সুবোধ ঘোষ

রচনা সমগ্র



সুবোধ ঘোষ
রচনা সমগ্র



সম্পাদনা

উত্তম ঘোষ

সমীরকুমার নাথ

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

SUBODH GHOSH
RACHANA SAMAGRA
PART III

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী ১৯৯৮

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা-৭০০০২৯

প্রচ্ছদপট
চারু খান

অক্ষরবিন্যাস
ওয়ার্ডওয়ার্কস
৭২/৩এফ/১, আর কে চ্যাটার্জী রোড
কলিকাতা-৭০০০৪২

মুদ্রক
ট্রায়ো প্রসেস
পি ১২৮ সি. আই. টি. রোড
কলকাতা-৭০০০১৪

ভূমিকা

সুবোধ ঘোষ রচনা সমগ্র আরো আগে প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। আজ থেকে প্রায় ১৮ বছর আগে সুবোধবাবু (মার্চ, ১৯৮০) আমাদের ছেড়ে হঠাৎ চলে গেলেন। যাবার আগের দিনও আনন্দবাজার পত্রিকায় তিনি তাঁর শেষ সম্পাদকীয় লেখা লিখে রেখে গেলেন : 'ওমর খৈয়াম স্মরণে'।

সুবোধবাবু সম্পর্কে আমি আমার বই 'সম্পাদকের বৈঠকে'—বেশ অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতার কথা লিখেছি, যা শুধু লেখক সুবোধ ঘোষকে নয়, ব্যক্তি সুবোধবাবুকেও হয়তো অনেকটা তুলে ধরতে পারে। তাঁর মৃত্যুর পর আমি আনন্দবাজারে লিখেছিলাম ঃ 'একসঙ্গে যোগ দিই, সেই যোগ'।

এ রচনাবলীতে প্রথম খণ্ডে সুবোধবাবুর 'তিলাঞ্জলি' উপন্যাসটি স্থান পেয়েছে। এটা কেন জানি না বহুদিন অমুদ্রিত অবস্থায় ছিল। আমার স্পষ্ট মনে আছে—এর কভার এঁকেছিলেন, প্রখ্যাত শিল্পী যামিনী রায়। সুবোধবাবু যে সময় 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে এই উপন্যাসটি লিখতে শুরু করেন তখনই পাঠকেরা বুঝে গিয়েছিল, শুধু 'ফসিল' বা 'অযান্ত্রিকে'র মতো অসাধারণ ছোট গল্প নয়, একটি নতুন স্বাদের উপন্যাস রচয়িতা এক বলিষ্ঠ লেখকের আবির্ভাব ঘটলো। সেই সময়কার রাজনৈতিক ডামাডোলের চিত্র--যা তিনি এই উপন্যাসে প্রকাশ করেছিলেন--তা পরবর্তীকালের পুস্তকাকারে বের হবার সময় একটা সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রকাশককে কেউ কেউ ভয় দেখিয়েছিলেন —এই বই প্রকাশ করলে তাকে জেলে যেতে হবে।

সুবোধবাবু তখন অসুস্থ, হাসপাতালে। তিনি প্রকাশককে আমার কাছে পাঠালেন। আমি বললাম—আপনি অনায়াসে প্রকাশক হিসেবে আমার নাম দিতে পারেন। আমি জেলখাটা লোক, জেলে যেতে আপত্তি নেই।

তাই হয়েছিল। প্রথম সংস্করণে প্রকাশক হিসেবে আমার নামই ছেপে বের হয়েছিল। অবশ্য আমাকে শেষ পর্যন্ত তার জন্য জেল খাটতে হয়নি।

১৯৪০ সালের পয়লা জানুয়ারি আমি আর সুবোধবাবু একই সঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগ দিই।.....তার আগে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে প্রুফরিডারের কাজে নিযুক্ত ছিলেন, আর আমি ছিলাম যুগান্তর পত্রিকার একজন জুনিয়র সাব-এডিটর। আনন্দবাজার রবিবাসরীয় বিভাগে মন্মথনাথ সান্যালের তিনি ছিলেন সহকারী আর আমাকে যোগ দিতে হল দেশ পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে। সেই সময় বর্মন স্ট্রীটের পূর্ব দিকে দোতলায় একটি ঘরেই ছিল দেশ ও আনন্দবাজারের রবিবাসরীয় দফতর।.

আমরা একই ঘরে বসে এই দুই পত্রিকার সাহিত্য সম্পর্কিত কাজে নিযুক্ত ছিলাম। সুবোধবাবুকে সে সময় যেভাবে দেখেছিলাম, সেই স্মৃতি আজও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তিরিশের কাছাকাছি বয়স, কিন্তু দেখে মনে হয় এখনও যেন যৌবনে পা দেননি। অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন তিনি, যাকে বলা যায় রোমান্টিক পুরুষ। কথা তিনি খুবই কম বলতেন। সব সময় দেখতাম, ডাকে আসা পাণ্ডুলিপিগুলো নিয়ে পড়ায় মগ্ন হয়ে আছেন। কখনও বিভাগীয় সম্পাদকের নির্দেশে তিনি সেই পাণ্ডুলিপি সংশোধনে নিমগ্ন থাকতেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হত, এ মানুষটি বোধহয় খুবই অভিমানী ও গম্ভীর। কিন্তু দিনের পর দিন একঘরে বসে কাজ করতে করতে যখন মধুরভাষী মানুষটির হৃদয়ের স্পর্শ পাওয়ার সুযোগ ঘটল, তখন দেখলাম যে, মানুষটি আসলে নীরব, নিরহঙ্কার, মধুরভাষী। যাকে বলা যায় অত্যন্ত বন্ধুবৎসল এক আড্ডাবাজ

মানুষ।

আমাদের চাকুরী জীবন শুরু একই সঙ্গে। মারকাস স্কোয়ারের সংলগ্ন মারকাস বোর্ডিং-এ একই সঙ্গে পাশাপাশি দুটি ঘরে আমাদের প্রাকবিবাহ যুগের বেশ কয়েকটি বছর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সন্নিবেশে কেটেছে। সেই সময় সুবোধবাবুকে নানা দিক দিয়ে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে জানবার নানা সুযোগ আমার ঘটেছিল।

ওঁর চরিত্রের একটি গুণ যা আমাকে বরাবরই আকর্ষণ করেছে, তা হলো বাঙালী হয়েও 'বাঙালীয়ানা'র কোন ছাপ তাঁর মধ্যে সচরাচর দেখা যেত না। তার একটা কারণ তিনি বাংলাদেশের বাইরে মানুষ হয়েছিলেন। হাজারিবাগ অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃঢ়তার প্রভাব তাঁর চরিত্রেও ছিল।'...

সুবোধবাবু বাংলা সাহিত্যকে যে একটি উজ্জ্বলরত্ন দিয়েছেন, সেই 'ভারত প্রেমকথা' 'দেশ'-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর 'শতকিয়া'। অন্য স্বাদের উপন্যাস। তাছাড়া ওঁর বহু গল্প—যা এই রচনাবলীতে স্থান পেয়েছে—তার মধ্যে অনেকগুলোই দেশ পত্রিকায় বেরিয়েছে। তাঁর অন্যত্র প্রকাশিত রচনাগুলিও বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে চিরকালীন মর্যাদা পাবে।

সুবোধবাবুর একটি গল্পসংকলন 'গল্প মণিঘর' শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল ও আমাকে উৎসর্গ করেছিলেন। লিখেছিলেন ঃ 'ভ্রাতৃপ্রতিম দুই বন্ধু—করকমলেষু...।'

প্রায় চল্লিশ বছর ধরে আমরা একই প্রতিষ্ঠানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে এসেছি। আমাদের দুজনের সম্পর্ক ছিল অটুট বন্ধুত্বের, প্রগাঢ় সহমর্মিতার। আমাদের দুজনের ভাগ্য ছিল এক সুতোতেই গাঁথা। তাঁর মৃত্যুতে সেই সুতো ছিঁড়ে গেল। গেল কি, সত্যি?

সম্পাদকের কথা

প্রখ্যাত সাহিত্যিক শংকর লিখেছেন ঃ

'পঞ্চাশ দশকে যখন আমার সাহিত্য ক্ষেত্রে কুণ্ঠিত প্রবেশ তখন সুবোধ ঘোষ খ্যাতির মধ্যগগনে। চল্লিশ দশকের যে বিস্ময় সৃষ্টির মধ্যে সাহিত্যে গগনে তার উদয় তার রেশ কিছুটা কেটেছে, কিন্তু বিপুল পাঠক সমাজের কৌতূহলের অভাব নেই। সকলের মুখে তখন এক প্রশ্ন, তিনি আরও বেশি লেখেন না কেন? সুবোধ ঘোষ তার উত্তর দিতেন না, কিন্তু সাহিত্য কর্মের সঙ্গে যাঁরা কিছুটা যুক্ত তাঁরা সহজেই বুঝতে পারতেন, সুবোধ ঘোষ যে ধরনের গল্প লেখেন, তা বেশি লেখা যায় না, প্রতিটা গল্পের পেছনে থাকে গভীর চিন্তার অদৃশ্য ভিত্তিভূমি।'

সুবোধ ঘোষের রচনা সমগ্র সম্পাদনার সময় আমরা এটা মর্মে মর্মে অনুভব করেছি। সত্যি, বেশি লেখেন নি তিনি। তিরিশ-বত্রিশটি উপন্যাস, তার মধ্যে আয়তনে বৃহৎ মাত্র তিন-চারটি (ত্রিযামা, শতকিয়া ও জিয়াভরলি), আর বাকীগুলি মাঝারি, কতগুলি তো ছোট উপন্যাসের পর্যায়ে পড়ে—যেমন সুজাতা, বর্ণালী, মুক্তিপ্রিয়া, কান্তিধারা, ছায়াবৃতা প্রভৃতি।

গল্পের সংখ্যাকে চার ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(ক) সেই অযান্ত্রিক, ফসিল থেকে শুরু করে সিরিয়াস আলোড়নকারী গল্প থেকে জীবন বিচিত্রার বহু দিক, ব্যক্তি ও মানসিকতা নিয়ে কাহিনীর মধ্য দিয়ে হাল্কা মিষ্টি প্রেমের গল্প—যার সংখ্যা প্রায় ১৬০।

(খ) ভারত প্রেমকথা—২০

(গ) কিংবদন্তীর দেশে—৩১

(ঘ) পুতুলের চিঠি—৮

(ঙ) ক্যাকটাস (জীবজগৎ পশু-পাখি-অরণ্য)—১৪

তাই যার মাত্র তিরিশটা উপন্যাস ও আড়াইশোর কম গল্প (পেশাগত সাহিত্যিক জীবন মধ্য চল্লিশ দশক থেকে সত্তর দশকে শেষ, অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ বছর। তাও একটানা নয়—হঠাৎ হঠাৎ কলম থেমে গেছে—বিশেষ করে জীবনের শেষ অধ্যায়ে) তিনি অবশ্যই পরিমাণের দিক দিয়ে বেশি লেখেন নি (তাঁকে ঠিক prolific writer বলা যায় না সেই অর্থে)—যার জন্য গণিতের দিক থেকে বিচার করে তাঁর সমগ্র রচনা বর্তমান বিজ্ঞানের মুদ্রণ যন্ত্রে ৬০০০ পাতার মধ্যে হয়তো সীমাবদ্ধ করা সম্ভব। এবং এর মধ্যে অবশ্যই তাঁর বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ, রম্যরচনা এবং একটি গীতিনাট্যকেও ধরা হয়েছে।

তাই আমরা হয়তো দশটি খণ্ডের মধ্যে তাঁর সমগ্র সাহিত্যিক ফসলকে গোলায় ভরে ফেলতে পারব, যা অন্যান্য সাহিত্যিকদের তুলনায় অনেক কম—পূর্বসূরী তারাশংকর-বিভূতিভূষণ-সমসাময়িক বিমল মিত্র বা উত্তরসূরী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়—যেই হোক না কেন। শংকর সুবোধ ঘোষকে মহৎ স্রষ্টাদের পূর্ণকুম্ভ মেলায় 'নিজস্ব মহিমা' নিয়ে বিরাজ করার কথা বলেছেন। তাঁর জীবন সংগ্রামও বড় বিস্ময় জাগানো জীবন কথা, কিছু লিখিত, কিছু লোকমুখে শোনা যায়। গল্প-উপন্যাস ছাড়াও নানা বিষয়ে গবেষণামূলক রচনা লিখেছেন তিনি, তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে। প্রধানত ছোটগল্প লেখক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করলেও তাঁর কলম দিয়েই বেরিয়েছে বিভিন্ন বই যার বিষয় মনস্তত্ত্ব (ফ্রয়েড), কারুশিল্প (শিল্পভাবনা/রঙ্গবল্লী),

আদিবাসী সমাজ, সামরিক বিজ্ঞান, গান্ধীজীবনী, নৃতত্ত্ব ও সমাজ-বিজ্ঞানের কথা। বিচিত্রপথে যাওয়া তাঁর রচনার এই 'সর্বত্রগামী' দিকটা বহুলাংশে অজানা বলে আমাদের মনে হয়েছে। তাই বোধ হয় চিন্তামণি কর মন্তব্য করেছেন : 'গল্প উপন্যাস পুরাকাহিনী প্রভৃতি লেখার জন্য এই লেখকের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা সুবিদিত থাকলেও নাট্য, সংগীত, পুরাতত্ত্ব, রূপকথা সম্বন্ধে তাঁর আন্তরিক ও গভীর পরিজ্ঞানসম্ভূত প্রবন্ধগুলি বহুজনের প্রায় অজানা ছিল।'

তৃতীয় খণ্ডে আমরা তার বৃহত্তম উপন্যাস 'শতকিয়া' এবং আরেকটি উপন্যাস 'বন উপবন' কে স্থান দিয়েছি। 'শতকিয়া' 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। একটি চিঠিতে লেখক (৮/৩/৬৩) নিজে লিখেছেন : '...আমার বৃহত্তম উপন্যাস শতকিয়া বর্তমান শাসনব্যবস্থা (অর্থাৎ, আমাদের স্মরন করতে হবে--ষাটের দশক) ও প্রশাসনের সমালোচনা। বর্তমান ভূমি-প্রথা, চাষী-সত্ত্বের প্রতি অবিচার, পুঁজিবাদী ইণ্ডাস্ট্রির অনাচার, জুডিসিয়ারির অন্ধতা, উৎকোচ-দুষ্ট পুলিশ ও থানার অত্যাচার--এইসব অন্যায়ের আঘাত সহ্য করতে করতে একজন দুঃখী দরিদ্র ও সৎ মানুষের বিদ্রোহের শক্তিও করুণভাবে শেষ হয়ে গেল। তার বদলে টাকাওয়ালা মেকি মানুষের সুলভ ইলেকশন ও ভোটবাজির এক চটুল ডেমোক্রেসি মাথাচাড়া দিয়ে উঠল...। বলে রাখা ভালো, নানা কারণেই প্রথাগত সন-তারিখ বা কালক্রম অনুযায়ী আমরা খণ্ডগুলোকে সাজাইনি। আমাদের উদ্দেশ্য প্রতিটি খণ্ড যেন এক একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে বহু বিচিত্রা হয়ে ওঠে। তাই তৃতীয় খণ্ডে আছে দুটি উপন্যাস, ষোলটি সামাজিক গল্প ; এ ছাড়া দুটি গল্প 'ভারত প্রেমকথা'র এবং চারটি 'কিংবদন্তীর দেশে' থেকে সংগৃহীত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'কালপুরুষের সাতপাঁচ' গ্রন্থের ছয়টি ছোট রম্যরচনা।

অল্পকথায়, এই রচনা সমগ্র সম্পাদনায় আমরা চেয়েছি প্রতিটি খণ্ডে সুবোধ-প্রতিভার 'কামিনী-কাঞ্চন' যোগ হোক (বলা বাহুল্য--বিশেষণটি এখানে রচনাগুলোর বৈশিষ্ট্যের ঐশ্বর্যের কথা ভেবে বলা হয়েছে)। কালপঞ্জি বা অ্যাকাডেমিক পাঠক্রম হিসাবে সাজালে পরিবেশন রসলাভের দিক থেকে ততটা সার্থক হতো না বলে আমাদের মনে হয়েছে। পাঠকরা এটাই বিচার করবেন।

সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের মূল্যায়নটা আমাদের কাছে সম্পাদনার মানদণ্ড স্থির করতে সাহায্য করেছে : 'তিনি (সুবোধ ঘোষ) সাহিত্য করেছেন। শতকরা একশোভাগ সাহিত্য।... আছে সচেতন বিদ্রোহ, সেই কারণে তিনি এক ভিন্ন নামের নদী। স্রোত কম, অবগাহনে তৃপ্তি।...সব্যসাচী, অজাতশত্রু!'

মহাশ্বেতা দেবী বলেন, 'যে লেখক পরুষ, রুক্ষ ঋজুতা থেকে সহজ সাবলীল মিষ্টিলেখা--তা থেকে সংস্কৃত কাব্যের মতো অলংকার ঝংকৃত বাংলায় এমন অনায়াসে যাতায়াত করতে পারেন, তিনিই সুবোধ ঘোষ'। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন--'ছাত্র বয়সে 'দেশ' পত্রিকা পেলেই দুজনের গল্প আগে পড়ে ফেলতাম--পরশুরাম ও সুবোধ ঘোষ। বাংলার ছোট গল্পের সেই স্বর্ণযুগে কারুর সঙ্গে কারুর তুলনা চলে না। তবু এক একজন লেখক সম্পর্কে কিছু কিছু পাঠকের পক্ষপাতিত্ব থাকেই। আমার পক্ষপাতিত্ব ছিল সুবোধ ঘোষ সম্পর্কে'--যাকে ব্যক্তিজীবনে তাঁর 'দূর থেকে দেখা'।

সন্তোষকুমার ঘোষ একটি রচনার শীর্ষনাম দিয়েছিলেন--'যে বনস্পতির নাম সুবোধ ঘোষ।'

সমরেশ মজুমদার প্রশ্ন করেছেন নিজেকেই--'এখনও নিজের লেখার পাশে ওঁর লেখা রেখে দেখতে গেলেই লজ্জা পাই...ইনি অবশ্যই আমার পূর্বসূরী, কিন্তু আমি, আমরা কতটা উত্তরসূরী?'

আশাপূর্ণা দেবী মুগ্ধ হয়ে লিখেছেন : 'তিনি এলেন, দিলেন, জয় করলেন', এই 'দিলেন' শব্দটা লেখিকার তাৎপর্যপূর্ণ সংযোজন--শেক্সপীয়ারের নাটকের বিখ্যাত উক্তি 'vidi'-র (দেখলাম-এর) পরিবর্তে।

সম্পাদনা করতে করতে সম্পাদক হিসেবেই কিছু স্বাভাবিক প্রশ্ন মনে জাগে। বোধ হয় এই ধরনের প্রশ্ন পাঠকদের হয়েই আমরা উপস্থাপনা করতে পারি। সবচেয়ে ভাল, একটি জিজ্ঞাসা আমাদের ভাষায় না বলে, এক প্রসিদ্ধ প্রকাশনা সংস্থার জ্যাকেটে লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিচিতির উল্লেখ করলেই পরিষ্কার হতে পারে। তাঁরা লিখেছেন :

'...প্রথম গল্প অযান্ত্রিক। বন্ধুদের অনুরোধে লেখা, এরপর ফসিল। বাংলা সাহিত্যে বিস্ফোরণ জাগিয়ে আবির্ভাব। বহু গল্প-উপন্যাস চলচ্চিত্রায়িত। আনন্দ পুরস্কার ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী পদক। এছাড়া অন্য পুরস্কার পাননি। বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাবের মতোই বিস্ময়কর এই ঘটনা।'...

সম্পাদনার কাজ করতে করতে যখন মহাশ্বেতা দেবীর কথা স্মরণ বিশেষ ভাবে করছি ('আবার হব মুগ্ধ'), তখন এই 'বিস্ময়কর ঘটনাটা' পাঠকের দৃষ্টিতে একটা বিরাট প্রশ্ন চিহ্ন থেকে গেছে বলে মনে হয়েছে। রচনা সমগ্রের "সম্পাদকের কথা"য় তাই তার উল্লেখ বা পুনঃ-উল্লেখ। উত্তরের জন্য নয়, আক্ষেপ হিসেবে নয়,--শুধু সাহিত্যের ইতিহাসে এই প্রশ্নটিকে স্থায়ী স্থানদানের জন্য, পরবর্তী প্রজন্মকে এই বিষয়ে সতর্ক করার দায় অনুভব করেছি আমরা।

তাই বোধ হয় শংকরের দুঃসাহসী মন্তব্য : 'অনেকের কীর্তন গাইবার দল থাকে, সুবোধ ঘোষের (সেসব) কিছুই নেই।'

উত্তম ঘোষ
সমীরকুমার নাথ

সূচীপত্র

রম্যরচনা

উপন্যাস

বন উপবন

ঘরের দরজার কপাটে টোকা পড়ছে—টক্ টক্ টক্। একবার দুবার তিনবার। তার পরেই শব্দটা থেমে গেল।

ঘরের ভিতরে আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে চিরুনিটাকে হাতে তুলে নিতে গিয়েই হেসে ফেলে প্রতিভা। বুঝতে তো কোন অসুবিধে নেই, কে টোকা দিয়েছে।

কিন্তু টোকা দেবার কী দরকার ছিল? দরজার কপাট তো বন্ধ নয়। ভিতর থেকে কপাটের গায়ে খিল এঁটে দেয়নি প্রতিভা। তাছাড়া ভেজানো কপাট তো কোন বাধাও নয়। সামান্য একটু ঠেলা দিলেই খুলে যায়। তবু টোকা দিচ্ছেন ভদ্রলোক। আহা, কী ভদ্রতা! যিনি সেদিন হুট করে স্নানের ঘরে ঢুকে প্রতিভার হাতের তোয়ালেটাকে কেড়ে নিলেন, তিনি এখন প্রতিভার ঘরের দরজার ভেজানো কপাটে টোকা দিয়ে প্রতিভাকে সাবধান হতে বলছেন। কী চমৎকার সতর্ক আর সংযত সৌজন্য!

প্রতিভার চোখের হাসিটা দরজার দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পেরেছে, ভেজানো কপাটের ওদিকে কী সুন্দর একটি দুষ্টুমির হাসি দাঁড়িয়ে আছে। উনি বোধ হয় মনে করেছেন যে, কপাটের গায়ে এরকম তিনটে টোকার শব্দ শুনলে ভয় পেয়ে চমকে উঠবে প্রতিভা। বন্ধ জানালার গায়ে কাকের ঠোকরের শব্দ শুনে খুব ভয় পায়, বউদির যে ছোট মেয়েটা, সেই মণ্টুর মত গলা কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে উঠবে। আর, ভদ্রলোক তখন একটা ধাক্কা দিয়ে ভেজানো কপাট ঠেলে ঘরের ভিতরে ঢুকবেন। থিয়েটারের বীরের মত চেঁচিয়ে উঠবেন—ভয় নেই, এই যে, আমি আছি!

কে জানে এখন কেমন আছে মণ্টু? পুরো একটা বছর পার হয়ে গিয়েছে, সেই যে মণ্টুটা কোলের উপর ঘুমিয়ে পড়লো, আর ঘুমন্ত মণ্টুকে বিছানাতে শুইয়ে দিলে প্রতিভা, তারপর সেদিন আর একটিবারও ওর কাছে গিয়ে ওকে দেখবার সাহস হলো না। তিন বছর বয়সের সেই মণ্টুকে সেদিন তখন ঘুম না পাড়িয়ে প্রতিভার চলে আসবারও উপায় ছিল না। জাগন্ত মণ্টুর দুই চোখ কী অদ্ভুত সতর্ক দুটো চোখ। পিসি যেন বরের বাড়িতে পালিয়ে যেতে না পারে, তাই সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত পিসির হাত শক্ত করে ধরে রেখেছিল মণ্টু। বিয়ের রাতের উৎসবের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খুশি হয়ে ছুটোছুটি করেছিল যে, সেই মণ্টু। বড় বেশী ঘামাচি হয় মেয়েটার। বউদিকে তো অনেকবার বলা হয়েছে, মাঝে মাঝে শ্বেতচন্দনের গুঁড়ো ভাল করে ওর সারা গায়ে মেখে দিয়ে তারপর ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে দিও। বউদি কি মনে করে রেখেছে সে-কথা? মনে করে রাখলেই বা কি? শুধু কাপড় কাচতেই যার সকাল থেকে বিকেল ফুরিয়ে যায়, সে মানুষের পক্ষে মণ্টুর ঘামাচি নিয়ে ব্যস্ত হবার সময় কোথায়?

চলে গেলেন নাকি ভদ্রলোক? কপাটের গায়ে আর তো টোকা পড়ছে না। মুখ ফিরিয়ে দবজার দিকে তাকায় প্রতিভা। না, ভেজানো কপাট একটুও নড়ে উঠলো না! তবে, তবে বোধ হয় খুব আস্তে আস্তে ঠেলা দিয়ে, দুই কপাটের মাঝখানে সামান্য একটু ফাঁক দিয়ে একজোড়া ধূর্ত চোখের হাসি এখুনি ঘরের ভিতরে উঁকি দেবে। চিরুনিটাকে তেমনই হাতে ধরে রেখে দরজার কাছে এগিয়ে আসে প্রতিভা। কপাট একটু ফাঁক হলেই, একজোড়া ধূর্ত চোখের হাসি দেখতে পেলেই কপাটের ফাঁকের ভিতর হাত চালিয়ে অনুপমের মাথায় ওই চিরুনি দিয়ে বেশ জোরে একটা টোকা দিতে হবে। শাড়ির আঁচলটাকে দাঁতে চেপে ধরে আর চুপ করে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে প্রতিভা। খুব সাবধান ; মুখের নীরব হাসিটা যেন শব্দ করে উথলে উঠতে না পারে।

অনুপমের মাথায় মেয়েলী চিরুনির টোকা! এর পরিণাম কী হবে, তা-ও বুঝে নিতে কোন অসুবিধা নেই প্রতিভার। জানাই আছে, কী করবেন ভদ্রলোক। প্রতিভার হাত দুটো শুধু শক্ত করে একবার চেপে ধরেই আবার শান্ত হয়ে চলে যাবেন, এমন মেজাজের মানুষ উনি নন। কিন্তু তাতেই বা ভয় কিসের? ছাই ভয়। ভালই তো লাগে। শুধু অনুপমের মেজাজের দোষ দেবার কোন মানে হয় না। প্রতিভার মনটাও যে মাঝে-মাঝে সময়-অসময় বিচার করতে চায় না। কতবার ভুলে যেতে হয়েছে, এটা রাত নয়, নিতান্ত একটা দুপুরবেলা। সেদিনও তো, হঠাৎ ভুলেই যেতে হলো যে, এটা একটা বিকালবেলা, এখনই বের হতে হবে, পার্ক-সার্কাসের রজনীবাবুর বাড়িতে নেমন্তন্ন আছে, রজনীবাবুর গাড়িটা এসেও গিয়েছে। আধ ঘণ্টা ধরে কত যত্ন করে পরা সাজ এক মিনিটের মধ্যে এলোমেলো হয়ে গেল। আবার নতুন করে সাজতে হলো। শুধু অনুপমকে একটা ক্ষেপা বাতাসের ঝড় বলে নিন্দে করা উচিত নয়। প্রতিভা নিজেও যে একটা ঢলের জলের ঢেউ, ভেসে যেতে আর ভাসিয়ে নিয়ে যেতে ভালবাসে। আশ্চর্য, বলে আশ্চর্য! ভাবতেও অদ্ভুত লাগে, এক বছর আগে যে-মানুষ একেবারে অচেনা অজানা ও অদেখা একটা মানুষ ছিল, আজ এখন তারই কাছে মন-প্রাণ সবই লজ্জা হারিয়ে কত সুখী হয়ে যায়।

মনে পড়লে হাসি পায়। একদিন রিক্সাতে বড় মাসির কোলে বসতে হয়েছিল বলে কত অস্বস্তি বোধ করতে হয়েছিল। ধিঙ্গি শরীরটা নিয়ে বড় মাসির কোলে বসা, হাত-পা যেন লজ্জা পেয়ে শিউরে উঠেছিল। কিন্তু এখন? এই তো, এখুনি অনুপম এসে ঘরে ঢুকবে। ঘরের আলোটা জ্বলতেও থাকবে। তখন কী হবে? তখন কী আর সেই অদ্ভুত লজ্জা আর অস্বস্তির কোন কথা মনে পড়বে?

হ্যাঁ, রিক্সা। নড়বড়ে নোংরা একটা রিক্সা। সেই রিক্সার দিকে তাকিয়ে বড় মাসির চোখ দুটো ভয় পেয়ে চমকে উঠেছিল। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে হাঁফ-ধরা স্বরে একটা অদ্ভুত কথাও জিজ্ঞেস করে বসলেন বড় মাসি—রিক্সা কেন পরেশ? শুনেছিলাম যে...।

হেসে ফেললেন বাবা। কী অদ্ভুত শুকনো খটখটে হাসি। যেন বুকের ভিতর থেকে একগাদা পোড়া কয়লার ছাই ঝরে পড়ছে। ছাতার হাতলটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে বাবা যেন একটা হঠাৎ-আঘাতের কাঁপুনি সহ্য করে নিলেন। জবাব দিতে গিয়ে কেশে ফেললেন। হাসি আর কাশির সঙ্গে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা গলার স্বর মিশিয়ে দিয়ে বাবা শুধু বললেন—হ্যাঁ বড়দি ; কিন্তু আপনার খুব বেশী কষ্ট হবে না। এই তো, এই স্টেশন থেকে মাত্র আট-দশ মিনিটের রাস্তা।

শ্রীনগরের বড় মাসি এই প্রথম গুপ্তিপাড়ার বাড়িতে এলেন। শ্রীনগরে নিশ্চয় রিক্সা নেই। তা না হলে সামান্য একটা রিক্সা দেখে এত ভয় পেতেন না বড় মাসি।

কিন্তু দরজার কপাট যে একেবারে চুপ হয়ে স্থির হয়েই এঁটে রয়েছে। ওদিকের কোন সাড়া আর শব্দ করে বেজে ওঠে না। তা হলে কি শুধু অকারণে তিনটে টোকা দিয়ে চলে গিয়েছে একটা মিথ্যে ভয়-দেখানো মতলব? এ সময়ে তো শুধু নীচের তলার ঘরে বসে চন্দ্রবাবু আর সূর্যবাবুর সঙ্গে দুনিয়ার যত মাথা-ব্যথার গল্প করা ছাড়া অনুপমের আর কোন কাজ নেই। ওসব গল্পের মধ্যে কী এমন আনন্দের জাদু আছে যে, এখানে এই ঘরের দরজার কাছে এসেও আবার ওখানেই ছুটে চলে যেতে হবে?

কপাট খুলে ঘরের বাইরের বারান্দার দিকে তাকায় প্রতিভা। ঠিকই, কেউ নেই। চলে গিয়েছে অনুপম। চলেই যদি যাবে, তবে এরকম একটা মিথ্যে ঠাট্টা করবার কী দরকার ছিল? চন্দ্র-সূর্যকে নীচের তলার ওই ঘরে দু পেয়ালা চা দিয়ে একটা ঘণ্টা বসিয়ে রাখলে কি গল্পের মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত? এমনিতেই তো কতবার সন্ধ্যা হবার আগেই এসে ওই ঘরের দুই চেয়ারে চন্দ্র-সূর্য দুজনেই বসে থাকেন। অনুপম তখন বাড়িতে নেই, তবু তাঁরা বসে

থাকেন। সন্ধ্যা হয়, ঘরের ভিতরে তখন চারটে আলো জ্বলে। কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা আলো। সারা ঘরে যেন কালিমাখানো একটা আভা ছমছম করে। দুটো পাখাও ঘোরে। আর, চাকর রামপ্রসাদ দু' ঘণ্টার মধ্যে অন্তত চার পেয়ালা চা পৌঁছে দিয়ে আসে। যুদ্ধটা একেবারে থেমে না যাওয়া পর্যন্ত বোধ হয় চন্দ্রবাবু আর সূর্যবাবুর চা খাওয়াও থামবে না। কী আশ্চর্য, যখন সাইরেন বেজে ওঠে, এ আর পি'র হুইসিলের শব্দ ছুটোছুটি করে, তখনও ব্যস্তভাবে ডাক দেন চন্দ্রবাবু—রামপ্রসাদ, তাড়তাড়ি দু' কাপ চা দিয়ে যাও।

এই বারান্দার আলোটা কিন্তু বেশ নরম। ঘন নীল রঙের ডুম দিয়ে ঢাকা। দোতলার এই বারান্দা যেন রঙীন মোজেয়িকের একটা সড়ক। কত লম্বা! এখান থেকে একটানা পর পর পাঁচটা ঘরের দরজা ছুঁয়ে ছুঁয়ে একেবারে সিঁড়ির কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। এক পাশে ফুলের টবের সবই যত চীনে লিলি আর জাপানী হানা। ওদিকে সিঁড়ির মুখের সামনা-সামনি সেগুন কাঠের একটা সিংহের পিঠের উপর মস্ত বড় একটা মিরর। এখানে দাঁড়িয়ে ওই মিররের দিকে তাকালেই বুঝতে পারা যায়, সিঁড়ি ধরে কে উপরে উঠছে, আর কে-ই বা নেমে যাচ্ছে।

না, কেউ না। ওই মিররে কোন মানুষের যাওয়া-আসার ছবি নড়ছে না। কোন সিগারেটের ধোঁয়ার একটা হালকা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা কুণ্ডলীও দুলছে না।

গুপ্তিপাড়ার বাড়ির বারান্দাতে একদিন হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলেন বড় মাসি। হাঁটুতে খুব ব্যথাও পেয়েছিলেন। ফাটলে ভরতি, বেশ এবড়ো-খেবড়ো একটা বারান্দা। সিমেন্টের প্রলেপ ভেঙ্গে-চুরে ছন্নছাড়া হয়ে গিয়েছে। বড় মাসি তাঁর হাঁটুটাকে এক হাত দিয়ে চেপে ধরে আর খুবই ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—এ কেমন একটা বারান্দা রেখেছিস মলিনা? আমাদের শ্রীনগরের গলির রাস্তাও যে এর চেয়ে...।

বড় মাসির হাঁটুতে হাত বুলিয়ে আর জলপটি বেঁধে দিয়ে মা যেন মুখ লুকিয়ে কথা বললেন—আগে এরকম ছিল না।

বড় মাসি—তাই তো শুনেছিলাম।

কাশ্মীরের শ্রীনগর দেখতে খুব খুন্দর। কত সুন্দর করে কাশ্মীরের কত গল্প বলতেন বড় মাসি। ডাল লেকের অত ঠাণ্ডা জলেও কী চমৎকার পদ্মফুল ফোটে। ঝিলমের জলের বাজে পমফ্রেটও তোমাদের এই গুপ্তিপাড়ার ফলুইয়ের চেয়ে ভাল স্বাদের মাছ। চেনারের পাতা যখন পাকে, তখন দূর থেকে দেখলে মনে হবে যে, গাছের মাথায় আগুন লেগেছে ; পাকা পাতার রং যেন গনগনে লালচে আগুনের রং। তোদের মেসো আজকাল আর বাইরে বড় বের হয় না ; আমিও না। গাড়িটা গ্যারেজে বন্ধ হয়ে পড়েই আছে। হ্যাঁ, মধু অবিশ্যি মাঝে মাঝে গাড়ি নিয়ে এদিক-ওদিক একটু দৌড়ে আসে। ওরই বা সময় কোথায়? এত বড় ওষুধের দোকান, বছরে তিন লাখ টাকার বিক্রী। সব ঝঞ্ঝাট সামলাতে গিয়ে ছেলেটা হিমসিম খায়।

—মলিনা, ও মলিনা? গুপ্তিপাড়ার বাড়ি থেকে চলে যাবার ঠিক পাঁচ মিনিট আগে ডাক দিলেন বড় মাসি। মা কাছে আসতেই একটা অদ্ভুত কথা বললেন।—না মলিনা, আমি কোন ভরসা দিয়ে যেতে পারলাম না।

—তুমি তো চিঠিতে লিখেছিলে যে, ওঁদের কোন দাবি নেই। শুধু মেয়ে দেখতে ভাল হবে, এ ছাড়া...।

—হ্যাঁ, লিখেছিলাম। কিন্তু তখন তো স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে, তোমাদের আর কোন কিছুই ভাল নয়। দত্তবাবুর মত টাকা-পয়সার মানুষ, আর কিছু না হোক, তিনি তো অন্তত ঘর বুঝে কাজ করতে চাইবেন।

কে জানে কেন, বাবা আর বড় মাসির কাছে এগিয়ে আসতে পারলেন না। বেশ একটু

দূরে দাঁড়িয়ে বড় মাসির কথাগুলিকে শুনলেন, আর দূরেই দাঁড়িয়ে রইলেন। বাবার চোখ দুটো কি ভয়ানক শুকনো হয়ে উঠানের চালতে গাছের মাথায় একটা কাকের বাসার দিকে তাকিয়ে রইল। ছেঁড়া ছেঁড়া খড়, মরা কাঁটাঝোপের ডাঁটি, পচা বাঁশের কঞ্চি আর টেরা-বাঁকা একটা শুকনো নেবুডাল দিয়ে তৈরী কাকের বাসাটা এলোমেলো হয়ে ঝুলছে।

তাই তো, এতক্ষণ চোখেই পড়েনি যে, টবের এই জাপানী হানার কুঁড়িটা ফুটেছে! কখন ফুটলো? নিশ্চয় আজই, এই সন্ধ্যাতেই, কিছুক্ষণ আগে। আজই বিকালে, স্নান সেরে নিয়ে এই ঘরে ঢোকবার আগে চোখে পড়েছিল, কুঁড়িটা সেই সকাল থেকে তখনও কুঁড়ি হয়েই রয়েছে।

হেসে ফেলে প্রতিভা। আজ ভাবতে গেলে শুধু হাসিই পায়। কে না কে এক দত্তবাবু, শ্রীনগরে থেকে কলকব্জার কারবার করেন, তাঁর ছেলের জন্যে একেবারে সত্যিকারের রাজবাড়ির মেয়ে চাই। বড় মাসি যে সেদিন কোন ভরসা না দিয়ে, আর বেশ একটু বিরক্ত হয়ে চলে গিয়েছিলেন, সেটা তো বলতে গেলে ভগবানের আশীর্বাদ। তা না হলে আজ এখানে এই টবের জাপানী হানার কাছে দাঁড়িয়ে আর হেসে হেসে অনুপমের উপরে রাগ করতে এত ভাল লাগতো কার?

কারও না। আর কারও সে সাধ্যিই হতো না। হতেই পারে না। হ্যাঁ, সব মেয়েই স্বামীকে ভালবাসে। কিন্তু সবাই কি ঠিক এ রকম কাণ্ড করে? সব সময় স্বামীর গা ঘেঁষে বসে থাকতে চায়, আর কিছু চায় না, পৃথিবীতে এমন মেয়ে আরও দুটি-তিনটি সত্যিই কি আছে? বিশ্বাস হয় না, আর কোন মেয়ে কখনও তার বরের ফটোর দিকে তাকিয়ে কথা বলে ফেলেছে, হেসে ফেলেছে, আর সেই ফটোকে বুকের উপর রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। সত্যিই একটা যাচ্ছেতাই ব্যাপার। যার সঙ্গে এক বছর আগে সামান্য একটু চেনা-শোনাও ছিল না, আজ তারই বুকের উপর মুখ রেখে কথা বলতে হয়।

এবেলা গুপ্তিপাড়াতে গেলে ওবেলা ফিরে আসতে হয়। মা রাগ করে বলেন, এটা তোরই একটা বাড়াবাড়ি। শেফালীদি বলেন—আমি তো আমার জীবনে কখনও দেখিনি, কোন মেয়ে বিয়ের পর একটা দিনও পার না হতেই তোমার মত একেবারে...।

একটু থেমে নিয়ে আর চোখ বড় করে শেফালীদি সেই নিতান্ত একটা পুরনো কথাকে এই সেদিনও আবার সবার সামনেই চেঁচিয়ে বলে দিলেন। ঠিকই, এতটা উচিত হয়নি। বিয়ের পরের দিনেই, ওরকম ঝকঝকে একটা সকালবেলাতে, ঘরের জানালাটাও যখন খোলা, তখন নিজের হাতে একটা সিঙাড়া তুলে নিয়ে অনুপমকে খাইয়ে দেওয়া! লোকের চোখে একটু বেশী বাড়াবাড়ি বলে মনে হবেই তো। কিন্তু উপায়ও তো ছিল না। ভদ্রলোকই যে জেদ ধরে ওই কাণ্ডটা করিয়ে ছাড়লেন। তারপর, তারপর তো এই বাড়ির জীবন। এখানে তো শেফালীদির মত কেউ নেই যে, খোলা জানালা দিয়ে উঁকি দেবে। অনুপমেরও আর জেদ করে বলতে হয় না, খাইয়ে দাও। বেচারা কতবার একেবারে নিশ্চিন্ত মনে আর চোখ বন্ধ করে খাবার খেয়েছে। খাইয়ে দিয়েছে প্রতিভা। আর...মনে পড়তেই হেসে ফেলে প্রতিভা। একদিন কলার খোসাটাকে অনুপমের মুখের ভিতরে টুপ করে ফেলে দিয়েই সরে গিয়েছিল প্রতিভা। একটা থামের পিছনে লুকিয়েছিল। খোসাটাকে বার তিনেক চিবিয়ে নিয়েই কী ভয়ানক চমকে উঠলো বেচারা। চোখ মেলে এদিক-ওদিক তাকিয়ে প্রতিভাকে খুঁজলো। তারপর এক লাফে উঠে এসে আর থামের পিছনে লুকানো প্রতিভার একটা হাত চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠলো, এই ট্রেচারির শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে। ক্ষমা নেই, ছাড়াছাড়ি নেই।

ছাই শাস্তি। ওটা শাস্তিই নয়। চোখে মুখে আর কপালে ওই শাস্তি চিরকাল ঝরে পড়ুক। রুমাল দিয়ে কিংবা তোয়ালে দিয়ে মুছলেও যেন মুছে না যায়।

সেটা ছিল শ্রাবণ মাসের একটা দিন। আজ হলো পৌষ মাসের পয়লা। তার মানে চার

মাস আগে। তারপর ঠিক ওভাবে আর শাস্তি পাওয়া হয়নি। সকাল বিকেল সন্ধ্যা, সব সময়, যখন তখন, চেষ্টা পাওয়া একটা ঝড়ের বাতাসের মত উতলা হয়ে ওঠা, আর, ঝুর ঝুর করে একগাদা শিউলি ঝরিয়ে দেওয়া। না, ইচ্ছেটা আর ওরকম করে একটা চোখখোলা বিকালবেলার আলোতে একেবারে উঠানের মাঝখানে হুটোপুটি করবার সুযোগ পায় না। কিন্তু সেজন্যে বেচারাকে খুব দোষ দেওয়া যায় না। বাড়িটা আর ফাঁকা বাড়ি নয়। চারদিক থেকে নানা কাজের তাড়া এসে অনুপমের অনেক সময় কেড়ে নিয়েছে। এই আসছি বলে চলে গেলেও তিন ঘণ্টা পরে এসে দেখা দেয়। বেশ রাগ হয় প্রতিভার যখন উপরতলার ঘরের জানালা দিয়ে সড়কের দিকে তাকিয়েই দেখতে পায়, মোটা মোটা কাগজপত্রের ফাইল হাতে নিয়ে চন্দ্র-সূর্য একসঙ্গে এবাড়ির গেটের কাছে এসে পড়েছেন।

এই যে বাড়ির এই বারান্দার চকমকে রঙীন মোজেয়িক, এটাও যেন একটা হঠাৎ-ব্যস্ততার সৃষ্টি। মাস তিনেক আগে হঠাৎ একদিন মিস্তিরী মজুর আর গাদা-গাদা মালমশলা এসে আর মাত্র একমাস কাজ করে বারান্দার পুরনো সিমেন্ট উপড়ে ফেলল ; আর, একটা রঙীন শোভার প্রলেপ দিয়ে বারান্দাটার চেহারা ফিরিয়ে দিয়ে গেল।

এই যে আজ এ বাড়ির প্রত্যেক ঘরে পালিশ করা সেগুনের ফার্নিচার ঝকঝক করছে, এ-সবও তো চার মাস আগের আবির্ভাব। প্রতিভার এই ঘরের পাশের ঘরে যে নতুন একটা স্টীলের সেফ নতুন কার্পেটের উপর শক্ত হয়ে বসে রয়েছে, সেটাও মাস দুই আগে এসেছে। আজও দুপুরবেলা, হঠাৎ যখন ঘুমটা ভেঙে গেল, তখন শুনতে পেয়েছে প্রতিভা, পাশের ঘরে চাবির শব্দ কট্ করে বেজে উঠলো, সেফের ডালা বন্ধ হলো। তারপর সে-ঘরের দরজার তালাতেও চাবির শব্দ বাজলো আর থেমে গেল। কাজের দরকারেই ও-ঘরের ওই ইস্পাতের সেফের কাছে এসেছিল অনুপম ; আর কাজের দরকারের জিনিস নিয়েই ব্যস্তভাবে চলে গেল। চোখে না দেখলেও সবই বুঝতে পারে প্রতিভা।

ননীকাকা বলেন—তোমাকে দেখে আমার খুব আশ্চর্য লাগে বউমা। ছোট্ট চাঁদ ; কিন্তু কত আলো! তুমি তো এ বাড়িতে প্রথম এসে নিজের চোখেই সব দেখেছো। আমার এই ঘরটা কী ছিল, আর হঠাৎ কী হয়ে গেল!

ননীকাকা, অনুপমের কাকা, প্রায় বছর হলো বাতের রোগে পঙ্গু হয়ে গিয়েছে যে মানুষটা, তাকে দেখেও খুব আশ্চর্য হয়েছে প্রতিভা। খুব বুড়ো হয়েছেন ননীকাকা, দুই ভুরু একেবারে সাদা, চোখেও ঝাপসা দেখেন। সেই প্রথম দিনেই যখন এবাড়িতে এসে খুড়শ্বশুরকে প্রণাম করলো প্রতিভা, সেদিন তিনি প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন—মা'র মুখটি বড় চমৎকার, যেন জ্যোৎস্নায় ভরে রয়েছে। কে জানে, ঝাপসা দেখা ওই চোখে তিনি প্রতিভাকে এত সুন্দর দেখলেন কেমন করে?

প্রতিভার কাজলবোলানো চোখ দুটো কিন্তু বেশ স্পষ্ট করে দেখতে পায়, ননীকাকার ঘরের ভিতরে দুটো চামচিকে উড়ছে। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, তবু একটা এঁটো থালা ঘরের মেজের একদিকে পড়ে রয়েছে। কেন? এবাড়িতে কি এঁটো থালা সরিয়ে নিয়ে যাবার মত একটা চাকরও কাজ করে না?

বাপ নেই, মা নেই, শুধু এক কাকা বেঁচে আছেন, অনুপমের জীবনের এই পরিচয় গুপ্তিপাড়ার বাড়ির কারও অজানা ছিল না। কিন্তু বাড়িটা ছেলের নিজেরই বাড়ি। আইন পড়ছে ছেলে ; পাস করবার পর হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করবে। বাপের কালে অবস্থা বেশ ভালই ছিল ; এখন একরকম চলেই যায়। কি-যেন ভদ্রলোকের নাম, শেফালীদির ভাসুর, যিনি টালিগঞ্জে থাকেন, যিনি এই চন্দ্রবাবুর ভায়রা, তিনিই তো এই বিয়েটাকে ঘটিয়ে ছাড়লেন।

শেফালীদির বাবা নরেনকাকা, যিনি জ্ঞাতিকাকা হয়েও আপন কাকার চেয়ে কিছু কম

আপন নন। নরেনকাকা তাঁর আপন বড়দাকে ডাকেন মেজদা, আর প্রতিভার বাবা পরেশ চৌধুরীকে ডাকেন বড়দা। এ বিয়েতে নরেনকাকার খুব আপত্তি ছিল।

মা কিন্তু বিয়ের আগের দিনেও খুব কেঁদেছিলেন। আর বিয়ের দিনে বাবাও একটা অদ্ভুত কাণ্ড করেছিলেন। পা টিপে টিপে ঘরের ভিতরে ঢুকেই বললেন—আমার ওপর রাগ করিস না পতু। এর চেয়ে ভাল ঘর আর পেলাম না।

সেদিন বাবার হাতটা শক্ত করে ধরে হেসে ফেলতেই হয়েছিল, অথচ বুকের ভিতর থেকে যেন একটা অদ্ভুত ভয়ের কান্না ঠেলে উঠতে চাইছিল।

বয়স তো পঁচিশ পার হয়ে গিয়েছে, লেখাপড়া যা শিখেছে তা প্রায় কিছু না-শেখার কাছাকাছি একটা দশা। একটা হাজার টাকা খরচ করতে পারে এমন বাপের মেয়েও নয়। সে মেয়ের জন্য বড় ঘরের ছেলে পাওয়া যে সম্ভব নয়, এই সামান্য সহজ কথাটা বাবা খুব ভাল করে বুঝেও যেন সহ্য করবার শক্তি পাচ্ছিলেন না। কিন্তু ভাগ্যি ভাল, সেদিন খুব বুদ্ধি করে আর জোর করে হেসে ফেলে বাবাকে হাসিয়ে দিতে পারা গিয়েছিল।

আজ কী ভাবছেন বাবা? জানতে তো কিছু বাকি নেই। পুজোর সপ্তমীর দিনে গুপ্তিপাড়ার বাড়িতে যখন মা'র বিছানার উপর শুয়েছিল প্রতিভা, তখন নিজের কানেই কত স্পষ্ট করে শুনতে হয়েছে শুধু এক শানাই পার্টির জন্যই নরেন শেফালীর বিয়েতে সাতশো টাকা খরচ করেছিল। আর, আমার পতুর বিয়েতে মোট খরচ হয়েছে সাতশো তিরিশ টাকা। কিন্তু আজই শুনলে তো, নরেন কত দুঃখ করে কী সব কথা বলে গেল। শেফালীটা ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করবার টাকা চেয়ে বাপের কাছে চিঠি লিখেছে।

হায় ভগবান, এই কি শেফালীদির মত মেয়ের ভাগ্য! চমকে ওঠে বুকটা। শেফালীদির বর সমরবাবুর যে তিন-তিনটে মস্ত বড় অভ্রের খনি ছিল, দুটো গাড়ি ছিল, আর গিরিডি ছাড়া কলকাতাতেও একটা বাড়ি ছিল। দার্জিলিং-এ একটা বাড়িকে যেন চিরকালের ভাড়া দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন সমরবাবু। গরমের অন্তত তিনটে মাস শেফালীদিকে দার্জিলিংয়েই থাকতে হতো। কারণ, গরম বাড়লেই শেফালীদির মাথার সেই পুরনো জ্বালার কষ্টটা বেড়ে যায় ; ভেজা তোয়ালে দিয়ে মাথা জড়িয়ে রেখেও ছটফট করে আর কেঁদে ফেলে শেফালীদি। সেই শেফালীদি আজকাল নাকি গিরিডির ওই বাড়িতেই বোশেখ মাসের দুপুরেও নিজেই কুয়োর জল তোলে। শুধু ওই বাড়িটাই আছে, আর সব গেছে।

—কিন্তু আমাদের পতুর কাণ্ডটা দেখলে তো, মলিনা। আমি তো আশা করিই নি, কেউই বোধহয় আশা করেনি যে, এক বছরের মধ্যে তোমার মেয়ের ভাগ্যটা এমন সুন্দর একটা ইন্দ্রাণীর ভাগ্য হয়ে যাবে।

বাবা বলছেন, মা শুনেছেন। দু'জনেই খুশি হয়ে হাসছেন, কিন্তু মা আজ আর সেই কথাটা বলছেন না, যে-কথাটা কতবার বলে বলে শেফালীদিকে বুঝিয়েছেন—টাকা-পয়সাতে নয় শেফালী, স্বামীর ভালবাসাতেই মেয়েমানুষ ইন্দ্রাণী হয়।

বালিশে মুখ গুঁজে মুখের হাসিটাকে লুকিয়ে ফেলতে চেষ্টা করে প্রতিভা। মা নিশ্চয়ই জানেন না, জানবেনই বা কেমন করে যে, আজ নয়, সেই সেদিনেই, বিয়ের রাতেই বাসরঘরের বাতির কাছে দাঁড়িয়ে যখন তাঁর মেয়ের স্বামীর হাত দুটো হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে তাঁর মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল, তখনই ইন্দ্রাণী হয়ে গিয়েছিল তাঁর মেয়ে। কত ভাল লেগেছিল একেবারে অচেনা একটা মানুষকে।

বাগবাজারের এই বাড়িতে দুপুর বেলার রোদে উঠোনের এককোণের কলতলার কাছে বসে যে-মেয়ে একটা বছরের আটটা মাস রোজই কাপড় কেচেছে, সে মেয়ে কিন্তু সেদিনও নিজেকে একটা দুর্ভাগ্যের অ-ইন্দ্রাণী বলে মনে করেনি। কেউ না জানুক, অন্তত অনুপম জানে, আর ননীকাকাও জানে, কোন সংসারে প্রথম এসেই কোন নতুন বউ কখনও এভাবে

খাটে না। অন্তত একটা দুটো মাস একটু বেশি সাজে, একটু বেশি হাসে, আর একটু বেশি বসে থাকতে ভালবাসে। কিন্তু গুপ্তিপাড়ার পরেশ চৌধুরীর মেয়ে প্রতিভার প্রাণটা যেন এ-বাড়িতে খাটবার জন্যে তৈরী হয়েই এসেছিল। দু'দিনের মধ্যেই খুড়শ্বশুর ওই ননীকাকার ঘরের চামচিকা তাড়িয়ে, যত কালি-ঝুলি আর ময়লা নিজের হাতেই ধুয়ে-মুছে সরিয়ে, ঘরের চেহারা ফিরিয়ে দিয়েছিল কে?

বাণীদি সেদিন মুখ টিপে হেসে হেসে যে-মেয়েকে গুপ্তিপাড়ার রাজবাড়ির মেয়ে বলে ঠাট্টা করেছিল, সেই মেয়ে।

যে-বাড়িতে কোন মা মাসী খুড়ি জেঠি নেই, একটা বয়স্থা মেয়েও নেই, সে-বাড়িতে নতুন বউ যখন আসবে, তখন বরণডালাটা তুলে ধরবে কে? একটা আলপনা আঁকবার, একটু উলু দেবার জন্যেও তো কাউকে চাই। তাই এসেছিলেন বাণীদি ; অনুপমের মামার মেয়ে, বর্ধমানে থাকেন আর মেয়ে-স্কুলে পড়াবার চাকরি করেন, যাঁর স্বামী দু' বছরেরও বেশি হলো যুদ্ধে চলে গিয়েছেন, মাত্র পাঁচটি দিন এবাড়িতে ছিলেন বাণীদি। কিন্তু বাণীদি থাকাতে নতুন বউয়ের কী যে সুবিধা আর কত যে যত্ন হয়েছিল, তা শুধু ভগবানই জানেন। সারা দিনে পাঁচবার চা খাওয়া বাণীদির অভ্যাস। হ্যাঁ, নতুন বউই পাঁচবার চা তৈরী করে বাণীদির ঘরে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল। বাণীদির সঙ্গে একজন কাজের মানুষও এসেছিল, তাঁর ঝি, কাঞ্চনী। সেই কাঞ্চনীর জন্যেও দিনে তিনবার পান সেজে দিয়েছিল নতুন বউ।

বাণীদি বোধ হয় জানেন না যে, তাঁর সেই ঠাট্টার কথাটা কিন্তু খুব মিথ্যে একটা ঠাট্টা নয়। গুপ্তিপাড়ার পরেশ চৌধুরীর সেই ভয়ানক ফাটলধরা করুণ চেহারার বাড়িটার পিছনদিকের যে বাগানে আজ শুধু কয়েকটা চালতে গাছ আর মরা খেজুর গাছের ধড় দাঁড়িয়ে আছে, তারই নাম রাজার বাগান। সত্যিই, সেই বিখ্যাত জমিদার রাম চৌধুরী, যিনি গঙ্গার জলে বাইচ খেলার আনন্দে প্রতি বছর পাঁচ হাজার টাকা খরচ করতেন, তাঁরই নাতি পরেশ চৌধুরী। রাম চৌধুরীর ছেলে বিজয় চৌধুরী ছিলেন আরও বড় শখের মানুষ। যে-বছরে কোন লাট সাহেব আসামের জঙ্গলে গিয়ে হাতিখেদার আনন্দ নিতেন, সে-বছরে বিজয় চৌধুরীও তাঁর নিজের দল-বল সঙ্গে নিয়ে আসাম যেতেন, আর হাতিখেদার উৎসবে দশটি হাজার টাকা খরচ করে ফিরে আসতেন।

বাণীদি নিশ্চয় এসব গল্পের একটি কথাও কোনদিন শোনেননি। তাই ঠাট্টা করেছেন। কিন্তু সে ঠাট্টার কথা শুনে চোখ ছলছল করবে, এমন পানসে চোখ নয় প্রতিভার। তাই হেসে হেসে বলতেও পারে—আপনি আরও কয়েকটা দিন থাকুন বাণীদি।

বাণীদি হাসেন। তাহলেই হয়েছে। শেষে আমাকে বিনা চিনির চা খেয়ে বিদায় নিতে হবে। সেটা কি ভাল হবে?

নতুন বউয়ের চোখ দুটো সত্যিই ভয়ানক বোকা দুটো চোখের মত অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকে।

বাণীদি বলেন—বুঝলে না?

প্রতিভা—না।

বাণীদি—জিজ্ঞাসা করি, অনুদা কি বিনা পয়সাতে চিনি পেয়ে থাকেন যে, তুমি আমাকে রোজ পাঁচবার মিষ্টি চা খাওয়াবে!

হাসতে চেষ্টা করে প্রতিভা—আপনি কিন্তু আপনার দাদাকেই মিছিমিছি ঠাট্টা করলেন।

কোন কথা বললেন না বাণীদি, শুধু প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বাণীদির সেই চমৎকার কালো চোখের তারা দুটো শুধু একবার কেঁপে উঠলো, আর ভুরু দুটোও একটু কুঁচকে গেল।

এই এক বছরের মধ্যে বাণীদি আর এ-বাড়িতে আসেননি। ভুল ক'রে একটা গল্পের বই

ফেলে রেখে গিয়েছেন ; কিন্তু একবার একটা চিঠি দিয়েও খোঁজ নিলেন না, বইটা আছে কি না। আছে বইটা ; প্রতিভারই ঘরের আলমারির একটা তাকের অনেক বইয়ের মধ্যে বাণীদির সেই বই এখনও আছে।

ননীকাকার ঘরের পাশের ঘরটা সত্যিই বইয়ের ঘর। কত রকমের ভাষার বড় বড় বই। এই বইয়ের ঘরের ধুলো-ময়লা সরিয়ে ঘরটাকে একটা জীবন্ত চেহারা এনে দিয়েছিল যে, সেও তো সেই নতুন বউ, যে-মেয়ে ভাল করে লেখাপড়া করতে কোনদিন চায়ও নি, পারেও নি। পুরো দশটা দিন লেগেছিল ; বইগুলোকে রোদে দিয়ে আর ধুলোঝাড়া করে আবার সেই লম্বা-লম্বা কাঠের তাকের উপরে সাজিয়ে দিয়েছে প্রতিভা। আলমারির ময়লা কাচগুলিকে ঘষে মুছে পরিষ্কার করে দিয়েছে। এখন এই ঘরে আলো জ্বলে উঠলে ননীকাকা তাঁর ঝাপসা-দেখা চোখেই স্পষ্ট দেখতে পান, ঝকঝক করে হাসছে তাঁর সারা জীবনের আদরের সম্পদ এই বইগুলি।

দাদার সঙ্গে হাওড়াতে হঠাৎ একদিন অনুপমের দেখা হতেই অনুপম খুব অনুনয় করে বলেছিল, সময় করে একবার আমার এখানে আসবেন। তাই দাদা একদিন এসেছিলেন। হেসে হেসে অনেক কথা বলেই হঠাৎ বড় গম্ভীর হয়ে গেলেন দাদা। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন, তারপর ব্যস্তভাবে বললেন—কই তোর চা? একটু তাড়াতাড়ি কর।

তিন চুমুকে চা শেষ করে দিয়েই দাদা বললেন—খুব নাম কেনবার চেষ্টা করছিস বুঝি?

যে বোন তার দাদার একটা রুমাল শেলাই করে দিতে কুঁড়েমি করে তিনটে দিন পার করে দিত, সে বোন আজ এই বাড়িতে কত মন লাগিয়ে আর কত ব্যস্ত হয়ে মোটা সূঁচ চালিয়ে ছেঁড়া আসন সেলাই করছে ; দেখতে পেয়ে দাদার মনে ওরকম একটা সন্দেহ হবেই বা না কেন?

হাসতে চেষ্টা করছেন দাদা। যেন মনের সন্দেহটাকে জোর করে হাসিয়ে রাখতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু কপালের একটা রগ ফুলেও উঠছে। ওটা হলো দাদার কড়া মেজাজের সেই ভয়ানক রাগের রগ। শেফালীদির বাবা নরেনকাকা বলেন, ওটা হলো গুপ্তিপাড়ার এই চৌধুরীদের বংশধারার একটা মেজাজের রগ।

লিলুয়ার রেল-কারখানার সাহেবটার মুখের উপর ঘুষি চালাবার আগে দাদার কপালের ওই রগটা ঠিক ওইরকম করে ফুলে উঠেছিল। সাহেবটা দাদাকে খুব বিশ্রী একটা কথা বলেছিল—ইউ ড্যাম চীট, ফাকিবাজ ; ডিউটিসে ভাগ্‌তা হ্যায়, আওর ছোকরি লে কর ঘুমতা হ্যায়?

ঠিকই, সেদিন কাজে যাননি দাদা। চল্‌ পতু, বালীতে জনা পিসিমা'কে একবার দেখে নিয়ে তারপর বেলুড়ের মন্দির দেখে আসি। তাই তো, ঠিক বালী স্টেশনেই সাহেবটার সঙ্গে দাদার একেবারে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। দাদারই উপরওয়ালা এক ফোরম্যান সাহেব।

দাদা কিন্তু পরের দিন অফিসে গিয়েও কোন কৈফিয়ৎ দিতে রাজি হননি, মাপ চাওয়া দূরে থাক। চাকরি গেল দাদার, তিন বছরের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের নব্বই টাকা, আর এক মাসের মাইনের পঞ্চাশ টাকা, সবই কেড়ে রেখে দিল—বড়সাহেবের হুকুম। বাড়িতে এসে হাঁপ ছাড়লেন আর হেসে ফেললেন দাদা—দেখলি তো, আমার একটা ঘুষির দাম কত? এক'শো চল্লিশ টাকা।

বাবাও হেসে ফেললেন—ইংরেজের রাজত্বে ইংরেজের মুখের উপর এত চমৎকার একটা দেশী ঘুষি ; দামটা কম কেন হবে?

কিন্তু বোনের বাড়িতে এসে দাদার রগ আবার রাগ করে ফুলে ওঠে কেন? কে জানে কেন! দাদার চোখ দেখে তো কিছুই বুঝতে পারা যায় না। সিগারেটে জোরে একটা টান দিয়েই আর গলার স্বর বেশ গম্ভীর করে কথা বললেন দাদা—তোর হাতের আঙুলে অত বড়

একটা কাটা দাগ কেন রে? বঁটিতে আঙুল কেটেছিস? মনে হচ্ছে, দু'হাতে ঝাঁটা চালিয়ে উঠোন-টুঠোনও ধুচ্ছিস।...আচ্ছা, আমি এখন চলি।

বোনের ভাগ্যের কথা ভেবে দাদার কপালে সেই কড়া মেজাজের রগ আজ আর নিশ্চয় ফুলে ওঠে না ; লজ্জা পেয়ে শান্ত হয়ে গিয়েছে। আজ তো দাদা জানেন যে, এ বাড়িতে এখন ঝি-চাকর-রাঁধুনী নিয়ে মোট চারটে কাজের লোক খাটছে। দাদার সেই বোন আজকাল প্রায় রোজই টবের জাপানী হানার কাছে দাঁড়িয়ে এই এক বছরের জীবনের যত আশ্চর্যের কথা ভেবে ভেবে পুরো একটি ঘণ্টার সময় পার করে দেয়।

কিন্তু দাদাকে বোধ হয় বোঝাতে পারা যাবে না যে, দাদার বোন আজ এ বাড়ির এই মোজেয়িকের বারান্দাতে দাঁড়িয়ে যেমন সুখী ; সেদিন এ বাড়ির সেই অভাবের উঠানে দাঁড়িয়েও এর চেয়ে এমন কিছু কম সুখী ছিল না। হ্যাঁ, একটা কথা ভাবতে খুবই ভাল লাগে যে, তোমাদের মনে আর সেই সন্দেহ ও দুশ্চিন্তার কষ্ট নেই যে, পতু বোধ হয় মনের দুঃখ মনেই চেপে রাখে আর জোর করে হাসে। দাদার কাছে মুখ খুলে বলা যায় না, তাই সেদিন বলা সম্ভব হয়নি যে, একজনকে মনে-প্রাণে ভাল লেগে গেলে, তার কোন অভাবকেও আর অভাব লাগে না।

তবে বউদির কাছে মন খুলে বলে দিতে পারা যায় ; সত্যি বউদি আজকাল ভদ্রলোকের হাতের কাছে যখন ডিশ ভরতি করে মাছের ফ্রাই তুলে দিই, তখন মনটা যেন নতুন একটা শান্তিতে ভরে যায়। এতদিন তো শুধু পেঁয়াজ ভাজা দিয়ে আটার দুটো রুটি খেত আর কাজের চেষ্টায় বের হয়ে যেত। দেখতে সত্যি খুব কষ্ট হতো, বউদি।

মার কাছে লেখা আমার চিঠি থেকে তুমিও নিশ্চয় জেনেছো বউদি ; আমার অনেক নতুন জিনিস হয়েছে। তার মধ্যে একটা জড়োয়া সেটও আছে। খাঁটি মুক্তোর কাজ করা জিনিস। কত খুশি হয়ে কিনে এনেছেন ভদ্রলোক। আমিও খুশি হয়েছি। আশাও করিনি, চাইওনি, তবু পেয়েছি। এত খুশি হয়েছিলাম' যে হাসতে গিয়ে চোখ দুটো জলে ভরে গিয়েছিল।

ফুটলি কেন আপন মনে! না, আর গুন গুন করে গান করবার সময় নেই। জাপানী হানার গায়ে হাত বুলিয়ে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। বারান্দার ওদিকের ওই সিংহ-আয়নার মাথার কাছে দেয়ালের ঘড়িতে স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ছ'টা বেজে গিয়েছে।

তবে তো একটু ভুল হয়েই গিয়েছে। ননীকাকা যে ঠিক ছটার সময় এক গেলাস বার্লি খান। সুধার মা'র কি সময়জ্ঞান আছে? ননীকাকার ঘরে বার্লি পৌঁছে দিয়ে এসেছে তো? একবার দেখে আসতে হয়।

কিন্তু ঘরের দরজায় কপাটে টোকা দিয়ে চলে গেলেন যে ভদ্রলোক, তিনি এখন বাড়িতে আছেন তো? না, চন্দ্র-সূর্যের সাথী হয়ে বাইরের কাজের আকাশে পাড়ি দিয়েছেন?

এগিয়ে যেতে গিয়েই থমকে দাঁড়ায় প্রতিভা। হেসে ফেলে, চিরুনিটা হাতেই রয়ে গিয়েছে। চোর ধরা দিল না, চোরের মাথায় চিরুনিটা দিয়ে জোরে একটা টোকা দেবার সুযোগও পাওয়া গেল না।

ঘরে ঢুকে চিরুনিটাকে আয়নার টেবিলে রেখে দিতে গিয়েই বুঝতে পারে প্রতিভা, পাখির বাসার মত ওরকম একটা উসকো-খুসকো মাথা নিয়ে রান্নাঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই রাগ করে কথা বলবে সুধার মা। শুনতে বেশ ভাল লাগে, ঠিক মা'র মত রাগ করে ধমক দেয় সুধার মা—দেখে মনে হয়, যেন ঝড় গিলে খেয়েছো, তা না হলে মাথাটার অমন ছিরি হবে কেন?

কিন্তু শুধু সুধার মা'র কথার ভয়ে নয়, আর-একজনের দুই চোখের একটা আশার ভয়েও একটু সাবধান থাকতেই হয়। কী ভাববেন ভদ্রলোক, যদি দেখতে পান, এত সুন্দর করে

সাজানো ঘরের মধ্যে একটা উসকো-খুসকো মাথা ঘুরে বেড়াচ্ছে? দুপুরবেলার পরা শাড়িটা এখনও পরেই আছে। ময়লা নয়, কিন্তু কুঁচকে গিয়েছে তো! যখন-তখন বিছানায় গড়াগড়ি দিলে কোন্ শাড়ি না কুঁচকে যায়?

সাজলে একটু ভাল দেখায়। তবু সাজবে না ; অভিযোগের ভাষাটা যেন গুপ্তিপাড়ার বাড়ি থেকে বাগবাজারের এই বাড়িতেও, ওই সুধার মা'র মুখে এসে ঠাঁই নিয়েছে। বউদি বলেন, তোমার মত মেয়েকে সাজতে হলে কি ঢাকাই-বেনারসী দরকার হয়? না, হীরের দুল দোলাতে হয়? না, লিপস্টিক দরকার হয়? তবু বলছি, খোঁপাটাকে একটু ভাল করে বাঁধ। ওতেই হবে, আর বেশি কিছু দরকার হবে না।

তবে অন্তত খোঁপাটাকেই একটু ভাল করে বাঁধা যাক। চিরুনিটাকে হাতে তুলে নেয় প্রতিভা।

ঘরের দরজার কপাটের উপর টোকা পড়ে। টক্ টক্ টক্।

চমকে ওঠে, কিন্তু হেসেও ফেলে প্রতিভা। বার বার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান! না, আর নয়। আর বোকার মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়। হাতে হাতে ধরে ফেলাই উচিত।

পা টিপে টিপে দরজার কাছে এগিয়ে এসেই দু'হাতের টানে ভেজানো কপাট দুটোকে খুলে দিয়েই হেসে ওঠে প্রতিভা—গুড ইভিনিং স্যার!

হাসির শব্দটা কিন্তু সেই মুহূর্তে ভয় পেয়ে চাপা আর্তনাদের মত গুমরে ওঠে।—এ কি? আপনি এখানে কেন?

—অনেকক্ষণ আপনার অপেক্ষায় বসে বসে, তার পর যখন দেখলাম যে আপনি এলেনই না, তখন মনে করিয়ে দিতে এলাম যে...।

প্রতিভা—আপনি কি কিছুক্ষণ আগেও একবার এখানে এসেছিলেন?

—কিছুক্ষণ আগে নয়। প্রায় আধ ঘণ্টা আগে। আপনি কোন সাড়া দিলেন না দেখে চলে গেলাম।

—কিন্তু আপনি এখানে এলেন কেন? প্রতিভার শান্ত চোখের দুই কালো তারা যেন জ্বলে জ্বলে কাঁপতে থাকে।

—না এসে উপায় কি?

প্রতিভা—খুব উপায় ছিল। আপনি রামপ্রসাদকে বললেই তো সে আমাকে খবর দিত যে, আপনি এসে বসে আছেন।

—রামপ্রসাদকে তো অনেক সময় ডেকেও পাওয়া যায় না।

প্রতিভা—বেশ তো, তাই বলে আপনার এখানে এসে খবর দেবার দরকার হয় না।

—তাহলে বলুন...।

প্রতিভা—না, আমি কিছু বলতে পারবো না। আপনি আপনার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবেন।

—আপনার শরীরটা আজ ভাল নয় মনে হচ্ছে।

প্রতিভা—না, খুব ভাল আছি।

—মন ভাল নয় বোধ হয়।

প্রতিভা—আপনি এখন তাহলে...।

—হ্যাঁ, যাচ্ছি। টবের এই ফুল বোধহয় জাপানী ফুল। নয় কি?

প্রতিভা—আপনি যান।

—লোকে জাপানী মেয়ের খোঁপারও কেন যে এত প্রশংসা করে, বুঝি না। জাপানী খোঁপার মধ্যে একটুও আর্ট নেই ; আছে শুধু কারিগরী। ভয়ানক চেষ্টা করা আর বাঁধা-ছাঁদা একটা কায়দার ধাঁধা। বরং বলতে হয়, এই জাপানী ফুলই হলো সত্যিকারের আর্ট। কী

চমৎকার একগাদা উসকো-খুসকো শুঁয়ো পাঁপড়িগুলো এলোমেলো আর রং যেন একটা খেয়ালের রং। কেই যেন হঠাৎ খুশি হয়ে টোকা দিয়ে দিয়ে নানা রকম রঙের ধুলো এই ফুলের গায়ে ছিটিয়ে দিয়েছে।

প্রতিভা—আপনি কিন্তু...।

—না না, আজকাল আমি আর ছবি-টবি আঁকি না।

প্রতিভা—আপনি মিছিমিছি এখানে এসে এত কথা বলছেন কেন? নীচে যান। আপনার বন্ধুর সঙ্গে যত ইচ্ছে কথা বলুন।

—বন্ধু তো বাড়িতে নেই।

প্রতিভা—তাহলে আপনিও বাড়ি যান।

—আমার অবিশ্যি আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে অসুবিধে নেই।

প্রতিভা—অপেক্ষা করতে হয় নীচের ঘরে গিয়ে করুন।

—উপরতলার এই বারান্দাটা কিন্তু নীচের ঘরগুলোর চেয়ে অনেক ভাল। যেমন খোলা হাওয়া তেমনই, হ্যাঁ, সত্যি তো, খুব ফিকে একটা মিষ্টি গন্ধ যেন ফুরফুর করে উড়ছে। এটা কি...।

প্রতিভা—আপনি শিগগির চলে যান।

—এটা কি টবের কোন ফুলের গন্ধ? না, আপনার ঘরের ভিতরের একটা ধূপের গন্ধ?

প্রতিভা—আপনি এত বাজে কথা বলছেন কেন?

—অ্যাঁ? তা হলে কি আপনার এই খোঁপারই গন্ধ?

ফুলবনে সাপ। ভীরু পাখীর চোখ যেন একটা লিকলিকে ঘৃণ্য বিভীষিকার দিকে তাকায় আর ছটফট করে। ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছটফট করে প্রতিভা ; তার পরেই ছুটে গিয়ে বারান্দার রেলিংয়ের উপর যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। চেঁচিয়ে ওঠে—রামপ্রসাদ।

—রামপ্রসাদ বাড়িতে নেই বোধহয়। কোন কাজের দরকার থাকলে আমাকেই বলুন।

—আপনি নীচে যান।

—যাচ্ছি, কিন্তু আপনি কি আমাকে এখন কিছু টাকা দিতে পারবেন?

প্রতিভা—টাকা? কেন?

—অনুপমের সঙ্গে তো দেখা হওয়া আর দুটো কথা বলা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। রোজই অপেক্ষায় বসে থাকি আর চলে যাই। এই তিন মাসের মধ্যে কোনদিন বলবার সুযোগ পেলাম না যে, আমার এখন কিছু টাকা দরকার।

প্রতিভা—কিসের জন্য টাকা চান আপনি?

—সেটা কি আপনি জানেন না?

প্রতিভা—আপনার বন্ধু বলেছিল, আপনি নাকি আমাকে পড়াবেন। কিন্তু আমি তো কবেই স্পষ্ট করে বলে দিয়েছি যে, আমি পড়বো না। আপনার বন্ধু কি সে-কথা আপনাকে বলেনি!

—না।

প্রতিভা—তবু সেটা বুঝে নিতে আপনার কোন অসুবিধে ছিল না।

—হ্যাঁ, বুঝতে অসুবিধে নেই। বুঝেছি। দেখলামই তো, এই তিন মাসের মধ্যে কোনদিনও আপনি পড়তে এলেন না।

প্রতিভা—তবু রোজই আসছেন কেন?

—আপনিও তো সেদিন তখন ওঘরে ছিলেন। আপনার সামনেই সব কথা হলো। মনে নেই আপনার?

প্রতিভা—মনে আছে।

—মনে নেই বোধহয়।

প্রতিভা—সব মনে আছে। আপনার বন্ধু বললে, আমি পড়ি বা না পড়ি, আপনাকে কিছু টাকা দেওয়া হবে।

—অনুপম বলেছিল, আমাকে রোজই আসতে হবে। আপনার যেদিন ইচ্ছে হবে, পড়বেন। যেদিন ইচ্ছে হবে না, পড়বেন না।

প্রতিভা—বেশ তো, উনি না হয় এই কথাই বলেছিলেন ; একই কথা।

—আসল কথা হলো, অনুপম আমাকে সাহায্য করতে চায়। আপনি তো জানেন, অনুপম আমার অনেককালের বন্ধু।

প্রতিভা—জানি।

—আমি কিন্তু কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিনি যে, জীবনে কোনদিন অনুপমের কাছে সাহায্য নেবার সৌভাগ্য আমার হবে।

প্রতিভা—সৌভাগ্য? ঠাট্টা করে বলছেন?

—ছি ছি ; ঠাট্টা করবো কেন? আমি কাউকেই ঠাট্টা করি না, অনুপমকে তো নয়ই। আমাদের সেই অনুপম আজ আমাকে সাহায্য করবার মত অবস্থা পেয়েছে, এটা আমার সৌভাগ্য বইকি। তবু ; কথাটা কি জানেন? উপায় থাকলে অনুপমের কাছ থেকে সাহায্য চাইতাম না!, নিতামও না। অনুপমকে বিরক্ত করতে আমার সত্যিই বেশ খারাপ লাগে, বেশ কষ্ট হয়।

প্রতিভা—মনে হচ্ছে, আপনি আজ বেশিরকম কোন দরকারে পড়ে...।

—হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। শুনেছেনই তো, কী সাংঘাতিক ফেমিন দেখা দিয়েছে।

প্রতিভা—দুর্ভিক্ষ?

—হ্যাঁ, দুর্ভিক্ষ।

প্রতিভা—কোথায় দুর্ভিক্ষ?

—বাংলা দেশের প্রায় সব জায়গাতেই, এই কলকাতাতেও। লোক মরছে। ছেলে-মেয়ে বাচ্চা-কাচ্চা বুড়ো-বুড়ি, গাঁয়ের মানুষ কলকাতায় ছুটে আসছে। এলে হবে কি? এখানেও যে হাজার হাজার ঘরে উপোষ আর আধপেটা খাওয়া। কে কাকে খাওয়াবে? এর ওপর যদি কোন ভাগ্যিবানের ঘরে একটা অদ্ভুত অসুখের মানুষ আধমরা হয়ে মেজের উপর শুয়ে পড়ে থাকে, তবে তাকে আর কে বাঁচাতে পারে, বলুন?

প্রতিভা—ভগবান বাঁচাবেন। কিন্তু আপনি একটু স্পষ্ট করে বলুন, আপনি কার কথা বলছেন?

—আমার স্ত্রীর কথাই বলছি।

প্রতিভা—কিসের অসুখ?

—বুঝি না।

—ডাক্তার দেখাননি?

—একবার দেখিয়েছিলাম।

—ডাক্তার কি বললেন?

—সন্দেহ করলেন, গলার ভিতরে ঘা হয়েছে।

—চিকিৎসা ঠিক চলছে!

—ঠিক চলবে কি করে? একগাদা টাকা ছাড়া তো চিকিৎসা চলে না।

—টাকার জন্যে আপনি আপনার বন্ধুকে একটু ভাল করে বলুন।

—বলবো, কিন্তু আজই যে, অন্তত পঞ্চাশটা টাকা না হলে আমার কোন কিছুই চলবে না। আপনিই দিন। অনুপম আমাকে যে-টাকা দেবে, তা থেকে যেন এই পঞ্চাশ টাকা কেটে রাখে।

প্রতিভা—আমার কাছে তো টাকা থাকে না।

—তাহলে...সত্যিই যে একটা অদ্ভুত অবস্থায় পড়তে হলো।

প্রতিভা—আপনি অন্য কোথাও গিয়ে চেষ্টা করে দেখুন।

—অগত্যা তাই করতে হবে। কিন্তু তাতে কিছু হবে বলে মনে হয় না।

প্রতিভা—তাহলে আপনার বন্ধুর জন্যে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন।

—কিন্তু আর বেশি অপেক্ষা করা উচিত হবে না।

প্রতিভা—একথা কেন বলছেন?

—আজ বিকেল থেকেই মানুষটার অবস্থা বেশ সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। কথা বলতে পারছে না। এখন একজন ভাল ডাক্তারকে না ডাকলে খুব ভুল করা হবে।

প্রতিভা—তবে তো আপনার আর এখানে কারও অপেক্ষায় থেকে সময় নষ্ট করা একটুও উচিত নয়।

—একটুও উচিত নয়। আমার আর একটা মিনিটও অপেক্ষা করতে ইচ্ছে করছে না। তাই বলছি; আপনিই বরং চেষ্টা করে কারও কাছ থেকে পঞ্চাশটা টাকা যোগাড় করে আমাকে দিন। আমাকে ধার দিন। এই টাকা আমি নিশ্চয় একদিন আপনাকে ফেরত দেব, যদিও তাতে ঋণ শোধ করা হবে না।

প্রতিভা—আপনি আমাকে খুব বিপদে ফেললেন।

—একবার দেখুন চেষ্টা করে।

প্রতিভা—দেখি। আপনি ততক্ষণ নীচের তলার ঘরে গিয়ে বসুন।

—কাইগুলি একটু তাড়াতাড়ি করবেন।

না, আর দেরি করে না প্রতিভা। শুধু একটা মিনিট, চুপ করে সেই মোজেয়িকের বারান্দার উপরে সেখানেই দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে, সিংহ-আয়নার চকচকে বুকের উপরে কার্পেটপাতা একটা চমৎকার সিঁড়ির ধাপ ধরে একজোড়া রোগা-রোগা পা একজোড়া ছেঁড়া-ময়লা চটিজুতোর সঙ্গে ব্যস্তভাবে নেমে চলে গেল। তারপর প্রতিভার ভাবতে শুধু আরও একটা মিনিট, তার বেশি নয়।

ঘরের ভিতরে ঢুকে একটা বাক্স খোলে প্রতিভা। রেশমী সুতোর লেস দিয়ে ঢাকা ছোট একটা রঙীন স্টীল-ট্রাঙ্ক। ট্রাঙ্কের ভিতরে তিন-থাক শাড়ির সাজানো স্তূপের তলায় হাত চালিয়ে মোষের শিঙের একটা কৌটা বের করে। বিয়ের সময় পাওয়া যত আশীর্বাদীর টাকা, মোট একচল্লিশ টাকা যে এই কৌটার ভিতরে এখনও আছে, সে-কথা মনে পড়তে ওই এক মিনিটই সময় লেগেছে, তার বেশি নয়।

ও কে? কে এল? ভালই হলো। না ডাকতেই সুধার মা এসে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে। কৌটার ভিতরে একটি টাকা রেখে দিয়েই সুধার মা'র মুখের দিকে তাকায় প্রতিভা।

সুধার মা—ওবেলার দুধ সবই তো পড়ে রয়েছে। আমি বলি, ক্ষীর করে রাখি। নইলে নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি কি বল?

প্রতিভা—বলছি। তার আগে তুমি এখুনি নীচে গিয়ে মাস্টার মশাই অজয়বাবুকে এই চল্লিশটা টাকা দিয়ে চলে এস।

ননীকাকা তাঁর বইয়ের ঘরে একটা চেয়ারে বসে টেবিলের উপরে রাখা একটি খোলা বইয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন।

যুদ্ধের ভয়ে ভীরু কলকাতার একটি নিষ্প্রদীপ রাত। ঘরের ভিতরের আলোটাও যেন একটা মিটমিটে ভীরু তারা। ননীকাকার ঝাপসা-দেখা যে দুই চোখ দিনের বেলার রোদের

আলোটাকেও ভাল করে দেখতে পায় না, দিনটাকে একটা মেঘলা দিন বলে ভুল করে, সেই দুই চোখ কত বড়-বড় হয়ে একটা বইয়ের লেখা পড়বার চেষ্টা করছে।

প্রতিভা ডাক দেয়।—বার্লি খেয়েছেন, কাকা?

—খেয়েছি। কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ, কেন প্রাণঃ প্রথম প্রৈতি যুক্তঃ।

—আপনি তো বেশ পড়তে পারছেন, কাকা। একটুও অসুবিধে হচ্ছে না।

—তাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু তুমি একটু দেখে নিয়ে বলে দাও তো, বউমা ; ঠিক বইটা ধরেছি কিনা।

এগিয়ে আসে প্রতিভা। বইটার দিকে তাকায়।—এটা একটা ইংরেজী বই।

—অ্যাঁ? ইংরেজী বই।

—আপনি তবে কী মনে করেছেন?

—আমি মনে করেছি, কেনোপনিষদ।

হেসে ফেলেন ননীকাকা। হাত তুলে চোখ দুটোকে একবার ঘষে নিয়ে যেন একটু লজ্জা-পাওয়া কুণ্ঠিত স্বরে কথা বলেন—ভুল করেছি। আন্দাজটা ভুল করেছে। বইয়ের মলাটের উপর হাত বুলিয়ে কতটুকুই বা বুঝবো, বল? মলাটের মাঝখানে পোকা-খাওয়া একটা গর্ত, তাই মনে হয়েছিল, ওটাই বুঝি কেনোপনিষদ। যাই হোক, ইংরেজী বইটার নামটা কী, বউমা?

বইটার দিকে তাকিয়ে পড়তে চেষ্টা করে প্রতিভা। কিন্তু সারা মুখ যেন একটা করুণ লজ্জায় ভরে গিয়ে লালচে হয়ে যায়। আঁচল দিয়ে মুখ মোছে প্রতিভা।—বুঝতে পারছি না।

—লেখকের নামটা বল।

—বুঝতে পারছি না।

—কী লেখা আছে পড়। অক্ষরগুলি এক এক করে পড়ে যাও।

—এফ আই সি এইচ টি ই।

—ফিক্‌টে। তাই বল। ওটা জার্মান ভাষার বই। ও বই আর পাওয়া যায় না, বউমা। ভাগ্যি ভাল, খুব বুদ্ধি করে, সেই কবে, প্রথম যুদ্ধের ঠিক এক বছর আগে জার্মানী থেকে বইটা আনিয়েছিলাম। কিন্তু বেচারা ফিক্‌টেকেও তাহলে পোকাতে কেটেছে।

প্রতিভার মুখের কথাগুলি আরও করুণ হয়ে বিড়বিড় করে।—বোধহয় অনেক দিন ধরে বইগুলি অযত্নে পড়েছিল। তা না হলে পোকাতে কাটতো না।

—খুব সত্যি কথা।

—আপনার চোখ ভাল থাকলে বইগুলির এত অযত্ন হতে পারতো না।

—খুব সত্যি কথা। কিন্তু একটা খুব মজার কথা কি জান? বইগুলির যেদিন একটা ভয়ানক রকমের অযত্ন হয়ে গেল, ঠিক সেদিনই আমার চোখের দৃষ্টিও হঠাৎ বেশ একটু ঝাপ্‌সা হয়ে গেল। ডাক্তার বললেন, ছানি পড়ছে। কিন্তু, বুঝতে পারি না, ঠিক সেদিন থেকেই ছানি পড়তে শুরু করলো কেন?

—বইগুলোর হঠাৎ একটা ভয়ানক রকমের অযত্ন হয়ে গেল কেন?

—সে আজ প্রায় পঁচিশ বছর আগের কথা। আমার এইসব বই এই বাড়ির ওই বারান্দাকেত একটা ঢিবি হয়ে প্রায় এক মাস ধরে পড়েছিল। একদিন বাইরে থেকে ঘুরে এসে দেখি, বৃষ্টির জলে সব বই ভিজে গিয়েছে।

—কী অদ্ভুত কথা বলছেন!

—হ্যাঁ, তখন এই বাড়ির কোন ঘরে জায়গা ছিল না।

—কেন?

—নীচের তলার সব ঘর কারবারের যত জিনিসপত্রে ভরতি ছিল।

—কিসের কারবার?

—মেজদার, তোমার শ্বশুরের একটা চমৎকার ওষুধের কারবার। সে কারবারের সঙ্গে বড়দাও ছিলেন। নীচের তলার এইসব ঘর গাদা গাদা টিনের কৌটা আর শিশি-বোতলে ভরে ছিল। আর ছিল সরষের তেলের বড় বড় পিপে। বোধহয় কলতলার কাছে এখনও নাম-লেখা একটা কাঠের বোর্ড পড়ে আছে।

—হ্যাঁ, দেখেছি ভয়ানক একটা নাম, আত্রেয় বাত-কালান্তক। কী ওটা?

—ওটাই তো বড়দা আর মেজদার কারবারের সেই ওষুধের নাম। এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর কাছ থেকে ওই ওষুধের কথা জানতে পেরেছিলেন মেজদা। আর বড়দা জানতে পেরেছিলেন, ওই সন্ন্যাসী হিমালয়ের একটা গুহাতে থাকেন ; গুহাটা হলো সেই অত্রিমুনির গুহা। কারবার খুব ভালই চলেছিল। বর্মা চীন আফ্রিকা থেকেও অর্ডার আসতো। কাজেই আমার বইগুলোকে জায়গা দিতে মেজদার যেমন খুব অসুবিধে হয়েছিল, তেমনই আমারও খুব অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। কিন্তু দোষটা আসলে আমারই ; কোন খবর-টবর না দিয়ে হঠাৎ বস্তাবন্দী করা একগাদা বই দুটো ঘোড়ার গাড়িতে চাপিয়ে কারও বাড়িতে এসে দাঁড়ালে, তাকে খুবই অসুবিধেয় ফেলা হয় না কি?

—বুঝলাম না, কাকা।

—আমি কানপুরের স্কুলে মাস্টারী করতাম। একটানা পঁচিশটা বছর মাস্টারী করেছি। সে পঁচিশ বছরের মধ্যে কোনদিনও কলকাতায় আসিনি। শুধু চিঠিতে জেনেছি, কলকাতার বাড়ির সবাই একরকম ভালই আছে। হঠাৎ একদিন মনে হলো, এবার বাড়ি ফিরে যাই।

—কাকিমা তখন...।

—না না, তোমার কাকিমা তখন কোথায়? সে মহিলা তো সেই কবেই, বিয়ের পর ছ'টা মাস পার না হতেই ছুটি নিয়ে সরে পড়েছিলেন। শুধু একা আমি, আর আমার এই বইগুলি। কানপুরের জীবনটা ভালই কেটেছিল।

—এবাড়িতে তখন...।

—এবাড়িতে তখন সবাই ছিলেন। বড়দা আর বড় বউঠান ছিলেন। তোমার শ্বশুর ছিলেন, শাশুড়ী ছিলেন, আর অনুও তখন...হ্যাঁ, আমি যেদিন এখানে এলাম, অনুর বয়স তখন আট-দশ বছর তো হবেই।

—যাকে বলে, বেশ জমাট সংসার।

ননীকাকা হাসতে থাকেন—নিশ্চয়,. কিন্তু আমি যেমন হঠাৎ একদিন বোকার মত এখানে এসে উঠেছিলাম, তেমনই হঠাৎ একদিন বোকার মত চলেও যাচ্ছিলাম।

ননীকাকার চোখ দুটো চিকচিক করে। মনে হয়, কান পেতে কি যেন শুনতে চেষ্টা করছেন।—কিসের শব্দ, বউমা? গঙ্গার জলের শব্দ বলে মনে হচ্ছে।

প্রতিভা—হ্যাঁ।

ননীকাকা—ঘরের সব জানালা বোধহয় খোলা।

প্রতিভা—হ্যাঁ। কিন্তু আপনি শেষে...।

ননীকাকা—কিন্তু চলে যাওয়া আর হলো না, বউমা। দুটো ঘোড়ার গাড়ি ডেকেছিলাম। দু' তিন বস্তাবন্দী বই গাড়িতে তুলেও ফেলেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ উপরতলা থেকে নীচে নেমে এলেন মেজ বউঠান, তোমার শাশুড়ী। মেজ বউঠানের চোখে সে কী রাগ। বললেন—আপনি চলে যাচ্ছেন কেন? কে আপনাকে যেতে বলেছে? আপনি যেতে পারবেন না। কখ্‌খনো না।

আবার হেসে ফেললে ননীকাকা।—আমাকে ঠিক এই ভাষাতে ধমকে দিয়ে চলে গেলেন মেজ বউঠান। আমিও চুপ করে এই ঘরেই বসে সেদিন ঠিক এই রকম গঙ্গাজলের শব্দ শুনেছিলাম। মনে হয়েছিল, গঙ্গাজলের শব্দটাই যেন আমাকে ধমকে দিয়ে চলে

গেল।...অরেল স্টাইনের লেখা ছোট্ট একটা বই আছে, গ্লেসিয়ার গঙ্গোত্রী। আজ নয় ; কাল সকালে এসে বইটাকে একবার খুঁজে বের করে দিও তো।

প্রতিভার চোখে-মুখে আবার সেই করুণ লজ্জার লালচে আভা চমকে ওঠে।—আমি কিন্তু...আমি শুধু চেষ্টা করবো কাকা। কিন্তু খুঁজে পাব কিনা, জানি না।

ননীকাকা—তুমি বোধহয় ভবতোষবাবুর নাম শোননি। এবাড়ির এই পাশের বাড়িটাই তাঁর বাড়ি। তিনি এখন আর নেই। তিনি মেজদার ওপর কেমন-যেন বেশ-একটু অসন্তুষ্ট ছিলেন। তবু তিনিও এই বাড়ির কত প্রশংসা করতেন। বলতেন, চমৎকার হাওয়া মহল।

প্রতিভা—কেন?

ননীকাকা—দেখছো তো, এবাড়িতে কত জানালা আর কত হাওয়া। গঙ্গাজলের শব্দ কত স্পষ্ট শোনা যায়। ওই শুধু এক বাত-কালান্তকের পাঁচ বছরের রোজগারে কত খুশী হয়ে বড়দা আর মেজদা এই বাড়ি তৈরী করিয়েছিলেন। কিন্তু, কী আশ্চর্য। আমার এসিব বইয়ের মধ্যে কিন্তু একটা অদ্ভুত বই আছে, বউমা। নাগরী লিপিতে প্রথম ছাপা ঋগ্বেদ ও তার সায়নভাষ্য, ম্যাক্সমূলারের কীর্তি। প্রতাপগড়ের রাজাবাহাদুর আমাকে ওই বই উপহার দিয়েছেন। বড় দুর্লভ বই। হাজার টাকা হাতে নিয়ে ছুটোছুটি করলেও ওই বই আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

প্রতিভা—আপনার কি তবে এবাড়ির জন্যে...।

ননীকাকা—না না না। আমাকে এবাড়ির একটা ইঁটেরও দাম দিতে হয়নি। মামলাতে সাক্ষী দিতে গিয়ে কথাটাকে একেবারে স্পষ্ট করে আর চেঁচিয়ে বলে দিয়েছিলাম। শুনে কত খুশী হয়েছিলেন মেজদা।

চমকে ওঠে প্রতিভা—মামলা?

ননীকাকা—হ্যাঁ, বউমা। বড়দা আর মেজদার মামলা। মাধব রায় ভার্সাস যাদব রায়। এই বাড়ির মালিকানা নিয়ে আর ওই চমৎকার আত্রেয় বাত-কালান্তকের স্বত্ব নিয়ে মামলা। ভবতোষবাবু বলেছিলেন, হাওয়া মহলের মাধব রায় একটি খুব বিচক্ষণ মানুষ, যাদব রায় একটি খুব বুদ্ধিমান মানুষ, আর ননী রায় একটি গরু, মানুষই নয়।

ননীকাকা হো হো করে হাসেন, কিন্তু প্রতিভার চোখে যেন একটা আষাঢ়ে গল্পের করুণ আশ্চর্য থমথম করে।

হাসি থামাতে চেষ্টা করেন ননীকাকা—কেন প্রাণঃ প্রথম প্রৈতি যুক্ত? কেউ বলতে পারে না, বউমা। বলতে পারেও নি। সবাই শুধু অনুমান করেছে। আমিও তো কত চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না।

প্রতিভার মনের করুণ বিস্ময়টাও যেন জোর করে হাসতে চেষ্টা করে।—এত চমৎকার বাত-কালান্তকের শেষে এমন দশা হলো কেন?

ননীকাকা—কি করে বলি, বউমা? লোকে বলে, ওষুধের কারবারটা খুব জমে উঠতেই দুই ভাইয়ের মধ্যে মামলা বেধে গেল। আমি মনে করি, ওই চমৎকার ওষুধের কারবারটা ডুববে বলেই ভাইয়ে ভাইয়ে মামলা বেধেছিল। জ্ঞান বল আর বুদ্ধি বল, কোনটাই তো বড়রকমের কোন জোর নয়। আসল জোর হলো, ওই প্রথম প্রাণ। শাঙ্করভাষ্যে যা-ই বলুক, আমি মনে করি, প্রথম প্রাণ মানে ভালবাসা, হৃদয়ের কাজ। জগতের সব চেয়ে বড় বিস্ময়। এ বিস্ময়ের কাছে অসীম আকাশটাও কোন বিস্ময় নয়। কিন্তু তুমি যদি জিজ্ঞেস কর, কেন এই বিস্ময়? এর কারণ কি? তা হলে, মাপ করো, বউমা। আমি কিছুই বলতে পারবো না।

কথা বলতে গিয়ে প্রতিভার গলার স্বর কাঁপতে থাকে।—আমি কিন্তু লেখাপড়া কিছুই শিখিনি, কাকা।

—বেশ করেছো। ওতে কিছু আসে যায় না।

—আপনি বলছেন, আমিও শুনছি। কিন্তু কিছু বোঝবার সাধ্যি আমার নেই।

—কার সাধ্যি আছে, বল? কারও সাধ্যি নেই।

—সুধার মা'কে ডাকি তাহলে, আপনার খাবার দিয়ে যাক্।

—হ্যাঁ দিয়ে যাক্। খাবার খাওয়ার জন্যে আমিই তো একা পড়ে আছি। আর সবাই চলে গেল। কত তাড়াতাড়ি সব খালি হয়ে গেল, বউমা। ওষুধের এত বড় কারবারটা কত হঠাৎ পড়ে গেল। আর, মামলার যেদিন রায় বের হলো, দুই ভাই-ই ওই কারবারের সমান লাভের মালিক, তখন আর লাভ বলতে কিছু ছিল না। ছিল শুধু ওই সাইনবোর্ড আর একটা ঘরভরা যত শূন্য শিশি ও বোতল।

খুব জোরে একটা হাঁপ ছাড়লেন ননীকাকা।—ছ'বছরের মধ্যে বিদায় নিলেন প্রথমে বড় বউঠান। তারপর মেজদা আর মেজ বউঠান। বড়দা চলে গেলেন কাশী। তাঁর মৃত্যুর খবর যেদিন পেলাম, সেদিন দুপুরবেলার ঝড়-বাদলের মধ্যে এই কাছেই কোথায় যেন একটা বাজ পড়েছিল। পাড়ার লোকে কিন্তু এই বাড়িতেই বাজ পড়েছে মনে করে ছুটে এসেছিল, ওই উঠানটা লোকের ভিড়ে ভরে গিয়েছিল।

প্রতিভা—কিন্তু তারপর এতদিন কি করে আপনাদের...।

ননীকাকা—কী জিজ্ঞেস করছো, কী করে দিন চললো? কে চালালো?

—হ্যাঁ।

—আমার ষাট টাকা পেনসন।

—তাহলে তো খুব কষ্টেই আপনাদের দিন কেটেছে।

—কিছুই না। আমার কোন কষ্টই ছিল না। তবে হ্যাঁ, অনুর বেশ কষ্টই হতো।

—আপনি বললেও বিশ্বাস করবো না। আপনারও নিশ্চয় খুব কষ্ট হতো।

—না। শুধু একবার সত্যি খুব কষ্ট বোধ করেছিলাম। অনুর কলেজের পরীক্ষার ফী জমা দিতে হবে। কাজেই ভবতোষের কাছে গিয়ে টাকা ধার চেয়েছিলাম। ভবতোষ বললেন, ঠিক আছে, একটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। শুনে খুশী হয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। আধ ঘণ্টাও পার হয়নি বউমা, রামানুজখানা হাতে নিয়ে সবেমাত্র বসেছি। তুমি তো জান রামানুজের পুণা এডিশন এখন আর পাওয়া যায় না।

—আমি কিছুই জানি না, কাকা। আপনি বলুন, তারপর কী হলো?

—দেখলাম, দুটো লোক এসে একেবারে আমার এই বইয়ের ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে। কাগজের ঠোঙার কারবার করে, দুটো লোক। ভবতোষ পাঠিয়ে দিয়েছেন।

চমকে ওঠে প্রতিভা—কেন?

ননীকাকা—পুরনো বইয়ের কাগজ ওজন দরে কিনে নিতে চায়।

প্রতিভা—আপনি কী বললেন?

ননীকাকা—বললাম, তোমরা যাও। তারপর বাক্স থেকে আংটিটাকে বের করলাম।

—কিসের আংটি?

—তোমার কাকিমা'র আংটি। শুধু ওটাই তো ছিল, আর কিছু ছিল না। সে মানুষটা ওর একটা ফটোকেও আমার কাছে রেখে যেতে ভুলে গিয়েছে। বুঝলে তো, বউমা।

—খুব বুঝেছি, আপনার আর কিছু বলতে হবে না।

—কী বুঝেছো?

—সেই আংটি বেচে আপনার ভাইপোর পরীক্ষার ফী জমা দেওয়া হলো।

—তা তো হলো। কিন্তু তুমি আসল কথাটাই বুঝতে পারনি।

—কী বুঝতে পারিনি?

—ভবতোষ কেন যে আমাকে মিছিমিছি ওরকম একটা কষ্ট দিল, সেটা বুঝতে পেরেছো কি?

—না।

—তাই বল। আমিও বুঝতে পারিনি।

—আপনি এবার খেয়ে নিন।

—হ্যাঁ। খুব বুঝতে পারছি, ক্ষিদে পেয়েছে। হেসে ফেলেন ননীকাকা, প্রতিভাও হেসে ফেলে।

হেসে হেসেই বাঁ পায়ের হাঁটুটাকে টিপতে থাকেন ননীকাকা।—আরও বুঝতে পারি না, বাত-কালান্তক কেন যাবার আগে রাগ করে আমারই হাঁটুতে বাত রেখে গেল।

—আপনি কি ওই ওষুধ কোনদিন খাননি?

এবার বেশ একটু অদ্ভুতভাবে মাথা নেড়ে আর চেঁচিয়ে হেসে উঠলেন ননীকাকা—না, বউমা।

—খেলে আজ হয়তো ভালই থাকতেন, কষ্ট পেতে হতো না।

—তা হয়তো হতো না। কিন্তু এটা আমার কোন কষ্টই নয়। তুমি এসেছো যখন, তখন আমার কোন কষ্ট থাকতেই পারে না। তুমি মাঝে মাঝে এসে আমার বইগুলোকে একটু পড়ে শুনিয়ে যেও, তাহলেই হবে।

মুখ কালো করে ননীকাকার ঝাপ্‌সাদেখা চোখের চিকচিকে হাসিটার দিকে তাকিয়ে থাকে প্রতিভা। আর, যেন ভীরু দোষীর মত গলার স্বর কাঁপিয়ে কথা বলে—আমি এসব বই পড়তে পারি না, আপনি কিছু মনে করবেন না।

প্রতিভার কথা শুনে ননীকাকার গলার স্বরে যেন আরও অদ্ভুত একটা খুশির আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে—বেশ তো, তাতে কী হয়েছে? সে জন্যে আমার আর চিন্তা নেই, বউমা। আমার নাতিরা তো পড়বে।

প্রতিভার মাথাটা হেঁট হয়ে ঝুঁকে পড়ে। সারা মুখে যেন রাঙা আবীরের ঝড় লুটিয়ে পড়েছে। বুকের ভিতরটাও কেমন করছে। ননীকাকার সঙ্গে এখন আর একটিও কথা বলবার সাধ্যি নেই।

ভাগ্যিস চোখে ঝাপ্‌সা দেখেন ননীকাকা। তাই আস্তে আস্তে আবার মাথা তুলে ননীকাকার মুখের দিকে তাকায় প্রতিভা। ননীকাকা বলেন—তুমি এখন সুধার মা'কে একটু খবর দাও, বউমা। আমার খাবার দিয়ে যাক্‌।

রাত আটটা। তার মানে রাতটা শুরু হয়েছে। কানে কানে কথা বলবার, কিংবা একেবারে নীরব করিয়ে দেবার মত রাত নয়। পাশের বাড়ির রেডিও বেশ গলা খুলে যুদ্ধের খবরও শোনাতে শুরু করেছে। নীচের তলা থেকে উপরে উঠে গিয়ে প্রতিভা আবার তার নিজের ঘরের সেই আয়নাটির কাছে দাঁড়িয়েছে।

ঘরের দরজার কপাট আর ভেজানো নয়। দুই কপাট যেন খোলা-মেলা একটা বুকের দু'পাশের দুটো আগবাড়ানো হাত। বুকে জড়িয়ে ধরতে যেন একটুও দেরি না হয়, তারই জন্য তৈরি হয়ে থাকা দুটো হাত। খোলা দরজা দিয়ে ঘরের ভিতরে হাওয়া ঢুকছে আকুল হয়ে। ঝুলছে ঘরের ভিতরের আলনায় একটা তোয়ালে আর পাঁচটা রুমাল। নড়ছে এক বছর আগের নতুন বরবধূর একটি ফটো। কাঁপছে বিছানার বালিশের ঢাকা। ঘরের ভিতরটা সত্যিই হাওয়া-খুশি পাখির মত যেন পাখা মেলে উড়তে চায়।

প্রতিভার চোখ-মুখের দশাও হাওয়া-খুশি একটা পাখির দশা। পাখিটার শুধু চেহারার ডানা নয়, প্রাণের ডানাও নড়ছে কাঁপছে দুলছে। জীবনে কোন দিনও ইচ্ছে করে নিজেকে এরকম একটা চমৎকার রূপের প্রজাপতির মত এত রঙীন করে সাজাবার চেষ্টা করেনি প্রতিভা।

না, একটা হঠাৎ-খেয়ালের আনমনা ব্যস্ততার কাণ্ড নয়। প্রতিভার মনও আজ আর লজ্জা পেয়ে চমকে ওঠে না, এ কি? এত সাজবার কী দরকার ছিল? প্রতিভা জানে, প্রতিভার এঘরের আয়না-টেবিলের উপরে ছড়িয়ে পড়ে থাকা যত ক্রীম পাউডার আর চামেলী আরকের ছোট শিশিটাও জানে, একটা রঙীন প্রজাপতির প্রাণ সত্যিই আজ পরাগ নিতে চায় ; তাই একজনের বুকের উপর লুটিয়ে পড়তে চায়।

একবার মনে হয়েছিল, ঘরের ভিতরের চার দেয়ালের চারটে আলো জ্বেলে রাখাই ভাল। আলো-ঝলমল এই ঘরের আভা এ-আর-পি'র লোকগুলোর চোখেও পড়বে না। এই ঘর তো রাস্তার দিকের মাথায়ওঠা বারান্দাটার গা-ছোঁয়া একটা ঘর নয়। পাশের বাড়ির বাগানের নারকেলের পাতার ঝালরের ফাঁক দিয়ে আকাশের অত রোগা চাঁদের ফিকে আলো এই বারান্দার আর এই ঘরের দরজার কাছে লুটিয়ে পড়ে ঝিরঝির করছে। এই ভাল। তাই, ঘরের শুধু টেবিল বাতিটাকেই জ্বেলে দেয় প্রতিভা। মৃদু নিবিড় নীলচে এই থমথমে আলোতে কারও চোখ-মুখ-বুকের সব কিছু দেখে নেবার পরেও মনে হবে, আরও যেন কিছু দেখবার বাকি রয়ে গেল।

সত্যি, মনটা তখন কী ভয়ানক কষ্ট পেয়ে ছটফটিয়ে উঠেছিল, ননীকাকা যখন বললেন, তুমি মাঝে মাঝে আমার বই একটু পড়ে দিও। লেখা-পড়া না শেখবাব লজ্জাটা যে একদিন এরকম একটা দুর্ভাগ্যের লজ্জা বলে মনে হবে, কোনদিন কোন ভুল স্বপ্নেও এমন ভয়ের কথা ভাবতে হয়নি। কত খুশি হতেন ননীকাকা, ঝাপসা-দেখা চোখের সব দুঃখ ভুলে যেতেন, যদি প্রতিভা তাঁর ওই যত আদুরের বইয়ের অন্তত দু-চারটে বই ভাল করে পড়ে শোনাতে পারতো। কাকা নিশ্চয় ভাবতেই পারেননি যে, এত বড়-বড় দুটো চোখের মেয়ে হয়েও বই পড়তে পারে না, তাঁর ভাইপোর বউ, যার বয়স ছাব্বিশ পার হয়ে সাতাশ পার হতে চলেছে।

কিন্তু কী অদ্ভুত ননীকাকার ওই ঝাপ্‌সা-দেখা চোখের চিকচিকে হাসি। নাতিরা পড়বে। ননীকাকার চোখে চিকচিকে আশার হাসিটা যেন একটা খুশির আলো উথলে দিয়ে নির্ভাবনায় ভরে গেল। আর, উথলে উঠলো প্রতিভার বুকের ভিতরে এক ঝলক রক্তের জ্যোৎস্না। বলতে ইচ্ছে করেছিল, নিশ্চয় কাকা, বিশ্বাস করুন, আপনার নাতিরা ওই বই পড়বে। নিশ্চয় পড়বে। আজ আপনি আমাকে মাপ করে দিন।

কী যেন সেই গল্পটা—ভাল কথা করালি স্মরণ। এক পাগল মাঝির ভীষণ নিষ্ঠুর একটা পাগলামির বাতিক ছিল। মানুষকে খেয়া পার করাতে গিয়ে মাঝগাঙে ডিঙি ডুবিয়ে দিত। একদিন, খেয়ার ডিঙি তখন মাঝ-গাঙ প্রায় পেরিয়ে যেতে চলেছে। ডিঙির যাত্রীরা খুশি হয়ে জিজ্ঞেস করে—কী মাঝি, মেজাজ খুব ভাল নাকি? আজ যে ডিঙি ডুবিয়ে দিতে চেষ্টা করলে না। চমকে ওঠে পাগল মাঝি—ভাল কথা করালি স্মরণ। তখুনি ডিঙিটা ডুবিয়ে দিল পাগল মাঝি।

ননীকাকাও যেন এক পাগল মাঝির ভোলা মনটাকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে দিয়েছে। শেফালীদি সত্যিই একদিন বেশ ধমক দিয়ে বলেছিলেন, তুমি এতদিন ধরে কী করছো বল তো? বরের সঙ্গে কি শুধু কথা বলে বলে গল্প করেই দিন কাটাচ্ছো?

—তা তো করছিই।

—তাই তো মনে হয়। তা না হলে এতদিনে একটা প্রমাণ পাওয়াই যেত।

—কোন দরকার নেই।

—কী দরকার নেই?

—এরকম প্রমাণ দেবার কোন দরকার নেই, তুমি যে-রকম প্রমাণ দিয়েই চলেছ।

সত্যিই তো মনে হতো, ওরকম প্রমাণ দেবার জন্য ব্যস্ত হওয়ার কোন মানে হয় না। এ

যেন সুখে থাকতে ভূতের কিল খাওয়ার জন্যে ছটফট করা। যা ভাল লাগে তা তো সবই পাওয়া হয়ে গিয়েছে ; একটুও অভাব নেই, কোন অভাব নেই।

আজ এখন যদি শেফালীদি হঠাৎ এখানে এসে জিজ্ঞেস করে বসেন, এ কী প্রতিভা, আজ তোমার চোখ-মুখ এরকম হয়ে গেল কেন? এত সেজেছো কেন? কিসের জন্যে আজ এরকম একটা মোহিনী রূপ ধরবার ইচ্ছে হলো?

শেফালীদির কথার জবাব দিতে পারা যাবে না। মুখের ভাষাটা অত বেহায়া হতে পারবে না। কিন্তু, তাতেই তো ধরা পড়ে যেতে হবে। শেফালীদি বুঝেই ফেলবেন, কেন আজ জবাব দিতে পারছে না সেই মেয়ে, যে-মেয়ে একদিন চেঁচিয়ে জবাব দিয়েছিল, কোন দরকার নেই।

নাতিরা পড়বে। কাকার কথাটা যেন বালীর জনা পিসিমার বাড়ির দক্ষিণ-বাগানের হাওয়া। সেদিন, যেদিন দাদার সঙ্গে বালী হয়ে বেলুড়ের মন্দির দেখতে যাওয়া হয়েছিল, সেদিন জনা পিসিমার পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতে হাওয়ার কাণ্ডটা দেখেছিল আর চমকে উঠে হেসে ফেলেছিল প্রতিভা। ঠিকই, কেন যেন, দেখতে খুব ভাল লেগেছিল। দক্ষিণ-বাগানের দিক থেকে হঠাৎ একটা হাওয়া ছুটে এসে উঠানের উপর থেকে শুকনো-ঝরা আমপাতার একটা গাদা উড়িয়ে নিয়ে গেল। আর, উঠানের মাটিতে আঁকা একটা আলপনা যেন মুখ তুলে হেসে উঠলো।

আগে তো ঠিক এমন করে বুঝতে পারা যায়নি, এই প্রায়-সাতাশ বছর বয়সের বুকের ভিতরে লুকিয়ে থাকা একটা উঠানের উপরে একটা আলপনা শুকনো আমপাতায় ঢাকা পড়েছিল। কী আশ্চর্য, ইচ্ছেটা আজ আর একটুও লজ্জা পাচ্ছে না। লজ্জা করতে চায়ও না।

ননীকাকার মুখের ওই কথাটা মনে পড়লে বুকের ভিতরটা এখনও সেই কথা উতলা হয়ে হেসে ওঠে। আর চোখেও যেন একটা মিষ্টি ছবি ভেসে ওঠে। স্বপ্নে দেখা মধুমালার দেশের ছবি কি এর চেয়েও বেশি মিষ্টি?

ভদ্রলোক যখনই বাড়িতে ফিরে আসুক না কেন, খেতে যাবার আগে একবার তো এঘরেই আসবে আর ডাকবে। না, আজ আর ওভাবে চলবে না। ভদ্রলোকও একটু আশ্চর্য হবে নিশ্চয়। হোক। খেতে যেতে যত দেরি হয়, হোক। ভদ্রলোক বোধহয় বুঝেও ফেলবে, আজ নিশ্চয় এক পাগল মাঝির মতলব ভাল কথা স্মরণ করে ফেলেছে। বুঝুক। যদি জিজ্ঞেস করেই ফেলে, তবে স্পষ্ট বলে দেওয়াই হবে—হ্যাঁ।

কী ভাবলো সুধার মা? আজ এসময়ে নীচের তলার সব কাজ ফেলে রেখে উপরতলার ঘরে চলে গেল কেন বউদি? রোজই এ সময়ে সুধার মা'কে বলে দিতে হয়, কাল সকাল বেলার চায়ের সঙ্গে কী খাবার করা হবে? রোজ রোজ লুচি ভাল নয়। তুমি কি এত ঘি না দিয়ে সুজির মোহনভোগ করতেই পার না, সুধার মা? রামপ্রসাদকে বলবার ছিল, কাল আবার বাজার থেকে এক গাদা বেগুন নিয়ে এস না। এক ডালা বেগুন শুকিয়ে পড়ে রয়েছে। শুধু মাছ নিয়ে এস। ভানুর দোকানের পাঁউরুটি আর কখ্খনো আনবে না। কিন্তু বেচারা যে বলেছিল, আমার মাইনেটা আজই দিন, মা। দেনা-টেনা শুধে দিয়ে যা থাকবে, কালই মনি অর্ডার করে দেশের ঘরের মানুষটার কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে। ঘরের খবর ভাল নয়, মা। ঝি দুর্গাবালাও রোজই এই সময় একটা আশা করে রান্নাঘরের দরজার কাছে চুপ করে বসে থাকে, দোক্তা খাওয়ার জন্য চারটে পয়সা ওকে দিতে হয়।

সব হবে, সব হবে। আজ এখন আমাকে একটু রেহাই দাও। সকলকে এক কথায় বুঝিয়ে আর চুপ করিয়ে দিয়ে উপরতলায় চলে এসেছে প্রতিভা। আজ সব কাজের আগে প্রতিভার যেন একটা পরম কাজ আছে। একটা দুর্বার আশার উৎসবের কাজ।

নারকেলের পাতার ঝালরের ফাঁক দিয়ে ফালি চাঁদের আলো আর ঝিরঝির করে না। তার মানে, সেই ফালি চাঁদ সরে গিয়েছে, রাত বেড়েছে। কত রাত? সিংহ-আয়নার মাথার

ওপরের ঘড়িটা শব্দ করে বাজে, রাত দশটা।

তা হলে তো, বেশ রাত। বাড়ি ফিরতে কোনদিনও এত রাত করে না অনুপম।

সিঁড়ির মুখের কাছে, উপরতলার বারান্দায় উঠে ডাক দেয় চাকর রামপ্রসাদ--মা, শুনছেন?

চমকে ওঠে প্রতিভা--কি?

রামপ্রসাদ--নীচে এসে টেলিফোন ধরুন। বাবু ডাকছেন।

ডাকাচ্ছি তোমাকে। বাড়ি ফিরতে দেরি করবার আর রাত পেলে না। এখনও ফিরে না এসে দূর থেকে টেলিফোনে কথা বলতে চাইছো? দেখাচ্ছি মজা।

নীচের তলার ঘরে প্রতিভার টেলিফোনী ভাষাটা হাসতে গিয়েও যেন রাগ করে একটা ঝংকার দিয়ে বেজে ওঠে।—না, আমি কোন কথা শুনতে চাই না। তুমি এখনি বাড়ি চলে এস।

—আজ বিকালে কি টেলিফোনের লোক এসেছিল? উপরতলায় তোমার ঘরে টেলিফোন দিয়ে গেছে?

—না।

—বাথরুমে দিয়ে গেছে?

—আসেইনি তো দিয়ে যাবে কেমন করে?

—আসেনি?

—না।

—তবে বোধহয় কাল সকালেই আসবে।

—এসব কথা আমাকে জানিয়ে লাভ কি?

—তুমি নিজেই সামনে থেকে কাজটা করিয়ে নিও।

—আমি কেন? তুমিই দেখে শুনে কাজ করিয়ে নেবে।

—আমি তো কাল সকালবেলাতে বাড়িতে থাকবো না।

—কেন?

—নৈহাটি থেকে ফিরতে প্রায় দশটা হয়ে যাবে।

—তার মানে? তুমি কি আজ বাড়ি ফিরবে না।

—না। সূর্যবাবুর সঙ্গে এখুনি নৈহাটি যেতে হচ্ছে। না গেলেই নয়।

—কেন?

—কাজ আছে। খুব জরুরি কাজ। তুমি বিশ্বাস কর। একটুও বাড়িয়ে বলছি না।

—বেশ।

—তুমি আর আমার অপেক্ষায় থেকে......

—বলেই তো দিলে, বাড়ি ফিরবে না। তবে আর অপেক্ষায় থাকবো কেন?

—রাগ করো না বলছি, তুমি এখন খেয়ে নাও। রাত দশটা হয়ে গিয়েছে।

—তুমি খাবে না?

—খেয়েছি। সূর্যবাবুর বাড়িতেই খেয়ে নিয়েছি। ভালই খেয়েছি, প্রতিভা। বিরিয়ানি পোলাও আর ইলিশ ভাজা।

—ভাল করেছ। এখানে আজ পোলাও নেই, ইলিশ-ভাজাও নেই। শুধু মুগের ডাল আর কইমাছের ঝোল। খেতে তোমার একটুও ভাল লাগতো না।

হেসে ফেলে অনুপম—সত্যিই যে রাগ করেছো, দেখছি।

প্রতিভা--মিথ্যে কথা বলো না।

—মিথ্যে কথা?

—নিশ্চয়। কিছুই দেখতে পাচ্ছ না, তবে আর দেখছি দেখছি বলছো কেন? তুমি তো দূর থেকে শুধু কথা বলছো।

—কিন্তু তুমিও কি আমাকে দেখছো? দেখলে আর এত রাগ করে কথা বলতে না।

—আমি কিন্তু খুব দেখতে পাচ্ছি। হেসে ফেলে প্রতিভা।

—অ্যাঁ? কী দেখতে পাচ্ছ?

—তুমি এখন কাগজপত্রের একটা ফাইল এক হাতে শক্ত করে একেবারে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে রয়েছো।

—উঃ, কী ভয়ানক তোমার চোখ! ঠিকই বলেছো, এই ফাইল-হাতে নিয়েই এখন আমাকে নৈহাটি ছুটতে হবে। কিন্তু তুমি দুঃখ করো না। তুমি এখন খেয়ে নাও। আর...একটা কথা...কিন্তু কী করে বলি? সূর্যবাবু যে গ্যাঁট হয়ে এখানেই বসে রয়েছেন।

—চুপ কর। আর একটি কথাও বলো না। কিন্তু বেশি রাত জেগো না। ঘুমোতে চেষ্টা করো। আচ্ছা, এখন তাহলে...।

—হ্যাঁ, রেখে দাও।

হোক্ দুপুরবেলা। বেলা একটা। সে ইচ্ছেটা তো ক্লান্ত হবার মত একটা সামান্য পিপাসার অভিমান নয়। উপরতলার এই কপাটবন্ধ ঘরের ভিতরেও নীলচে জ্যোৎস্না থমথম করে। এখনি ঘুমিয়ে পড়বার সাধ্যি নেই অনুপমের, প্রতিভার মুখের দিকে তাকালে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছেও করে না। অনুপমের বরং জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, তুমি কি আজ ইচ্ছে করেই খোঁপা বাঁধনি? তুমি কি আগে থেকেই জেনে বসে আছ যে, আজ এই এত শান্ত একটা বিনাঝড়ের দুপুরবেলাতে, একটা কপাটবন্ধ ঘরের হাওয়া উতলা হয়ে উঠবে আর তোমার শক্ত করে পরা শাড়ির সাজ এলোমেলো করে দেবে? তাই কি শাড়িটাকে এরকম না-পরার মত করে পরেছ? এটা কি কাল রাত্রিতে ঘরে না আসার জরিমানা?

তা না হলে এরকম কাণ্ড করছে কেন প্রতিভা? সেই যে মাথাটাকে অনুপমের বুকের উপর রেখে এলানো চুলের গন্ধভরা মায়া লুটিয়ে দিয়েছে, আর নড়ছে না। কোন কথাও বলছে না। অনুপমের গলাটাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে যেন একটা স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু কী কথা বলে বোঝানো যায় এই মেয়েকে, রাতটা ঘরের বাইরে কাটিয়ে দিতে আমারও যে একটুও ভাল লাগেনি। নৈহাটির কারখানার ম্যানেজারের বাড়ির সেই ঘরের জানলাতে চমৎকার লতার ফুল দোলে, কিন্তু ঘরের ভিতরে মশার সে কী ভয়ানক গুনগুনে রাগের আওয়াজ। মশারির ভিতরেও ভয়-ভয় করে, শুয়ে থাকা যায় না, উঠে বসতে হয়। জেগে থাকতেও হয়। তখন বার-বার শুধু মনে পড়েছে, এই ঘরটিরই কথা, যেখানে অনুপমের জীবনের সারাদিনের ছুটোছুটি আর চিন্তার সব ক্লান্তি এসেই যেন ছায়ানিবিড় একটা তৃপ্তি খুঁজে পায়। এক-এক সময় সত্যিই বেশ আশ্চর্য মনে হয়। ঠিক যা চেয়েছিল অনুপমের প্রাণের ইচ্ছাটা, তাই পেয়ে গিয়েছে অনুপম। ঘরে ফিরে এসে আর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই, আগে বুকের কাছে চলে আসে, তারপর কথা বলে। প্রতিভার প্রাণটা যেন অনুপমের জীবনের এই দাবির কথাটা একদিন ওর ঘুমের স্বপ্নে শুনে ফেলেছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় বলেও ফেলেছিল, হ্যাঁ, তুমি যা চাও, আমারও ঠিক তাই হতে ইচ্ছে করে। শুধু তাই হতে পারি। তার বেশি কিছু হবার যোগ্যতা নেই, ইচ্ছেও নেই। আর কিছু হতে না পারি, অন্তত তোমার ঘরের সুখ হয়ে থাকতে পারবো নিশ্চয়।

না, আজ আর অনুপমের কল্পনা করে বুঝতে হয় না। একদিন তো নয়, অনেকবার, প্রতিভা এ-সব কথা একেবারে মন খুলে বলেই দিয়েছে। প্রথম কবে বলেছিল? হ্যাঁ, সেই বিয়ের রাতেই বাসর-ঘরে। বলেছিল—আমাকে জিজ্ঞেস করবার কোন মানে হয় না।

—আমার যে সত্যিই জানতে ইচ্ছে করছে, প্রতিভা।

—বিশ্বাস কর, আমি নিজেও আশা করিনি যে, তোমাকে দেখেই এত ভাল লেগে যাবে।

—কিন্তু আমার কথা শুনেছো তো? সামান্য মাইনের কেরানীগিরি করছি। আইন পাস করা কপালে আছে কিনা, তাও জানি না।

—সব শুনেছি।

—ভয় করছে না?

—একটুও না।

—আমি যদি তোমাকে সুখী করতে না পারি।

—খুব পারবে।

—আর তুমি?

—আমি লেখাপড়া জানি না; তবু আর কিছু না পারি, অন্তত তোমার ঘরের সুখ হয়ে থাকতে পারবো।

এই তো, সে মেয়ে এখন অনুপমের ঘরের সুখের একটা ব্যাকুল আশাকে তৃপ্তি দিয়ে ভরে দেবার জন্য অনুপমের গলা জড়িয়ে ধরেছে। না, আর কোন কথা বলতে ইচ্ছে করে না। বলবার দরকারও নেই। দুহাতে প্রতিভার মাথা জড়িয়ে ধরে বুকের উপর চেপে রাখে অনুপম। প্রতিভার মাথার উপর অনুপমের তপ্ত চঞ্চল নিঃশ্বাসের বাতাস ঝরে পড়তে থাকে।

কিন্তু বেজে ওঠে টেলিফোন। এক লাফ দিয়ে উঠে গিয়ে, আর টেলিফোনের মুখের কাছে মুখ নিয়ে কথা বলে অনুপম।—কে? চন্দ্রবাবু এসে পড়েছেন নাকি? আচ্ছা, যাচ্ছি। না না, এখনই যাচ্ছি।

এইবার আলনাটার দিকে তাকিয়ে কথা বলে অনুপম।—যাচ্ছি প্রতিভা। মনে হচ্ছে, খুব জরুরী কাজের কোন কথা নিয়ে চন্দ্রবাবু এসেছেন।

আলনার উপর থেকে একটা চাদর তুলে নিয়ে আর গায়ে জড়িয়ে তারপর সত্যিই একটা খুব-ব্যস্ততার আবেগ নিয়ে চলে গেল অনুপম।

ঘরের দরজা খোলা। দরজার কাছে মেজের উপর রোদ। সেই রোদের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে প্রতিভার চোখের তারা দুটো যেন শুকিয়ে দুটো কাঁকর হয়ে যাবে। জরুরী কাজ? পৃথিবীতে তাহলে এমন জরুরী কাজও আছে, যে-কাজের ডাকে দুপুরবেলার দরজাবন্ধ ঘরের নীলচে জ্যোৎস্নার কাছ থেকে তড়বড় করে আর ব্যস্ত হয়ে কেউ চলে যেতে পারে।

রাজপুতের ছেলে বরের সাজে সেজেছে। বিয়ের আঙিনায় দাঁড়িয়ে কনের গলায় মালা দেবার জন্য সবে মাত্র মালাটি তুলে ধরেছে। কিন্তু দুর্গের দ্বারে দামামা বেজে উঠলো। শত্রু হানা দিয়েছে। তখুনি তলোয়ার হাতে নিয়ে যুদ্ধ করতে ছুটে চলে গেল রাজপুতের ছেলে। কনের গলায় মালা দেওয়া আর হলো না। গল্পটা জানা আছে প্রতিভার। কে বলেছিল গল্পটা? বোধ হয় বউদি বলেছিলেন। এ তো তার চেয়েও ভয়ানক একটা দুর্ভাগ্যের কাণ্ড। কিন্তু চন্দ্রবাবুর ডাক কি একটা যুদ্ধের ডাক?

শুধু মনটা নয়, মনের ভিতরে একটা কথাও হাঁসফাঁস করছে। কিসের কাজ? শুধু জরুরী কাজ বললে তো স্পষ্ট করে কিছু বোঝা যায় না। সে কাজটার কি প্রাণ বলে কিছু নেই? দুর্গাবালা বলে, ওর স্বামী একদিন মেলাতলার মন্দিরের সামনে মাথার উপর ধুনি জ্বালিয়ে নিয়ে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর নেচেছিল। চারদিকের ভিড়ের সঙ্গে দুর্গাবালাও সেখানে দাঁড়িয়েছিল। কেঁদে আকুল হয়েছিল দুর্গাবালা। তবু দুর্গাবালার স্বামীর সে কী নাচন, কী ফুর্তি! মাথার চুল পুড়ছে, পা ঝলসে যাচ্ছে, তবু নেচেই চলেছে। দুর্গাবালার কান্নার চোখ দুটোকে দেখতে পেয়েও নাচ থামায়নি লোকটা। দুর্গাবালা বলে—উপায়ও তো ছিল না, মা। ওটা মানতের নাচ। ফাঁকি দিলে তো চলবে না।

ভদ্রলোকের জীবনের জরুরী কাজও কি একটা মানতের নাচ? কিন্তু কিসের মানত? যেকথা অনুপমকে কোন দিনও জিজ্ঞাসা করে জানতে ইচ্ছে করেনি, সে-কথা আজ জানতে ইচ্ছে করে। কী কাজ, কিসের কাজ, কেমনতর কাজ কর তুমি?

অনুপমের একটা কামিজ ঘরের মেজের উপর লুটিয়ে পড়ে রয়েছে। রোদ লেগে ঝিকমিক করছে কামিজের সোনার বোতাম। যাবার আগে জামা ঝোলাবার হুক থেকে কামিজটাকে তুলে নেবার জন্য বোধহয় হাত বাড়িয়ে একটা টান দিয়েছিল অনুপম। কামিজটাকে গায়ে দেবারই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাড়াতাড়ির মাথায়, একেবারে ছটফটিয়ে ব্যস্ত হতে হয়েছিল বলেই কামিজটাকে গায়ে দিতে পারেনি। বোধহয় হাত ফসকে পড়ে গিয়েছে কামিজটা। আবার তুলে নিতে একটু চেষ্টাও করেনি ভদ্রলোক। শুধু একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে নিয়েই চলে গিয়েছে। জরুরী কাজের ব্যস্ততা তাহলে নিজের জিনিসকেও ঘরের মেজের উপর ফেলে দেয় আর ছুটে চলে যায়। ধুলো লাগবে জেনেও ভয় করে না। মায়া করে তুলে নিতে আর ধুলো ঝেড়ে দিতে ভুলে যায়।

মণ্টুর একটা বুড়ো আছে। তুলো দিয়ে তৈরী একটা পুতুল বুড়ো। বুড়োর চোখ-মুখ-মাথায় কয়লার গুঁড়ো, হাতে-পায়ে সুরকির ধুলো, আর পেটের ফুটো থেকে তুলো বের হয়ে পড়েছে। সে বুড়োর গলাটাকে হাতের মুঠোয় খুব আলগা করে ধরে রেখে যখন ঘুমিয়ে পড়ে মমটু, তখনও কি কারও সাধ্যি আছে, মণ্টুর আদুরে বুড়োকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে খাটের তলায় ছুঁড়ে ফেলে দেবে? অসম্ভব! বুড়োকে ছুঁতে গেলেই ঘুমন্ত মণ্টুর চোখ দুটো খুলে যায়। চেঁচিয়ে ওঠে মণ্টু।

জরুরী কাজের ভদ্রলোকেরা মণ্টু নয়, ঠিকই। মণ্টু ওর একটা খেলনা জিনিসকে ঘুমের মধ্যেও হাতে ধরে রাখে। আর, জরুরী কাজের মানুষেরা জাগার মধ্যেই তার বুকে ধরে রাখা একটা জ্যান্ত জিনিসকে ঠেলে সরিয়ে দিতে পারে।

ছন্নছাড়া এলানো চুলের গোছাটাকে শক্ত করে একটা গিঁট দিয়ে খোঁপা বেঁধে নিয়েও বুঝতে পারে প্রতিভা, মনটা তবু একটুও শক্ত হতে পারছে না।

এ ছাই মনেরও কোন দোষ নেই। শক্ত হওয়ার জন্যে তো গুপ্তিপাড়ার পরেশ চৌধুরীর মেয়ের জীবনটা এবাড়িতে আসেনি। শক্ত হতে হয়, যদি পাথরের সঙ্গে ঠোকাঠুকির ভয় থাকে। এই মানুষটি তো একটি...সত্যিই কাজল মেঘ, ত্রিবেণীর বড়-মামা'র বাড়ির ছাদের উপর দাঁড়ালে যেমন দেখা যায়, নদীর ওপারের একটা বাগানের বড়-বড় তালের মাথার উপর ভেসে এলেই সেই মেঘ গলে যায়। মাথা খারাপ না হলে এই কাজল মেঘটাকে কেউ কাজল পাথর বলে সন্দেহ করবে না। প্রতিভার কাছে এসে দাঁড়ালেই যে প্রতিভার হাত ধরে ফেলে অনুপম, একটুও দেরি করে না।

টেবিলের উপর কী এটা? মেঘ রঙের মখমলের খুব চোট একটা বাক্স ধরনের ডিবে। কে জানে, জিনিসটাকে কখন এখানে এই টেবিলের উপর রেখে দিয়েছে অনুপম।

ডিবেটাকে হাতে তুলে নিয়ে খুলে ফেলতেই চমকে ওঠে প্রতিভা, আর দুই চোখ অপলক হয়ে ডিবের ভিতরের একটা ঝকঝকে বিস্ময়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। এক জোড়া হীরের দুল।

বুঝতে পারে না প্রতিভা, চোখ দুটো কখন এমন করে ভিজে গেল। ভালবাসার উপহার আজ হীরে হয়ে প্রতিভার মত মেয়ের ভাগ্যের কাছে এসেছে। এ যে স্বপ্নে দেখা আশ্চর্যের চেয়েও বড় আশ্চর্য। পরের চিঠিতে মা'কে যখন লেখা হবে, এক জোড়া হীরের দুলও হয়েছে মা, তখন মা নিশ্চয় আবার খুশী হয়ে আর হেসে হেসে বাবাকে ওই কথাটাই বলবে--ভগবান যাকে দেন তাকে এমনি করেই দেন।

কিন্তু মা'কে তো আর একথা লেখা যাবে না, আমার যেন কী হয়েছে মা। হীরের দুল

দেখেই চোখ ভিজে গেল কেন, ভাল লাগলো না কেন, কিছুই বুঝতে পারছি না।

দোষটা কি তবে আমার চোখেরই দোষ? দুটো পানসে চোখ? কিন্তু গুপ্তিপাড়ার অনেক মেয়ে আজও জানে আর বলেও থাকে নিশ্চয়, প্রতিভার চোখে পাথর আছে। তা না হলে চোখের সামনে ওরকম একটা কাণ্ড দেখে কোন মেয়ের চোখ না কেঁদে থাকতে পারে না।

সেদিন দাদাকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে দশজন পুলিস এসে বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল পুলিসের এক কর্তা-অফিসারও এসেছিল ; মাথায় টাক আর রোগা ঝিরকুটে চেহারা। বাবা তাকে চেনেন, শ্রীনগরের বড় মেসোর ছোট ভাই বসন্ত দত্ত। বসন্তবাবুর রোগা কোমরের বেল্টের সঙ্গে চেন-বাঁধা একটা মস্ত-বড় পিস্তল ঝুলছিল।

দাদা বলেন—তাড়াতাড়ি এক পেয়ালা চা করে দে, পতু।

বসন্তবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন—নো নো, নেভার।

দাদার কপালের রগ ফুলে ওঠে—কেন?

প্রতিভা বলে—এক কাপ চা করে দিতে কতটুকুই বা সময় লাগবে? পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন।

বসন্তবাবু—না।

প্রতিভা—কেন?

বসন্তবাবু—আপনার চা যে সত্যিই চা, বিষ নয়, তার কি কোন গ্যারাণ্টি আছে?

প্রতিভা—কী বললেন? দাদা চা খাবেন, সেই চায়ে বিষ মেশাবো আমি?

বসন্তবাবু—অসম্ভব নয়। পুলিসের আর আইনের চেষ্টাকে জব্দ করে দেবার জন্যে আপনারা এমন কাণ্ডও করতে পারেন, সব পারেন। চলুন মশাই, কুইক!

দাদার আর চা খাওয়া হলো না। বসন্তবাবু নিজেই দাদার হাতে হাতকড়া পরালেন। চলে গেলেন দাদা। যাবার সময় কিন্তু দাদা হেসে ফেলেছিলেন—তুই রাগ করিস না পতু ; কাঁদিস-টাদিস না।

না, কাঁদেনি প্রতিভা। বাবা চুপ করে আর শুকনো শান্ত চোখ তুলে চালতে গাছের কাকের বাসাটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মা ঘরের ভিতরে বসে কাঁদলেন। আর প্রতিভা শুধু দুটো শক্ত চোখ অপলক করে দেখতে থাকে, চলে যেতে যেতে দাদা তাঁর হাত-কড়া লাগানো হাত দুটোকে তুলে নিয়ে কপালটাকে টিপছেন।

জয়া সুলেখা আর বীণা, যারা এই পাড়ারই তিন মেয়ে, বলাইদার গ্রেপ্তার দেখতে যারা ছুটে এসেছিল, তারা কিন্তু কেঁদে ফেলেছিল, আর যাবার আগে ফিস-ফিস করে বলেওছিল, বলাইদা তো বোনকে বলে গেলেন, কাঁদিস-টাদিস না, কিন্তু বোনের চোখে তো এক ফোঁটা জল দেখছি না।

ছি-ছি, কামিজটা যে এখনও ঘরের মেজের উপর তেমনই লুটিয়ে পড়ে রয়েছে। লজ্জা পেয়ে চমকে ওঠে প্রতিভার চোখ। এ বাড়িতে আজ এই প্রথম ভুল, এমন ভুল কোনদিনও হয়নি। অনুপমের কামিজটা একটা অবহেলার জিনিসের মত মুখ থুবড়ে মেজের উপর পড়ে আছে, এমন কাণ্ড চোখের সামনে দেখেতে পেয়েও এতক্ষণ ধরে শুধু যত বাইরের ছবি দেখেছে প্রতিভা।

কামিজটাকে মেজের উপর থেকে তুলে নিয়ে দেখতে চেষ্টা করে প্রতিভা, ধুলো লাগেনি তো? এ ঘরের মেজেতে অবিশ্যি ধুলো নেই। দুর্গাবালা চমৎকার ঘর মুছতে পারে। কিন্তু তবু তো...। কামিজটাকে বার বার ঝাড়া দিয়ে নিয়ে আবার হুকের গায়ে ঝুলিয়ে দেয় প্রতিভা।

হাত দুটো এবার যেন লজ্জা পেয়ে মুখ ঢাকতে চেষ্টা করে। ছি-ছি, মানুষের একটা দুঃখকে চিনতে ও বুঝতে এত ভুল হয়? চন্দ্রবাবুর ডাক শুনেই চলে যেতে হলো, কামিজটাকেও গায়ে দেবার সময় হলো না, এ তো ভদ্রলোকের জীবনের একটা কষ্ট। সে

কষ্টটা চাপা থাকে, মুখ খুলে কথা বলে না, আক্ষেপও করে না। বরং যেন জোর করে হেসে থাকতে চেষ্টা করে। এটুকু বুঝতে এত দেরী হলো কেন? নিজের সাধের অভিমানে চোখ ভিজিয়ে দিলে, সেই চোখ বোধ হয় আর-একজনের কষ্টের মুখচাপা অভিমানের কিছুই দেখতে ও চিনতে পারে না।

কামিজটাকে হাতে তুলে নিয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায় প্রতিভা। তারপর বারান্দার সিঁড়ির মুখের কাছে এসে বেশ ব্যস্তভাবে ডাক দেয়--রামপ্রসাদ।

--হ্যাঁ, মা।

--এখানে এস, এই কামিজটাকে নীচের ঘরে বাবুর কাছে দিয়ে এস। তাড়াতাড়ি এস।

খুব জোরে পাখা ঘুরছে নীচের তলার ওই ঘরে ; দুটো বড়-বড় পাখা। ঘরটা কিন্তু লম্বাতে কিংবা চওড়াতে এমন-কিছু বড় নয়। একটা বড় টেবিলে ও চারটে চেয়ারে ঘরের প্রায় অর্ধেক ভরে গিয়েছে। কুড়ি বছর আগে এখানে একটি টেবিলের উপরে আত্রেয় বাত-কালান্তকের শিশি-বোতলের লেবেল স্তূপ হয়ে পড়ে থাকতো। অনুপমের বাবা যাদব রায় যে চেয়ারে বসে কারবারের হিসেব লিখতেন, আজ যাদব রায়ের ছেলে অনুপম রায় ঠিক সেখানেই অন্য একটি চেয়ারে বসে আছে। চীনে ছুতোরের হাতে পালিশ করা বর্মা সেগুনের নতুন টেবিল আর নতুন চেয়ার।

টেবিলের উপর আর সেই পুরনো ভাগ্যের জঞ্জাল নেই। একেবারে ফাঁকা একটা টেবিল। হ্যাঁ, টেবিলের উপরে এদিকে-ওদিকে অবশ্য চায়ের দুটো শূন্য পেয়ালা পড়ে আছে।

একেবারে আদুড়-গা হয়ে বসে আছেন চন্দ্রবাবু ; গায়ের গেঞ্জি ও কামিজ, দুটো বস্তুকেই চেয়ারের হাতলের উপর ফেলে রেখে দিয়েছেন। সূর্যবাবু তাঁর গায়ে শুধু গেঞ্জিটাকে রেখেছেন, আর মটকার পাঞ্জাবিটাকে দেয়াল-ঘেঁষা আলমারিটার কাঁচের হাতলের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়েছেন। অনুপমের গেঞ্জি-পরা গায়ে অবশ্য একটা চাদর জড়ানো রয়েছে, বেশ মিহি ও নরম একটা বিষ্ণুপুরী সিল্কের চাদর।

চন্দ্রবাবু বলেন--অনন্ত চাটুজ্জে কী বললে, শুনবেন? শুনলে আপনি চমকে উঠবেন, সূর্যবাবু।

অনুপম--কোন্ অনন্ত চাটুজ্জে? নিশিকান্তবাবুর......।

চন্দ্রবাবু--হ্যাঁ, নিশি উকীলের শালা অনন্ত চাটুজ্জে। বৈজু কালয়ারের দোকানে খাতা লিখতো যে অনন্ত। সেই অনন্ত বললে, ওর নাগপুর অফিসের জন্যে একজন ম্যানেজার চাই।

অনুপম--তার মানে?

চন্দ্রবাবু--তার মানে তাই। অনন্ত ওর নাগপুর অফিসের জন্য একজন ম্যানেজার খুঁজছে। পাঁচশো টাকা মাইনে দিতে রাজী আছে।

সূর্যবাবু--আমাকেও কে যেন বললে, অদ্ভুত উন্নতি করে ফেলেছে অনন্ত। কিন্তু বুঝতে পারি না, পুরনো লোহার হিসেব লিখে হাত পাকিয়েছে যে অনন্ত সে কি করে কাঁচা চামড়ার এত বড় একটা কারবার জমিয়ে তুললো।

চন্দ্রবাবু--বুঝতে না পারবার তো কিছু নেই, যুদ্ধের বাজারে কারবার করতে তো কোন অভিজ্ঞতার দরকার হয় না। একবার ধরতে পারলেই হলো।

সূর্যবাবু--খুব খাঁটি কথা। তা না হলে অবিনাশের মত একজন প্রফেসর মানুষ, যে-মানুষ জীবনে কোনদিন ধান-চালের চেহারা চোখে দেখেছে কিনা সন্দেহ, সে-মানুষ হঠাৎ কেনই বা চালের কারবার ধরবে আর এক মাসের মধ্যে দুটো গাড়ি কিনে ফেলবে? সবই কেমন-যেন ওলট-পালট হয়ে গেল।

চন্দ্রবাবু--ব্যাপার দেখে সত্যিই এক-এক সময় আমার বেশ হাসি পায়' হেসেও ফেলি। দেখতে পেয়ে গৃহিণী কেমন-যেন একটু সন্দেহ করে বসেন আর জিজ্ঞাসাও করেন--হাসছো

কেন? এ কী রকমের হাসি!

হেসে ফেলে অনুপম।—আপনি কী জবাব দেন?

চন্দ্রবাবু ঘাড় নাড়েন—বলতে পারতাম অনুপম ; কিন্তু বলা কি উচিত হবে? তুমি যে বয়সে আমার চেয়ে অন্তত পনের বছরের জুনিয়র।

সূর্যবাবু হাসেন—অন্তত এটুকু তো বলতে পারেন যে, আপনার জবাবের পর ভদ্রমহিলা খুব সন্তুষ্ট হয়ে হেসে ফেলেন।

চন্দ্রবাবু—হ্যাঁ, এটুকু স্বীকার করতে আর বলতে আমার কোন আপত্তি নেই, বয়সটা যা-ই হোক না কেন।

অনুপম—আমিও এই সেদিন অনন্ত চাটুজ্জের মত একজনের দেখা পেয়ে গেলাম।

সূর্যবাবু—কে? কে?

অনুপম—আমারই সঙ্গে পড়তো, বোধ হয় রিষড়ে কিংবা বৈদ্যবাটিতে বাড়ি। মানিক মজুমদার সেই সেকেণ্ড ইয়ারেই লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কোথায় যে চলে গেল, কিছুই জানতাম না। কোনদিন আর দেখা-সাক্ষাতও হয়নি। দেখা হলো এই সেদিন। সন্ধ্যেবেলা হেদুয়ার কাছে ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ একটা গাড়ি এসে আমার কাছেই থেমে গেল। গাড়ির ভেতর থেকে নেমে এল মানিক মজুমদার। বললে, চিনতে পারছো? চিনতে অবশ্য একটু দেরি হয়েছিল।

চন্দ্রবাবু—রিষড়ের অক্ষয়বাবুর ভাই, সেই মানিক নয় তো?

অনুপম—তা জানি না, হতে পারে। যে-ই হোক, বোম্বাইয়ে একটা আর কলকাতায় দুটো বাড়ি কিনেছে। বছরের ছ' মাস বোম্বাইয়ে থাকে মানিক। মিলওয়ালার মেয়ে, এক গুজরাটি মহিলাকে বিয়ে করেছে।

সূর্যবাবু—বুঝলাম। কিন্তু এর মধ্যে খুব বেশী আশ্চর্য হবার কী আছে?

অনুপম—মানিক মজুমদারের কারবার হলো, যুদ্ধের অর্ডারের খুব সাধারণ রকমের একটা জিনিস সাপ্লাই করা।

সূর্যবাবু—ব্যাং-ট্যাং নয় তো? শুনেছি হানিফ মিঞা শুধু এক রামগড়ের ক্যাম্পে ব্যাং সাপ্লাই করে লাখ টাকা লাভ করেছে।

অনুপম—না। মানিক মজুমদারের কাজ হলো ব্যাণ্ডেজের কাপড় সাপ্লাই করা।

চন্দ্রবাবু হাসতে থাকেন।—ভাগ্য! একেই বলে ভাগ্য!

সূর্যবাবু—ভাগ্য নয় মশাই। বলুন সুযোগ। সুযোগ সব সময় আসে না। যারা সুযোগ বুঝে কাজ করতে জানে, তারাই এগিয়ে যেতে পারে।

চন্দ্রবাবু—আরে মশাই, ওই সুযোগেরই নাম ভাগ্য। টাইম অ্যাণ্ড টাইড বুঝে কাজ করে যাও, ব্যস্।

অনুপম হেসে ফেলে—আমিও তাই বলি।

চন্দ্রবাবু মাথা নাড়েন—একটু বুঝে বল, অনুপম। ভাগ্য বলে একটা ইয়ে...একটা অদ্ভুত কিছু না থাকলে গিরিডির সমর ঘোষের অবস্থাটা এক সপ্তাহের মধ্যে ঝলমল করে উঠতো না।

অনুপম—আমি তো শুনেছি, ভদ্রলোকের অবস্থা এখন খুবই কাহিল।

চন্দ্রবাবু—এখন কাহিল ; সেটাও ভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু আগে কী ছিল? কী থেকে হঠাৎ কী হয়ে গিয়েছিলেন সমর ঘোষ?

সূর্যবাবু—অভ্রের একটা খনি ধরেছিলেন।

চন্দ্রবাবু—দু' শো দশ টাকা দিয়ে জমিদারের কাছ থেকে জঙ্গলের একটা গর্তের উপরচালা করবার ইজারা নিয়েছিলেন, মাত্র এক বছরের জন্য। গর্তের মাটি খুঁড়তে আর পাথর ফাটাতে

মজুর আর বারুদের জন্য সমব ঘোষের দেড়শো টাকাও খরচ করতে হয়নি। পাঁচটাও দিন পার হয়নি, হঠাৎ বেরিয়ে পড়লো স্পেশ্যাল ফার্স্ট ক্লাস ঝকঝকে অভ্রের বিরাট একটা পকেট। এক লট মালেই দেড় লক্ষ টাকা পেয়ে গেলেন সমর ঘোষ।

অনুপম--কিন্তু ভদ্রলোকের অবস্থাটা আবার কাহিল হয়ে গেল কেন? সেটা জানেন কি?

চন্দ্রবাবু--খুব জানি। জমিদারের সঙ্গে মামলা বেধে গেল। তিন বছর মামলা লড়ে শেষে হেরে গেলেন সমর ঘোষ, খাদটা হাতছাড়া হয়ে গেল।

অনুপম--কিন্তু হেরে গেলেন কেন?

চন্দ্রবাবু--শুনেছি, মামলা চালাতে কি-যেন বেশ বোকারকমের একটা ভুল করে ফেলেছিলেন ভদ্রলোক।

হেসে ওঠে অনুপম--তাই বলুন। ভুল করেছিলেন সমরবাবু ; ঠিক সুযোগ বুঝে কাজ করতে পারেননি। কিন্তু সুযোগ বুঝে, সময় বুঝে, একটু সাবধান হয়ে আর একটু বুদ্ধি খরচ করে যদি কাজ করতেন, তবে মামলাতে ভদ্রলোকের ও-রকমের একটা বিশ্রী হার হতো না।

ঘরে ঢোকে রামপ্রসাদ। অনুপমের হাতের কাছে একটা কামিজ এগিয়ে দেয়।

হেসে ফেলেন সূর্যবাবু।--আমিও বয়সে অনুপমের চেয়ে দশ বছরের সিনিয়র। নইলে একটা কথা এখনই বলে দিতে পারতাম।

চন্দ্রবাবু--বলতে আর কী বাকি রাখলেন?

সূর্যবাবু--সত্যিই, লজ্জা পেলে নাকি অনুপম?

অনুপম হাসে--পাইয়ে দিলেন যখন, তখন তো আর না পাওয়ার কোন কথা উঠতে পারে না।

চায়ের দুটো শূন্য পেয়ালার দিকে হাত বাড়ায় রামপ্রসাদ।

চন্দ্রবাবু বলেন--ভাই রামপ্রসাদ, দুই অতিথিকে এখন দু' পেয়ালা চা এনে দিলে তোমার অনেক পুণ্যি হবে।

চায়ের কাপ হাতে তুলে নিয়ে হাসে আর চলে যায় রামপ্রসাদ। সূর্যবাবু তাঁর হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হাঁফ ছাড়েন--কিন্তু কই? সে ভদ্রলোক তো এখনও...।

সূর্যবাবুর চিন্তার কথাটা শেষ হলো না। সে ভদ্রলোক এসেই পড়েছেন। ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাসছেন। চমৎকার কোষ্ঠী-বিচার করেন যিনি, সেই নাম-করা জ্যোতিষী কুলদা পণ্ডিত।

ঘরে ঢুকেই হাতের ঝোলার ভিতর থেকে দুটি কোষ্ঠীপত্র বের করে টেবিলের উপর রাখেন কুলদা পণ্ডিত। একটি চন্দ্রবাবুর, একটি সূর্যবাবুর কোষ্ঠীপত্র।

সূর্যবাবু বলেন--তোমার কোষ্ঠীপত্রটা একবার নিয়ে এস, অনুপম। পণ্ডিত মশাই একবার দেখুন আর বলুন।

অনুপম হাসে--আমার কোষ্ঠীপত্র নেই।

চন্দ্রবাবু--তবে শিগগির করিয়ে ফেল।

অনুপম--পণ্ডিত মশাইকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই, কিছু যদি মনে না করেন।

কুলদা পণ্ডিতের শান্ত ও সৌম্য চেহারাব মধ্যে তাঁর মুখের হাসিটা অদ্ভুত রকমের স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে।--বলুন, আমি কিছুই মনে করবো না।

অনুপম--কোষ্ঠীপত্র করিয়ে আমার কি কোন সুবিধা হবে? কোন লাভ হবে?

কুলদা পণ্ডিত--হবে।

--কী সুবিধা? কী লাভ?

--আপনি আপনার ভবিষ্যৎ আর ভাগ্যটাকে খুব স্পষ্ট করে বুঝতে পারবেন।

--কিন্তু ওটা বুঝেও কোন লাভ হবে কি?

--সেটা আপনি বুঝে দেখুন। আমি যা করতে পারি, শুধু তাই বললাম।

চন্দ্রবাবু চেঁচিয়ে ওঠেন।--ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনি অনুপমের একটা কোষ্ঠীপত্র করে দিন, পণ্ডিত মশাই।

সূর্যবাবু--যুদ্ধের ফল শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে, পণ্ডিত মশাই? হিটলার জিতবে?

কুলদা পণ্ডিত--বলতে পারতাম। কিন্তু আমার মনে একটা খটকা আছে। হিটলারের জন্মকালের রাশি-নক্ষত্রের যে খবর কাগজে বের হয়েছে, সেটা ঠিক নয় বলে আমার বিশ্বাস। আমার হিসাবে মিলছে না। তবু চেষ্টা করছি, দেখি, ধরতে পারি কি না।

চন্দ্রবাবু--আমাদের ইণ্ডিয়ার অবস্থা কী দাঁড়াবে? স্বাধীন হতে পারবে কি?

কুলদা পণ্ডিত--এটা বলা যায় গ্রহবিচার করে। সেটা করছি। এখনও শেষ হয়নি।

সূর্যবাবু--আপনি তো কররেখাও বিচার করেন।

কুলদা পণ্ডিত--হ্যাঁ।

চন্দ্রবাবু--তবে আমাদের অনুপমের হাতটা এখুনি একবার দেখে দিন।

হেসে ফেলে অনুপম, কিন্তু ডান হাতটাকে টান করে টেবিলের উপর পেতে দিতেও দেরী করে না। অনুপমের হাতের রেখাগুলির দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকেন কুলদা পণ্ডিত।--অদ্ভুত হাত। ভাল হাত।

অনুপম--কী দেখছেন, বলুন।

কুলদা পণ্ডিত--অনেক কিছুই দেখছি। মেঘও আছে তারাও আছে। তবে মেঘ খুব কম, তারাই বেশী।

অনুপম--খুব খারাপ মেঘ?

--না। দু-তিনবার একটু দুশ্চিন্তার কষ্ট সহ্য করতে হবে, এই মাত্র। কিন্তু যে-কথাটা আগেই বলতে চাই, সেটা বলে ফেললে লজ্জা পাবেন না তো?

চন্দ্রবাবু ব্যস্তভাবে চেয়ার থেকে উঠেই দাঁড়ালেন, আর, হাসতে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন--আপনি বলেই ফেলুন পণ্ডিত মশাই ; অনুপম যদি লজ্জা পায় তো পাক।

খুব লজ্জাকুণ্ঠিত স্বরে কথা বলেন কুলদা পণ্ডিত--যাকে বলে, অনবদ্য অনবচ্ছিন্ন ও অপরাহত গৃহসুখ।

সূর্যবাবু--কী আশ্চর্য, এই কথাটা বলতে আপনি একেবারে লজ্জায় ভেঙে পড়লেন, পণ্ডিত মশাই?

কুলদা পণ্ডিত--তৃঠিক বুঝিয়ে বলতে পারলাম না বোধ হয়।

চন্দ্রবাবু--তবে একটু বুঝিয়েই বলুন।?

কুলদা পণ্ডিত--অর্থাৎ স্ত্রী-সুখ।

সূর্যবাবু হাসে--অ্যাঁ, সেটা আবার কী?

কুলদা পণ্ডিত--ঐকান্তিকী অনুরাগিণী স্ত্রীর বিশুদ্ধ প্রণয়ের ভোক্তা হোয়ে এঁর জীবন নিয়তসুখে চমৎকৃত হবে।

চন্দ্রবাবু--তাহলে আমরা দুজনে কি স্ত্রীর অশুদ্ধ প্রণয়ের ভোক্তা?

হেসে ফেলেন কুলদা পণ্ডিত--ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারলাম না বোধ হয়। আপনাদেরও অপরাহত স্ত্রীসুখ। শুধু দু'একবার স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে সামান্য একটু ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার, একটু ক্ষণভ্রান্তিযোগ আছে।

সূর্যবাবু--আপনি কী এমন নতুন কথা বললেন, পণ্ডিত মশাই। ক্ষণভ্রান্তিযোগ তো লেগেই রয়েছে, প্রায় রোজই। মন দিয়ে একটা নভেল পড়ছি দেখতে পেলেই মহিলা সন্দেহ করেন, লোকটার চরিত্তির বুঝি খারাপ হয়েছে।

কুলদা পণ্ডিত--ওই ওই, ওই রকমের সামান্য একটু-আধটু ভুল উষ্মা ; তার বেশি কিছু

নয়। কিন্তু অনুপমবাবুর জীবনে ওটুকুও নেই। অনুপমবাবুর জীবনে স্ত্রী হলেন রসশাস্ত্রের মুগ্ধা নায়িকার মত নারী।

চন্দ্রবাবু—তার মানে, স্বামী রাত করে বাড়ি ফিরলেও কখনও জিজ্ঞেস করবে না, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

কুলদা পণ্ডিত—হ্যাঁ তাই। কিন্তু আপনারা আমার কথাগুলিকে এত লঘুভাবে নিচ্ছেন কেন? স্বামীভাগ্যে চিরকাল সুখী থেকে, শেষে স্বামীর কোলে মাথা রেখে, আর স্বামীরই মুখের দিকে একবার হাসিমুখে তাকিয়ে নিয়ে মরে যাবেন, এরকম এক সৌভাগ্যবতী নারীর স্বামীর কররেখার মধ্যে...এই দেখুন একবার অনুপমবাবুর হাতের দিকে একবার তাকিয়ে, ঠিক যবশীর্ষের মত দেখতে এইরকম একটি রেখা থাকে।

সূর্যবাবু হাসেন—বোঝা গেল, অনুপমের একদিন বিপত্নীক হতে হবে, আর আমরা দুজনে চিরকাল সপত্নীক থেকে মরে যাব। এই তো?

কুলদা পণ্ডিত হাসেন—হ্যাঁ।

সূর্যবাবু—মন্দ কি? আপনি কী বলেন, চন্দ্রবাবু?

চন্দ্রবাবু—একটুও মন্দ নয়। খুব ভাল।

অনুপমের হাত ছেড়ে দিয়ে এইবার অনুপমের মুখের দিকে তাকান কুলদা পণ্ডিত।—আপনার হাতে যা দেখলাম, ঠিক তার উল্টোটি দেখেছিলাম আর একজনের হাতে।

অনুপম—বেচারা!

কুলদা পণ্ডিত—প্রায় তিন বছর আগে একদিন পার্ক-সার্কাসে ইউ পি'র করমপুর স্টেটের কুমারসাহেবের বাড়িতে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কুমারসাহেবের ছেলেদের পড়াতেন ওই ভদ্রলোক। বেশ বিদ্বান মানুষ, গুণী মানুষ, ছাত্রজীবনে দুবার সোনার মেডেল পেয়েছেন। বয়সেও, ধরুন, আপনার চেয়ে কিছু ছোট কিংবা বড়। দেখতে শুনতেও বেশ। খুব সুখী আর খুশি চেহারা। সে ভদ্রলোকের হাত একবার দেখে নিয়েই আমি বলে দিয়েছিলাম—আপনার সব হবে, শুধু স্ত্রীসুখ হবে না। আপনি বিয়ে করলে ভুল করবেন। কারণ, আপনি কোনদিন হয়তো একটা নতুন কোহিনুর কুড়িয়ে পেতে পারেন, কিন্তু নারীর ভালবাসা কোনদিন পাবেন না।

অনুপম—কথাটা মুখের ওপর বলে দিতে পারলেন?

কুলদা পণ্ডিত—আমি প্রথমে কিছুই বলতে চাইনি। কিন্তু ভদ্রলোক যখন নিজেই বেশ একটু গর্ব করে বললেন, যা বলতে চান, বলেই ফেলুন না কেন, ভয় করছেন কেন, তখন বলেই দিলাম।

চন্দ্রবাবু—আপনার কথা শুনে ভদ্রলোক কী বললেন?

কুলদা পণ্ডিত—শুধু হাসলেন আর বললেন, আমি বিয়ে করেছি।

সূর্যবাবু—ভুলটা তাহলে আগেই করে রেখেছিলেন ভদ্রলোক।

কুলদা পণ্ডিত—হ্যাঁ, কিন্তু আমার গণনার ভুল ধরতে চেষ্টা করবেন না, সূর্যবাবু। কালই সন্ধ্যাবেলা সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে হঠাৎ আমার দেখা হয়ে গেল। বুঝলাম, আমার গণনা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছেন?

চন্দ্রবাবু—কী বললেন ভদ্রলোক?

কুলদা পণ্ডিত—ভদ্রলোক ভাঙেন তো মচকান না। বিষণ্ণ হতাশ শুকনো একটা মুখ ; তবু জোর করে হাসলেন। বললেন, হ্যাঁ, মনে পড়েছে ; আপনি অনেকদিন আগে একটা অদ্ভুত কথা বলেছিলেন। বলতে বলতে আর পাগলের মত হাসতে হাসতে ভদ্রলোক চলে গেলেন।

অনুপমের হাতের কলম যেন অনুপমের চোখেরই মত খুব খুশি হয়ে আর ব্যস্ত হয়ে চেক লিখে ফেলে, এক'শো এক টাকা। কুলদা পণ্ডিতের হাতে চেকটা ধরিয়ে দিয়ে অনুপমের

গলার স্বরও নিবিড় হয়ে হাসে—আসুন, পণ্ডিত মশাই।

কুলদা পণ্ডিত উঠে দাঁড়ান—আমি এখন তবে আসি।

ঘরের মেজেতে একটা মাদুরের উপরে স্তব্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে রুগ্না এক নারীর শরীর। তারই কাছে এগিয়ে এসে আর তারই মাথাটাকে খুব মৃদুভাবে একবার ছুঁয়ে নিয়ে ডাক দেয় অজয়—সরযূ, ডাক্তার এসেছেন।

চোখ মেলে তাকায় সরযূ। ডাক্তারও এগিয়ে আসেন। মেজের উপর নিজেও লুটিয়ে বসে পড়েন, আর রোগিণীর মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। রোগিণীর গলার শুকনো পেশীর উপর আস্তে একবার হাত বুলিয়ে নিলেন ডাক্তার। তারপর ব্যাগ থেকে একটা তরল ওষুধের শিশি আর ছুঁচমুখো সিরিঞ্জ বের করলেন। ইঞ্জেকশন দিলেন। যাবার সময় বলে গেলেন—দু' ঘণ্টা পরে আমার ডিসপেন্সারিতে এসে পেশেন্টের অবস্থার কথা জানিয়ে দিয়ে যাবেন, মশাই।

দুটো ঘণ্টা শেষ হবার আগেই কথা বলে সরযূ—কোথায় গিয়েছিলে? কেন এত ছুটোছুটি করছো?

সরযূর কথার কোন জবাব না দিয়ে সেই মুহূর্তে ঘরের ভিতর থেকে যেন ছুটে বের হয়ে যায় অজয়। ডাক্তারের ডিসপেন্সারিতে গিয়ে খবর জানায়—কথা বলছে পেশেন্ট।

ডাক্তার খুশি হয়ে হাসেন।—সুখবর। তবু বলছি, পেশেন্টকে বেশি কথা বলতে দেবেন না। যা বলবার, তা ওই স্লেট-পেন্সিলেই লিখে বলা ভাল।

ঘরে ফিরে এসে সরযূর হাতের কাছে একটা স্লেট রাখে অজয়। স্লেটের উপর সরযূর ডান হাতটাকে তুলে দিয়ে, হাতের কাছে একটি পেন্সিলও রেখে দেয়।

সরযূর রোগা শুকনো হাতটা কাঁপতে কাঁপতে লেখে—পাপিয়া কোথায়?

অজয় বলে—পাপিয়া ঘুমিয়ে আছে। ঘুম ভাঙুক, তারপর ওকে খাওয়াবো। আমিও খেয়ে নেব।

সরযূ লেখে—ঘরে খাবার আছে?

অজয়—খুব আছে। অনেক আছে। তুমি সেজন্যে একটুও চিন্তা করবে না। আজই সকালবেলা একটিন বিস্কুট এনেছি। দুটো পাঁউরুটি এনেছি। আর একটু পরেই বের হব, আধ সের গরম দুধ কিনে নিয়ে আসবো। তা ছাড়া, তোমারও একটা খাবার আনতে হবে।

সরযূ লেখে—না।

অজয়—না বললে চলবে কেন? ডাক্তার রাগ করবেন। ডাক্তার বলেছেন, তোমাকে এখন গ্লুকোজ খেতে হবে।

মদনমোহনতলার কাছে ঠাকুরবাড়ি লেন। এই লেনের পথে রাত্রির অন্ধকারে কোন-কালেও আলোর উৎপাত ছিল না। শুধু লেনের মুখের কাছে একটা ল্যাম্পপোস্ট আছে। মাসখানেক আগে একটা রাত্রিতে, মাতাল গুণ্ডার মারামারির চোট ওই ল্যাম্পপোস্টের উপরেও পড়েছিল। একটা সোডার বোতল ছুটে গিয়ে ল্যাম্পপোস্টের মাথার উপর আছড়ে পড়েছিল। তাই বাতিটা ভেঙে আর টুকরো-টুকরো হয়ে ঝরে পড়ে গিয়েছে।

ঠাকুরবাড়ি লেনের এই পথে কলকাতার আকাশের চাঁদও এককুচো আলো ছড়িয়ে দিতে পারে না। পথটা খুবই সরু, আর দুপাশের বাড়িগুলির মাথা খুব কম উঁচু নয়। অজয়ের মেয়ে, চার বছর বয়সের ওই পাপিয়াও এই গলির রাত্রির অন্ধকারে গুটগুট করে হাঁটতে পারে। কালও সন্ধ্যাবেলায় একবার হেঁটে হেঁটে গলির মুখের কাছে ওই অন্ধ ল্যাম্পপোস্টের কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল পাপিয়া। দেখতে চেয়েছিল, বাবা বাড়ি ফিরে আসছে কিনা। আর, দেখতে পেয়েই হেসে ফেলেছিল, সত্যিই বাবা আসছে।

—ছি পাপিয়া, তুমি আবার একানে এসে দাঁড়িয়েছ কেন? হেসে হেসে আর মিষ্টি করে একটা ধমক দিয়েই পাপিয়াকে কোলে তুলে নেয় অজয়। পাপিয়ার পায়ের ধুলো এক হাতে মুছে দিয়ে আবার সেই পায়েরই উপর হাত বোলায় অজয়। মেয়েটার পায়ের পাতা দুটো কেন যে এই একটা মাস ধরে এরকম ফোলা-ফোলা হয়ে রয়েছে, কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না। অনেক দিন আগে ডাক্তার বলেছিলেন, এ মেয়ের পুষ্টির খুব অভাব। এখুনি আপনার একটু সাবধান হওয়া দরকার, মশাই। ফল আর দুধ একটু বেশি করে খাওয়াবেন।

চেষ্টা তো করা হচ্ছে। মাঝে মাঝে পাপিয়ার ফল আর দুধও যোগাড় করতে পারা যাচ্ছে। কিন্তু মনে হয়, আরও চাই।

কিন্তু ওই ফল আর দুধ যেন মেয়েটার চক্ষুর বিষ। খেতেই চায় না। খাওয়াতে গেলে চেঁচিয়ে ওঠে। ওর লোভ শুধু ভাতের উপর। বেগুনভাজা হলে তো রক্ষেই নেই ; মাঝ রাতেও ঘুম থেকে জেগে উঠে ভাত খাওয়ার জন্যে বায়না ধরে।

ঠাকুরবাড়ি লেনে আর যারা থাকে, তাদের চোখে এই অজয়বাবু একটি অদ্ভুত রহস্য। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলেই তো বোঝা যায় ; বেশ শিক্ষিত বিদ্বান মানুষ। সুমন্ত নামে ছেলেটি, কলেজে পড়ে যে ছেলে, সে তো অনেকদিন আগে অনেকেরই কাছে বলে বলে একটা অদ্ভুত সত্য কথার বিস্ময় ছড়িয়ে দিয়েছে। এই অজয়বাবু একজন ভাল স্কলার, গোল্ড মেডালিস্ট।

কী আশ্চর্য, রেকম একজন বিদ্বান মানুষ এত গরীব হয়ে ঠাকুরবাড়ি লেনের সব চেয়ে রোতো একটা ঘরের ভাড়াটে হয়ে পড়ে আছে কেন?

একটা সন্দেহকেও সুমন্ত রটিয়েছিল। ভদ্রলোক বোধহয় একজন খুব বড়লোকের পলাতক ছেলে। বাপের উপর রাগ করে এমন এক জায়গায় এসে লুকিয়েছে, যেখানে চোখ পড়লে পুলিসের বাবাও সন্দেহ করতে পারবে না যে, মোষের খাটালের পাশে একটা ঘরে কোন বড়লোকের ছেলে লুকিয়ে থাকতে পারে।

সুমন্তর বাবা ইন্দ্রবাবু কিন্তু অন্যরকমের একটা সন্দেহ রটিয়েছেন। ওরা কি সত্যিই সত্যিকারের স্বামী আর স্ত্রী?

না মশাই, না। হতেই পারে না। ব্যাপারটা নিশ্চয়, ওই যাকে বলে, ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে। আগে ফেঁসেছে, তারপর বেধেছে, তারপর পালিয়ে এসে লুকিয়েছে।

ইন্দ্রবাবুর রূঢ় সন্দেহটা নিজের ইচ্ছামত কল্পনা করে অনেক বাজে কথা রটিয়েছে বটে ; কিন্তু সব সত্যি কথা জানতে পারলেও তিনি বোধহয় বলবেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই একই ব্যাপার ; এমন কিছু ভুল কথা বলিনি।

পুলিসের সেই চমৎকার অফিসার বসন্ত দত্ত, আর, তাঁর দাদা আশু দত্ত শ্রীনগরে যাঁর ওষুধের দোকানের লাভের হিসাবের খাতাটাকে চমৎকার একটা টাকাভারি ভাগ্যের হিসাব বলা যায় ; তাঁদের দুজনের কেউই আজ বলতে পারবেন না, এখন কোথায় আছে আর কী অবস্থায় আছে, তাঁদের একমাত্র বোন, যার নাম সরযূ। তাঁরা শুধু জানেন যে, নিতান্ত একটা অপদার্থকে বিয়ে করেছে সরযূ, আর কলকাতাতেই আছে। কত করে বোঝানো হলো, তবু বুঝলো না। আদর করে বলা মিষ্টি কথার যত অনুরোধে ; সবই বিফল হলো। ধমক দিয়ে আর ভয় দেখিয়েও কোন লাভ হলো না। করমপুর স্টেটের এক কুমারসাহেব, কীই বা তার আয়! দেনার দায়ে সাতপুরুষের সাতটা তরবারির সোনার খাপ বেচে দিয়েছে, তবু দেনা শোধ হয়নি। এহেন অপদার্থ এক কুমারসাহেবের বাড়িতে বাচ্চা ছেলেদের প্রাইভেট টিউটর, এক'শো টাকা মাইনে পায়, এরকম একটা মানুষকে বিয়ে করতে কেমন করে যে রুচি হলো সরযূর মত মেয়ের, সেটা বোধহয় পাগলের চিকিৎসার ডাক্তারেরাই ঠিক-ঠিক কিছুটা বলতে পারেন।

ছাত্রজীবনে দু'বার দুটো সোনার মেডেল পেয়েছে আর খুব লেখা-পড়া শিখেছে ; এ ছাড়া অজয় সরকারের জীবনের আর সবই যে ফাঁকা আর ফাঁকি। বাপ নেই, মা নেই, ভিটে-মাটি নেই ; একটা অনাথ গেঁয়ো ছেলে কলকাতাতে এক কুটুমবাড়ির দয়াতে ভাত খেয়ে বেঁচেছে আর খুব ভাল করে বি-এ পাস করেছে। ওর ছাত্রজীবনের সেই সোনার মেডাল দুটো কি এখনও আছে? নেই ; মেসের বকেয়া পাওনার টাকা শোধ করতে গিয়ে সেই অপদার্থের জীবনের ওই সামান্য ও ছোট্ট দুটো সোনার টুকরোও কবেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

অজয়ের বিদ্যের রূপ দেখে সরযূর মত মেয়ের মুগ্ধ হবারই বা কী আছে? সরযূও তিনবার ফার্স্ট হয়েছে। সোনার মেডাল না-ই বা পেল সরযূ, ওর কানের একজোড়া সোনার দুলের দাম যে অজয়ের দুটো মেডালের সোনার দামের চেয়ে অন্তত দুই গুণ বেশি হবে।

কলকাতাতে যতদিন কলেজ খোলা থাকে, ততদিন কলকাতাতে ; আর, কলেজ বন্ধ হলেই কাশ্মীরের শ্রীনগরে ; সরযূর জীবনটা যেন একটা শখের নিয়মে চলাফেরা করে। ঠিকই, একটা শখ বইকি। সেটা কিন্তু বড় দাদা আর ছোট দাদার দুজনের একজনও ঠিক বুঝতে পারেন না। তাই ছোট দাদা, রায়সাহেব বসন্ত দত্ত বলেন,—এত ভাল ভাল সাবজেক্ট থাকতে তুই বোটানি নিতে গেলি কেন?

—তুমিই বল, কী সাবজেক্ট নিলে ভাল হতো।

—রুল ব্রিটানিয়া রুল দি ওয়েভস্‌।

—ওরকমের কোন সাবজেক্ট নেই।

—নেই? সিলেবাসের মধ্যেও কি ওরা ঢুকে বসে আছে?

—জানি না। আমি কিন্তু ছুটিতে কাশ্মীর যাবই।

—কাশ্মীরেই বা এত দেখবার কী আছে?

বড়দাদা আশু দত্ত বলেন—তুই যদি এখানে এসেও ঘরে বসে থাকিস, আর যত কবিতার বই পড়ে সময় নষ্ট করিস, তবে এখানে এলি কেন? একটু বেড়িয়ে আয়।

বেড়িয়ে আসতে ভালই লাগে। চশমাশাহী আর নিশাতবাগের নতুন-ফোটা ফুলগুলিকে দেখতেও ভাল লাগে। সিটি থেকে বেশ দূরে, ঝিলমের স্রোতের কাছে দাঁড়িয়ে নিকটের একটা পাহাড়ের গায়ে আপেলের ফুলের সাদাটে শোভা দেখতেও মন্দ লাগেনি। কিন্তু আর কত ভাল লাগবে? তার চেয়ে অনেক বেশি ভাল লাগে ঘরে বসে কবিতার বই পড়তে। কলকাতাতে গিরিজাবাবু, যিনি বাড়িতে এসে সরযূকে পড়িয়ে যান, তিনি সরযূর টেবিলের উপরে একদিন একটা ছড়ার বই দেখতে পেয়েই খুব রাগ করেছিলেন।—তুমি তবে বোটানি নিলে কেন, যখন কাব্যে-টাব্যে তোমার এত শখ?

সরযূ—এটা ভুলুর ছড়ার বই, আমার নয়।

গিরিজাবাবু তখনি টেবিলের একপাশে রাখা সরযূর কলেজের পড়ার বইয়ের একটা গাদার ভিতর থেকে টেনে টেনে আর বেছে বেছে চারটে বই বের করেন। থেরীগাথা, বলাকা, লাইট অব এশিয়া, শকুন্তলা।

—এগুলোও কি ভুলুর বই?

শখটা যেন সরযূর রক্তমাংসেরই একটা মরজি। কবিতা মুখস্থ করবার জন্যে রাত জাগতেও সরযূর ভাল লাগে।—গগনে অব ঘন মেহ দারুণ, সঘন দামিনী ঝলকই। তখন সত্যিই মাঝরাতের বৃষ্টির জল ঝড়ো হাওয়ার ঝাপটা লেগে রায়সাহেব বসন্ত দত্তের কলকাতার বাড়ির একটি ঘরের বন্ধ জানালার কাচের উপর আছড়ে পড়ছে। রাউণ্ড থেকে ফিরে এসে বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে রায়সাহেব বসন্ত দত্তের দুই চোখ ওই বন্ধ জানালার কাচের আলোর দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারে, তাঁর খামখেয়ালী বোনের মাথায় এতদিনে একটু দায়িত্ববুদ্ধি জেগেছে ; রাত জেগে পরীক্ষার পড়া পড়ছে সরযূ।

সে মেয়ের খামখেয়াল যে একদিন এত ভয়ানক রকমের একটা চেহারা নিয়ে দেখা দেবে, সেটা দুই দাদার একজনও কখনও কল্পনা করতে পারেননি। কলকাতা থেকে শ্রীনগরে বেড়াতে এসেছিল সরযূর কে-না-কে এক বান্ধবী। কিন্তু সেই বান্ধবী বেচারীর কোন দোষ নেই। এক মাস হলো বিয়ে হয়েছে, তাই বরের সঙ্গে বেড়াতে বের হয়ে শ্রীনগর এসে ডাল লেকের একটা হাউসবোটে ছিল। সরযূ তখন শ্রীনগরে ছিল বলেই চিঠি দিয়ে সরযূকে হাউসবোটের ঠিকানা দিয়েছিল আর চা খেতে নেমন্তন্নও করেছিল। বাস্, তারপর কেমন করে কী যে হলো, কিছুই ধরতে বুঝতে পারা গেল না। শুধু জানতে পারা গেল, সরযূ ওর ভাগ্যের মাথা চিবিয়ে খাওয়ার জন্যে গোঁ ধরে বসেছে। ওই হাউসবোটেই তো অপদার্থটার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল সরযূর।

আজ সেই সরযূর জন্যে গ্লুকোজ কিনতে যাবে বলে এখন কলকাতার ঠাকুরবাড়ি লেনের খাটাল-ঘেঁষা একটা ঘরে, খাটের বিছানার একটা বালিশের তলা থেকে টাকা বের করেছে, তবু সরযূর মুখের দিকে তাকিয়ে আর চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে যে, সে কিন্তু সবই জানে, কিছুই ভুলে যায়নি। সবচেয়ে আশ্চর্য, আজও একবার ভোর হতেই সরযূ যখন কোনমতে হাত নেড়ে ইশারায় বলেছিল, জানালাটা খুলে দাও ; ঠিক তখন জানালাটা খুলে দিয়েই আর সরযূর মাথায় হাত বুলিয়ে গল্প করতে চেষ্টা করেছে অজয়—মনে আছে তো তোমার, সেদিন তখন......কী যেন সেই হাউসবোটের নামটা, হ্যাঁ, হামেশা বাহার ; আকাশে একটুও কুয়াশা ছিল না।

হামেশা বাহার, একটি চমৎকার সৌখীন হাউসবোট। সেই হাউসবোটের এদিকের ঘরের অতিথি ছিলেন যাঁরা, তাঁরা হলেন সরযূর বান্ধবী রমলা ও তার স্বামী সঞ্জয়বাবু। ওদিকের ঘরে অতিথি ছিলেন চারজন ; একজন অবাঙালী কুমারসাহেব, তাঁর দুই বাচ্চা ছেলে আর ঢিলে-ঢালা ফ্লানেলের পায়জামা পরা একজন। ওই ঢিলে-ঢালা পায়জামা পরা লোকটি তখন হাউসবোটের লাউঞ্জের একটি সোফায় বসে হিন্দী খবর-কাগজ পড়ছিলেন। আর, দূরের সোফাটার উপরে রমলার পাশে বসে ফিস-ফিস করে গল্প করছিল সরযূ। গল্প করতে করতেই চেঁচিয়ে হেসে উটলো সরযূ।—খোঁপার ফুল কি হাতে ধরিয়ে দিতে হয়? বুকে না হোক, অন্তত বুক-পকেটে গুঁজে দিতে পারতে।

তারপর আর অত জোরে না চেঁচিয়ে, বরং গলার স্বর একটু মৃদু করে নিয়ে সরযূ বলে—বরও যখন নিজেই যেচে তোমাকে বর দিতে চাইছেন, তখন তুমিই বা চাইতে ছেড়ে দেবে কেন?

রমলা—কিন্তু কী যে ছাই চাইবো, বুঝতে পারছি না।

সরযূ—তবে বলবো? শিখিয়ে দেব, কী চাহিতে হবে?

রমলা—বল।

সরযূ—এই বর দেহ মোরে, সদা যেন দেখু তোরে, আর কোন নাহিক বাসনা। এই সুখমণি দিবা, আপন নিকটে নিবা...। এ কী হলো, শেষটা মনে আসছে না কেন?

ঢিলে-ঢালা ফ্লানেলের পায়জামা, সেই লোকটা হাতের হিন্দী খবর-কাগজ নামিয়ে রাখে, আর হেসে-হেসে সরযূর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে।—এই সুখমণি দিবা, আপন নিকটে নিবা, তোমা মিলায় তোমার করুণা।

চমকে ওঠে সরযূ, লজ্জা পায় ; সে লজ্জায় মুখটাও লাল হয়ে যায়। তারপর অজয়ের সঙ্গে কথাও বলে। সে কথাও যেন নিজেরই মনের একটা বিস্ময়ের মত এলোমেলো কথা।—আপনি এরকম আশ্চর্যভাবে এখানে কেমন করে এলেন?

অজয়—আমি এই কুমারসাহেবের ছেলেদের টিউটর। কলকাতা থেকে এসেছি।

সরযূ—কলকাতাতেই থাকেন?

অজয়--হ্যাঁ।

তারপর কেমন করে কী যে হলো, তার অনেক খবর রমলা আর রমলার স্বামী সঞ্জয়ও জানে। এরা দুজনেও সরযূকে বুঝিয়ে বলতে আর নিরস্ত করতে কিছু কম চেষ্টা করেনি। কিন্তু কিছুই বুঝতে চায়নি সরযূ। শ্রীনগর থেকে কলকাতাতে ফিরে এসে সরযূ ওই অজয়েরই কাছে পুরো দুটি বছর ধরে ওর যত স্বপ্নের চিঠি পাঠিয়েছে।

খুব ভয় পেয়েছিল রমলা, যেদিন রমলারই বাড়িতে অজয় আর সরযূর বিয়ে হয়ে গেল। সঞ্জয়, সঞ্জয়ের ভাই নির্মল আর রমলা, তিনজনেই মুখ কালো করে রেজিস্ট্রারের সামনে বসে বিয়ের সাক্ষী হয়ে খাতায় নাম সই করেছিল। তখন শ্রীনগরের আশু দত্ত আর কলকাতার লেক রোডের বসন্ত দত্ত, দুজনের কেউই জানতেও পারেননি যে, তাঁদের একমাত্র বোনের বিয়ে হয়ে গেল।

রায়সাহেব বসন্ত দত্ত জানতে পারলেন, বিয়ের দশ ঘণ্টা পরে, সরযূ নিজেই যখন টেলিফোনে খবরটা জানিয়ে দিল আর ক্ষমা চাইতে গিয়ে কেঁদে ফেললো। শ্রীনগরের আশু দত্ত জানলেন, বিয়ের সাত দিন পরে।

না, দুই দাদার কেউই আর সরযূকে ক্ষমা করতে পারেননি। দুজনেই বলেছিলেন, আর যেন ওর মুখ দেখতে না হয়। রমলার স্বামী সঞ্জয়ও খুব দুঃখিত হয়ে আক্ষেপ করেছিল, কবিতা নিয়ে ভালবাসাবাসি চলতে পারে, কিন্তু পেট চলতে পারে না। তোমার বন্ধু কিন্তু এই সোজা কথাটা একেবারেই বুঝতে চাইল না, রমলা।

রমলার অবশ্য আরও কয়েকবার সরযূর মুখ দেখতে হয়েছে। এক বছরের মধ্যে তিনবার দেখা হয়েছিল। শেষ যেবার দেখা হলো, সেবার সরযূর মুখের একটা কথা শুনে যেমন একটু আশ্চর্য তেমনই একটু খুশিও হয়েছিল রমলা। সত্যিই, যেন একটা গর্বে ভরা উল্লাসের কথা—আমি চাকরি করছি, রমলা। মেয়ে-স্কুলের টিচার।

রমলা—কোথায় আছ এখন?

সরযূ—বেলেঘাটা।

বলা ভাল, কপালঘাটা। দুটো ছন্নছাড়া বাতিক এক ঠাঁই হয়ে থাকতে পারলেই বেলেঘাটার কোন ঘর একটা স্বর্গ হয়ে যেতে পারে না। প্রাইভেট টিউটর হয়ে ছেলে পড়ানো ছাড়া অজয় সরকারের কপালে আর কোন কাজ জোটেনি। আর, একবছর বয়সের পাপিয়ার কাকলি একটু বেশি মিষ্টি হয়ে উঠতেই সরযূর চাকরিটাও গেল। এক বছরের মধ্যে একশো এগার দিন কামাই, এমন একটা অকর্মণ্যতাকে ভাল-ভাল মায়ার কথা দিয়ে আর কবিতা করে বোঝাতে চেষ্টা করলেও কেউ বুঝবে না, ক্ষমাও করবে না। বেলেঘাটার সেই মেয়ে-স্কুলও ক্ষমা করতে পারেনি। তার পর থেকে সরযূর গলার ভিতরে একটা ব্যথা। এই ব্যথাটাকেও বুঝতে ও চিনতে কোন চেষ্টা না করে পুরো দুটো বছর কাটিয়ে দেবার পর ; আজ এই এক মাস হলো ডাক্তার দেখাবার পর বুঝতে হয়েছে ; ওটা বোধহয় ক্যান্সারের লক্ষণ।

পাপিয়ার জন্য আধসের গরম দুধ, আর সরযূর জন্য এক বোতল গ্লুকোজ এখন এনে ফেললেই তো হয়। আর দেরি করবার তো কোন অর্থ হয় না।

কিন্তু একটু দেরি হয়েই গেল। কারণ, মেজের মাদুরের উপর সরযূর শয়ান শরীরটা আস্তে আস্তে উঠে বসে। অজয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সরযূর চোখ দুটো হাসতেও থাকে। তারপর স্লেটের উপরে লিখেই ফেলে সরযূ—আজ বাইরে যাবার আগে পাপিয়াকে চুমো খেয়েছিলে?

অজয়—হ্যাঁ।

সরযূ লেখে—আমাকে?

অজয় হাসে—নিশ্চয়। তুমি টের পাওনি। তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে।

সরযূর চোখে যেন একটা ধূর্ত হাসির ছায়া কাঁপে।—কপালে খেলে কেন?

অজয়—তাই বল। কপট নিদ্রা।

সরযূ লেখে—আমার কথার জবাব দাও।

অজয়—তোমার ঘুম ভেঙে যাবে বলে ভয় ছিল, তাই শুধু...।

অজয়ের কথা শেষ না হতেই সরযূ লেখে—সত্যি তো?

অজয় হাসে—বাঃ, তোমার কপট ঘুমের জন্য আমিই ঠকলাম ; আর উল্টো আমাকেই তুমি জেরা করছো? সন্দেহ করছো, আমার ভুল?

সরযূ লেখে—ভুল তো একবার করেছিলে।

অজয় আশ্চর্য হয়—কবে? কোথায়? ও হ্যাঁ। বেলেঘাটার বাড়িতে, যেদিন তুমি হাসপাতালে চলে গেলে, সেদিন। তাই না?

সরযূ মাথা নাড়ে—হ্যাঁ।

অজয়—উপায় ছিল না। তুমি দেখতে পাওনি, আমি দেখতে পেয়েছিলাম, পাশের বাড়ির মহিলা তখন একেবারে দরজার কাছে এসে পড়েছিলেন।

সরযূ লেখে—রাত হলো।

বাইরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে অজয়। বোধ হয় হঠাৎ বুঝতে পেরেছে দুজনেই, এখন এভাবে জীবনের যত চুমোর হিসেব করতে থাকলে রাত আরও বেড়ে যাবে। দোকান বন্ধ হয়ে গেলে গ্লুকোজ পাওয়া যাবে না, আধসের গরম দুধও পাওয়া যাবে না।

ঘুমন্ত পাপিয়ার গলার স্বর ঘড়ঘড় করছে। জাগলো নাকি মেয়েটা? এগিয়ে যেয়ে পাপিয়ার বিছানার মাথার কাছে দাঁড়ায় অজয়।—এ কি? পাপিয়া যে সত্যিই চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। কিন্তু এ কী রকমের অদ্ভুত চোখ। আর গলা থেকে ওরকম একটা অদ্ভুত শব্দই বা কেন বের হচ্ছে?

অজয় ডাকে—পাপিয়া!

একটা হেঁচকি তোলে পাপিয়া। খোলা চোখ দুটোও হঠাৎ সাদা হয়ে কাঁপতে থাকে।

অজয় বলে—তুমি একটু চেষ্টা করে হেঁটে এসে পাপিয়ার কাছে একটু বসো, সরযূ। পাপিয়া কেঁদে উঠলে ওকে একটু মিষ্টি কথা বলে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করো। আমি এখনই আসছি।

ঠাকুরবাড়ি লেনের অন্ধকার গায়ে মেখে, আর প্রায় ছুটে ছুটে চলতে থাকে অজয়। আধসের গরম দুধ কেনবার জন্যে নয় ; এক বোতল গ্লুকোজ কেনবার জন্যেও নয়। একজন ডাক্তার ডেকে আনবার জন্য। আর-একটু হলে অন্ধ ল্যাম্পপোস্টের গায়ের উপর পড়ে একটা ধাক্কা খেত অজয়। কিন্তু সামলে নিয়েই আবার চলতে থাকে।

গুপ্তিপাড়ার চৌধুরীদের বাগান, যার নাম রাজার বাগান, তার চারদিকে, আজ নতুন কাঁটাতারের বেড়া। হাজরা মশাই কিনে নিয়েছেন ওই বাগান। লোকে বলে, বাগানটাকে একেবারে জলের দামে পেয়ে গিয়েছেন হাজরা মশাই। কিন্তু হাজরা মশাই বলেন—ডাহা ঠকে গিয়েছি, মশাই।

গুপ্তিপাড়ার বাড়ির বড় ঘরে ; দেয়ালের এক জায়গায় খসে পড়া পলেস্তারার মাঝখানে এখনও সেই বিখ্যাত মেজাজের মানুষ বিজয় চৌধুরীর শক্ত চেহারার রঙীন অয়েল পেন্টিং ঝুলে রয়েছে। বন্দুক হাতে নিয়ে আর হাতীর পিঠের উপর বসে বিজয় চৌধুরী হাসছেন। তিনি যদি আজ ওই ছবির চোখেই দেখতে ও বুঝতে পারতেন যে, তাঁর ছেলে পরেশ চৌধুরী এই দশদিন হলো তিনপুরুষের রাজার বাগান বিক্রী করে দিয়ে পাঁচ হাজার টাকা পেয়েছে, তবুও তিনি হাসতেন। তিনি নিজেও যে ঠিক এই কাণ্ডটি করতেন, যদি আজও

বেঁচে থাকতেন।

দেনার দায় মেটাতে গিয়ে পরেশ চৌধুরীর ওই পাঁচ হাজার টাকার সাড়ে চার হাজারই ব্যাঙ্কের ঘরে চলে গিয়েছে। তিনশো টাকা খরচ করতে হয়েছে আর একটা কাজের দায় মেটাতে গিয়ে। এটাও বলতে গেলে গুপ্তিপাড়ার এই চৌধুরীদের তিন পুরুষের জীবনের একটা মেজাজের কাজ। হাজরা মশাই সবই জানেন, তাই মাঝে মাঝে দুঃখ করে বলেও থাকেন—সাহেব পিটিয়েই ফতুর হয়ে গেল চৌধুরীরা।

এমন কিছু মিথ্যে কথা বলেননি হাজরা মশাই। একটু বাড়িয়ে বলেছেন এই মাত্র। ওই কর্মটি বিজয় চৌধুরীও করতেন। এই পরেশ চৌধুরীও অনেক করেছেন। আর বলাই চৌধুরী তো এখনও করেই বেড়াচ্ছেন। ধর্মতলাতে একটা রাগী গোরা সোলজারকে চড় মেরে বেহুঁস করে দিয়েছিল বলাই, এই বছরেই পূজোর একটা দিনে। গ্রেপ্তার হয়েছিল, জামিনে ছাড়া পেয়েছিল, আর দাঙ্গার মামলার আসামী হয়েছিল বলাই। বলাইকে কড়া ওয়ার্নিং দিয়েছেন আর তিনশো টাকা জরিমানা করেছেন ম্যাজিস্ট্রেট। কালই কলকাতায় গিয়ে জরিমানার টাকা আদালতে জমা করে দিয়েছে বলাই। সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে এসে আর একডালা মুড়ি খেয়ে নিয়েই টাটানগর চলে গিয়েছে। আজকাল টাটানগরে থাকে আর চাকরি করে বলাই। দিন প্রতি মেহনতের দাম পাঁচ টাকা ; একটা কারখানার লেদ-মেশিনের ঘরে কাজ করে ; ওভারম্যান বলাই চৌধুরী।

পরেশ চৌধুরী যে স্কুলের ফোর্থ ক্লাসেই পড়া ছেড়ে দিয়েছিলেন, তার আসল কারণও হলো এই মেজাজ, সাহেব দেখলেই যে-মেজাজ খারাপ হয়ে যায় আর কপালের রগ ফুলে ওঠে। স্কুলের সাহেব ইনস্পেক্টর ছেলেদের ড্রিল দেখছিলেন ; আর দেখছিলেন, ড্রিলের সারির মধ্যেই দাঁড়িয়ে একটা ছেলে বার বার হাসছে আর সামনের ছেলেটার পিঠে চিমটি কাটছে। সাহেব ইনস্পেক্টর রুষ্ট হয়ে তেড়ে এলেন, ছেলেটার কাঁধ ধরে একটা ঝাঁকুনি দিলেন। ছেলেটাও সেই মুহূর্তে হাত তুলে সাহেবের গায়ে একটা ঠেলা দিল। হেড মাস্টার বললেন, মাপ চাও। ছেলেটা বললে—না। বই হাতে তুলে নিয়ে স্কুল থেকে সেই যে চলে এলেন ছেলে, তিনি জীবনে আর কোনদিন স্কুলমুখো হতে পারেননি। হতে চানও নি। তিনিই আজ পঁয়ষট্টি বছর বয়সের পরেশ চৌধুরী হয়ে আর বিক্রী-করা রাজার বাগানের নতুন কাঁটাতারের বেড়ার দিকে তাকিয়ে ভাবছেন, ইংরেজ না গেলে, আর দেশ স্বাধীন না হলে কিছুই হবে না। যেমন অদ্ভুত যুদ্ধ, তেমনই অদ্ভুত দুর্ভিক্ষ। পাপগুলো দূর হবে কবে।

দূর হবেই একদিন কিন্তু ততদিন কি...। বলাই তো বলে, তুমি ভেব না বাবা, তুমি স্বাধীনতা দেখেই যাবে।

ঘরের ভিতরে বসে মলিনা চৌধুরীর মনের অন্য একটা চিন্তা বেশ করুণ হয়ে কথা বলে —টাটানগরেও তো অনেক সাহেব আছে, শুনলাম।

রাণু—কোথায় শুনলেন?

—বীণা এসে বলে গেল।

—তা আপনি আর ভেবে কি করবেন?

—না ভেবে যে পারি না। ছেলে যদি আবার ওখানেও একটা কাণ্ড করে বসে, তাহলে তো এ চাকরিটাও যাবে। তোমার চিঠিতে বলাইকে একটু দিব্যি-টিব্যি দিয়ে লিখে দিও, রাণু ; বলাই যেন একটু বুঝে-সুঝে চলে।

কিন্তু শাশুড়ির চিন্তার এরকম একটা করুণ স্বরের অনুরোধ শুনেও রাণুর চোখের শক্ত ভাবটা একটুও নরম হয় না। রাণু বলে—তাতে কোন ফল হবে কি? আপনিও এই বাড়ির মেজাজকে কত দিব্যি-টিব্যি দিয়ে কত বুঝিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে কোন ফল হয়েছিল কি?

মলিনা—ঠিকই বলেছ। শ্বশুরকে বোঝাতে পারিনি, শ্বশুরের ছেলেকেও পারিনি। এখন কি

সোয়ামীর ছেলেকেও কিছু বোঝাতে পারবো? অসম্ভব। বলে বলে শুধু হয়রানই হয়েছি রাণু। এদের মেজাজের মন কোনদিনও একটু নরম হলো না।

জাঁতিটাকে হাতে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে সুপুরি কাটেন মলিনা। রাণুর কোলে ঘুমিয়ে পড়া মণ্টুর মুখের দিকেও একবার তাকিয়ে নিলেন—ষোল বছর বয়সে বউ হয়ে এবাড়িতে এসেছি, রাণু। সব কিছু বুঝবার মত বয়স নয়, তবু অনেক কিছু বুঝেছিলাম। শ্বশুরের হাত ধরে কথা বলতে গিয়ে কতবার কেঁদে ফেলেছি--আপনি আর হাতীশিকারে যাবেন না, বাবা। আমার খুব ভয় করে। শ্বশুর তো হেসেই আকুল হলেন। বুঝতে পারলেন না যে, আমি বুনো হাতীর ভয়ের জন্য কাঁদছি না, কাঁদছি পাঁচ-দশ হাজার টাকা নষ্ট হয়ে যাবার ভয়ে।

মলিনাবালা চৌধুরী যেমন করে জানেন, তেমন করে আর-কেউ জানেন কিনা সন্দেহ, এই চৌধুরীদের মেজাজ কত সহজে কত টাকা নষ্ট করে দিতে পারে। বিদেশ থেকে বোমা-বন্দুক আনবার জন্যে স্বদেশীদের হাতে এককথায় একবার দশ হাজার টাকা দিয়ে ফেলেছিলেন যিনি, তিনি এই পরেশ চৌধুরী, যিনি এখন ঘরের বাইরের বারান্দায় পায়চারী করছেন আর নতুন কাঁটাতারের বেড়ার দিকে বার বার তাকাচ্ছেন। ওই যে হাজরা মশাই, উনিই তো তাঁর ভাগ্নীকে, বাপ-মা-মরা এক মেয়েকে একটা রুগী বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন। এই পরেশ চৌধুরীই গোঁ ধরে আর জেদ করে সেই বিয়ের ব্যবস্থা ভণ্ডুল করে দিয়েছিলেন। আর, একটা মাস পরেই কোন্নগরের হৃদয়বাবুর ছেলের সঙ্গে সেই মেয়ের বিয়ে দিলেন। বরপণ আর গয়নার জন্যে তিন হাজার টাকা, বিয়ের খাওয়া-দাওয়া আর আতসবাজির জাঁক করতে আরও দু'হাজার টাকা, পুরো পাঁচটি হাজার টাকা খরচ করে সেদিন মেজাজ খুশি করেছিলেন এই পরেশ চৌধুরী।

মলিনা বলেন—একবার এক সাহেবের সঙ্গে রাগারাগি করে ট্রেনের গোটা একটা ফাস্ট কেলাসের ঘরই রিজার্ভ করে তোমার শ্বশুর একগাদা টাকা...।

রাণু বলে—থামুন মা। শুনতে একটুও ভাল লাগছে না।

আজ এসব কথা শুনতে রাণুর একটুও ভাল লাগবার কথা নয়। রাণুর কোলের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে আর ঘুমিয়ে পড়েছে যে, মণ্টু, তারই পিঠের উপর হাত বোলাতে গিয়ে রাণুর হাতটা যেন মেয়ের পিঠের হাড়গুলিকে গুণতে পারছে। কত রোগা হয়ে গিয়েছে মেয়েটা।

দিনের আলো। খোলা জানালার কাছে কোন অন্ধকার জমাট হয়ে দাঁড়িয়ে নেই, আর কলাগাছের পাতাটাও কোন বিভীষিকার হাত হয়ে দুলছে না। তবু যেন হঠাৎ-ভয়ে ভীরু হয়ে আর চমকে উঠে ডাক দিয়ে ফেলে রাণু—মা।

মলিনা—কি?

রাণু—বাগবাজারের খবর কি? চিঠি এসেছে?

—হ্যাঁ, এসেছে।

—কী বলে প্রতিভা?

—ভাল আছে। কিন্তু কী জানি কেন, কেমন একটু আবোল-তাবোল করে লিখেছে, আবার কবে যে তোমাদের দেখতে যেতে পারবো, জানি না।

—আর কিছু লেখেনি?

—একজোড়া হীরের দুল হয়েছে, সেকথাও লিখেছে। কিন্তু কী জানি কেন, কথাটা এত লজ্জা করে লেখার কী দরকার ছিল? ভগবানের দয়াতে সুখের ভাগ্য পেয়েছে, চিরকাল সুখী হয়েই থাকুক।...ও কি? তুমি কাঁদছো কেন রাণু?

রাণু—আপনি বুঝে দেখুন, মা। যে মেয়ে মণ্টুর ঘামাচির কথা ভেবে মন খারাপ করতো আর চিঠিতে উপদেশ দিয়ে লিখতো, ঘামাচিতে গোলাচন্দন লেপে দিত, সে মেয়ে আজ

হীরের দুলের কথা লিখতে গিয়ে মণ্টুর কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলেই গিয়েছে।

মলিনা—হ্যাঁ, ভুলই করেছে। কিন্তু এটা প্রতিভার শুধু একটা ভুলই, রাণু। আর কিছু নয়। তুমি কিছু মনে করো না।

রাণু—আমি কিন্তু মনে মনে ঠিক করেই রেখেছিলাম, মণ্টুকে প্রতিভার কাছে পাঠিয়ে দেব।

মলিনা চমকে ওঠেন—কেন?

রাণু হেসে ফেলে—আমি তো জানি, মণ্টু আমার চেয়ে ওর পিসিকে কত বেশি ভালবাসে।

—ঠিক কথা। কিন্তু তুমিই বা মণ্টুকে পিসির কাছে পাঠিয়ে দিয়ে আর একেবারে খালি হয়ে থাকতে পারবে কেন?

—পারবো।

—না না ; ঝোঁকের মাথায় ওসব কাণ্ড করতে চেয়ো না।

—ঝোঁক নয় মা। আমি খুব ভেবে আর ইচ্ছে করেই...।

মলিনা এবার রাগ করে কথা বলেন—তুমি কেমনতর মা হয়েছ, রাণু? নিজের বুক খালি করে বাচ্চা মেয়েকে পরের বাড়িতে পাঠাতে তোমার একটুও ভয় করছে না? আশ্চর্য।

—ভয় করছে বলেই তো বলছি, আমি অচল হলে মণ্টুকে সামলাবে কে? আপনি পেরে উঠবেন? আপনি কি কিছু বুঝতে পারেননি? আঁচল তুলে চোখ মোছে রাণু।

এইবার মলিনাবালার চোখের রাগ-করা বিস্ময়টা ছল ছল করে।—তাই বল। বীণা এসে আজ সন্দেহ করে যে-কথাটা বলে গেল, সেটা তাহলে সত্যি।

এতক্ষণ যিনি শুধু নীরব ছায়ার মত বাইরের বারান্দায় পায়চারী করে ঘুরছিলেন, তিনিই এইবার হঠাৎ সরব হয়ে আর বেশ একটু ব্যস্ত হয়ে একেবারে ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ান।—সবই শুনলাম। কিন্তু মণ্টু এখানেই থাকবে। পিসির কাছে যাবে না।

মলিনা—কেন?

পরেশবাবু—মণ্টুর পিসি কি আদর করে মণ্টুকে ডেকেছে? না ডাকলে গুপ্তিপাড়ার চৌধুরীবাড়ির কোন মানুষ কোন ব্রহ্মা-বিষ্ণুর বাড়িতেও যায় না। তুমি তোমার ওসব বাজে ইচ্ছের কথা ভুলে যাও রাণু। বলাই শুনতে পেলে তোমার রক্ষা থাকবে না।

ঠিক কথাই বলেছেন পরেশ চৌধুরী। এমন কথা না বলতে পারলে তাঁকে একজন পরেশ চৌধুরী বলে মনে হবেই বা কেন? প্রতিভা কতবার তো চিঠিতে লিখেছে, এখানে এসে আমাকে একবার দেখে যেতে কি তোমার ইচ্ছেই করে না, বাবা? মেয়ে লিখলে হবে কি? জামাই তো লেখেনি। হাজরা মশাইয়ের কাছে বেশ-একটা গর্ব করে জামাইয়ের নামে অনেক কথা বলতে পরেশ চৌধুরীর কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু বিনা আহ্বানে জামাইয়ের বাড়িতে যাওয়া? না, ওটা চৌধুরীদের জীবনের নিয়ম নয়।

এতক্ষণ ধরে মুখ লুকিয়ে আর চুপ করে শ্বশুরের কথা শুনেছে যে রাণু, সে রাণু হঠাৎ মুখ তুলে আর শ্বশুরের দুই চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে কথা বলে—কিন্তু আপনি একটু বুঝে বলবেন তো ; মেয়েটা এত রোগা হয়ে যাচ্ছে কেন?

পরেশ চৌধুরী—নিশ্চয় একটা কারণ আছে।

মলিনা বলেন—ঠিকই, মেয়েটা কেমন-যেন মনমরা হয়ে মাঝে মাঝে চুপ করে বসে থাকে। ছুটোছুটি করে না। খেলাধুলো করবারও কোন চাড় দেখা যায় না।

পরেশ চৌধুরী—এটা একটা অসুস্থতা। ডাক্তার দেখানো চাই ; ওষুধ খাওয়াতে হবে ; কড লিভার তেল খাওয়ালে স্বাস্থ্যটা তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে পারে।

রাণু—সবই তো টাকার ব্যাপার। আপনি কি পারবেন?

চমকে ওঠেন পরেশ চৌধুরী ; চোখ দুটো যেন ধোঁয়াতে ভরে গিয়েছে—কি বললে?

জবাব দেয় না রাণু। কথাগুলি যেন রাণুর বুকের ভিতর থেকে ঠিকরে বের হয়ে গিয়েছে। জীবনে এই প্রথম, এর আগে কোনদিনও শ্বশুরকে কিংবা স্বমীকে এরকম একটা স্পষ্ট কথা বলতে পারেনি রাণু।

কিন্তু স্পষ্টকথা তো নয় ; যেন ভয়ানক স্পষ্ট একটা আঘাত। সে আঘাতে চৌধুরীবাড়ির পুরনো মেজাজের যত ইঁট ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়ে যেতে পারে। কিন্তু না বলে তো উপায় নেই, রাণুর পেটের ভিতরেও যে একটা নতুন যন্ত্রণা, বুকের ভিতর তো আছে। মন্টুর পিঠের হাড়গুলিকে গুণতে পারা যাচ্ছে।

ঘরের দরজা ছেড়ে আর আস্তে আস্তে হেঁটে চলে গেলেন পরেশ চৌধুরী। বারান্দার উপর গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। বারান্দার ছায়াতে দাঁড়িয়ে থাকলেও দুপুরের ওই কাঠফাটা রোদের তেজ যেন আগুনের আঁচের জ্বালার মত গায়ে এসে লাগছে।—ওঃ, কী কড়া রোদ্দুর! পরেশ চৌধুরীর মুখে যেন অদ্ভুত একটা চাপা-ভয়ের ভাষা বিড়-বিড় করে। পঁয়ষট্টি বছর বয়সের একটা মানুষের আদুড় শরীরটা বাইরের ওই রোদের তেজ দেখে আজ যেন একটু ঘাবড়ে গিয়েছে। বেশি দূরে নয়, পুরনো দোলমঞ্চের ওদিকের ওই চারবিঘের উপর শুকনো বাঁশপাতা আর ধুলোর ঘূর্ণি নিয়ে একটা বাতাস ভুতুড়ে ফুর্তির মত ছুটে বেড়াচ্ছে।

হাজরা মশাই তো ওই চারবিঘেও কিনতে চেয়েছিলেন। এখনও বোধ হয় কিনতে চাইবেন, যদি জানতে পারেন যে, ওটাও এবার বিক্রী করে দেওয়া হবে। কাউকে পাঠিয়ে হাজরা মশাইকে এখনি একটা খবর দিতে হয়। কিন্তু কে যাবে? কা'কে পাঠানো যায়।

সামনের পুকুরের ওপারের ঘাটের দিকে তাকিয়ে ডাক দিলেন পরেশ চৌধুরী—ও বিশ্বনাথ, একবার এসে একটা কথা শুনে যাও।

বীণার দাদা বিশ্বনাথ তখন চৌধুরীপুকুরের পানাঢাকা ঠাণ্ডা জলে স্নান করে, একটা ভেজা তোয়ালে মাথায় দিয়ে, আর ঘাটের মাথার চাতাল পার হয়ে চলেই যাচ্ছিল। পরেশবাবুর ডাক শুনে তখনই মুখ ফিরিয়ে তাকায়। কিন্তু, যেন একটা অনিচ্ছায় কুণ্ঠিত হয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে আসে।—বলুন।

পরেশ চৌধুরী—হাজরা মশাইকে এখনি একটা খবর দাও বিশ্বনাথ। বল, আমি ডেকেছি।

বিশ্বনাথ বলে—আমার সময় নেই। আপনি আর-কাউকে বলুন।

পরেশ চৌধুরী—তোমার এখন কাজ আছে?

—আছে বইকি। কলকাতায় গিয়ে ঠিক সময়মত নীলামে হাজির হতে না পারলে আমার বেশ ক্ষতি হয়ে যাবে।

—কত ক্ষতি হতে পারে?

—পঁচিশ টাকা।

দপ্ করে জ্বলে ওঠে পঁয়ষট্টি বছর বয়সের ঘোলাটে চোখের তারা—আমি তোমাকে একশো টাকা দেব। যাও, এখনি গিয়ে হাজরা মশাইকে খবর দিয়ে এস। যাও, দেরি করো না।

বিশ্বনাথ ব্যস্ত হয়ে বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ, এখনি যাচ্ছি। কিন্তু আপনি এখন ঘরের ভিতরে গিয়ে বসুন। এরকম একটা পোড়া দুপুরের বাতাস গায়ে লাগাবেন না।

গাঁথুনি শুরু হয়ে গিয়েছে। দোতলার উপরে তেতলা। একটা নক্সা হাতে নিয়ে আর দেয়ালের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কন্ট্রাক্টর গাঙ্গুলীর সঙ্গে কথা বলছে অনুপম।—আপনি অন্তত সিঁড়িটার মধ্যে অদ্ভুত কিছু একটা করুন।

গাঙ্গুলী—করবো।

অনুপম—কী করবেন, একটু আভাস দিতে পারেন?

গাঙ্গুলী—স্টেপ হবে একেবারে সাদা মাকরানা মার্বেল ; কিন্তু রেলিং হবে ফতেপুর সিক্রীর আকবরী ড্রিম-প্যালসের জাফরির মত, ফিকে লালচে বিকানীর স্টোনের ওপর খুব মিহি ফুলকারির কাজ।

অনুপম—জানলা-কপাটের রং যেন ম্যাটমেটে না হয়।

গাঙ্গুলী—না না। সেজন্যে একটুও চিন্তা করবেন না। দেখিয়ে দেব, রং কাকে বলে।

বাড়ির গা-ঘেঁষা বাঁ-পাশের পড়তি জমির সেই ফাঁকা চেহারাটা আর নেই। বেশ লম্বা-চওড়া একটা গ্যারেজ-ঘর উঠছে। বাড়ির পুরনো কাঠের গেট আর পুরনো থাম ভেঙে ফেলা হয়েছে। নতুন ফটকের দু'পাশের থাম দুটো হবে দুটো ছোট পিরামিড, কুচকুচে কালো কষ্টিপাথরের রং, আর তেমনই মসৃণ।

চলে গেলেন কন্ট্রাক্টর গাঙ্গুলী। ঘরের ভিতর থেকে হাসতে হাসতে বের হয়ে আসে প্রতিভা।—কই, তুমি তো আমাকে বললে না?

অনুপম—কী বললাম না?

প্রতিভা—ভুলে গেলে? বাঃ!

—সত্যিই মনে পড়ছে না।

—বেশ মন! কালকেও তো, সন্ধ্যেবেলা, ঠিক এখানে দাঁড়িয়েই তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। মনে নেই?

হেসে ফেলে অনুপম—তাই বল! এই কথা! কিন্তু ওটা কি তোমার জিজ্ঞাসা করে জানবার মত একটা কথা?

চমকে ওঠে প্রতিভা।—এ কী রকমের কথা হলো। স্ত্রী জানবে না স্বামী কী করে? কেন এত খাটো? কিসের জরুরী কাজ?

অনুপম—জানলেও কি সে-কাজে তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারবে? আমার খাটুনি একটু কমিয়ে দিতে পারবে?

প্রতিভা—কেন পারবো না? তুমি বললেই পারবো।

অনুপম—আমি যদি যুদ্ধে যাই, তবে তুমিও যুদ্ধে যাবে?

প্রতিভা হাসে—নিশ্চয় যাব ; যদি নিয়ে যেতে চাও আর নিয়ে যেতে পার।

বলতে গিয়ে হেসে ফেলে প্রতিভা। আর, অনুপমের একটা হাত ধরে যেন দুরন্ত একটা আবদারের মূর্তির মত ছটফট করে।—না না, হাসির কথা নয়। আমি হাসছি না। তুমি বল।

অনুপম—বলবার কিছু নেই, প্রতিভা।

প্রতিভা—কী যে বলছো, বুঝতে পারছি না। তোমার উন্নতি দেখে সব চেয়ে খুশি হয়েছে যে, সে বেচারীই জানবে না, কিসে এত উন্নতি হলো? তোমার ভাগ্য কি আমারও ভাগ্য নয়?

প্রতিভার হাতে হাত বুলিয়ে আস্তে আস্তে কথা বলে অনুপম—তোমার ভাগ্য কিন্তু আমার ভাগ্যের চেয়ে অনেক ভাল।

প্রতিভা—একথার মানে?

অনুপম—কুলদা পণ্ডিত আমার হাত দেখে কী বলেছেন, শুনবে?

প্রতিভা—শুনবো।

—স্বামীকে শুধু ভালবেসেই সুখী হয়, আর কিছু তার কামনা নেই, তুমি নাকি সেই রকমের স্ত্রী। মুগ্ধা নায়িকার মত। একদিন স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে আর স্বামীর কোলে মাথা রেখে বিদায় নেয়, সেইরকম এক সৌভাগ্যবতী।

অনুপমের হাতটাকে শক্ত করে ধরে প্রতিভা। দুই চোখে যেন নিশ্চন্ত প্রাণের একটা তৃপ্তি গভীর হয়ে টলমল করে।—চমৎকার কথা বলেছেন পণ্ডিত মশাই।

অনুপম—এটা আমার যেমন একটা দুঃখ, তেমনই একটা সান্ত্বনা।

প্রতিভা—কী বললে?

অনুপম—তুমি একদিন থাকবে না, শুধু আমি একাই থাকবো, এটা ভাবতে কষ্ট হয়। কিন্তু তোমাকে কখনও এটা থাকতে হবে না, এটা ভাবলে মনে হয়, তাই ভাল।

প্রতিভা—নিশ্চয় ভাল।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকায় অনুপম।—ন'টা বেজে গিয়েছে।

প্রতিভা—এবার তাহলে, বল।

অনুপম—কী?

প্রতিভা—তুমি কী কাজ করে এত উন্নতি করলে?

—আমি যা করি, সেটা হলো একটা কাজ। যেমন, কোন কোন উকীল তাঁর মক্কেলকে শুধু পরামর্শ দেন, সেটা কি একটা কাজ নয়?

—তুমিও কি তবে...

—হ্যাঁ। ধরে নিতে পার, আমার কাজও প্রায় ওরকমেরই একটা কাজ।

—চন্দ্রবাবু আর সূর্যবাবুও কি এই কাজ করেন?

—হ্যাঁ।

জোরে একটা হাঁফ ছাড়ে প্রতিভা। অনুপম হাসে—মনে হচ্ছে, তোমার বুকের ভিতর থেকে একটা পাষাণভার নেমে গেল।

প্রতিভা—উঃ, সত্যি।...কিন্তু তুমি আমার কাছে এই সামান্য একটা কথা একটু স্পষ্ট করে না বলে আমাকে এত ভোগালে কেন? অনুপমের পিঠে আস্তে একটা চড় মেরে আর ছটফটিয়ে হেসে ওঠে প্রতিভা। অনুপম বলে—এই সাবধান! এটা বারান্দা। পাশের বাড়ির জানালা খোলা। সেই জানালার কাছে কে দাঁড়িয়ে আছে, দেখ।

দেখতে পেয়েই চমকে ওঠে প্রতিভা। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন এক বিধবা, যিনি হলেন এই বাড়ির উপর খাম্‌কা আক্রোশের সেই অদ্ভুত মানুষ ভবতোষবাবুর স্ত্রী।

জিভ কেটে, দুরন্ত হাতটাকে সামলে নিয়ে, আর একেবারে শান্ত মূর্তিটি হয়ে অনুপমের মুখের দিকে তাকায় প্রতিভা।—কিন্তু যে-কাজে তুমি পরামর্শ দাও, সেটা কী কাজ?

অনুপম—বলবো, নিশ্চয় বলবো। তোমাকে না বলে পারবো কেন? কিন্তু আজ নয়। আজ না বলবার অনেক কারণ আছে। আজ বললেও তুমি বুঝতে পারবে না। আমি ঠিক সময় বুঝেই তোমাকে বলবো, বিশ্বাস কর। সেদিন তুমি নিজেই ভেবে লজ্জা পাবে যে, কেন একদিন...।

—তুমি থাম তো। বলতে গিয়ে প্রতিভার গলার স্বরে একটা লজ্জা যেন ব্যথা পেয়ে কেঁপে ওঠে।

অনুপম বলে—আমি চলি।

—নীচের ঘরে গিয়ে বসছো? না, বাইরে বের হবে?

—এখন নীচের ঘরে। পরে বাইরে বের হতেও পারি।

—ফিরতে বেশি দেরি করো না।

—না। চলে যেতে যেতেই মুখ ফিরিয়ে তাকায়, আর মুখ টিপে হেসেও ফেলে অনুপম।

প্রতিভা—হ্যাঁ, শোন। একটা কথা।

থামে অনুপম। এগিয়ে আসে প্রতিভা।—তোমার বন্ধু অজয়বাবুও তো ইচ্ছে করলে ওরকম কাজ করতে পারেন।

আশ্চর্য হয়ে প্রতিভার মুখের দিকে তাকায় অনুপম।—হঠাৎ এখন অজয়ের কথা মনে পড়লো কেন তোমার?

প্রতিভা--ভদ্রলোকের টাকা-পয়সার খুব অভাব আছে মনে হলো।

--তা তো আছেই।

--আমার কাছে টাকা ধার চেয়েছিলেন।

--দিয়েছ নিশ্চয়।

--দিয়েছি।

--কত টাকা?

--চল্লিশ টাকা।

--ভালই করেছো।

--তোমারই অপেক্ষায় অনেকক্ষণ বসে ছিলেন, কিন্তু...।

--হ্যাঁ, আমারই ভুল হয়েছে। ওকে টাকা দিতে ভুলেই গিয়েছিলাম। নানা কাজের তাড়ায় সব কথা সব সময় মনেও পড়ে না।

--অজয়বাবু নিশ্চয় খুব বিদ্বান মানুষ।

--তা বইকি। অজয়ই তো আমাদের ক্লাসের সেরা ছাত্র ছিল। এককালে খুব ভাল ছবিও আঁকতো।

—তাহলে অজয়বাবুকে একবার বলেই দেখ না!

হেসে ফেলে অনুপম।—আমি বললেও কোন ফল হবে না, প্রতিভা। অজয়ের দ্বারা কিছুই হবার নয়। ওর হাত কুঁড়ে, পা কুঁড়ে, মন-প্রাণ সবই কুঁড়ে।

--কেন?

—গায়ের ওপর একটা কাঁকড়াবিছা পড়লে লোকে সেটাকে টোকা দিয়ে ফেলে দেয়। আর, অজয় সেই কাঁকড়াবিছার দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হবে, যেন একটা টাটকা গোলাপফুল গায়ে পড়েছে।

—মাথার দোষ আছে?

—আছে বৈকি। তা না হলে এরকম একটা অদ্ভুত ভাগ্য হবে কেন? যাই হোক্, অজয় নিশ্চয় আবার সাহায্য চাইতে আসবে, আসবেই, না এসে পারবে না। কিন্তু এলেও হয়তো আমার দেখা পাবে না। তুমিই ওকে দশ-বিশ কিছু দিয়ে দিও।

—কিন্তু আমার কাছে তো টাকা থাকে না।

অনুপম—আচ্ছা, সে ব্যবস্থা এখনই করে দিচ্ছি। তোমার কাছে আমার সবই যখন আছে, তখন টাকাও থাকবে।...এই নাও।

স্টীল-সেফের চাবিটাকে প্রতিভার হাতে তুলে দিয়ে আর হাসতে হাসতে চলে গেল অনুপম। অনুপমের মুখের সেই হাসি যেন বারান্দার সিংহ-আয়নার ঝকঝকে বুকটাকে ছুঁয়ে দিয়ে চলে গেল।

ছুঁয়ে গেল প্রতিভারও বুকের ভিতরে লুকোনো একটা মিথ্যা কষ্টকে; এই মানুষের জীবনটাকে এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আর জিজ্ঞেস করে করে বুঝতে চেষ্টা করবার কোন দরকার ছিল না। প্রতিভার কাছে সব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারলেই যার প্রাণ খুশি হয়ে এত হেসে ওঠে, তার কাজের খবর জানবার জন্যে এত ছটফট করবার কোন মানে হয় না।

প্রতিভার মনের লজ্জাটাও চমকে ওঠে। একা একা দাঁড়িয়ে থাকলেও মুখ লুকোতে ইচ্ছে করে। ছি ছি, এ যেন নিজেরই ভাগ্যের সঙ্গে কোঁদল করা। রাজার সুখ-শান্তি সহ্য করতে পারতো না সেই সুয়োরানী; হীরের খাটে শুয়েও নিজের গায়ে চিমটি কেটে কেটে নিজেকে কাঁদাতো, আর রাজাকেও জ্বালাতো। বলতো, তোমার রানী হয়েও আমার কোন সুখ হলো না।

সত্যিই যে হীরের দুল এবার পরতে ইচ্ছে করছে। আয়নার টেবিলের দেরাজের ভিতরে হীরের দুলের ছোট বাক্সটা পড়ে আছে। অনুপম যদি জিজ্ঞাসা করে বসে, কবে এনে রেখেছি জিনিসটাকে, কিন্তু এতদিনের মধ্যে একদিনও ওটাকে তোমার পরবার সময় হলো না? তবে যে সত্যি কথা বলে জবাব দিতে ভয় করবে। না, আর দেরি করা উচিত নয়। এখনই পরে ফেললেই হয়।

তার চেয়ে ভাল হয় সন্ধ্যাবেলার স্নানের পর, ঘরের বড় বাতির আলোটাকে ঝলমলিয়ে জাগিয়ে দিয়ে আর আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে যদি তাড়াতাড়ি পরে ফেলা যায়। না, তাড়াতাড়ি কেন? একা ঘরে আয়নার সামনে আবার চক্ষুলজ্জা কিসের? মুখ লুকিয়ে হাসবারও কোন দরকার হবে না।

এখনই একবার নীচে না গেলে নয়। সুধার মা নিশ্চয় ভাবছে, দাদাবাবু তো নেমেই এসেছেন, তবে বউদির আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন? রামপ্রসাদ হয়তো ভুল করে পচা মাছ নিয়ে এসেছে। ননীকাকাও বোধ হয় দু-একবার ডাক দিয়েছেন, বউমা তুমি কি নীচে এসেছ?

ননীকাকার শরীর একটুও ভাল যাচ্ছে না। সব সময় হাঁপাচ্ছেন। কাছে গেলেই জিজ্ঞাসা করেন, দেখ তো বউমা, জানালাগুলো খোলা আছে কিনা। হাওয়া পাচ্ছি না কেন? রাতের খাওয়া ছেড়েই দিয়েছেন ননীকাকা। দিনের বেলাতেও যা খান, তা না-খাওয়ারই মত। দু মুঠো ভাত কোনমতে এলোমেলো করে মুখে তোলেন। আর দুধের বাটিতে একটা চুমুক দিয়েই বলে ওঠেন, নাঃ, অনেক বেশি হয়ে গেল।

—আপনি তো কিছুই খেলেন না, কাকা।

—না বউমা, মনে হচ্ছে খুব বেশি হয়ে গিয়েছে। এর বেশি আর ভাল নয়।

মিস্তিরী আর মজুরদের কাজের ঠকাস-ঠকাস আর ধুপধাপ শব্দ সারাদিন বেজেই চলেচে। ননীকাকার দুপুরের ঘুমের শান্তি নিশ্চয় নষ্ট হয়ে যায়।

এক-এক সময় হঠাৎ ঘর ছেড়ে বের হয়ে পড়েন ননীকাকা। দেয়াল ছুঁয়ে ছুঁয়ে বারান্দার উপর হেঁটে বেড়ান। পা টলমল করে। রামপ্রসাদ দৌড়ে এসে ননীকাকাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আবার ঘরের ভিতরে নিয়ে যায়। ননীকাকার মুখে ওই এক কথা—ঘরের ভেতরে হাওয়া পাই না।

—আপনি রামপ্রসাদকে সঙ্গে না নিয়ে কখ্খনো একা-একা হাঁটতে চেষ্টা করবেন না, কাকা। কতবার ননীকাকাকে বলেছে আর বুঝিয়েছে প্রতিভা। কিন্তু ননীকাকার মনের ভিতরেই কী যেন হয়েছে। জেগে বসে আছেন, চুপ করে, অনেকক্ষণ। হঠাৎ চমকে ওঠেন, ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ান। তারপরই, ওই ভাঙ্গা-ভঙ্গুর শরীর নিয়েই দেয়াল ছুঁয়ে ছুঁয়ে বারান্দার এদিকে ওদিকে হাঁটতে থাকেন।

নীচে নেমে এসেই চমকে ওঠে প্রতিভা। হ্যাঁ, ঠিক, কাকা আবার সেই ভুল করেছেন। রামপ্রসাদকে ডাকেননি, নিজেই একা-একা হেঁটে বারান্দার একেবারে ওদিকে......ইস কতদূরে চলে গিয়েছেন ননীকাকা, অনুপমের সেই ঘরের দরজার কাছে, যেখানে একটা সবুজ পর্দা দুলছে।

ফিরে আসছেন ননীকাকা, কী ভয়ানক চমকে চমকে কাঁপছে ননীকাকার সাদা মাথাটা। দেয়াল ছুঁয়ে ছুঁয়ে টলতে টলতে আসছেন। এগিয়ে যেয়ে ননীকাকার হাত ধরে প্রতিভা।—কী হলো, কাকা? ওরকম করছেন কেন?

ননীকাকা—ঘরটা কোন্ দিকে?

প্রতিভা—এই তো আপনার ঘর, ঘরের দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন।

ঘরের ভিতরে ঢুকেই বিছানার উপর বসে পড়েন আর হাঁফ ছাড়েন ননীকাকা।—তোমার কাছে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে, বউমা?

--সুধার মা দাঁড়িয়ে আছে।

--অনুকে একবার ডাক।

অনুপমকে ডাকতে চলে যায় সুধার মা। ঘরের পাখা ঘুরছে। তবু হাতপাখা তুলে নিয়ে ননীকাকার মাথার উপর জোরে জোরে বাতাস দিতে থাকে প্রতিভা। অনুপম ঘরে ঢুকতেই ননীকাকা তাঁর ঝাপসা-দেখা চোখ দুটোকে টান করে তাকিয়ে নিয়ে কথা বলেন।--অনু এসেছো, বোধহয়।

অনুপম--হ্যাঁ।

ননীকাকা--এ ঘরের টেবিলের দেরাজে আমার এ মাসের পাওয়া পেনসনের ষাট টাকা আছে। আমার জন্যে ডাক্তার ডাকবার খরচ আর ঘাটখরচ, সবই ওই টাকার মধ্যেই সেরে নিতে হবে। তুমি একটি পয়সাও দিও না।

অনুপম--আপনি আজ হঠাৎ এরকম কথা বলছেন কেন?

ননীকাকা--আমি চোখে ঝাপ্‌সা দেখি, এটা আমার সৌভাগ্য। কানে ঝাপ্‌সা শুনতে পেলেও সেটা একটা সৌভাগ্য হতো। তা হলে তোমার ওই ঘরের ভিতরের কথাগুলোকে এত স্পষ্ট করে কানে শুনতে হতো না।

অনুপম--আপনি কি আরও কিছু বলতে চান?

ননীকাকা--না। হ্যাঁ, শুধু একটা ইচ্ছের কথা। তুমি জাঁক করে দানসাগরটাগর করো না, তোমার টাকা নষ্ট করো না। আমার এই পেনসনের ষাট টাকার কিছু যদি থাকে, তবে তাই দিয়ে, কয়েকটা কাঙালীকে পেট ভরে ভাত খাইয়ে দিও, বাস্, সেটাই হবে আমার শ্রাদ্ধ।

অনুপম--আপনি আজই এসব কথা না বললেও পারতেন, কাকা।

ননীকাকা--আমার আর কিছু বলবার নেই, অনু।

প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে চাপাস্বরে কথা বলে অনুপম--আমি এখনি ডাক্তারকে খবর পাঠাচ্ছি।

চলে যায় অনুপম। প্রতিভার হাতের পাখাটা ধপ্ করে মেজের উপর পড়ে যায়। ভাঙ্গা-ভঙ্গুর শরীরটাকে একটু টান করে নিয়ে বিছানার উপর শুয়ে পড়েন ননীকাকা। প্রতিভা ডাকে--কাকা!

ননীকাকা হাসেন--তুমি এখনও আছ নাকি?

--হ্যাঁ কাকা।

--তা হলে একটা গল্প-টল্প বল।

--কিসের গল্প?

--তোমাদের দেশের বাড়িতে আমবাগান নেই?

--ছিল।

--কখনও ঝড়বৃষ্টির রাতে আমবাগানে ঢুকে আম কুড়োওনি?

--কত কুড়িয়েছি। সেবার, তখন শেফালীদিরই বয়স হবে পনর কি ষোল ; আমি তো শেফালীদির চেয়ে সাত বছরের ছোট ; অনেক রাতে ঝড় শুরু হলো। শেফালীদি বললে, ওঠ পতু। আমিও উঠলাম। মস্ত বড় একটা কাঁচা-মিঠে ছিল গরুর ঘরের ঠিক পেছনে। শেফালীদি কোঁচড় পাতে, আমি আম তুলে তুলে কোঁচড় ভরে দিই। তারপর ফিরে যাবার জন্যে যেই না দু'পা এগিয়েছি, অমনি চালতে গাছের আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিল কী বিশ্রী চেহারার একটা ভূত। বললে, আঁম দেঁ। ভূতটার মাথা মুখ হাত-পা সবই চট দিয়ে ঢাকা ; শুধু চোখ দুটো বেরিয়ে রয়েছে। মাগো বলে শেফালীদি তো আমাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে কাঁপতে থাকে, কোঁচড়ের সব আমও ভয় পেয়ে ঝুরঝুর করে কাদার ওপর পড়ে যায়।...শুনছেন কাকা?

ননীকাকা হাসেন--হুঁ।

প্রতিভা—আমি কিন্তু একটুও ভয় পাইনি, কাকা। সেই কাদামাখা শক্ত কাঁচা আম এক-একটা করে হাতে তুলে নিই আর ভূতের মাথায় ছুঁড়ে মারি। ভূতটা দু-তিনবার উঃ আঃ করেই শেষে চেঁচিয়ে উঠলো—কি করছিস, পতু? থাম একটু। চটের ঢাকা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দাদা এগিয়ে আসে আর হাসতে থাকে—আশ্চর্য তোদের লোভ, এই মাঝরাতের অন্ধকারে আম চুরি করতে বাগানে ঢুকেছিস?

ননীকাকা হাসেন--হুঁ। বেশ গল্প।

খুব আস্তে, যেন একটা ক্লান্তির ঘুম-ঘুম আবেশে ননীকাকার গলার স্বর নরম হয়ে গিয়েছে। ননীকাকা বোধহয় এখন একটু ঘুমোতেই চাইছেন। তাই আশি বছর বয়সের বুড়ো মানুষ যেন ছেলে মানুষের মত বায়না ধরে একটা রূপকথা শুনে নিলেন।

ডাক্তার এলেন। ননীকাকার বুক পরীক্ষা করে চলে গেলেন। ভালমন্দ কিছুই বললেন না ডাক্তার। শুধু বললেন, দেখা যাক।

বিকাল হতেই ডাক্তার একবার এলেন। সন্ধ্যা হতেই আবার একবার এলেন। বললেন—হ্যাঁ, ঘুমোচ্ছেন।

একবার মনে হলো জেগেছেন ননীকাকা। প্রতিভা কাছে এগিয়ে যেয়ে বলে—বার্লি দেব, কাকা? খাবেন?

হাত তুলে ইসারায় জানালেন ননীকাকা—না।

উপরতলায় উঠে নিজের ঘরের আয়নার সামনে যখন একবার দাঁড়ায় প্রতিভা, তখন মনে পড়ে, আজ এখন হীরের দুল পরবার কথা ছিল। চোখ দুটো হাসতে গিয়ে জ্বলতে থাকে।

মাঝরাতেও একবার নীচে নেমে গিয়ে আর ননীকাকার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কান পাতে প্রতিভা। হ্যাঁ, নিঃশ্বাসের শব্দটা বেশ স্পষ্ট শোনা যায়।

সকাল হতেই আবার ডাক্তার এলেন। ননীকাকার মুখের দিকে তাকিয়ে আর হাতের নাড়ি টিপে ধরেই বলে উঠলেন—আহা! চলেই গিয়েছেন। রামপ্রসাদ ফুঁপিয়ে ওঠে—হে রাম! হে রাম!

সুধার মা ডুকরে ওঠে—শান্তি! শান্তি!

আর, প্রতিভা শুধু দুটো অপলক চোখ তুলে অনুপমের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভেজা চোখ, কিন্তু কী অদ্ভুত শক্ত চোখ।

কী যেন বলতে চায় অনুপম, তাই ওরকম করে প্রতিভার একটা হাত ধরে রেখেছে। প্রতিভাকে কী যেন বোঝাতে চায় অনুপম, তাই প্রতিভার হাতের আংটিপরা আঙুলটার উপর বার বার হাত বোলায়। ভবতোষবাবুর বাড়ির জানলার কাছে আড়াল হয়ে কে-যেন দাঁড়িয়ে আছে। নিশ্চয় ভবতোষবাবুর বিধবা স্ত্রী, জগদম্বা দেবী। থাকুক দাঁড়িয়ে ; দেখতে পায় তো দেখতেই থাকুক। এই বারান্দা ছেড়ে আবার এখন ঘরের ভিতরে ঢুকতে চায় না অনুপম। টবের জাপানী হানার ছোট শরীরটা ফুলে-ফুলে ভরে গিয়েছে। ফুলের উপর সকাল বেলার রোদ পড়েছে।

এখনই নীচে নেমে গিয়ে কাজের ঘরে ঢুকতে হবে। কাজের ডাকে হয়তো বাইরেও বের হতে হবে। ফিরে আসতে হয়তো অনেক দেরি হবে। বেলা একটা দুটো কিংবা তিনটেও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ততক্ষণ কি অনুপমের অপেক্ষায় না-খেয়ে বসে থাকবে প্রতিভা? কোন মানে হয় না।

মেদিনীপুর জেলের ভিতরে রাজনীতিক বন্দীরা খাওয়া বন্ধ করেছে। ওটা একটা প্রতিবাদ। কারণ, জেলর বলেছেন, বন্দীদের খবর-কাগজ পড়তে দেওয়া হবে না। কিন্তু

দমদম জেলের বন্দীদের খবর-কাগজ পড়তে কোন নিষেধ নেই। তবু ওবাও খাওয়া বন্ধ করেছে। এটা নাকি মেদিনীপুরের বন্দীদের জন্য সিমপ্যাথির অনশন। প্রতিভা যা করছে, সেটাও প্রায় ওইরকমেরই একটা একরোখা ও অবুঝ সিমপ্যাথির কাণ্ড। সেদিন হঠাৎ একবার বারাসত চলে যেতে হয়েছিল। বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। কী আশ্চর্য, দেখে বেশ রাগই হয়েছিল অনুপমের ; প্রতিভা তখনও খায়নি। সুধার মা বললে, আমি তো বউদিকে শত কথা বলেও কিছু বোঝাতে পারলুম না।

তাই প্রতিভাকে একটু বুঝিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, তুমি তো জেলবাড়ির বন্দী নও ; তোমার এরকম বেলা দুটো-তিনটে পর্যন্ত না-খেয়ে-থাকা সিমপ্যাথির কোন মানে হয় না। আমাকে বাইরের কাজ নিয়ে থাকতে হয় ; আমার কথা আলাদা। তুমি ঘরের মানুষ ; তোমার জীবন ঘরের নিয়মেই চলবে। আমার বাইরের ঝঞ্ঝাটের সঙ্গে তুমি নিজেকে জড়িয়ে ফেলবে কেন?

তিন মাসেরও বেশি হয়ে গিয়েছে, ননীকাকা চলে গিয়েছেন। বাড়ির তেতলার কাজও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। গ্যারেজ ঘরের কোন কাজ আর বাকি নেই। গাড়িও এসে গিয়েছে। কিন্তু প্রতিভা যেন এখনও মনমরা চেহারার একটা চলন্ত পুতুল। ঘরের কাজে অবিশ্যি কোন শ্রান্তি-ক্লান্তি নেই। ঝি দুর্গাবালার অপেক্ষায় না থেকে এক-একদিন নিজের ঘরের মেজে নিজেরই হাতে ধোয়ামোছা করে। রামপ্রসাদের কিনে আনা একসের আলুর মধ্যে তিনটে পচা আলু চোখে পড়লে রামপ্রসাদের কাছে তিনবার কৈফিয়ত চায়, আলু কেনবার সময় তুমি কি চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে ছিলে, রামপ্রসাদ?

অনুপম—তুমি আর আমার অপেক্ষায় থেক না।

প্রতিভার দুই চোখ যেন চমকে ওঠে, দুই ভুরু শিউরে ওঠে—কী বললে?

অনুপম—তুমি খেয়ে নিও, আমার অপেক্ষায় থেক না।

প্রতিভা—অপেক্ষায় তো থাকতেই হবে। তুমি 'না' বললেই বা শুনবো কেন?

আশ্চর্য হয় অনুপম। অনুপমের এই আশ্চর্যের চোখ দুটোও যেন একটু ধোঁয়াটে হয়ে প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এরকম একটা কথাকে কেমন করে একটুও না হেসে বলতে পারলো প্রতিভা? আগে তো এরকম কত কথাই বলেছে প্রতিভা, বলতে গিয়ে হেসেও ফেলেছে। হেসে হেসে লুটোপুটি করেছে।

সেই প্রতিভা আজ এখন কিন্তু একটুও বুঝতে পারছে না যে, ওই কথাটাকে এত গম্ভীর হয়ে বললে কথার অর্থটা অন্যরকমের হয়ে যায়।

অনুপম হাসে—একটা হাসির কথাকে এত গম্ভীর হয়ে বলছো কেন?

হেসে ফেলে প্রতিভা।—তোমার কাছে হাসির কথা হতে পারে, আমার কাছে নয়।

বুঝতে তো কোন অসুবিধে নেই, ঘরের এত কাজের মধ্যে থেকেও প্রতিভার প্রাণটা কেন আনমনা হয়ে রয়েছে, একটা হাসির কথাকেও হেসে বলতে পারে না, আর না হেসে গম্ভীর হয়ে থাকতে পারলেই যেন শান্তি পায়। ননীকাকার কথা সব সময় মনে পড়ছে, তাই যেন মনে-প্রাণে আর চোখে-মুখে একটা থমথমে বিষাদ ও বিস্বাদের ভাব নিয়ে বসে থাকে, কাজ করে, আবার ছটফট করেও ওঠে।

ননীকাকা যেদিন মারা গেলেন, ঠিক তার পরের দিনেই বিকেলবেলাতে নীচেরতলার বারান্দার ওদিকে দাঁড়িয়ে অনুপমের ঘরের দরজাটার দিকে তাকিয়েছিল প্রতিভা। সবুজ পর্দাটাকে নয় ; দরজার কাছে বারান্দার উপরে একটা টুলের উপরে বসেছিল যে দারোয়ান বীরবাহাদুর তাকেই দেখছিল প্রতিভা। ঝি দুর্গাবালা বারান্দা মুছতে মুছতে ওই ঘরের দরজার দিকে একটু এগিয়ে যেতেই হেই-হেই করে ধমক দিয়ে লাফিয়ে ওঠে বীরবাহাদুর—ইধর নেহি, ইধর নেহি।

—কী হলো গো? ধমকাও কেন? চমকে উঠেই জিজ্ঞেস করে দুর্গাবালা।

বীরবাহদুর জবাব দেয়—ইধর আনা মানা হ্যায়।

দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেও এই অদ্ভুত দৃশ্যটাকে বেশ স্পষ্ট করেই দেখতে পেয়েছিল প্রতিভা। আর হেসেও ফেলেছিল।

ঘরের দরজার সবুজ পর্দা সরিয়ে বাইরে বের হয়ে আসে অনুপম। তারপর প্রতিভার কাছে এগিয়ে এসে হাসতে থাকে—বীরবাহাদুরের বুদ্ধি আর বুলডগের বুদ্ধি, দুইই সমান; বিশেষ কোন তফাত নেই।...কিন্তু তুমি ওরকম করে হাসছো কেন?

প্রতিভা—কী রকম?

অনুপম—যেন...যেন থিয়েটারের একটা লজ্জার সীন দেখে হাসছো।

ঠিকই, মুখের উপর শাড়ির আঁচলটাকে চেপে রেখে অদ্ভুতভাবে হাসছে প্রতিভা। শুধু মাথা নেড়ে জবাব দেয়—হুঁ।

অনুপম—কী করবে আর বল? বীরবাহাদুরের বুদ্ধিটার একটু সভ্য হতে দেরি হবে। তুমি বরং দুর্গাবালাকে একটু বুঝিয়ে বলে দিও, আমার ওই ঘরে যখন কেউ থাকবে না, তখন যেন ওদিকের বারান্দা ধোয়া-মোছা করে।

প্রতিভা—হুঁ।

অনুপম—ননীকাকারও বুদ্ধির অবস্থা কেমন-যেন এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। তা না হলে...।

চমকে ওঠে প্রতিভা।—দুধ পুড়ছে বোধ হয়। কী বিশ্রী গন্ধ। সুধার মা কি নাক বন্ধ করে কাজ করছে? ছিঃ। বলতে বলতে ব্যস্ত হয়ে বারান্দা পার হয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল প্রতিভা।

কোন সন্দেহ নেই, প্রতিভা সব সময় ননীকাকার কথা শুধু যে ভাবছে, তা নয়। বেশ বড় করেই ভাবছে। ননীকাকা যেন পৃথিবীর একটা অষ্টম আশ্চর্য, এইরকম একটা ধারণার মায়াতে পড়ে প্রতিভার নরম মনটা আরও নরম হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ভুল করছে প্রতিভা, খুব খারাপ ভুল। বুঝতেও পারছে না যে, ওরকমের শুকনো হাসি আর মনমরা ভাব নিয়ে চোখ-মুখ সব সময় উদাস করে রাখলে একজনের ওপর কত অন্যায় করা হয়। তার ঘরের জীবনটাকেও যে বিস্বাদ করে দেওয়া হয়। তার যে কল্পনা করতেও ভয় হয়; প্রতিভার চোখের কালো তারা খুশি হয়ে নাচছে না, ঠোঁট দুটো লালচে হয়ে কাঁপছে না। মুখে হাসি নেই, সাজে শোভা নেই, আর শরীরটা রুগিয়ে যাচ্ছে। এমন প্রতিভাকে বুকে জড়িয়ে ধরলে যে অনুপমের বুকটাও উদাস হয়ে যাবে, কোন তৃপ্তি পাবে না।

এক-এক সময় মনে হয়েছে অনুপমের, প্রতিভাকে সত্যিই যদি খুব করে হাসিয়ে দিতে পারা যেত, তবে প্রতিভার মনের ওই গুমোট দূর হয়ে যেত, যে গুমোট ঘনিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছেন ননীকাকা। তাই আজ ইচ্ছে করেই প্রতিভার হাতটাকে ওভাবে ধরে রেখেছে অনুপম। ইচ্ছে করেই বারবার হাসছে; প্রতিভাকে হাসিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায় অনুপম।

নতুন গ্যারেজের নতুন কংক্রীটের ছাদের উপর ঝুপ করে যেন একটা শব্দ আছড়ে পড়েছে। মুখ ফিরিয়ে তাকায় অনুপম। ভবতোষবাবুর বাড়ির পাঁচিলের কাছের নারকেল গাছের মাথা থেকে মস্ত বড় একটা ঝুনো খসে পড়েছে। একেবারে গ্যারেজের ছাদের ঠিক মাঝখানেই পড়েছে।

হেসে ফেলে অনুপম।—জাপানী বোমা।

প্রতিভা—কি বললে?

অনুপম—দেখতে পাচ্ছ না, জানালার কাছে দাঁড়িয়ে জগদম্বা দেবী কী রকম চোখ কটমট করে দেখছেন?

—কে? ভবতোষবাবুর বাড়ির জানালার দিকে তাকায় প্রতিভা।

প্রতিভা—কী দেখছেন উনি?

অনুপম—আমার গ্যারেজের ছাদটা তাঁর নারকেলকে কী ভয়ানক একটা ব্যথা দিল, তাই দেখছেন।

প্রতিভা—তোমার কথার মানে কিছু বুঝতে পারছি না।

অনুপম—তোমার একটুও হাসি পাচ্ছে না?

প্রতিভা—হাসবার কী আছে?

অনুপম—আগে কিন্তু এতেই হাসতে।...আচ্ছা, আমি এখন চলি।

প্রতিভা—একটা কথা ছিল।

অনুপম—বল।

প্রতিভা—একটু দাঁড়াও।

ঘরের ভিতরে ঢুকে তখনই বের হয়ে আসে প্রতিভা। রূপোর চেনে বাঁধা মস্ত বড় একটা চকচকে চাবিকে অনুপমের হাতের কাছে এগিয়ে দেয়।—নাও।

—দাও। স্টীল-সেফের চাবিটাকে হাতে তুলে নিয়ে প্রতিভার মুখের দিকে তাকায় অনুপম।—এটা তোমার কাছে রাখতে কি তোমার খুব অসুবিধে হচ্ছিল?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—অত টাকা আমি গুনতে পারি না। আমার ভুল হবে, তাতে তোমারই অসুবিধে হবে।

মিথ্যে কথা বলেনি প্রতিভা। বাড়িয়েও বলেনি। অনুপম নিজেই জানে, নীচের ঘর থেকে রামপ্রসাদকে দিয়ে প্রতিভার কাছে স্লিপ পাঠিয়ে যতবার টাকা চেয়েছে অনুপম, ততবারই হিসেব করে টাকা পাঠাতে ভুল করেছে প্রতিভা। এক হাজার তের টাকা চেয়ে পাঠালে এক হাজার একশো তের টাকা পাঠিয়েছে।

অনুপম—একটু ধৈর্য ধরলে কিন্তু একদিন নিজেই বুঝতে পারতে, টাকা গুনতে তোমার কোন ভুল হচ্ছে না, হিসেব করতে ভাল লাগছে।

প্রতিভা—তুমি কিছু মনে করো না।

অনুপম হাসে—কিচ্ছু না। আমার তো ধৈর্য হারালে চলবে না।

চলে গেল অনুপম।

গুপ্তিপাড়ার চৌধুরী বাড়ির মেয়ে, যে-মেয়ের চোখ পান্‌সে নয়, সে-মেয়ের দুই চোখ কিন্তু এইবার জলে ভরে যায়। এ বাড়িতে এসে এই প্রথম প্রতিভার চোখে জল ছলছল করছে। বলতে ইচ্ছে করে, ভুল সন্দেহ করলে তুমি। আমিও ধৈর্য হারাইনি, একটুও না। ধৈর্য হারালে আমার যে সবই যাবে।

হাসতে তো হবেই। না হেসে বেঁচে থাকবো কি করে? কিন্তু তুমিই বা কেন এত তাড়াতাড়ি করে আমাকে হাসাবার চেষ্টা করছো? একটু সময় দাও। শোকের মানুষকে কি কেউ কাতুকুতু দিয়ে হাসায়?

গ্যারেজ ঘরে শব্দ গুরগুর করছে। গাড়িটা বের হচ্ছে বোধহয়। হ্যাঁ, বের হয়েই গেল। কোথায় গেল কে জানে। ভদ্রলোকের বাইরের কাজের সঙ্গে ঘরের মানুষের মনের কোন চিন্তা জড়িয়ে রাখবার দরকার নেই ; স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন। বেশ তো, তাই হবে।

ঘরে ঢুকে আর আয়নার কাছে নয়, বিছানারই উপর চুপ করে বসে থাকে প্রতিভা। এখন আর কোন কাজ নেই মনে হয়। কিন্তু চেষ্টা করে খুঁজলে কি কাজের কোন অভাব হয়? কলতলায় গিয়ে একবার দেখে এলেই তো হয়, দুর্গাবালার কাপড়-কাচা শেষ হলো কিনা। কাপড় কাচতে বড় বেশি সাবান খরচ করে ফেলে দুর্গাবালা।

কিন্তু এত ক্লান্তি বোধ করতে হচ্ছে কেন? এটা কি শরীরটারই কোন দোষ? ভগবান রক্ষে করুন। না না, কখ্‌খনো না। এখন যে কোন ইচ্ছেই করে না। এত অনিচ্ছাকে তুচ্ছ করে কেউ যেন এখনই আসে না। অনেক সময় আছে। ইচ্ছের সময়টা এখনই ফুরিয়ে যাচ্ছে না। পড়বেই তো, ননীকাকার নাতিরা একদিন অনেক বই পড়বে।

বুঝতে পারেনি প্রতিভা, ক্লান্তিটা কখন এমন করে একটা গভীর ঘুম হয়ে ঢলে পড়েছিল। ধড়ফড় করে জেগে উঠতেই মনে হয় ঘরের ভিতরে যেন একটা কলকলে হাসির জোয়ার এসে ঢুকেছে। তার পরেই চমকে ওঠে ; বিছানা থেকে নেমে পড়ে। ঘুমভাঙা দুই চোখের চমকানো বিস্ময় নিয়ে ঘরের ভিতরে দুই অচেনা আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। দুই মহিলা ঘরে ঢুকেছেন আর হাসছেন।

এক মহিলা অন্য মহিলাকে দেখিয়ে দিয়ে কথা বলেন--ইনি হলেন সুচারু, চন্দ্রদেবের রোহিণী।

সুচারু আবার অন্য মহিলাকে দেখিয়ে দিয়ে বলেন--উনি হলেন মীরা, সূর্যদেবের ছায়া।

দুই মহিলার হাসি একসঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে এক সঙ্গেই কথা বলে—খবর-টবর না দিয়ে, সোজা এসে ঘরে ঢুকে পড়লাম। কিছু মনে করবেন না, ভাই।

সুচারু বলেন—অনেকদিন থেকেই ভাবছিলাম, যাই একবার অনুপমাকে দেখে আসি। কিন্তু সাতকাজের ঝঞ্ঝাটে কি আসতে পারা যায়?

মীরা—তোমার সাতকাজ মানে তো সাতবার করে চন্দ্রবাবুর ঘরে উঁকি দেওয়া ; আর একা আছেন দেখতে পেলেই ঘরে ঢুকে পড়া।

সুচারু--কে কাকে বলছে, শোন! নিম বলে নিসিন্দেকে তুই বড় তেতো! শুনুন তবে অনুপমা ; এর বাড়িতে যখনই যান না কেন, গেলেই শুনতে পাবেন, সূর্যবাবু গান গাইছেন—তোমা বই আর জানিনে।

মীরা—কিন্তু আমি তো গান গাই না। আমাকে কারও কিছু বলবার সাধ্যি নেই।...ছি ছি, আমরা শুধু নিজেদের কথাই বলছি। আর অনুপমাও আমাদের রকম দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে শুধু হাসছেন, কিন্তু কিছুই বলছেন না।

সুচারু—না ভাই, অনুপমা। না বললে চলবে না।

প্রতিভা--বলুন, কী বলবো।

সুচারু--শোন কথা, এটাও কি বলে দিতে হবে?

মীরা মুখ টিপে হাসেন—অসময়ে শুয়েছিলেন কেন? শরীর ভাল যাচ্ছে না, বোধহয়?

সুচারু—আমি কিন্তু সত্যিই এবার ডাক্তারের মত একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো। বলতে হবে। লজ্জা করলে চলবে না।

প্রতিভার কানের কাছে মুখ এগিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসার কথাটাকে বলেই ফেললেন সুচারু। শিউরে ওঠে প্রতিভা ; শুধু কান দুটো নয় ; মুখটাও লালচে হয়ে যায়। আর ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে জবাব দেয়—না।

সুচারু—তাহলে কিছু নয়। এখনই চিন্তে করবার কিছু নেই।

মীরা বলেন--আমার একটা কথা শুনুন ভাই। সব সময় হেসে খেলে থাকবেন। কখ্‌খনো মনমরা হয়ে থাকবেন না। এত সুন্দর সুখের ঘর আপনার, আপনি কেন মিছিমিছি সব সময় উদাস হয়ে থাকবেন?

সুচারু—সত্যি, আপনার মনের অবস্থার কথা শুনতে পেয়ে খুবই কষ্ট বোধ করেছি।

প্রতিভা—কোথায় শুনলেন?

সুচারু—আপনার কর্তা গিয়ে ওঁকে বললেন, সূর্যবাবুকেও বললেন। তারপর আমরা দুজনেও দুই কর্তার কাছে ধমক খেলাম, যাও এখনই গিয়ে অনুপমের স্ত্রীকে বুঝিয়ে এস।

মীরা—আপনি নিজেই বুঝে দেখুন, সংসারে থাকতে হলে শোক-তাপের জ্বালা ভুল থাকতেই হয়। দুঃখের মধ্যেও হাসতে হয়। আশি বছর বয়সের একটি মানুষ চলে গিয়েছেন, যাবার বয়স তো হয়েই গিয়েছিল। হ্যাঁ, দুঃখ হবেই, কিন্তু সে দুঃখ পুষে রাখবেন কেন?

সুচারু—ও বয়সের মানুষের কাছে জীবনটা তো একটা বোঝা হয়ে যায়। সে বোঝা নামিয়ে চলে গিয়েছেন, শান্তি পেয়েছেন। বলুন, আমি কি বাজে কথা বলছি?

প্রতিভা—না না, একটুও বাজে কথা নয়। আপনি যা বলছেন, ঠিকই বলছেন।

মীরা—তবে চলুন, আপনার তেতলার চেহারা একবার দেখে যাই।

তেতলার চেহারা দেখলেন সুচারু আর মীরা। সুচারু বলেন—আপনি কিন্তু এই ঘরটা নেবেন ভাই ; কী চমৎকার। এ ঘরে সব সময় হাওয়া ফুরফুর করবে, একথা আমি এখনই বলে রাখছি।

মীরা—সন্ধ্যা হলে একবার এই জানালাটার কাছে দাঁড়াবেন ভাই। তাহলে আপনার মুখের ওপর আলো পড়বে আর আপনার খোঁপার চুলও ফুরফুর করবে। আপনাকে তখন কী সুন্দরই যে দেখতে লাগবে তা আমি এখনই দেখতে পাচ্ছি।

প্রতিভা—চলুন, চা খাবেন। নীচে যাই।

নীচের তলায় নেমে এসে চা খেলেন সুচারু আর মীরা। তারপর বিদায় নিলেন। কিন্তু বারান্দাটা পার হয়ে যেতে গিয়ে এক জায়গায় দুজনেই থমকে দাঁড়ালেন।

মীরা—এটা কিসের ঘর, ভাই?

প্রতিভা—এই ঘরেই থাকতেন ননীকাকা।

সুচারু—তাই বলুন।

মীরা—শুনেছি, মাত্র ষাট টাকা পেনসন পেতেন।

সুচারু—তার ওপর বুদ্ধি-সুদ্ধিও ঘুলিয়ে গিয়েছিল।

মীরা—এটাও একরকমের অমানুষ হয়ে যাওয়া।

সুচারু—শুনতেন এক কথা, বুঝতেন আর-এক কথা।

মীরা—এমন বিড়ম্বনা হয়ে বেঁচে থাকবার কোন মানেও হয় না।

সুচারু—হ্যাঁ, ভালই হয়েছে যে চলে গিয়েছেন।...আচ্ছা চলি।

প্রতিভা আর এগিয়ে যায় না। চুপ করে আর নিথর হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে।

দূরের একটা ঘরের সবুজ পর্দা ঠেলে দিয়ে বের হয়ে আসে অনুপম। তারপর ব্যস্তভাবে হেঁটে এসে প্রতিভার কাছে দাঁড়ায়। অনুপমের চোখেও অদ্ভুত একটা ব্যস্ততার দৃষ্টি। যেন প্রতিভার মুখের হাসি দেখবার জন্য দুর্বার একটা আকুলতা।

অনুপম—এ কি? তুমি এত গম্ভীর কেন?

প্রতিভা ডাকে—রামপ্রসাদ!

রামপ্রসাদ কাছে আসতেই প্রতিভা ধমক দিয়ে বলে—এ ঘরের দরজায় তালা কেন? কে বলেছে ঘরটাকে তালাবন্ধ করে রাখতে?

রামপ্রসাদ ভয়ে ভয়ে বলে—বাবু বলেছেন।

প্রতিভা—তার মানে, এ ঘরে ধূপ ঘোরানো হয় না?

রামপ্রসাদ—না।

প্রতিভা—বইয়ের ঘরে?

রামপ্রসাদ—না।

প্রতিভা—এ ভুল আর কখ্খনো করবে না, রামপ্রসাদ। এই দুই ঘরেই রোজ সন্ধ্যায় একবার ধূপ ঘুরিয়ে যেও।

আর এক মুহূর্তও দেরি না করে ব্যস্তভাবে চলে গেল প্রতিভা।

ঘরের দরজার বন্ধ কপাটে টোকা পড়ছে, টক্ টক্ টক্! যেন স্তব্ধ রাত্রির বুকের উপর একটা কঠোর বিস্ময়ের টোকা পড়ছে।

তারপর আর টোকার শব্দ নয়। দুম্ দুম্ শব্দ। যেন দরজার কপাটের উপরে একটা আক্রোশের হাত ছটফটিয়ে আছড়ে পড়ছে।

মাঝরাতের নীরবতার মধ্যে এ-বড় অদ্ভুত শব্দ। সে শব্দে রাস্তার এ-আর-পি'র কানও চমকে উঠতে পারে। পাশের বাড়ির জগদম্বা দেবীর ঘরের জানালাও খুলে যেতে পারে। কিন্তু ঘরের ভিতরের ঘুমটা তবু চমকে উঠছে না।

কিন্তু আর দেরি হয় না। শব্দটা এইবার ঘরের ভিতরে ঘুমন্ত প্রতিভার স্বপ্নেরই বুকের উপর আছড়ে পড়ে বেজে ওঠে। ধড়ফড় করে জেগে উঠেই ঘরের দরজা খুলে দেয় প্রতিভা।

ঘরের ভিতরে ঢুকে অনেকক্ষণ কথা বলে না অনুপম। সিগারেট ধরায়, খোলা দরজার বাইরের অন্ধকারটার দিকে তাকিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে।

প্রতিভা—খেয়েছো?

অনুপম--হ্যাঁ, তুমি খেলে না কেন?

প্রতিভা—আমি তো সুধার মা'কে আগেই বলে রেখেছিলাম, আজ আমি খাব না।

--এবার থেকে আমার অপেক্ষায় না থেকে তুমি আগেই খেয়ে নেবে।

--না।

—তাহলে আমার কথা শোন ; তোমাকে আগেই খেয়ে নিতে হবে। যেন ভুল না হয়।

চমকে উঠে, অনুপমের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই চোখ নামিয়ে ফেলে প্রতিভা।—আচ্ছা!

—আর, যত রাতই হোক্ এ ঘরের দরজা বন্ধ করবে না।

—আচ্ছা।

—আজ বন্ধ করে রেখেছিলে কেন?

—ভুল হয়েছে।

—কেন এমন ভুল হলো?

—ভয় করছিল।

—আগে কোনদিনও তো ভয় করেনি।

—না।

—তবে আজ কেন?

—কিছু বুঝতে পারছি না।

—তুমি কিছু বুঝতে পারছো না, এমন কথাও আমাকে বিশ্বাস করতে হবে? ননীকাকার ওই সূক্ষ্ম পাগলাটে ফিলসফিটাকে তো খুব তাড়াতাড়ি বুঝে ফেলতে পেরেছো।

—বিশ্বাস কর, বুঝতে পারছি না।

—বেশ, এবার শুয়ে পড়।

—তুমি শোও।

—আমি তো শুয়েই পড়েছি।

—আমি একটু বসে থাকি।

—কোথায়? চেয়ারে?

—হ্যাঁ।

বিছানা থেকে নেমে প্রতিভার কাছে এসে দাঁড়ায় অনুপম—কেন?

—একটু ভাবতে দাও।

প্রতিভার একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে, আর প্রতিভার মুখের কাছে চোখ দুটোকে এগিয়ে নিয়ে কথা বলে অনুপম—কী ভাবতে চাও?

প্রতিভা—আমার এখন ইচ্ছেই করছে না।

—কেন?

—বুকটা কেন-যেন হাঁস-ফাঁস করছে। একটু জিরিয়ে নিতে দাও।

—না।

—ও কি? তুমি এরকম করে তাকাচ্ছো কেন?

প্রতিভার হাত ধরে টান দেয় অনুপম—শোবে চল।

আর কোন কথা বলে না প্রতিভা। আপত্তিও করে না। শুধু বিছানার কাছে এগিয়ে এসেই একবার থমকে দাঁড়ায়। অনুপমের চোখ দুটোকে আর-একবার একটু ভাল করে দেখে নেয়।

তারপর মুমূর্ষু নিঃশ্বাসের সাড়ার মত এই ঘরের সব সাড়াও যেন ধুকুপুকু করে করে শেষ হয়ে যায়। গভীর রাত্রের নীরবতার মধ্যে এই ঘর যেন নিরেট একটা স্তব্ধতা।

তখনও ভোর হয়নি, রাত আছে। রাস্তার উপরে মিলিটারীর গাড়ি একটা মাতালকে থেঁতলে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। তাই ছোট্ট একটা ভীরু হল্লা রাস্তার উপরে দৌড়াদৌড়ি করছে।

হল্লার শব্দটা নয়, ভবতোষবাবুর বাড়ির নারকেল গাছের কাক হঠাৎ ভুল করে ডেকে ফেলেছে, সেজন্যেও নয়। বাইরের পৃথিবীর কোন শব্দ অনুপমের এই ঘরের ভিতরে ঢোকেনি, যদিও দরজাটা তখনও খোলা হয়েই রয়েছে।

আজ অনুপমের ঘুমের মধ্যেও যেন একটা জ্বালা ছিল। তাই জেগে উঠেছে অনুপম। বিছানা থেকে নেমে গিয়ে একটা চেয়ারের উপর বসে পড়ে অনুপম। তার পরেই ডাক দেয় —তুমি কি ঘুমোচ্ছ?

—না।

এতক্ষণ কি তাহলে জেগেই ছিলে?

—হ্যাঁ।

—উঠে বসো, কথা আছে।

প্রতিভার মিথ্যে ঘুমের শোয়া শরীরটা তখনি উঠে বসে। অনুপমও বলতে থাকে।—আমি তোমার জন্য যে একজোড়া হীরের দুল এনেছি, সেটা কি কোনদিনও পরেছ?

—না।

—পরবে না?

—ইচ্ছে হলেই পরবো।

—ইচ্ছেটাকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি?

—বুঝলাম না।

—ইচ্ছেটাকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি?

—একথাটা না বললেই ভাল করতে।

—কেন?

—এটা খুব ভুল কথা।

—যাই হোক, একদিন যখন পরতেই হবে, না পরে পারবে না, তখন...তবে শোন।

অনেকদিন আগে, আমি তখন স্কুলের ছাত্র, আমাদের এই বাগবাজারের গঙ্গার ঘাটের কাছে একদিন কোথা থেকে একটা জটাধারী সাধু এসে আড্ডা নিল। সাধুটা চিমটে বাজিয়ে ভজন গাইতো আর কোন গেঁজেলকে দেখতে পেলেই চোখ পাকিয়ে ধমক দিত—গাঁজা পিনা পাপ হ্যায়। কিন্তু পাঁচু গেঁজেল ইচ্ছে করে রোজই এক চিলিম গাঁজা এই সাধুর চোখের

সামনে ফেলে রেখে দিয়ে চলে যেত। পরের দিন এসে দেখতে পেত পাঁচু, গাঁজার চিলিম তেমনই পড়ে আছে, সাধুবাবা সেই চিলিম একবার ছোঁয়ওনি। কিন্তু পাঁচুও ছাড়েনি। সন্ধ্যাবেলা রোজই ওইরকম এক চিলিম গাঁজা ফেলে রেখে যায় আর রাত্রিবেলা ফিরে এসে একটু দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে, কী করছেন সাধু মহারাজ। এভাবে, ঠিক একটা মাস পরেই একদিন দেখতে পেল পাঁচু গেঁজেল ও তার দল, গাছতলার অন্ধকারে গাঁজার চিলিমের আগুন লালচে হয়ে হাসছে, ধোঁয়াও উড়ছে, বাতাসে গাঁজার গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। শেষে কাছে এসে দেখেই ফেললো পাঁচু, সাধুবাবা বিভোর হয়ে আর গাঁজার চিলিম মুখের কাছে তুলে নিয়ে লম্বা লম্বা টান দিচ্ছেন।

অনুপমের মুখের দিকে একবার তাকায় প্রতিভা। মাথাটা তখনই হেঁট হয়ে ঝুঁকে পড়ে। বোধহয় চোখ লুকোবার চেষ্টা।

টেবিলের উপরের একটা লাল বাতিকেও জ্বেলে দিয়েছে অনুপম। একটা নীলবাতি, একটা লালবাতি, আর দুটোরই উপরে কালো কাপড়ের আধা ঘেরাটোপ। অনুপমের মুখের হাসিটা যেন নানা রংয়ের ছোপ নিয়ে একটা অদ্ভুত চেহারা ধরেছে, নীলচে লালচে আর কালচে। দেখতে পেয়ে প্রতিভার চোখ দুটো নিশ্চয় শিউরে উঠেছে।

অনুপম—গুপ্তিপাড়ার চিঠি পেয়েছো?

প্রতিভা—পেয়েছি।

—কী বলে চিঠি? ভাল খবর?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু আমি তো অন্য রকমের একটা খবর পেয়েছি। হাজরা মশাইয়ের কাছে চার বিঘে জমি বেচতে হয়েছে।

—আমি জানি না।

—জান না বলেই জানিয়ে দিলাম।

—আমার জেনেই বা কী লাভ?

—লাভ এই যে, একটা চেতনা লাভ হবে। একটু ভাল করে বুঝতে পারবে. আগে কোথায় ছিলে আর এখন কোথায় আছ?

আবার মুখ তোলে প্রতিভা। অনুপমের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আবার মাথা ঝুঁকিয়ে চোখ লুকোবার চেষ্টা করে।

অনুপম—তুমি কখনও তেজমরা সাপের চেহারা দেখেছো? গুপ্তিপাড়ার চালতে বাগানে নিশ্চয় অনেক সাপ আছে। ফোঁস করে একবার ফণা তুলেই তখুনি আবার মাথাটিকে ঝুপ করে ঝুঁকিয়ে দিয়ে ফণা গুটিয়ে ফেলে।

জবাব দেয় না প্রতিভা। তেজমরা সাপের মত সেই ঝুঁকে পড়া মাথাটারই শক্ত খোঁপাটাকে খুলতে থাকে।

অনুপম—ওই বোসপাড়াতে ছোট একটা মুদীর দোকান ছিল ; হরি মুদীর দোকান। দোকানটা এখন আর নেই। কলেরায় মরে গিয়েছে হরি মুদী। সেই হরি মুদীর জীবনের একটা মজার গল্প শুনবে?

সাড়া দেয় না প্রতিভা।

চেঁচিয়ে ওঠে অনুপম—শুনতে হবে। শোন। খুব মন দিয়ে শোন।...হরি মুদী শখ করে একটা যাত্রার দলে ভিড়েছিল। সন্ধ্যা হতেই দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে যাত্রাদলের আখড়াতে যেত, রাজা-গজার পার্ট নিয়ে ভাল-ভাল আর বড়-বড় কথা মুখস্থ করতো। হাত নেড়ে আর মাথা দুলিয়ে অভিনয় শিখতো। সেই হরি মুদী একদিন আখড়াতে যেতে না পেরে বাড়িতেই মুদিনীর সামনে হাঁটু পেতে বসে আর দুই হাত জোড় করে পার্টের মুখস্থ কথা আউড়েছিল—

দেবি! রাখ এই বুকে তোমার ওই রাঙা-চরণ! মুদিনী তখুনি ওর একটা পা তুলে নিয়ে হরি মুদীর বুকের উপর রেখে দিয়েছিল।

প্রতিভার খোঁপার জরি-ফিতেটা হাত ফসকে মেজের উপরে পড়ে যায়। তখুনি তুলে নিয়ে ফিতেটাকে বিছানার উপর রেখে দেয়।

অনুপম—আশ্চর্যের কথা এই যে, কোন-কোন গবেট মেয়ে স্বামীর মুখ থেকে ভালবাসার দুটো ভাল কথা শুনেই বিশ্বাস করে ফেলেন যে, তিনি একটি দেবী। ওটা ভয়ানক একটা ভুল বিশ্বাস, প্রতিভা।

প্রতিভার এতক্ষণের নীরব মুখটা হঠাৎ বলে ওঠে—নিশ্চয়।

অনুপম—হ্যাঁ, নিশ্চয়। নিশ্চয় যেন সব সময় মনে থাকে।

কাক ডেকে উঠেছে। ভোরের কাকেরই ডাক। পুবের আকাশেও ঘুমভাঙা আলোর আভা জেগেছে। টেবিলের বাতি নিভিয়ে দিয়ে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ায় অনুপম। বারান্দার রেলিংয়ের উপরে হাত দুটোকে আল্‌গা করে রেখে দিয়ে আর চোখ ঘুরিয়ে দেখতে থাকে, ভোরের বাতাসে উসখুস করছে গ্যারেজ-ঘরের ছাদের উপর কয়েকটা শুকনো পাতা। তার উপর হুটোপুটি করে খেলা করছে দুটো কাঠবিড়ালী।

বোধহয় একটা লঞ্চ এসে গঙ্গার ঘাটে লাগবার চেষ্টা করছে। উলুবেড়ের মাছের লঞ্চ ঠিক এই সময়ে রোজই আসে। তাই একটা জলভাঙা ছলছল শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

ঘরের ভিতরে ঢুকে আর কামিজটাকে গায়ে দিয়েই অনুপম বলে—চল।

প্রতিভা—কোথায়?

অনুপম—আবার জিজ্ঞেস করা কেন? যেতে বলছি, যেতে হবে।

প্রতিভা—চল।

তারপর আর দেরি হয় না। নীচে নেমে আসে অনুপম, সঙ্গে প্রতিভা। দারোয়ান বীরবাহাদুর গেট খুলে দেয়। গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করে অনুপম।—উঠে বসো।...না পিছনের সীটে নয়, সামনের সীটে বসো।

অনুপমও উঠে বসে, স্টিয়ারিং-এর চাকা দু' হাতে আঁকড়ে ধরে। শব্দ করে গুমরে ওঠে, ছুটে বের হয়ে যায় নতুন গাড়িটা।

হাওড়া-পুলের মুখের কাছে এসে গাড়ির স্পীড একটু মৃদু করে দেয় অনুপম।—কেমন হয়, যদি এখান থেকে গঙ্গা পার হয়ে ওদিকের হাওড়া, তারপর বালীতে ওদিক থেকে গঙ্গা পার হয়ে এদিকে দক্ষিণেশ্বর, তারপর সোজা আবার আমাদের বাগবাজারে ফিরে আসা যায়? মন্দ নয়, কী বল?

প্রতিভা—তুমি যা বলবে, তাই।

অনুপম—আমি তো বলতে চাই, তুমি রোজই সন্ধ্যাবেলা একবার বেড়িয়ে আসবে। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে অবিশ্যি অসুবিধেয় পড়বে। হয়তো আমিই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলাম, সেদিন সন্ধ্যাবেলা তোমার আর বেড়াতে যাওয়া সম্ভব হবে না। যাই হোক, এ অসুবিধেও বেশি দিন থাকবে না। খুব সম্ভব তিন-চার মাসের মধ্যেই আর-একটা নতুন গাড়ি পেয়ে যাব।

সালকিয়ার এই রাস্তার এখানে এত সকালেও কী ভয়ানক একটা নড়বড়ে ভিড়। টিনের চালার একটা শেড পুরনো টিনের বেড়া দিয়ে ঘেরা, এটা নিশ্চয় একটা লঙ্গরখানা। লঙ্গরখানাতে ধোঁয়া নেই, এখনও উনান জ্বলেনি। তবু এরই মধ্যে কত বড় একটা খাই-খাই ভিড় জুটে গিয়েছে।

জোরে জোরে হর্ন বাজিয়ে আর ভিড়ের ভিতর দিয়ে পথ করে নিয়ে অনুপমের গাড়িটা আবার স্পীড বাড়িয়ে দেয়। অনুপম বলে—একটু সাহস করে না চলতে পারলে এ পৃথিবীতে কেউই তোমাকে পথ ছেড়ে দেবে না, তুমিও চলতেই পারবে না। বাবা বলতেন...।

বালীর গঙ্গাপুলের উপর দিয়ে পুবমুখো হয়ে ছুটে চলেছে অনুপমের গাড়ি। সকালবেলার ঝলমলে রোদ গাড়ির সামনের কাচের উপর ঝলসে ঝলসে জ্বলছে। প্রতিভার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নেয় অনুপম।—আজ আমার সত্যিকারের নিজের জন বলতে তুমি ছাড়া আর কে আছে, বল? কেউ নেই। আমি কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি যে, তুমি একটা বাজে চিন্তে মনের মধ্যে পুষে রেখে আমাকে কষ্ট দিতে পার, আর আমিও কতগুলো শক্ত কথা বলে তোমাকে কষ্ট দিতে পারি। এ বড় ভুল হয়ে যাচ্ছে, প্রতিভা।

গঙ্গার জলের ঢেউয়ের উপরেও সকালের রোদের আলো দুলছে ভাঙছে আর গলে গলে গড়িয়ে যাচ্ছে। অনুপম বলে—ভালবেসে একটা জিনিস এনে দিয়েছি ; ওটাকে তুচ্ছ করো না। তুচ্ছ করতে নেই। সব সময় না হোক, অন্তত মাঝে মাঝে ওই দুল কানে দিও।

কে জানে কখন ব্যারাকপুর পার হয়েছে গাড়িটা। এইবার সিঁথি পার হয়ে টালার পুলের উপরে উঠছে। অনুপম বলে—তোমাকে বোধহয় খুব শিগ্‌গির নেমন্তন্ন করতে আসবেন রোহিণী, তার মানে...।

হেসে ফেলে অনুপম—তার মানে চন্দ্রবাবুর স্ত্রী। কাজেই আমি তোমার জন্যে নতুন ডিজাইনের একটা জড়োয়া নেকলেসের অর্ডার দিয়ে রেখেছি। চন্দ্রবাবুর বাড়ির নেমন্তন্নে যাবার সময় ওটা পরবে। হয়তো কাল কিংবা পরশু, নয়তো বুধবারেই জিনিসটা পাওয়া যাবে। এরই মধ্যে নেমন্তন্ন করতে যদি চলে আসেন রোহিণী, তবে তুমিও যেন আবার ভুল করে বুধবারের আগের কোনদিনের নেমন্তন্নে রাজি হয়ে যেও না।

গুপ্তিপাড়ার চিঠি। মা লিখেছে এই চিঠি। সে চিঠি একবার পড়ে নিয়েই রেখে দেয় প্রতিভা। এক হাত দিয়ে কপালটাকে টিপে ধরে। হ্যাঁ, দোলমঞ্চের ওদিকের চার-বিঘে জমি সত্যিই বিক্রী হয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ আবার হেসেও ওঠে শান্ত ও গম্ভীর এই প্রতিভার কপালের ওই কটমটে ব্যথার জ্বালাটা। মা লিখেছে ; মণ্টু খুব রোগা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখন বেশ সেরে উঠেছে। মণ্টুর জন্যে কডলিভার তেল এসেছে। চার বেলা ওষুধের বিস্কুট খায় মন্টু। মণ্টু আজকাল ওর দাদুর কাছেই সব সময় থাকে। ঘুমোবার হলেও দাদুর কোলে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কাজেই রানু একটু নিশ্চিন্ত হয়েছে, হাঁপ ছাড়বার সময় পায়। রানুরও তো দিন এগিয়ে আসছে। খুব সম্ভব বোশেখ মাসেই রানুর আঁতুড় হবে।

কিন্তু ছোট্ট একটা কাগজের টুকরোতে বউদি যে চার-লাইনের লেখা লিখেছেন, তার মধ্যে বউদির একটা মিথ্যে সন্দেহ বেশ শক্ত করে একটা খোঁচা দিয়েছে।—তুমি আজকাল যেমন মণ্টুকে ভুলেই গিয়েছ, মণ্টুও তেমনই তোমাকে ভুলে গিয়েছে। আজকাল দাদুর সঙ্গেই মণ্টুর খুব ভাব। তোমার কথা একবারও বলে না।

খুব ভাল করেছে মণ্টু। কিন্তু রানু বউদি এ কী কথা লিখলেন? মণ্টুকে এরই মধ্যে ভুলে যাব, আমার মনের এমন দুর্ভাগ্য যে এখনও হয়নি। আমার মন যে সব-সময় গুপ্তিপাড়ার ওই বাড়িতেই ছুটে গিয়ে আর মণ্টুকে বুকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়বার জন্যে ছটফট করছে। তুমিই বরং একটু সাবধান হও, বউদি ; আমার ছোঁয়াচ মণ্টুর গায়ে লাগতে দিও না।

ভদ্রলোক খুব জোর গলা করে সাধুবাবার গাঁজা খাওয়ার গল্প শুনিয়ে দিলেন। কিন্তু গল্প করে বললে তো অনেক কিছুই বলা যায়। জবাবের গল্পও আছে। সে গল্পটা তো রানু বউদিই বলেছিলেন। এক ডাকাতের একবার খুব সাধ হয়েছিল, গাঁয়ের গরীব বামুনকে ভালরকম একটা প্রণামী দিয়ে খুশি করে পুণ্যি লাভ করতে হবে। কিন্তু বামুনের আপত্তি, তোর দেওয়া কোন কিছুই আমি নেব না, ছোঁবও না। একদিন রাত্রিবেলা সেই বামুন এক মন্দিরে ঢুকেছেন, তাঁর ভাঙা-ময়লা খড়মজোড়া মন্দিরের দরজার বাইরে রেখে দিয়েছেন। ফিরে এসে দেখেন,

সেই পুরনো ভাঙা-ময়লা খড়মজোড়া নেই। সোনার বোলের একজোড়া নতুন খড়ম সেখানে পড়ে রয়েছে। গরীব বামুন একটু হাসলেন, তারপর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওরে, ভাল চাস তো আমার খড়ম দিয়ে যা, নইলে এই চললাম। সোনার বোলের খড়মজোড়াকে পা দিয়েও একবার না ছুঁয়ে খালি পায়েই হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরে এলেন সেই বামুন।

ভদ্রলোক আজ একবার খোঁজ করে সেই পাঁচু গেঁজেলকেই ডেকে আনুক না কেন। তাহলে একবার জিজ্ঞেস করা যেতে পারে, সাধুটার লোভ জন্মাবার জন্যে যে গাঁজা সাধুটার চোখের সামনে সে রেখে দিয়ে যেত, সেটা কোথা থেকে, কেমন করে আর কিসের রোজগারে কিনে আনতো পাঁচু? পাঁচু নিশ্চয় বলে দিতে পারবে। এই ভদ্রলোকও তাহলে বলে দিক না কেন, কিসের রোজগারে হীরের দুল কেনা হয়েছে? বলতে পারবে কি? বলতে এত কুণ্ঠা কেন? একটা তেজমরা সাপকে এত ভয় করবারই বা কী আছে?

বীণার দাদা বিশ্বনাথদা পুকুরের ঘাটের এদিকে-ওদিকে প্রায়ই সাপ মারণ। সাপটা মরে যাবার পরেও বিশ্বনাথদার মনের সন্দেহ যেন দূর হয় না। আবার ঠেঙ্গা দিয়ে সাপটারে মাথা ছেঁচে ঘষে আর থেঁতলে দিয়ে চলে যান।

এই ভদ্রলোকও তাই করলেন। সাপটার মাথা থেঁতলে দিলেন, যেন আর কোনদিনও ফণা তুলতে না পারে। কিন্তু সেজন্য নিজেরই গায়ে রক্ত মেখে এরকম একটা খুনী বিভীষিকা হবার কোন দরকার ছিল না।

সকাল হতেই নতুন গাড়িতে চড়ে বেড়িয়ে আসা ; খুব চমৎকার! এ যেন মরা পাখিকে জল খাওয়াবার চেষ্টা। শেফালীদির ভাই চিনুর সেই কাণ্ড দেখে হেসে ফেলেছিলেন সমরবাবু।

ভাগ্যি ভাল বলতে হবে, চন্দ্রবাবুর রোহিণী নেমন্তন্ন করতে আসেননি। তাঁর শরীর খারাপ। তাঁর মাথা ঘোরার সেই পুরনো অসুখটা আবার জোর করেছে। তিন মাস হলো বিছানায় পড়ে আছেন। নতুন ডিজাইনের নেকলেস গলায় দিয়ে নেমন্তন্নে যাবার সুখ সহ্য করবার আর দরকার হয়নি।

ভাগ্যি ভাল বলতে হবে, আজকাল রাত্রিবেলা ঘরের দরজা বন্ধ করেই ঘুমিয়ে পড়তে পারা যায়। এটা নতুন তৈরী তেতলার সবচেয়ে ভাল ঘর। কাজের মানুষ নিজেই একটু চিন্তে করে নিয়ে শেষে বলে দিয়েছেন, না, বেশি রাত পর্যন্ত দরজা খোলা রাখা উচিত নয়। ভবতোষবাবুর বাড়িতে চুরি হয়ে গিয়েছে। কিছু নগদ টাকা আর কিছু সোনার গয়না, জগদম্বা দেবীর শেষ সম্বল লোপাট হয়েছে।

কাজের মানুষ ইচ্ছে করেই পাশের ঘরে নতুন মেহগনির খাটে তার বিছানা রেখেছে। সেই ঘরেই তার স্টীল-সেফ ; সেই ঘরেই তার লেখা-পড়ার একটা নতুন টেবিল। কাজের মানুষকে অনেক রাত পর্যন্ত কাগজ-পত্র নিয়ে ভাবতে হয়, হিসেব লিখতে হয়। জানবার উপায় নেই, জানবার দরকারও নেই, ওই ঘরে কাজের মানুষ তার লেখা-জোখার কাজ কখন শেষ করে, আর, কখন ঘুমিয়ে পড়ে।

হ্যাঁ, মাঝে মাঝে অবশ্য জানতেই পারে প্রতিভা, কাজের মানুষ তার কাজের লেখাজোখা আর হিসেব শেষ করেও, এই গভীর রাতেও ঘুমিয়ে পড়েনি। প্রতিভার ঘুম যতই গভীর হোক না কেন, সে ঘুমের মধ্যে কোন স্বপ্ন থাকুক বা না-ই থাকুক, একটা শব্দ শুনে ধড়ফড়িয়ে ভেঙ্গে যায় প্রতিভার ঘুম। দরজার কপাটের গায়ে টোকা পড়ছে, টক্ টক্ টক্! বিছানা থেকে নেমেই দরজা খুলে দেয় প্রতিভা।

কী আশ্চর্য, ঘরের দরজার টোকার শব্দ বাজে যে-রাতে, ঠিক সেই রাতের পরের দিনেই সকালবেলাতে প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে সুধার মা হেসে ফেলে আর মনের ভিতরে চাপা কথাটাকে শেষে মুখ খুলে বলেই ফেলে—তোমার কেন যে এত বেশি দেরি হয়ে যাচ্ছে,

বউদি, আমি তো তার কোন নিদেন খুঁজে পাচ্ছি না।

প্রতিভা বলে—ভাগ্যি ভাল বলবো, যদি ভগবানের এই দয়া চিরকাল থাকে।

চমকে ওঠে সুধার মা'র চোখ। বউদি সত্যিই খুব গম্ভীর হয়ে আর চোখ দুটো কুঁচকে শক্ত করে নিয়ে কথা বলছেন।

সুধার মা—দাদাবাবুর চা আর খাবার কি তবে...।

প্রতিভা—তবে আবার কি? ওরকম করে কথা বলছো কেন? জিজ্ঞেস করবার কী আছে? আমাকে দাও, আমিই দিয়ে আসছি।

শেফালীদির কাছ থেকেও একটা চিঠি অনেক দিন হলো এসেছে। কেমন আছ প্রতিভা? মাঝে যে একবার লিখেছিলে মন ভাল নয়, তার মানে কি? বোধহয় শরীর ভাল নয়। কিন্তু সেজন্যে কি মন খারাপ করতে হয়? তুমি এখনও সেই আগের মতই বোকা।

চিঠির জবাব দিতে তো আর কোন অসুবিধে নেই। প্রতিভার হাতের কলম আর লাজুক হয়ে জবাব লুকোতে চেষ্টা করবে না ; পাল্টা শেফালীদিকে ঠাট্টা করে নতুন খবর জানতে চাইবে না। শুধু একটু স্পষ্ট করে লিখে দিতে হবে, ভাল আছি। শরীর একটুও খারাপ নয়। তুমি ওই বিশ্রী কথাটা বার বার লিখবে না, আমার বড় ভয় করে। শুনেছিলাম, তোমরা গিরিডি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে আসবে। সত্যি তো? কবে আসছো?

এই তিন মাসের মধ্যে আরও অনেক কিছু ভেঙেচুরে, তার বদলে মনের মত করে একটা নতুন রূপ সাজিয়ে দিয়েছেন অনুপম রায়। একেবারে নতুন চেহারার দুটো ঘর। নতুন রং আর পালিশ, নতুন পর্দা কার্পেট আর পাপোশ, আসবাবও সবই নতুন। ননীকাকার সেই ঘর, আর তাঁর বইয়ের ঘরে পুরনো চেহারার একটা ধুলোকণাও নেই। বইগুলি বড় বড় কুড়ি-পঁচিশটা শক্ত ক্যাম্বিসের থলের মধ্যে বোঝাই হয়ে এখন কলতলার কাছের একটা ছোট কুঠুরীর ভিতরে পড়ে আছে। থলেগুলি নাকি খুব মজবুত, জলে ভেজে না। অনুপম নিজেই বলেছে, এ থলে কলকাতার বাজারে পাওয়া যায় না। এগুলো মিলিটারীর জিনিস। ফোর্ট থেকে আনিয়েছে।

অনুপম রায় যেমনটি চেয়েছেন, ঠিক তেমনটি হয়ে এই বাড়ির জীবন চলছে নড়ছে হাসছে। অনুপমের চা ও খাবার হাতে নিয়ে প্রতিভা যখন উপরতলায় উঠে যায়, তখন সিঁড়ির একপাশের দেয়ালের গায়ে প্রতিবার খোঁপার ছায়াটাও দুলতে দুলতে উপরে উঠতে থাকে। বেশ শান্ত ছন্দে বাঁধা এই বাড়ির জীবন। কোন নালিশ কিংবা আক্ষেপ, কোন অভিযোগ কিংবা অভিমানের কলরব নেই।

শেফালীদি সত্যিই যদি একদিন সব বুঝে ফেলে তবে বোধ হয় চোখ দুটো বড় করে আর আতঙ্কে শিউরে উঠে জিজ্ঞাসা করবে, এরকম হলে তোমার চলবে কি করে? কতদিন চলবে? খুব চলবে, শেফালীদি। তিন মাস যখন চালাতে পেরেছি, তখন তিন বছর কিংবা ত্রিশ বছরও চালাতে পারবো। কিন্তু সাবধান, তোমার পায়ে পড়ি, মা-বাবা, দাদা আর বউদিকে কোনদিন ভুলেও কিছু বলে দিও না।

চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়েই খাবার খেতে থাকে অনুপম—এ ডালপুরি কে করেছে? তুমি?

প্রতিভা—আমি না। সুধার মা তৈরী করেছে।

অনুপম খুশি হয়ে হাসে—বুড়ির হাত তো বেশ ভাল। তুমি বোধহয়...।

প্রতিভা হাসে—আমিও পারি। আচ্ছা, কাল আমি তৈরী করবো।

হঠাৎ রুমাল দিয়ে হাতের আঙুল থেকে ডালপুরির ঘিয়ের দাগ মুছতে থাকে অনুপম। প্রতিভা বলে—ও কি? বাকি সবই তো পড়ে রইল। একটার শুধু আধখানা খেয়েই...

চমকে ওঠে প্রতিভা। প্রতিভার একটা হাত ধরে ফেলেছে অনুপম। উঠে দাঁড়ায় অনুপম।

প্রতিভাকে কাছে টেনে নিয়ে প্রতিভার পিঠে হাত বোলাতে থাকে। প্রতিভা বলে—খেয়ে নাও।

অনুপম—খাবই তো। কিন্তু তোমাকেও খেতে হবে।...না, কোন আপত্তি শুনবো না। হাঁ কর। বলতে বলতে প্রতিভার মুখের উপর একটা আস্ত ডালপুরি চেপে ধরে অনুপম।

প্রতিভা—খাচ্ছি, খাচ্ছি। আমার হাতে দাও।

অনুপম হাসে—ঠিক তো? ব্লাফ নয় তো?

প্রতিভা—না।

ডালপুরির একটা টুকরো ভেঙ্গে নিয়ে প্রতিভা মুখে ফেলতেই তাড়াতাড়ি খাবার খেতে থাকে অনুপম। তারপর তিন চুমুকে চা শেষ করে দিয়েই হাত মোছে।—আজ এখনই একবার বাইরে যেতে হবে। ফিরতে অবিশ্যি তেমন কিছু দেরি হবে না।

চলে গেল অনুপম। দোতলা থেকে নীচে। আর প্রতিভা চলে যায় দোতলা থেকে উপরে, নিজের ঘরে, যে ঘরের এই আয়না কতবার দেখেছে, ভালবাসার একটি হাত একজনকে বুকে জড়িয়ে ধরে, আর-একটি হাতে কেমন করে তার পিঠের উপর সুখের স্বপ্নের ছোঁয়া বুলিয়ে দেয়।

না না, এটা তো নতুন আয়না। সেই পুরনো আয়নাটা আর নেই, যার সামনে এ বাড়ির জীবনের সেই প্রথম দিনেই প্রতিভার গলা জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়েছিল অনুপম। বেশ ছিল সেই আয়নাটা ; একদিকের ফ্রেমটাই নেই ; নীচের অর্ধেকটা ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। এই নতুন আয়নার সামনে প্রতিভা শুধু একাই দাঁড়িয়েছে আর হেসেছে।

ঘরে নতুন আয়না এল, পাশের ঘরে একটা স্টীল-সেফও এল ; ঠিক তারপর থেকেই যেন এ বাড়ির বাতাসে একটা অপয়া ছায়ার আনাগোনা শুরু হয়ে গেল। ফুল হয়ে গেল কাঁটা। সে কাঁটা প্রতিভার প্রাণটাকে বিঁধে বিঁধে অনেক রক্ত ঝরিয়েছে ; তাতেই খুশি হয়েছে, শান্ত হয়েছে আর নিশ্চিন্ত হয়েছে অনুপম। তবে আবার হঠাৎ কেন আজ সেই পুরনো ফুলের স্মৃতি পিঠের উপর বুলিয়ে দেওয়া? তবে কি আবার সেই পুরনো মায়া আজ এতদিন পরে অনুপমের বুকের ভিতরে ঢুকে বলে দিয়েছে ; ভুল করেছো তুমি।

কিন্তু এ কী ছাই অভিশাপ! কিছুতেই যে ভুলতে পারা যায় না, কোন্ এক সুড়ঙ্গ থেকে গুপ্তধন তুলে নিয়ে এসে অনুপম তার ভাগ্য আর গর্ব তৈরী করে ফেলেছে। বেশ তো, ভাগ্য আর গর্বের মানুষটা ঘরের বাইরে বাইরেই থাকুক না কেন ; শুধু সেই পুরনো মানুষটি ঘরের ভিতরে থাকুক। তাহলেও তো একরকম চলতে পারা যাবে, মরে থাকতে হবে না।

বিছানার উপর পড়ে আছে, সিল্কের একটা পাঞ্জাবি। সোনার বোতামে আর চেনে ফাঁস লেগে পাঞ্জাবির বুকের একটা দিক কুঁচকে গিয়েছে। কাজের মানুষের তাড়াহুড়ো ব্যস্ততার ভুল আজ এই সকাল থেকেই এখানের এই ঘরের বিছানার উপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। যাবার সময় জামাটাকে তুলে নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছে অনুপম।

পাঞ্জাবিটা হাতে তুলে নিয়ে নীচের তলায় নেমে যায় প্রতিভা।—দুর্গা, তুমি কোথায়?

—এই যে মা। কলতলায় আছি।

—তোমার হাতের সাবানের কাজ হয়ে গিয়েছে?

—হ্যাঁ।

—তাহলে সাবানটা এবার আমাকে দাও।

- সে কি? জামাটা রেখে যান। আমিই সাবান দিয়ে দেব।

—না না ; তুমি সর। তুমি বরং এখন গিয়ে রান্নাঘরের দোরগোড়ার পা ছড়িয়ে বসো, আর দোক্তা খাও।

প্রতিভার এই হঠাৎ-ব্যস্ততার কাজ সারতে কতই বা সময় লাগে? পনর মিনিটের বেশি নয়। সাবান-কাচা জামাটাকে হাতে নিয়ে আবার উপরতলায় চলে যায় প্রতিভা।

সকাল মাত্র ন'টা। তবু এরই মধ্যে তেতলার এই বারান্দার হাওয়া কত শুকনো আর গরম হয়ে উঠেছে। সাবান-কাচা পাঞ্জাবিটা কত তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাচ্ছে।

ঠিক কাজ নয় ; খেলার মত একটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠে প্রতিভা। ঘরের কুঁজো থেকে এক গেলাস করে জল আনে, টীনে লিলি ও জাপানী হানার গায়ে সেই জল আস্তে আস্তে গড়িয়ে দেয়। ইস্, পাতাগুলো কত নেতিয়ে পড়েছে ; ফুলগুলোও চুপসে গিয়েছে।

রামপ্রসাদ এসে বলে—মাস্টারমশাই অজয়বাবু এসেছেন।

প্রতিভা—এসেছেন তো আমি কী করবো বল? বলে দাও, বাবু বাড়িতে নেই।

—বলেছি।

—তবে?

—বললেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

—আমার সঙ্গেই বা দেখা করে কী হবে?...হ্যাঁ, এক কাজ কর। ভদ্রলোককে আগে চা আর খাবার দাও। তারপর বলে দাও, মা আর টাকা দিতে পারবেন না। যেন বাবুর সঙ্গে দেখা করে টাকা চান।

চলে যায় রামপ্রসাদ।

ছোট্ট এইটুকু একটা গাছ, ধড়টা আধ হাতও নয়, কিন্তু কত বড়-বড় শুঁড় বের হয়েছে, দেখ! গুঁড়ো গুঁড়ো হলদে রঙের ফুলে ভরা শুঁড়গুলি টব ছাপিয়ে মেজের উপর লুটিয়ে পড়েছে। এসব বিলিতী ফুলের নামগুলিও ছাই মনে থাকে না। হলদে ফুলের শুঁড়ের উপর আস্তে আস্তে জল গড়িয়ে দিতে থাকে প্রতিভা।

রামপ্রসাদ ফিরে এসে হাসতে থাকে।—মাস্টারমশাই বলছেন, টাকা চাইতে আসেননি। টাকার দরকার নেই। আপনাকে কয়েকটা কথা বলে যেতে চান।

প্রতিভা—আমার কাছে কথা? কী কথা? ও...তাই বল! কেমন আছেন অজয়বাবুর স্ত্রী?

রামপ্রসাদ—আমাকে কিছু বলেননি।

প্রতিভা—আচ্ছা, বল গিয়ে আমি আসছি।

সত্যি বেশ ভয়-ভয় করে। কে জানে কী খবর শোনাবেন ভদ্রলোক। মহিলা সত্যিই আছেন তো? না, ডাক্তার ডাকবার আগেই...।

নীচের তলার সেই ঘর, যেটা আগে ননীকাকার বইয়ের ঘর ছিল, আর, এখন হলো নতুন সোফাতে আর কার্পেটে সাজানো একটি ঘরোয়া ড্রইং-রুম, তারই দরজার পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢোকে প্রতিভা।—কী খবর?

অজয়—সেদিন খুব ঠিক সময়ে ডাক্তারকে ধরতে পেরেছিলাম।

প্রতিভা—আপনার স্ত্রী এখন নিশ্চয় বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

—বেশ সুস্থ হয়ে ওঠা তো সম্ভব নয়। তবে আছে, একরকম ভালই আছে।

—কথা-টথা বলছেন?

—মাঝে মাঝে বলে। তবে...আপনি নিশ্চয় জানেন না যে, কথা বলতে ডাক্তারের নিষেধ আছে। তাই, যা বলতে চায় সরযু, সেটা ওকে স্লেটে লিখে লিখেই বলতে হয়।

—এ তো বড় কষ্টের কথা!

—তা তো বটেই।

—লিখে লিখে আর কতটুকুই বা বলতে কিংবা বোঝাতে পারবেন?

—সব সব ; তাতে কোন অসুবিধা হয় না।

—উনি নিশ্চয় অনেক লেখা-পড়া করেছেন।

—তা এককালে করেছেন। মেয়ে-স্কুলে পড়াতে হয়েছে।

—অসুখটা না হলে বোধহয় এখনও...।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে তো এখনও চাকরি করতো সরযূ। আগে নিজেই আমাকে কতবার ধমক দিয়ে বলেছে, তুমি ঘরে বসে থাকো, তোমাকে কোন কাজ করতে হবে না।

—যাক্, সুখবর শোনালেন। শুনে খুব ভাল লাগলো।...চা-খাবার খেয়েছেন?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, আমি এখন তবে...।

—আমি একটা কাজ ধরেছি।

—ভাল। আপনি এখন তবে...।

—এক ফরাসী মিলিটারী সাহেবের স্ত্রীকে আমাদের দেশের পাহাড়ী স্টাইলের ছবি আঁকা শেখাতে হয় ; আর মেঘদূত বুঝিয়ে দিতে হয়। মাসে একশো টাকা দিচ্ছে।

—আপনি কি এরকমের কাজ ছাড়া আর-কোন রকমের কাজ করতেই পারেন না?

—খুব পারি, কিন্তু করতে চাই না।

—কেন?

—সে বড় অস্বস্তির ব্যাপার। অনেক বাজে কথা কানে শুনতে হয়। তা ছাড়া, ওরকম ঘড়ি ধরা দশটা-পাঁচটা নিয়মে কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভবই নয়। একটানা অতক্ষণ ঘরের বাইরে থাকতে পারি না।

হেসে ফেলে প্রতিভা।—আচ্ছা, আপনি এখন তবে...।

প্রতিভার কথা শেষ না হতেই সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় অজয়। পকেট থেকে দশটা টাকা বের করে।—এই নিন। আপনার চল্লিশ টাকার মাত্র দশটা টাকা এখন দিলাম। বাকিটা যেমন পারি আর যখন পারি দিয়ে যাব।...হ্যাঁ, আপনি যথাসময়ে টাকাটা দিয়ে কী যে উপকার করলেন, তা আর বলে বোঝানো যাবে না। অনুপমকে বলবেন, আমি এসেছিলাম।

প্রতিভার চোখে যেন ছোট্ট একটা ভ্রূকুটি ছায়া-ছায়া হয়ে কাঁপতে থাকে। অজয় মাস্টারের এই কাণ্ডটাও যেন একটা শক্ত আঙুলের টোকা, প্রতিভার মুখের হাসিটাকে এলোমেলো করে দিয়েছে। প্রতিভার মুখের কথাগুলিও লজ্জা পেয়ে বিড়-বিড় করে।—আমি বুঝতে পারিনি যে, আপনি টাকা ফেরত দিতে এসেছেন। দিন তবে।

অজয়ের ফেরত দেওয়া টাকা হাতেই তুলে নেয় প্রতিভা। অজয় বলে—ফেরত দেব না? কী বলেন আপনি? সরযূ বললে, যিনি অসময়ে এত উপকার করলেন, তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে টাকাটা ফেরত দিয়ে এস। কিন্তু এ মাসে দশ টাকার বেশি দিতে পারা গেল না।

প্রতিভা হাসে—কই? ধন্যবাদ তো দিলেন না।

অজয়—দিইনি?

প্রতিভা—না।

অজয়—তাহলে ভুলই হয়েছে। কিন্তু আপনি তো বুঝতেই পেরেছেন, আপনাকে ধন্যবাদ দেবার জন্যেই এসেছি।

প্রতিভা—তা বুঝেছি। যাই হোক্, আপনি ভাল আছেন তো?

—হ্যাঁ শরীর ভাল। এ শরীর যে কখন ভাল থাকে না, তা'ও জানি না, বুঝিও না। কিন্তু...। হঠাৎ কথা থামিয়ে প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে অজয়ের দুই চোখ যেন অপলক দুটো শূন্যতার মত তাকিয়ে থাকে।

প্রতিভা—বলুন, কী যেন বলছিলেন।

অজয়—শুধু বুকটা ভাল নেই।

প্রতিভা—সে কী? আপনাকেও একটা অসুখে ধরেছে?

অজয়—না। বুকটা খালি।

প্রতিভা—তার মানে?

অজয়—পাপিয়া নেই।

প্রতিভা—কে?

—আমার মেয়ে পাপিয়া। এইটুকু একটা মেয়ে, চার বছর বয়স। ওই সেদিনই, যেদিন আপনার কাছ থেকে টাকা নিয়ে গেলাম, সেদিনই মেয়েটা, কী আশ্চর্য, বেশ কিছুক্ষণ ঘুমলো, আর, তারপরেই চলে গেল।

প্রতিভার চোখের পাতা থরথর করে কাঁপে। তাই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আর মাথা ঝুঁকিয়ে মেজের উপর পাতা মির্জাপুরী গালিচার কিনারাটার দিকে তাকিয়ে থাকে। গালিচার কিনারাতে লাল সুতোয় বোনা একটা ফুলের ডাল, তার উপর একটা পাখি।

অজয় বলে—ইতালীতে খুব পুরনো কালের একটা সমাধির পাথরে দু'লাইনের একটা কবিতা লেখা আছে। প্লিনির কবিতা। ইনি কিন্তু সেই বিখ্যাত নেচারাল হিস্টোরিয়ান প্লিনি নন, যিনি ভিসুভিয়াসের আগুন আর লাভার ভয়ানক রূপ স্টাডি করতে গিয়ে মারা গিয়েছিলেন। ইনি হলেন কবি প্লিনি : ওই প্লিনিরই ভাইপো...আপনি কি সত্যিই শুনছেন?

প্রতিভা—শুনছি।

অজয়—পাথরটা খুব ছোট, তার কারণ ওটা খুব ছোট্ট একটি মেয়ের সমাধির পাথর। তার গায়ে কবি প্লিনির কবিতার দুটি লাইন লেখা আছে : আজও আছে।—হে পৃথিবীর মাটি, এর বুকের উপর তুমি একটু হালকা হয়েই থেকো : ভার দিও না। কারণ, এ যে তোমারও বুকের উপর এতদিন খুব হালকা হয়েই ছিল, ভার ছিল না।...আমার পাপিয়ার বয়সও তো মাত্র চার বছর হয়েছিল, কতটুকুই বা ভার, আর কী-ই বা ওজন!

হঠাৎ হেসে ফেলে অজয়।—কিছুই বোঝা যায় না! আচ্ছা, চলি।

চমকে ওঠে প্রতিভার ঝুঁকে পড়া মাথাটা। চলে যাচ্ছেন ভদ্রলোক, কিন্তু ভদ্রলোককে সামান্য দু'-একটা সান্ত্বনার কথাও বলা হলো না। লোকে একটু সান্ত্বনার আশা করেই তো পরের কাছে নিজের দুঃখের কথা বলে। ছি ছি, খুবই বিচ্ছিরি একটা অভদ্রতা করা হলো।

চলে যেতে যেতেই থমকে দাঁড়ায় অজয়। মুখ ফিরিয়ে আর বেশ উৎফুল্ল স্বরে কথা বলে—আপনি কি বলতে পারবেন, নটে চাঁপা কোথায় পাওয়া যায়?

প্রতিভা—নটে চাঁপা? না, চাঁপা নটে?

অজয়—না ; নটে চাঁপা। ছোট ছোট কড়ির মত গড়ন, একটু লালচে-হলুদ রং, আর খুব মিষ্টি সুগন্ধ।

প্রতিভা—আমি জানি না।

অজয় হাসে—কেউই জানে না, দেখছি। যাকে জিজ্ঞেস করি সেই বলে, জানি না, বলতে পারি না, কখনও দেখিনি। মনে হচ্ছে, নটে চাঁপা ফুল শুধু আমি আর সরযূ ছাড়া পৃথিবীর আর কেউই কখনও দেখেনি। যাই হোক্, শেষে এক ঠোঙা চাঁপা নিয়েই বাড়ি যেতে হবে। সরযূকে বলবো, এই নাও তোমার বোটানির মাইকেলিয়া চম্পকা ; নটে চাঁপা পাওয়া গেল না।

প্রতিভা—আজ বোধহয় আপনার বাড়িতে ফুলের কোন দরকার আছে?

অজয়—আছে।

প্রতিভা হাসে—বলতে আপনার আপত্তি আছে, কিসের দরকার?

অজয়—মনে হচ্ছে, আপনি অনেকটা বুঝেই ফেলেছেন। হ্যাঁ, আজ আমাদের বিয়ের বাৎসরিকী দিন। সরযূ বললে, যাও, দেখ চেষ্টা করে, নটে চাঁপা কোথাও পাও কিনা ; নইলে কিছু চাঁপাই নিয়ে এস।

প্রতিভা—কিন্তু সরযূদি কি এখন পারবেন, মালা-টালা গাঁথতে?

অজয়—না না, মালা গাঁথার ব্যাপার নেই। সেদিনও ছিল না। বালিশের পাশে কিছু চাঁপা

ফুল রেখে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে সরযূ। এই একটু শখ ; এর বেশি কিছু নয়। এ বছর অবশ্য তারই মধ্যে একটু নতুন ব্যাপার আছে। চমৎকার মজার ব্যাপার। তার মানে...।

প্রতিভা--আপনি চুপ করুন। বেশি কথা আমার না শুনলেও চলবে।

অজয়--শুনলে আপনার বোধহয় ভালই লাগতো।

প্রতিভা--না। এসব কথা বলতে আপনার একটু লজ্জা থাকা উচিত।

অজয়--আপনি বোধহয় একটু ভুল বুঝেছেন। লজ্জার কথা হলে আমি আপনাকে সে-কথা বলতে যাব কেন? আমি তো পাগল নই।

প্রতিভা--তবে কী কথা?

অজয় হাসে—মজার কথা হলো, শুধু বালিশের কাছে চাঁপা ফুল রেখে নয় ; সরযূ আজ পাপিয়ার ফটোটাকেও বুকের উপর রেখে ঘুমিয়ে পড়তে চায়। আমাকে বলেছে, তুমি শুধু পাশে বসে আমার হাত ধরে রেখ, যেন ঘুমের মধ্যেই চলে না যাই।...আচ্ছা যাই।

প্রতিভার চোখের পাতা আবার থরথর করে কাঁপতে থাকে। না, আর মাথা ঝুঁকিয়ে চোখ লুকোতে হবে না। চলে গিয়েছে অজয়। বাঁচিয়েছে।

কিন্তু কী অস্বস্তি! বুকের ভিতরটা এত হাঁসফাঁস করছে কেন? সত্যিই যে কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না!

উপরতলায় উঠে গিয়ে বিছানার এক কোণে চুপ করে বসে থাকে প্রতিভা। শরীরটাকে একেবারে নিথর করে আর শক্ত করে কিছুক্ষণ বসিয়ে রাখতে পারলে বোধহয় স্বস্তি পাওয়া যাবে। নিজের বাগানে ফুল ফোটে না, সেজন্যে কোন কান্না নেই, কিন্তু পরের বাগানের ঝরা ফুল দেখে কান্না। এ যেন জনা পিসির ছোট ছেলে হাবুর কান্নার মত একটা বাতিকের কান্না।

ঘরে ঢোকে অনুপম ; সঙ্গে সঙ্গে চমকে ওঠে—এ কি? কাঁদছো কেন? কে তোমাকে টেলিগ্রামটা দেখালে? তুমি তো ইংরেজী পড়তে পার না।

চেঁচিয়ে ওঠে প্রতিভা—টেলিগ্রাম? কিসের টেলিগ্রাম? শিগগির বল।

অনুপম—তোমার এখন একবার গুপ্তিপাড়া না গেলেই নয়।

প্রতিভা--কেন? কী হলো? শিগগির বল। আমাকে না বলে-কয়ে কেউ চলে গেল নাকি?

অনুপম--হ্যাঁ।

প্রতিভা—কে? মা?

অনুপম—না ; তোমার বাবা। তোমার মা'র অবস্থাও ভাল নয়। কিন্তু কেঁদ না। চেষ্টা করে নিজেকে একটু সামলে রাখ। আমি তোমাকে গুপ্তিপাড়া পাঠাবার ব্যবস্থা এখনই করে দিচ্ছি।

ভবতোষবাবুর বাড়ির পাঁচিলের পাশে সেই নারকেল গাছের মাথাটা আর নেই। কালবোশেখীর ঝড়ে নয় ; সময়ের ঝড়ে ওটাকে শুকিয়ে মরিয়ে আর ঝরিয়ে দিয়েছে। গাছের ধড়টা শুধু দাঁড়িয়ে আছে। রাত্রিকালে চোখ পড়লে মনে হয়, ওটাও একটা মরে যাওয়া জীবনের প্রেতশরীর।

তিন বছর আগে ওই নারকেলের মাথা থেকে একটা শুকনো ঝুনো অনুপমের গাড়ির গ্যারেজের মাথায় ঝরে পড়তে যাঁর দুই চোখ জানালার আড়ালে থেকে কটমট করে উঠেছিল, সেই জগদম্বা দেবী অবশ্য আছেন। মাঝে মাঝে জানালার কাছে এসেও দাঁড়িয়ে থাকেন। কিন্তু কই, তাঁর চোখ দুটো তো একটুও কটমট করে তাকায় না। প্রতিভা বরং বেশ স্পষ্ট করে দেখতে পায়, কাঁদছেন জগদম্বা দেবী।

ভাগ্যের খবরগুলি ঠিক যুদ্ধেরই খবরের মত! এখানে হার ওখানে জয়। জগদম্বা দেবীর ছেলে নেই, একটি মাত্র মেয়ে। সে মেয়ে বিধবা হয়েছে। বাড়িটাকেও মারোয়াড়ীর কাছে বন্ধক রেখেছেন।

জয়ের খবর কতটুকু? প্রায় সবই তো হারের খবর: শেফালীদি গত বছর একবার এসে দেখা করে গিয়েছে। গিরিডি ছেড়ে কলকাতায় এসে সমরবাবু শুধু একটার পর একটা নতুন ব্যবসা ধরছেন আর ছাড়ছেন। লাভের মুখ দেখতে পান না, শুধু লোকসান। তাঁর সব ব্যবসা তাঁকে দিয়ে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটিয়ে শুধু ফেল করে। ঘিয়ের কারবার ধরেছিলেন, সেটা অনেক টাকা ডুবিয়ে দিয়ে তারপর শেষ হয়েছে। একটা কাপড়ের দোকান কিনে নিয়ে এক বছর চালিয়েছিলেন। তারপর আর চালাতে পারেননি, তার মানে চলেনি। এইবার তৈরী হয়েছেন, একটা কল কিনবেন, গম পেষাইয়ের কল। শেফালীদির আটগাছি চুড়ি বেচে দিয়ে কলের দাম বায়না করে ফেলেছেন সমরবাবু। কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছিল শেফালীদি, আমি বুঝি না প্রতিভা, এত লোকের ব্যবসা চলছে শুধু ওর ব্যবসা চলে না কেন? এত খাটে মানুষটা, এত খাঁটি জিনিস দেয়, কারও কাছ থেকে একটি পয়সাও বাড়িয়ে দাম নেয় না, তবু ব্যবসা চলে না। আমি সত্যিই একদিন অনুপমবাবুকে জিজ্ঞেস করবো, বলে দিন তো, কী করলে আপনার ভায়রা মশাইয়ের ব্যবসার কপাল একটু ভাল হতে পারে।

প্রতিভা হাসে--কখ্খনো না, ভুলেও ও কর্মটি করো না। ও মানুষকে জিজ্ঞেস করে তোমার কোন লাভ হবে না।

শেফালীদি--কেন?

প্রতিভা--তুমি ওর কথা বুঝতেই পারবে না।

শেফালীদি--কী এমন কথা বলবেন যে, আমি বুঝতেই পারবো না।

প্রতিভা--যদি বলেন, সাহস করলেই ব্যবসা চলে, তবে? বল, কী বুঝবে?

শেফালীদি হাসেন--সাহস তো আছেই। দ্বারভাঙ্গার গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে ঘি যোগাড় করতে গিয়ে রাত্রিবেলা একবার ডাকাতের হাতেই পড়তে হয়েছিল। ভদ্রলোক তো তাতেও ভয় পাননি। এই বয়সেও ডাকাতের সঙ্গে মারামারি করে পালিয়ে আসতে পেরেছিলেন।

প্রতিভা--আমি আর কী বলবো বল? মনে হয়, শুধু ওরকম সাহসে ব্যবসা চলে না। একটু অন্যরকম সাহস থাকা চাই।

শেফালীদি--আচ্ছা, আজ তবে যাই, প্রতিভা।

প্রতিভা--আবার এসো কিন্তু।

রানু বউদির চিঠি আর আসছে না। টাটানগরে যাবার পর থেকে কী যেন হয়েছে রানু বউদির। নিজের ভাগ্যটাকে গালমন্দ করে যে-সব কথা লেখেন রানু বউদি, তাতে মনে হয় যে, যেন কারও সৌভাগ্যের জন্য তাঁর মনে অনেক রাগ জমেছে। রানু বউদির চিঠি পড়ে বার বার হেসে ফেলতে হয়েছে। একটুও রাগ হয়নি। যাই হোক, সব সময় যে জানতে ইচ্ছে করে, বলাইদা কেমন আছেন, মণ্টু'আর টুলু কেমন আছে? রানু বউদি এত কথা লিখতে পারে, শুধু ওদের কথা লিখতে পারে না। অদ্ভুত। বলাইদাকে চিঠি দিয়েও কোন লাভ নেই। চিঠি লেখা অভ্যাস নেই বলাইদার। কোন কালেও ছিল না। গুপ্তিপাড়া থেকে শেষবারের মত চলে আসবার দিন বলাইদা বললে, চিঠি না লিখলে কিছু মনে করিস না পতু। আমার হাতুড়িমার্কা হাত কলম ধরতে পারে না। সত্যি, বিশ্বাস কর।

গুপ্তিপাড়ার বাড়িতে এখন কোন আলো জ্বলছে কি? বিশ্বাস হয় না। বাগ্দী-বুড়ো অনন্ত সে-বাড়ির একটা ঘরের এক কোণে এখন ঘুমিয়েই পড়েছে। সন্ধ্যা হলেই নেশা করে ; সে বুড়ো এখনও জেগে থাকবে কেমন করে? আলোই বা জ্বেলে রাখবে কেন?

কী ভয়ানক মিথ্যে কথা আর নিষ্ঠুর কথা বলতে পারেন ওই হাজরা মশাই। পরের মুখ থেকে শোনা কথা নয়, নিজের কানেই শোনা কথা। পুকুরঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে আর বেশ জোরে জোরে চেঁচিয়ে বিশ্বনাথদা'র কাছে দুঃখ করছিলেন হাজরা মশাই : ওই চার বিঘের শোক পরেশবাবু আর সহ্য করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত যা ছিল তা তো শুধু ওই চার

বিঘে। সহ্য করতে পারবেনই বা কেমন করে?

বিশ্বনাথদা'ও অদ্ভুত মানুষ। এমন একটা মিথ্যে কথাকে ধমক না দিয়ে শুধু বললেন-- হতে পারে।

বিশ্বনাথদা'র মা কিন্তু মা'র শিয়রে বসে মার শেষ নিঃশ্বাসের শব্দটাকে কান পেতে শুনেছিলেন আর খুব কেঁদেছিলেন।--স্বামীর শোক সহ্য করতে না পেরেই চলে গেল বেচারা।

শেফালীদির বাবা নরেন কাকা তো বাবার কথা মনে করে এই সেদিনও শেফালীদির কাছে বলেছেন, আর বলতে গিয়ে তাঁর চোখ ছলছল করেছে—বড়দা'র যে খুব সাধ ছিল, যাবার আগে যেন দেখে যেতে পারেন, দেশ স্বাধীন হয়েছে।

সবই মনে পড়ে। কিন্তু মনে পড়লে চোখের উপরে কোন কান্না ভেসে ওঠে না। পুরনো খবরের কাগজের লেখার মত এত বড় দুটো দুঃখের কথাও আজ বেশ পুরনো হয়ে গিয়েছে। বরং এখানে এই বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে আর মাঝরাত পর্যন্ত আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে ভাবতে ভাললাগে, মা বোধ হয় এখন আশ্চর্য হয়ে বাবার কানের কাছে ফিসফিস করে বলছেন, মেয়ে.টা এত রাতে ওখানে ওরকম করে দাঁড়িয়ে আছে কেন?

ভাবতে গিয়ে মনটা যেন হেসেও ওঠে। আজ সবই সম্ভব। ভয়ানক কষ্টের আঁচড়গুলিকেও মজার কথা দিয়ে হাসিয়ে দিতে পারা যায়।

কোথায় আছেন এখন অজয়বাবু, যিনি এই কাজের ওস্তাদ। বুক খালি করে চলে গেল যে চার-বছর বয়সের মেয়ে, কী যেন নামটা, পাপিয়া, সে মেয়ের ফটো বুকের ওপর রেখে ঘুমিয়ে পড়বার কথা, এটাও নাকি মজার কথা। সেদিন অজয়বাবুর কথা শুনে খুব আশ্চর্য লেগেছিল, কথাটা জগৎ-ছাড়া পাগলাটে আনন্দের কথা বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু আজ খুব বুঝতে পারা যায় ; ঠিকই বলেছিলেন অজয়বাবু। ভাগ্যটাকে তুচ্ছ করে নিজের মনের মত করে বেঁচে থাকবার কায়দা ওরা বুঝে ফেলেছে, ওই অজয় আর সরযূ। কেমন করে বুঝলো? ননীকাকা বলেছিলেন, ভালবাসার মত আশ্চর্য জিনিস আর কিছু নেই।

মাঝে হঠাৎ একদিন এসেছিলেন অজয়বাবু। দেনার আরও দশটা টাকা শোধ করে দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু নীচে থেকেই রামপ্রসাদকে দিয়ে টাকাটা পাঠিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। কারও অপেক্ষায় আর বসে থাকেননি। কিন্তু একটা ভাল খবর জানিয়ে গেলেই তো পারতেন, সরযূদির গলার ভিতরের ঘা একটু সেরেছে, কিংবা সেরেই গিয়েছে।

আজই সকালবেলা হঠাৎ কোথা থেকে বীণা এসে হাজির। গুপ্তিপাড়ার সেই বীণা, যে বীণাকে ছোটবেলায় একবার চুলের ঝুঁটি ধরে পুকুরের ঘাটের জলে একটা চুবুনি খাইয়ে দিয়েছিল প্রতিভা, সেই বীণা। সে রাগ বীণা বড় হয়েও ভুলতে পারেনি। বীণার বিয়ে দেখতে গিয়ে বেশ বিপদে পড়েছিল প্রতিভা। কপালে চন্দনের লবঙ্গছাপ নিয়ে আর রঙীন বেনারসী পরে বসে আছে আর কাঁদছে বীণা। প্রতিভা কাছে যেতেই আরও জোরে কেঁদে উঠলো বীণা, চললাম পতু, এবার খুঁজে দেখ, ঝুঁটি ধরে ঘাটের জলে চুবুনি দেবার জন্যে আর কাউকে পাওয়া যায় কি না।

সেই বীণা আজ কত হেসে হেসে ওর সেই জলে চুবুনি খাওয়ার দুঃখটাকেই একটা মজার গল্পের মত বলে গেল।—সত্যি, ছেলেবেলায় তুই বড্ড দুরন্ত ছিলি, পতু।

প্রতিভা—তুইও একটু বেশি রাগস্ত ছিলি, বীণা। কিছু একটা হলেই জন্মের মত আড়ি।

বীণা—তবু ভেবে দেখ তো, কী সুখের জীবনই না ছিল। আড়ি করতেও কত মজা ছিল। আর এখন...।

প্রতিভা—এখন কারও সঙ্গে আড়ি-টাড়ি করিস না?

বীণা—না ; এ একেবারে মাটির মানুষ। আমি যদি বলি, আবার সিগারেট খাচ্ছ কেন, তক্ষুনি সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দেবে। যদি বলি, মনুকে ঘুম পাড়িয়ে দাও। তক্ষুনি মনুকে

কোলে তুলে নিয়ে মাসি-পিসি গাইতে শুরু করবে।...তুমি কেমন আছ, শুনি।

প্রতিভা—ভাল আছি।

বীণা—কী রকম ভাল?

প্রতিভা—ডেলি প্যাসেঞ্জারের মত। ভোর হতেই ঘর থেকে বের হয়ে কাজের ট্রেনে চড়ি আর রাত হলে ট্রেন থেকে নেমে ঘরে ফিরে যাই।

বীণা হাসে—চালাকি! তোমার আবার কোন্ ছাই কাজ? এত ঝি-চাকর থাকতে তোমার আবার কাজ করতে হবে কেন? আমাকে বোকা পেয়ে যত বাজে কথা বোঝানো হচ্ছে।

প্রতিভা—বিশ্বাস কর।

বীণা—না, কাজ করলে তোমার আর ওই চেহারা হতো না।...সত্যি, তুই বেশ একটু মুটিয়েছিস পতু ; বেশ গিন্নী-গিন্নী চেহারা হয়েছে।

বীণা বেশ খুশি হয়ে আর হেসে হেসে এক থালা মিষ্টি খেয়ে চলে গেল।

বীণাকে একটুও মিথ্যে কথা বলা হয়নি। মনটা শুধু নিজের কাছে আছে, আর সবই ভদ্রলোকের নিয়মের শাসনে একেবারে নির্ভুল হয়ে কাজ করছে। ঘরের দরজায় টোকা পড়লেই তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিতে হবে, এটাও একটা নিয়ম। অঘোরে ঘুমিয়ে থাকা চলবে না। ডাক দিলেই সাড়া দিয়ে আর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। হাত ধরে যখনই যা ইচ্ছে হয় বলেন চুপ করে শুনতে হয়। ভদ্রলোক যদি বলেন, কী, শুনতে লজ্জা করছে বুঝি, তখন লজ্জা পেয়ে হাসতেও হয়। প্রাণটাকে আর শরীরটাকে আর এ বাড়ির ইচ্ছার সঙ্গে চালিয়ে নিয়ে যেতে তো আর কোন অসুবিধে নেই, কষ্টও নেই। অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। একঘেয়ে লাগছে বলে ডেলি প্যাসেঞ্জার তো ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে না।

কিন্তু এত রাত্রিতে এভাবে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশের তারা দেখবার কথা নয়। তবু দাঁড়িয়ে আছে প্রতিভা। মনের ভুলে যেন নিয়মটাকেই আজ ভুলে গিয়েছে, তা না হলে এ সময়ে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে নিজেরই ঘরে বিছানায় শুয়ে থাকতো। হয় জেগে থাকতো, কিংবা ঘুমিয়ে পড়তো ; কিন্তু ঘরের ভিতরেই থাকতো।

কিন্তু পাশের ঘরে, যে-ঘরে এ সময়ে হয় আলো জ্বেলে কাজ করে, নয় আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে অনুপম, সে ঘরের দরজা এখনও তালাবন্ধ।

তিন বছরের মধ্যে অনুপমের টাকার ভাগ্য নতুন করে ঝনঝনিয়ে বেজে উঠেছে কিনা, জানে না প্রতিভা। জানবার তো কথা নয়। শুধু বুঝে নেবার কথা, মাটির পোকা যেমন গর্তের মুখের বাইরে শুধু শুঁড় বের করেই বুঝতে পারে, দিন না রাত। অজগরের মাথার মাণিক হঠাৎ কুড়িয়ে পাওয়ার মত আর একটা ব্যাপার হলে সেটা এতদিনে বুঝতেই পারা যেত। আরও একটা স্টীল-সেফ আসতো, আরও একটা নতুন গাড়ি চলে আসতো। সুধার মা একদিন বলেছিল, ভবতোষবাবুর বাড়িটা দাদাবাবু কিনবেন বলে ঠিক করেছেন। কিন্তু এখনও যে কেনা হয়নি, সেটা বুঝতে পারা যায়। সুধার মা'ও আর কিছু বলেনি। কেনা হয়ে থাকলে, নিশ্চয় খবরটা জানিয়ে দিত। এ বাড়ি থেকে শুধু ওই এক সুধার মা'র সঙ্গে ভবতোষবাবুর বাড়ির ভিতরের একটু মেলা-মেশার সম্পর্ক আছে।

তবু ভদ্রলোকের এই সুখের ছবিঘরের ভিতরে কোথাও যে একটু-আধটু নতুন রঙের ঠাট চমকে ওঠেনি, তা নয়। প্রতিভার চিন্তার কাজ অনেক লঘু হয়ে গিয়েছে। বাজারসরকার দীনুবাবু আছেন। ভাঁড়ারের দরকার থেকে শুরু করে মোটরগাড়ির তেলের দরকার পর্যন্ত, সব কিছু সামলে রাখা এখন দীনুবাবুর দায়। ঘরের দরকারে প্রতিভার যদি কিছু বলবার থাকে, তবে সেটা দীনুবাবুকে বলে দিলেই হলো।

রামপ্রসাদের পক্ষে এখন বাইরের লোকের জন্য চায়ের এত ফরমাস খাটতে পারা সম্ভব নয়। আগে চৌরঙ্গীর সাহেবী হোটেলে রান্নার কাজ করতো, মাদ্রাজী কুক রাজুলু এখন

নীচের তলার ওই কাজের ঘরের অতিথিদের চা-সেবার ভার পেয়েছে। বাড়ির জন্য রোজের মাছ আর মাংস রান্নার কাজও রাজুলুর চাকরির কাজ। সুধার মা আজকাল মাছ-মাংস ছোঁয় না।

এ ছাড়া নতুন কিছু বলতে শুধু গেটের পাশের ঘর আর বারান্দাতে সকাল-সন্ধ্যা একগাদা মানুষের ভিড়। রামপ্রসাদ আজকাল আর বাইরে ছুটোছুটি করে না। ওই ভিড়ের মানুষগুলির কাছেই একটা টুলের উপর বসে থাকে। অনুপমের সঙ্গে একটু সাক্ষাতের কাঙাল, এক একটা শুকনো-মুখ মানুষের নাম-লেখা চিরকুট হাতে নিয়ে রামপ্রসাদ পৌঁছে দিয়ে আসে ওই কাজের ঘরের দরজার সবুজ পর্দার কাছে বসে আছে যে দারোয়ান বীরবাহাদুর, তারই হাতে।

কিন্তু গাড়ি করে যিনি আসেন, তিনি অবশ্য রামপ্রসাদের তদারকীর অধীন ওই গেটের-পাশের ঘর আর বারান্দায় এসে বেঞ্চের উপর বসেন না। তিনি সরাসরি ভিতরে গিয়ে ড্রইং-রুমের ভিতরে সোফার উপর বসেন, সেই ঘরেরই টেলিফোনে কথা বলে অনুপমের কাজের ঘরটাকে জানিয়ে দেন, আমি এসেছি।

জল বাড়েও না কমেও না, একরকম একটা স্রোতের মত এ বাড়ির টাকার ভাগ্যটাও বয়ে যাক না কেন। কিন্তু তা কি হবে? প্রতিভার মনটা যেন বাতাসে নতুন ধুলোর গন্ধ পেয়েছে। তাই সন্দেহ হয়, আবার ঝড় আসছে। তা না হলে এতদিন পর হঠাৎ ওরকম একটা কথা অনুপমের মুখের ভাষা হয়ে আবার বেজে উঠবে কেন? আজ ভোর হবার আগেই এ ঘরের বিছানা থেকে হঠাৎ নেমে পড়লো আর দরজা খুলে ঘরের বাইরে চলে গেল অনুপম। যাবার সময় শুধু একটি কথা বলে গেল—মনে হচ্ছে, তুমি একটা ডেড-বডি।

হ্যাঁ ঠিকই ডেড-বডি। কিন্তু জিজ্ঞেস করলে হতো, এই তিন বছরের মধ্যে কোনদিনও বুঝতে পারলে না কেন যে, আমি একটা ডেড-বডি? আজ হঠাৎ এই জ্ঞান চমকে উঠলো কেন?

তুমি তো ঠিক এই রকমটি চেয়েছিলে। এই ডেড-বডি যে তোমার সুখের সিংহাসন। সিংহাসন যেমন হ্যাঁ কিংবা না, কোন কথাই বলে না, ডেড-বডিও তেমনই কোন কথা বলেনি। রাজা যখন খুশি এসে সিংহাসনে বসেছেন আর খুশি হয়ে চলে গিয়েছেন। তবে আজ হঠাৎ এ রকম একট অখুশির ধিক্কার কেন?

চমকে ওঠে প্রতিভা। কী অদ্ভুত খুশির মূর্তি হয়ে আর আস্তে আস্তে হেঁটে যেন দুলতে দুলতে, বারান্দার সিঁড়ির মুখের দিক থেকে এ দিকেই আসছে অনুপম। অনুপমের দু'হাতে দুটো চামড়ার ব্যাগ। নিশ্চয়ই খুব ভারী ব্যাগ। তা না হলে অনুপমের ওই শক্ত কাঁধের দুটো দিক ওরকম একটু ঝুঁকে পড়বে কেন?

এগিয়ে আসে অনুপম। প্রতিভার কাছে এসেই একটা ব্যাগ প্রতিভার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে ওঠে—ধর। সঙ্গে সঙ্গে হেসে ফেলে অনুপম। ব্যাগটাকে দু'হাত দিয়ে ঠিকই ধরেছে প্রতিভা, কিন্তু ভারী ব্যাগটা যেন প্রতিভাকেই পাল্টা একটা টান দিয়ে ঝুঁকিয়ে কুঁজো করে দিয়েছে। আর-একটু হলে মেজের উপরেই পড়ে যেত ব্যাগটা, আর প্রতিভাও ধুপ করে বসে পড়তো।

ঘরের দরজার তালা খোলে অনুপম।—এস। প্রতিভাকেও ডাক দিয়ে ঘরের ভিতরে নিয়ে যায়, আর রুমাল তুলে কপালের ঘাম মুছতে থাকে। তার পরেই প্রতিভার মুখের দিকে তাকায়। ছটফট করে অনুপমের চোখের তারা। কী যেন বলতে চায় অনুপমের চোখের ওই ছটফটে তারা। বোধ হয় প্রতিভার এই নীরব শান্ত চেহারাকে সহ্য করতে না পেরে ছটফট করছে অনুপমের মনের একটা পুরনো আশা।

অনুপম বলে—তুমি তো একবার জিজ্ঞেসও করলে না, এই ব্যাগে কী আছে।

প্রতিভা—বল।

অনুপম—সোনার বার। এবার আর কারেন্সী নোটে আমার পাওনা টাকা নিতে রাজী হলাম না। যুদ্ধ থেমেছে, একটা এলোমেলো অবস্থা। কখন্ যে কোন্ নোট অচল হয়ে যাবে, তার কোন ঠিক নেই।...কিন্তু তুমি ওরকম করে তাকিয়ে আছ কেন? যেন মড়ার চোখের চাউনি।

প্রতিভা—জল খাবে তো, বল।

অনুপম—না। তুমি কি দোতলার সেই ঘরের ভিতরে আজ একবারও উঁকি দিয়ে দেখেছো?

প্রতিভা—কোন্ ঘরে?

অনুপম—যে-ঘরে তুমি আগে থাকতে।

প্রতিভা—না।

অনুপম—তবে চল, এখনই দেখবে চল, দেখিয়ে দিচ্ছি।

ঘরের ভিতরে ঢুকে অনুপম সুইচ টিপতে ঝকমকিয়ে হেসে উঠলো একটা প্রকাণ্ড রঙীন ছবি। তুলি দিয়ে আঁকা অনুপম রায়ের কী চমৎকার একটি রঙীন চেহারা!

অনুপম—এটা হলো উপহার। শর্মা কোম্পানী, যারা মিলিটারীর অর্ডার সাপ্লাই করে কোটিপতি হয়েছে, তারাই দিয়েছে। আর, এটা হলো একটা মানপত্র। এটা দিয়েছে একটা অ্যাসোসিয়েশন, যারা দেশের গরীব লোকের ছেলেমেয়ের শিক্ষার জন্য প্রায় পঞ্চাশটা ফ্রী স্কুল চালায় ; তারাই কাল সন্ধ্যাবেলা আমাকে, বলতে গেলে একরকম জোর করেই নিয়ে গেল। আমি অবিশ্যি আগেই টের পেয়েছিলাম, ওরা একটা ঘটা করে সংবর্ধনার কাণ্ড না করে ছাড়বে না।...ও কি? তোমার চোখ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি যেন নাক সিঁটকে একটা আস্তাকুঁড়ের জঞ্জালের দিকে তাকিয়ে আছ।

প্রতিভার কাছে এগিয়ে যায় অনুপম। শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। আর প্রতিভার একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে।—বল।

প্রতিভা—কী বলবো?

—এখনই যদি তোমাকে গুপ্তিপাড়ার বাড়িতে ফেরত পাঠাতে চাই, তবে চলে যাবে তো?

—না।

—তবে বল, এখানে তোমাকে সুখে থাকতে কিসের ভূতে কিলোচ্ছে?

—কোন ভূতে কিলোচ্ছে না, শুধু তুমি আর ওরকম করে কথা বলো না, তাহলেই সুখে থাকবো।

—এই তিন বছরের মধ্যে হীরের দুল কানে দিতে তোমার ইচ্ছা হলো না কেন?

—ইচ্ছে না হলে আমি আর কী করতে পারি?

—এটা যে গুপ্তিপাড়ার চৌধুরী-মার্কা মেজাজের কথা হয়ে গেল।

—তোমার তাই মনে হয়েছে, তাই ওকথা বলছো।

—আমাকে অপমান করবার জন্য তোমার মনে একটা জেদ চেপেছে। এই জেদটাই হলো তোমার আসল সুখ।

—তোমার কথায় আর ইচ্ছায় উঠছি বসছি, তবু এ কথা বলছো?

—এটাও তো একটা চৌধুরী-মার্কা মেজাজের জীবন। কিন্তু লোক বলবে, সেই মেছুনিটার জীবন। মেছুনি একদিন ওর মিতিন এক মালিনীর বাড়িতে গিয়েছিল। রাত্রিবেলা মালিনীর ঘরের ঝুড়িভরা ফুলের গন্ধে মেছুনির ঘুম হয় না। মেছুনি শেষে ওর আঁসচুপড়ির উপর জল ছিটিয়ে নিয়ে নাকের কাছে ধরে রেখে শুয়ে পড়লো, একঘুমে রাত পার করে দিল।...তুমিই না আমাকে তোমার শেফালীদির নামে একটা গল্প শুনিয়েছিলে আর হেসেছিলে।

—কী গল্প?

—অভ্র খনির ভেতর থেকে হঠাৎ যেদিন লাখ টাকার মাল বের হলো, রাতারাতি

ভাগ্যবান হয়ে গেলেন সমরবাবু ; সেদিন থেকে সমরবাবু আর শেফালী নাকি প্রায় রোজই সন্ধ্যাবেলা গলা জড়াজড়ি করে বসে একসঙ্গে গান গাইতো।

--হ্যাঁ।

--কিন্তু তুমি কী করলে? আমাকে জব্দ করবার জন্যে রাতারাতি একটা ডেড-বডি হয়ে গেলে। আমি অনেক আশা করেছিলাম প্রতিভা, তুমি একদিন তোমার ভুল বুঝবে। আজ বেশ বুঝতে পারছি, আমার আর আশা করবার কোন মানে হয় না।

--তুমি বল, আমি কী করলে তুমি...।

--বলবো?

--বল।

--তুমি এখুনি হীরের দুল কানে দিয়ে এসে আমার কোলে বসো, গলা জড়িয়ে ধর, আর চুমো খেয়ে বল, ভুল করেছি, ক্ষমা কর।

অনুপমের মুখের দিকে তাকায় প্রতিভা। চোখের পাতা কাঁপে, বুকের ভিতর থেকে উথলে ওঠা একটা নিঃশ্বাসকে ঢোঁক গিলে দমিয়ে দেয়।

--এখনি আসছি। ঘর ছেড়ে চলে যায় প্রতিভা আর এক মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসে।

প্রতিভার কানে হীরের দুল। প্রতিভার দুই হাত অনুপমের গলা জড়িয়ে ধরে। প্রতিভার মুখটাও অনুপমের মুখের উপর পড়ে আর আকুল হয়ে বলে, ভুল হয়েছে, ক্ষমা কর।

অনুপম রায়ের কাজের ঘরের চার-চারটে আলোর তেজ এখন ঝকঝকিয়ে হাসতে পারে। কারণ, কালো কাপড়ের সেই আবরণ আর নেই। যুদ্ধ তো নেই।

আজকাল অনুপমের এই ঘরে সন্ধ্যা কিংবা সকালের বৈঠকে চন্দ্রবাবু আর সূর্যবাবু ছাড়া বাইরের আরও কেউ একজন থাকেন। কাল এসেছিলেন জুট মিলের মথুরানাথ আগরওয়ালা, পরশু এসেছিলেন গ্যারিসন এঞ্জিনিয়ার মেজর গিলবার্ট, তার আগের দিন কেরোসিনের স্টকিস্ট শরৎ মল্লিক। আজ এসেছেন পুলিসের রায়সাহেব বসন্ত দত্ত।

বসন্ত দত্তের রোগা শরীরে মটকার ঢিলে পাঞ্জাবি, পরনে মিলের মোটা ধুতি আর পায়ে একজোড়া হরিণ-ছালের চটি। বসন্ত দত্ত হাসেন--সত্যিই, খাকি উর্দির ভার আর সহ্য হয় না চন্দ্রবাবু ; না শরীরে, না মনে।

সূর্যবাবু--রিটায়ার করতে চান?

বসন্ত দত্ত--ইচ্ছে হয়। কিন্তু তখুনি আবার মনটা নরম হয়ে যায়। অন্তত রায়সাহেবীটা দূর হলে বাঁচি।

অনুপম--ওটা বোধহয় দূর হয়েই যাবে।

বসন্ত দত্ত--বোধহয় স্বাধীনতা এসেই যাবে। কী মনে করেন?

অনুপম--মনে করতে তো ভালই লাগে।

চন্দ্রবাবু--হিটলারের শেষটা কিন্তু খুবই করুণ। কে ভেবেছিল যে...।

বসন্ত দত্ত--আমি কিন্তু ভেবেছিলাম, চন্দ্রবাবু। ধরাকে সরা জ্ঞান করে, মানুষের জীবনের উপর শুধু জোরের দাপট দেখালে তার পরিণাম কখনও ভাল হতে পারে না।

সূর্যবাবু--আমাদের ব্রিটিশ প্রভুদের কীর্তিটাও কি কম নিষ্ঠুর? দেশটাকে যেমন দুর্ভিক্ষ দিয়ে মেরেছে, তেমনই গুলী করেও মেরেছে। আমি মনেপ্রাণে প্রার্থনা করি, এরা শিগ্‌গির নিপাত যাক।

চন্দ্রবাবু--নিপাত যাবে বলেই মনে হচ্ছে।

অনুপম--আমার ধারণা, আমাদের দেশের জীবনে আরও কঠিন পরীক্ষার দিন এগিয়ে আসছে।

সূর্যবাবু—আসুক, আসুক। না পুড়লে সোনা শুদ্ধ হয় না।

অনুপম—খুব সত্যি কথা।

চন্দ্রবাবু—কান্না আর ব্যথার ভিতর দিয়েই নবজন্ম দেখা দেয়।

অনুপম—আমার যদি ক্ষমতা থাকতো, তবে আমি আজই ওই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সব ছবি-টবি সরিয়ে দিয়ে আমার সব চেয়ে প্রিয় একটা ইচ্ছা সার্থক করে নিতাম।

বসন্ত দত্ত—আজ্ঞে?

অনুপম—আমি ওটাকে একটা ফ্রী মেটার্নিটি হোম করে ফেলতাম। ফুটপাথের ওপরে শিশুর জন্ম হয়, এমন ভয়ানক ঘটনা শুধু আমাদের এই দেশেই সম্ভব হয়. আগে হতো জারের রাশিয়াতে। আমরা শুধু চোখ বুজে লজ্জা আর অপমান ভুলে থাকতে চেষ্টা করি।

চন্দ্রবাবু—আপনি বোধহয় জানেন না, বসন্তবাবু; নতুন হাসপাতালটার একজন ট্রাস্টি হয়েছে অনুপম। সে হাসপাতালের মেটার্নিটি ওয়ার্ডের চেহারা একবার দেখে আসবেন। এরকম সুব্যবস্থা কোন লণ্ডন-হাসপাতালেও আছে কিনা সন্দেহ।

বসন্ত দত্ত—নিশ্চয় নিশ্চয় ; একদিন গিয়ে দেখে আসবো। ভগবান অনুপমবাবুকে আরও বড় সেবার ট্রাস্টি হবার শক্তি দিন।

সূর্যবাবু—আমাদের অনেক দোষ আছে, বসন্তবাবু। শুধু ব্রিটিশকে নিন্দা করে আর কী হবে? তবু মাঝে-মাঝে মনে হয়, আমরা একেবারে মরে যাইনি। নিজের জোরে এখনও কিছু করতে পারি ; হ্যাঁ, ইচ্ছেটা আন্তরিক হবে, তবে তো?

অনুপম—কেবিনেট মিশনের কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, এবার ব্রিটিশের ইচ্ছেটাও বোধহয় একটু আন্তরিক। স্বাধীনতা দিতে চায়।

চন্দ্রবাবু—সেই জন্যেই তো আমি তোমাকে সেদিন বলেছিলাম অনুপম, এসোসিয়েশনে তোমার বক্তৃতাতে কেবিনেট মিশন সম্পর্কে খুব কড়া করে কিছু বলো না।

দরজার সবুজ ভেলভেটের পর্দা সরিয়ে ঘরের ভিচরে উঁকি দেয় একটা মুখ। আপত্তির ভঙ্গীতে মাথা নাড়ে অনুপম, উঁহুঁ, এখন নয় পুলকবাবু, একটু পরে আমি নিজেই আপনাকে ডাকবো।

পুলকবাবু—পাঁচটা প্রি-পেড টেলিগ্রাম এসেছে। অন্তত এগুলোর জবাব এখনই দেওয়া উচিত, স্যার।

অনুপম—আর পনের মিনিট অপেক্ষা করা কি চলে না?

পুলকবাবু—তা চলে। তা ছাড়া, অনেকগুলি চিঠি এসেছে, যেগুলো প্রাইভেট বলে মনে হচ্ছে। কয়েকটা চিঠি তো প্রায় দশ দিন হলো এসে পড়ে রয়েছে। এসব চিঠি তো আমি খুলতে পারি না, স্যার।

অনুপম—সব রেখে দিন। আমি একটু পরে নিজেই দেখবো।

পুলকবাবু—এর মধ্যেও খুব তাড়াতাড়ি জবাব দেবার মত জরুরী চিঠি থাকতে পারে।

অনুপম—আছে হয়তো। কিন্তু শুধু আর পনর মিনিট অপেক্ষা করুন।

পুলকবাবু চলে গেলেন। চন্দ্রবাবু বলেন—অনুপম বেশ ভাল একটি সেক্রেটারী পেয়েছে। খুব নম্রস্বভাব আর খুব খাটিয়ে মানুষ।

বসন্ত দত্ত—কে?

চন্দ্রবাবু—পুলক নামে এই ছেলেটি ; তিনটে বছর আমেরিকার কয়েকটা বেশ ভাল কাগজের ইণ্ডিয়া-করেসপণ্ডেন্ট ছিল এই পুলক।

অনুপম—আমি ভেবে ঠিক করে রেখেছি, যদি আমার কখনও একটা সাপ্তাহিক কাগজ বের করবার দরকার হয়, তবে পুলকবাবুকেই এডিটর করে দেব।

বসন্ত দত্ত—দেরি করবেন না অনুপমবাবু। বের করেই ফেলুন।

অনুপম--ইচ্ছে তো আছে।

সূর্যবাবু হাসেন—ইচ্ছেটাকে একটু আন্তরিক করে ফেলতে অসুবিধা কোথায়?

অনুপমও হাসে—বউদি যদি কবিতা লিখতে রাজি হন, তবে আর দেরি করবো না। এই বছরেই বের করে ফেলবো।

বসন্ত দত্ত—সত্যি, কবিতার মত জিনিস হয় না।

চন্দ্রবাবু—আমি বলি, গান।

অনুপম--কোন্ গান? তোমা বই আর জানিনে?

সূর্যবাবু--এঃ, তুমি আমার আব্রু নষ্ট করে দিচ্ছ, অনুপম।

চন্দ্রবাবু--শুনলাম, গানের কনফারেন্সটাও নাকি তোমাকে এসে ধরেছে।

অনুপম--হ্যাঁ, বলছে আপনাকেই উদ্বোধন করতে হবে।

বসন্ত দত্ত—করুন করুন। আপনারা না করলে কে আর করবে? ব্রিটিশরাজ তো আমাদের গানের মাথার ওপরেও লাঠি মারতে ছাড়েনি।

অনুপম--সেটা তো আপনিই আমাদের চেয়ে বেশী জানেন।

বসন্ত দত্ত--জানি বইকি। শুধু ওই এক কতকাল পরের পিছনে তাড়া করে কি কম ছুটতে হয়েছে, মশাই? সে-সব কথা মনে পড়লে লজ্জা বোধ করতে হয়। সেই জন্যেই তো ইচ্ছে করছে, আজই রিটায়ার করি।

অনুপম--না না, বাকি যে দু-তিনটে বছর আছে, ভালয় ভালয় থেকেই যান। আচ্ছা, এখন তাহলে...।

দরজার পর্দার দিকে তাকিয়ে অনুপম ডাক দেয়—বীরবাহাদুর! তুম হ্যায়?

--হুজুর। পর্দার ফাঁকে উঁকি দেয় দারোয়ান বীরবাহাদুর।

অনুপম—ঠিক হ্যায়।...আচ্ছা এখন তাহলে কাজের কথাই হোক, বসন্তবাবু।

কাজের ঘরে কাজের কথা চলতে থাকে। এ ঘরের পর পর দুটো ঘরের পরের একটা ঘরে সেক্রেটারী পুলকবাবুর দুই হাতের ব্যস্ততা পুরনো চিঠির জবাব টাইপ করে করে বাজতে থাকে। গেটের পাশের ঘরে সাক্ষাতের ভিড় রামপ্রসাদের সঙ্গে কথা বলে ; চাপা স্বরে বাজতে থাকে ব্যস্ত মিনতির কলরব। ভিতর দিকের বারান্দার পাশের একটি ঘরে ব্যস্ত হয়ে বাজতে থাকে কাপডিশের শব্দ ; চা তৈরী করছে মাদ্রাজী কুক রাজুলু। গমগম করে বাজছে আর-একটা শব্দ, জলের পাম্পের সুইচ টিপে দিয়েছে দুর্গাবালা, উপরে উঠছে জল। রান্নাঘরে খুন্তির শব্দ, মোচার ঘণ্ট রাঁধছে সুধার মা। গ্যারেজ ঘরে গাড়ির ইঞ্জিনের গর্জনের শব্দ, রেস করে করে ব্যাটারির তেজ পরীক্ষা করছে অনাদি ড্রাইভার।

শুধু একজন, দিনমানে যার কোন কাজ থাকে না, তারই ঘরে কোন শব্দ নেই। আয়নার সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে সে এখন একটা কানের লতি টিপে টিপে ভাবছে, আর যেন একটু আশ্চর্যও হয়ে যাচ্ছে, হীরের দুল তো এমন কিছু ভারী নয়, শুধু সেই রাত্রিতে একবার পরে নিয়েই আবার খুলে ফেলা হয়েছে, তবু এখনও কানের এ-জায়গাটা এত ব্যথা-ব্যথা করছে কেন?

যাকগে ; কিন্তু এই ব্যথার চেয়েও বেশি জ্বালা নিয়ে নতুন করে আর-কোন ব্যথা যেন দেখা না দেয়। স্বামীর ইচ্ছার ডাকের কাছে স্ত্রী তার প্রাণের সব সাড়া বন্ধ করে গুটিয়ে রাখবে, আর, একটা ডেড-বডি হয়ে পড়ে থাকবে, এটা ভুল বইকি। খুব ভুল। কিন্তু স্বামীর ইচ্ছা কি ওরকম করে একটা সম্রাটের হুকুমের মত কথা বলে?

শেফালীদির সঙ্গে তুলনা করে আমার দোষ ধরলেন ভদ্রলোক। জিজ্ঞাসা করবার অধিকার নেই, সেই অধিকার কবেই মরে গিয়েছে, মেরে ফেলা হয়েছে, তা না হলে জিজ্ঞেস করতে পারা যেত, শেফালীদির সঙ্গে আমার তুলনা করলে কেন? শেফালীদি কি জানতো না যে,

সমরবাবুর সেই একলাখ টাকার ভাগ্যটা কেমন করে আর কোথা থেকে হঠাৎ দেখা দিয়েছিল? তুমি তো সে-রাতেও বলতে পারলে না, কে কেন আর কিসের জন্য তোমাকে এত সোনা দিল? সমরবাবুর লাখ টাকা দেখে শেফালীদির গর্ব হবেই তো ; সে গর্ব স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে গান তো গাইবেই। কিন্তু তুমি কি আমাকে ওই গর্ব এনে দিতে পেরেছ?

বেশ মজার হুকুম। জল নেই, সাঁতার দিতে হবে। ফুল নেই, মালা গাঁথতে হবে। নেশা নেই তবু মাতাল হতে হবে ; গুপ্তিপাড়ার ভোলা স্যাকরার মত। রোজ রাত্রিবেলা মদ খেয়ে মাতাল হতো আর চিৎকার করতো ভোলা স্যাকরা। কিন্তু সর্বস্ব নষ্ট করে যখন ভিখিরীর মত দশা হয়ে গেল ভোলা স্যাকরার, পয়সার অভাবে মদ কিনতে পারতো না, তখনও ঠিক রাত্তির হলেই ঘরের দাওয়ার ওপর টলে টলে হাঁটতো, বেলেল্লা স্বরে চিৎকার করতো আর লাঠির বাড়ি মেরে মেরে ঘরের চালাটাকে ভেঙ্গে তছনছ করে দিত।

হেসে ফেলে প্রতিভা। সে হাসিতে শব্দ নেই। আয়নাতে এই হাসির চেহারা দেখলে আরও হাসি পায়। প্রতি বছর দোলের আগে পুকুর ঘাটের কাছে ঢোলক বাজাতো ছিদেম পটুয়া, আর পটের ছবি দেখিয়ে গান গাইতো। বোকা আহ্লাদী লোভ করে চিনির ভাঁড় চেটেছে, তাই ঠোঁটে পিঁপড়ে কামড়েছে। তবু সেই পিঁপড়ে কামড়ের জ্বালা নিয়ে পটের আহ্লাদীর ঠোঁট দুটো কী অদ্ভুত হাসছে।

হাসি পাবেই বা না কেন? প্রতিভার হাত-পাগুলোকে সত্যিই যে বিনা নেশায় মাতলামি করতে হয়। হাসতে হয়। হাত ধরে কথা বলতে হয়। অনুপমের জীবনের এক-একটা রাত যেন জীবন্ত সুখে সুখী হয়। প্রতিভাকে যেন একটা ইচ্ছাহীন ডেড-বডি বলে সন্দেহ করে আবার দুঃখ না পায় প্রতিভার স্বামী, অনুপম রায়।

এভাবেও চলেত পারা যাবে। চালিয়ে নিতে পারা যাবে। ভদ্রলোক যদি এতেই সুখী হতে চায়, তবে এতেই সুখী হোক। মাঝে মাঝে মাঝরাতে প্রতিভার এই ঘরের দরজাতে ভদ্রলোকের ইচ্ছার টোকা টক-টক করে বাজবে, দরজা খুলে দিয়েই প্রতিভাকে একটা অপেক্ষা-বিহুল মুখ তুলে হাসতে হবে, আর হাত বাড়িয়ে হাত ধরে বলতে হবে, এস। চলবে না কেন? চলেই যাবে। তবু তো, যা-ই হোক না কেন, এটা তো এই ভদ্রলোকেরও একটা অদ্ভুত তোমা বই আর জানিনে দশার টোকা। যদি সূর্যবাবুর ছায়ার সঙ্গে আবার কোনদিন দেখা হয়ে যায়, তবে হয়তো লজ্জা-টজ্জা না করে বলে দিতেও পারা যাবে, আপনার কর্তাটির মত এ বাড়ির ভদ্রলোকেরও...না, না, তুলনা করলে খুব ভুল করা হবে। গানের পাখি রোজ একই গাছের ডালে এসে বসে ; ভাবতে ভাল লাগে। কিন্তু তেষ্টার বাঘ রোজ একই ঝরনার জল খায়, ভাবতে, কেমন লাগে? ঝরনার জল কি মনে করতে পারে যে, তার জীবনটা ধন্য হয়ে গেল?

দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সুধার মা, তার পিছনে এক মহিলা। সরু পাড় ধুতি পরেছেন মহিলা, আর দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছেন। সুধার মা বলে—বর্ধমান থেকে এসেছেন।

মুখের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়েই ফুঁপিয়ে উঠলেন মহিলা—বর্ধমান থেকে তিনদিন হলো কলকাতায় এসেছি। এখন ভবানীপুর থেকে আসছি।

চমকে ওঠে প্রতিভা—আপনি? বাণীদি?

সতরঞ্চি দিয়ে জড়ানো একটা বিছানা, আর দুটো বাক্স নিয়ে এসে রামপ্রসাদও এই ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ায়—কোথায় রাখবো, বলে দিন মা।

প্রতিভা—এখানেই রাখ।

চলে গেল সুধার মা, চলে গেল রামপ্রসাদ। বাণী হঠাৎ ব্যাকুলভাবে এগিয়ে এসে প্রতিভার হাত ধরে—আমার সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে, বউদি।

প্রতিভা--কবে?

বাণী--এক বছর হলো। যুদ্ধে গিয়েছিল, যুদ্ধেই শেষ হয়ে গেল। এক চিঠিতে লিখলে, ছুটি পেয়েছি, এবার বাড়ি ফিরবো। তার একমাস পরেই সরকারী চিঠি এল, সে আর ফিরবে না, চিরকালের ছুটি নিয়ে সরে পড়েছে।

প্রতিভা--ঘরের ভিতরে এসে বসুন, বাণীদি।

ঘরে ঢুকে শ্রান্তভাবে মেজের উপরেই বসে পড়ে বাণী।--বর্ধমানের মেয়ে-স্কুলে পড়াবার যে চাকরিটা করতাম, সেটাও গিয়েছে। একটি খাঁটি অভাগী হয়ে পথেই বসে পড়েছি, বউদি। কী করবো, কোথায় যাব, বুঝতে পারছি না।

প্রতিভা--চাকরিটা গেল কেন?

বাণী--কপাল। স্কুলে আমার দুটো কাজ ছিল। পড়ানো আর গান শেখানো। আগের মত পড়িয়ে যাচ্ছিলাম ঠিকই, কিন্তু আগের মত গান আর গলায় এল না। কত চেষ্টা করলাম, তবুও না। সেক্রেটারীর কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলাম, দয়া করে আমাকে গান থেকে রেহাই দেওয়া হোক। কিন্তু রাজি হলেন না সেক্রেটারী। বললেন, গানের জন্যেই তো আপনাকে রাখা ; আপনি যা পড়ান সেটা এমন কিছু বিদ্যের কাজ নয় যে, আপনাকে পঞ্চান্ন টাকা মাইনে দেওয়া চলতে পারে। অগত্যা...।

প্রতিভা--ভবানীপুরে আপনার কে আছেন?

--আমার দেওর। কিন্তু দেওরের বাড়িতে জায়গা হলো না।

--কেন?

--জা কোন কথাই বললে না। দেওর তবু বললে, এখানে জায়গার অভাব, আপনার খুব অসুবিধে হবে।...কাজেই তুমি এখন যদি অনুদা'কে একটু বলে কয়ে...।

--আপনি এ কী কথা বলছেন বাণীদি। আপনি আপনার দাদাকে যা বলবার বলবেন, এর মধ্যে আমি তো কেউ নই।

--ও কথা বললে কি চলে, বউদি? তুমি খুশি হয়ে রাজি না হলে আমার কি এখানে থাকা চলবে? শুধু আমার একটা চাকরি যোগাড় করতে যতদিন লাগবে, ততদিন। তারপর চলে যেতে আমি আর একটি দিনও দেরি করবো না।

--আপনি আমাকে ভুল বুঝলেন, বাণীদি। আমি খুশি হয়েই আছি, আমি রাজি হয়েই আছি।

--সেদিন আমিই তো তোমার কপালে বরণডালা ছুঁইয়ে ছিলাম, যেদিন তুমি প্রথম এ বাড়িতে এলে।

--সব মনে আছে। আপনাকেও কতবার মনে পড়েছে।...আচ্ছা দেখুন তাহলে, আপনাকে একটা জিনিস দেখিয়ে দিচ্ছি।

হাসতে থাকে প্রতিভা। তারপরেই আলমারি খুলে একটা বই বের করে নিয়ে বাণীর হাতের কাছে তুলে ধরে--এই নিন।

চমকে ওঠে, হাসতে থাকে, তারপর কেঁদে ফেলে বাণী--আমার এই বই তুমি এত যত্ন করে তুলে রেখেছ? আমি যে এই বইটাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছি। ভেবে ভেবে ঘুম হয়নি, কোথায় হারিয়ে ফেললাম বইটাকে? বুকের ভিতরে একটা অলুক্ষণে ভয় ছমছম করতো। যুদ্ধের কাজে রওনা হয়ে যাবার দিন বিদায় নেবার সময়, সে যে এই বইটা আমাকে উপহার দিয়ে বলে গেল, যখনই আমার কথা ভেবে মন খারাপ হবে, তখনই এই বইটা পড়বে।

বইটাকে তুলে নিয়ে কোলের উপর রেখে দিয়ে আবার কাঁদতে থাকে বাণী। তারপরেই হাঁপ ছেড়ে আর চোখ মুছে কথা বলে--অনুদা'র সঙ্গে কখন দেখা হতে পারে?

প্রতিভা—দেখা হবেই। সেজন্যে আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?

বাণী—অনুদা'কে চিঠি দিয়েছিলাম। উত্তর পাইনি। কিন্তু অনুদা কি ভুলতে পারে যে, আমিই অনুদার একমাত্র বোন। অনুদার একমাত্র মামার একমাত্র মেয়ে আমি। এ বাড়ির শুভ কাজের দরকারে আপনজন খুঁজতে গিয়ে আমারই কথা মনে পড়েছিল অনুদা'র।

প্রতিভা—সেইজন্যেই তো বলছি, আপনি মিথ্যে এত চিন্তে করছেন।

বারান্দা ধরে জুতো-পরা পায়ের শব্দ বাজতে বাজতে এই ঘরেরই দিকে এগিয়ে আসে। এসেই পড়ে। অনুপম বলে—সত্যিই যে, বাণীই এসেছে, দেখছি।

চার-পাঁচটে খোলা চিঠি ক্লিপ-আঁটা এক সঙ্গে অনুপমের এক হাতে ঝুলছে। অনুপম বলে—তোমার চিঠি ঠিক সময়েই এসেছে, বাণী। কিন্তু খুলতে প্রায় সাত-আটটা দিন দেরি হয়ে গেল। আজ এই কিছুক্ষণ আগে চিঠি খুলেছি। কিন্তু জবাব দেবার দরকার হলো না। রামপ্রসাদ খবর দিল, বর্ধমানের দিদি এসেছেন।

অনুপমের পায়ে হাত ছুঁইয়ে প্রণাম করে নিয়েই আবার দু'হাতে মুখ ঢাকে আর ফোঁপাতে থাকে বাণী।

অনুপম—আর কেঁদে কোন লাভ নেই। যা হবার তো হয়েই গিয়েছে। তুমি এখানে থাকবে, তাতে আমার আবার কিসের অসুবিধে? কিছুই না।

প্রতিভার দিকে তাকিয়ে কথা বলে অনুপম—তুমিই দেখে-শুনে বাণীর জন্য একটা ঘর ঠিক করে দাও।

হাতের চিঠির গুচ্ছ নেড়ে-চেড়ে মনে মনে পড়তে থাকে অনুপম। তারপর বলেও ফেলে--সবাই দেখছি কষ্টে পড়েছে, থাকবার ঠাঁই চায়।

চলে যেতে যেতেই একবার থমকে দাঁড়ায়, আর, হাতের একটা চিঠির লেখার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকেই আবার ফিরে আসে অনুপম।

—বাণী, কে এই মহিলা, যে তোমার নাম করে লিখেছেন যে, তুমি তার অবস্থার সব কথা জান?

বাণী—কে? তবে কি মুক্তি লিখেছে এই চিঠি?

অনুপম—হ্যাঁ, মুক্তি সোম।

বাণী—রামপুরহাট থেকে?

অনুপম—হ্যাঁ।

বাণী—মুক্তির দুর্ভাগ্যের সব কথা শুনলে তোমার চোখে জল এসে যাবে, অনুদা। ওরই স্বামীর নাম জয়ন্ত সোম, যার কথা তুমিও নিশ্চয়...।

অনুপম—আমি কিছুই জানি না।

বাণী—আগস্ট হাঙ্গামার সময় গ্রেপ্তার হয়ে সেই যে জেলে গেলেন জয়ন্ত সোম, আর ফিরলেন না। মুক্তির আর আমার প্রায় একই রকমের দুর্ভাগ্য, অনুদা। জেলে থাকতেই মারা গেলেন জয়ন্তবাবু।

অনুপম—মহিলার আপনজন বলতে কি কেউই নেই?

বাণী—আছেন বইকি। এক রায়বাহাদুর ভাসুর আছেন, তিনি মুক্তিকে ঘরে ঠাঁই দিতে পারেননি। কাজেই বর্ধমানে এক পিসির বাড়িতে তিনটে বছর ছিল। তখন আমার কাছে প্রায় রোজই আসতো মুক্তি। খুব শান্ত স্বভাবের মেয়ে। পিসির বাড়িতে দাসীর মত খাটতে হতো, তবু কোনদিনও আমার কাছে পিসির নামে একটাও নিন্দের কথা বলেনি। পিসি মারা গেলেন, আর পিসেও বললেন, তুমি অন্য কোথাও তোমার ঠাঁই খুঁজে নাও। অগত্যা রামপুরহাটে চলে গেল মুক্তি। সেখানে এক বুড়ো পিসে আর বুড়ি পিসি। অভাবে অনটনে তাদেরই দিন চলে না।

অনুপম—মুক্তি সোম লিখছে, পিসে আর পিসি দুজনেই শিগ্‌গির কাশী চলে যাবেন আর সেখানেই থাকবেন।

বাণী—তাই নাকি? তাহলে তুমি দয়া করে মুক্তির অবস্থার কথাটা একটু ভেবে দেখ, অনুদা।

অনুপম—মুক্তি সোমও তাই লিখেছে। খবরের কাগজে আমার কথা পড়ে মুক্তি সোমের ধারণা হয়েছে, আমি ভগবানের চেয়েও বেশি দয়ালু। হেসে ফেলে অনুপম।

বাণী হাসতে চেষ্টা করে—দুঃখী মানুষের মুখের কথা ওরকমই হয়ে থাকে।

অনুপম—মহিলা লিখছেন, একটা আশ্রয় পেতে চান। একবেলা খাবেন আর ঘরের সব কাজ করে দেবেন। কিন্তু...।

আবার হেসে ফেলে অনুপম—এটা তো কোন কজের কথা নয়।...আচ্ছা, আমি যদি মহিলার জন্যে কোন কাজ-টাজ যোগাড় করে দিই, তবে...।

বাণী—তবে খুব ভাল হয়, অনুদা। কিন্তু তার আগে তো মুক্তির একটা ঠাঁই পাওয়া দরকার।

অনুপম—কিছুদিন এখানে রইলো ; তারপর কাজ পেয়ে অন্য জায়গায় চলে গেল ; এরকম একটা ব্যবস্থা হলে চলবে তো?

বাণী—খুব চলবে। এর চেয়ে আর বেশি কী উপকার আশা করতে পারে মুক্তি?

অনুপম—মহিলাও সেই কথা লিখেছে। তা হলে তুমিই এর চিঠির একটা জবাব পাঠিয়ে দাও, বাণী।

মুক্তি সোমের চিঠিটাকে বাণীর হাতে তুলে দিয়েই চলে যায় অনুপম।

কত তাড়তাড়ি পার হয়ে যাচ্ছে দিনগুলি। দিবস দিবস করি মাসা। তারপর, মাস মাস করি বরষ গোঙায়নু। বাগবাজারের এই বাড়ির তেতলার ঘরের জানলা দিয়ে যখন গঙ্গার হাওয়া হু-হু করে ছুটে এসে ভিতরে ঢুকতে চায়, তখন জানলার কাছে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও, আর খোঁপাটাকে শক্ত করে বাঁধলেও, প্রতিভা রায়ের ওই শক্ত খোঁপারই উপরে ভেসে থাকা একটা সাদা চুল ফুর ফুর করে উড়তে থাকে।

হ্যাঁ, চলেই যাচ্ছে। চালিয়েও যাচ্ছে প্রতিভা। মাঝরাতে দরজার কপাটের গায়ে টোকার শব্দ বাজে। প্রতিভাও দরজা খুলে দিতে একটুও দেরি করে না। আর ভুল হয় না। মাঝরাত পার না হবার আগে কখনও ঘুমিয়ে পড়ে না। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে যখন বুঝতে পারে, এইবার রাত শেষ হতে চলেছে, তখন ঘুমিয়ে পড়ে। অভ্যাসে কী না হয়! চোখ দুটো বন্ধ করলেই ঘুম এসে যায়। ঘুমটা যেন প্রতিভার বিছানার বালিশের কাছে একটা অদেখা করুণার শরীর হয়ে আর প্রতিভার চোখ-মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকে। প্রতিভা একটা হাঁফ ছেড়ে নিয়ে চোখ দুটোকে বন্ধ করে দিতেই সেই মুহূর্তে এসে লুটিয়ে পড়ে ওই ঘুম ; সে ঘুমের মধ্যে যদি কোন স্বপ্ন থাকেও, তবু ঘুম ভাঙতে সে স্বপ্নের কোন কথা আর মনে পড়ে না প্রতিভার।

মাঝে মাঝে একটা অদ্ভুত কথা মনের ভিতরে হেসে ওঠে। যেন চোরাকাঁটার জঙ্গলের ভিতর থেকে একটা ছোট্ট ঘাস-ফুল উঁকি দিয়ে প্রতিভার মুখটাকে দেখছে আর একটা সান্ত্বনার কথা বলছে। হেসে ফেলে প্রতিভা। হ্যাঁ, এটা একটা চমৎকার সান্ত্বনা বটে। দুর্গাবালার বোন মণিবালার স্বামী বাড়ি ফিরে এসেই মণিবালার গলা টিপে ধরে কিলোতে থাকে। মণিবালা বলেছে, তবু রক্ষে, দিদি, শুধু আমাকেই কিলোয়। আর কোন মেয়েমানুষকে তো কিলোয় না।

প্রতিভার জীবনের নিয়ম-করা সেই অদ্ভুত খাটুনিও অনেক কমে গিয়েছে। মাসের মধ্যে

বড়জোর একবার কি দু'বার মাঝরাতে ঘরের দরজায় টোকা পড়ে। বিনা নেশায় হাত-পা ছুঁড়ে, একটা জীবন্ত মাতলামি হবার ব্রতটা এখনও আছে, কিন্তু বারে কম গিয়েছে। তবে কি অনুপমের নিঃশ্বাসের বাতাসটাও একঘেয়ে সুখের ক্লান্তিতে একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছে? না, বয়সের ছোঁয়া লেগে মাথার দু' পাশের কালোর উপর বেশ কিছুটা সাদা-সাদা ছিটে পড়েছে, সেই জন্যে?

এক একদিন বুঝতে পেরে একটু আশ্চর্যও হয়েছে প্রতিভা। বাইরের বারান্দাতে পায়ের শব্দটা আস্তে আস্তে হেঁটে এল, ঠিক এই ঘরের বন্ধ দরজার কাছে এসে থামলো। তার পর, কে জানে কী ভেবে আবার চলে গেল শব্দটা।

মনে হয়েছে প্রতিভার, অনুপমের শরীরটা আজ বোধহয় ভাল নয়। কেন? সেটা আর খোঁজ নিয়ে জানবার দরকার হয় না। রোজের খবর-কাগজটাকে একটু ভাল করে পড়লেই জানা যায়, বাইরে বাইরে কী তুলকামাল কাণ্ডই না করে বেড়াচ্ছেন ভদ্রলোক। একদিন চার জায়গায় বক্তৃতা করেছেন। পার্কের মিটিং-এ হাজার হাজার মানুষের ভিড়ের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেছেন অনুপম রায়, খবরকাগজে এই ছবিও দেখতে পাওয়া যায়। দিনের পর দিন এত হাততালির শব্দ শুনলে শরীরটা একটু অসুস্থ না হয়েই বা পারবে কেন? নরেনকাকা তো একটা ফেরিওয়ালার গলার একটা হাঁক শুনলেই চমকে ওঠেন আর কানে হাত দেন।

খোঁজ নিতে, একটু জিজ্ঞেস করে জানতে ইচ্ছে করে, শরীর ভাল নয় কেন? ভাল বোধ না করলে ডাক্তারকে দেখাও না কেন? সত্যিই দেখিয়েছ কি? আমার তো কিছু জিজ্ঞেস করা নিষেধ আছে। তবু জিজ্ঞেস করছি। এখনো তো একেবারে পাগল হয়ে যাইনি।

এই বাড়ির দোতলাটা এখন সত্যিই একটা করুণা-তলা। দোতলার অনেক ঘরের মধ্যে দুটি ঘরের একটিতে থাকে বাণী, আর-একটিতে মুক্তি। অনুপম রায়ের করুণার আশ্রয় পেয়ে দুঃখ আর দুর্ভাগ্যের দুই অসহায় নারীর জীবনের উদ্বেগ মুছে গিয়েছে।

এই বাড়ির বিকেল বেলার জীবনটা সত্যিই গল্প হাসি আর খুশি গুঞ্জনের জীবন। বাণী আর মুক্তি দুজনেই তেতলায় প্রতিভার ঘরে এসে বসে। তারপর গল্প। কাঁচপোকার টিপ থেকে শুরু করে সাতভরি সীতেহারের গল্প। চুরি করে টকো কুল খাওয়া থেকে শুরু করে বেলুড়ের মন্দিরের গল্প। বাণী অবশ্য এক-একবার গম্ভীর হয়ে যায় আর ফুঁপিয়ে ওঠে, যখন একটা শেষ উপহারের বইয়ের গল্প বলতে শুরু করে। আর মুক্তির চোখের পাতাও জলে ভারি হয়ে যায় ; যখন জেল থেকে পাওয়া একটা শেষ চিঠির কথা তুলে কিছু বলতে চেষ্টা করে।

মুক্তি বলে—সব ভাল, তবু বলবো, বউদি, এত কুঁড়ে হয়ে পড়ে থাকতে ভাল লাগছে না। আমাকে যাহোক কোন একটা কাজের ভার দাও।

প্রতিভা হাসে—ওরে বাবা, আমি ওর মধ্যে নেই। কাজ-টাজের ভার দেবার মানুষ আমি নই।

মুক্তি—অনুদা'র সঙ্গে তো এক মিনিট কথা বলবারও উপায় নেই। বলতেও পারছি না যে, আমার যে এবার একটা কাজ না হলেই নয়, অনেকদিন তো হয়ে গেল।

বাণী বলে—আমি অবিশ্যি অনুদাকে অনেকবার বলেছি।

প্রতিভা—কী বললে তোমার অনুদা?

বাণী হাসে—কানেই তোলে না আমার কথা। শুধু বলে, হ্যাঁ মনে আছে।

প্রতিভা—তবে আর তোমরা এক ব্যস্ত হচ্ছো কেন? যেমন আছ তেমনই থেকে যাও।

প্রতিভার মাথা থেকে পট্ করে একটা সাদা চুল উপড়ে দিয়ে হেসে ওঠে বাণী—এ কী, বউদি? তুমি না আমার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট?

প্রতিভা—হতে পারে।

বাণী--তা'হলে? কী এটা? সত্যি তোমার ওপর মাঝে মাঝে আমার বেশ রাগ হয়।

প্রতিভা--কেন?

বাণী--একবার হাসপাতালে যাও আর নতুন জিনিস কোলে নিয়ে ফিরে এস। তবে বলবো, রাগ আর নেই।

মুক্তিও উৎফুল্ল হয়ে হাসে--তাহলে আমাদেরও একটা মনের মত কাজ পাওয়া হবে।

বাণী--হ্যাঁ, তুমি শুধু তোমার বিছানাতেই গ্যাঁট হয়ে বসে থাকবে ; তোমাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না, বউদি।

মুক্তি--কাঁথা ধোওয়া থেকে শুরু করে দোলনা দোলানো পর্যন্ত সব কাজ আমরাই করে দেব।

বাণী--তাই বলছি ; তোমার আর দেরি করা ভাল দেখায় না।

প্রতিভা হাসে--বাণীদি।

বাণী--কী?

প্রতিভা--তোমার চোখের চশমাতে একটা মশা।

বাণী--অ্যাঁ? তাই নাকি।

চশমাটাকে নামিয়ে নিয়ে মুছতে থাকে বাণী।

মুক্তি--তুমি নিশ্চয় একটা ধাপ্পা দিলে, বউদি।

প্রতিভা--তুমি বরং তোমার ওই গল্পটা, রামপুরহাটের ভৈরব বাবার গল্পটা আর-একবার বল। কী যেন একটা কথা বলে চিৎকার করতো ভৈরব বাবা?

মুক্তি--না লাগে দয়ামায়া, না লাগে মন, বাবা, বোম বোম বোম!

প্রতিভা হাসে--কিন্তু একথা শুনে ভয় পেতে কেন?

মুক্তি--পাব না? শুনলে তুমিও ভয় পেতে।

প্রতিভা--আমি একটুও ভয় পেতাম না। ভয়-টয় আমার নেই।

রামপ্রসাদ এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাক দেয়--মা।

প্রতিভা--কী?

রামপ্রসাদ--সেই মাস্টারবাবু এসেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

--কে? অজয়বাবু। বলতে বলতে আর শাড়ির আঁচলটাকে টানতে টানতে চলে যায় প্রতিভা।

প্রতিভার ঘরের ভিতরে বিকাল বেলার গল্পের আসরে বসে শুধু মুক্তি আর বাণী গল্প করে। আর নীচের তলার ড্রইং-রুমের পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকেই হেসে ওঠে প্রতিভা--কী খবর? নিশ্চয় দেনা শোধ করতে এসেছেন।

অজয়--হ্যাঁ। এই নিন ; সব নয় কিন্তু, দশ টাকা।

প্রতিভা হাসে--তার মানে ত্রিশ টাকা শোধ হলো।

অজয়--হ্যাঁ, বাকি রইল দশ টাকা।

--কিন্তু এত দেরি করলেন কেন?

--বুঝতেই তো পারছেন, দেরি হবার কারণ কী হতে পারে।

--বুঝতে পারি। আপনি কিন্তু বেশ অদ্ভুত মানুষ।

--পাড়ার লোকে অবিশ্যি একথা বলে, কিন্তু আপনিও একথা বলছেন?

--না না, আপনি ভুল বুঝবেন না। অদ্ভুত মানে...মানে যা-ই হোক, আমি আপনাকে নিন্দে করে কথাটা বলিনি।

--এই জন্যেই আপনাকে ভাল লাগে।

--কি বললেন?

—এই জন্যেই আপনার কাছে কোন কথা বলতে ভয় করে না।

—কী জন্যে?

—আপনি শক্ত কথা বলতেই পারেন না। তা না হলে আমি ভুল করে সেদিন যে-কাণ্ডটা করেছিলাম, সেটা সহ্য করা অন্য কারও পক্ষে...যাক সে-কথা। পুরনো কথা।

—বুঝলাম না, আপনি কবে কী কাণ্ড করেছিলেন।

—ওই যে একেবারে উপরতলায় গিয়ে আপনার ঘরের দরজায় টোকা দিলাম। অন্য কেউ হলে আমাকে দারোয়ান দিয়ে বের করে দিত। আর, আপনি আমাকে দিলেন টাকা। সরযূও আশ্চর্য হয়ে বলেছিল, এই মহিলার মনের ভিতরে স্ফটিক লুকানো আছে; চোখ দুটো দেখতে কেমন বল তো? আমি বললাম, শুকতারার মত।

—আপনাকে চা-খাবার দিয়েছে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, দিয়েছে। আপনাদের বাড়ির ওই বুড়ো মানুষটি, নাম অবিশ্যি জানি না...।

—রামপ্রসাদ।

—যা-ই হোক, ইনিও একজন চমৎকার প্রাণের মানুষ বলে মনে হয়। আমাকে দেখা মাত্র বলে ফেললেন, আগে একটু চা-খাবার খেয়ে নিন বাবা।

—সরযূদি এখন কেমন আছেন?

—সেই কথাটি আপনাকে বলবার জন্যেই তো বসে আছি, তা না হলে এতক্ষণে চলে যেতাম।

—কেন?

—আজ আবার আমাকে নটে চাঁপা খুঁজতে বের হতে হবে।

—তাই বলুন। আজ আপনাদের বিয়ের বাৎসরিক দিন। কিন্তু...।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক সন্দেহ করেছেন। বলুত তো, কী সন্দেহ হয়েছে আপনার?

—আমার তো মনে পড়ছে, সেবার আপনি শ্রাবণ মাসের একটা দিনে নটে চাঁপা খুঁজতে বের হয়েছিলেন।

—ঠিক। আজ হলো আর-একটা অদ্ভুত ঘটনার বাৎসরিক দিন। তার মানে, সরযূ আর নেই। পুরো এক বছর হলো নেই।

চমকে ওঠে প্রতিভার বুকের ভিতরের সব নিঃশ্বাস। চোখের পাতা ভারি হতে থাকে।

অজয়—কিছুই বুঝলাম না, সরযূ কেন এত তাড়াতাড়ি চলে গেল। চলে যাবার একদিন আগে, যখন সবে মাত্র ভোর হয়েছে, সেই রোগা জিরজিরে হাতটাকেই কোন মতে স্লেটের উপর তুলে লিখে দিল—আমি বোধহয় যাচ্ছি, কিন্তু তুমিও শিগগির চলে এস, দেরি করো না।

কপালটাকে দুই আঙুল দিয়ে আস্তে একটু টিপে নিয়েই হাসতে থাকে অজয়।—সরযূ কী বলতো, শুনবেন? শুনলে আপনি একটু আশ্চর্য না হয়ে পারবেন না। বলতো, আমার আগেই চলে যেও তুমি।

প্রতিভার চোখে যেন ভয়ানক এক বিস্ময়ের ছায়া চমকে ওঠে।—এরকম অদ্ভুত কথা কেন বলতেন, সরযূদি?

অজয়—আমাকে কেউ মানুষ বলে মনে করতে পারবে না, শুধু ঘেন্না করবে আর অপমান করবে, ভালবেসে আর সম্মান করে এক গেলাস জলও আমাকে কেউ খাওয়াবে না, বেঁচে থাকলে আমি শুধু কষ্টই পাব, এই দুশ্চিন্তার জন্যেই সরযূ বলতো, তুমিই আগে যাও। এ জঙ্গলে তোমাকে একা রেখে দিয়ে আমি আগে চলে যেতে চাই না।

প্রতিভা—একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

অজয়—বলুন।

প্রতিভা—সরযূদি কে?

অজয়—আমার স্ত্রী।

হেসে ফেলে প্রতিভা—আমি জানতে চাই, সরযূদির মা বাবা ভাই বোন আছেন নিশ্চয়। তাঁরা কোথায়?

অজয়—মা বাবা নেই। দুই দাদা আছেন।

প্রতিভা—তাঁরা কোথায়?

অজয়—একথা কেন জিজ্ঞেস করছেন?

প্রতিভা—সরযূদির এরকম একটা সাংঘাতিক অসুখে তাঁরা তো সাহায্য করতে পারতেন।

হেসে ফেলে অজয়—না, পারতেন না। তাঁরা সরযূকেও একটা অপদার্থ প্রাণী বলে মনে করেন।

প্রতিভা—কী অদ্ভুত দাদা।

—তাঁদের দোষ দেবার কিছু নেই। সরযূকে চিনতে ও বুঝতে পারা তাঁদের মত মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

—তাঁরা কোথায় থাকেন?

—একজন এই কলকাতাতে, আর একজন কাশ্মীরে, শ্রীনগরে।

—শ্রীনগরে? কী নাম, শুনি?

—তাঁর নাম আশুতোষ দত্ত। কলকাতায় যিনি থাকেন, তাঁর নাম বসন্তকুমার দত্ত।

প্রতিভার গলার স্বর যেন একটা নিবিড় বিস্ময়ের ভারে থমথম করে।—তাঁরা তো খুব বড়লোক মানুষ।

অজয়—আপনি তাঁদের চেনেন নাকি?

প্রতিভা—হ্যাঁ। আশু দত্ত আমারই আপন মেসোমশাই।

অজয়—বলেন কি? তাহলে...আপনার নামটা বললে সরযূ আপনাকে নিশ্চয় চিনতে পারতো। সত্যি, বড় ভুল হয়ে গেল ; আপনার নামটা সরযূকে আর বলা হলো না।

প্রতিভা হাসে—আমার নামটা তাহলে আপনার জানা আছে?

—আজ্ঞে?

—আমার নামটা কী?

অজয় হাসে—জানি না।

প্রতিভা—আমার নাম প্রতিভা।

অজয়—ভাল নাম। নামটা আভা হলে আরও ভাল হতো।

--কেন?

—ওই যে বললাম, আপনার চোখ দুটো যেন দুটো শুকতারা। সব সময় একটা আভা ফুটে রয়েছে। না দিলেক লক্ষ কোটি, সবে দিলা আঁখি দুটি, তাহে দিলা নিমিষআচ্ছাদন।

—এ কবিতার মানে কী?

—এ হলো ভালবাসার দুই চক্ষুর আক্ষেপ! মাত্র দুটি চোখ, তার ওপর আবার ক্ষণে ক্ষণে পলক পড়ে ; তা না হলে তোমাকে আরও কত স্পষ্ট করে আর ভাল করে দেখে নিতে পারতাম।

প্রতিভা হাসে।—আমার কিন্তু কোন আক্ষেপ নেই, মাত্র দুটো চোখ পেয়েছি বলে।

অজয়—কেন? একথা বলছেন কেন?

—আমার আর দেখবার কিছু নেই।

—আপনি কখনও কাশ্মীরে গিয়েছেন?

—না।

—গেলে একথা আর বলতেন না ; সরযূ প্রথমে ঠিক আপনার এই কথার মত একটা কথা বলতো ; কাশ্মীরের ওইসব ফুলের মধ্যে কী আর দেখবার আছে? কিচ্ছু নেই। কিন্তু একদিন বলতে হয়েছিল, আছে, সব দেখা দুচোখে কুলিয়ে উঠতে পারছি না।

—সেদিনটা আপনাদের বিয়ের পরের দিনটা, নিশ্চয়?

—না। আমার সঙ্গে দেখা হবার পর আমাকে যেদিন নিশাতবাগে বেড়াতে নিয়ে গেল সরযূ।

—লজ্জা না করে আর-একটা কথা জিজ্ঞেস করছি।

—বলুন।

—কথাটা কী বলেছিলেন, সরযূদি?

—ওই তো ; সরযূ বললে, আজ নিশাতবাগের সেই অনেক-দেখা ফুলগুলিকেই দেখতে এত বেশি ভাল লাগছে কেন? নতুন চোখ পেয়ে গেলাম নাকি?

হঠাৎ সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় প্রতিভা—আচ্ছা, আপনি এখন তাহলে...।

অজয়ও উঠে দাঁড়ায়—হ্যাঁ, চলি এখন।

প্রতিভা—আজ আবার নটে চাঁপা নিয়ে কী করবেন?

অজয়—বিশেষ কিছু না। শুধু বালিশের এক পাশে রেখে দেব ওই নটে চাঁপা, যদি পাই, তা না হলে চাঁপা।

প্রতিভা—তাতে কী হবে?

অজয় হাসে—শুধু নিজেকে ভুলিয়ে রাখবার একটা খেলা। হঠাৎ হয়তো একবার মনে হবে, যায়নি সরযূ, আমার কাছেই বসে রয়েছে। সবই ফাঁকি, কিন্তু খুব সুন্দর ফাঁকি নয় কি?...আপনি কি মনে মনে হাসছেন?

প্রতিভা—না। বেশ রাগ হচ্ছে।

—কেন? আমি তো...।

—আপনি বেঁচে থাকবেন কি নিয়ে?

—কি বললেন?

—আপনি এরকম কেন? বলতে গিয়ে প্রতিভার এত শান্ত গলার স্বরও যেন একটা ধমক দিয়ে ফেলে।

—বুঝলাম না, আপনি কী বলছেন?

—এত লোকের টাকা-পয়সা হয়, আপনার হয় না কেন?

—হবার নয় বলেই হয় না। আমি কাজ করতে পারি না, জানি না, ইচ্ছেও হয় না। আমার এই পৃথিবীতে থাকতেই ভয় করে, ভাল লাগে না। চন্দ্রবাবু একদিন কী কাণ্ড করেছিলেন, শুনবেন?

—বলুন।

—একদিন হঠাৎ আমার কাছে একটা লোক পাঠিয়ে দিলেন। লোকটা বলে কিনা, ভাল ডাক্তার হাতে আছে, সরযূর লাইফ এক লক্ষ টাকায় ইনসিওর করে দিতে কোন অসুবিধে হবে না। আমি বললাম, আমার টাকা কোথায় যে লাখ টাকার পলিসির প্রিমিয়াম দেবার সাধ্যি হবে? লোকটা বললে চন্দ্রবাবু দেবেন। আমি বললাম, চন্দ্রবাবু দেবেন কেন? লোকটা যা বললে, সে-কথা মনে পড়লে আমার এখনও ইচ্ছে করে, পালিয়ে গিয়ে গভীর জঙ্গলের একটা বাঘের পায়ের কাছে আছড়ে পড়ি আর বলি, হে বাঘ, তুমিই দয়ালু, তুমি আমাকে শান্তি দাও।

প্রতিভা—কথাটা বলুন।

অজয়—ক্যান্সারের রোগিণী, দু-এক বছরের মধ্যেই তো শেষ হয়ে যাবে। অতএব এক

লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে। ওই এক লক্ষে সত্তর হাজার নেবেন চন্দ্রবাবু, ত্রিশ হাজার নেব আমি ; এই হলো সর্ত।

--আপনি লোকটাকে কী বললেন?

হেসে ফেলে অজয়।--বললাম, চন্দ্রবাবুকে বলবেন, চন্দ্রকলঙ্কের চেহারা দেখে খুব ভয় পেয়েছে অজয় সরকার। ফর এ মেস অব পটেজ সর্বস্ব নষ্ট করতে পারে না অজয় সরকার।

প্রতিভা--আপনাকে সেবার যা দেখেছিলাম, তার চেয়ে এখন আপনি অনেক রোগা হয়ে গিয়েছেন।

অজয়--রোগা! তাতে কী আসে যায়!

--খুব আসে যায়। আপনি আমার একটা কথা শুনুন।

--বলুন, শুনছি।

--না, শুধু শুনছি নয়। আমাকে কথা দিন, শরীরের যত্ন করবেন, তুচ্ছ করবেন না।

--ইচ্ছে করে তো তুচ্ছ করি না ; তুচ্ছ হয়েই যায়।

--না। আমি এখনই নিয়ম করে দিচ্ছি, শুনে রাখুন, মনে করে রাখুন। সকালবেলা চায়ের সঙ্গে বিস্কুট-মাখন খাবেন। দুপুরবেলায় খাওয়ার মধ্যে যেন মাছ আর দই অবশ্যই থাকে। বিকেলে খাবেন, পাঁউরুটি আর ফল। সস্তা ফল ; ধরুন কলা শাঁকআলু ; এই সব। রাত্রিবেলা ভাত খাওয়া হয়ে যাবার এক ঘণ্টা পর এক গেলাস গরম দুধ খেয়ে নেবেন।

অজয়ের চোখে-মুখে যেন একটা হঠাৎ-বিস্ময়ের ঝড় এসে লেগেছে। তাই প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু ভাল করে তাকিয়ে দেখবার জন্য চোখ দুটোকে একটু টান করতে চেষ্টা করে। চাপা-চাপা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা স্বরে কথা বলে অজয়।--আপনি একথা বলছেন!

প্রতিভা--হ্যাঁ, আমিই বলছি। তাতে হয়েছে কী? এত আশ্চর্য হবার কী আছে? আচ্ছা, আপনি এখন তাহলে...।

অজয়--হ্যাঁ, চলি।

দরজার দিকে এগিয়ে যায় অজয়। প্রতিভা বলে--মনে থাকবে তো?

--থাকবে। মুখ না ফিরিয়েই জবাব দেয়, আর চলে যায় অজয়।

অনুপমের কাজের ঘরে আলো জ্বলে, পাখাও ঘোরে ; আর দরজার সবুজ ভেলভেটের পর্দা কেঁপে কেঁপে দুলতেও থাকে।

বড়বাজারের ভগবান দাস জৈন এসেছিলেন সন্ধ্যা সাতটায়, চলে গিয়েছেন আটটা বাজবার আগেই। কাজের কথা সেরে দিতে বেশি সময় নেননি।

ইনকম ট্যাক্সের সেনগুপ্ত এসেছিলেন সাড়ে আটটায়, চলে গিয়েছেন সাড়ে ন'টায়। ভুল করে সিগারেট কেসটা ফেলে রেখেই চলে গিয়েছেন।

রাত দশটার পর এলেন রেলওয়ের জয়স্বামী। টেণ্ডারের একটা ফাইল অনুপমের হাতের কাছে রেখে দিয়ে শুধু পাঁচ মিনিট বসলেন, এক কাপ কফি খেলেন, তারপর হাসলেন--আজ ওয়েদার খুব ভাল।

জয়স্বামী চলে যাবার দশ মিনিট পরে এলেন প্রাক্তন সাব-জজ এস হালদার।

চন্দ্রবাবু হাসেন--হালদার সাহেবের বয়স কমে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

এস হালদারও হাসেন--কী যে বলেন। চিন্তায় চিন্তায় প্রতি মুহূর্তে বুড়িয়ে যাচ্ছি।

সূর্যবাবু হাসেন--পনরই আগস্টে আপনি কলকাতায় ছিলেন?

এস হালদার--না। আমি ছিলাম আমার গ্রামে।

অনুপম--সেটা আমি অনুমান করেছিলাম।

এস হালদার--কেমন করে?

অনুপম--একটা গান শুনে সেদিন আপনার চোখ যে-রকম ছলছল করে উঠলো, তাতে

অনুমান করতে কি আর কোন অসুবিধে আছে?

চন্দ্রবাবু—কী ব্যাপার, অনুপম?

অনুপম—ভিলেজ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির একটা সভায় ছোট্ট একটি মেয়ে গান গাইল, 'ফিরে চল মাটির টানে', তাই শুনে হালদার সাহেবের চোখ ভিজে গেল।

এস হালদার—আমার সেন্টিমেন্টের কথা ছেড়ে দিন, ইন টার্মস অব ইকনমিক্সেই বলুন, গ্রামের উন্নতি ছাড়া ভারতের মত দেশের কি কোন উন্নতি সম্ভব?

সূর্যাবাবু—অসম্ভব? সাত লাখ গ্রাম নিয়েই তো ভারত, সহর আর কটা?

এস হালদার—এখন পাঁচ লাখ গ্রাম।

চন্দ্রবাবু—কেন?

অনুপম—দু' লাখ যে দু' পাশ থেকে কেটে বেরিয়ে গেল।

চন্দ্রবাবু হাসেন—বুঝলাম, বুঝলাম।

এস হালদার—কিন্তু নতুন লীডারশিপের খুব দরকার।

সূর্যবাবু—এসে যাবে। আমি কথাটা খুব বিশ্বাস করি হালদার সাহেব, সম্ভবামি যুগে যুগে। জাতি যখন সঙ্কটে পড়ে, দুঃখে আঘাতে মুষড়ে পড়ে, তখন নতুন লীডারশিপ আপনা-আপনি দেখা দেয়।

এস হালদার—ফিনিক্স পাখি আগুনে পুড়ে যখন ছাই হয়ে যায়, তকনই সেই ছাইয়ের মধ্যেই আবার নতুন পাখি জন্ম নিয়ে উড়ে বের হয়ে আসে। যাই হোক, আপনাকে দেখে তবু একটু ভরসা হয় যে...

চন্দ্রবাবু—আপনি কাকে একথা বলছেন, হালদার সাহেব? আমার মত বুড়োকে?

এস হালদার নম্রভাবে হাসেন—না, আমি অনুপমবাবুকেই বলছি।

সূর্যবাবু—এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন, অনুপম যদি দরজায় খিল দিয়ে ঘরে বসে থাকে, তবুও রেহাই পাবে না। পাব্লিক নিজেই এসে ভিড় [illegible]বে আর অনুপমকে টেনে নিয়ে যাবে।

অনুপম—আপনারা বড় বেশি বাড়িয়ে বলছেন, হালদার সাহেব আর সূর্যদা। এত যোগ্যতা আমার নেই যে, লীডার হতে পারি।

সূর্যবাবু—এটাও কিন্তু একটু বেশি বাড়িয়ে আত্মনিন্দা করা হয়ে গেল।

অনুপম—না না। আমি কাজ পেলে জান-প্রাণ দিয়ে শুধু খেটে দিতে পারি, এই মাত্র।

এস হালদার—আমার ইচ্ছে, আপনি কর্পোরেশনটাকে একটু দেখুন।

হেসে ওঠে অনুপম—তারপর একদিন বলবেন, ইউনিভার্সিটিটাকে একটু দেখুন।

চন্দ্রবাবু—তা তো বলবোই, বলতেই হবে।

সূর্যবাবু—হ্যাঁ, তারপর আরও বলবো, ইলেকশনে দাঁড়াও, স্বাধীন দেশের পার্লামেন্টের মেম্বার হও।

অনুপম—সেটা তো এখন অনেক দূরের ব্যাপার।

চন্দ্রবাবু—কিন্তু তৈরী হতে হবে। সেজন্যে একটু আগে থেকেই গ্রাউণ্ড ওয়ার্ক দরকার।

অনুপম—এ সব নিয়ে আমি এখন মাথা ঘামাই না চন্দ্রদা। শুধু এক রিলিফ সোসাইটির ট্রেজারার হয়েই ভাবতে হচ্ছে, হঠাৎ এই ঝুঁকি নিতে গেলাম কেন?

এস হালদার—তা বললে কি চলে? এখন কিন্তু একটু চিন্তা আর চেষ্টা করাই দরকার, অনুপমবাবু। আমিও একদিন অসময়ে, তার মানে সময় থাকতেই পেনসন নিয়ে সরে এলাম ; জজিয়তী দিতে চেয়েছিল, কিন্তু নিলাম না।

সূর্যাবাবু—সেটা এক রকম ভালই করেছিলেন। ভগবানের দয়াতে, তার পরেও তো আপনাকে কোন অসুবিধেয় পড়তে হয়নি। বরং...।

অনুপম- আপনি কি তা হলে সত্যিই...।
এস হালদার—হ্যাঁ, গ্রামের কাজ করবো।
অনুপম—কিন্তু এদিকের কাজ...।
এস হালদার—সেটা তো আছেই, থাকবেও।
অনুপম—এখন তাহলে কাজের কথাই হোক।
এস হালদার—হ্যাঁ।
অনুপম ডাকে—বীরবাহাদুর। তুম হ্যায়?
—জী হুজুর।
অনুপম—আচ্ছা, ঠিক হ্যায়।

ঠিকই. চমৎকার ওয়েদার। পরিষ্কার আকাশে একটি পরিচ্ছন্ন চাঁদ। সেই সঙ্গে একটি পরিষ্কার নীরবতা। ধীর স্থির ও নীরব বীরবাহাদুর টুলের উপর বসে আছে। সেক্রেটারী পুলকবাবুর ঘরটাও নীরব, টাইপাইটারের শব্দ নেই। ফটক নীরব, ড্রইং রুম নীরব, গ্যারেজ নীরব। মাদ্রাজী কুক রাজুলুর চা-তৈরীর ডেস্কও নীরব। দরজাবন্ধ প্রত্যেকটি ঘরের ঘুমও নীরব।

শুধু একজন, এই বাড়ির অনুপম রায়ের স্ত্রী প্রতিভা রায়ের চোখে ঘুমও নেই, ঘরের দরজা বন্ধও নয়, আর মুখটাও নীরব নয়। তেতলার বারান্দার রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রতিভা, আর বিড়বিড় করে যেন নিজেরই সঙ্গে কথা বলছে। যত সব অদ্ভুত কথা। যেন ছেঁড়া-ছেঁড়া স্বপ্নের এক-একটা ভাসা-ভাসা কথা। যেন বুকটা কেঁপে উঠে কথা বলে, মাথাট জ্বলে উঠে কথা বলে।

হ্যাঁ, সাপের মাথাটাকে শুধু থেঁতলে দিয়েই ছেড়ে দিতেন না বিশ্বনাথদা। একটা কাঁচা বাঁশের কঞ্চিতে সাপটাকে ঝুলিয়ে নিয়ে গিয়ে পুকুরের ওদিকের আলোকলতার ঝোপটার গায়ের উপরে ফেলে দিতেন। তখুনি কোথা থেকে একটা চিল উড়ে এসে আর ছোঁ মেরে মরা সাপটাকে তুলে নিয়ে উধাও হয়ে যেত।

দু' মাস কেন, প্রায় তিন মাস হতে চলেছে, এই ঘরের ভিতরে আর ঢোকেনি ভদ্রলোক। দরজার গায়ে টোকার শব্দ তো বাজেইনি, পায়ের শব্দটা যদি বা কখনও আস্তে আস্তে হেঁটে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু তখুনি ফিরে চলে গিয়েছে। এর মানে তো এই দাঁড়ায় যে, প্রতিভার জীবনে একটি মাত্র যে-কাজ ছিল, এই ঘরের ভিতরে রাত জেগে বসে থেকে একটা অপেক্ষার মানত পালন করবার কাজ, সে-কাজের দরকারও শেষ হয়ে গিয়েছে। তাহলে তো বলতে হয়, মাথা থেঁতলানো সাপটাকে এইবার তুলে নিয়ে আলোকলতার ঝোপের উপরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আর এই ঘরে একা-একা রাত জেগে বসে থেকে লাভ কি, যদি তিনিই না আসেন, যাঁর জন্যে বসে থাকা?

না না ; নিশ্চয় ভদ্রলোকের শরীর খুব খারাপ হয়েছে। বাইরের কাজের হুল্লোড়ে পড়ে কাহিল হয়ে গিয়েছে। কী আশ্চর্য, সুধার মা এত রাজ্যের যত বাজে খবর দিতে পারে, কিন্তু একদিনও একটু বলে গেল না যে, দাদাবাবুর শরীর ভাল যাচ্ছে না। সকাল-সন্ধ্যার মধ্যে অন্তত চার-পাঁচবার তো সুধার মার সঙ্গে ভদ্রলোকের দেখা হয়। সুধার মা তো আজকাল প্রায় সময় নীচের তলার বারান্দাতেই বসে থাকে, আর শুধু রামায়ণ পড়ে ও পান সেজে দিন পার করে দেয়। তখন তো দেখতে পায় সুধার মা, ওর চোখের সামনে দিয়ে যে মানুষটা চলে গেল, সে মানুষটার মুখ শুকনো কিনা, দেখতে রোগা-রোগা লাগছে কিনা।

পায়ের শব্দ। শব্দটাকে একটু ভাল করে শোনবার জন্যে মাথা ঝুঁকিয়ে সিঁড়ির মুখটার দিকে তাকায় প্রতিভা। হ্যাঁ, আসছেন ভদ্রলোক।

গায়ের পাঞ্জাবিটাকে খুলে নিয়ে কাঁধের উপর ফেলে রেখেছে অনুপম, নাগরা-পরা পায়ের

শব্দটাও যেন ঢিলে-ঢিলে হয়ে বাজছে, এক হাতে রুপোর চেনের সঙ্গে বাঁধা চাবিও ঝুলছে। আর-এক হাতে কাগজপত্রের একটা ফাইল।

নিজের ঘরে না ঢুকে সোজা প্রতিভারই কাছে এসে দাঁড়ায় অনুপম।—কী? তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

প্রতিভা—তোমার শরীর ভাল আছে তো?

অনুপম হাসে—নিশ্চয় ভাল আছে। দেখতেই তো পাচ্ছ, এটা কি একটা অসুখ-হওয়া শরীর?

হ্যাঁ, দেখতেই পেয়েছে প্রতিভা, এ শরীরকে কোন অন্ধও একটা কাহিল শরীর বলে সন্দেহ করবে না। তবু, ভুলের ভয় আছে বলেই কথাটা জিজ্ঞেস করেছে।

—যাও, ঘরে যাও। শুয়ে পড়, অনেক রাত হয়েছে। বলতে বলতে নিজের ঘরের দিকে চলে যায় অনুপম। দুটো স্টীল-সেফ আছে যে-ঘরে, সেই ঘরে। মুখ ফিরিয়ে আর তাকায় না প্রতিভা, কিন্তু শব্দ শুনে বুঝতেও কোন অসুবিধে নেই, তালা খুললো, ঘরে ঢুকলো, আর দরজাও বন্ধ করে দিল, অনুপম।

এইবার নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে আর শুয়েও পড়ে প্রতিভা। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়া কি উচিত হবে?

উচিত নয়। অনুপমের রাতের জীবনের ইচ্ছেটা আজ বোধহয় দরজার গায়ে টোকা না দিয়ে পারবে না। আবার ভুল হবে, যদি ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখে প্রতিভা, সে শব্দের ডাক শুনতে না পায়, তাড়াতাড়ি দরজা খুলে না দিতে পারে, আর, জাগা-চোখের দুটো ক্লান্ত কালো তারাকে হাসিয়ে ও চকচকিয়ে দিয়ে বলতে না পারে, এস।

রাত বাড়ছে, বাড়ুক। জেগে থাকতে অসুবিধে নেই। যদি সত্যিই চোখ দুটো জেগে জেগে ক্লান্ত হয় আর মাথাটা বার-বার ঢুলে পড়ে, তবে উঠে গিয়ে খোলা জানালাটার কাছে গিয়ে একবার দাঁড়াতে হবে, আর আকাশের মিটমিটে তারাগুলির দিকে একবার চোখ টান করে তাকিয়ে নিলেই হবে। ঘুমের আবেশ তখুনি ভেঙ্গে যাবে।

কিন্তু কই? দরজার নিরেট কাঠের কপাট যে সত্যিই একটা নিরেট বোবা ঠাট্টা। শব্দ নেই। বলতেই হবে, এ এক চমৎকার ভাগ্য। যাদের কেউ নেই, তারা এখন ঘুমোচ্ছে। খুব ভাল ঘুম, গভীর ঘুম। মুক্তিদি ঘুমোচ্ছে একটি চিঠির সঙ্গে, বাণীদি ঘুমোচ্ছে একটি বই-এর সঙ্গে, আর এক মুঠো নটে চাঁপা ফুলের সঙ্গে ঘুমোচ্ছেন ওই অজয়বাবু। শুধু গুপ্তিপাড়ার চৌধুরীবাড়ির মেয়ে, যার জীবনের একজন এত স্পষ্ট ও এত সত্য হয়ে একটু দূরে একটি ঘরের মধ্যেই আছেন, তারই চোখে ঘুম নেই। টোকার শব্দটাও তাকে আজ ভুলে গিয়েছে। এ যেন শ্মশান-ঘাটের একটা একলা মড়া, কেউ তাকে চেনে না, তাই কেউ কাছে যেতে আর ছুঁতেও চায় না।

রাত কি ভোর হয়ে এল? চমকে উঠে খোলা জানালার দিকে তাকায় প্রতিভা।

হ্যাঁ, ভোর হয়েছে বইকি। পুবের আকাশটা তো প্রায় ফরসা হয়েই এসেছে। হাওয়াটাও বেশ ঠাণ্ডা।

দরজা খুলে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায় প্রতিভা। হ্যাঁ, ওটারই নাম শুকতারা। শুধু আকাশে নয়, শুকতারাটা বারান্দার দেয়ালের একটা আয়নার বুকের উপরেও ফুটে রয়েছে। ফুলের টবের পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটে আজকের ঘুমভাঙা ভোর বেলার প্রথম ছায়ার মত ঘুরে বেড়ায় প্রতিভা।

চমকে ওঠে প্রতিভা। দু' চোখ অপলক করে দেখতে থাকে। একটা উতলা আলুথালু ভয়ের চেহারা, হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে আর হুমড়ি খেয়ে খেয়ে তেতলার সিঁড়ি ধরে উপরে উঠছে। ও কে? মনে হচ্ছে, মুক্তিদি।

উঠে এসেই প্রতিভার গায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে, আর, প্রতিভার একটা হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে কাঁপতে থাকে মুক্তি—ঘুমোতে পারিনি, বউদি। বুক কাঁপছে, বউদি।

প্রতিভা—কেন? কী হয়েছে?

মুক্তির দু' চোখের ভয় তখনও থরথর করছে। মুক্তি বলে—দরজার গায়ে টোকা।

প্রতিভা—শুনতে ভুল করনি তো?

মুক্তি—না বউদি ; একবার দু'বার নয়। বার বার, আট-দশ বার। চলে যায়, আবার ফিরে এসে দরজার গায়ে টোকা দেয়। ভয় পেয়ে প্রায় মরতেই বসেছিলাম। চেঁচিয়ে একটা ডাকও দিতে পারিনি। ঠক ঠক করে কেঁপেছি আর ভগবানকে ডেকেছি।

প্রতিভা—টোকার শব্দ থামলো কখন্?

মুক্তি—কে জানে কখন। কাক ডাকলো, আর আমিও তক্ষুনি দরজা খুলে বের হয়ে পড়ি-মরি করে একটা দৌড় দিয়ে তোমাকেই ডাকতে যাচ্ছিলাম।

প্রতিভা—বেশ করেছো।

মুক্তি—তোমার ঘরের দরজাতেও কি...।

প্রতিভা হাসে—না।

মুক্তি—এ কেমন শব্দ, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না। চোর?

প্রতিভা—না।

মুক্তি—তবে?

প্রতিভা—ভূত।

মুক্তি—মিথ্যে কথা বলো না, বউদি।

প্রতিভা—আস্তে কথা বল। কথা বলোই না। এখন আমার ঘরে গিয়ে শুধু চুপটি করে বসে থাক। চল।

কিন্তু কতক্ষণ আর চুপটি করে বসে থাকা যায়? মুক্তির দুই চোখ বার বার শিউরে উঠতে থাকে। প্রতিভার মুখের দিকে তাকালেও যে বুকটা ছমছম করে। চুপ করে আর চোখ দুটোকে একেবারে পাথরের মত শক্ত করে নিয়ে কী দেখছে আর কী ভাবছে প্রতিভা?

প্রতিভার ঘরের মেজের উপর লুটিয়ে বসে আর আস্তে কথা বলতে গিয়েও মুক্তির গলার স্বর কাঁপে।—এত ঘর আর এত দরজা থাকতে শুধু আমারই ঘরের দরজাতে ভূতের টোকা?

প্রতিভা—তার মানে বুঝে দেখ।

মুক্তি—কী?

প্রতিভা—তার মানে, তোমার আর এখানে থাকা চলবে না। থাকলে ভুল করবে। ভূতে একদিন তোমার ঘাড় মটকে তোমাকে মেরে ফেলবে। তোমাকে এখনই চলে যেতে হবে।

মুক্তি—এখনই?

প্রতিভা—হ্যাঁ।

মুক্তি—কিন্তু কোথায় যাব?

প্রতিভা—তা আমি জানি না।

উঠে দাঁড়ায় মুক্তি।—আচ্ছা, চলি তবে বউদি। নমস্কার বউদি।

চলেই যাচ্ছিল মুক্তি ; কিন্তু প্রতিভা যেন ধড়ফড় করে চমকে উঠেই এগিয়ে আসে। মুক্তির একটা হাত ধরে।—গরীবের বাড়িতে থাকতে চাও, মুক্তিদি?

মুক্তি হাসে—চাই।

প্রতিভা—তাহলে আমার একটা কথা শোন।

মুক্তি—বল।

প্রতিভা—তুমি শেফালীদির কাছে চলে যাও।

মুক্তি—আমি তো যেতে পারি। কিন্তু...।

প্রতিভা—কোন কিন্তু নেই। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি। এই চিঠি নিয়ে তুমি এখনি চলে যাও।...হ্যাঁ, যাবার সময় বাণীদিকে একটা মিথ্যে কথা বলে যেতে পারবে?

মুক্তি হাসে—পারবো। বল।

প্রতিভা—বাণীদিকে বলো, কাজ পেয়েছি ; এখুনি না গেলে চলবে না, তাই চলে যাচ্ছি।

চিঠি লিখতে থাকে প্রতিভা—তোমার পায়ে পড়ি শেফালীদি, মুক্তিদিকে তোমার ঘরে ঠাঁই দিও। আমার এখানে ঘর আছে, কিন্তু জায়গা নেই। মুক্তিদির তাই জায়গা হলো না।

এ কি? সত্যিই যে গুপ্তিপাড়ার চিঠি। খামের টিকিটের উপরে গুপ্তিপাড়ার ডাকঘরের ছাপ। ঠিকানাটা রানু বউদিরই হাতের লেখা। গুপ্তিপাড়ার বাড়ির ঘরে তাহলে এখন সন্ধ্যে-পিদিম জ্বলে। পুরনো দোলমঞ্চের কাছে খেলা করে মণ্টু আর টুলু। ঠিক কত বয়স হলো টুলুর?

খাম খুলে চিঠি পড়ে প্রতিভা। তারপর চিঠিটারই দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। শক্ত শুকনো, আর যেন ছাই-মাখা দুটো চোখ অনেক দূরের একটা আগুনলাগা অদৃষ্টের ধোঁয়া দেখছে।

পরেশ চৌধুরীর মেয়ের চোখ পানসে নয়। তবু ভিজে ভিজে ভারী হয়ে যায় প্রতিভার চোখের পাতা। তার পরেই চোখ মোছে, আর হেসেও ফেলে।

রানু বউদির চিঠির লেখাগুলির মধ্যে আগুন-লাগা অদৃষ্টের ধোঁয়া আছে, আর এক ঠাট্টার হাসিও আছে।

বলাইদার চাকরি নেই। টাটানগর থেকে ফিরে এসে আবার সবাই গুপ্তিপাড়ার ভাঙ্গাবাড়ির ঘরে ঠাঁই নিয়েছে। দাদার মাথায় দোষ দেখা দিয়েছে। কথা বলে না দাদা। সারাদিন শুধু চুপ করে বসে থাকে আর দু'হাত দিয়ে কুচি-কুচি করে কাগজ ছেঁড়ে।...এই ভাগ্য নিয়ে আমি এখানে মহাসুখে পড়ে আছি, প্রতিভা। কবরেজী তেলের শিশিটা হাতে নিয়ে মাথায় মাখিয়ে দেবার জন্য যখন কাছে গিয়ে দাঁড়াই, তখনও ফ্যালফ্যাল করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, বোধহয় আমাকে চিনতেও পারে না।...সেজদা, যাঁর নিজেরই সংসারে শত অভাব, তিনি মাসে মাসে পঞ্চাশটা টাকা পাঠিয়ে দেন বলেই এখনও আমরা বেঁচে আছি ; তুমি যাকে নিজের প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসতে, সেই মণ্টুও তাই বেঁচে আছে। যাই হোক, চৌধুরীবাড়ির প্রাণ এখন একজন গরীব কুটুমের দয়াতে চলছে, বড়লোক মেয়ের দয়াতে নয়।

হাসবারই মত কথা। একটা কথা নিশ্চয় ভুলে গিয়েছে রানু বউদি, তাই চৌধুরীবাড়ির মান-মেজাজের গর্বটাকে খোঁচা দিয়েছে। বউদির সেজদা নিশ্চয় খুব ভাল লোক, তাই চৌধুরীবাড়িকে মাসে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে সাহায্য করছেন।...কিন্তু তোমার ভুলে যাওয়া উচিত হয়নি রানু বউদি, তোমারই শ্বশুর পরেশ চৌধুরী একদিন তোমার ওই সেজদাকে দশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন, ব্যবসা করবার জন্য।

আমাকেও তুমি খুব ভুল বুঝলে, রানু বউদি। কিন্তু সেজন্য তোমাকে একটুও দোষ দিতে পারি না। তোমার শক্ত শক্ত ঠাট্টার কথাগুলি আমাকে শুধু হাসিয়ে দেয়। জবাব দিতে পারবো না বলেই হাসি।

কিন্তু আর কিসের ধৈর্য? জবাব দিতে পারা যাবে না কেন? এখুনি রানু বউদিকে লিখে দিলেই তো হয় ; তুমি কিচ্ছু জান না, তাই তোমার ধারণা হয়েছে যে, আমি একটা মস্তবড় ভাগ্যিবান ভদ্রলোকের বউ। ডাহা মিথ্যে কথা।

হঠাৎ ছটফট করে চেয়ার ছেড়ে একটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় প্রতিভা। এত শক্ত করে বাঁধা খোঁপাটাও ঢিলে হয়ে ঝুলে পড়ে। গায়ের ধাক্কা লেগে আয়নাটাও কেঁপে ওঠে। হাতের

ধাক্কা লেগে টেবিলের উপরের ফুলদানিটা হেলে পড়ে, তারপর ধুপ করে পড়েই যায়। পড়ে যাবেই তো, হালকা পলকা একটা রুপোর ফুলদানি।

সন্ধ্যা হয়েছে। কিন্তু আলো জ্বেলে দিতে আর ইচ্ছে করে না। কিন্তু বাণীদি যেমন রোজই সন্ধ্যাবেলা একবার দেখা করতে আসে, তেমনই আজও নিশ্চয় আসবে। বাণীদি দেখেই তো আশ্চর্য হবে আর পাঁচ কথা জিজ্ঞেস করে করে আবার জবাব দেবার একটা হয়রানি বাড়িয়ে তুলবে। চুল বাঁধনি কেন? ফুলদানিটা গড়িয়ে পড়ে রয়েছে কেন? ঘর অন্ধকার রেখে চুপটি করে বসে আছ কেন?

আলো জ্বালে, খোঁপা বাঁধে, ফুলদানিটাকে দাঁড় করিয়ে দেয় প্রতিভা। চেয়ারের উপর বসে একটা হাঁপ ছাড়ে ; যেন বুকের ভিতরে হঠাৎ গুমরে ওঠা একটা নিঃশ্বাসকে এতক্ষণে শান্ত করে বাইরের বাতাসের কাছে ছেড়ে দেয়।

এক মাস হয়েছে, শেফালীদির চিঠি এসেছে। নিশ্চিন্ত হয়েছে প্রতিভা। প্রতিভার একটা ভয়ানক দুঃখের উদ্বেগ মিটে গিয়েছে। মুক্তিদি এখন শেফালীদির বাড়িতেই আছে। শেফালীদি লিখেছে, মুক্তিদি যদি চলে যেতে না চায়. তবে আমরা কখনও চলে যেতে বলবো না।...তোমার জীবনে শান্তির ফুল-চন্দন পড়ুক শেফালীদি।

এই এক মাসের মধ্যে কোন দিনের কোন মুহূর্তেও অনুপমের সঙ্গে প্রতিভার দেখা হয়নি। দিনেও না, রাতেও না। এটাও একটা শান্তি। আরও বড় শান্তি, দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়া যায়। দরজা খুলে দেবার দায় ফুরিয়ে গিয়েছে। বলা ভাল, সে দায় মিথ্যে হয়ে গিয়েছে।

প্রতিভারও আর জোর করে কোন আশার কথা ভেবে জল্পনা বা কল্পনা করবার কিছু নেই। দরজা খুলে দেবার সাধ্যি নেই প্রতিভার। প্রতিভার হাত আর উঠবে না। সে দাবি এই ঘরের দরজার উপর টোকার শব্দ করুক, দুমদাম করে শক্ত হাতের আঘাত আছড়ে দিক, কিংবা লাখি মেরে দরজাটাকে ভেঙেই ফেলুক, কিচ্ছু আসে যায় না। প্রতিভার প্রাণ শুধু একটি কথা বলে দেবার জন্যে তৈরী হয়ে আছে—না, কখ্‌খনো না, কিছুতেই না, মেরে ফেললেও না। চৌধুরীবাড়ির মেয়ের মেজাজ তুমি কখনও দেখনি, তাই চিনতেও পারনি।

বাণীদি বেচারা বেশ আশ্চর্য হয়েছে ; দুঃখও পেয়েছে, আর একটু অসুবিধাতে পড়েছে। মুক্তিদি নেই, কার সঙ্গে দিন-রাত গল্প করবে আর এত হাসবে বাণীদি? মাঝে মাঝে বেশ রাগ করে আক্ষেপ করে—আমার ভাবতে একটু আশ্চর্যই লাগে, বউদি ; যেন ট্রেন ছেড়ে যাচ্ছে, একেবারে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে চলে গেল মুক্তি। যাবার সময় এতদিনের চেনা-জানা একটা মানুষকে অন্তত দুটো মায়ার কথাও তো বলে যেতে হয়। তা তো নয়। কাজ পেয়েছি বাণীদি, চললাম : বাস্ ; শুধু দুটো কথা কোনমতে মুখ থেকে উগরে দিয়েই চলে গেল।

মাঝে-মাঝে প্রতিভার ঘরে এসে অনেক গল্পে মাতিয়ে তোলে বাণী। আর হাসাহাসির মধ্যেই বলে ওঠে—নাঃ, মুক্তি থাকলে গল্প যেমন জমতো, ঠিক সে-রকম জমছে না।

প্রতিভা হাসে—শুধু এজন্যে মুক্তিদির ওপর এত রাগ করবার কোন মানে হয় না।

বাণী—মুক্তি সত্যিই রাগ-টাগ করে চলে যায়নি তো?

প্রতিভা—না।

বাণী—তাই বল। শুনে মনটা শান্ত হলো।...কিন্তু তুমি ঠিক হাসি জমিয়ে গল্প বলতে পার না, বউদি।

প্রতিভা—তবে শোন। শেফালীদির ভাই চিনুকে একবার বেশ দামী, বেশ চকচকে একজোড়া জুতো কিনে দিয়েছিলেন নরেনকাকা। তখন চিনুর বয়স মাত্র দশ বছর। চিনু সে জুতো পায়েই দিত না। স্কুলে যাবার আগে জুতো জোড়ার দিকে তাকিয়ে থাকতো, মাঝে মাঝে বুরুশ দিত, পালিশও লাগাতো। কিন্তু পরতো না। খালি পায়েই স্কুলে চলে যেত। ফিরে এসেও চিনুর ওই কাণ্ড। জুতো জোড়াকে মুছে আর ঘষে, খাটের তলায় একটা তক্তার উপর

রেখে দিয়ে বেড়াতে বের হয়ে যেত। একদিন খুব বৃষ্টি হয়ে গেল, কাদাজলে ভরে গেল রাস্তা। চিনুকে জব্দ করবার জন্য নরেনকাকা ডাকলেন—ওরে চিনু, তোর নতুন জুতো নিয়ে তুই যদি ওই কাদার উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে ভানুদের বাড়ির গেট একবার ছুঁয়ে দিয়েই চলে আসতে পারিস, তবে তোকে এখনি একটি টাকা দেব। চিনু কী করলে, শোন। জুতো জোড়া হাতে তুলে নিয়ে কাদার উপর দিয়ে থপ থপ করে হেঁটে চলে গেল আর গেট ছুঁয়ে ফিরে এল। নরেনকাকা বললেন, হলো না, তুমি টাকা পাবে না। চিনু বলে—কেন? নরেনকাকা বলেন—তুমি তো জুতো পায়ে দিলে না। চিনু বলে—তুমি বলেছো জুতো নিয়ে, জুতো পায়ে দিতে বলনি। চালাকী! শিগগির দাও আমার টাকা। দিতেই হবে।

বাণী হাসতে থাকে।—দেখ কাণ্ড! এইটুকু ছেলের বুদ্ধি কত সজাগ।

এই তো, নিশ্চিন্ত হওয়া একটা জীবন। কোন কাজ নেই, শুধু দিনগুলি পার করে দেওয়া। আশাটা সেই যে একটা হোঁচট খেল, হঠাৎ-টাকার একটা স্টীল-সেফ ঘরে এল, তারপর থেকে আর এক পা'ও এগুতে পারা গেল না। শুধু পিছিয়ে যেতে হলো। পিছিয়ে যেয়েও কোথাও থেমে থাকতে পারা গেল না। আবার আরও পিছিয়ে যেতে হলো। কিন্তু এই তো শেষ, আর যে পিছিয়ে যাবারও জায়গা নেই, পাথরের চটানে এসে পিঠ লেগেছে। ছোট হতে হতে একেবারে ধুলোর সঙ্গে সঙ্গে মিশে যেতে হলো, আর তো আরও ছোট হবার উপায় নেই। না, আর আলেয়া দেখবার ভয় নেই। আর নিশির ডাক শোনবার ভয় নেই। ঘেন্নার সঙ্গে লড়াই করবার হয়রানির পালা চুকে গিয়েছে। এই তো শেষবারের মত থেমে যাওয়া। শান্তি বইকি। শেফালীদিকে লিখে দিতে অসুবিধা হবে না, তোমাদের পতুর জীবনে আর চলবার ও চালিয়ে নেবার মত কিছু নেই।

বাণীদি জানে না, আজ জ্বর হয়েছে প্রতিভার। সুধার মা'কে জানিয়ে দিয়েছে প্রতিভা, আজ রাতে কিছুই খাব না। একটু দুধ বিস্কুটও না। এখন বাণীদি আর বেশি দেরি না করে এসে পড়লেই তো পারে, গল্পটল্পও তাড়াতাড়ি সেরে নিলেই ভাল। আজ এখুনি যে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে।

ঘরে ঢোকে বাণী।—আজ এখন আর গল্প করবো না, বউদি। শুধু একটা কথা বলে চলে যাব।

প্রতিভা—কেন? এখন বুঝি সুধার মা'র রামায়ণ শুনবে?

বাণী যেন আনমনার মত হাসে—না, তা নয়। আমাকে দিয়ে কোন একটা কাজ করাও, বউদি। নইলে আমার ভাল লাগছে না। তুমি অন্তত আমাকে কিছু উল আনিয়ে দাও। আমি অনুদার জন্যে একটা সোয়েটার বুনে দিই।

প্রতিভা হাসে—তোমার অনুদার অনেক সোয়েটার আছে, বাণীদি। বিলিতী উলের দামী দামী সোয়েটার।

বাণী—আছেই তো। তা কি আর জানি না? কিন্তু দাদার কাছে কি গরীব বোনের হাতের বোনা সোয়েটার কিছু কম দামী জিনিস হয়? তুমিই বল।

প্রতিভা—তা হলে আজ নয়, কাল। দীনুবাবুর কাছে কাল সকালবেলা একটা ফর্দ লিখে পাঠিয়ে দিও, কী চাই, তাহলেই হবে।

বাণী—আমি লিখলেই হবে?

প্রতিভা—হ্যাঁ।

চলে গেল বাণী। দরজা বন্ধ করে আর আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়তেই ঘুম আর জ্বর যেন পালা করে প্রতিভাকে স্বপ্ন দেখায়, আবার জাগিয়ে তুলে ছটফট করায়। উঃ, এই পাখার হাওয়াতে জ্বরের জ্বালা জুড়োয় না। যদি গঙ্গার হাওয়াটা একবার হু হু করে ছুটে এসে খোলা জানালা দিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে আর প্রতিভার মাথাটার উপরে পড়ে হুটোপুটি

করতো, তবে স্বস্তি পাওয়া যেত বোধ হয়।

বিছানা থেকে নামে, আলো জ্বালে, আর টেবিলের ঘড়ির দিকে তাকায় প্রতিভা। না, মাঝরাত পার হতে চলেছে, তবু এখনও গঙ্গার হাওয়া এল না। মনে হয়, ভোর না হওয়া পর্যন্ত এই গুমোট থাকবে।

চমকে ওঠে প্রতিভার কান। চমকে ওঠে প্রতিভার বুকের ভিতরের সব রক্ত। মনে হয়, নিশাচর টোকার শব্দটা দোতলার কোন ঘরে দরজার উপর পড়ে পড়ে আর বারে বারে বাজছে—টক্ টক্ টক্!

কার ঘরে? তবে কি বাণীদির ঘরে?

ঘরের দরজা খুলে, তেতলার বারান্দার অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ছুটে যায় প্রতিভা। কিন্তু পায়ের শব্দ নেই। আক্রোশের সিংহিনীও ঠিক ওইরকম করে ছুটে যায়, পায়ের নরম থাবার শব্দ হয় না।

দোতলার সিঁড়ির মুখের কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় আর গা-ঢাকা সিংহিনীরই মত উঁকি দিয়ে আর দুই চোখের দৃষ্টি অন্ধকারে ভাসিয়ে দিয়ে দেখতে থাকে প্রতিভা, হ্যাঁ, বাণীদিরই ঘরের দরজার সামনে কালো লোভের একটা শক্ত ছায়া দাঁড়িয়ে আছে। টক্ টক্ টক্—টোকার শব্দ বাজছে। উন্মাদ অজগরের তেষ্টা দরজার গায়ে ছোবল দিয়ে দিয়ে শব্দ করছে।

দরজাটার কাঠ বোধহয় ঘেন্না সইতে না পেরে পাথর হয়ে গিয়েছে। নড়ে না, খোলে না, সাড়া দেয় না দরজার কপাট।

ফিরে আসছে ছায়াটা। প্রতিভাও যেন বুকের ভিতরের একটা দমবন্ধ গুমোট এক নিঃশ্বাসে হালকা করে দিয়ে তখুনি উপরে চলে যায়। নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

হ্যাঁ, নাগরা-চটির শব্দটা বারান্দার রঙীন মোজেয়িকের গা ঘষে ঘষে এগিয়ে আসছে। কান পেতে শুনতে থাকে প্রতিভা। এইবার থেমে যায় শব্দ। হাঁপ ছাড়ে প্রতিভা। এই বাড়ির রাতের সম্রাট অনুপম রায় এইবার নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন।

দরজা খুলে আবার বের হয়ে পড়ে প্রতিভা। দোতলায় নেমে বাণীর ঘরের দরজার উপর হাত ঠুকে ঠুকে আর চাপা স্বরে ডাক দেয়—বাণীদি ; ভয় নেই বাণীদি। আমি ডাকছি। শিগগির দরজা খোল।

দরজা খুলে দিয়েই হাঁপাতে থাকে বাণী। বাণীর কপাল ঘামে ভেসে গিয়েছে। কাঁপছে চোখ দুটো।—তুমি আমাকে মিছিমিছি কেন এরকম ভয় দেখালে, বউদি? ছিঃ, আমি যে আর-একটু হলে মরেই যেতাম। এই দেখ এখনও বুকটা কী ভয়ানক টিপ টিপ করছে।

বাণীর ঘরের ভিতরে ঢুকে কুঁজো থেকে এক গেলাস জল ঢালে প্রতিভা—নাও, কপালটা আর মুখটা ধুয়ে ফেল, আর, একটু জল খাও।...হ্যাঁ, এইবার শোন বাণীদি, আমি টোকা দিইনি।

চেঁচিয়ে ওঠে বাণী—তবে কে টোকা দিল?

প্রতিভা—ভূতে।

বাণী—ঠাট্টা করছো?

—না।

—তবে?

—তোমার আর এখানে থাকা চলবে না। আর একটি দিনও না। তোমাকে এখনই চলে যেতে হবে।

—একথা কেন বলছো?

—আমার ইচ্ছে।

—সত্যি কথাটা বল, বউদি।

—না।

দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ওঠে বাণী।—হ্যাঁ, এখনই চলে যাব।

বাণীর একটা হাতের উপর আস্তে আস্তে হাত বোলায় প্রতিভা—একটু দেরি কর। ভোর হোক্।

বাণী—তুমি কিন্তু এখনই ওপরে চলে যেও না।

প্রতিভা হাসে—না না, তবে এলাম কেন? তোমাকে বিদায় না করা পর্যন্ত আমি এখান থেকে নড়বো না।

নড়ে না প্রতিভা। ভোরের কাক যখন ডাকে, পুবের আকাশ যখন ফর্সা হয়, আর গুমোট-ভাঙা গঙ্গার হাওয়া বইতে শুরু করে, তখন ডাক দেয় প্রতিভা—এবার তৈরী হতে হয়, বাণীদি। নীচে গিয়ে রামপ্রসাদকে বললেই একটা রিক্সা ডেকে দেবে।

বাণী—হ্যাঁ ; কিন্তু কোথায় যে যাব, কার কাছে যাব, কিছুই ভাবতে পারছি না। পাগল হয়েই যাব, বউদি।

প্রতিভা—আমি ভেবে রেখেছি। তুমি এখন বেলেঘাটাতে আমার নরেন কাকার বাড়িতে চলে যাও।

বাণী—তবে একটা চিঠি লিখে দাও। একটু তাড়াতাড়ি কর বউদি। আমি আর এ বাতাস সহ্য করতে পারছি না।

চিঠি লেখে প্রতিভা—আপনাকে পায়ে ধরে অনুরোধ করছি কাকা, বাণীদিকে আপনার বাড়িতে থাকতে দিন, যতদিন না বাণীদি একটা কাজ যোগাড় করে নিতে পারে। এর বেশি কিছু আমি আর লিখতে পারছি না। ক্ষমা করবেন।

রামপ্রসাদকে এখুনি ডাক দিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, একটা রিক্শা ডেকে দাও, আমাকে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসুক। আমাকে দুটো টাকা ধার দাও, রামপ্রসাদ, গুপ্তিপাড়া যাবার ট্রেনের টিকেট কিনতে হবে।

ইচ্ছেটা মাঝে মাঝে ছটফট করে প্রতিভার দুপুর বেলার এক অলস ঘুমটাকেও ভেঙে দেয়। আর ঘুম ভাঙলে নিজেরই উপর রাগ করে মনটা ছটফট করে, সত্যিই তো, আর এখানে কেন পড়ে থাকা?

আর, বুঝতে না পেরে নিজেই আশ্চর্য হয়, এখনও পড়ে থাকতে ইচ্ছে করে কেন? এটা যে একটা পাগলের অপেক্ষা। ঘাটে দাঁড়িয়ে দেখতেই পাচ্ছে, খেয়ার নৌকা ডুবে গেল, তবু খেয়া পার হবার অপেক্ষায় বসে আছে।

বিছানা থেকে উঠে আর চুপ করে চেয়ারের উপর বসে থাকলেই বা কী? মনটা চুপ করে থাকতে চায় না, কথা বলতে চায়। কবরেজী তেলের শিশিটা আমার হাতে দাও, রানু বউদি। দাদার মাথায় মাখিয়ে দিয়ে আসি। দেখি, দাদা আমাকে চোখে দেখেও কেমন করে না চিনে থাকতে পারে।

চলে যেতেই হবে যখন, তখন আর মিছে দেরি করে তো কোন লাভ নেই। গল্পটা দাদাই বলেছিল, আলিপুরের জেলে যখন ছিল দাদা, তখন একটা যাবজ্জীবন কয়েদীর সঙ্গে দাদার খুব ভাব হয়েছিল। চোদ্দ বছরের মেয়াদ শেষ হবার পর যেদিন ছাড়া পেল কয়েদীটা, তখন বলে কিনা, আজ যাব না, আজ শনিবার, যাত্রা নাস্তি, আজ দিন ভাল নয়। আর পাঁচ দিন পরে পূর্ণিমা, সেদিন আমি যাব। আমাকে দয়া করে আর পাঁচটে দিন জেলেই থাকতে দিতে আজ্ঞা হোক।

এইবার হাসতে ইচ্ছে করে। তবে কি জেলের ওই যাবজ্জীবন কয়েদীর মত প্রতিভা

রায়ের প্রাণটাও একটা পূর্ণিমা দেখবার ইচ্ছে নিয়ে এখানে পড়ে থাকবে? আলিপুর জেলের মাথার উপরে আকাশ ছিল। কিন্তু প্রতিভা রায়ের এই জীবনের মাথার উপরে কোন্ আকাশ আছে যে, পূর্ণিমা দেখবার অপেক্ষা করতে হবে?

বাণী চলে গিয়েছে ; আবার আরও একটা মাস পার হয়েছে। এর মধ্যে অন্তত চারটে দিন প্রতিভার ইচ্ছেটা ছটফট করেছে। কিন্তু সে দুরন্ত ইচ্ছেটা আবার যেন নিজেই নিজেকে শান্ত করে দেয়। রাত্রি ন'টা থেকে সকাল ন'টা পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ে থাকতে কোন অসুবিধে হয় না। সকালবেলা ঘরের দরজা খুলে দিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াবার পর মনে হয়েছে, আরও একটা দিন পার হয়ে গেল।

অনুপমের ঘরের দরজা এ সময় তালাবন্ধ। তাই কোন অস্বস্তি বোধ করতেও হয় না। বারান্দার টবের ফুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঘুরে বেড়াতে পারা যায়। এখনি স্নানটা সেরে নিতে হবে, তাই খোঁপা খুলে ফেলে আর চুলের গোছা ঘাড়ে পিঠে এলিয়ে-ছড়িয়ে দিয়ে, আরও কিছুক্ষণ স্বচ্ছন্দে শুধু একা একা নিজেরই ছায়ার দিকে তাকিয়ে একটু ঘুরতে-ফিরতে পারা যায়।

আজ সকালবেলা ঘর থেকে বের হতে আরও একটু দেরি করে ফেলেছে প্রতিভা। এখন বেলা প্রায় দশটা। ঘরেরই দরজার কাছে বারান্দাটার উপর দাঁড়িয়ে, বারান্দার দেয়াল-ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে, আর, তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে খোঁপা খুলতে থাকে প্রতিভা। কিন্তু চমকে ওঠে। শক্ত জুতো-পরা পায়ের শব্দ, সেই সঙ্গে অনুপম রায়ের খুব-ব্যস্ত একটি মূর্তি এই দিকেই আসছে, প্রায় এসেই গিয়েছে।

অনুপমের এক হাতে কাগজপত্রের চামড়া-ব্যাগ ঝুলছে, আর-এক হাতের দুই আঙুলের চিমটি দিয়ে চেপে ধরা কয়েকটা খোলা চিঠি।

নিজের ঘরের কাছে এসে একবার থেমে নিয়েই, আবার এগিয়ে আসতে থাকে অনুপম। ব্যস্তভাবে নয়, খুব আস্তে আস্তে, যেন জুতোর চাপে এক-একটা পোকামাকড় চেপটে দিয়ে-দিয়ে পা ফেলছে আর এগিয়ে আসছে।

হ্যাঁ, প্রতিভারই কাছে এসে দাঁড়ায়, আর প্রতিভারই মুখের দিকে তাকায় অনুপম।—তোমার সঙ্গে দেখাই হয় না, তাই একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারিনি। মুক্তি হঠাৎ চলে গেল কেন?

উত্তর দেয় না প্রতিভা। চুলের একটা গোছা শক্ত করে ধরে আর মুখ ফিরিয়ে বারান্দার রেলিংয়ের পাথুরে নকশাটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

অনুপম—মুখ ঘুরিয়ে থাকলে চলবে না। আমার কথার জবাব দাও।

মুখ ঘুরিয়ে, মাথা তুলে, আর দু'চোখের দৃষ্টিটাকে সোজা ঠিকরে দিয়ে অনুপমের মুখের দিকে তাকায় প্রতিভা।

অনুপম—ওভাবে শুধু তাকিয়ে থাকলে চলবে না। আমার কথার জবাব দাও, মুক্তি হঠাৎ কেন চলে গেল?

প্রতিভা—ভূতের ভয়ে।

চোখ দুটোকে কুঁচকে দিয়ে আবার জিজ্ঞেসা করে অনুপম।—বাণী কেন চলে গেল?

প্রতিভা—ভূতের ভয়ে।

অনুপম—এটা তাহলে একটা ভূতুড়ে বাড়ি?

প্রতিভা—হ্যাঁ।

অনুপম—মনে হচ্ছে, চৌধুরীবাড়ির মেজাজের তেজ কথা বলছে।

প্রতিভা—হ্যাঁ।

হেসে ফেলে অনুপম—ভুল করছো। খুব ভুল।

কথা বলে না প্রতিভা। হাতের ব্যাগটাকে বারান্দার মেজের উপর নামিয়ে রেখে দিয়েই

অনুপম আবার হাসতে থাকে।—গুপ্তিপাড়ার চৌধুরীবাড়ি কিন্তু আর মেজাজের তেজ দেখাতে ভালবাসে না। তাহলে শোন, চিঠিটাকে একটু পড়েই শুনিয়ে দিচ্ছি।

চিমটি দিয়ে ধরে-রাখা তিন-চারটে চিঠির মধ্যে একটা চিঠির লেখা পড়তে থাকে অনুপম।—বড়লোকের বউকে এত করে লিখেও যখন কোন সাড়া পেলাম না, তখন তার বড়লোক স্বামীকেই লিখতে হচ্ছে। না লিখে পারলাম না। প্রতিভা না হয় সব ভুলে গিয়েছে, কিন্তু আপনি তো ভুলে থাকবার মত মানুষ নন। লোকের মুখে শুনছি, আপনার সাহায্যে স্কুল চলছে, হাসপাতাল চলছে। আপনি নিশ্চয় জানেন না যে, গুপ্তিপাড়ার এ-বাড়ির জীবন আর চলতে পারছে না। আমি কাল কলকাতায় যাচ্ছি, আপনার সঙ্গে একবার দেখা করবো। আশা করি, বিরক্ত হবেন না। ইতি...।

প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে অনুপম এইবার বেশ মৃদুস্বরে কথা বলে—ইতি কে, সেটা বুঝতে পারছো তো?

প্রতিভা—পারছি।

অনুপম—তবে চুপ করে থাক, খুশি হয়ে থাক।

প্রতিভা—না।

অনুপম—না? মনে হচ্ছে, বেশ তেজ করে কথা বলছো।

প্রতিভা—হ্যাঁ।

—একেবারে ঠাণ্ডা বরফ হয়ে যাবে এই তেজ।

—কখ্খনো না।

—আচ্ছা। তাহলে অপেক্ষায় থাক।

বারান্দার দেয়ালের ঘড়িটার দিকে তাকায় অনুপম। তারপর নিজেরই হাত-ঘড়িটার দিকে তাকায়। তারপর বারান্দার শেষ প্রান্তের সিঁড়ি-মুখের দিকে তাকায়। তারপর হেসে ফেলে অনুপম, উৎসুক চোখের দৃষ্টিটাও হাসতে থাকে।—এই যে, তিনি এসেই গিয়েছেন।

প্রতিভাও দেখতে পায়, সুধার মা'র সঙ্গে কথা বলে বলে, লাল রবারের চটি পায়ে দিয়ে, আর দুই চোখে অদ্ভুত একটা চকচকে আকুলতা নিয়ে যিনি এগিয়ে আসছেন আর হাসছেন, তিনি গুপ্তিপাড়ার চৌধুরীবাড়ির বউ, প্রতিভারই রানু বউদি।

রানু বউদির পায়ের ওই লাল রবারের চটি নিশ্চয়ই আজকেরই কেনা একটি নতুন সংগ্রহ, একেবারে নতুন। কিন্তু গায়ের শাড়িটা বেশ পুরনো। পাড়ের জরি উসকো-খুসকো, আঁচলের গায়ে তিন জায়গায় মোটা সুতোর তিনটে সেলাই, খুব মিহি জমির একটা শান্তিপুরী। গলাতে কিছুই নেই ; কানের ওদুটো জিনিসের মধ্যে সোনার একটা কুচিও নেই ; দুটো বেলোয়ারী কানফুল।

কত রোগা হয়ে গিয়েছে রানু বউদি। প্রতিভার চোখ দুটো সব জ্বালা নিয়েও অপলক হয়ে দেখতে থাকে, কী খসখসে হয়ে গিয়েছে রানু বউদির সেই দুটো নরম হাত, যে হাত একটা শিশির সামান্য একটু আঁট ছিপি খুলতে গিয়ে চুপসে যেত, বার বার হাতে ফুঁ দিত রানু বউদি।

অনুপম বলে—আসুন।

রানু হাসতে চেষ্টা করে—এসেই গিয়েছি, তাই বলতে পারলেন, আসুন। আগে কিন্তু এই সামান্য একটা কথাও কেউ লিখে জানাতে পারেনি।

রানু যেন প্রতিভার মুখের দিকে তাকাতেই চায় না। এক পলকে একবার প্রতিভাকে দেখে নিয়েই আবার অনুপমের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে রানু—টাটানগর থেকে লিখেছি, গুপ্তিপাড়া থেকে লিখেছি, কিন্তু ভুলেও একবার কেউ লিখলে না যে, একবার এস।

অনুপম—এখন যখন এসেই পড়েছেন, তখন পুরনো কথা ছেড়ে দিন।

রানু—আজই সকালবেলা কলকাতায় এসেছি। এসেই ভাবলাম...।

অনুপম—এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?

রানু—সেজদার বাড়িতে, কালীঘাটে। আমি তো প্রতি মাসেই একবার করে কলকাতায় আসি। কিন্তু থাকবার তো উপায় নেই, সকালে এসে আবার বিকালেই গুপ্তিপাড়া ফিরে যেতে হয়।

অনুপম—কেন?

রানু—না যেয়ে উপায় তো নেই। একটা দশ বছরের বাচ্ছা মেয়ে, একটা ছ' বছরের বাচ্চা ছেলে, কার কাছে ওদের ফেলে রেখে কলকাতার হাওয়া খেতে পারি বলুন? সে ভদ্রলোক তো নিজেই পাগল। বলে-কয়ে বীণার মা'কে রাজি করাই, উনি দয়া করে দু' চারবার উঁকি দিয়ে দেখে যান বলেই আসা-যাওয়া করতে পারি। নইলে তা'ও পারতাম না। এখন তো সেজদাই ভরসা। সেজদা হাতে যা ধরিয়ে দেন, তাই নিয়ে আবার গুপ্তিপাড়া চলে যাই।

প্রতিভা হঠাৎ বলে ওঠে, যেন এতক্ষণের নীরব একটা মায়ার আশা হঠাৎ করুণ হয়ে কথা বলে ফেলেছে—মণ্টু আর টুলু আসেনি?

রানু এইবার প্রতিভার মুখের দিকে একটু স্পষ্ট করে তাকিয়ে জবাব দেয়।—না। ট্রেনে যাওয়া-আসা করতে পয়সা লাগে, প্রতিভা।

অনুপম—কিন্তু আপনার তো আজ গুপ্তিপাড়া ফিরে যাওয়া হবে না।

রানু—কেন?

অনুপম হাসে—আপনাকে যেতে দেওয়া হবে না। আপনি এখানে থাকবেন।

রানুও হাসে—যাক্, আপনি তবু তো মুখ খুলে একটু বললেন। কিন্তু আমার থাকা সম্ভব নয়, অনুপমবাবু। আপনি বলেছেন, এই যথেষ্ট। আমি শুধু আপনাকে কয়েকটা কথা বলে...।

অনুপম—সব কথা শুনবো। কিন্তু আপনাকে আজ চলে যেতে দেওয়া হবে না। আপনি বরং এখনই...।

রানু—বলুন।

অনুপম—এখনই আমার সঙ্গে একবার বের হতে পারবেন?

রানু—কোথায়?

অনুপম—চলুন, মার্কেটে ঘুরে আসি।

রানু—আর মার্কেট? কতবার ভেবেছি, এবার মণ্টুর জন্যে একটা সিল্কের ফ্রক নিয়ে যাব, কিন্তু...ভাবলেই কি স্বপ্ন সত্য হয়ে যায়? হয় না।

অনুপম—চলুন। ওসব সামান্য ব্যাপার নিয়ে আপনার আজ আর মন খারাপ করা উচিত নয়।

রানু—ফিরতে কত সময় লাগবে?

অনুপম হাসে—মণ্টুর জন্যে একটা সিল্কের ফ্রক কিনতে যতটুকু সময় লাগবে।

রানুর দুই চোখের চকচকে বিস্ময় যেন নিবিড় হয়ে টলমল করে।—সত্যি, কাছে না এলে মানুষকে চেনা যায় না। আপনাকে কী ভেবেছিলাম, আর কী দেখলাম।

অনুপম—কী ভেবেছিলেন?

রানু—ভেবেছিলাম, এত বড় একজন গণ্যিমান্যি বড়লোক মানুষ, ভাগ্যিবান মানুষ, লোকের মুখে যার সুনামের এত হাঁকডাক, তিনি কি আমার মত মানুষের দুটো কথা সত্যিই ধৈর্য ধরে শুনবেন?

চামড়ার ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে ওঠে অনুপম—চলুন।

প্রতিভার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই অনুপমের দিকে তাকায় রানু।—হ্যাঁ, চলুন।

প্রতিভা ডাকে—বউদি।

অনুপম হাসে—পিছু ডাকতে নেই।

প্রতিভা—দাদা এখন কেমন আছে, বউদি?

রানু—একটুও ভাল নয়। মাঝে একদিন...।

অনুপম—চলুন চলুন, সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

রানু—হ্যাঁ, চলুন।

প্রতিভা—টুলু কি খুব দুষ্টু হয়েছে?

রানু—আর বলো না! একদিন একটা বেড়ালের লেজ ধরে...।

অনুপম—এবার চলুন। চলতে থাকে অনুপম।

—হ্যাঁ, চলুন। রানুও চলতে থাকে।

প্রতিভার বুকের ভিতরের চিৎকারটা বোবা হয়ে শুধু ছটফট করে। নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে প্রতিভা। তাড়াতাড়ি পা ফেলে ফেলে, যেন অনুপম রায়ের হাসির শব্দের সঙ্গে তাল রেখে হেঁটে চলে যাচ্ছে একজোড়া লাল রঙের চটি।

রানু বউদিকে একবার জিজ্ঞেস করলে হতো, মনে পড়ে তো, একদিন লুকোচুরি খেলতে গিয়ে কী দশা হয়েছিল তোমার? রানু বউদি তখন নতুন বউ ; মা তখন রানু বউদিকে কোন কাজই করতে দিতেন না।

সন্ধ্যা হলেই, দাদা যখন বাইরে বের হতো, তখন সেই নতুন বউ নিজেই এসে প্রতিভার কাছে চুপি-চুপি বলতো, লুকোচুরি খেলবে? হ্যাঁ খেলবো। তবে লুকোই? হ্যাঁ ; ধরতে পারলে কিন্তু এক কিল। বেশ।

রানু বউদিকে ধরে ফেলতে কিন্তু এক মিনিটও সময় লাগেনি। একটা পুরনো মাদুর গায়ে জড়িয়ে ঘরের এক কোণের দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে নিয়ে, তখুনি বাবা-গো বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল আর ধরা পড়ে গিয়েছিল সেই রানু বউদি। মস্ত বড় একটা মাকড়সা রানু বউদির মুখের উপর দিয়ে দৌড়ে গিয়েছিল। লুকোচুরি খেলতে সাহস করে, কিন্তু পারে না, সেই রানু বউদি আজ...।

যাই হোক, প্রতিভার জীবন রোজ এ সময় যেভাবে চলে, ঠিক সেভাবেই চলতে থাকে। দুপুর গেল। বিকেলও প্রায় শেষ হতে চললো। বিছানার উপর শুয়ে, আর, একটা মিথ্যে ঘুমের সঙ্গে উসখুস করে, বার বার টেবিলের ঘড়িটার দিকে তাকাতেও হলো। রানু বউদি কি এখনও ফিরে আসেনি?

ঘরের বাইরে এসে, তারপর বারান্দার শেষে সিঁড়ির মুখের কাছে এসে দাঁড়ায় প্রতিভা। তারপর দোতালাতে নেমে একটানা বারান্দার পাশে একটা ঘরের দরজার দিকে তাকায় ; সে ঘরের খোলা দরজা দিয়ে রঙীন সিল্কের পর্দা ফুরফুর করে উড়ছে। না, আর সন্দেহ নেই, ভয়ানক ভুতুড়ে তামাসার নিশান উড়ছে।

ঘরের দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় প্রতিভা—কখন ফিরে এলে বউদি?

রানু—অনেকক্ষণ।

প্রতিভা—খাওয়া হয়ে গেছে নিশ্চয়।

—হয়েছে। তুমি অবিশ্যি একটু খোঁজ নিতেও ভুলে গিয়েছ।

—কখন্ খেলে?

—এই তো, ঘণ্টাখানেক হলো। অনুপমবাবু যখন খেলেন, তখন।

—নীচের খাবার ঘরের টেবিলে?

—হ্যাঁ।

—তুমি কি এখানে থেকে যাবে ঠিক করেছো?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু কালীঘাটে খবরটা জানিয়েছো কি? ওঁরা কি চিন্তা করবেন না?

—খবর পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কথা বলছে রানু, প্রতিভার সব কথারই জবাব দিয়েও চলেছে, কিন্তু রানুর চোখ দুটো আর হাত দুটোও সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে অন্য একটা কাজও করছে। একটা নতুন-কেনা বাস্কেটের ভিতরে জিনিস ভরছে রানু ; মাঝে মাঝে জিনিসগুলিকে এক-এক করে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেন গুণেও নিচ্ছে। বেবি-ফুড, চা, জেলি বিস্কুটের টিন, চকোলেটের প্যাকেট, মিছরি, মশলা, কিসমিস, বেদানা, মাখন...।

ঘরের টেবিলের উপর সাজানো রয়েছে বড় বড় প্যাকেট ; প্যাকেটের গায়ে লেখা দেখেই বোঝা যায়, এগুলো জামা-কাপড়ের প্যাকেট।

বিছানার উপরে পড়ে রয়েছে একটা বই। ঘরের ভিতরে ঢুকেই বইটাকে হাতে তুলে নেয় প্রতিভা। গয়নার দোকানের বই, গয়নার ছবিতে ভরা। একটা নেকলেসের ছবির কাছে লাল পেন্সিলের একটা দাগ হেসে রয়েছে।

হেসে ফেলে প্রতিভা।—এর চেয়ে আর একটু ভাল প্যাটার্নের নেকলেস পেলে না?

—অ্যাঁ? কী বললে? হ্যাঁ, ছিল হয়তো ; কিন্তু ওটাই আমার পছন্দ হলো।

—জিনিসটা দেখি, একবার।

—অনুপমবাবু পরে নিয়ে আসবেন।

—তাই বল।

—মণ্টুর জন্যে দুল কেনোনি?

—কিনেছি।

—দেখি।

—তোমাকেও আবার দেখাতে হবে নাকি? তা হলে তো আবার বাস্কেটের সব জিনিস তুলে নিয়ে তলা থেকে ডিবেটাকে বের করতে হয়।

—তা হলে থাক। যাক ; কিন্তু ভদ্রলোকের কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় না করে নিলে তো চলবে না। টাকা চেয়েছো?

—চাইনি।

—না চাইলেও ভদ্রলোকের নিজের থেকেই দেওয়া উচিত ছিল।

—নিজেই বলেছেন। এখন তিন'শো টাকা দেবেন।

—মাত্র তিন'শো।

—এখন তিন'শো, পরে দরকার হলে আর লিখলে আরও যা পারেন পাঠিয়ে দেবেন।

—টাকা আর নেকলেস এখনও হাতে পাওনি?

—না।

—কিন্তু কখন পাবে?

—অনুপমবাবু বলেছেন, ফিরতে একটু রাত হতে পারে। যখনই ফিরে আসুন না কেন, নিজেই এসে আমার হাতে দিয়ে যাবেন।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে প্রতিভা। রানুর হাতের ব্যস্ততাও সব কাজ শেষ করে আর বাস্কেটের ডালা বন্ধ করে এইবার একটু স্বস্তি বোধ করবার সুযোগ পায়।

প্রতিভা—দু-একটা কথা বল, বউদি। এত চুপ করে বসে থাকা কি ভাল দেখায়?

রানু—তুমিই বল, আমি শুনি।

প্রতিভা—তোমার কি কিছু বলবার নেই।

রানু—কিছু মনে করো না, প্রতিভা। তোমাকে কোন কথা বলেও তো কোন লাভ নেই।

রানুর মুখটাকে যেন একটু ভাল করে দেখতে চায় প্রতিভা, তাই দুই ভুরু টান করে

তাকিয়ে থাকে। আর রানু যেন নিজেরই সঙ্গে কথা বলে—সন্ধ্যা হয়ে এল।

প্রতিভা—তোমার ভয় করছে না, বউদি?

রানু—কিসের ভয়?

—সন্ধ্যা হয়ে এল যে!

—তাতে ভয় কিসের?

—কিন্তু গুপ্তিপাড়াতে তো সন্ধ্যে হতেই তোমার খুব ভয়-ভয় করতো।

—এখনও করে। কিন্তু এখানে তো ভয়-ভয় করবার কিছু নেই।

প্রতিভা হাসে—হ্যাঁ, এখানে বাদুড় ওড়ে না, ঝিঁঝি ডাকে না, চালতে গাছের মরা ডালে পেঁচা বসে না, কলাগাছের কাছে কালোছায়ার হাত দোলে না।

রানুও হাসে—তবে?

প্রতিভা—তোমার হাসতে লজ্জা করছে না?

রানুর গলার স্বরও বেশ শক্ত হয়ে জবাব দেয়—না।

প্রতিভা—তোমার এখানে আসতে একটুও লজ্জা হলো না?

—না।

—তুমি এখনই চলে যাও।

—তোমার মুখ থেকে একথা শুনতে পাব বলে তৈরী হয়েই এসেছি।

—তোমাকে এখনই যেতে হবে।

—না। তোমার বাড়ি নয় যে, তোমার হুকুমে চলে যাব।

মেজের উপর ধুপ করে বসে পড়ে প্রতিভা, দুই হাত দিয়ে শক্ত করে রানুর দুই পা জড়িয়ে ধরে—চলে যাও, বউদি।

—এ কি? চমকে ওঠে রানু। রানুর দু' চোখে ভয়ানক একটা আশ্চর্যের ভয়ও যেন গুমরে উঠেছে, তাই কাঁপতে থাকে একটা অদ্ভুত অন্ধ-অন্ধ দৃষ্টি।

প্রতিভা—তুমি কি আমাকে দেখেও কিছুই বুঝতে পারলে না?

এইবার রানুর দুই চোখ যেন নিষ্পলক দুটো নির্বোধ যন্ত্রণার মত স্তব্ধ হয়ে দেখতে থাকে; প্রতিভার হাতে সেই রুলি, আর কানে সেই দুল, গুপ্তিপাড়ার মধু স্যাকরাকে মাত্র পাঁচ ভরি সোনা দিয়ে যে দুটো জিনিস তৈরী করানো হয়েছিল। দাদার ভাগ্যের মত বোনের ভাগ্যটাও কি পাগল হয়ে গিয়েছে? প্রতিভা কি শ্মশানের ছাই গায়ে মেখে ত্রিবেণীর সেই ক্ষেপী তুলসীর মত গাছতলায় পড়ে রয়েছে?

রানুর গলার স্বর কেঁপে কেঁপে কথা বলে—ঠিক বুঝতে পারছি না, প্রতিভা। কিন্তু ভয় করছে।

প্রতিভা—এটা একটা ভুতুড়ে বাড়ি, বউদি।

প্রতিভার হাত দুটো শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রানুর রোগা শরীরটা যেন কাঠ হয়ে যায়।

প্রতিভা—ঠিক মাঝরাতে ভূত এসে তোমার ঘরের দরজায় টোকা দেবে। সে ভূত একটা সুড়ঙ্গের অন্ধকারের ভিতর থেকে চুরি করে গাদা-গাদা টাকা আনে। সে ভূত ঘরের বাইরে বক্তৃতা করে আর মানপত্র পায়! আর, ঘরের ভিতরে মানুষ পেলেই তাকে ঘাড় মটকে মেরে ফেলতে চায়। তুমি এখনই চলে যাও। শিগগির যাও।

—যাচ্ছি। এখনই যাচ্ছি। প্রতিভার গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে রানু।

প্রতিভা—দেরি করো না, বউদি। রাস্তা থেকে একটা রিকশা ডেকে নিয়ে কালীঘাটে চলে যাও।

—যাচ্ছি। কিন্তু...।

—কী?

—তুমিও চল।

—যাব ঠিকই ; কিন্তু আজ নয়।

প্রতিভার হাত ছেড়ে দিয়ে আর পুরনো শাড়ির সেলাই-করা আঁচল তুলে চোখ মুছে নেয় রানু। তারপর আর একটি কথাও না বলে ঘর ছেড়ে বের হয়ে যায়। না, আর মুখ ফিরিয়ে প্রতিভাকে আর-একবার দেখে নেবার চেষ্টা করে না রানু। শুধু প্রতিভা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে, লাল রবারের একজোড়া চটি ধড়ফড় করে নীচের সিঁড়িতে নেমে গেল।

অনুপম রায়ের বুকটা নিশ্চয় দুর্দান্ত সাহসে ভরাট একটা চমৎকার ভাগ্যের বুক। সেই সাহসও বোধহয় মরুভূমির ঘোড়া। বাধা পেলে আরও দুরন্ত হয়ে ছুটতে থাকে।

একটা বোর্ড আছে ; সে বোর্ড দেশের সমাজজীবনের উন্নতির নানারকমের সেবা সাহায্য ও কল্যাণের কাজ করবার ক্ষমতা পেয়েছে। ক্ষমতা দিয়েছেন সরকার ; টাকাও দিয়ে থাকেন সরকার। এই বোর্ডের তিন বছরের চেয়ারম্যান এন সি সেন যে এবছরেও আবার চেয়ারম্যান হয়ে যাবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। এন সি সেনের মত মানুষের পক্ষে বোর্ডের সব মেম্বারের শ্রদ্ধা আর সমর্থন আছে। কিন্তু অনুপম রায়ের আশা সেজন্য একটুও ভয় পায়নি। অনুপম রায় শুধু একটি মাস ঘোরাঘুরি আর ছুটোছুটি করেছে: দশজন মেম্বারের ছ'জনকে এক এক করে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে এই বাড়ির ওই কাজের ঘরে বসিয়েছে ; তারপর কাজের কথা হয়েছে।

তারপর একদিন এই কাজের ঘরের ভিতরে বসেই টেলিফোনের বার্তা পেয়ে হেসে উঠেছে অনুপম রায় ; বোর্ডের চেয়ারম্যান ইলেকশন হয়ে গেল। এন সি সেন হেরে গিয়েছেন, জয়ী হয়েছেন অনুপম। আজ থেকে বোর্ডের হাজার হাজার টাকার দাতব্যের খাতায় নাম সই করবেন নতুন চেয়ারম্যান অনুপম রায়।

কাজের ঘরের দরজায় সবুজ ভেলভেটের পর্দা দোলে। ঘরের ভিতরে চারটে আলো জ্বলে, দুটো পাখা ঘোরে। সকাল-সন্ধ্যা যখন-তখন চন্দ্রবাবু, আর সূর্যবাবুও এসে পড়েন। কাজের ঘরের জীবন যেভাবে এতদিন চলে এসেছে, সেভাবেই চলছে। জয়ের গুঞ্জন আর খুশি-হাসির হঠাৎ-কলরব একটুও ক্লান্ত হয়নি, হয়ও না।

কিন্তু অনেক রাতে তেতলার সিঁড়ি ধরে যখন আস্তে আস্তে দু'পায়ের নাগরা-চটি ঘষে ঘষে উপরে উঠতে থাকে অনুপম, তখন যেন আচমকা একটা হোঁচট খায়। জ্বলে ওঠে অনুপম রায়ের মাথার ঘিলু, সেই সঙ্গে গায়ের সব রক্ত।

আর, তেতলার দরজা-বন্ধ একটা ঘরের ভিতরে তখন বিছানার উপর শুয়ে পড়ে থেকে প্রতিভা রায়ের বিনা-ঘুমের প্রাণটা আশ্চর্য হয়ে ভাবে—আর কেন এভাবে পড়ে থাকা! এবার চলে গেলেই তো হয়।

সেই সেদিন সকাল হতেই আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল অনুপম—তোমার রানু বউদি হঠাৎ না বলে-কয়ে সব কিছু ফেলে রেখে দিয়ে একটা হঠাৎ-পাগল গাধার মত চলে গেল কেন?

প্রতিভা—ভূতের ভয়ে।

অনুপম—তাই বল!

প্রতিভা—একটা কথা বলবার ছিল।

অনুপম—কী কথা?

প্রতিভা—তুমি আমার ঘরের দরজাতে কখ্খনো টোকা দেবে না।

অনুপম রায়ের কপালের সম্মানিত সুখের রেখাটা যেন শিউরে গিয়ে নীল হয়ে যায়।—কেন?

প্রতিভা—আমি দরজা খুলবো না।

—আমি দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকবো।

—আমি তখুনি ঘর ছেড়ে বের হয়ে যাব।

—এত সাহস আছে তোমার?

—আছে।

—তবে তোমার রানু বউদির আঁচল ধরে গুপ্তিপাড়া চলে গেলে না কেন? এখানে পড়ে আছ কেন?

—আমার ইচ্ছে।

হেসে ফেলে অনুপম।—তাই বল!

চলে গেল অনুপম।

তেতলার সারা বারান্দায় ছড়িয়ে পড়ে সকালবেলার রোদ হাসছে। এক হাতে চামড়ার ব্যাগ, আর-এক হাতে রুপোর চেনে ঝোলানো চাবি দোলাতে দোলাতে সেদিন যেমন চলে গিয়েছিল অনুপম, রোজই তেমনি চলে যেতে পারে। অনুপমের মনটাও হাসে, দরজা বন্ধ করে ঘরের ভিতরে বসে রয়েছেন অদ্ভুত এক কাঙাল অভিমান। অনেকদিন ঘরের দরজায় টোকার শব্দ বাজেনি, তাই রাগ হয়েছে। সে আবার ওই টোকার শব্দেরই ওপর রাগ দেখায়।

কিন্তু অনেক রাতে যখন আবার তেতলার এই সিঁড়ি ধরেই উপরে উঠতে হয়, তখন যেন একটা ঠোকর খায় অনুপম। নাগরাচটি দুমড়ে যায়। টিকটিকিটাও শব্দ করে ডেকে ওঠে। বোর্ডের নতুন চেয়ারম্যান অনুপম রায়কে টিটকারি দিচ্ছে, অনুপম রায়ের নিজেরই ঘর। তবে কি টিকটিকির ভয়ে পা টিপে টিপে হাঁটতে হবে? না, সহ্য করা অসম্ভব।

প্রতিভা রায়ের এই মিছে পড়ে থাকা জীবনেও কোথাও যেন একটা ছটফট পিপাসা লুকিয়ে আছে। প্রায় একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে প্রতিভার সন্ধ্যাবেলার একটা হঠাৎ-ব্যস্ততা, প্রতিভার প্রাণেরই একটা বাতিক।

সারা বিকেল ঘুমিয়ে পড়ে থাকবে, কিন্তু সন্ধ্যা হলেই ধড়ফড় করে জেগে উঠবে, দরজা খুলবে ; আর, বারান্দায় রেলিংয়ের কাছে দাঁড়িয়ে চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকাবে। ছটফট করে যেন একটা পূর্ণিমা দেখতে চাইছে প্রতিভার দুই চোখ। সুধার মা যখন চা নিয়ে আসে, তখন সত্যিই চমকে ওঠে প্রতিভা।—কে? ও, তুমি সুধার মা।

সুধার মা হাসে—এমন কিছু গভীর আঁধার তো এখনও হয়নি, বউদি, তবু তুমি যেন আমাকে দেখে চিনতেই পারলে না।

প্রতিভাও হাসে—যার চোখেই আঁধার, সে অত তাড়াতাড়ি চিনতে পারে না।

সুধার মা—ষাট, তোমার চোখ আঁধার হবে কেন? মাণিকের আলো নিয়ে চিরকাল হেসে থাকুক তোমার চোখ।

বারান্দার আলো জ্বেলে দিয়ে চলে যায় সুধার মা।

একদিন সন্ধ্যায় প্রতিভার প্রাণের বাতিকটা যেন হঠাৎ ছটফট করে জিজ্ঞেস করেই ফেলে, আজ কী তিথি, সুধার মা?

কিন্তু সুধার মা তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে নেই। আনমনা প্রতিভার চোখ দুটো দেখতেই ভুলে গিয়েছে, চা রেখে দিয়ে কখন্ নীচে চলে গেল সুধার মা।

আবার আনমনার মত আস্তে আস্তে হেঁটে বেড়ায় প্রতিভা। বারান্দার এদিক থেকে ওদিক। বুকের ভিতরের একটা অশান্ত নিঃশ্বাস আজ আর কিছুতেই শান্ত হতে পারছে না। সেগুন কাঠের সিংহ-আয়নার কাছে এসে দাঁড়িয়ে উপরের ঘড়িটার দিকে একবার তাকায় প্রতিভা।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। চমকে ওঠে প্রতিভা। চোখ তুলে তাকায়। কে? কে এল? কে ও?

সাদা পাঞ্জাবী, সাদা চাদর, অনুপম রায়ের ধবধবে মূর্তিটা সিঁড়ি ধরে উপরে ওঠে, প্রতিভার কাছে এসে দাঁড়ায়।

অনুপমের মুখের হাসিটাও বেশ ধবধবে।--তোমাকেই বলে যাবার জন্য এলাম। ভবতোষবাবুর বাড়িটা আমিই কিনবো বলে ঠিক করে ফেলেছি, তোমারই নামে ওটা কেনা হবে।

প্রতিভার উদাস চোখ আর নীরব মুখে কোন সাড়া নেই। কিন্তু অনুপমের মুখের হাসি আর ভাষা হঠাৎ একেবারে মৃদু হয়ে ফিস-ফিস করে।--খুব রাগ হয়েছে, তাই না? কিন্তু খুব ভুল বুঝেছো। আমি আজ রাতে তোমার ঘরে যাব। অনেক কথা আছে।

গায়ের চাদরটাকে টেনেটুনে একটু আলগা করে নিয়েই অনুপম বলে--আজ আমাকে এখন...এখনও অবশ্য অনেক সময় আছে, একবার বের হতে হবে। ওরা একটা সভা করে আমাকে সম্মান জানাবে ; আমি যে জিতেছি, প্রতিভা।

রামপ্রসাদ এসে বলে--মাস্টারমশাই অজয়বাবু এসেছেন।

--এসেছেন! প্রতিভার উদাস চোখ যেন ঘুম-ভাঙা পাখির মত খোলা বাতাসের ছোঁয়া পেয়ে আর খোলা আকাশের আলো দেখতে পেয়ে খুশি হয়ে নেচে উঠেছে। সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে চলে যায় প্রতিভা।

ড্রইং-রুমের পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকে প্রতিভার বুকের ভিতর থেকে যেন অনেক দিনের একটা ছটফটে অপেক্ষার বদ্ধ যন্ত্রণা মুখভরা হাসি হয়ে উথলে ওঠে।--এসেছেন তবে?

অজয়--আসতেই তো হতো। এই নিন, বাকি দশ টাকা।

প্রতিভা--দেনা শোধ।

অজয় হাসে--দেনা শোধ নয় ; টাকা শোধ।

প্রতিভা--এতদিনে যে কথা কখনও মনে হয়নি, আজ সে কথা, এই এখুনি আপনি আসতেই মনে হয়ে গেল। আমি আগে বুঝতেই পারিনি যে, আপনার অপেক্ষায় বসে আছি। কিন্তু আপনি আসতে বড় দেরি করে দিলেন।

--হ্যাঁ, দেরি হয়েই গেল।

--আমার কথা রেখেছেন তো?

--নিশ্চয়। আমাকে দেখে এতক্ষণে আপনার সেটা বুঝে নেওয়া উচিত ছিল।

--হ্যাঁ, আপনার শরীর অনেক ভাল হয়েছে। আরও ভাল হবে, যদি আমার কথাটা ভুলে না যান।

--না, ভুলে যাব না, এতদিনেও যখন ভুলিনি।

--আমাকে ভুলে যাবেন নিশ্চয়।

--না।

--কেন?

--না না, সম্ভব নয়। এতে আবার 'কেন' কিসের?

--আমাকে মনে করে রেখে আপনার কী লাভ?

--মনে করে রাখাই তো একমাত্র লাভ, আর সব ফাঁকি।

--তার মানে?

--তার মানে, কাছে পেয়েই বা কী লাভ, যদি মনের মধ্যে পেতে না পারি।

--খুব ইচ্ছে করে, অজয়বাবু, আপনার কাছে চলে যাই।

--আপনি...কী আশ্চর্য...আপনি এ কথা বলছেন?

--হ্যাঁ, আমিই বলছি, আমি প্রতিভা, যার নাম আভা হলে আরও ভাল হতো। ইচ্ছে করে, এখুনি দৌড়ে গিয়ে আপনার একলা ঘরের বিছানাতে লুটিয়ে পড়ি।

—আপনি আমাকে আর বেশি আশ্চর্য করে দেবেন না। সহ্য করতে পারবো না।

—যদি যাই, তবে আমার জন্যেও নটে চাঁপা আনবেন তো?

—আনবো।

—বাস্, তাহলেই হলো, আর কিছু চাই না।

সাদা ধবধবে সাজ, যে অনুপম রায় এতক্ষণ ড্রইং-রুমের দরজার কাছে বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে আছে, সে এইবার দরজার পর্দাটাকে এক হাতে খিমচে ধরে আর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে চেষ্টা করে। কিন্তু হাতটা, সেই সঙ্গে হাতঘড়িটা যেন শীতভীরু, বুড়ো রোগীর হাতের মত থরথরিয়ে কাঁপতে থাকে। চুপসে গিয়েছে অনুপম রায়ের ভরাট মুখটা, চোয়ালটাও নরবড় করছে, তাই চুরুটটাও মুখ ফসকে টুপ করে মেঝের উপর পড়ে যায় আর গড়াতে থাকে। যেন মরুভূমির ঘোড়ার সাহস মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছে।

অফিস-ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সেক্রেটারী পুলকবাবু চেঁচিয়ে কথা বলে—আপনি এখনও কেন দাঁড়িয়ে আছেন স্যার? আর দেরি করবেন না। ওরা বার বার টেলিফোন করে বলছে, সময় হয়ে গিয়েছে।

গেটটা যে সত্যিই খোলা। গেটের তালার চাবি আছে যার কাছে, সে বীরবাহাদুর এখন কোথায়? কে তাকে ডাকবে? গেট বন্ধ করবে কে? ওদের আটক করে ধরে রাখবে কে? গেট বন্ধ করলেই বা কি? ফুর্তির ফড়িংয়ের মত বাগবাজারের সন্ধ্যার এই ধোঁয়াটে হাওয়াতেও ওরা ফুরফুর করে উড়ে চলে যেতে পারে।

খোলা গেটের সামনে রাস্তার উপর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। এক ভদ্রলোক ওই গাড়ির কাছ থেকে খুব ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসেন আর চেঁচিয়ে ডাক দেন—বেশ দেরি হয়ে যাচ্ছে, স্যার।

খিমচে-ধরা পর্দাটাকে ছেড়ে দিয়ে পকেট থেকে সাদা ধবধবে রুমাল বের করে কপালটাকে মুছতে থাকে অনুপম। কিন্তু কাঁপা হাতের ছোঁয়া লেগে কপালটাও কাঁপতে থাকে। হ্যাঁ, যেতে হবে। ঘাড় টান করে ঝুঁকে পড়া চেহারাটাকে একটু সোজা করে দাঁড় করায় অনুপম। আর, আবার দুই কানের সব আবেগ সচকিত করে এই ভয়ানক মতলবের ঘরের ভাষা শুনতে চেষ্টা করে।

দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠেছে প্রতিভা।—কিন্তু এ জন্মে আর হবে না, অজয়বাবু।

অজয়—কী?

প্রতিভা—আপনার কাছে যাওয়া আর হলো না।

অজয়—তাতে কী হয়েছে? কিচ্ছু আসে যায় না। আপনি কাঁদবেন না।

পর্দার বাইরের ধবধবে সাজের অনুপমের চুপসে-যাওয়া মুখটা হঠাৎ ভরাট হয়ে যায়, আর হেসে ফেলে—তাই বল! যাবে না ; যাবার সাহস নেই, ইচ্ছেও নেই। গুপ্তপ্রেমের বুদ্ধিটা খুব পাকা।

গেটের কাছে গাড়িটা উতলা হয়ে বার বার হর্ন বাজাতে থাকে। এগিয়ে যায় অনুপম, আর চলতে চলতেই হাত তুলে ইসারা করে—যাচ্ছি।

চোখ মুছে ফেলে প্রতিভা, হেসেও ফেলে—আর তো আপনার কাছে আমার টাকার পাওনা নেই। সবই তো আজ শোধ হয়ে গেল।

অজয়—হ্যাঁ।

প্রতিভা—তার মানে, আপনি আর আসবেন না।

অজয়—আপনি বললেই আসবো, আপনি ডাকলেই আসবো।

প্রতিভা—না, অজয়বাবু। ক্ষমা করুন। আপনি আর আসবেন না।

অজয়—বেশ তো, তাই হবে। তাতে কী আসে যায়?

উঠে দাঁড়ায় প্রতিভা। প্রতিভার দুই চোখ হেসে হেসে, যেন শেষবারের মত শুকতারার

আভা ফুটিয়ে নিয়ে অজয়কে একবার দেখে নেয়।--যাই অজয়বাবু, নমস্কার।

—হ্যাঁ, আমিও যাই।

চলে গেল অজয়। ঘরের ভিতরে একা হয়ে শুধু একটা মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে প্রতিভা। না, অজয়ের পায়ের শব্দ আর শোনা যায় না। দরজার পর্দা হাতের এক ঠেলায় সরিয়ে দিয়ে আর হেসে হেসে হাঁটতে থাকে প্রতিভা।

—যাই, সুধার মা। প্রতিভার ডাক শুনেই রামায়ণ পড়ায় ব্যস্ত চোখ দুটোকে তুলে নিয়ে সুধার মা তাকায়--এস।

এইবার সিঁড়ি। ছেঁড়া কাগজে ভরতি একটা ঝুড়ি হাতে নিয়ে চলে যাচ্ছে রামপ্রসাদ।

--যাই রামপ্রসাদ। ডাক দেয় প্রতিভা। রামপ্রসাদ হাসে--হ্যাঁ মা, আসুন।

সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতে থাকে প্রতিভা। দোতলার বারান্দাতে টবের ফুলের ঝরাপাতা ঝাড়ু দিয়ে জড়ো করছে দুর্গাবালা।

--যাই দুর্গাবালা। ডাক দেয় প্রতিভা।

--আসুন মা, আসুন। ব্যস্তভাবে সাড়া দিয়ে হেসে ফেলে দুর্গাবালা।

এইবার তেতলার বারান্দা। প্রতিভার প্রাণে হাসি, তাই মনে হয়, সেগুন কাঠের সিংহ-আয়নার মাথার উপরে ওই ঘড়িটার শব্দের মধ্যেও একটা নতুন হাসির শব্দ টিক্ টিক্ করে বাজছে। ঘড়িটার দিকে একবার তাকায় প্রতিভা। এখনও মাত্র সাড়ে ছ'টা। গঙ্গার হাওয়া বইতে শুরু করবে কখন্?

সেগুন কাঠের সিংহ-আয়নার মাথার উপরে ওই ঘড়িটা মাসের মধ্যে অন্তত একবার হঠাৎ ক্লান্ত হয়ে যায়, যেন একটা অফুরান হয়রানির জীবনের হঠাৎ-অভিমান। কবে কখন্ কোন্ সময়ে যে ঘড়িটা বন্ধ হয়ে যাবে, তার কোন ঠিক নেই, নিয়মও নেই। গত মাসে সকাল বেলাতেই দেখা গিয়েছে, দেড়টার ঘরে কাঁটা থামিয়ে রেখে চুপ করে রয়েছে ঘড়িটা। রামপ্রসাদ খবর দেয়, তাই দীনুবাবু এসে দম দিয়ে আর কাঁটা ঘুরিয়ে ঘড়িটাকে ঠিক সময়ের তালের সঙ্গে চালিয়ে দিয়ে চলে যান।

আজ রাতে যখন ঠিক সাড়ে দশটার ঘরে কাঁটা থামিয়ে দিয়ে চুপ করে গেল ঘড়িটা, তখন নীচের তলার কাজের ঘরের গুঞ্জন সামান্য একটু মৃদু হয়ে এসেছে। সূর্যবাবু, যিনি খুবই জোরে চেঁচিয়ে হাসেন, তিনি একটু আগেই চলে গিয়েছেন। শুধু আছেন চন্দ্রবাবু, আর, সেই যে প্রায় আট বছর আগে একবার অনুপমের এই কাজের ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হেসেছিল, সেই কুলদা পণ্ডিতও বসে আছেন। কুলদা পণ্ডিতের সেই স্নিগ্ধ চেহারা আর নেই। রোগে ভুগে ভুগে শুকনো ঝিরঝিরে হয়ে গিয়েছে। চিমসে গলাটার শিরাগুলি ফুলে যেন জট পাকিয়ে রয়েছে।

কুলদা পণ্ডিত হাসেন—এবার আমাকে উঠতে আজ্ঞা করুন।

অনুপম—আচ্ছা।

কুলদা পণ্ডিত—আজ তো আমি আপনার কাছে অন্তত এক হাজার এক টাকা আশা করতে পারি।

কুলদা পণ্ডিতের মুখের দিকে শুধু তাকিয়ে থাকে অনুপম। কানের কাছে একটা অন্ধ উল্‌কি পোকা ফুরফুর করে উড়ছে, তবু মাথাটা একটু সরিয়ে নিতেও ভুলে যায় অনুপম।

চন্দ্রবাবুর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই হেসে ফেলে অনুপম ; শান্ত লাজুক ও খুশিঘন একটা হাসি।—পণ্ডিত মশাই আমাকে কী অদ্ভুত লজ্জায় ফেললেন, দেখুন তো চন্দ্রদা।

চন্দ্রবাবু—কিন্তু পণ্ডিত মশাই যে সত্যিই তোমার কাছে একটু বেশি দক্ষিণা দাবি করতেই

পারে, তাতে তো কোন ভুল নেই।

অনুপম—না, তাতে অবশ্য কোন ভুল নেই।...আচ্ছা, আপনি কষ্ট করে কাল একবার আসুন পণ্ডিত মশাই।

—আসি তাহলে। খুশি হয়ে চলে যান কুলদা পণ্ডিত।

—আমিও এবার উঠি। চলে গেলেন চন্দ্রবাবু।

চন্দন কাঠের ফ্রেম আর কাঁচ দিয়ে বাঁধানো মানপত্রটাকে হাতে নিয়ে একা-একা সবুজ ভেলভেটের পর্দার বাইরে এসে হাতঘড়ির দিকে যখন তাকায় অনুপম, তখন নীচের তলাও প্রায় নিঝুম হয়ে এসেছে।

রাজুলু, আমি আজ খাব না। খাবার ঘরের দরজার কাছে এসে কথাটা বলে দিয়েই এগিয়ে যায় অনুপম।

সিঁড়ি ধরে এক ধাপ উঠেই থমকে দাঁড়ায় অনুপম! বুকের ভিতরে যেন বাঘের দাঁত কড়মড় করে শব্দ করে বেজে উঠেছে। কৈফিয়ত চাই। আমাকে ছেড়ে অজয়কে? কেন? কিসের জন্য? কী কৈফিয়ত দিতে পারবে তুমি?

দোতলার বারান্দাতে উঠে আবার থমকে দাঁড়ায় অনুপম। ছুরি নয়, পিস্তল নয়, এক হাতে শুধু চন্দন কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো মানপত্র ; অনুপমের হাতটা যেন খুনীর হাতিয়ার আঁকড়ে ধরে রয়েছে। এরই একটি আঘাত মাথার উপর আছড়ে দিলে গুপ্তিপাড়ার ওই শক্ত খোঁপা রক্তে ভিজে যাবে।

লাফ দিয়ে দিয়ে এক-একটা সিঁড়ি পার হয়ে উঠতে থাকে অনুপম। গুপ্তিপাড়ার মেয়ের রক্তে ভেল্‌কি, মুখে মেজাজ। আজ একবার দেখতে চাই, সে-মেজাজ কেমন করে মুখ তোলে আর কথা বলে।

তেতলার বারান্দা। অনুপমের নিঃশ্বাসের জ্বালাটাও যেন শব্দ করে বাজছে। কাঁদলে চলবে না, পা জড়িয়ে ধরলেও চলবে না। আগে কৈফিয়ত চাই। রেহাই নেই তোমার। দরজা না খুলে দাও তো লাথি মেরে দরজা ভেঙে ফেলবো।

ঘরের দরজার কাছে ছুটে এসেই অনুপমের আক্রোশের মূর্তিটা থমকে গিয়ে টলমল করে। দরজাটা খোলা। ঘরের ভিতরে আলো। আর...।

অনুপমের হাত থেকে চন্দন কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো মানপত্রটা ফসকে পড়ে যায়, বারান্দার রঙীন মোজেয়িক যেন শব্দ করে কঁকিয়ে ওঠে, কাঁচের টুকরো ছড়িয়ে পড়ে।

বিছানার উপরে নয়, ঘরের মেজের উপরে একটা হাতের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে আছে প্রতিভা। অনুপমের দুই চোখের তারা দুটো যেন ফোস্কা হয়ে ফুলে ওঠে আর দেখতে থাকে, হ্যাঁ, ঘুম, সাংঘাতিক ঘুম। মেজের উপর পড়ে রয়েছে ওটা কিসের শিশি? হ্যাঁ, ঘুমের বড়ির শিশি।...এই, কে আছ, ডাক্তার বোলাও। চেঁচিয়ে ওঠে অনুপম।

কী অদ্ভুত চিৎকার! যেন ঘাড়-মটকানো শকুনের ভীরু মিনমিনে স্বরের একটা শিহর। ভাঙা কাঁচের টুকরোগুলি মাড়িয়ে মাড়িয়ে কাঁপতে থাকে অনুপম রায়ের দুর্দান্ত সাহসের ধড়টা। আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে দরজার কপাট ভেজিয়ে দেয় অনুপম।

তেমনই আস্তে আস্তে হেঁটে বারান্দা পার হয়ে যায় অনুপম। সিঁড়ি ধরে আস্তে আস্তে নামতে থাকে। চুপসে গিয়েছে ভরাট মুখটা। ঝুলে পড়েছে চোয়াল। মাঝরাতের চোরের মত যেন ছায়া লুকিয়ে লুকিয়ে সিঁড়ির ধাপ থেকে ধাপে নেমে যেতে থাকে অনুপম রায়ের কুঁজো হয়ে যাওয়া একটা অদ্ভুত শরীর। আরও অদ্ভুত ওই শরীরের ছায়াটা ; যেন শিরদাঁড়াভাঙা একটা অন্ধকার চুপি-চুপি পালিয়ে যেতে চেষ্টা করছে।

নীচের তলায় নেমেই একবার টান হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করে অনুপম। তারপর আর দেরি করে না। সবুজ ভেলভেটের পর্দা ঠেলে সেই কাজের ঘরের ভিতরেই ঢোকে আর

টেলিফোনে কথা বলে।—ডাক্তার ব্যানার্জি আছেন?

—আছি।

—আমি অনুপম।

—কী খবর?

—আমার দুর্ভাগ্য, ডাক্তার ব্যানার্জি।

হেসে উঠলেন ডাক্তার ব্যানার্জি।—কী বললেন? আপনার দুর্ভাগ্য? সেটা কী করে সম্ভব?

—মনে হয়, হঠাৎ হার্টফেল করেছে ; তাই এভাবে আমাকে একা রেখে দিয়ে চলে গেল।

—কে? কে? শিগগির বলুন।

—আমার স্ত্রী। শিগগির আসুন ডাক্তার ব্যানার্জি।

শতকিয়া

আর কতদূর?

আর খুব বেশি দূর নয়। এই বাবুরবাজার থেকে পুরনো সড়ক ধরে তিন ক্রোশ দক্ষিণে চলে গেলেই মধুকুপি নামে সেই গাঁ, যে গাঁয়ে দাশু ঘরামির একটি ঘর আছে আর ঘরণীও আছে।

গাঁয়ের পাশে ডরানি নামে সেই ছোট নদীটিও আছে, যে নদীতে বৈশাখ মাসেও হাঁটুজল থাকে। আর, সেই পাহাড় দুটিও আছে ; ছোটকালু ও বড়কালু, কাদামাখা মোষের গায়ের মতো কালো-কালো আর মেটে-মেটে রঙের দুটি বেঁটে আকারের পাহাড়। বোশেখের ভয়ানক শুকনো দুপুরে যখন ডরানির স্রোতের কিনারাতে কোন বকও বসে থাকে না, তখন এই দুটি পাহাড়ের গায়ের উপর ছাগল চরে বেড়ায়, কচি বটের পাতা খায়। আর, শ্রাবণের শেষে পাহাড়ের গায়ে, এমন কি মাথার উপরেও পাথরের ফাঁকে ফাঁকে সবুজ ঘাস যখন ঘন হয়ে গজিয়ে ওঠে, তখন গাঁয়ের রোগা-রোগা গরুর দল কাঁকুরে ডাঙার কুশে ঘাস ছেড়ে দিয়ে বরং ছোটকালু আর বড়কালুর কোলে বুকে ও মাথায় চড়ে তাজা ঘাসের গোছা খেতে ভালবাসে।

সন্ধ্যা হয়েছে। মোটর বাস থেকে নেমে বাবুরবাজারের পথের উপর দাঁড়িয়ে একটা আরামের হাঁপ ছেড়ে সোজা দক্ষিণের আকাশের দিকে তাকিয়ে দূরের আবছায়াময় মধুকুপির সেই জঙ্গলটাকেও চিনতে পারে দাশু ঘরামি। জঙ্গলটা আছে, সেই কপালবাবার জঙ্গল, যার কিনারায় বেলগাছের তলায় একটা গোল পাথর আর একটা খুলি পড়ে আছে।

আছে, সবই ঠিক আছে। কপালবাবার আসন যেখানে ছিল আজও নিশ্চয় সেখানে আছে। কিছুই বদলায় নি। এই পাঁচ বছরের মধ্যে বদলে যাবারই বা কি আছে? আর তিন ক্রোশ পথ হেঁটে পার হয়ে যেতে পারলেই দাশু ঘরামি তার পুরানো মধুকুপিকে, ছোটকালু আর বড়কালুকে, নুড়ি-ছড়ানো আর বালুমাখা সেই ডরানির কলকল জলের স্রোতটাকেও পেয়ে যাবে। হরিপদ নিশ্চয় এখনও কপালবাবার জঙ্গলে মৌচাক ভাঙে ; আর সুরেন মান্‌ঝি রোজ দুপুর হতে-না-হতে তার ছোট গো-গাড়ি মরা শালে বোঝাই করে জঙ্গলের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে। আজও নিশ্চয় রোজই পালকি বইতে গোবিন্দপুরে যায় হরিশ নিধিরাম আর লটবর।

মধুকুপি জনমজুরের গাঁ, যে গাঁয়ের মানুষেরা সবাই মনিষ। পরের মাটি কাটে, পরের জমি চষে, পরের গো-গাড়ি হাঁকায়, পরের ঘরের চালা ছায় আর পরের পালকিতে বেহারা খাটে।

জঙ্গলকে একেবারে পর ভাবে না, কিন্তু ক্ষেতের মাটিকে বেশি ভালবাসে ; কাঁড় টাঙ্গি ছেড়ে দেয়নি, কিন্তু লাঙ্গল কোদাল হাতে তুলে নিয়েছে। কর্মঠ ভূমিজ জীবনের ছোট্ট একটি উপনিবেশ এই মধুকুপি। জাতের পেশা নামে ধরাবাঁধা কোন পেশা নেই। ঘরের চালা ছেয়ে দু পয়সা রোজগার করতে প্রতি বছরের দুটি মাস গোবিন্দপুর যেত দাশু ; দাশু তাই দাশু ঘরামি। দাশুর বাবা ছিল কাঠুরিয়া, বাবার বাবা মাটিয়াল।

ত্রিশ মাইলের মধ্যে রেল-লাইন নেই, এহেন মধুকুপির মনে একটা অহংকারও আছে যে, গাঁয়ের কোন মানুষ আজ পর্যন্ত গোবিন্দপুর হাসপাতালের ওষুধ মুখে দেয় নি। কপালবাবার সেই বেলগাছের পাতাই যথেষ্ট, মধুকুপির সব রোগের ওষুধ, সব ভয়ের কবচ আর সব মানতের আশ্বাস। হোই, হোই সেই মধুকুপি!

এখানে সড়কের দু পাশে গোটা দশেক চালাঘর, তারই নাম বাবুরবাজার। যাই হোক, বাবুরবাজারের এই দশা কেন? একেবারে স্তব্ধ। সব দোকানঘর বন্ধ। একটাও গো-গাড়ি নেই।

এই তো সেই বাবুরবাজার, যেখানে ঠিক সন্ধ্যার পর যত ধানের গাড়ি এসে ভিড় করত, আর মানপুরের পাইকারেরা টাকার থলি হাতে নিয়ে চেঁচিয়ে দর হাঁকত। কোথায় গেল তারা? বাবুরবাজারের সন্ধ্যার প্রাণটা পালিয়ে গেল কোথায়?

নিতাই মুদির দোকান আছে দেখা যায়। দোকানের ঝাঁপ বন্ধ। কিন্তু ভিতরে আলো জ্বলছে। এগিয়ে যায় দাশু ঘরামি। চাপা গলায় ডাক দেয়--নিতাইদাদা আছ হে?

--কে?

--আমি দাশু।

দোকানের ঝাঁপ খুলে নিতাই মুদি বের হয়ে এসে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকে ঃ এ কি! তুই হঠাৎ এই অসময়ে! ছাড়া পেলি কবে?

দাশু--আজই ছাড়া পেলাম।

নিতাই সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করে--কিন্তু তোর মেয়াদের পাঁচ বছর কি শেষ হয়েছে?

দাশু হাসে ঃ না দাদা।

নিতাই মুদি তার কাঁপা হাতে দোকানের ঝাঁপ ধরে হঠাৎ একটা টান দেয়। দরজার অর্ধেকটা বন্ধ করে দিয়ে বলে--জেলখানার পাঁচিল-টাঁচিল টপকে পালিয়ে এসেছিস মনে হচ্ছে।

--না গো। সাজার চার মাস মকুব হয়েছে।

অনেকক্ষণ দাশুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর চোখ বুজে যেন মনের সন্দেহটাকে আস্তে আস্তে সামলাতে চেষ্টা করে নিতাই মুদি। দোকানের ঝাঁপ আবার একটু ঠেলে সরিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করে নিতাই--সাজার চার-চারটে মাস মকুব করে দিল, এটাও যে আশ্চর্যের কথা বলছিস দাশু!

--হ্যাঁ। একটা ক্ষেপা দাগীর হাত থেকে ছুরি ছিনে নিয়ে জমাদারকে বাঁচিয়েছিলাম। সে বাবদ দু মাস মকুব হয়েছে। আর জেলের ফুলবাগানে চারটে করাইত সাপ মেরেছিলাম। সে বাবদ এক মাস।

নিতাই--এ তো মোট তিন মাস হল। হিসাব ভুল করছিস কেন রে?

দাশু--একটা বুড়ো কয়েদী কুয়ার ভিতর পড়ে গিয়েছিল, সে বেটাকে আমিই টেনে উঠিয়েছিলাম--সে বাবদ এক মাস মকুব হয়েছে।

নিতাই মুদি দাশুর চেহারাটাকে আর একবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। প্রশ্ন করে নিতাই--গায়ে নতুন গেঞ্জি, নতুন ধুতিও পরেছিস দেখছি। এসব এরই মধ্যে জোটালি কেমন করে?

দাশু--এগার টাকা দশ আনা বকশিশ জমা হয়েছিল।

নিতাই--বকশিশ?

দাশু--হ্যাঁ, একটি বেলাও অসুখ নিয়ে হাসপাতালে যাই নাই। জেলের বাগানের এক বিঘা মাটি আমি একা ভেঙেছি। দুই হাজার ধুঁদুল আর ঝিঙা ফলিয়েছি। আমি বকশিশ পাব না তো কে পাবে? জেলারবাবু বলেছে, দাশু ঘরামির মত ভাল মেজাজের কয়েদী আর নাই।

নিতাই--এগার টাকা দশ আনার সবই খরচ করে ফেলেছিস?

দাশু--না। আট টাকা ছ আনা খরচ করেছি।

নিতাই--একটা গেঞ্জি আর একটা ধুতি আট টাকা ছ আনা হবে কেন?

দাশু হাসে, লাজুক হাসি ; সেই হাসির আভা লেগে চোখ দুটোও জ্বলজ্বল করতে থাকে : এক শিশি ফুলেল তেল, আর এক শিশি আলতাও কিনেছি, দু টাকা দু আনা দাম পড়েছে।

কিছুক্ষণ মাথা চুলকোয় নিতাই, তারপর হাঁপ ছাড়ে ঃ বুঝলাম। বেশ করেছিস, তা হলে

হাতে এখন মোট তিন টাকা চার আনা আছে?

দাশু—হ্যাঁ।

নিতাই--ভেতরে এসে বস। কি খাবি বল? মুড়ি আছে, মটর আছে, গুড় আছে।

দাশু—কিছু খাব না।

নিতাই—খাবি না মানে?

দাশু—ঘরে গিয়ে খাব।

নিতাই—এখন ঘরে যাবি কি রে? সন্ধ্যা পার হতে চলল। তার ওপর এই তিন ক্রোশ পথ।

দাশুও হাসে ঃ এ তো আমি এক ছুটে পার হয়ে যেতে পারি গো।

নিতাই মুদি চোখ বড় করে আতঙ্কিতের মত তাকায় ঃ পারবি না দাশু। এমন সাহস করিস না।

দাশু আশ্চর্য হয় ঃ কিসের ডর?

নিতাই—দেখছিস না বাজারের দশা? সন্ধ্যা হবার আগেই যে-যার ঘরে চলে গিয়েছে। আজ এক মাস ধরে এই কাণ্ড চলছে। কোন কারবারী আর এমুখো হয় না।

—কেন?

—এক মাসের মধ্যে তিনটে গরু, পাঁচটা ছাগল আর দুটো মানুষ গিয়েছে।

—কোথায় গেল?

—আঃ, সোজা কথাটা বুঝতে পারিস না কেন দাশু? কানারানীর পেটে গিয়েছে।

নিতাই মুদির মুখের এত বড় আতঙ্কের গল্পটা শুনে আতঙ্কিত না হয়ে দাশুর বিস্মিত চোখের তারা দুটো ঝিক করে হেসে ওঠে। তা হলে কানারানীও আছে। এই পাঁচ বছরের মধ্যে কানারানী মরে যায় নি। জঙ্গলের কাঁটার আঁচড়ে নয়, নিজেরই বাঘের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে বাঘের থাবার আঘাতে একটা চোখ কানা হয়ে গিয়েছিল যে বাঘিনীর, সেই কানারানী। মধুকুপির আখের ক্ষেতের মধ্যে সারা রাত ধরে বাঘ-বাঘিনীর সেই লড়াই চলেছিল. সে আজ প্রায় আট বছর আগের কথা। ঘরে দরজা বন্ধ করে সারা গাঁয়ের মানুষ সারা রাত জেগে বাঘ-বাঘিনীর সেই ভয়ংকর ঝগড়াটে গর্জন শুনেছিল। ছোটকালু আর বড়কালুর পাথরের উপর আছড়ে পড়ে সেই গর্জনের প্রতিধ্বনি আরও ভয়াল হয়ে উঠেছিল। এবং ভোর হতেই আখের ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে গাঁয়ের লোক দেখতে পেয়েছিল, শুকনো ঘাসের উপর বাঘিনীর দুটো বাচ্চা হুটোপুটি করছে, আর ঘাসের ওপর এলিয়ে শুয়ে রয়েছে বাঘিনী, কাদামাখা একটা চোখ থেকে রক্ত ঝরছে।

অদ্ভুত একটা খুশির স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে দাশু—সেই কনারানী!

নিতাই—হ্যাঁ রে বাবা, হ্যাঁ। জনার্দনের মা সেই মুটকি বুড়িকে মনে পড়ে তো? শেষ রাতে উঠে সড়কের উপর গিয়ে গোবর কুড়তো যে বুড়িটা?

—হ্যাঁ।

—এই তো সাত দিন হল বুড়িকে খেয়ে ফেলেছে কানারানী। গোবিন্দপুর থানা থেকে চারজন শিকারী এসে আজ বিশ দিন হল জঙ্গল তছনছ করছে। মাচান বেঁধে সারা রাত ধরে তাক করছে, কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। গুলি করলেও কানারানীর গায়ে লাগে না।

দাশু—কানারানী তো বাঘিন নয় ; বনমাতা বটে।

নাক সিঁটকে খেঁকিয়ে ওঠে নিতাই—হ্যাঁ, খুব দয়াময়ী বনমাতা বটে।

চুপ করে নিতাই মুদির দোকান-ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কি-যেন ভাবতে থাকে দাশু। আর, স্তব্ধ বাবুরবাজারও এইবার ঘন অন্ধকারে যেন আরও ভাল করে গুটিশুটি হয়ে লুকিয়ে পড়তে থাকে।

দাশু বলে—আচ্ছা, এবার আমি চলি।

নিতাই—যাবি?

দাশু—হ্যাঁ।

নিতাই—মাত্র পাঁচটি আনা পয়সা খরচ করে মুড়ি-গুড় খেয়ে এখানে আজকের রাতটার মত থেকে গেলে ভাল করতিস। পাঁচ আনা পয়সা বাঁচাবার জন্য শেষে কানারানীর পেটে যদি যেতে হয়।

হেসে ওঠে দাশু ঃ আমাকে কিছু বলবে না কানারানী।

নিতাই বলে—সে না হয় হলো, কিন্তু আমার কথাটা শুনলে ভাল করতিস দাশু। এ রকম অসময়ে হঠাৎ ঘরে গিয়ে ঢুকলে...।

কি যেন বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যায় নিতাই মুদি। দাশু বলে—কি বললে নিতাইদাদা?

নিতাই মুখ টিপে হাসে ঃ যাচ্ছিস যা। কিন্তু ঠকবি।

ঝট করে হাত চালিয়ে দরজার ঝাঁপ বন্ধ করে দেয় নিতাই মুদি।

তিন ক্রোশ পথ হন হন করে হেঁটে পার করে দিতে কতক্ষণই বা লাগবে? পথের দূরত্বকে নয়, অন্ধকারকে নয়, এবং কানারানীর রক্তলোলুপ ভয়ানক ক্ষুধার উৎপাতকেও নয়, কাউকেই ভয় করতে ইচ্ছা করে না। ভয় করেও না। দাশু ঘরামির বুকের ভিতরটাই যে স্বপ্নলোলুপ একটা পিপাসায় মত্ত হয়ে উঠেছে। বার বার মনে পড়ে, শুধু একটি মুখের ছবি। মুরলীর মুখটা। ঝালদার মহেশ রাখালের যে মেয়েকে একান্ন টাকা পণ দিয়ে বিয়ে করে ঘরে এনেছিল দাশু ঘরামি, সেই মুরলী।

আকাশের তারার দিকে মাঝে মাঝে তাকায় আর পথ হাঁটে দাশু। হাতের পুঁটলিটা দোলে, যার ভিতর এক শিশি ফুলেল তেল আর এক শিশি আলতাও দোলে। ঠিক যেদিন মুরলীর জন্য ঠিক এই দুটি জিনিস কিনতে গোবিন্দপুর যাবার জন্য তৈরি হয়েছিল দাশু, প্রায় পাঁচ বছর আগের সেই সকালে দাশু ঘরামির জীবনের একটা আক্রোশ এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসে রইল। তার পরেই গ্রেপ্তার আর চালান। এক মাসের মধ্যেই পুরুলিয়ার দায়রা আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হাকিমের রায় শুনতে হয়েছিল, সাংঘাতিক অস্ত্র দিয়ে মানুষকে সাংঘাতিকভাবে জখম করার অপরাধে দাশু ঘরামির পাঁচবছরের শক্ত কয়েদ।

যার জন্য এই সাজা তার চেহারাটাও মনে পড়ে। মুরলীর মত জীবন্ত হাসি হাসে না সে, কিন্তু হাসে ঠিকই। সে হল, গুলঞ্চের বেড়া দিয়ে ঘেরা দেড় বিঘের মত জমি।

মাত্র দেড় বিঘে চাকরান জমি, মাটি এঁটেল। কিন্তু চেষ্টা করলে ওই এঁটেলকেই সামান্য গোবরসার দিয়ে তৈরি করে বছরে দুটো ফসল তোলা যায়। শীতের তিন মাসে ভাল সব্জী তোলা যায় ; তারপর জিরে বুনে দিলেই হয়। মানপুরের পাইকারেরা জিরের ভাল দর দিতে রাজি আছে।

জিরে বুনব, জিরে বুনব, দশটা টাকা জমাতে পারলেই ওই দেড় বিঘেতে সোনার দানার মত জিরে ফলাব, মুরলীর কাছে কতবার এরকমের আশার কথা বলেছে দাশু।

কিন্তু কোথা থেকে এসে দেখা দিল এক রায়বাবু, ইঁটের ঠিকাদার। দাশু ঘরামির সেই দেড় বিঘে জমি তার চাই, প্রকাণ্ড এক ইঁটখোলা চালু করবে রায়বাবু। পঁচিশ টাকা নাও, আর ঐ দেড় বিঘে জমি ছেড়ে দাও ; লোক পাঠিয়ে বার বার দাশুকে একটা রফার প্রস্তাব জানিয়েছিল রায়বাবু। কিন্তু জমি ছাড়তে রাজি হয় নি দাশু।

—পাঁচশো টাকা দিলেও না। বেশ জোর গলায় হাঁক দিয়ে রায়বাবুর সরকারের দিকে একদিন মারমুখো হয়ে তেড়ে গিয়েছিল দাশু।

—ঈশানবাবুর মত মানুষ তাঁর তিন বিঘে ব্রহ্মোত্তর পর্যন্ত রায়বাবুর ইঁটখোলার জন্য ছেড়ে

দিতে পারলেন, আর তুমি তোমার এক টুকরো চাকরান ছেড়ে দিতে পারবে না, কোথাকার লাট হে তুমি?

রায়বাবুর সরকার মশাইয়ের এই গর্জনের উত্তরে দাশুও গর্জন করেছিল—চুলায় যাক ঈশানবাবুর বেরোমতোর। ঈশানবাবু সদরে বসে মোক্তারি করে, আর গাঁয়ে এসে জমি মারে। ওর কত জমি! ডরানির জলে ওর দশ বিঘা জমি গলে গেলেও ওর কোন দুখ নাই ; কিন্তু আমার দুখ হয় গো মশাই।

—শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিতেই হবে বাবা।

—কেন?

—নতুন সেটেলমেন্টের কাগজে দেখেছি, তাতে তোমার এই দেড় বিঘে চাকরানের কোন দাগ নেই। এখান থেকে শুরু করে ওই সড়ক পর্যন্ত সবই ঈশানবাবুর সাবেক পতিত, রায়বাবু ইজারা নিয়েছেন।

—কাগজে দাগ নাই তো নাই। সারা গাঁয়ের লোক জানে ওটা আমারই তিন পুরুষের ভোগদখলের জমি। লাঙ্গল গরু নাই, বীজ কিনবার পয়সা নাই, তাই চাষ দিতে পারি নাই ; কিন্তু তাই বলে জমি ছেড়ে দিব কেন?

—জমিটা তোমার কোন কাজে লাগছে না, তবুও ছাড়বে না?

—না।

—আচ্ছা।

সেই যে শাসিয়ে গেল রায়বাবুর সরকার, তার দশ দিন পরে সকালে ঘুম থেকে উঠেই মাঠের দিকে লোকের হল্লা শুনতে পেয়ে চমকে ওঠে দাশু ঘরামি।

গোবরমাখা হাত নিয়ে ছুটে এসে মুরলীও চেঁচিয়ে ওঠে—ইঁটখোলার লোক এসে মাটি কাটতে লেগেছ গো।

দেখতে পায় দাশু, গুলঞ্চের বেড়া উপড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। দেড় বিঘে চাকরান, সেই শান্ত শক্ত চৌরস এঁটেলের উপর ঝপাঝপ কোদালের আঘাত পড়ছে। এরই মধ্যে মস্ত বড় দুটো গর্ত হয়ে গিয়েছে। রায়বাবুর সরকার দাঁড়িয়ে আছে। লাঠি হাতে নিয়ে তিনজন ভাড়াটে লেঠেলও দাঁড়িয়ে আছে।

—আমার টাঙ্গি কোথা রে মুরলী? কাঁপতে কাঁপতে চেঁচিয়ে ওঠে দাশু। দাশু ঘরামির পঁচিশ বছর বয়সের মজবুত শরীরের হাড়গুলি যেন আক্রোশে ক্ষিপ্ত হয়ে কটকট করে বাজতে থাকে। চোখ দুটো নেশাড়ে মানুষের চোখের মত ঘোলাটে হয়ে যায়।

গোবরমাখা হাতেই মুরলী দাশুর হাত চেপে ধরে অনুনয় করে—যেও না। ওরা অনেক লোক, তোমাকে ওরা মেরে ফেলবে।

এক ধাক্কা দিয়ে মুরলীকে সরিয়ে দিয়ে ঘরের চালা থেকে টাঙ্গিটা টেনে বের করে নিয়ে ছুটে চলে দাশু। যে টাঙ্গি দিয়ে ফণীমনসার ঝোপের অনেক শজারুকে এক কোপে দু'টুকরো করেছে দাশু সেই টাঙ্গি হাতে তুলে নিয়ে দাশু ঘরামির মনে হয়েছিল, ইঁটখোলার লোকগুলিও যেন উৎপাতের শজারু। সেই মুহূর্তে...

সেই মুহূর্তে দাশুর টাঙ্গির একটি আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রায়বাবুর সরকার। ঠিক ঘাড়ের কাছে কোপটা পড়েছে। রক্তের ফোয়ারা ছুটেছে। পাগড়ি বাঁধা মাথা, সব চেয়ে লম্বা-চওড়া চেহারার লেঠেলটার মাথা লক্ষ্য করে দাশু ঘরামির টাঙ্গি হিংস্র হয়ে লাফিয়ে উঠতেই মাথা নীচু করে মাথা বাঁচায় সেই লম্বা-চওড়া লেঠেল। টাঙ্গিকেও ধরে ফেলে। দাশু ছুটে এসে ঘরের আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে হাঁক দেয়—আমার কাটারিটা দে তো মুরলী।

কাটারিটা লুকিয়ে ফেলে মুরলী। চিৎকার করে, গাঁয়ের মানুষ কে কোথা আছ গো জলদি এস।

যারা কাছে ছিল, তারা মুরলীর ডাক শুনে ছুটে এসে দাশুকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ঃ একটু থাম দাশু। মাথা খারাপ করিস না ; পাগলপারা কাণ্ড করছিস কেন?

পালিয়ে গেল ইঁটখোলার লোকজন। ভাড়াটে লেঠেলরা সরকারের জখম শরীরটাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে দূরের সড়কের উপর একটা মোটর গাড়ির দিকে চলে গেল।

তার পর মাত্র একটি দিন মুরলীকে চোখের সামনে দেখবার সুযোগ পেয়েছিল দাশু। পরের দিন সকালে দাশুকে গ্রেপ্তার করার জন্য যখন পুলিস এসে ঘরের দরজায় দাঁড়াল, তখন মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলেছিল দাশু ঃ আমি তো চললাম, কিন্তু তোর কি করে দিন চলবে মুরলী? ঝালদা চলে যাবি?

মুরলী—না।

দাশু—এই ঘরে থাকবি?

মুরলী—হ্যাঁ।

দাশু—কিন্তু কতদিন থাকতে পারবি?

মুরলী—যতদিন না তুমি ফিরে আস।

দাশু—বেঁচে থাকবি তো?

হাতের তেলো দিয়ে চোখের জল মুছে মুরলী বলে—থাকবো।

মুরলীর সেই মুখটাকে মনে পড়ে। কী সুন্দর একটা প্রতিজ্ঞার জোরে মুরলীর চোখ-মুখ শক্ত হয়ে উঠেছিল। বয়সটি সুন্দর, চেহারাটি সুন্দর, আর কথাগুলিও কত সুন্দর। যত দিন না দাশু ফিরে আসে, ততদিন নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবেই আর এখানেই পড়ে থাকবে মুরলী।

সেই মুরলী আজ এখন ওই মধুকুপির একটা মাটির ঘরে ঘুমিয়ে পড়ে আছে। মধুকুপি বদলায় নি, মুরলীই বা বদলাবে কেন? মুরলীর বয়সটা আঠার থেকে তেইশ হয়েছে, এই মাত্র। কাঁচপোকার টিপ কপালে লাগিয়ে কেমনটি হাসত মুরলী! আজও কাঁচপোকার টিপ পরে তো মুরলী?

ওই তো ওই জমাট অন্ধকার হলো কপালবাবার জঙ্গল। বাতাসটা ঠাণ্ডা। ডরানির স্রোতের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। এইবার ডান দিকে একটু ঘুরে গেলেই মধুকুপির ডাঙা কাছে এসে পড়বে।

দাশু ঘরামির পথ চলার আবেগ হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খায়। একটা নতুন বিস্ময়ের আঘাত। এই সড়ক তো ঠিক সেই সড়ক নয়। লাল কাঁকর আর ধুলোয় ভরা থাকত যে সড়কটা, সেটা এরকম ভরাট আর শক্ত হয়ে গেল কেমন করে? কালো কাতরা ঢেলে সড়কটাকে পাকা করা হয়েছে বলে মনে হয়। ধুলো নেই। লড়াইয়ের সময় এই সড়ক দিয়ে গোরা পল্টন কতবার কাতার দিয়ে যাওয়া-আসা করেছে। ঢেঙা ঢেঙা, হট্টাকাট্টা, সাদা সাদা আদুড় গা ; যত আমরিক গোরা।

এই সড়কটাই তো দাশু ঘরামির সেই মাটির ঘরের গা ঘেঁষে চলে গিয়েছে। আজও ভুলে যায় নি দাশু, কী ভয়ানক উৎপাতের দিনই না গিয়েছে, কানারানীর উৎপাতের চেয়েও ভয়ানক মানুষখেগো উৎপাত। ঘরের দরজা সব সময় বন্ধ করে রাখতে হত। দরজার কাছে এক মিনিটও নিশ্চিন্ত মনে দাঁড়াবার সুযোগ পেত না মুরলী। পল্টনের দল আসছে আর যাচ্ছে। সাঁজোয়া গাড়ি যায়। ঝনঝন শব্দের হুল্লোড় তুলে লোহার জানোয়ারের মত এক-একটা ট্যাঙ্ক যায়। রামগড়ের দিক থেকে আসে, আর কোথায় যে চলে যায় কে জানে? আবার কোথা থেকে যেন আসে, আর রামগড়ের দিকে চলে যায়। মুরলীর শাড়ির আঁচলটা, মুরলীর খোঁপার ছায়াটাও যদি ভুল করে দরজার কপাটের আড়াল থেকে বের হয়ে পড়ত, তবে সেই মুহূর্তে পল্টনের মুখ থেকে কী ভয়ানক লুব্ধ একটা আহ্লাদের আওয়াজ উথলে উঠত। সেই পুরনো জামকাঠের জীর্ণ দরজার কপাটের উপর কতবার ঝুপঝাপ করে লুটিয়ে

পড়েছে গোরা পল্টনের মতলবের যত উপহার—চকোলেটের প্যাকেট, এক গাদা লেবেনচুষ, সিগারেটে ভরা ডিবে, এঁটো মদের বোতল। মুরলী সেই সব জিনিস কোনদিন পা দিয়েও ছোঁয় নি।

থমকে দাঁড়ায় দাশু। হঠাৎ গা ছমছম করে উঠেছে। মনের ভিতরেও একটা কাঁপুনি যেন সিরসির করে। ছোটকালুর মাথার উপরে চাঁদ উঠেছে দেখা যায়।

চাঁদের আলোতে অনেক কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু চিনতে পারা যাচ্ছে না। কি এগুলি? কোথায় ছিল? কেমন করে কেন এল? মধুকুপির ডাঙার দূরকিনারায় ওসব কিসের ইমারত গড়ে উঠেছে? ডরানির এই স্রোতটার উপর পুল বাঁধা হল কবে? এদিকে ওদিকে এত রাস্তা কেন? কোন্ দিকে কার কাছে ছুটে গিয়েছে কালো সাপের মত কিলবিলিয়ে এইসব রাস্তা? অনেক দূরে ধোঁয়া ছাড়ছে একটা চিমনির মুখ। তবে কি ওখানে কারখানা হয়েছে?

না, ঠিক সে মধুকুপি নয়। ডরানির ভাদুরে জলের ঢলে মধুকুপির ডাঙা বোধহয় আর ভেসে যায় না। বোধহয় বড়কালুর মাথার উপর বাজ পড়ে না ; পোড়া ঘাসের বন থেকে গরম ধোঁয়া আর ফুরফুর করে ওড়ে না। জোরে হাঁপ ছাড়তে গিয়ে দাশুর হতাশ নিশ্বাসটা কেঁপে ওঠে।

তা হলে কি মুরলীর মুখের হাসিটাও বদলে গিয়েছে? কে জানে কেমন করে এই পাঁচটা বছর নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে মুরলী। জেলে যাবার আগে মুরলীর হাতে পাঁচটা টাকাও রেখে আসে নি দাশু। দাশুর বুকের উপর মাথা রেখে রোজ ঘুমিয়ে পড়ত যে নরম-সরম মুরলী, সে এই পাঁচটা বছর নিজেকে একেবারে পাথরের মত শক্ত করে নিয়ে গতর খাটাতে পেরেছে কি? গরু চরিয়েছে? কাঠ ভেঙেছে? জঙ্গলের তেঁতুল কুড়িয়ে হারানগঞ্জের হাটে গিয়ে বেচে এসেছে? কিংবা গোবিন্দপুরের কোন বাবুর বাড়িতে দাই খেটেছে? তা না হলে মুরলী বেঁচে থাকবে কি করে?

ভয়ে ছমছম শরীরটা এইবার ছটফট করে ওঠে ব্যস্তভাবে, প্রায় দৌড়ে দৌড়ে চলতে থাকে দাশু।

ঘুমন্ত মধুকুপির পিপুলের ছায়ার কাছে এসে পড়ে দাশু। দাশুর অনেক চেনা সেই পিপুল, গাঁয়ে ঢুকবার পথে আগেভাগে যেটা পাহারাদের মত দাঁড়িয়ে আছে। পিপুলের কাছে দুখন গুরুজীর বাড়ীটাও আছে। হ্যাঁ, গুরুজীর বাড়ির সামনে সিমেন্ট-বাঁধানো একটা চাতাল দেখা যায়। বাঃ, গুরুজীর সুখ আরও জমাট হয়েছে মনে হয়।

দাশু ঘরামির ঘর। সেই পাঁচ হাত উঁচু মাটির দেয়াল, খাপরার চালা, আর পুরনো জামকাঠের একটা দরজা। পাঁচ বছর আগে সেদিন কোমরে দড়ি বাঁধা দাশু ঘরামি পুলিসের সঙ্গে চলতে চলতে অনেক দূর গিয়েও একবার থমকে দাঁড়িয়ে পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছিল। হ্যাঁ, তখনও এই দরজার কাছে একঠায় দাঁড়িয়ে ছিল মুরলী। ওই সেই কপাট, যার গায়ের উপর কতবার নেকড়ের আঁচড় পড়েছে। আর, শব্দ শুনে ভয় পেয়ে দাশুকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছে মুরলী।

আর সেই দেড় বিঘে জমি? সেটা কোথায় গেল? চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে দাশু ; দেখতে দেখতে দুই চোখ কাঁপিয়ে একটা জ্বালা ফুটতে থাকে। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, যেন বুক চিরে হাঁ করে পড়ে আছে সেই দেড় বিঘে জমি। সারি সারি কতগুলি গর্ত। গর্তের মধ্যে ছোট ছোট ঝোপ, বোধহয় শিয়ালকাঁটার ঝোপ। আর ইঁটের পাঁজার যত টুকরো টুকরো হাড়-গোড়, গুঁড়ো গুঁড়ো ঝামা আর ঝুনো ছড়িয়ে পড়ে আছে।

বদলে গিয়েছে মধুকুপি। দাশু ঘরামির জেলখাটা শক্ত শরীরের পাঁজরগুলি যেন হাঁ করে

তাকিয়ে ধুঁকতে থাকে। তার পরেই চমকে ওঠে দাশু। ঘরের ভিতর আলো জ্বলছে মনে হয়। জেগে আছে মুরলী? একটা শব্দও শোনা যায়, ঘর্‌ঘর্‌ ঘর্‌ঘর্‌ অদ্ভুত শব্দ। এত রাত্রে কোন্ শব্দের সঙ্গে খেলা করছে মুরলী? কিসের এত আহ্লাদ?

হাত তুলে দরজার কপাট কাঁপিয়ে একটা ধাক্কা দেয় দাশু ঃ আমি এসেছি মুরলী। দরজা খোল।

খুলে যায় দরজার কপাট। কিন্তু ঘরের ভিতরে ঢুকেই একেবারে স্তব্ধ হয়ে বোবার মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে দাশু। মুরলীর কপালে কাঁচপোকার টিপ নেই, যদিও মুখ টিপে হাসছে মুরলী।

দাশু ঘরামির সাধের মুরলী নয়। পাঁচবছর ধরে জেলের জীবনে রোজ ভোরে ঘুম থেকে উঠে মুরলীর যে চেহারাটা মনে পড়েছে, সে চেহারা নয়। হারানগঞ্জের গির্জাবাড়ির মেয়েদের মত ঢং করে শাড়ি পরেছে মুরলী। গায়ে নতুন রকমের জামা, ঈশানবাবুর মেয়েরা যে-রকমের জামা গায়ে দেয়। মুরলীর পায়ে চটিজুতা। আর, বিছানাটা যেন বাইজী-নাচের বড়বাবুর বসবার আসর ; মোটা নরম তোশকের উপর সাদা ধবধবে চাদর আর মোটা মোটা বালিশ। কাঠের দুটো চারপায়াও আছে ঘরের ভিতরে। তার একটার উপর ছোট একটা কল। এই কলটাই বুঝি এতক্ষণ ধরে ঘর্‌ঘর্‌ করছিল!

তাই তো, সবচেয়ে বেশি বদলে গিয়েছে দাশু ঘরামির ঘরণী মুরলী। ডরানির স্রোতের উপর নতুন পুল দেখে আশ্চর্য হয়েছিল দাশু। কিন্তু কী ভয়ানক আশ্চর্যের জিনিস সেই মুরলীর এই চেহারা! দাশু ঘরামির চোখের ফ্যালফ্যালে বিস্ময় আস্তে আস্তে কটকট করে জ্বলতে থাকে। চেঁচিয়ে ওঠে দাশু—বেঁচে আছিস মুরলী?

মুরলী হাসে ঃ দেখতেই পাচ্ছ।

হাতের পুঁটলিটাকে একটা আছাড় দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় দাশু। ফুলেল তেলের আর আলতার শিশি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। তেল আর আলতার ধারা মিশে গিয়ে গাঢ় রক্তের ধারার মত ঘরের মেজের উপর গড়াতে থাকে।

—কি হলো? ভ্রূকুটি করে প্রশ্ন করে মুরলী।

—তোর কি হল, সেটা আগে বল।

—আমার আর কি হবে? যা দেখছো তাই। বেঁচে আছি।

—কিন্তু তুই কি আছিস?

—আছি।

—না, হতে পারে না। তুই গিয়েছিস।

—গালি দিও না।

—গালি তো ভাল। এখনও যে টাঙ্গি হাতে তুলি নাই সেটা তোর বাপ মহেশ রাখালের কপালের জোর।

—কি বললে?

—ঠিক বলেছি।

—তোমার চোখ নাই।

—চোখ আছে, খুব ভাল চোখ আছে, সবই দেখছি।

দাশুর চোখের চেহারা দেখে থরথর করে কেঁপে ওঠে মুরলী। হ্যাঁ, কটকট করে তাকিয়ে মুরলীর শরীরটাকে যেন তন্নতন্ন করে দেখছে দাশু। আর, দাউ দাউ করে জ্বলছে চোখভরা সন্দেহ।

—আমি এখনি এই ঘরে আগুন লাগাবো। তোর ওই সাধের কল আছাড় মেরে ভাঙবো। কিন্তু তার আগে...।

ক্ষেপা নেকড়ের মত একটা লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে এক হাতে মুরলীর শাড়ির আঁচলশক্ত করে চেপে ধরে দাশু ঃ তাব আগে আমি দেখবো।

মুরলী বলে--কি দেখবে?

দাশু--দেখবো, সব দেখবো। এত ফুলেছিস কেন? তোর কোমর এত মোটা হলো কেন? তোর পেটে...।

মুরলী--সাবধান বলছি।

মুরলীর শাড়ির আঁচলটাকে দুহাতের আক্রোশ দিয়ে হিংস্রভাবে ধরে নিয়ে জোরে একটা টান দেয় দাশু। মুরলীও দু হাত দিয়ে শাড়ির আঁচল জড়িয়ে মেজের উপর বসে পড়ে।

—তুই নষ্ট হয়েছিস। গর্জন করে দাশু।

—তুমি পাগল হয়েছ! দাশু ঘরামির মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে উত্তর দেয় মুরলী।

--আমি পাগল হই নাই, কিন্তু তুই খুব চালাক হয়েছিস।

মুরলীর সেই একজোড়া বেহায়া চোখের দিকে জখমী জানোয়ারের মত হিংস্রভাবে তাকিয়ে আর দাঁত দিয়ে পিষে পিষে কথা বলে দাশু। চোখে পড়ে, মুরলীর খোঁপাটা লাল ফিতে দিয়ে শক্ত করে বাঁধা, তার মধ্যে আবার ছোট ছোট বেলকুঁড়ি কাঁটা গাঁথা রয়েছে।

এক হাত ছুঁড়ে দিয়ে, যেন থাবা দিয়ে মুরলীর খোঁপাটাকে চেপে ধরে দাশু। খোঁপা ভেঙে যায়, বেলকুঁড়ি কাঁটা ঝরে পড়ে। তারপর একটা লাফ দিয়ে সরে এসে ঘরের দেয়ালের খোপে হাত দিয়ে কি-যেন খোঁজে দাশু। আবার সরে গিয়ে চালার গোঁজের ভিতর হাত চালিয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় মুরলী। ভাঙা খোঁপাকে শক্ত করে বেঁধে নিয়ে আর চোখের চাহনিকেও অদ্ভুত এক দুঃসাহসে শক্ত করে নিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।—টাঙ্গি খুঁজছো?

দাশু—হ্যাঁ।

মুরলী--কেন?

দাশু—তোকে বলি দিব।

মুরলী—হোই দেখ, ঝুড়িটার পিছনে তোমার টাঙ্গি।

টাঙ্গি হাতে তুলে নেবার জন্য এগিয়ে যেতে গিয়েই হঠাৎ যেন চমকে ওঠে দাশু। থমকে দাঁড়ায়, মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে—এত ডাঁট কেন রে মাগি?

মুরলী—কেন ডাঁট হবে না? আমি তোমার পল্টনী দিদি নই।

দাশু ঘরামির হাতের দুঃসাহস যেন আঁতকে ওঠে। মুরলী যেন পাথুরে ঢেলার মত শক্ত একটা ধিক্কার ছুঁড়ে মেরেছে, সঙ্গে সঙ্গে জব্দ হয়ে গিয়েছে দাশু ঘরামির পাগলাটে সন্দেহ।

পল্টনী দিদি নই? কি বলতে চায় মুরলী? সারা মধুকুপির মধ্যে শুধু এক পল্টনী দিদির ঘরে এইরকম শখের বিছানা আছে। এইরকম নরম তোশক, মোটা মোটা বালিশ, আর নকশাদার চাদর। এখান থেকে আধ ক্রোশও হবে না, মাঠান কুলের ছোট জঙ্গলটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে এক বুড়ো পাকুড়ের ছায়ার কাছে পল্টনী দিদির ঘর। ওই ঘর একটা জাতছাড়া ঘর। গ্রেপ্তার হয়ে দড়ি-বাঁধা কোমর নিয়ে ভেলকিওয়ালার বাঁদরের মত পুলিসের সঙ্গে পথ হেঁটে চলে যাবার সময়, সেই পাঁচ বছর আগের এক সকালবেলাতে দেখতে পেয়েছিল দাশু, পল্টনী দিদি তার ঘরের দরজার সামনে বসে তালপাতার পাখা বাঁধছে। আর, পল্টনী দিদির গোরা-গোরা চেহারার সেই দোগলা ছেলে দুটো—সেই মোটা আর কটা, ছাগলছানার সঙ্গে খেলা করছে।

তা হলে পল্টনী দিদিও আছে? চলে যায় নি, মরেও যায় নি পল্টনী দিদি।

দশ বছর আগে পাঁকুড়তলার ওই নারীকে কেউ পল্টনী দিদি বলে ডাকত না। ওই ঘরের কাছে আরও তিন-চারটে ঘর ছিল। চার ঘর শিয়ালগীর—ভুতন, লেদু, লকাই আর ভরত ;

শিয়াল মেরে, শিয়ালের চাম বেচে, আর মাগ-ছেলে সবাই মিলে হাঁড়িয়া খেয়ে দিনরাত নেশা করে বেশ সুখেই ওরা থাকত। রোজই সন্ধ্যা হলে যখন কুলের জঙ্গলের আশেপাশে হুয়া হুয়া শিয়ালের ডাক বেজে উঠত, তখন এই ঘরের ভিতরে বসে হেসে হেসে কত ঢলাঢলি করেছে দাশু আর মুরলী। কী সুন্দর শিয়াল ডাকছে ভরত আর ভুতন!

মুরলী হেসে হেসে দাশুর অনুমানের ভুল শুধরে দিত, ভরত আর ভুতন নয়, ভরত আর বাতাসী।

ভরতের বউ সেই বাতাসীর পুরনো নাম মুছে গিয়েছে। সেই বাতাসীই হল আজকের মধুকুপের পল্টনী দিদি।

ঠিক সেই লড়াইয়ের সময়, গাঁয়ের লোকের মনের ভুলে একবার দু মাসের মধ্যেও একটা পূজা পায় নি কপালবাবা। এমন কি, জেঠুয়া অমাবস্যায় কপালবাবার আসনের কাছে যে একটি ডাগর সাদা ছাগ বলি দেবার নিয়ম ছিল, তাও ভুলে গিয়েছিল সবাই। বড় ব্যস্ত ছিল সবাই। লড়াইয়ের মাল চালানের যত ঠিকাদার এসে গাঁয়ের মানুষের হাতে হাতে দাদন ছড়িয়ে দিয়েছিল। এত পয়সা জীবনে দেখে নি মধুকুপি। শুধু ডরানির বালু তুলে গো-গাড়ি বোঝাই কর আর বাবুরবাজারে ঠিকাদারের মোটর ট্রাকের কাছে ফেলে দিয়ে এস। দিনে এস, রাতে এস। কোন অসুবিধা নেই। ঠিকাদারের লোক নগদ নগদ ঢোলাই মিটিয়ে দেয়।

সেই সময় ভয়ানক রাগ করেছিল কপালবাবা। আর, এক মাসের মধ্যে মধুকুপির পঞ্চাশেরও বেশি মানুষের প্রাণ কলেরায় শেষ হয়ে গেল। ছেলে বুড়ো জোয়ান, মাগি আর মরদ, সব লাস ওই ডরানির জলে ফেলে দিতে হয়েছিল। কিছু ভেসে গিয়েছিল, কিছু শেয়ালে খেয়েছিল, খুঁজলে বোধহয় ডরানির বালুর কোন গর্তে আজও দু-একটা খুলি পাওয়া যাবে।

সেই কলেরাতে শেষ হয়ে গেল ওই চার-ঘর শিয়ালগীরের সংসার। শুধু রইল বাতাসী। ভরতের রাঁড়ি বউ বাতাসী।

কপালবাবার রাগ শান্ত হল তখন, যখন ডরানির ভাদুরে ঢলে ভাঙার সব কোদো ধান ভেসে গেল, আর কুলের জঙ্গলে সব লা-এর ফেকড়ি পচে গেল। আর, শুরু হল লাল কাঁকরের সড়ক দিয়ে গোরা পল্টনের যাওয়া-আসা ; গান গেয়ে, শিশ বাজিয়ে, সড়কের ধুলো উড়িয়ে দিনরাত ছুটে যায় আর আসে, আসে আর চলে যায় পল্টনের গাড়ি। একদিন এই ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে চিৎকার শুনতে পেয়েছিল দাশু—গোরা পড়েছে, গোরা পড়েছে, বাতাসী দিদির ঘরে গোরা পড়েছে।

গাঁয়ের তিন-চারটে গরু-চরানী মেয়ে চিৎকার করতে করতে ছুটে চলে যেতেই টাঙ্গি হাতে তুলে নিয়েছিল দাশু। দাশু ঘরামি ছাড়া সেসময় মধুকুপির ঘরে ও ক্ষেতে কোন পুরুষও বোধহয় ছিল না। যাই হোক, শেষে কিন্তু টাঙ্গিটাকে অলসভাবে কাঁধের উপর রেখে আর হেঁটমাথা হয়ে দাশুকে আস্তে আস্তে হেঁটে আবার ফিরে আসতে হয়েছিল।

—কি হলো? আতঙ্কিত চোখ নিয়ে প্রশ্ন করেছিল মুরলী।

—সলজারের হাত ধরে বাতাসী হাসছে। ডুবেছে, মরেছে, নরকে গিয়েছে বাতাসী। বলতে বলতে টাঙ্গিটাকে উঠানের একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল দাশু।

যে বাতাসীকে, যে কলঙ্কিনীকে পল্টনী দিদি নাম দিয়েছে গাঁয়ের লোক, তার ঘরের সুখের চেহারাটা দু-তিন মাসের মধ্যেই কেমনতর পাল্টে গিয়েছিল, তা-ও কারও অজানা নয়। একবার দেখতে পাওয়া গিয়েছিল, মস্ত বড় একটা ঘাগরা পরে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে পল্টনী দিদি। ঘরের দাওয়ায় বসে মাঝে মাঝে গানের একটা কলও বাজাত।

কোন লজ্জা নেই, কোন আক্ষেপ নেই ; পল্টনের গাড়ি সড়কের উপর থামলেই ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে ফিক করে হেসে উঠত পল্টনী দিদির। তিনটে বছর যেতে না

যেতেই দুটো ছেলে হল পল্টনী দিদি। সোনা রঙের চুল, ধবধবে ফরসা, আর কটা চোখ—দুটো ছেলে। পল্টনী দিদির প্রাণটাও যেন আহ্লাদে মুখর হয়ে ছেলে দুটোকে দুটো আদুরে নাম দিয়েছিল—মোটা আর কটা।

গরু-চরানী মেয়েরা পাকুড়তলার কাছ দিয়ে যেতে যেতে কতবার তাকিয়ে দেখেছে, ঘরের দাওয়ার উপর শখের বিছানা পেতে শুয়ে আছে পল্টনী দিদি। আর মোটা ও কটাকে বুকের উপর চড়িয়ে ছড়া গাইছে।

গরু-চরানী মেয়েরা চেঁচিয়ে গালি দিত—মর মর মাগি সলজারভাতারী বিস্কুটখাগী। কপালবাবা তোকে নেয় না কেনে?

পল্টনী দিদি উঠে বসত, আর গরু-চরানী মেয়েদের মনকে রাগকে আরও জ্বালিয়ে দিয়ে ফিক করে হাসত।

এহেন পল্টনী দিদির নাম করে মুরলী এখন যে ধিক্কার দিয়ে দাশু ঘরামির সন্দেহটাকে চমকে দিয়েছে, সেই ধিক্কারের অর্থ বুঝতে চেষ্টা করতে গিয়ে দাশু ঘরামির পাগলাটে চোখ হঠাৎ নরম হয়ে ফ্যালফ্যাল করে।

মুরলীর শাড়িটা কোমর থেকে প্রায় খসে পড়ে গিয়েছে। দেখতে পায় দাশু, শাড়িব আড়ালে একটা সায়াও আছে। মুরলীর সায়াটার দিকে অপলক চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে দাশু ; চোখের কোণে একটা সন্দেহের বেদনা আবার ঝিকঝিক করে জ্বলতে থাকে।

চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী—আমি তেতরি ঘাসিন নই।

আবার চমকে ওঠে দাশু, কারণ, মুরলী আবার মধুকুপির একটা কলঙ্কের নাম ক'রে দাশু ঘরামির গেঁয়ো অহংকারের উপর যেন আর-এক ঠাট্টার পাথর ছুঁড়ে মেরেছে।

মিঠুয়া ঘাসীর বউ সেই তেতরি ঘাসিনও বেঁচে আছে তা হলে। মনে পড়ে দাশুর, গ্রেপ্তার হয়ে এই গাঁ থেকে চলে যাবার সময় বাবুরবাজারের দিকে যেতে যেতে হলুদ রঙের ডাকবাংলাটার কাছে এসে পৌঁছতেই তেতরি ঘাসিনকে দেখতে পেয়েছিল দাশু। ঘাসের বোঝা মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তেতরি। ছোট ময়লা একটা ছেঁড়া শাড়ি গায়ে জড়ানো। একটা গামছা কোমরে জড়িয়ে ছেঁড়া-ছেঁড়া শাড়ির ফাঁকগুলিকে ঢাকা দিয়েছে তেতরি। তেতরি উল্কিকাটা গলা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। ভুলে যায় নি দাও, সেদিন দাশুর কোমরে দড়ি বাঁধা দেখে চমকে উঠেছিল, আর হাত তুলে চোখের জলও মুছেছিল তেতরি ঘাসিন।

শুধু কপালবাবার জঙ্গল নয়, পাঁচ ক্রোশ দূরে ওই যেখানে ডরানি এসে মস্ত বড় একটা ঝরনা হয়ে দামোদরের বুকে আছাড় খেয়ে পড়েছে, সেই চিত্রপুরের জঙ্গলেরও বুকের ভিতরের সব খবর রাখত তেতরির স্বামী মিঠুয়া ঘাসী। গোবিন্দপুরের বাবুরা জানত, হারাণগঞ্জের গালাকুঠির সাহেবরা জানত, এদিকের আর ওদিকের সব থানা আর সব ডাকবাংলা জানত, মধুকুপির মিঠুয়া ঘাসীর মত ওস্তাদ খোঁজি এই তল্লাটে আর-কেউ নেই। জঙ্গলের কোথায় কোন্ ঘাসের ভিড়ে সম্বর চরে বেড়ায়, নতুন ভালুক এসে ডেরা নিয়েছে কোন্ মহুয়ার কাছে, কোথায় কোন্ জলার কাছে নোনা মাটি চাটতে আসে ডোরাকাটা বাঘ ; কত শিকারীকে খোঁজ দিয়েছে আর ঠিক ঠিক পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে মাচান বাঁধবার ঠিক জায়গাটি বুঝিয়ে দিয়েছে মিঠুয়া। মিঠুয়া যেন জঙ্গলের বাতাস শুঁকে জানোয়ারের গায়ের গন্ধ বুঝতে পারত ; ভালুক না সোনাচিতা? নেকড়ে না বনবিড়াল? ছেঁড়া লতার চেহারা দেখে, চিবানো পাতার চেহারা দেখে বলে দিত মিঠুয়া, এটা বড় হরিণ নয় ; ছাগলা হরিণ।

সেই মিঠুয়াকে শেষ দেখতে পেয়েছিল গাঁয়ের লোক, দাশু ঘরামিও দেখেছিল, বড়দিনের সময় রাতের বেলায় পুলিস সাহেবকে কপালবাবার জঙ্গলে শিকার খেলাতে নিয়ে গিয়ে সকালবেলা জঙ্গল থেকে যখন বের হয়ে এল মিঠুয়া। জ্যান্ত মিঠুয়া নয়, মরা মিঠুয়া। চারজন

সাঁওতাল কুলি, যারা পুলিস সাহেবের তাঁবু বয়ে নিয়ে জঙ্গলের ভিতরে গিয়েছিল, তারাই লতা দিয়ে বাঁধা মিঠুয়ার রক্তমাখা লাস কাঁচা বাঁশে ঝুলিয়ে নিয়ে গোবিন্দপুর থানার দিকে চলে গেল। হ্যাঁ, সেই ভালুকটার লাসও ছিল, পুলিস সাহেবের গুলি খেয়ে মরার আগে মিঠুয়া ঘাসীর মাথার খুলি একটি থাবা দিয়ে চিরে আঁচড়ে একেবারে নামিয়ে দিয়েছিল।

তেতরি ঘাসিনের সেদিনের চেহারাটাও মনে পড়ে। সাঁওতালদের কাঁধের কাঁচা বাঁশে ঝোলানো মিঠুয়ার সেই লাসের পাশে পাশে হেঁটে, গুন গুন ক'রে কাঁদতে কাঁদতে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল তেতরি। গাঁয়ের লোকই শেষে বাধা দিয়ে তেতরিকে থামিয়েছিল : আর মিছা কেন যাচ্ছিস তেতরি? এবার ঘরে ফিরে যা।

সেদিন ভরানির স্রোতের কাছে গিয়ে হাত দুটোকে পাথরের উপর আছড়ে আছড়ে গালার মোটা মোটা বালা দুটোকে ভেঙে আর স্নান করে ঘরে ফিরেছিল মিঠুয়া ঘাসীর রাঁড়ি বউ তেতরি।

তারপর ওই হলুদ রঙের ডাকবাংলার দাবী মেটাতে গিয়ে নিশির ডাকের মত এক-একটা ডাক শুনতে শুনতে তেতরি ঘাসিন কবে আর কেমন করে বদলে গেল, সে খবরও গাঁয়ের লোকের টের পেতে বেশি দেরি হয় নি। ওই ডাকবাংলাতে কত শখের টুরিস্ট আসে, তদন্তের অফিসার আসে, কলকাতা থেকে শিকারী আসে। ডেকচি-ভরা মুরগীর কারি আর বোতল-ভরা মদ সামনে রেখেও ডাকবাংলার রাতের অতিথি উৎকট ক্ষুধায় ছটফট করে। খানসামাকে কাছে ডেকে এনে ফিস ফিস করে ঃ আর একটা জিনিস চাই যে খানসামা। পাওয়া যাবে?

—চেষ্টা করলে পাওয়া যেতে পারে হুজুর।

—ভাল বকশিশ দেব, চেষ্টা কর।

—বহুৎ আচ্ছা হুজুর।

—দেখো, জিনিসটা যেন ভাল হয়।

—নিশ্চয় হুজুর।

খানসামার সাইকেল ছুটে চলে যায়, আর তেতরি ঘাসিনের ঘরের দরজার কাছে এসে ঘণ্টি বাজিয়ে ডাকবাংলার রাতের বকশিশের আহ্বান শুনিয়ে দিয়ে যায়। দরজার কপাটে শিকল তুলে দিয়ে রওনা হয় তেতরি। গায়ে জ্বর থাকলেও এক ক্রোশ পথ হেঁটে সেই ভয়ানক অভিসারে যেতে হয়। গাঁয়ের কে না জানে, সারা মাসের মধ্যে অন্তত তিন-চারটে দিন এইভাবে রাতের বেলা ঘর থেকে বের হয়ে ডাকবাংলার এক-একটা মাতাল লালসার ছোবল খেয়ে শরীরটাকে বিষিয়ে ঘরে ফেরে তেতরি। দেখেছে গাঁয়ের লোক, ডাকবাংলার বকশিশের আহ্বানে ঘর থেকে চলে যাবার সময় কেমনতর সাজ করে তেতরি ঘাসিন। একটি লাল রঙের সায়া পরে।

দাশু ঘরামির ঘরের ভিতরে রেড়ির তেলের মেটে প্রদীপ মিটমিট করে। লুটিয়ে-পড়া শাড়িটাকে হাতে তুলে নিয়ে আবার গায়ে জড়াতে থাকে মুরলী। মুরলীর লাল সায়াটা দোলে। দাশু ঘরামির চোখের সন্দেহ নতুন বিস্ময়ে দুলতে থাকে ; না না না, সেরকম কিছু নয়। তেতরি ঘাসিনের যে লাল সায়াতে ঘৃণার দাগ লেগে থাকে, যে সায়াকে ছাই-কাচা করেও ঘরের বেড়ার উপর মেলে দিতে লজ্জা পায় তেতরি, মুরলীর এই সায়া সেরকম সায়া নয়।

ঘরের চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখতে থাকে দাশু। ঝুড়িতে মকাইয়ের দানা আছে, মাটিরে সেই সরাগুলিও আছে। এই সব পুরনোর মধ্যে একেবারে নতুন ও দুর্লভ একটা নতুন জিনিসও আছে। সরার মধ্যে কয়েকটা আলু।

শাড়িটাকে শক্ত করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে মুরলী তেমনই অদ্ভুত এক অহংকারের আবেগে

বলে ওঠে—আমি ফুলকি মাসি নই।

আর-এক ধিক্কার! মধুকুপির আর-একটা কলঙ্কের কাহিনীকে খুঁচিয়ে দিয়ে দাশু ঘরামিকে ভয়ানক একটা ঠাট্টা করেছে মুরলী।

তেজ-মরা সাপের মত মাথাটাকে আস্তে আস্তে ঢুলিয়ে তারপর কাত করে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে দাশু। সেই ফুলকি মাসিও আছে তা হলে ; দাশু ঘরামির সৎভাইয়ের আপন মাসি, সেই ফুলকি। ঈশান মোক্তারের ঘরে বাতি জ্বালতে যায়, যে ফুলকি। ঈশান মোক্তারও নিশ্চয় আজও আদালতের ছুটির দিনে মধুকুপিতে তার সম্পত্তির চেহারা দেখতে আর হিসেব নিতে, বকেয়া খাজনা তসীল করতে, পরবের ভেট নিতে, আর ফসলের ভাগ নিতে আসেন।

ঈশান মোক্তারের একটা কুঠি আছে মধুকুপিতে, সেই কুঠির কাছে পঞ্চাশ জোড়া বলদের একটা খাটাল আছে। এটাও ঈশান মোক্তারের সম্পত্তি। সেই খাটালের চারদিকে সারি সারি খড়ের মাচান, মাচানের ফাঁকে ফাঁকে এদিকে-ওদিকে গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে থাকে যেসব গো-গাড়ি, সেগুলিও ঈশান মোক্তারের সম্পত্তি। যেমন ঈশান মোক্তারের জমিতে, তেমনি ঈশান মোক্তারের এই সব গো-গাড়িতে মধুকুপির গাঁয়ের মানুষ মনিষ খাটে। অনেকে আবার আধিয়া খাটে। ঈশান মোক্তারের জমিতে নিজের বীজ লাঙ্গলে ক্ষেত করলে যেমন মকাই কুরথি কোদো আর অড়হরের আধ ভাগ, তাঁর গো-গাড়িতে খাটলে তেমনই ঢোলাই মজুরির আধ ভাগ তাঁকে দিতে হয়। ঈশান মোক্তারের বড় গোমস্তা দুখন গুরুজী আর দুজন মুহুরি খাতা হাতে নিয়ে কুঠির দাওয়ার উপর বসে হিসাব লেখে আর চিঠা ছাড়ে।

বছরের যে ক'টা দিন মধুকুপির কুঠিতে এসে ঠাঁই নেন ঈশান মোক্তার, সেই ক'টা দিন ফুলকি মাসির জীবনটাও একটু বেশি ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ফুলকির স্বামী, সেই বেকুব খোঁড়াটা, সেই তিনকড়িও ব্যস্ত হয়ে ওঠে। নিজেই ড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঈশান মোক্তারের কুঠিতে যায়, দণ্ডবৎ করে, তারপর ঈশান মোক্তারেব দয়াব উপহার চাল ডাল আলু আর মাটির খুরিতে দু-চার ছিটে নারকেল তেলও নিয়ে, আবার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘরে ফিরে আসে।

ফুলকির জন্য কুঠির ভাণ্ডার থেকে মাসোয়ারী সিধা বরাদ্দ করা আছে। তা ছাড়া এক বিঘা বেলে জমি ফুলকিকে খয়রাত করেছেন ঈশান মোক্তার। বছরের অন্তত বিশটা দিন, রুক্ষ চুলের বোঝা খুলে মেলে দিয়ে নারকেল তেল মাখে ফুলকি। তারপর রান্না করে, খিচুড়ি আর আলু-হলুদ। সারা মধুকুপির মধ্যে একমাত্র ফুলকি মাসি ছাড়া আর কোন কিষাণ-কিষাণীর জীবনে আলু খাওয়ার সৌভাগ্য এখনও হয় নি। গোবিন্দপুরের গোল আলু অনেকে শুধু চোখে দেখেছে এই মাত্র।

ঠিক যখন সন্ধ্যা হয়, ওদিকে ঈশান মোক্তার যখন তাঁর কুঠির একটি ঘরের নিরালায় মাদুরের উপর গড়িয়ে পড়েন, এদিকে ফুলকি মাসি তখন হেসে হেসে তিনকড়ি খোঁড়ার হাতের কাছে খৈনির ডিবা এগিয়ে দিয়ে বলে—যাই, মোক্তারের ঘরে বাতি জ্বেলে আসি।

গাঁয়ের চোখ অন্ধ নয় ; গাঁয়ের বুদ্ধিশুদ্ধিও বেকুব তিনকড়ির মত খোঁড়া হয়ে যায় নি। অনেক রাত করে যখন কুঠি থেকে ঘরে ফেরে ফুলকি, তখন গাঁয়ের কেউ-না কেউ দেখে ফেলে, পা টলছে ফুলকির।

—ভাল বাতি জ্বালছিস ফুলকি! একদিন ঠাট্টা করেছিল নটবর।

—এ মাগিকে কপালবাবা মরাবে কবে? গালি দিয়েছিল হরিশ।

কিন্তু গাঁয়ের এই সব ভীরু-ভীরু ধমক ঠাট্টা আর ধিক্কারকে একটুও ডরায় নি ফুলকি। দাশু ঘরামির ফুলকি মাসি আজও হলুদ-ছোপানো কাপড় পরে, রিঠার জলে গা মাজে, আর গালার রসে নখ রাঙায়।

—আমি ঝালদার মহেশ রাখালের বেটি। চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী। মুরলীর দু চোখের তারায় অদ্ভুত এক দেমাকের তেজ ধিকধিক করে। কাত মাথা তুলে মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে

থাকে দাশু।

—মহেশ রাখালের আর দুটা বেটি কেন মরেছে, ভুলে গেছ কি? কটকট করে তাকিয়ে আবার প্রশ্ন করে মুরলী।

জানে দাশু ; মনে পড়তেই দাশু ঘরামির চোখে যেন একটা শ্রদ্ধার ব্যথা টলমল করে ওঠে। মুরলীর আরও দুটা বোন ছিল। একটা মুরলীর বড়, আর একটা মুরলীর ছোট—কুসুম আর কালিন্দী ; ওরা দেখতে মুরলীর চেয়েও সুন্দর ছিল। দুজনের বিয়েও হয়েছিল।

কুসুম মরেছে গলায় দড়ি দিয়ে, এই পৃথিবীর একটা কুৎসিত মামলার লজ্জা ও যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে। সেই মামলার আসামী ছিল চিত্রপুর জঙ্গলের চারটে গার্ড। একদিন দুপুরে জঙ্গলের মহুয়া কুড়াতে গিয়ে যেন চারটে অজগরের লোভের সামনে পড়ে গাভিন হরিণীর মত কুসুমের শরীরটাও আতঙ্কে অসাড় হয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ, ঠিকই, সেই সময় কুসুমের পেটের ভিতরেও একটা নতুন প্রাণের পিণ্ড ধুকপুক করেছিল। কিন্তু জঙ্গলের চারটে গার্ড কোন বাধা মানে নি, মিনতি শোনে নি। কুসুমের আতঙ্কিত শরীরটাকে লুঠপাট করে তৃপ্ত হয়েছিল চারটে লোভের অজগর। থানায় এজাহার দিয়েছিল কুসুম, আদালতের আসামীর কাঠগড়ায় সেই চারটে পাপীকে দেখতেও পেয়েছিল ; কিন্তু তাতে কুসুমের গায়ের জ্বালা বোধহয় মেটে নি। তাই, শেষে গলায় দড়ি দিয়ে...।

কালিন্দীর জীবনের মামলাটা একটু অন্য রকমের ; মরে যাবার পর মামলা। কালিন্দী দেখে যেতে পারে নি, কিন্তু ঝালদার মানুষ দেখেছিল ; আসামীটা গ্রেপ্তার হ'ল, চালান হ'ল আর চার মাসের মামলার পর ছাড়া পেয়ে চলেও গেল। বেশ টাকাপয়সা ছিল সেই আসামীর, এক ছোকরা কারবারী, ধুরকুণ্ডার ভাঁটিখানার ঠিকা নিয়েছিল যে ছোকরা। একজোড়া সোনার চুড়ি নিয়ে কালিন্দীর ঘরে ঢুকেছিল সেই ছোকরা। কিন্তু কিছুতেই রাজি হয় নি কালিন্দী, তাই সেই ছোকরার হাতের ছুরিতে খুন হয়েছিল কালিন্দী। লোকে বলে, মহেশ রাখালের বেটিগুলার তেজ আছে।

—মহেশ রাখালের বেটিরা পরের মরদানির থুতু গিলে না, পরের ছেইলা পেটে নেয় না। চোখ বড় করে কি দেখছো তুমি? কি ভাবছো তুমি?

মুরলীর দেমাক-ভরা কথার শব্দে কুণ্ঠিত হয়ে দাশু ঘরামির চোখ দুটো কুঁচকে ছোট হয়ে যায়। হাত তুলে চোখ মোছে দাশু আর দেখতে পায়, কই? মুরলীর সেই পাঁচ বছরের আগের চেহারা তো একটুও ফোলে নি। শাড়ির আঁচল দিয়ে কোমরটাকে শক্ত করে জড়িয়েছে মুরলী, কত সরু কোমরটা। এক হাতে এক পাক দিয়ে জড়িয়ে ধরা যায়। মিথ্যে নয় মুরলীর অভিযোগ। সত্যিই দাশুর চোখ দুটো হঠাৎ যেন অন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

—মুরলী! আস্তে আস্তে আদরের সুরে ডাক দেয় দাশু আর হাসতে চেষ্টা করে।

মুরলীর শক্ত চেহারাটাও এতক্ষণে একটু বিচলিত হয়। ঘরের কোণ থেকে খেজুর পাতার একটা চাটাই তুলে নিয়ে এসে মেজের উপর পাতে মুরলী ; অভিমানের স্বরে গলা কাঁপিয়ে বিড় বিড় করে, পাঁচটা বছর পর ঘরে ফিরে এসে নিজের মাগকে এমন করে গালি দিতে নাই।

খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর বসে এবার নিজেকেই গাল দেয় দাশু—হ্যাঁ, জেলের ভাত খেয়ে মাথাটা যেন পাগলা কুত্তার মাথার মত...।

হেসে ফেলে মুরলী। দাশুও হেসে হেসে এইবার আসল বিস্ময়ের কথাটাকে শান্তভাবে বলে—কিন্তু, বুঝতে পারি না, তুই কেমন করে...।

মুরলী হাসে—কি?

দাশু—তুই বেশ সুখে আছিস মনে হয়।

মুরলী—হ্যাঁ, কেন থাকবো না? সুখের কাজে খাটছি। পনর টাকা, বিশ টাকা কামাচ্ছি।

দাশু ঘরামির চোখের বিস্ময় আবার চমকে ওঠে ঃ কি করে? কেমন করে?

—হোই দেখ। হাত তুলে চার-পায়ার উপর রাখা সেলাইয়ের ছোট কলটাকে দেখিয়ে দেয় মুরলী।

দাশু বোকার মত তাকায় ঃ ওটা তো একটা খেলার কল বটে। পল্টনীর ঘরেও একটা গানের কল আছে।

হেসে হেসে যেন গড়িয়ে পড়তে চায় মুরলী ঃ গানের কল নয়, খেলার কল নয়, এটা একটা কাজের কল গো।

চার-পায়ার কাছে একটা কাপড়ের পুঁটলি পড়ে ছিল। হাত বাড়িয়ে পুঁটলিটাকে কাছে টেনে আনে মুরলী। পুঁটলিটাকে খুলে ফেলতেই দাশুর চোখ দুটো অপলক হয়ে, যেন আরও দুর্বোধ একটা বিস্ময়ের দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে—কাপড়ের উপর নক্সার বাহার, এসব কি রে মুরলী?

—এর নাম লেস।

—কে দিলে?

—আমি বানিয়েছি।

—তুই?

—হ্যাঁ।

—কেমন করে?

—এই কলটা চালায়ে গো।

—কল চালাতে কে শিখালে?

—সিস্টার দিদি।

—সে আবার কে বটে?

—হারানগঞ্জের গির্জাবাড়ির মেম।

—তুই গির্জাবাড়ি যাস? চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

—না, সিস্টার দিদি এখানে আসে।

—এখানে আসে?

—হ্যাঁ গো, এখানে বসে কত শোলোক গেয়েছে সিস্টার দিদি।

—খিরিস্তানী শোলোক?

—হ্যাঁ।

—তুই কি খিরিস্তান হয়েছিস? দাশু ঘরামির গলা কাঁপিয়ে একটা আর্তনাদ ঠিকরে বের হয়।

মুরলী হাসে—না।

মুরলীর সুডোল হাতটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দুটো সন্দেহ-ভরা চোখ দিয়ে কি-যেন খুঁজতে থাকে দাশু। তারপরেই যেন ডুকরে ওঠে ঃ হাতে টিকা দেগেছিস?

—হ্যাঁ।

—কেন? তোকে তো আর আমার মত জেলে গিয়ে কয়েদী হতে হয় নাই।

—সিস্টার দিদি বললে।

—হাসপাতালের ওষুধও খেয়েছিস?

—মুরলী হাসে ঃ একবার খেয়েছি বটে।

—এই সব শাড়ি-জামা পরতে, আর...।

—সব, সব, সব সিস্টার দিদি শিখালে।

—এই সব নক্সা-টক্সা...।

—সব, সব, সিস্টার দিদির লোক এসে সব কিনে নিয়ে যায়।

—কলটা পেলি কোথা থেকে?

—সিস্টার দিদি ধারে পাইয়ে দিলে।

—ধারের টাকা শুধবি কেমন করে?

—শুধে দিয়েছি।

—এক-একটা প্রশ্ন করতে গিয়ে যেন দাশুর বুকের এক-একটা পাঁজর ফেটে গিয়ে আর্তনাদ করছে। আর, প্রশ্নের উত্তর শুনতে শুনতে ধীরে ধীরে স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে বুকের নিঃশ্বাস। কী ভয়ানক বদলে গিয়েছে মুরলী!

আস্তে আস্তে গলা কাঁপিয়ে আবার প্রশ্ন করে দাশু।—তোর কি খিরিস্তান হবার সাধ হয়েছে?

মুরলী—হলে ভাল হয়।

আর চেঁচিয়ে উঠতে পারে না দাশু। বুকের ভিতরের সব নিঃশ্বাস ভীরু হয়ে গিয়েছে। ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে দাশু—কপালবাবাকে কি তোর একটুকও ডর লাগে না?

মুরলী হেসে ফেলে ঃ ডরাবো কেন গো? কি পাপ করেছি যে ডরাবো?

মুরলীর মনে আবার একটা সন্দেহ চমকে ওঠে ঃ তুই কি লিখাপড়াও শিখেছিস?

মুরলী—না ; সিস্টার দিদি বলেছে, এইবার শিখাবে।

যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে দাশুর কলিজার ধুকধুক শব্দ। মুরলীর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে ভয় করে। একান্ন টাকা পণ দিয়ে কিনে আনা মহেশ রাখালের মেয়ে নয়। ছোট একটা গামছা কোমরে জড়িয়ে, আদুড় গায়ে, দাশুর বুকের উপর লুটিয়ে পড়ত যে নারী, সে নারী নয়। মুরলীর প্রাণটাই মেমসাহেব হয়ে গিয়েছে। এই মেটে ঘরের ভিতরে শাড়ি-জামা গায়ে দিয়ে একটা শৌখিন অহংকার বসে আছে। গোবর-ঘাঁটা হাত ধুয়ে ফেললেও মুরলীর সে হাতে যে মিষ্টি গন্ধ মাখা হয়ে থাকত, ওই টিকা-দাগা আর কল-চালানো হাতে সে মিষ্টি গন্ধ মরেই গিয়েছে।

ফুলেল তেল আর আলতার ধারা গাঢ় রক্তের ধারার মত ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। এই মুহূর্তে পুলিশ এসে ঘরে ঢুকলে সন্দেহ করবে, একটা খুন হয়েছে বোধহয়। হ্যাঁ, দাশুর পাঁচ বছরের উপোসী একটা আশা খুন হয়ে গিয়েছে। এই মুরলীকে ছুঁতে ইচ্ছা করে না, ছুঁতে ভয় করে। মুরলীর সরু কোমরটাকে দেখেও কোন লোভ হয় না, সাহসও হয় না ; ওটা যে একটা বাবুমানুষের বউয়ের কোমর ; একটা দেশী মেমসাহেবের কোমর। এখন মনে পড়ে, বুঝতেও পারে দাশু, ঠিকই বলেছিল নিতাই মুদি—ঠকবি। ঠকেছে দাশু ; দাশুর বউ মুরলী জাতের বাইরে অনেক দূরে আর অনেক উপরে চলে গিয়েছে। দাশু ঘরামির চাষাড়ে হাতের যে-কোন ইচ্ছাকে এখন অনায়াসে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে পারে মুরলী। লোকের চোখে দাশুকে মুরলীর চাকর বলে বোধ হবে ; আর মুরলীও...।

সত্যিই কি তাই ভাবছে মুরলী? দাশুকে ঘরের মরদ বলে মনে করতে পারছে না? দেখতে পায় দাশু, মুরলী চুপকরে চোখ দুটোকে ভয়ানক উদাস করে দিয়ে কি-যেন ভাবছে। আর, মাঝে মাঝে নতুন গেঞ্জি গায়ে দেওয়া দাশুর রুক্ষ ও শক্ত চেহারাটাকে চোখের কোণ দিয়ে দেখছে।

দাশু বলে—কি ভাবছিস?

মুরলী—কিছু না। তুমি এবার কিছু খেয়ে নাও আর শুয়ে পড়।

দাশুর ঘাড়ের রগগুলি যেন হঠাৎ আহত হয়ে দপদপ করে ঃ কোন্ ঠাঁই শুব?

—এই তো চাটাই বিছিয়ে দিয়েছি।

—আর তুই বুঝি বিছানায় শুবি?

উত্তর দিতে গিয়ে হঠাৎ যেন ভাষা হারিয়ে বিড়বিড় করে মুরলী ঃ তা তুমি যদি রাগ কর, তবে নাই বা বিছানায় শুলাম।

—কিন্তু শুবি কোন্ ঠাঁই? মাটিতে?

—সে যেথা পারি এক ঠাঁই শুয়ে নিব আমি।

—আমার ঠাঁই শুবি না?

উত্তর না দিয়ে চুপ করে আর মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকে মুরলী। দাশু বলে—আমাকে ছুঁতে তোর আর সাধ নাই মুরলী, বটে কি না?

আবার ভয়ে ভয়ে বিড়-বিড় করে মুরলী—সাধ কেন হবে না? কিন্তু আজ নয়।

দাশু—আজ নয় কেন?

মুরলী—সিস্টার দিদি বলেছে।

দাশু—কি বলেছে?

মুরলী—তুমি কলে কাজ নিবে, ভাল মানুষ হবে, খিরিস্তান হবে, তারপর।

মধুকুপির কিষাণ দাশুর মাথার উপর যেন একটা চাবুক আছড়ে পড়েছে। জ্বলে যাচ্ছে মাথাটা। মুরলীর কাছে আজ অমানুষ হয়ে গিয়েছে মধুকুপির সবচেয়ে তেজী দেমাকী আর মজবুত কিষাণ এই দাশু ঘরামি। দাশু আজ মুরলীর জীবন ও যৌবনের মরদ নয় ; একটা মনিষ মাত্র।

খেজুর-পাতার চাটাই ছেড়ে একটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় দাশু। চমকে ওঠে মুরলী ঃ কি হলো?

দাশু বলে—তুই থাক্, আমিই যাই।

—কোথায় যাবে? মুরলীও আতঙ্কিত হয়ে দাঁড়ায়।

—দাশু ঘরামি আর তোর সোয়ামী নয়।

বলতে বলতে এগিয়ে গিয়ে দরজার কপাটে হাত দেয় দাশু। এক টান দিয়ে কপাটের হুড়কো নামিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—মহেশ রাখালের বেটি মুরলীও আর দাশু ঘরামির মাগ নয়।

চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী—যেও না, থাম, কথা শুন।

আহত জানোয়ারের মত ছটফট করে একটা লাফ দিয়ে দরজা পার হয়ে চলে যায় দাশু।

ছুটে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাক দেয় মুরলী—যেও না, তোমার পায়ে পড়ি, এত রাতে ঘর ছেড়ে যেও না।

মধুকুপির মাটিতে শেষ রাতের চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। দাশুর মূর্তিটা যেন এক টুকরো হালকা ছায়া হয়ে বাইরের বাতাসে মিশে যাবার জন্যে ছুটে বের হয়ে যায়।

সেই মুহূর্তে শব্দ করে শিউরে ওঠে সড়কের পাশে বাঁশঝাড়ের শুকনো পাতা। আর, একটা প্রকাণ্ড কালোছায়ার পিণ্ড বাঁশঝাড়ের ভিতর থেকে লাফ দিয়ে সড়কের ধুলোর উপর এসে দাঁড়ায়। জ্বলজ্বল করে এক জোড়া সবুজ আগুনের চোখ। একটা গোটা চোখ, আর একটা নিভু নিভু চোখ।

—কানারানী! কানারানী! চিৎকার করে দরজার কপাটে মাথা ঠুকতে থাকে মুরলী। দেখতে পেয়েছে মুরলী, দাশুর সেই ছায়ামূর্তির একেবারে সামনে, মাত্র দশ হাত দূরে পথ আটক করে কানারানীর দু চোখের রক্তলোলুপ আশা জ্বলজ্বল করছে।

—এসো, এসো, জলদি ফিরে এসো গো! তোমার সামনে যে যম দাঁড়িয়ে আছে গো। কেঁদে চেঁচিয়ে উতলা হয়ে ডাকতে থাকে মুরলী।

কিন্তু এক পা'ও নড়ে না দাশু। মধুকুপির একটা চাষাড়ে অভিমান যেন ইচ্ছে করে কানারানীর থাবার কাছে লুটিয়ে পড়ে রক্তাক্ত হবার জন্য একটা প্রতিজ্ঞা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

মুরলীর চোখ দুটোও হঠাৎ যেন এক নতুন আক্রোশে দপ করে জ্বলে ওঠে। ছুটে এগিয়ে যায় মুরলী। মুরলীর শাড়িটা কাঁটার ঝোপে ফেসে গিয়ে ঝোপের গায়ে আটকে যায়। খোঁপা ভেঙে গিয়ে চুলগুলিও এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। দাশুর একটা হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে মুরলী।

সবুজ চোখের আগুন দুলিয়ে একটা লাফ দিয়ে পিছনে সরে যায় কানারানী, তারপর অলসভাবে একটা হাই তুলে আবার সেই জ্বলন্ত চাহনি একেবারে সুস্থির করে সোজা তাকিয়ে থাকে।

দাশুকে হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে ঘরের দরজার কাছে এসেই একটা ধাক্কা দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দেয় মুরলী ; হাঁপাতে হাঁপাতে দরজার কপাট বন্ধ করে দিয়ে দাশুকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে কাঁপতে থাকে।

রেড়ির তেলের ছোট বাতিটার বুকেও যেন একটা আতঙ্কের শিহর ছুটে এসে লাগে। গরম রেড়ির তেল ফুট্ করে একটা শব্দ ছাড়ে। নিভে যায় বাতিটা। আতঙ্কিত মুরলীও যেন আর্ত শরীরের সব ঠক্ ঠক্ কাঁপুনি দাশুর বুকের উপর ঢেলে দিয়ে ফিসফিস করে ঃ তোমার হাত দুটো কই গো? আমাকে জড়িয়ে ধরছো না কেন?

দাশু ঘরামির বুকে আতঙ্ক নেই। হাত দুটোও উদাস ও অলস। মুরলীর এই আবেদন একটা চালাক হুকুম মাত্র। সায়া-পরা আর জামা-গায়ে-দেওয়া একটা অচেনা মেয়েমানুষ দাশু ঘরামির চাষাড়ে হাত দুটোকে শুধু একটা দরকারের কাজে খাটিয়ে নেবার চেষ্টা করছে।

বুঝতে পারে না মুরলী, কানারানী এখনও পথের উপর দাঁড়িয়ে আছে, না, চলে গিয়েছে। কে জানে, হয়তো আরও কাছে এগিয়ে এসেছে কানারানী। রাক্ষুসে ক্ষুধার প্রকাণ্ড একটা হাঁ এই জামকাঠের জীর্ণ কপাটের কাছে থাবা পেতে বসে আছে। কিংবা সেই কর্কশ গোঁপের কাঁটা-কাঁটা রোঁয়া বুলিয়ে কপাটটাকে শুঁকছে। এক জোড়া চোখের একটা চোখ কটকট করে জ্বলে, আর একটা চোখ নিভু-নিভু বাতির মত জ্বলে। উঃ, কী ভয়ানক ধূর্ত কানারানীর রাতের বেলার এই মুখটা!

—আমি যে পড়ে যাব গো! দাশু কানের কাছে আবার কাঁপতে কাঁপতে ফিসফিস করে মুরলীর আতঙ্কিত প্রাণের একটা দুঃসহ অভিযোগ। মুরলীর নিঃশ্বাসের শব্দে যেন একটা রাগ ফিসফিস করে।

দাশু আস্তে আস্তে বলে—বসে পড় না কেন?

মুরলীকে বসে পড়তে বলতে পারে ; মুরলীকে অনায়াসে বুকের কাছ থেকে নামিয়ে দিতে একটু আপত্তি নেই দাশু ঘরামির? পাঁচ বছর জেল খেটে মাথাটাকে কী ভয়ানক খারাপ করে এসেছে দাশু। মুরলীর আতঙ্কিত শরীরটা এইবার যেন অভিমানের জ্বালায় ছটফট করে আরও জোরে দাশুকে আঁকড়ে ধরে। আর দাশুর কানের কাছে তপ্ত নিঃশ্বাস ছড়িয়ে দিয়ে একটা ধিক্কারও দেয় ঃ তুমি এমন কশাই হয়ে গেলে কেন গো?

ধিক্কারটা যেন বাঘিনী কানারানীর ভয়ে মুরলীর প্রাণের একটা বাজে অভিযোগের কাতর বিলাপ। কোন অর্থ হয় না। দাশুর হাত দুটো মুরলীকে জড়িয়ে ধরতে পারবে কেন? এমনটা আশা করে কেন মুরলী? এর মধ্যে কশাইপনা কোথায়? কশাই হয়েছিল দাশু, যখন টাঙ্গি হাতে তুলে নেবার জন্য লাফালাফি করেছিল।

কিন্তু চমকে ওঠে দাশু। কাঁধের উপর যেন গরম জলের ছোঁয়া লেগেছে। ভিজে গিয়েছে দাশু ঘরামির গায়ের নতুন গেঞ্জির সুতো।

—এ কি? তুই কাঁদলি কেন? দাশু ঘরামির হাত দুটো যেন হঠাৎ-মায়ায় চমকে ওঠে আর মুরলীর নরম শরীরটাকে বুকের উপর শক্ত করে সাপটে ধরে।

আস্তে আস্তে, এক একটা নিঃশ্বাসের শব্দের সঙ্গে ছন্দ রেখে মুরলীর ভয়াতুর শরীরের

কাঁপুনিও শান্ত হয়ে আসতে থাকে। দাশুর দুই শক্ত হাতের বাঁধনে বাঁধা হয়ে যেন ঘুমিয়ে পড়তে চায় মুরলী। দাশু বলে--ডর কেন? কিসের ডর?

সত্যিই ডর নেই। কপাটের ওপারে কানারানী দাঁড়িয়ে থাকলেও মুরলীর মনে আর কোন ডর নেই। মুরলীর শরীরটা যেন নতুন নির্ভয়ের সুখে একেবারে জমাট হয়ে দাশুর বুকের উপর পড়ে থাকতে পারছে। সেই ভয়াতুর ঠাণ্ডা নিঃশ্বাসের শিহরও একেবারে মরে গিয়েছে।

--তোর গা-টা এত গরম কেন? জ্বর হয় নাই তো? হঠাৎ উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করে দাশু।

মুরলী বলে--হ্যাঁ, জ্বর বটে।

দাশু--কেন জ্বর হলো?

মুরলী--জান না?

দাশু--না।

মুরলী--বোকা বটে তুমি।

মিলনের আগে দাশুর আবদারে মুরলী পুরানো পোশাক পরে নাচ দেখায়--গান শোনায়।

না, বোকা নয় দাশু। পাঁচ বছর ধরে জেলের কয়েদী জীবনের কম্বলের উপর রাত কাটিয়ে মুরলীর শরীরের সেই মিষ্টি জ্বরের স্বাদ ভুলে যেতে পারে নি দাশু। ভুলে যাওয়া দূরে থাকুক, মুরলীর গায়ের এই জ্বর-জ্বর উষ্ণতার স্বাদটিকে যে ঘুমের মধ্যেও ভোগ করেছে দাশু। কিন্তু আজ বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। মুরলীর গায়ের এই জ্বর সেই জ্বর নয়। বাঘিনী কানারানীর ভয়ে ভীতু হয়ে আর ঘাবড়ে গিয়ে দাশুর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে মুরলী। এই জ্বর শুধু একটা ভয়ের জ্বর।

মুরলীর মাথার এলোমেলো চুলগুলি দাশুর মুখের কাছেই ছড়িয়ে রয়েছে। মুরলীর চুলে নতুন তেলের গন্ধ ; অচেনা গন্ধ। এই গন্ধও একটা ঠাট্টা ; দাশুর জীবনের ভয়ানক নতুন ব্যথাটাকেই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে ; পর হয়ে গিয়েছে মুরলী। মুরলীর মাথার কাছ থেকে মুখটাকে সরিয়ে নিয়ে শুকনো একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে দাশু।

ঘামে ভিজেছে, একটু সেঁতসেঁতে হয়েছে মুরলীর হাত দুটো। পিছল সাপের মত আস্তে আস্তে গা-মোড়া দিয়ে মুরলী হঠাৎ বলে ওঠে--ছাড়।

ছেড়ে দেয় দাশু। আর, নিজের অপমানিত হাত দুটোকে যেন একটা কামড় দিয়ে আরও শাস্তি দিতে ইচ্ছে করে। মুরলীর চোখের জলকে বিশ্বাস করে মায়া করতে গিয়ে দাশুর প্রাণ আবার একটা ঘৃণার মার খেয়েছে। দরজার দিকে তাকায় দাশু। এখনি, কপাটের হুড়কো একটানে নামিয়ে দিয়ে...।

এ কি! চমকে ওঠে দাশু। বুকের উপর এ কোন্ স্পর্শের স্বাদ ঝাঁপিয়ে পড়ল! এ যে সেই মুরলীর গায়ের নরম-নরম স্বাদ! শাড়িতে জামাতে আর সায়াতে সাজানো নকল মুরলী নয়। গামছা গায়ে জড়ানো লাজুক মুরলীও নয়। যেন পাঁচ বছরের অদেখার সব রাগ একেবারে আদুড় হয়ে দাশু ঘরামির বুকের উপর লুটিয়ে পড়েছে।

দাশুর বুকের উপর ছোট্ট একটা দাঁত-ফোটানো কামড়ের জ্বালা চিন্ করে শিউরে ওঠে। মুরলীর সেই পুরনো অভ্যাস। দাশুর শরীরের সব রক্তের স্বাদও সেই মুহূর্তে মিষ্টি হয়ে যায়। মুরলীর মাথার উপর মুখটা নামিয়ে দিতেই দাশুর সব উদ্বেগ মিটে যায়। সেই মুরলী, মুরলীর ঘামে-ভেজা কপালে সেই পুরনো গন্ধ। দাশুর নিঃশ্বাসও মুরলীর চুলের সেই বুনো ছড়াছড়ির মধ্যে লুটিয়ে পড়বার জন্য ছটফট করে ওঠে। মুরলীর চোখ-মুখ-কপাল আর ঘাড় শুঁকে শুঁকে অতীতের একটা আদুরে গন্ধকে খুঁজতে থাকে দাশু।

মুরলী বলে--এসো।

দাশুর হাত ধরে টান দেয় মুরলী। দাশুর হাতের সব কুণ্ঠা সেই মুহূর্তে ঝরে পড়ে যায়। এই মুরলীকে বুঝতে কি-ভয়ানক ভুল করে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল একটা বোকা সন্দেহের

মন!

এক হাতের এক পাক দিয়ে মুরলীর কোমরটা জড়িয়ে ধরতেই মনে পড়ে যায় দাশুর ; পাঁচ-পাঁচটা করম পার হয়ে গিয়েছে, এই কোমরে আঁচল জড়িয়ে কত ঝুমুর নেচেছে মুরলী, কিন্তু মুরলীর এই সরু কোমরের দোলানি চোখে দেখতে পায় নি দাশু। শুধু জেলের বাগানে কাজ করতে করতে জাগা চোখের স্বপ্নে মুরলীর নাচ দেখেছে।

বিছানাটার কাছে এগিয়ে যেতেও আর কোন কুণ্ঠা নেই। মুরলী যেন পাঁচ বছরে ধরে একটা মানত করে দাশুর জন্যই একটা আদরের সিংহাসন তৈরি করে রেখেছে।

রাতটা বড় স্তব্ধ। বাইরের বাঁশের ঝাড়েও কোন পাগলা হাওয়া হুটোপুটি করে না। চালার গায়ে ছোট ছোট ফুটো আর ফাটলগুলি খুশি হয়ে হাসছে মনে হয় ; বাইরের ফিকে চাঁদের আলো চালার ফুটো-ফাটল দিয়ে চুঁয়ে পড়তে চেষ্টা করছে। মুরলী বলে--বেশ তো পাগল হয়েছো, তবে আর কেন...।

আর একটা মুহূর্তও দেরি করতে চায় না মুরলী। আর দেরি করলে হয়তো কাক ডেকে উঠবে, ভোর হয়ে যাবে, মুরলীর মানত নষ্ট হয়ে যাবে।

দাশু বলে—তুই বা কি কম পাগল?

মুরলী বলে—চুপ।

অনেকক্ষণ পরে যখন ঘরের চালার ফুটো-ফাটল দিয়ে বাইরের আলোর চোরা হাসির ঝরানি বন্ধ হয়ে যায়, তখন ডাক দেয় দাশু—কথা বল মুরলী।

মুরলী বলে—চুপ।

দাশু হাসে--আবার চুপ হতে বলছিস কেন?

মুরলী—হ্যাঁ আবার।

আপত্তি করে না দাশু। মুরলীর পাগল ইচ্ছার রকম দেখে দাশুর শক্ত চেহারার স্নায়ু ও শোণিতের ভিতরে যেন নতুন করে মত্ততার ঝুমুর বাজতে শুরু করে। বেশ তো! কি ভেবেছে মুরলী? মধুকুপির জোয়ান কিষাণ দাশু ঘরামির উপোসী লোভের জোর পরীক্ষা করে দেখতে চায়? তবে দেখুক মুরলী, বুঝুক মুরলী, এই দাশু সেই পাঁচ বছর আগেরই দাশু। পাঁচ বছর জেল খেটেও দাশু ঘরামির রক্ত একটুও শুকিয়ে যায় নি।

তারপর...মুরলীর দুই চোখের উপর যখন নিবিড় ক্লান্তির সুখ ঘুমভারে অলস হয়ে যায়, ঠিক তখন রাতের মধুকুপির নিরেট স্তব্ধতাকে হঠাৎ আহত করে অনেক দূরে একটা আতঙ্কের শব্দ চাপা হুল্লোড়ের মত বেজে ওঠে। শব্দটা আসছে মান্‌ঝিদের পাড়ার দিক থেকে। একসঙ্গে এক শো টিনের উপর ঠেঙার বাড়ি মেরে হৈ-হৈ করছে মান্‌ঝিরা।

দাশু বলে—শুনছিস?

মুরলী—কি?

দাশু—কানারানী ভেগেছে।

আনমনার মত আর আধ-ঘুমে জড়ানো স্বরে বিড়বিড় করে মুরলী—কেন?

দাশু হাসে—খুব খুশি কানারানী।

মুরলী—কেন গো? গা-মোড়া দিয়ে দাশুর হাত ধরে আদুরের স্বরে প্রশ্ন করে মুরলী।

দাশু হেসে ওঠে—বুঝলি না।

মুরলী—না।

দাশু--তোর আমার নতুন বিয়া দিতে কানারানী এসেছিল।

আবার একটা আর্তনাদের হুল্লোড়। একসঙ্গে ছটফট করে এক পাল গরু ডাকতে শুরু করেছে। গাঁ-গাঁ করে যেন লাফালাফি করছে, ছুটছে মুখ থুবড়ে পড়ছে, এক গাদা ভীরু করুণ আর আলুথালু শব্দ।

—শুনছিস মুরলী? দাশু ডাকে।

মুরলী—কি?

দাশু—ঈশান মোক্তারের গরুগুলার খবর নিচ্ছে কানারানী।

মুরলী শক্ত করে দাশুর একটা হাত আঁকড়ে ধরে।

দাশু—ডর লাগছে কি? মুরলী?

মুরলী—না, চুপ কর।

—কি বললি?

—ঠিক বলছি।

—সত্যি তো?

—হ্যাঁ।

দাশু ঘরামির শক্ত বুকের পাঁজরগুলিকে যেন আবার সোনার কাঠি ছুঁইয়ে অভ্যর্থনা করেছে মুরলী। বোধহয় মুরলীর প্রাণের একটা দীর্ঘ অপেক্ষার পিপাসা বার বার উতলা হয়ে উঠছে। তাই দাশুকে এক অফুরান উপহারের দেবতা বলে মনে করে বার বার আকুল হয়ে ডাকছে। বেশ তো, দাশুর প্রাণেও কোন অনিচ্ছা নেই, শরীরেও ক্লান্তি নেই।

একটা কাকের ডাক শোনা গেল যখন, তখন দাশুর ঘুম-জড়ানো চোখের ক্লান্তিটা একটা চমক লেগে টলমল করে ওঠে। মধুকুপির আকাশটাই যেন হঠাৎ হাঁক দিয়ে একটা প্রচণ্ড গম্ভীর প্রতিধ্বনি গড়িয়ে দিয়েছে। নিশ্চয় বড় কালুর মাথার উপরে উঠে ডাক ছেড়েছে কানারানী। বড়কালুর পাথর কাঁপে, সেই সঙ্গে সারা মধুকুপির বাতাসও কাঁপে। কানারানীর গর্জনের রেশ গড়িয়ে গড়িয়ে কপালবাবার জঙ্গলের বাতাসে মিশে যায়।

দাশু ডাকে—নিঁদ গেলি নাকি?

মুরলী—না। এবার নিঁদ যাব।

দাশু—কানারানীর হাঁক শুনেছিস?

মুরলী—শুনেছি।

দাশু—শুনেছিস তো, বুঝেছিস কিছু?

মুরলী—বুঝেছি ; খুব খুশি হয়েছে কানারানী।

দাশু—কেন খুশি হয়েছে?

হেসে ফেলে মুরলী—তোমার মুরলীর পেটে ছেইলা এসে গেল তাই।

দাশুর বুকের ভিতরে যেন একটা রঙীন আশার উল্লাস লাফিয়ে ওঠে। কপালবাবার কাছে অনেকবার অনেক মানত করেও হতাশ হয়ে গিয়েছিল মুরলীর যে সাধ, সে সাধ এতদিনে সফল হবে তবে? চেঁচিয়ে ওঠে দাশু—এ কি কথা বললি মুরলী? কেমন করে বুঝলি?

মুরলী—তোমার মুরলীর হাড়মাস এত মিঠা হয়ে আর কোনদিনও গলে নাই। বুঝতে পারবো না কেন গো?

মুরলীর মাথাটাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে দাশু ; মুরলী হাসে ঃ দেখো, যেন আবার টাঙ্গি হাতে নিয়ে তেড়ে এসো না।

দাশু রাগ করে ঃ ছি, কেন আবাব ওসব রাগের কথা বলছিস?

মুরলী—আর রাগ করবে না তো?

দাশু—কেন রাগ করবো?

মুরলী—যদি মুরলী সরদারিনের কোমর মোটা হয়?

—হবে তো, একশোবার হবে। মুরলীর মাথায় আস্তে আস্তে হাত বোলায় দাশু।

ঘুমিয়ে পড়ে মুরলী। মুরলীর মুখটাকে একবার ভাল করে দেখবার চেষ্টা করে দাশু, আর, আবছা অন্ধকারের মধ্যেও দেখতে পায়, মুখভরা হাসি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে মুরলী।

জেগে থাকতে চেষ্টা করে দাশু, কারণ মুরলীর মুখটাকে বার বার দেখে নিজেরই জীবনের একটা তৃপ্তির পূর্ণতা বার বার প্রাণের ভিতরে ছড়িয়ে দিতে ইচ্ছা করে। মুরলীর ছেইলা হবে ; কপালবাবার কাছে সাদা ছাগ বলি দেবে দাশু। একটা দিনও ঘরে বসে না থেকে, গো-গাড়ি হাঁকিয়ে হোক আর মাঠান কুলের জঙ্গলটায় লা-পোকার ডাঁটি ভাঙবার ঠিকা নিয়ে হোক, কিছু টাকা দুতিন মাসের মধ্যে যোগাড় করতেই হবে।

না হয়, ঈশান মোক্তারের কুঠিতে গিয়ে নতুন করে একটা চিঠা নিতে হবে। ডরানির ওপারে বিঘা পাঁচেক, অন্তত বিঘা তিনেক দো-আঁশ যদি ভাগজোত করতে পাওয়া যায়, তবে ছয় মাসের মধ্যে একটা ফসল তুলতে পারা যাবে। কে জানে, আজকাল সরু ধানের কী দর দিচ্ছে মানপুরের পাইকারেরা?

কিন্তু ভাগজোতে পেট ভরুক বা না ভরুক, মনটা যে একটুও ভরে না। ফলন শেষ হয়, ফসল তোলা হয়, ব্যস্, জমিটা আবার পর হয়ে যায়। আবার ঈশান মোক্তারের কুঠিতে গিয়ে নতুন করে চিঠার জন্য হাত পাততে হয়। আবার চিঠা না পেলে ঐ জমিতে হাল ছোঁয়াবার উপায় থাকে না।

কোর্ফা হলে তবু মনটা যেন একটুখানি ভরে। জমিটাকে একটু আপন-আপন মনে হয়। ডরানির এপাশে ঈশান মোক্তারের তিন বিঘা ঢালু গরঞ্জি ; ওপাশে আছে দো-আঁশের কানালি। ভাল ধান ফলে, ঝাঁজলি আর কালিশ। কিন্তু অন্তত পঞ্চাশটা টাকা সেলামি না দিলে ঈশান মোক্তার কি দাশুকে কোর্ফা করে নিতে রাজি হবেন?

কিন্তু সুরেন মান্‌ঝির মুখের সেই যন্ত্রণার ছবিটাও মনে পড়ে। পর পর দু বছরের সাঁজা দিতে কামাই করেছিল ঈশান মোক্তারের কোর্ফা রায়ত সুরেন। সালিয়ানাও বাকি পড়েছিল। মুহুরিটা একদিন এসে সুরেনের ঘরের আঙ্গিনায় উঠে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে গর্জে উঠেছিল—বেটিটা তো বেশ ডাগর হয়েছে, সেটাকে ভাড়া খাটিয়ে টাকা আনিস না কেন, আর সাঁজা উসুল করিস না কেন সুরেন?

টাঙ্গি হাতে নিয়ে মুহুরির দিকে তেড়ে গিয়েছিল সুরেন।

তার পরেই নোটিস হল। ক্ষেতি-খামার করবার সাধ এ জন্মের মত ছেড়ে দিয়ে সেই যে মনিষ হয়ে গেল সুরেন, তার পর থেকে সে শুধু কপালবাবার জঙ্গলের মরা শাল কুড়োয়।

না, কোর্ফা হলেও কোন সুখ নেই। তাতেও নোটিশের ভয় আছে সালিয়ানা জমা দিতে একটু দেরি হলেই জমির আলের উপর গিয়ে দাঁড়াবারও অধিকার থাকবে না, এমন অভিশাপের মধ্যে ক্ষেতি-খামার করতে না যাওয়াই ভাল।

বিঘা দুয়েক জমি কি কিনতে পারা যায় না? দাশুর ক্লান্ত চোখের পাতায় পাতায় যেন একটা পুরনো স্বপ্নের সাধ ঝির ঝির করে। জমি পেতে হবে। দো-আঁশ হোক, বেলে হোক, এঁটেল বা মেটেল হোক, জমি চাই। গুলঞ্চের বেড়া হলে ভাল হয়। জিরে বুনতে পারা যাবে, সোনার দানার মত জিরে। আখ না হোক, সরগুজা হবে। হলদে ফুলে ছেয়ে যাবে পৌরুষের ক্ষেত। ক্ষেতের বেড়ার কাছে ছুটোছুটি করে চোর খরগোশ ধরে ফেলবে মুরলী, আর খরগোশটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে হেসে উঠবে।

না, খরগোশ কেন? খরগোশ কোলে নিয়ে হাসবার আর দরকার হবে না মুরলীর। দাশু ঘরামির স্বপ্নাতুর চোখ দুটো দেখতে পাচ্ছে, খরগোশেরই মত তুলতুলে নরম একটি জিনিসকে, দাশুর ছেইলাকে কোলে নিয়ে হাসছে মুরলী।

আরও কত কী না ভাবতে ইচ্ছা করে। নতুন মাদল কিনতে হবে। করম নাচবে মুরলী। ভাদুরে বৃষ্টি নামবে আর থামবে। ছোটকালুর মাথার উপর আকাশের এপার ওপার জুড়ে রামধনু ফুটবে। দাশুর কাঁধের উপর ছেইলাটা, বুকের কাছে মাদলটা, আর পাশে পাশে মুরলী। সরগুজা-ক্ষেতের বেড়ার কিনারা দিয়ে সরু ঘেসো পথ ধরে আখড়ার দিকে যেতে

যেতে দাশুর মাদল বাজবে--ধিতাং ধিতাং--

খট্ খট্ খট্! যেন দাশু ঘরামির স্বপ্নের উপরে শক্ত শব্দের আঘাত। খট খট খট—কী কর্কশ শব্দ! ধড়ফড় করে জেগে উঠেই চোখ মোছে আর গভীর ঘুমে অলস মুরলীর শরীরটাকে একটা ঠেলা দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে দাশু—ওঠ, জলদি ওঠ মুরলী।

চোখ মেলে চমকে ওঠে মুরলী ঃ কি হলো?

—কপাট ঠুকছে কে!

--কে? কে? আতঙ্কিত হয়ে বিছানার উপর উঠে বসে মুরলী। চালার ফুটো দিয়ে সকালবেলার রোদ ঘরের ভিতরে চুঁইয়ে পড়েছে। নিজের চেহারাটা চোখ পড়তেই পোড়া-সাপের মত ছটফটিয়ে ওঠে মুরলী। ছিঃ, কী বেলাজ বুনো চেহারা! মাদি হরিণের মত একেবারে নিরাবরণ একটা শরীর হয়ে এ কোন্ জঙ্গলের ঘাসের উপর একটা জংলী ইচ্ছার গা ঘেঁষে শুয়ে আছে মুরলী? এ ভুল কখন হল? কেন হল? পাঁচ বছর কয়েদ খেটে ঘরে ফিরে আসা এই মানুষটা কি মুরলীকে ধুতরা খাইয়ে বেহুঁস করে দিয়েছিল?

মুরলীর একটা হাত ধরতে চেষ্টা করে দাশু, আর কথা বলতে গিয়ে গলার স্বরটাও ভীরু হয়ে যায়, পুলিস এসেছে।

মুরলী—তোমার কপাল এসেছে।

বলতে বলতে দাশুর হাতটাকে যেন একটা কঠোর তুচ্ছতার আঘাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে যায় মুরলী, সায়াটাকে হাতে তুলে নেয়, শাড়ি খুঁজতে থাকে।

মুরলীর চোখ মুখের নিষ্ঠুরতা দেখে হতভম্বের মত তাকিয়ে থাকে দাশু ঃ তুই এত রাগলি কেন মুরলী? গোবিন্দপুর থানাতে হাজিরা না দিয়ে সোজা ঘরকে চলে এলাম, তাই খবর নিতে পুলিস এসেছে।

সায়া শাড়ি জামা দিয়ে শরীরটাকে সুন্দর করে সাজিয়ে, চিরুনি হাতে নিয়ে চট্‌পট্ করে চুল আঁচড়ে নিয়ে, আর চটি পায়ে দিয়ে, একটা ভয়ানক জাদুখেলার বিস্ময়কেও হার মানিয়ে দিয়ে কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে একেবারে বদলে যায় মুরলী। মুরলীর চোখ দুটো যেন রাগ সহ্য করতে গিয়ে জ্বলছে। সারা মুখটাই শক্ত হয়ে গিয়েছে। দাশুর সেই বোকার মত তাকিয়ে থাকা চোখ আর হতভম্ব বুকের পাঁজরগুলির উপরে যেন আরও একটা আঘাত দেবার জন্য চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী—বিছানা থেকে নেমে বসো।

—কেন? দাশুর চোখ দুটোও দপ্ দপ্ করে।

—সিস্টার দিদি এসেছে। বলতে বলতে ছুটে গিয়ে ঘরের দরজার হুড়কো নামিয়ে দিয়ে কপাট খোলে মুরলী।

কিন্তু চৌকাঠ পার হয়ে ঘরের বাইরে দু পা এগিয়ে যেয়েই হঠাৎ যেন পাল্টা একটা ধাক্কা খেয়ে তিন পা পিছিয়ে এসে আবার ঘরের ভিতরে থমকে দাঁড়িয়ে থাকে মুরলী।

—কি হলো? প্রশ্ন করতে গিয়ে দাশুর মুখটা হিংস্র হয়ে কেঁপে ওঠে।

যেন শুনতেই পায় নি মুরলী ; মুখ তুলে দরজার বাইরের দিকে তাকিয়ে চুপ করে এক ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকে।

—দেখি তোর সিস্টার দিদির মুখটা কেমন? বাঘিনের মত, না ডাইনের মত? বলতে গিয়ে আস্তে আস্তে দাঁতে দাঁত ঘষে দাশু।

দাশুর কথাগুলি, এত তপ্ত রুক্ষ ও স্পষ্ট একটা ধিক্কার, তাও যেন শুনতে পায় নি মুরলী। ঘরের ভিতরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের একটা বিস্ময়ের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে। নড়ে না, চোখ ফেরায় না মুরলী।

ঘরের ভিতর থেকে রাগী বনশুয়োরের মত একটা ছুটন্ত আক্রোশ হয়ে দরজার পাশে থমকে দাঁড়িয়ে থাকা মুরলীর চেহারাটার পাশ কাটিয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায় দাশু।

চমকে ওঠে, অপ্রস্তুত হয়, দু পা পিছিয়ে দাঁড়ায় দাশু। একটা লোক যেন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। লোকটাকে ভদরলোক বলে মনে হয়। গায়ে কামিজ আছে, পরনে ছোট পেণ্টালুন আছে ; হাতে একটা বন্দুক আছে, আর কোমরবন্ধে বন্দুকের গুলি সাজানো আছে।

—কে বটেন আপনি? প্রশ্ন করে দাশু।

লোকটা হেসে ফেলে ঃ তুমি কে বট, সেটা আগে বল।

—আমি এই গাঁয়ের কিষাণ।

—কিন্তু কেমন কিষাণ?

—সরদার কিষাণ।

লোকটা এইবার আরও জোরে হো-হো করে হেসে ওঠে ঃ তাই বল। ভূমিজ বট?

—হ্যাঁ, তাতে হয়েছে কি?

—রাগছো কেন সরদার, আমি তোমার জাতের নিন্দা করছি না।

বন্দুকটাকে চালার খুঁটির গায়ে হেলিয়ে দিয়ে পেণ্টালুনের পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছে লোকটা। মুরলীর মুখের দিকে বার বার তাকায়। তারপর দাশুর দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে। সরদারিনকে বড় লাজুক মনে হয়।

দাশু—এখানে আপনার কি কাজটা আছে বলবেন?

লোকটা গম্ভীর হয়—হ্যাঁ কাজ আছে, অনেক কাজ।

দাশু—কি কাজ?

লোকটা—আগে আমার নামটা জেনে নাও।

দাশু—বলেন।

—আমার নাম পলুস হালদার। আমি খিরিস্তান। তোমার সরদারিন যদি এক ঘটি জল খেতে দেয়, তবে আমি এখনি সেই জল ঢক ঢক করে খেয়ে নিব।

মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে পলুস হালদার। দাশুর বুকের হাড়েও খট্ করে একটা বিস্ময়ের আঘাত বেজে ওঠে। দেখতে পেয়েছে দাশু মুরলীর গম্ভীর মুখে ঝিক করে একটা মিষ্টি খুশির ছায়া শিউরে উঠেছে।

সত্যিই ব্যস্ত হয়ে উঠল মুরলী। সত্যিই ঘরের ভিতর থেকে এক ঘটি জল নিয়ে বাইরে এসে পলুস হালদারের হাতের কাছে তুলে ধরল।

নিশ্চয়ই খুব পিপাসিত হয়েছিল পলুস হালদার। ঘটি হাতে তুলে নিয়ে ঢক ঢক করে জল খায় পলুস। তারপর একটা তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে শান্ত চোখে দাশুর দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে ঃ কিন্তু বুঝতে পারছি না সরদার, তোমরা বাঁচলে কি করে?

—কি বলছেন আপনি?

—বাঘিনটা শুধু একটা শাড়ি টেনে নিয়ে চলে গেল, এটা কেমন করে হয়?

দেখতে পায় দাশু, হ্যাঁ, কাল রাতের মুরলীর গায়ে নীল রঙের শাড়িটা বাঁশঝাড়ের কাছে ময়না কাঁটার গায়ে ফেঁসে গিয়ে আটকে রয়েছে। সকালের আলোতে আর ফুরফুরে বাতাসে শাড়িটা নিশানের মত উড়ছে।

দাশু বলে—আপনার কাজের কথাটা বলবেন?

পলুস হালদার—তাই তো বলছি। আমার বিশ্বাস, ওই বাঘিন আবার এখানে আসবে।

দাশুর ঘরের দাওয়ার চারদিকের ধুলোর দিকে তাকিয়ে, পথের পাশের মাটির উপর এক-একটা অদ্ভুত আঁচড়ের দাগের দিকে তাকিয়ে, আর বাঁশঝাড়ের গোড়ার কাছে ছন্নছাড়া হুটোপুটির চিহ্নগুলির দিকে তাকিয়ে পলুস হালদার বলে—উঃ, তোমরা খুব বেঁচে গিয়েছ সরদার! কিন্তু কেন বাঁচলে বুঝতে পারছি না।

দাশু বলে—বুঝে কাজ নাই।

পলুস দালদার—আমি বুঝবার কাজে এসেছি সরদার। ভোর হতেই মাচান থেকে নেমে, সেই ডরানির পুল থেকে আরও আধ ক্রোশ দূর থেকে, বাঘিনটার পায়ের দাগ ধরে ধরে ঠিক জায়গাটিতে এসেছি। আজ রাতে আমি এখানে মাচান বাঁধবো।

চমকে ওঠে দাশু। পলুস হালদারের দিকে ভ্রূকুটি করে তাকায়—না, এখানে আপনি শিকার খেলবার মজা নিতে সাধ করবেন না।

—কেন?

—কেন আবার কি? ওসব এখানে চলবে না।

—আমি সরকারী হুকুমে বাঘিনটাকে শিকার কবতে এসেছি। তুমি বাধা দিবার কে?

—আমি বাধা দিব না তো কে দিবে? চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

পলুস হালদার তবু শান্তভাবে একটু সমীহ করে বলে—তুমি ভুল করছো সরদার। থানা যদি জানতে পারে যে, তুমি মানুষখাগী বাঘিনটাকে মেরে ফেলতে বাধা দিয়েছ, তবে...কি হবে জান?

দাশু—যা হবার হবে।

পলুস হালদার হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে মুরলীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে—তুমি কি বল সরদারিন?

মুরলী বলে—আপনি রাগ করবেন না।

মুরলীর মুখের দিকে কটমট করে তাকায় দাশু। শিকারী পলুস হালদারের ওই কামিজ আর পেণ্টালুন পরা চেহারার গর্বটাকে যেন মিষ্টি মিষ্টি নরম কথা বলে তোয়াজ করছে মুরলী। কী ভয়ানক বেহায়া হয়ে উঠেছে মুরলীর মুখটা!

শিকারী পলুস হালদারের চেহারাটাও যেন এক মুহূর্তের মধ্যে, মুরলীর ওই সুন্দর মুখের একটি মিষ্টি অনুরোধের মায়াতেই নরম হয়ে যায়। বন্দুকটাকে আবার হাতে তুলে নেয় পলুস হালদার। রুমাল দিয়ে মুখ মোছে। দাশুর মত একটা কিষাণ মনিষের ধমক-ধামক সবই এক মুহূর্তের মধ্যে ভুলে গিয়ে পলুস হালদারের প্রাণটা যেন হেসে উঠেছে। দাশুর দিকে একটা ভ্রূক্ষেপ করতেও ভুলে যায় পলুস হালদার। মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে, বোধহয় আরও গভীর একটা আশ্বাসের সঙ্কেত আশা করে পলুস হালদার বলে—তাই হবে সরদারিন, আমি রাগ করলাম না।

মুরলী হাসে—যেন থানাতে গিয়ে সরদারের নামে...।

পলুস হালদার—না না না, তুমি কিছু ভেবো না সরদারিন। আমি নালিশ করবো না। কিন্তু...।

মুরলী—কি?

পলুস হালদার—তোমাকে দেখে কেমন যেন মনে হয়। তুমি কি ঠিক—ঠিক...।

মুরলীর মুখটা হঠাৎ-ভয়ে শিউরে ওঠে—আমাকে আবার কেন মিছিমিছি...কি ঠাহর করছেন?

পলুস হালদার—তুমি কি এই সরদারের ঘরণী?

মুরলী মাথা হেঁট করে—হ্যাঁ।

পলুস—কিন্তু তোমাকে দেখে যে খিরিস্তানী বলে মনে হয়।

মুরলী—না, আমি খিরিস্তানী নই।

পলুস—তবে তুমি কেমন করে ঠিক গড বাবার মেয়েটির মত এমন সুন্দরটি হয়ে...।

মুরলী—সিস্টার দিদির দয়া।

—হারানগঞ্জের সিস্টার দিদি? বলতে গিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে পলুস হালদার ; যেন খাকি

কামিজের আড়ালে শিকারী পলুস হালদারের বুকের একটা আশা চেঁচিয়ে উঠেছে।

মুরলীরও চোখে-মুখে অদ্ভুত একটা মায়াময় হাসি নিবিড় হয়ে ওঠে। মুরলী বলে—হ্যাঁ।

—আসি সরদারিন। মুরলীর মুখের দিকে আরও একবার তাকিয়ে, আর, একেবারে শান্ত ও প্রসন্ন একটা মূর্তি নিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যায় পলুস হালদার।

চালার খুঁটো ধরে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে মুরলী। দাশুও আস্তে আস্তে, যেন পা দিয়ে মাটির উপর শক্ত থাবা রেখে রেখে মুরলীর কাছে এগিয়ে এসে বুকের ভিতরের একটা বদ্ধ জ্বালাকে বাইরে আছড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—মুরলী।

—কি?

—কানারানী নয় ; তোর সিস্টার দিদিই মানুষখাগী বাঘিন বটে।

কোন উত্তর না দিয়ে তেমনি মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে মুরলী। যেন মধুকুপির একটা মনিষের এই অসার গর্জন তুচ্ছ করে নিজের ভাবনার সঙ্গে কথা বলছে মুরলী।

দাশু বলে—আমিও তোর সিস্টার দিদিকে দেখে নিব।

মুখ তোলে মুরলী। দাশুর মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে, একটা কটকটে কঠোর চাহনি ছড়িয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—তোমার সাধ্যি নাই।

—কি বললি? বলতে গিয়ে দাশুর শক্ত হাত দুটো ; মাটি-কোপানো কাঠ কাটা, চালা ছাওয়া আর গো-গাড়ি হাঁকানো জীবনের কঠিন দুটো পেশীময় শক্ত হাত থর থর করে কেঁপে ওঠে। কিন্তু...ব্যস্, তারপরেই যেন অলস হয়ে নেতিয়ে পড়ে। এই হাতে টাঙ্গি তোলবার আর সাহস নেই। এই মুরলীর প্রাণ দাশু ঘরামির টাঙ্গির চেয়েও বেশি ধারালো। এই মুরলী দাশু ঘরামির মুরলী নয় ; কেউ নয়। মুরলীকে দেখতে ভয় করে।

সরে যায় দাশু। পথের দিকে উদাস দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে দেখতে থাকে, এখন কোন্ দিকে চলে গেলে ভাল হয়? কোন্ দিকের পথটা ফাঁকা?

গাঁয়ের লোকের সঙ্গে দেখা হবে না, অথচ কপালবাবার জঙ্গলের দিকে চলে যেতে পারা যাবে, এমন একটা পথ কি পাওয়া যাবে না? কুলের জঙ্গলটাকে ডাইনে রেখে ঘেসো পথে এগিয়ে গেলে পল্টনী দিদির ঘরটা চোখে পড়বে না। তারপর একটা ঢালু আছে, ডরানির স্রোত পর্যন্ত গড়িয়ে গিয়েছে সেই ঢালু। কাঁটানটের জঙ্গলের ছাওয়া সেই ঢালু দিয়ে কেউ পথ হাঁটে না। ওই পথ ধরে একটা ক্রোশ এগিয়ে গেলেই তো কপালবাবার আসনের কাছে পৌঁছে যাওয়া যায়।

সকালবেলার আলোতে ঝলমল করে মধুকুপির পাঁচ বছর আগের সেই চেহারা। শালবনের সেই সবুজ, কাঁকুরে ডাঙ্গার সেই লাল, বেলে ঢালুর সেই সাদা, পলিমাখা দো-আঁশের সেই ভেজা-ভেজা কালো। বড়কালুর বুকের সেই ঝরনার জলো দাগটাও চিকচিক করে, শুকিয়ে একেবারে খটখটে হয়ে যায় নি। পাথুরে টিলাগুলিও ঠিক সেই পাঁচ বছর আগের মতই ছড়িয়ে গড়িয়ে, বাবলার আর খেজুরের ঝোপঝাপ গায়ে জড়িয়ে, মধুকুপির পুবের আকাশ পর্যন্ত চলে গিয়েছে। সাবাই ঘাসের জঙ্গলটাও বাতাসে দুলছে। এর মধ্যে ক্ষতের মত দগদগ করে শুধু একটা জায়গা, রায়বাবুর ইঁটখোলার শ্মশানটা।

ইঁটখোলার দিকে নয়, দাশু ঘরামির হতাশ ও উদাস চোখ দুটো যেন ক্লান্ত হয়ে মধুকুপির আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা সান্ত্বনা খুঁজতে থাকে। এই আকাশে হাতিয়া তারা নিশ্চয় ঠিক সময়ে দেখা দেয়, আর ঝরঝর করে বৃষ্টি ঝরিয়ে মধুকুপির মাটির পিপাসা মিটিয়ে দেয়। কিন্তু...চমকে ওঠে দাশু। বুম্ বুম্ বুম্! উত্তর দিকের আকাশটা যেন গম্ভীর আক্রোশের তিনটে শব্দ গড়িয়ে দিয়ে মধুকুপির বাতাস কাঁপিয়ে দিল।

জানে না দাশু ; এখানে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে জানবারও কোন উপায় নেই, বড়কালুর পশ্চিমে সেই ঘন শালবনের ভিড়কে প্রকাণ্ড এক-একটা খাবলার জোরে উপড়ে

আর সরিয়ে দিয়ে বড় বড় কয়লার খাদ তৈরি হয়ে গিয়েছে। বড় বড় পোখরিয়া খাদ। কালো ধুলোর এক একটা দহ, যার তলায় এক একটা লাইন বেঁধে কিলবিল করে মানুষ। গাঁইতা শাবল হাতে নিয়ে কাজ করে মালকাটার দল। কয়লার নিরেট চাপের গায়ে বিঁধ দিয়ে বারুদ ঠাসছে সর্দার, জ্বলছে ফিউজ, আর, তারপরেই বুম্ করে একটা প্রচণ্ড আওয়াজের বিস্ফোরণ। সঙ্গে সঙ্গে এক শো ফাটলে ফাটা হয়ে, নড়ে চিরে আলগা হয়ে যাচ্ছে নিরেট কয়লার স্তূপ।

শুধু পোখরিয়া খাদ নয়, এজরা ব্রার্দার্সের আরও তিনটে কলিয়ারী চালু হয়েছে, আরও ক্রোশখানেক দূরে ; একটা পিট আর দুটো ইনক্লাইন। কাল রাতের বেলায় চাঁদের আলোতে অনেক দূরে যে মস্ত উঁচু একটা চিমনির গলা আবছা ছবির মত দেখতে পেয়েছিল দাশু, এখন সেই চিমনির গলাটাকে বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। এইবার বুঝতে পারে দাশু, ওটা মেঘ নয়, ওটা চিমনির ধোঁয়া। কিন্তু জানে না দাশু, সুরেন মান্‌ঝি আজকাল আর কপালবাবার জঙ্গলে মরা শাল কুড়োয় না। সুরেন মান্‌ঝি আজ এজরা ব্রাদার্সের ওই কলিয়ারির মালকাটা।

মধুকুপির পুবের আকাশ কিন্তু শান্ত ; যদিও এই সকালবেলার রোদেই একটু বেশি তেতেছে বলে মনে হয়। রাতের বেলা ডরানির স্রোতের নতুন পুলের কাছে দাঁড়িয়ে, ওই পুবের ডাঙ্গার দিকে তাকিয়ে অনেক দূরে কয়েকটা নতুন ইমারতের ছায়া-ছায়া চেহারা দেখেছিল দাশু। এখন স্পষ্ট দেখা যায়। যেন ডাঙ্গা আর আকাশের ছোঁয়াছুঁয়ির মাঝখানে ছবির মত আঁকা একটা নতুন জীবনের বসতি। দাশু ঘরামির চোখে অদ্ভুত একটা আতঙ্ক কাঁপতে থাকে।

পুবের আকাশটাও বেজে ওঠে। বাঁশির শব্দের মত শব্দ, গম্ভীর অথচ মিষ্টি। সে শব্দ এক ক্রোশের বাতাসে পাড়ি দিয়ে মধুকুপির কানের কাছে এসে বাজছে।

জানে না দাশু, এই বাঁশির শব্দ নতুন কাজের মানুষকে কাজ করতে ডাকছে। অনেক দূরের ইমারতগুলি হলো সেন এণ্ড ওয়াল্টারের মাটিচালান কোম্পানির লেবরেটরি, অফিস-বাড়ি, কুলি-ধাওড়া আর বাবু-কোয়ার্টার। এক হাজার বিঘা জমি লীজ নিয়েছে সেন এণ্ড ওয়াল্টার। সকাল ছটা থেকে শুরু করে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত এক হাজার মজুর খাটে। কোদালের ক্ষান্তি নেই, টবের শ্রান্তি নেই। মোটর ট্রাকে বোঝাই হয়ে দূরের কুমারঢুবির দিকে চলে যায় সিলিকা স্যাণ্ড। ধুরকুণ্ডার দিকে চালান হয় ফেলস্পার, আর কেওলিন চালান হয় কলকাতায়। জানে না দাশু—হরিশ, নটবর ও নিধিরাম আজকাল আর পালকি বইতে গোবিন্দপুরে যায় না। ওরা সেন এণ্ড ওয়াল্টারের খনিতে কাজ করে দিন এক টাকা দু আনা রেটে মজুরি পায়।

মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকায় দাশু। তবে আর বাকি রইল কোন্ দিকটা? পশ্চিমটা? ছোটকালু চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে যেদিকে, সেই দিকটা? কিন্তু ছোটকালুর পাহাড়ে ধড়টাও গুর্ গুর্ শব্দ করছে মনে হয়।

জানে না দাশু, ছোটকালুর ওই পাহাড়ে ধড়ের ঠিক পিছনে, যেখান থেকে মহুয়ার জঙ্গল আর উইঢিবির ভিড় ক্রোশের পর ক্রোশ আরও এগিয়ে যেয়ে একেবারে বাঘমুণ্ডি রেঞ্জের সঙ্গে মিশেছে, সেখান দিয়ে একটা নতুন রেললাইন এঁকেবেঁকে আরও কিছুদূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছে। আরও এগিয়ে যাবে রেললাইন। খেলারির সিমেন্ট তাড়াতাড়ি রামগড়ে পৌঁছে দিতে হলে, লোহারডাগার বক্সাইট আরও তাড়াতাড়ি মুরির অ্যালুমিনিয়াম কারখানার কাছে এনে ঢেলে দিতে হলে, এই নতুন রেললাইনকে আরও বিশ মাইল জঙ্গলের ভিতর দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে হবে। তাই নতুন রেললাইন তৈরী হচ্ছে। সারাদিন কাজ চলে। পোড়া ডিজেলের ধোঁয়া ছড়িয়ে গোঁ-গোঁ করে মাটি খোঁড়ে প্রকাণ্ড দুটো ইউক্লিড, মাটি চৌরস করে ক্যাটারপিলারের খাঁজকাটা চাকার দাঁত। ওয়াগন বোঝাই হয়ে রেল আসে, স্লিপার আসে, ইস্পাতের দড়ির বড় বড় রীল আসে, আর আসে সিগন্যালের খুঁটি। ছোটকালুর ওপারে, ছোটকালুরই ছায়ার কাছে শাণ্টিং ইয়ার্ড। শাণ্ট করে ইঞ্জিন, নতুন লাইন গুর্ গুর্ শব্দ করে

কাঁপে।

মহুয়ার জঙ্গল ছিঁড়ে-খুঁড়ে দশ বিঘা জায়গা জুড়ে রেলওয়ের স্টোর ছড়িয়ে আছে। ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে সরঞ্জামে ভরা সারি সারি ওয়াগন। জানে না দাশু, আজকাল সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওয়াগনের লোডিং আর আনলোডিং-এ কাজ করে হরিপদ ; কপালবাবার জঙ্গলে সে আর মৌচাক ভাঙ্গতে যায় না।

তবে কি শুধু একটি দিকের আকাশ পুরনো মধুকুপির শান্তির ছায়া নিয়ে আজ বেঁচে আছে? ঐ দক্ষিণের দিকটা?

হ্যাঁ, দক্ষিণের দিকে তাকালে কপালবাবার জঙ্গলের ছায়াঘন চেহারা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। কপালবাবার জঙ্গল, অনেক ঠাঁই জুড়ে অনেক ঝরনার শব্দ বুকের ভিতর লুকিয়ে, অনেক পাহাড়কে চারদিক থেকে পাক দিয়ে দিয়ে বন্দী করে রেখে, ক্রোশের পর ক্রোশ এক-একটা নতুন নাম নিয়ে রাঁচি জেলার সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। থানা বলে, প্রতি বছর শীতকালে বাঘিন কানারানী কপালবাবার এই জঙ্গল থেকে সরে গিয়ে, রাঁচির পাহাড়ী ঘাটগুলিকেও পার হয়ে, একেবারে পালামৌয়ের রিজার্ভ জঙ্গলের গভীরে গিয়ে লুকিয়ে থাকে।

ঘরের দাওয়ার কাছে একঠায় দাঁড়িয়ে কপালবাবার জঙ্গলের দিকে অপলক চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে দাশু। কপালবাবার জঙ্গল আছে ঠিকই, কিন্তু কপালবাবা আছে কি? দাশুর চোখ দুটো কটকট করে, বুকটা হাঁসফাঁস করে। মনের ভিতরটা যেন আর্তনাদ করে--কপালবাবা তুমি আছ, কি আছ নাই? মরেছ, কি মর নাই?

যেন একটা শেষদেখার আক্রোশ নিয়ে মুরলীর মুখের দিকে একবার তাকায় দাশু। দাওয়ার খুঁটির কাছে উবু হয়ে বসে আর হাঁটুর উপর মুখটা পেতে দিয়ে চুপ করে বসে আছে মুরলী। মাটির উপর নখ দিয়ে হাবিজাবি আঁকছে আর কি-যেন ভাবছে। মনে হয়, একটা দুরন্ত ভাবনার সুখে নির্লজ্জ হয়ে নতুন সৌভাগ্যের হিসেব করছে মুরলী। ওকি? মুরলীর চোখে জল কেন? কিন্তু দাশু ঘরামির সন্দেহের হিসাবেও আর ভুল হয় না। মুরলীর ওই চোখের জল জলই নয়।

একবার দাশু ঘরামির এই মজবুত শরীরের একটা কষ্ট দেখে কেঁদে ফেলেছিল মুরলী। কাঁকড়া বিছার কামড়ে বিষিয়ে ফুলে গিয়েছিল দাশুর শরীরটা। দাশুর গায়ে হাত বোলাতে গিয়ে জলে ভরে গিয়েছিল মুরলীর চোখ। কিন্তু মুরলীর এই চোখ সেই চোখের মত নয়, আর দাশুর গায়ে হাত বোলাবার জন্য মুরলীর মনে আজ আর কোন সাধও নেই।

একবার মুরলীর নিজেরই একটা অসুখ হয়েছিল। একমাস ধরে জ্বরে আর বুকের ব্যথায় কষ্ট পেয়েছিল। দাঁড়াতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়েছিল।--আমার মরণ এসেছে গো। বলতে গিয়ে মুরলীর চোখ জলে ভরে উঠেছিল।

না, সে রকমের দুখিনীর চোখও নয়। সিস্টার দিদির দয়া পেয়েছে যে, পলুস হালদারের পিপাসা মেটাতে গিয়ে হেসে উঠেছে যে, দাশু ঘরামির ঘর করবার সাধ শেষ করে দেবার ইচ্ছে হয়েছে যার, তারই চোখ দুটো নতুন ঢং করে জল ঝরিয়ে হাসছে।

কিন্তু মুরলীর চোখের এত কাছে মাটির উপর আর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে দাশু ঘরামির পা দুটো পুড়ে শেষ হয়ে যাবে। জ্বলতে শুরু করেই দিয়েছে। এখনি ছুটে গিয়ে কপালবাবার আসনের কাছে আছড়ে না পড়া পর্যন্ত এই জ্বালা বোধহয় শান্ত হবে না।

কিন্তু চমকে ওঠে দাশু। দাশু ঘরামির পায়ের জ্বালার উপর এক ঝলক ঠাণ্ডা জল হঠাৎ শব্দ করে ছড়িয়ে পড়েছে।

পলুস হালদারের পিপাসা মিটিয়ে দিয়েছিল যে ঘটিটা, সেই ঘটি হাতে নিয়ে দাশু ঘরামির পায়ের উপর হঠাৎ জল ঢেলে দিয়েছে মুরলী। মনটা বিশ্বাস করতে না চাইলেও

দাশুর চোখ দুটো অস্বীকার করতে পারে না, সত্যি মুরলী জল ঢেলেছে। কী আশ্চর্য, অনেকদিন আগের একটি সন্ধ্যার উৎসবের ছবি আবার এই সময়ে দাশু ঘরামির আজকের এই আশাহীন জীবনের সবচেয়ে দুঃসহ লগ্নে হঠাৎ জীবন্ত হয়ে ওঠে কেন? সেদিন ঢোল বেজেছিল, মহেশ রাখাল কেঁদেছিল, ঝালদার এক কুটিরের আঙ্গিনায় হাঁড়ি হাঁড়ি মহুয়া-মদের নেশায় ভাইয়ারি মেতে উঠেছিল। গাঁও-পঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে মুরলীর মাথায় সিঁদুর দিয়েছিল দাশু। সিঁদুরদানের পর এক ঘটি জল দাশুর পায়ের উপর ঢেলে দিয়ে মুখ টিপে লাজুক হাসি লুকিয়েছিল যে মুরলী, সে মুরলী কি সত্যিই মরে যায় নি?

দাশু বলে—কি হলো?

মুরলী বলে—জানি না।

দাশু—তবে?...

—এসো তবে। ঘরে চল। ডাক দেয় মুরলী। আর দাশুও যেন একটা জাদুর আবেদনে মুগ্ধ হয়ে মুরলীর পিছু হেঁটে ঘরের ভিতর ঢোকে।

—বসো! মুরলীর একটি অনুরোধের শব্দেই মুগ্ধ মানুষের মত অবশ হয়ে ঘরের মেঝেতে খেজুরপাতার চাটাইয়ের উপর বসে পড়ে দাশু।

মুরলী বলে—একটা কথাও বলবে না। বড় বড় চোখ করে তাকাবে না। চুপচাপ খেয়ে নাও।

দাশুর হাতের কাছে বাঁশের ডালা ভরে মকাইয়ের খই, দু ঢেলা গুড়, একটা শশা আর এক ঘটি জল রেখে দিয়ে মুরলী নিজেও মেজের উপর পা ছড়িয়ে বসে।

কয়েদ খেটে পাঁচ বছর পরে ঘরে ফিরে এসে দাশুর পেটের ক্ষুধাটাও যেন এইবার পুরনো স্বাদের মধুরতায় ভরে যায়। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই প্রথম খাবারের চেহারা দেখতে পেয়েছে দাশু। পাঁচ বছর পরে এই প্রথম মধুকুপির মকাইয়ের খই মুখে দিল দাশু। জেলের ভাত খাওয়া জীবনের সব বিস্বাদগুলিকে এখন একটা মিথ্যা দুঃস্বপ্ন বলে মনে হয়। মধুকুপির মাটিতে যে শসা ফলে, সেই শসা ; মধুকুপির মাটিতে যে আখ ফলে, সেই আখেরই গুড়। দাশুর পেট ভরছে, সেই সঙ্গে বুকটাও অগাধ তৃপ্তিতে ভরে যাচ্ছে। ঘটি তুলে ঢকঢক করে জল খায় আর ঢেকুর ছাড়ে দাশু।

চোখ তুলে মুরলীর দিকে তাকাতেই হেসে ওঠে দাশুর চোখ ঃ তুই কি আমার খাওয়া দেখছিস, না, আমাকে দেখছিস?

দাশুর প্রশ্ন শুনে চমকে ওঠে মুরলীর শান্ত দুটি চোখ। ঠিক ধরতে পেরেছে দাশু। পাঁচ বছর কয়েদের খাটুনিতেও একটুও কাবু আর একটুও কাহিল হয়ে যায় নি মুরলীর জীবনের মরদ সঙ্গী দাশু ঘরামির ওই শরীর, শরীরের ওই পাথুরে ছাঁদ। দাশুর পিঠের দাঁড়া যেন একটা গভীর খাদের ছায়ার মধ্যে লুকিয়ে আছে। বুকের পাটা যেন দুটো চাকা চাকা পাথর দিয়ে গড়া। কপালের বাঁ দিকে ছোট্ট একটা রগ কুঁকড়ে আছে। হেসে ফেললেই কোমরটা লিকলিক করে দোলে, সেই সঙ্গে নাভিটাও শিউরে উঠে আরও গভীর হয়ে যায়। ভুলে যাবে কেমন করে মুরলী, মধুকুপির এই মানুষটারই গা ঘেঁষে মুরলীর জীবনের আট বছরের কত কামনা কতবার কত সুখের আবেশে গলে গিয়েছে?

মুরলী হাসে ঃ তোমাকেই দেখছি, দেখতে মানা আছে কি?

দাশুও হাসে ঃ তোর মরদকে তুই দেখবি, মানা করবে কে?

পা ছড়িয়ে অলস হয়ে বসে থাকা মুরলীর সেই খুশি শরীরটা হঠাৎ ভয় পেয়ে কেঁপে ওঠে। মুখের হাসি মিলিয়ে যায় আর পা গুটিয়ে আবার হাঁটুর উপর মাথা রেখে শরীরটাকে আবার শক্ত করে চেপে রাখতে চায়।

হঠাৎ মনে পড়েছে মুরলীর, সত্যিই যে মানা করেছে একজন। মুরলীকে এই পাঁচ বছরের

সব দুঃখের অভিশাপ থেকে বাঁচিয়ে, বরং আরও সুন্দর করে হাসিয়ে সাজিয়ে রেখেছে যে, সেই সিস্টার দিদির মানা আছে। সিস্টার দিদির কাছে যে শপথ করেছে মুরলী। না কখনো ভুল করবো না সিস্টার দিদি। আগে আমার মরদ ভাল মানুষ হবে, কলে কাজ নিবে, খিরিস্তান হবে, তারপর। তার আগে নয়। তার আগে মরদের পা ছোঁব না, কোমরও ধরবো না।

কিন্তু মহেশ রাখালের মেয়ের শক্ত প্রাণটা যে কাল রাতে হঠাৎ পাগল হয়ে গেল, আর এই শপথটাকেই একটা মাতাল খেলার আনন্দে ছিঁড়ে-খুঁড়ে শেষ করে দিল। সিস্টার দিদিকে মিথ্যে কথা বলতে বুকটা যে কেঁপে উঠবে। আর, সত্য কথা বললে যে আর মুখ দেখাবার অধিকার থাকবে না।

দাশু বলে--করম নাচবার সময় আমার কথা তোর মনে পড়ে নাই?

মুরলী—আমি করম নাচি নাই।

--কেন?

—সিস্টার দিদি মানা করেছে।

—আবার কেন ওর নাম করছিস? ওর কথা ছেড়ে দে।

--ছাড়বো কেন? সিস্টার দিদি দয়া না করলে মুরলী যে মরে যেত।

—মিছা কথা বকিস না মুরলী, কপালবাবার দয়া থাকলে কে তোকে মরাতে পারে?

চুপ করে মুরলী আবার আনমনার মত তাকিয়ে যেন একটা আনদুনিয়ার কথা ভাবতে থাকে। আর, ঘরের এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে একটা নতুন রকমের লাজুক হাসি মুখের উপর ছড়িয়ে কি-যেন খুঁজতে থাকে দাশু। দেখতে পেয়ে খুশি হয় দাশু, হ্যাঁ, ঘরের এক কোণে বিঁড়ের উপর বসানো সেই ছোট হাঁড়িটা আজও আছে। দাশুর জীবনের অনেক সন্ধ্যার আনন্দের বন্ধু ওই হাঁড়ির ভিতরে মধুকুপির মহুয়ার মাতাল রস আজও টলমল করছে।

দাশু বলে—হাঁড়িটাকে কাছে নিয়ে আয়। জেলের ভিতরে পাঁচ-পাঁচটা বছর এই হাঁড়িটাকে ভেবে ভেবে বুকটা যে কি তরাস ভুগছে, তুই বুঝতে পারবি না।

শুকনো চোখে ছোট একটা তুচ্ছতার ভ্রূকুটি পাকিয়ে নিয়ে মুরলী বলে—ও হাঁড়িতে কিছু নাই। কিছু থাকে না।

—কেন, তুই কি পরবের দিনেও হাঁড়িয়া খাস নাই?

—না।

--কেন?

—সিস্টার দিদির মানা আছে।

—তোর সিস্টার দিদি মানা করে কেন? খিরিস্তানীরা কি বোতলা সরাব খেয়ে নেশা করে না? লিলে লিলে করে নাচে না?

—জানি না।

—তা জানবি কেন? সিস্টার দিদির মিছা কথাও তোর ভাল লাগে?

বোধহয় দেখতে পায় নি দাশু, মুরলীর চোখের তারা দুটো আবার কেমন করে হঠাৎ ছটফটিয়ে উঠে আবার শান্ত হয়ে গেল। ঘরের আর-এক দিকের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে দাশু, আর চোখ দুটোও করুণ হয়ে যায়। দেয়ালের গায়ে মাদলটা ঝুলছে। কিন্তু শুকিয়ে চিমসে হয়ে গিয়েছে। মধুকুপির আকাশের মেঘকে, মধুকুপির ক্ষেতের ধানের শিষকে, মধুকুপির জীবনের কত আনন্দকে নাচিয়ে মাতাল করে দিয়েছে এই মাদলের বোল। মহুয়ার নতুন ফুলের গন্ধকে এই মাদলটাই যে ডেকে ডেকে বরণ করেছে। সে জিনিসটার এমন দশা!

মাদলটাকে নামিয়ে এনে ধুলো ঝাড়তে থাকে দশু। ফুঁ দেয়, হাত দিয়ে ঘষে, টোকা

মারে ঃ ইস্, এটাকে যে একেবারে মেরেই রেখেছিস।

মুরলী রাগ করে ঃ আমাকে বকছো কেন? আমি কি পুরুষ বটি যে, তোমার মাদল নিয়ে ধিতাং ধিতাং করবো।

দাশু শুকনো মুখে হাসে ঃ তা করতে বলছে কে? কিন্তু, এটাকে মাঝে মাঝে একটুক মুছমাছ করে আর আগুনে সেঁকে রাখতে পারতিস তো?

উত্তর দেয় না মুরলী। মনে পড়ে মুরলীর, সিস্টার দিদি যেদিন প্রথম এসে নতুন আশার রঙ ধরিয়ে দিয়ে গেল, সেদিন যে ভয় করেছিল মুরলী, সেই ভয়ই সত্য হয়ে উঠেছে। মানুষটা পাঁচ বছর পর ঘরে ফিরে এসে আবার সেই পুরনো আহ্লাদগুলিকেই খুঁজছে। আদুড়-গা হয়ে কোমরে গামছা বেঁধে হাঁড়িয়া খেয়ে চোখ লাল করে, মাদল পিটে পিটে নাচবার জন্য আবার ব্যস্ত হয়ে উঠেছে এই মানুষটার জীবনের সাধ।

মুরলীর চোখের দৃষ্টিটা হঠাৎ যেন সব তৃপ্তি হারিয়ে বিস্বাদ হয়ে যায়। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আবার হেঁট মাথা হয়ে ঘরের মেটে মেঝের উপর নখের দাগ আঁকতে থাকে মুরলী। মুরলীর মন যেন এই ঘরের দরজা থেকে সরে গিয়ে বাইরের একটা নতুন ভাষা, নতুন হাসি আর নতুন আহ্বানের মায়ার কাছে বসে সত্যিই হিসেব করছে।

আসি সরদারিন! খিরিস্তান পলুস হালদার কী সুন্দর নরম সুরে কথা বলে ! কী চমৎকার তাকায় ! গায়ে কামিজ, পরনে পেণ্টালুন, পায়ে বুটজুতো, হাতে বন্দুক ওই পলুস হালদার হারানগঞ্জের সিস্টার দিদিকে নিশ্চয় খুব ভক্তি করে। নিশ্চয় হারানগঞ্জের গির্জাবাড়ির কাছে, সেই ছোট ছোট বাংলাঘরের একটি ঘরে থাকে পলুস হালদার। নিশ্চয় কলে কাজ করে পলুস হালদার। সাইকেল চড়ে কাজের কারখানায় চলে যায়, আর সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে এসে গির্জাবাড়িতে প্রেয়ার সাধতে যায়। সিস্টার দিদি বলেন, একবার প্রেয়ার সাধলে সব পাপতাপ মুছে যাবে বহিন, তোমার জীবন সুখে ভরে যাবে।

আবার কবে আসবে পলুস হালদার? সত্যিই আসবে কি? মুরলীর নিঝুম চোখের উপর কত স্পষ্ট একটা ছবি ছটফট করে। পকেট থেকে রুমাল বের করেছে পলুস হালদার, আর মুরলীর ভীরুচোখের জল মুছে দেবার জন্য সেই রুমাল হাতে তুলে নিয়ে...।

চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী ঃ শুনছো?

চমকে ওঠে দাশু ঃ কি?

মুরলী—তুমি কবে কলে কাজ নিবে বল?

দাশু ভ্রূকুটি করে ঃ কলে কাজ নিব কেন? গাঁয়ের জমি কি মরে গেছে?

মুরলী—কি বললে?

দাশু—ঈশান মোক্তারের চিঠা নিব ; ভাগজ্যোত করবো।

মুরলী—তাতে পেট ভরবে? কত মকাই আর কত ধান ভাগে পড়বে?

দাশু—পেট ভরবে না জানি। তাই ভেবেছি, কপালবাবার জঙ্গলের মরা শালও ভাঙবো।

মুরলী—ঠিকাদারের দস্তুরি, জঙ্গল পুলিসের জলপানি, আর ঈশান মোক্তারের গো-গাড়ির ভাগ দিয়ে তোমার কাঠবেচা পয়সার কটা পয়সা বাঁচবে?

দাশুর চোখ দুটো হঠাৎ উদাস হয়ে যায়। মুরলীর আতঙ্ক একটুও মিথ্যে আতঙ্ক নয়। কিন্তু...কিন্তু জিউ-জান দিয়ে খাটলে কি কিছু টাকা জমানো যাবে না? আর, বিঘা দুই জমি কি...।

দাশু বলে—ভাবিস না মুরলী, একটুক সবুর কর।

মুরলী—কি করতে চাও?

দাশু—সব্জী ফলাবো। আমি একলা খেটে জেলখানার দুই বিঘা জমি কুপিয়ে কত সব্জী ফলিয়েছিলাম, তুই জানিস না।

মুরলী—কিন্তু দুই বিঘা জমি তোমাকে দিবে কে?

আবার সেই ভয়ঙ্কর সত্য, মধুকুপির মনিষজীবনের সবচেয়ে বড় অভিশাপের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে মুরলী। জমি দিবে কে? জমি কিনবার টাকা কই? টাকা জমবে কেমন করে? জিউ জান ভিড়িয়ে দিয়ে খাটলেও যে টাকা জমে না।

দাশুর উদাস চোখ দুটো হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে, আর এই দুর্ভাবনার প্রশ্নগুলিকে যেন একটি বিশ্বাসের জোরে হাসিয়ে দেবার জন্য হেসে ওঠে দাশু ঃ কপালবাবার দয়া থাকলে পেয়ে যাব, ভাবিস না।

মুরলী ভ্রূকুটি করে তাকায় ঃ তারপর কি হবে?

দাশু—কপি ফলাবো, আলু ফলাবো। ভাদুই সবজিও ফলাবো। আমি কোপাই করবো, তুই ঢেলা ভাঙ্গবি। আমি ছিটাই করবো, তুই বুনবি ; ক্ষেতটাকে বেড়া দিয়ে ঘিরে নিয়ে...।

দাশুর কথাগুলি যেন দাশুর সেই পুরনো স্বপ্নের আবোল-তাবোল বোল। শুকনো চোখে দাশুর মুখের দিকে তাকিয়ে মুরলী বলে—না। তুমি কলে কাজ নিবে। একটা-দুটা বছর কাজ শিখবে। সিস্টার দিদি বলেছে, তোমাকে সাহেবের খাদের কলঘরের মিস্তিরি করে দিবে। তিন কুড়ি, চার কুড়ি টাকা মাহিনা পাবে। আর আমি...।

হেসে ফেলে মুখে আঁচল চাপা দেয় মুরলী, যেন মুরলীর বুকের ভিতরে জোর করে চেপে রাখা একটা নতুন স্বপ্ন হঠাৎ এই মুখরতার সুযোগ পেয়ে হেসে উঠেছে।

দাশু—কি বটে?

মুরলী হাসে।—কি আবার বটে? আমি সিস্টার দিদির ইস্কুলে পড়তে যাব।

দাশুর পাঁজর টনটন করে ঃ ওসব কথা ছেড়ে দে। কী পাপ করেছিস যে সিস্টার দিদির ইস্কুলে পড়বি?

কটমট করে তাকায় মুরলী ঃ তবে কি আমি তোমার কামিন হয়ে খেটে খেটে গতর বুড়ো করে দিব?

—ছি, এমন মিছা কথাটি কেন বলিস মুরলী? নিজের মরদের সাথে কাজ করলে মেয়েমানুষ কি কামিন হয়ে যায়?

মুরলীর হতাশ মুখের দিকে তাকিয়ে কি-যেন ভাবে দাশু। তারপর আদরের সুরে ডাক দেয়—মুরলী! তুই ভাবিস না। কিচ্ছু ভাবিস না। আমি নিতাই মুদির ঠিকা জঙ্গলে খয়ের করবো। গাছ ভাঙ্গবো আমি, ছিলবো আমি, তুই জ্বাল দিবি। দিনে খাটবো, রেতে খাটবো। পঞ্চাশ টাকা হবেই বে মুরলী। তোর হাঁসুলী হবে, আমার নতুন মাদল হবে, আর...।

—না। দাশুর স্বপ্নাতুর মুখরতার বিরুদ্ধে একটা কঠোর আপত্তি হেঁকে বাধা দেয় মুরলী ঃ না, তুমি কলঘরে কাজ করতে যাবে, আমি নতুন ঘরে বসে রাঁধবো। রূপার হাঁসুলী নয়, তুমি সোনার দানার মালা কিনে দিবে। পরবের দিনে তুমি নতুন শাড়ি এনে দিবে।

—না, না, তুই পাগল হয়েছিস মুরলী। চেঁচিয়ে ওঠে দাশু—নতুন ঘরে নয়, তুই এই ঘরে থাকবি।

—আমি এই ঘরে থাকতে পারবো না।

—তোকে এই ঘরেই থাকতে হবে রে মহেশ রাখালের বেটি।

—না।

—হ্যাঁ। সোনার দানার মালা পরতে যদি সাধ হয়, তবে এই ঘরে থেকেই সাধ কর্ না কেন?

—না।

—কেন না? কুলের জঙ্গলে লা-পোকার ডাঁটি ভাঙবার ঠিকা নিব আমি। আমি ভাঙ্গবো, তুই কুড়াবি। আমি বোঝা বাঁধবো, তুই বোঝা মাথায় নিবি। ঈশান মোক্তারের ভাণ্ডারে পৌঁছে

দিয়ে আসবি। তুই পয়সা পাবি, আমি পয়সা পাব। সুখ হবে, এই ঘরে থেকেই অনেক সুখ হবে।

--তোমার কপাল হবে! গেঁয়ো মধুকুপির একটা অসার দুর্বল আর মূর্খ স্তুতিকে যেন একটা ধিক্কার দিয়ে উঠে দাঁড়ায় মুরলী।

--কি ভেবেছিস তুই? বলতে বলতে এগিয়ে আসে দাশু।

সরে যায় মুরলী। দাশুর মনিষজীবনের এই অসার অহংকারের ছায়াটাকে আর সহ্য করতে ইচ্ছে করে না। দাশুর মুখের দিকে ছোট একটা ভ্রূকুটি হেনে আর রঙীন শাড়ির আঁচলটাকে দাঁত দিয়ে চেপে আস্তে আস্তে এগিয়ে যেয়ে দরজার চৌকাঠের উপর পা রেখে সামনের সড়কের দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

দাশু বলে—পথের দিকে মিছা তাকাস কেন? শিকারীটা নাই।

চমকে ওঠে মুরলী। আস্তে আস্তে মুখ ঘুরিয়ে দাশু ঘরামির হিংসুটে মুখটার দিকে কটমট করে তাকায়।

দাশু--কি বলছিস বল? মহেশ রাখালের বেটি যদি এক বাপের বেটি হয়ে থাকে, তবে বলুক, এই ঘরে থাকতে ঘিন্না লাগছে?

মুরলী—হ্যাঁ।

কেঁপে ওঠে দাশু। দাশু কিষাণের জীবনের সব মরদানির অহংকার, স্বামিপনার সব দুঃসাহস যেন বজ্রপাতে আহত বড়কালুর পাথুরে টিবির মত ফেটে খানখান হয়ে যায়। বড়কালুর ভেজা ঘাস বাজের আগুনের জ্বালা লেগে যেমন করে পোড়ে আর ধোঁয়া ছড়ায়, দাশুর জীবনের স্বপ্ন আর আশাগুলিও তেমনি করে পুড়ে যাচ্ছে আর ধোঁয়া ছড়াচ্ছে।

দাশু বলে, বলতে গিয়ে অলস অসহায় ও ভীরু একটা অবসাদের মধ্যে যেন নেতিয়ে পড়ে দাশুর গলার স্বর—তবে আর দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

মুরলী--চলে যেতে বলছো?

দাশু—হ্যাঁ।

সেই মুহূর্তে রঙীন শাড়ির আঁচলটাকে আরও শক্ত করে কামড়ে ধরে মুরলী। সড়কটার দিকে একবার তাকায়। পুরনো জামকাঠের জীর্ণ কপাটের ছোঁয়া থেকে শরীরটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছটফট করে ছুটে চলে যায়।

চুপ করে বসে, প্রাণহীন অসাড় একটা দেহ নিয়ে শুধু তাকিয়ে দেখতে থাকে দাশু। একটা মাছি উড়ে এসে দাশুর চোখের কাছে ভনভন করতে থাকে। দাশুর এই অসাড় চোখ দুটোকে বোধহয় মরা মানুষের চোখ বলে ভুল করে মাছিটা।

হঠাৎ দাশুর সেই মড়াটে চেহারা যেন নতুন রক্তের ঝলক লেগে তপ্ত হয়ে ওঠে। হাত দুটো কাঁপতে থাকে। কি যেন মনে পড়ে গিয়েছে দাশুর। টাঙ্গি টাঙ্গি টাঙ্গি! দাশুর হাত দুটো যেন এক প্রচণ্ড গর্বের দুঃসাহসে বেপরোয়া হয়ে সেই মুহূর্তে ঘরের চালার গোঁজ থেকে টাঙ্গিটাকে টেনে হাতে তুলে নিয়ে মুরলীর দিকে ছুটে যায়। মহেশ রাখালের বেটি যে দাশুর জীবনের একটা সাধের আশাকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

মুরলীর পথ আটক করে দাঁড়ায় দাশু ঃ আমার ছেইলাকে পেটে নিয়ে কোন্ নরকে পালিয়ে যাচ্ছিস রে মাগি?

—কি বললে? থরথর করে কাঁপতে থাকে মুরলী।

—আমার ছেইলা! চিৎকার করে দাশু।

বুনো মধুকুপির একটা প্রচণ্ড দাবি গর্জন করে মুরলীর পথ আটক করেছে। কিন্তু মুরলীর শরীরের সব রক্তমাংস যে জানে, মুরলীর কোমরের একটা নিবিড় ব্যথাও যে বিশ্বাস করে, একটুও মিথ্যে নয় এই দাবি। দাশু ঘরামির ছেইলাকে যেন ভয়ানক ধূর্ত আর লোভী চোরের

মত পেটের কোটরের ভিতর লুকিয়ে রেখে পালিয়ে যাচ্ছে মুরলী।

মুরলীর চোখ দুটো কেঁপে ওঠে। রঙীন শাড়িতে জড়ানো শরীরটা কুঁকড়ে যায়। মাথাটাও কাঁপতে কাঁপতে হেঁট হয়ে যায়। আস্তে আস্তে হেঁটে আর ফিরে এসে আবার ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ে মুরলী।

পাঁচ হাত উঁচু মাটির দেয়াল, আর খাপরার চালা। জামকাঠের জীর্ণ দরজার একটা কপাট খোলা, একটা কপাট ভেজানো। বড়কালুর গায়ে যখন বিকালের রোদ গড়িয়ে পড়ে, তখনও মধুকুপির এই ঘরের ভিতরে দুটি মানুষের প্রাণ সাড়া হারিয়ে নিঝুম হয়ে পড়ে থাকে। আকাশের দিকে তাকিয়েও দাশুর চোখ দুটো যেন মধুকুপির বিকালের এই চেহারাটাকে চিনতে পারে না। আর. মুরলীও বোধহয় বুঝতে পারে না, কতক্ষণ ধরে ওর মাথাটা হেঁট হয়ে আছে, আর হাতটা শুধু মেঝের মাটির উপর নখের দাগ এঁকেছে।

মধুকুপির আকাশ কাঁপিয়ে আবার শব্দের সেই ভয়ানক খেলা মেতে উঠেছে। বুম্ বুম্ শব্দ করে বাতাস ফাটে, গুর্ গুর্ করে বাতাস কাঁপে, আবার বাঁশি বাজিয়ে শিউরে ওঠে বাতাস।

চমকে ওঠে দাশু, যেন দাশুর জীবনের একটা অবসাদের ঘুম হঠাৎ ভয় পেয়ে ভেঙে গিয়েছে। এইবার মুখ ঘুরিয়ে দেখতে পায় দাশু, না, পালিয়ে যায় নি মুরলী। যদিও দরজা খোলা, দাশুর হাতে টাঙ্গিও নেই। নেশার ঘুমের চেয়েও বেশি নিরেট একটা অবসাদের ঘোরে দাশুর চোখের পাতাগুলি নেতিয়ে পড়েছিল।

মাটির উপর নখের দাগ আঁকছে মুরলী। হিসেব করছে মুরলী। মুরলীর শান্ত চোখের তারা দুটো যেন নিজের আলোর অহংকারে চিকচিক করছে। মুরলীর ওই হেঁট মাথা কি মরদের টাঙ্গির ভয়ে ভীরু হয়ে যাওয়া কোন নারীর মাথা?

না, ভয় পায় নি মুরলী ; ওর জীবনের স্বপ্ন একটুও ভীরুও হয়ে যায় নি। এই ঘরকে ঘৃণা করে, এই ঘরের ছোঁয়াচ থেকে আলগা হয়ে, গুটিশুটি হয়ে বসে আছে মুরলী। নিশ্চয় হিসেব করে দেখেছে, চলে যাবার সুযোগ কি আবার পাওয়া যাবে না?

একবার একটা আমগাছের মাথায় জাল পেতে একটা কোকিল ধরেছিল দাশু। ঘরের মধ্যেই কানের কাছে যখন-তখন কোকিলের ডাক শুনতে পাওয়া যাবে ; অনেক আশা করে, অনেক হেসে কোকিলটাকে একটা বাঁশের খাঁচায় বন্ধ করে ঘরের ভিতরে রেখেছিল। কিন্তু ডাকেনি কোকিলটা। একবারও না। খাঁচায় বন্ধ হওয়ামাত্র যেন প্রতিজ্ঞা করে ডাক বন্ধ করে দিয়েছিল চতুর পাখিটা। শেষে, কোকিলটাকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। আজও মনে পড়ে দাশুর, এই ঘরের দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে দেখতে আর শুনতে পেয়েছিল দাশু, খাঁচা থেকে বের হয়েই কোকিলটা ফুড়ুৎ করে উড়ে গিয়ে পথের ধারে ওই নিমের ডালে বসল আর ডেকে উঠল, কু-কু-কু। মনের সুখে যেন পাগল হয়ে ডেকে ডেকে আর দাশুকে ঠাট্টা করে তারপর উধাও হয়ে গেল পাখিটা।

মুরলীর প্রাণও ঠিক সেই কোকিলটারই মত চালাক। খাঁচায় বন্ধ হয়েছে মুরলীর প্রাণ। হাসবে না, নাচবে না, গাইবে না মুরলী। দাশু ঘরামির সব আশা আর কল্পনাকে জব্দ করে দেবে। একদিন, যেদিন ছাড়া পাবে মুরলী, ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে দাশু, সেদিন আনন্দেরই ডাক ডেকে হাসতে হাসতে চলে যাবে। নেই, এই ঘরের মধ্যে পড়ে থাকলেও মুরলী আর নেই। এভাবে টাঙ্গির ভয়ে পড়ে থাকা যে মরে থাকার মতই না-থাকা।

মুরলীর চোখদুটো হাসছে। চমকে ওঠে দাশু। মাথা তুলেছে মুরলী, মুখ ঘুরিয়ে দাশুর মুখের দিকে কটমট করে তাকিয়েছে। দাশুর টাঙ্গির চেয়েও বেশি শাণিত আর প্রখর, মুরলীর সেই হিসেব করা ভাবনাগুলি যেন হেসে উঠেছে।

মুরলী বলে--টাঙ্গি হাতে নিয়ে তেড়ে এলে, কিন্তু মারলে না কেন?

দাশু খিড়বিড় করে--আর একবার চলে যেতে চেষ্টা করে দেখ না কেন, মারি কি না।

মুরলী--মারলে মরবে কে?

দাশু--মরবে মহেশ রাখালের বেটি, খিরিস্তানী হবার সাধ হয়েছে যে কিষাণী মাগির।

মুরলী--তোমার ছেইলাটা মরবে না?

দাশুর বুকের হাড়ের উপর যেন টাঙ্গির কোপ পড়েছে। চোখ দুটো কেঁপে ওঠে।

মুরলীর কটমট করে তাকানো সেই চোখের মধ্যে একটা চতুর ধিক্কারের হাসিও জ্বলতে থাকে! মুরলী বলে--মহেশ রাখালের বেটি যদি একটা শিকড়বাকড় খেয়ে পেট খালি করে দেয় ; তবে...।

--থাম থাম, কিষাণের মাগ হয়ে ডাইনির মত কথা আর বলিস না। বুকফাটা একটা আর্তনাদ কোনমতে চেপে রেখে, আর কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ায় দাশু। এমন ভয় জীবনে কোনদিন পায় নি দাশু। মুরলীর চোখের মধ্যে সত্যিই শাণিত টাঙ্গির ছায়া দেখতে পেয়েছে দাশু। দাশুর জীবনের সবচেয়ে মিষ্টি লোভটা, দাশুর ছেইলার প্রাণটা যে এই মুরলীর দয়ার কাছে বাঁধা পড়ে গিয়েছে।

বলতে বলতে আবার ঘরের মেঝের মাটির উপর অলসভাবে বসে পড়ে দাশু। পাথুরে ছাঁদে গড়া এত শক্ত শরীরের সব হাড়ের গিঁটগুলি যেন খুলে ভেঙে ঢিলে হয়ে গিয়েছে। আনমনার মত হাত তুলে কি-যেন খোঁজে দাশু। বোধহয় একটা গামছাকে হাতের কাছে পেতে চায়। তারপর শিথিল হাতটা তুলে আস্তে আস্তে চোখ মোছে।

আস্তে আস্তে দাশুর কাছে এগিয়ে আসে মুরলী। দাশুর মুখের দিকে কটকটে চোখের একটা নতুন অস্থিরতা নিয়ে তাকিয়ে থাকে, অনেকক্ষণ। মুরলীর চোখে যেন হঠাৎ একটা ভয়ানক কাঁটার খোঁচা লেগেছে। জ্বলছে চোখ, কিন্তু জ্বালাটা যেন ভীরু হয়ে আস্তে আস্তে গলে যাচ্ছে।

দাশুর মাথার উপর হাত রাখে মুরলী ঃ কি হলো?

উত্তর দেয় না দাশু। দাশুর মাথার উপর আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে মুরলীর হাতটাও কাঁপতে থাকে ঃ তুমি কাঁদলে কেন বল?

কথা বলে না, বোধহয় বলারই শক্তি নেই, কিংবা সাহস নেই দাশুর। মহেশ রাখালের মেয়ে মুরলীকে জীবনে কোনদিন এত ভয় করে নি দাশু। নইলে মুরলীর হাতের ছোঁয়া মাথার উপর আদর বুলিয়ে দিলেও দাশুর গায়ের পেশীতে একটা শিহরও কি না কেঁপে থাকতে পারে?

দেখতে পায় না দাশু, মহেশ রাখালের সেই মেয়ে একটা হাত তুলে আস্তে আস্তে নিজেরই কটমটে চোখ দুটোকে কেমন করে মুছছে। মুরলী ডাকে--আমার কথাটা শুনছো কি?

দাশু--কি?

মুরলী--কোন কিষাণের ঘরে কি জোয়ান মেয়ে নেই?

দাশু--থাকবে না কেন? অনেক আছে।

মুরলী--তবে তোমার ভাবনা কিসের?

দাশু--কি বলছিস তুই?

মুরলী--তুমি তো আবার একটা বিয়া করতে পার, ছেইলাও পেতে পার।

দাশু ভ্রূকুটি, করে তাকায়। মুরলীও সেই মুহূর্তে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে--মুরলী মরে যাক না কেন? তোমার ভাবনা কিসের? কত কিষাণের মেয়ে তোমার হাতের সিঁদুর মাথায় নিয়ে খুশি হয়ে তোমাকে ছেইলা দিবে।

দাশু বলে--না।

মুরলী--কেন না?

দাশু--জানি না। আমি তোর মত হিসাব জানি না।

কিন্তু জানতেই হবে, শুনতেই হবে। মুরলী বলে--বলতেই হবে। আমি আজ জবাব নিয়ে ছাড়বো। যেন দুর্বার একটা জিদ মুরলীর মনের ভিতর কঠোর হয়ে চেপে বসেছে।

হিসাব করতে জানে না যে মাথাটা, দাশু তার সেই মাথা দু হাত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরে। কেন কিসের জন্য কি পেতে চায়, ঠিক বুঝতে পারে না দাশুর যে বুকটা, সেই বুকের উপর একবার হাত বুলোয় দাশু। যা বলতে চায় তা ঠিক করে গুছিয়ে বলতে পারে না দাশুর যে মুখটা, হাত তুলে সেই মুখ একবার মুছে নেয় দাশু। তারপর ঘরের দরজার দাওয়ার উপর বিকালের ছড়ানো আলোর দিকে তাকিয়ে আনমনার মত বিড়বিড় করে ঃ তুই রাগ করলে আমার যে বাঁচতে সাধ হয় না। কথাটা বুঝিস না কেন?

সরে যায় মুরলী। কিন্তু দাশুরই মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বোধহয় মুরলীর হিসেব করে চলা ভাবনার আর বুদ্ধির সব জোর হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে এলোমেলো হয়ে গিয়েছে।

ঘরের ভিতর ছটফট করে ঘুরে বেড়াতে থাকে মুরলী। কান দুটো যেন দাশুর মাদলের বোল শুনতে পেয়েছে, তাই দুপায়ে নাচের নেশা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বার বার চুমুক দিয়ে হাঁড়িয়ার নেশা বুকের ভিতর ভরে নিতে ইচ্ছে করে। ভিজে গিয়েছে ঠোঁট দুটো। হবে, খুব হবে। এই মানুষটার শুধু কোমর ধরে সারা জীবন এই ঘরের ভিতর পড়ে থাকলেও সুখ হবে, অনেক সুখ।

বিছানাটাকে একটা টান দিয়ে গুটিয়ে পাকিয়ে এক দিকে সরিয়ে দেয় মুরলী। সেলাইয়ের কলটাকে চোখে পড়ে। একটুকরো চট দিয়ে কলটাকে বোঁচকার মত বেঁধে ঘরের এক কোণে রেখে দেয়। তারপর নিজের চেহারাটার দিকেও চোখ পড়ে। সত্যিই, একটা নতুন নেশার সুখে মত্ত হয়ে শাড়ি জামা আর সায়া দিয়ে তৈরী করা এই সাজটাকেও সরিয়ে দিতে চায় মুরলী।

ঘরের দরজার কাছে তেমনই নীরব নিরেট অলস আনমনা চেহারা নিয়ে বাইরের পথের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে দাশু। যখন বিকালের আলো মরে আসে, আর ঘরের চালার উপর ক্লান্ত পাখির মেলা বসে যায়, তখন দাশু ঘরামির স্তব্ধ চোখ দুটি যেন ধোঁয়া লেগে কটকট করে ওঠে।

সত্যিই ধোঁয়া। ঘরটা ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছে। রেড়ির তেলের বাতিটা জ্বলছে। ঘরের কোণে উনানের ভিতরে শুকনো বাঁশপাতার আগুন জ্বলছে। রান্না করছে মুরলী। ভাতের হাঁড়িতে টগবগ করে জল ফুটছে।

আর মুরলীর চেহারাটা একেবারে কিষাণী হয়ে গিয়েছে। খাটো শাড়ি দিয়ে জড়ানো মহেশ রাখালের মেয়ে সরু কোমরের উপর ছোট আঁচলের ঝালর ঢলে পড়েছে। হাত চালিয়ে কাজ করছে মুরলী। মুরলীর আদুড় গায়ের নরম-নরম গড়নগুলি দুলছে কাঁপছে দুমড়ে যাচ্ছে।

একটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় দাশু। যেন এতক্ষণে পাঁচ বছর আগের একটা আনন্দের জীবন্ত মাদলকে চোখে দেখতে পেয়েছে। মুরলীকে শক্ত করে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বুকের উপর তুলে নেয় দাশু।

--মুরলী, তুই আমার মুরলী। তুই কোথায় যেতে চাস বল্? চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

মুরলী মুখ টিপে হাসে--তুমি যেথা নিয়ে যাবে।

দাশু--আজ কোথাও যাব না।

মুরলী--যেও না।

দাশু—কাল যাব।

মুরলী—যেও।

দাশু—কিষাণ আর কিষাণীতে মিলে একসাথে যাব, কেমন?

মুরলী—হ্যাঁ।

দাশু—ঈশান মোক্তারের কুঠিতে গিয়ে চিঠা নিব।

মুরলী—নিও।

দাশু—তিন বিঘা জমি নিয়ে ভাগজোত করবো।

মুরলী—করো।

বুকে জড়ানো মুরলীকে আদরের চাপে যেন পিষে দিয়ে দোলাতে থাকে দাশু। ডরানির স্রোতের মত কলকল করে মুরলীর বুকের ভিতর থেকেও একটা উতলা খুশির হাসি উথলে পড়তে থাকে। মধুকুপির কিষাণ ও কিষাণীর জীবনের ঝুমুর এতক্ষণে সব অভিশাপের জ্বালা থেকে মুক্তি পেয়ে নেচে উঠতে পেরেছে।

মুরলীর দু'হাত ধরে হেসে হেসে আর দুলে দুলে সুর করে ছড়া গেয়ে ওঠে দাশু—তু যাস কুথাকে, হেই কিষাণী।

মুরলী চোখ টিপে হাসে—নাইহর যাব, ডহর জানি।

দাশু—কিসের এত গমর হয়।

মুরলী—উমর কমর বুড়া নয়।

দাশু—কিষাণী তুর চিকণ চুল।

মুরলী—কে দিবেক ঝিঙ্গা ফুল।

দাশু—মোর ঘর যাবি কি?

মুরলী—মন দিব লিবি কি?

দাশু—ছল মন লিব না।

মুরলী—যৈবন দিব না।

চেঁচিয়ে ওঠে দাশু—কি বললি?

দাশুর মুখ একটা হাত দিয়ে চেপে ধরে মুরলী বলে—চুপ কর।

ভোর হয়েছে। চালার ফুটো-ফাটল দিয়ে মধুকুপির আকাশের চোখ দাশু ঘরামির ঘরের ভিতর হেসে হেসে উঁকি দেয়। ঘুম ভেঙেছে দাশুর, আর মুরলীর ঘুমন্ত শরীর তখনও ছোট মাদলটার মত দাশুর দু হাতের শক্ত বাঁধনে বাঁধা হয়ে দাশুর বুকের সঙ্গে সেঁটে আছে।

দাশু ডাকে—শুনছিস!

ভাঙা ভাঙা ঘুমের মধ্যে ফিসফিস করে মুরলী—হ্যাঁ, শুনছি।

দাশু—তবে ওঠ না কেন?

মুরলী—না।

দাশু—ভুলে যাস কেন?

মুরলী—কি?

দাশু—রাতের বেলা কত কথা হলো, মনে নাই?

রাতের বেলার কথা? কি কথা? না, মুরলী মনে করতে পাছে না। শুধু মনে পড়ে হাঁড়িতে মহুয়ার জল ছিল না, তবু দুজনে মিলে, মধুকুপির কিষাণ আর কিষাণী সেজে একসঙ্গে বসে এক থালাতে ফেনভাত খেয়ে আর হেসে হেসে যেন একটা মিথ্যা নেশার আবেশে বিভোর হয়ে মিছিমিছি অনেক গল্প করেছিল।

দাশু বলে—ভুলে গেলি কেন, এখন একবার ঈশান মোক্তারের কুঠিতে যেতে হবে?

মনে পড়ে মুরলীর। আর মনে পড়া মাত্র ভয় পেয়ে চমকে ওঠে। ঠিক কথা, রাতের বেলা দাশু কথাটা বলেছিল বটে। অন্তত বিঘা তিনেক জমি ভাগজোত করবার জন্য ঈশান মোক্তারের কুঠিতে গিয়ে চিঠা নিতে হবে।

মুরলী বলে--যাও না কেন?

আশ্চর্য হয় দাশু ঃ আমি তো যাবই : কিন্তু তুই কি যাবি না?

মুরলী--না।

দাশু--তুই যে বললি, যাবি।

মুরলী--বলেছিলাম ; কিন্তু আমি যেতে পারবো না।

দাশু -কেন? তুই আবার কি ভাবলি?

মুরলী--আমি যাব না।

দাশু--কেন?

মুরলী--লাজ লাগে।

দাশু--আমার সাথে যাবি, তাতে লাজ কিসের?

মুরলীকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে থাকা দাশুর হাত দুটোকেই হঠাৎ একটা ঠেলা দিয়ে চমকে দেয় মুরলী।--ছাড়।

হাতের বাঁধন আলগা করে দিয়ে মুরলীকে ছেড়ে দেয় দাশু। মুরলী আস্তে আস্তে সরে গিয়ে ঘরের মেঝেয় মাটির উপর চুপ করে বসে থাকে। নিজের চেহারার দিকে শুধু নয়, যেন নিজের জীবনের দিকে আবার চোখ পড়েছে মুরলীর। মুরলীর ঘুম-ভাঙা চোখ দুটো এই খাটো শাড়ি ও আদুড় গায়ের দিকে তাকিয়ে ভয়ানক লজ্জা পেয়েছে।

--কি হলো? বেশ একটু শক্ত স্বরে, দাঁত চিবিয়ে প্রশ্ন করে দাশু।

মুরলী বলে--আমি যাব না।

মুরলীর গলার স্বরে একটা অদ্ভুত আতঙ্ক। ভয় পেয়েছে মুরলী। মধুকুপির মাটির কাঁকর ধূলো আর কাঁটার মধ্যে জীবনটাকে সঁপে দিতে হবে, ভাবতেই যে মুরলীর বুকটা কেঁপে উঠেছে। অসম্ভব। সারা মধুকুপির মানুষ এই পাঁচ বছর ধরে মুরলীর নতুন চেহারা দেখেছে, আর হিংসেয় জ্বলছে। তবে আবার কেন? মধুকুপির কিষাণ আর কিষাণীগুলির চোখে-মুখে ঠাট্টার সুখ জাগিয়ে দেবার জন্য নিজেকে ছোট করে দিতে পারবে না মুরলী। সিস্টার দিদির এত উপকারের অপমান করতে পারবে না। কেন, কিসের দুঃখ, কার ভয়ে কিষাণী হয়ে যেতে হবে?

দাশু বলে--তুই যাবি, যেতে হবে।

মুরলী--না, আমি তোমার কামিন নই।

দাশু উঠে দাঁড়ায় ঃ আবার সেই কথা!

মুরলী--আমি কিষাণী হতে পারবো না।

দাশু--কিষাণের মাগ তুই কিষাণী হবি না তো কি হবি?

উত্তর দেয় না মুরলী। মুরলীর আরও কাছে এগিয়ে এসে চাপা গর্জনের মত স্বরে প্রশ্ন করে দাশু--কার মাগ হতে তোর সাধ হয়েছে রে?

উত্তর দেয় না মুরলী। একটা হাত এগিয়ে দিয়ে মুরলীর হাত ধরবার চেষ্টা করে দাশু ঃ চল্।

হাত দুটো গুটিয়ে পেটের কাছে লুকিয়ে মুরলীও শক্ত হয়ে একটা কঠোর অবাধ্যতার গর্বে অনড় হয়ে বলে--না।

দাশু--আমি তোর ঝুঁটি ধরে হিঁচড়ে নিয়ে যাব।

দাশুর চাষাড়ে আক্রোশ হঠাৎ যেন মরিয়া হয়ে মুরলীর একটা হাত ধরবার জন্য মুরলীর

উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

কিন্তু পিছন থেকে জামকাঠের কপাটটা যেন প্রচণ্ড টিটকারি দিয়ে বেজে ওঠে। কপাটের উপর যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। ভোঁতা ভোঁতা ভারি শব্দ।

দাশু ঘরামির কান চমকে ওঠে। তারপর শরীরটাই স্তব্ধ হয়ে যায়। তারপর এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দেয় দাশু।

—এই যে, মাল যে ঘরের ভিতরেই আছে দেখছি।

কী কুৎসিত উল্লাসের স্বরে চেঁচিয়ে উঠল একটা লোক! পিতল বাঁধানো মোটা ও বেঁটে একটা লাঠি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। এই লোককে জীবনে কখনও দেখেছে বলে মনে করতে পারে না দাশু। খাকি গরম কোট গায়ে, খাকি পা-জামা পরা। রুমাল দিয়ে মাথাটা এক পাক বাঁধা। লোকটার গরম কোটের বুকের কাছে পকেটের মধ্যে ছোট একটা বই আর পেন্সিল। লোকটার ঠোঁটের উপর মোটা মোটা একজোড়া গোঁফ নেতিয়ে রয়েছে।

এই লোকটারই পাশে আর একজন দাঁড়িয়ে আছে। তাকে চিনতে পারে দাশু। রামাই দিগোয়ার; নীল উর্দি গায়ে, কোমরে চামড়ার পেটি, হাতে চকচকে টাঙ্গি। এই রামাই দিগোয়ার বাবুরবাজার ফাঁড়ির চৌকিদার।

রামাই দিগোয়ার ডাকে--চলে এসো দাশু।

সঙ্গী রামাই দিগোয়ারের মুখের দিকে তাকিয়ে উর্দির লোকটা মাথা দোলায় আর বিড়বিড় করে—আমার আর সন্দেহ নাই, রামাই ; এ বেটা গুপীর দলের একটা পাপী বটে ; না হলে শালার চোখ দুটো এত ডাঁট করে তাকায় কেন?

দাশু—কেন? কোথায় যাব? আমাকে আবার মিছা কেন ডাকছো, রামাই?

রামাই মিচকে হাসি হেসে গোঁপালো লোকটাকে দেখিয়ে দেয়।--চৌধুরীজীকে শুধাও।

লোকটা বলে—আমি গোবিন্দপুর থানার পুলিস মুন্সী।

দাশু ফ্যালফ্যাল করে পুলিস মুন্সী চৌধুরীজীর কঠোর মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকে। চৌধুরীজী তার হাতের পিতল বাঁধানো লাঠির গায়ে হাত ঘষে চেঁচিয়ে ওঠে।—এ শালা খুব শক্ত মাল বটে রামাই। দেখছিস না, শালা একটা সেলামও করছে না।

দাশুর হাত কাঁপে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকেও বুঝতে পারে, মুরলী এসে পিছনে দাঁড়িয়েছে। দাশুর হাতের কাঁপুনি যেন হঠাৎ হিংস্র হয়ে আবার টাঙ্গি খুঁজে নিতে না পারে ; তাই বোধহয় পিছনে এসে পথ আটক করেছে মুরলী। বেশ তাই হোক্।

রামাই দিগোয়ার বলে—আজ তিনদিন হলো তুমি ছাড়া পেয়েছ। কিন্তু থানাতে হাজিরা দিতে যাও নাই। কোথায় ছিলে তুমি?

দাশু—ঘরে ছিলাম।

রামাই হাসে—বেশ তো, চল এবার ; থানাতে গিয়ে এই কথাটি বলে এসো।

গর্জন করে চৌধুরীজী--মিথ্যুক চোট্টা! এই দুই দিন গাঁয়ের একটা লোকও তোমাকে দেখে নাই। সারা গাঁ ঘুরে আমি রিপোর্ট নিয়েছি।

অভিযোগ মিথ্যা নয়। দাশু ঘরামির এই তপ্ত মাথাটাও স্মরণ করতে পারে, এই দুটি রাত আর একটি দিন, সারাক্ষণ মহেশ রাখালের সুন্দর-মুখ মেয়ের সোহাগ ভিক্ষে করতে করতেই পার হয়ে গিয়েছে। ঘর থেকে বের হয়ে গাঁয়ের কোন মানুষের সঙ্গে সুখদুঃখের একটা কথাও বলে নি দাশু।

—চল। পিতল বাঁধানো লাঠিটাকে দরজার কপাটে ঠুকে হাঁক দেয় পুলিস মুন্সী চৌধুরীজী।

—চলেন। কথাটা বলেই ছোট্ট আর্তনাদের মত তীক্ষ্ণ ও করুণ একটা শব্দ আছড়ে দিয়ে দরজার চৌকাঠ থেকে একটা লাফ দিয়ে দাওয়ার উপর নেমে পড়ে দাশু।

—যেতে হবে না, যদি দশটা টাকা দাও। লাঠির মাথাটাকে শুঁকে শুঁকে কথা বলে চৌধুরীজী।

—না, দিব না। জবাব দেয় দাশু।

—তবে চল। চেঁচিয়ে হাঁক দেয় চৌধুরীজী।

আগে আগে পুলিস মুন্সী চৌধুরীজী, মাঝখানে দাশু, পিছনে রামাই দিগোয়ার। মধুকুপির সকালবেলার রোদ গায়ে মেখে ছোট একটা অদৃষ্টের মিছিল সড়কের উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে চলে যেতে থাকে। রামাই দিগোয়ারের টাঙ্গিতে টাটকা রোদের হাসি চিকচিক করে। আর দাশুর গায়ের নতুন গেঞ্জিতে সিঁদুরের ছোপগুলি ছোট ছোট শুকনো রক্তের ছোপের মত সকালের রোদে পুড়তে পুড়তে চলে যায়।

দরজার চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে মুরলী। শুকনো খটখটে চোখ। মুরলীর সে চোখে শুধু ধোঁয়া আছে, জল নেই। যেন স্মৃতি হারিয়েছে মুরলী। কে চলে গেল, কেন চলে গেল, যেন বুঝতেই পারছে না মুরলী।

দরজার চৌকাঠ থেকে একটা দৌড় দিয়ে ছুটে গিয়ে সড়কের পাশে নিমের ছায়ার কাছে উঁচু পাথরের টিলার উপর দাঁড়ায় মুরলী। এখনও দেখতে পাওয়া যায়, তিনটে মানুষের মিছিল হন হন করে হেঁটে ডরানির ছোট পুলের দিকে এগিয়ে চলেছে। দাশুকে দেখবার জন্য গাঁয়ের ছেলেমেয়ে আর মাগি-মরদ ছুটে এসে পথের পাশে ভিড় করেছে।

টিলার উপর দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকে মুরলী। না আর দেখা যায় না। পথের বাঁকে ওরা ঘুরে গিয়েছে। ছি ছি, লোকটা যে একবার মুখ ফিরিয়ে তাকালও না। পাঁচ বছর আগে গ্রেপ্তার হয়ে চলে যেতে যেতে ওই লোকটাই তো ছলছল চোখ নিয়ে মুখ ফিরিয়ে মুরলীর দিকে বার বার তাকিয়েছিল।

যাবে আর কোথায়? ছাড়া পেয়েই তো আবার ছুটে আসবে। মহেশ রাখালের বেটি মুরলীকে না জ্বালাতে পারলে মানুষটা যে মরেই যাবে।

ধোঁয়াটে চোখের জ্বালা হাত দিয়ে মুছে ফেলতে চেষ্টা করে মুরলী। সামনের ঐ সড়কের আঁকা-বাঁকা চেহারার দিকে আর তাকাতেও ইচ্ছা করে না। তাকালেই চোখে জ্বালা লাগে। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে পুব দিকের ফাঁকা পথের ছায়া-ছড়ানো শান্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকে।

ও কে বটে গো? কে আসছে? চমকে ওঠে মুরলী।

আস্তে আস্তে হেঁটে, বন্দুকটাকে কাঁধের উপর রেখে, দুলতে দুলতে সকালবেলার ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে মুখের ফুরফুরে হাসি একেবারে মিশিয়ে দিয়ে এই দিকেই এগিয়ে আসছে পলুস হালদার।

এদিকেই যদি আসছে তবে ওখানে পথের উপর ওভাবে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো কেন পলুস হালদার? চুপ করে আর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেই বা কি? হ্যাঁ, জীয়লে ফুল ধরেছে। কিন্তু শিকারীর চোখ কি গাছের ফুলের শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল? তাই কি দেখতে পেল না যে, মুরলী এখানে দাঁড়িয়ে আছে?

মুরলীর মনের ভিতরে যেন একটা অভিমান হতাশ হয়ে যায়। ভুল হয়েছে। পলুস হালদারকে একটুও বুঝতে আর চিনতে পারে নি মুরলী। রাত জেগে মাচানে বসে থাকা একটা ক্লান্ত শিকারীর দু চোখের নকল পিপাসাকে একেবারে একটা খাঁটি প্রাণের ডাক বলে মনে করে মুরলী বৃথা নিজের বুকটাকে একটা মিথ্যা গর্বে ভরে দিয়েছিল। শুধু এক ঘটি জল খেয়ে খুশি হবার জন্য এসেছিল পলুস হালদার। তার চেয়ে বেশি কোন পলুস হালদারের চোখে ছিল না।

পাথুরে টিলার উপর একটা পাথুরে ছবির মত শক্ত হয়ে বোধহয় আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকত মুরলী, যদি মুরলীর স্তব্ধ শরীরটাই হঠাৎ সির-সির করে না উঠত। মুরলীর হাঁটুর

কাছে অদ্ভুত একটা অস্বস্তি সুড়সুড় করে উঠছে। একটা ফড়িং, বেশ সুন্দর দেখতে একটা রঙিন চেহারার ফড়িং মুরলীর হাঁটুর উপর বসে পাখনা কাঁপিয়ে ফর্‌ফর্‌ করছে।

চমকে ওঠে মুরলী। ফড়িংটার দোষ কি? মুরলীর খাটো শাড়িতে যে মুরলীর হাঁটুও ঢাকা পড়ে নি। একেবারে খাঁটি একটা পাতা-কুড়ুনি আর আগাছা-বাছুনি কিযাণীর মত মুরলীর চেহারাটা যে আধ-উলঙ্গতায় বেলাজ হয়ে রয়েছে। ছি ছি ছি! মুরলীর এই চেহারা চোখে পড়লে পলুস হালদারের চোখ ভয় পেয়ে শিউরে উঠবে। পলুস হালদার যে কোন দুঃস্বপ্নে সন্দেহও করতে পারবে না, গড বাবার মেয়েটির মত দেখতে সেই সুন্দর সাজে সাজানো মুরলীর আবার এরকম একটা জংলা চেহারা থাকতে পারে।

ভালই হয়েছে। মুরলীকে চোখে পড়ে নি, কিংবা চোখে পড়লেও মুরলী বলে বুঝতে পারে নি পলুস হালদার। হাতের এক ঝাপটে রঙিন ফড়িংটাকে খেদিয়ে দেয় মুরলী। খাটো শাড়িতে জড়ানো আদুড় শরীরটাকে কুঁকড়ে আরও ছোট করে একেবারে লুকিয়ে ফেলবার জন্য বসে পড়ে। তার পরেই টিলা থেকে নেমে পড়ে। দৌড়ে গিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে কপাট বন্ধ করে দেয়।

বেশ কিছুক্ষণ পার হয়ে যায়। চুলের উপর চিরুণি চালিয়ে নতুন করে খোঁপা বাঁধে মুরলী। শাড়ি সায়া জামা পরে। চটি জোড়াও পায়ে দিতে ভুলে যায় না। মুরলীর যে-চেহারা দেখে পলুস হালদারের চোখে সেই আশার পিপাসা আবার চমকে উঠবে, সেই চেহারা একেবারে নিখুঁত করে নিয়ে বন্ধ দরজার কপাটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে মুরলী। আসবে পলুস হালদার, এই দিকেই আসবে, এই ঘরের এই দরজার কপাটের কাছে এসে পলুস হালদারের জুতোর শব্দ থমকে যাবে।

কিন্তু কই? আসছে না কেন পলুস হালদার? জীয়লের ফুলের দিকে এতক্ষণ ধরে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবার কি দরকার আছে? এখনও কি মানুষটার তেষ্টা পায় নি?

পলুস হালদারের উপর সন্দেহ করে আবার একটা অভিমান মুরলীর নিঃশ্বাস কাঁপিয়ে দিত নিশ্চয়, কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে মুরলীর, মনে পড়তেই মুরলীর চোখে-মুখে একটা আমুদে হাসির আভা চমকে ওঠে। মনে পড়েছে, অনুমান করতে পারছে মুরলী, শিকারীর চোখ একটা শিকার দেখতে পেয়েছে, তাই জীয়ল গাছের মাথার দিকে তাকিয়ে আর শক্ত হাতে বন্দুকটাকে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তাই আসতে দেরি করছে।

ওই জীয়লের মাথার উপরে পাতার ঝোপের আড়ালে দুটো মোটা মোটা ডালের চিপার মধ্যে কাদা দিয়ে লেপা ছোট্ট একটা বাসা আছে। আজ প্রায় দশদিন হল, ডিম মজাবার জন্য বাসার ভিতরে নিজেকে বন্ধ করেছে পাখিটা, একটা ধনেশী। ধনেশটা বাসার বাইরে বাসাটারই প্রায় গা ঘেঁষে বসে থাকে আর পাহারা দেয়। মাঝে মাঝে উড়ে যায় ধনেশটা, আর ঠোঁট ভরে ফড়িং নিয়ে এসে কাদালেপা বাসার ছোট ফুটোর ভেতর দিয়ে মুখ ঢুকিয়ে ধনেশীকে খাওয়ায়। মনে পড়ে মুরলীর, কদিন আগে একটা বেদিয়া এসে ঐ বাসা ভেঙে ধনেশীটাকে ধরবার জন্য গাছে উঠেছিল। কোথা থেকে লাঠি হাতে নিয়ে গালি দিতে দিতে তেড়ে এল পন্টনী দিদি—ভাগ এখান থেকে খালভরা, চোরের পুত, ড্যাকরা।

পন্টনী দিদির রাগ দেখে আর বেদিয়াটার ভয় দেখে হেসে ফেলেছিল মুরলী। বেদিয়াটা কাঁচুমাচু হয়ে মুরলীর কাছেই আবেদন করেছিল—তু বল তো দিদি, আমার কসুরটা কি? ধনেশীটাকে তেল করে বাতের ওযুধ বানিয়ে তুদিগেরই কাছে বেচে যাব, তুদিগেরই ভালাই হবে।

পন্টনী দিদি আবার তেড়ে আসে ঃ ভাগবি কিনা রে কসবির বেটা, নয় তো আজ তোকেই আগুনে চড়িয়ে তেল করে নিব।

দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিল বেদিয়াটা।

বন্ধ দরজার কপাটের কাছে দাঁড়িয়ে মুরলীর মুখে এখন সেদিনের হাসিটা নতুন করে যেন আরও আমুদে আবেগে চঞ্চল হয়ে কাঁপতে থাকে। নিজের হাসির শব্দ শোনে মুরলী, তার পরেই অন্য একটা শব্দ শোনে, বন্দুকের গুলির আওয়াজ। নিশ্চয় সেই বেহায়া মাদি-কাতুরে ধনেশটা, যেটা কাদালেপা খাসার গা ঘেঁষে বসে থাকে আর বাসা পাহারা দেয়, সেই ধনেশটাকে মেরেছে পলুস হালদার।

কপাট খুলে, দরজার চৌকাঠের কাছে দাঁড়ায় মুরলী। এইবার, এই দিকে না এসে আর কোন্ দিকে যাবে পলুস হালদার?

মুরলীর অনুমান মিথ্যে নয়। ভাবতে ভুল করে নি মুরলী। হ্যাঁ, এদিকেই আসছে, এসে পড়েছে পলুস হালদার। পলুস হালদারের হাতে মরা ধনেশটা ঝুলছে। পাখিটার পা দুটোকে যেন খিমচে ধরে রয়েছে পলুস হালদার। পাখিটার প্রকাণ্ড চওড়া ঠোঁট আর অসাড় মাথাটা প্রায় সড়কের ধুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে দুলছে।

--কেমন আছ সরদারিন? বলতে বলতে কাছে এগিয়ে এসে আর দাওয়ার উপরে উঠে মুরলীর প্রায় পায়েরই কাছে রঙীন একটা উপহারের মত রক্তমাখা পাখিটাকে ফেলে দিয়ে হাসতে থাকে পলুস হালদার।

--জল খাবেন কি? না, দরকার নাই? হাসতে হাসতে মুরলীও প্রশ্ন করে।

--খাব। জবাব দেয় পলুস।

একটি ঘটি জল নিয়ে আসে মুরলী। পলুস হালদার সেই জল ঢক ঢক করে খেয়ে হাঁফ ছাড়ে ঃ আমি এতটা ভাবি নাই সরদারিন।

--কি?

--আমি চাই নাই, কিছু বলিও নাই, তবুও তুমি বুঝে ফেলেছো।

--যা বলেন, মুখ খুলে বলেন না কেন?

--আমার পিয়াস তুমি বুঝতে পার।

--কিন্তু আপনি তো কিছু বুঝেন না।

--কি বুঝি না?

--আপনার এখানে আসা ভাল নয়, আর আমার হাতের জল খেয়েও আপনার কোন লাভ হবে না।

--তুমি জল দিলে আমি জল খেলাম। লাভ নেই বলছো কেন মুরলী?

মুরলীর চোখের তারা চমকে ওঠে ঃ আমার নাম জানলেন কিসে?

পলুস হালদার হাসে ঃ জেনেছি।

মুরলী ভ্রূকুটি করে ঃ নাম ধরছেন কেন?

পলুস--ইচ্ছা হলো।

--এমন ইচ্ছা ভাল নয়।

--জানি।

মুরলী চেঁচিয়ে ওঠে ঃ জেনেও বুঝি আমাকে জ্বালাবে তুমি?

মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকায় মুরলী। মুরলীর চোখ যেন একটা তীব্র অভিমান, একটা সন্দেহ, একটা উদ্বেগ। কিন্তু মুরলীর সেই উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে পলুস হালদারের চোখের সব আশার উদ্বেগ একেবারে শান্ত হয়ে গিয়েছে। মুরলীর রাগের ভাষাটা যে এরই মধ্যে পলুসকে ডাক দিয়ে আপন করে নিয়েছে।

পলুস ডাকে--মুরলী।

মুরলী বলে--না।

পলুস--কিসের না?

মুরলী—আমাকে জ্বালাবে কেন তুমি? কেন পিয়াস ঠাণ্ডা করতে এখানে আসবে তুমি? তোমাকে জল দিবার মানুষ নাই?

পলুস—নাই।

—কেন? ঘরণী গেল কোথায়?

—বেঁচে আছে, কিন্তু ঘরে নাই।

—কেন?

—ঘরে এলো না। অনেক ডেকেছিলাম, তবুও না।

—এলো না কেন?

—আমি খিরিস্তান হলাম, সে খিরিস্তান হলো না। অনেক সেধেছিলাম, তবু সে খিরিস্তান হতে রাজি হলো না।

—সে এখন আছে কোথায়?

—আমার ঘর ছিল যে গাঁয়ে, সেই কুলডিহাতে আছে।

—কোন্ সুখে আছে?

—সে খুব ভাল সুখে আছে। বড়পাহাড়ির পূজা করে, আর আমার মরণ মানত করে।

—ছি, ছি। হালদারিন কি পাগল হয়েছে?

অস্ফুট স্বরে একটা আক্ষেপ করে পলুস হালদারের মুখের দিকে অপলক চোখের একটা সমবেদনাতুর বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে মুরলী। পলুস হালদারের জীবনে বেদনা আছে ; কি আশ্চর্য, সে বেদনা যে হুবহু মুরলীর জীবনেরই বেদনার মত। আর অভিযোগ নয়, উদ্বেগও নয়, মুরলীর দুই চোখে যেন দুর্বার এক সান্ত্বনার আবেগ ঝকঝক করে।

পলুস বলে—ওর কথা আর ভাবি না, ওকে আমি ঘিন্না করি।

মুরলী—হালদারিনের সাথে দেখা হয় কি?

—এই বছরে আর দেখা হয় নাই।

মুরলী মুখ টিপে হাসে ঃ গত বছরে?

পলুস—হ্যাঁ।

মুরলী—কেন? কেমন করে দেখা হলো? সে এসেছিল, না, তুমি গিয়েছিলে?

পলুস—আমি গিয়েছিলাম।

মুরলী আবার হাসে ঃ তাই বল। হালদারিনকে ভুলতে পার নাই?

পলুস অপ্রস্তুত হয়ে বলে—তখনো ভুলি নাই।

মুরলী—তারপর ভুললে কেন?

পলুস—শুনতে চাও?

মুরলী সন্দিগ্ধ হয়ে, আর এতক্ষণের ঠাট্টার তরল হাসি একেবারে স্তব্ধ করে দিয়ে বলে—শুনবো।

পলুস—পিয়াস লেগেছিল, এক ঘটি জল চেয়েছিলাম। কিন্তু সে তবু আমাকে জল দেয় নাই।

মুরলীর চোখ দুটো বোধহয় ছলছল করে উঠবে ; পলুসের জীবনের পিয়াসের মধ্যে এত বেদনা আছে কল্পনাও করতে পারে নি মুরলী।

পলুস বলে—বুঝলে তো মুরলী ; কেন আমার পিয়াস লাগে?

মুরলী—বুঝেছি।

পলুস—তবে?

মুরলী—বল, আমি কি করতে পারি?

পলুস—যখন এতই বুঝেছ, তখন আরও একটু বুঝে নাও।

মুরলীর বুক দুরদুর করে, দুই হাঁটুর জোড় যেন খুলে যাচ্ছে, টলমল করে এখনি দাওয়ার উপর আছাড় খেয়ে পড়ে যাবে শরীরটা।

পলুস বলে—বল মুরলী।

দরজার কপাট শক্ত করে আঁকড়ে ধরে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে মুরলী। তারপর, যেন জোর করে একটা ঢোঁক গিলে সেই সঙ্গে এই মুহূর্তের সব দুর্বলতা গিলে ফেলতে চেষ্টা করে। না, কখনই না, আর কিছু বুঝতে চেষ্টা না করাই ভাল। পলুস হালদার এই মুহূর্তে চলে গেলেই ভাল। হতাশ হোক, রাগ করুক, মুরলীকে একটা ছলনার ডাইনী বলে মনে করে ভয় পেয়ে চলে যাক পলুস হালদার।

খিল খিল করে হেসে একটা অন্য জগতের হাসাহাসির মধ্যে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে মুরলী। মুরলী বলে—কানারানী তোমাকে বুঝিয়ে দিবে, ওর পিছে আর যেও না।

—কানারানী কে বটে?

—বাঘিনটা গো, যেটাকে মারবার লেগে তুমি জঙ্গল ঢুঁড়ছো।

পলুস হালদার—কে কাকে বুঝিয়ে দিবে, দেখে নিও।

মুরলী—আমি শুধাই, কানারানী তোমার কোন্ কলিজা খেয়েছে যে, ওর উপর তোমার এত রাগ?

পলুস হাসে ঃ তোমাকে খেতে এসেছিল, তাই।

মুরলী—কিন্তু খায় তো নাই।

পলুস—কিন্তু তোমার গন্ধ নিয়ে গেছে। আবার আসবে।

ঘরের দাওয়ার চারিদিকে চোখ ঘুরিয়ে কানারানীর থাবার দাগগুলিকে খুঁজতে থাকে পলুস হালদার ঃ না, কাল রাতে আর এপাকে আসে নাই বাঘিনটা। এই সবই পরশুর দাগ।

মুরলী—কানারানী ভেগেছে কি?

পলুস—না। পৌষের জাড়া না এলে বাঘিনটা ভাগবে না। কিন্তু আমি তার আগেই...।

হঠাৎ কথা থামিয়ে পলুস হালদার আবার হাসতে থাকে ঃ কিন্তু বুঝতে পারছি না, বাঘিনটার রাগটা এত মজার রাগ কেন?

—কি বললে?

—বুঝলে না?

—না।

—তোমার শাড়িটা টেনে নিয়ে গিয়ে কাঁটায় ফাঁসিয়ে ছিঁড়েছে, মনে নাই?

মুরলী বিব্রতভাবে বলে—তাই বল।

পলুস—শাড়িটাকে পেল কেমন করে?

মুরলী হাসে—পেয়ে গেল।

পলুস—নিশ্চয় ভুল করে রাতের বেলায় এই দাওয়াতে শাড়িটাকে মেলে রেখেছিলে?

মুরলী হাসে ঃ হবে, মনে নাই।

পলুস হো-হো করে হাসে ঃ বেচারী তেতরি ঘাসিনের একটা লাল সায়াকেও বেড়ার উপর থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে কানি করে দিয়েছে বাঘিনটা।

চমকে ওঠে মুরলী। কানারানীর ধূর্ত চোখের ওই জ্বলজ্বলে রাগের মধ্যে যেন ভয়ানক একটা শাসন আছে। নইলে...।

পলুস বলে—ফুলকি কিষাণীরও খবর নিয়েছিল বাঘিনটা। ফুলকিকে দিয়ে মা ডাক ডাকিয়ে ছেড়েছে।

—অ্যাঁ! আবার চমকে ওঠে মুরলী।

পলুস—ফুলকির দরজার ফাঁক দিয়ে থাবা ঢুকিয়ে ওর খোঁড়া ভাতারটার পা ধরে

টেনেছিল বাঘিনটা। কিন্তু ভাগ্য ভাল ফুলকির; ফুলকি মাগো মা বলে চেঁচিয়ে উঠতেই বাঘিনটা ভেগে গেল।

চুপ করে, আর বুকের ভিতরের একটা ছমছমে ভয়ের শিহর নিয়ে শুনতে থাকে মুরলী। পলুস বলে—ঈশান মোক্তারের একটা বলদকে মেরেছে আর বড়কালুর মাথার উপরে নিয়ে গিয়ে খেয়েছে বাঘিনটা। ডরের মারে রেললাইনের কুলিগুলো কাজ ছেড়ে ভেগে যাচ্ছে। আমি বড়কালুর কাছে স্রোতের ধারে মাচান বেঁধেছি। বাঘিনের ছায়াটি একবার কাছে পেয়েছি কি ওকে আমি সেরেছি।

পলুস হালদার বন্দুকে হাত বুলিয়ে কোমরের পেটিতে সাজানো টোটা গুনতে থাকে। তারপর যেন নিজের গর্বের দুঃসাহসে দুলতে দুলতে বলে—মাত্র একটা গুলি খরচ করবো মুরলী। তুমি দেখে নিও। ও-জানোয়ারকে খতম করতে পলুস শিকারীর একটা বেশি গুলির দরকার হয় না।

পলুস হালদারের গর্বের গল্প শুনে হাসতে চেষ্টা করে মুরলী, কিন্তু হাসিটা যেন গলার ভিতর আটকে যায়। একটা চোখ জ্বলজ্বল করে, আর একটা চোখ নিভু নিভু হয়ে জ্বলে, কানারানীর সেই হিংস্র ধূর্ততার দৃষ্টিটা যেন মুরলীর বুকের ভিতর বিঁধছে। আনমনার মত তাকিয়ে ফিসফিস করে মুরলী ঃ কানারানীর প্রাণ মেরে তোমার কি লাভ?

পলুস—থানা দিবে পঁচিশ টাকা, ঈশান মোক্তার দিবে পাঁচ টাকা, আর রেল-কোম্পানির সাহেব বলেছে, বিশ টাকা বকশিশ দিবে। লাভ আছে মুরলী।

মুরলী—তাই বল। তুমি বাঘিনটাকে মারবার ঠিকা নিয়েছ?

পলুস—আরও দুইজন শিকারী ঠিকা নিয়েছে। কিন্তু আমি জানি, বাঘিনটার প্রাণ আমিই নিব। সব বকশিশ আমার, আর সেই বকশিশের টাকা দিয়ে আমি...বল দেখি মুরলী, আমি কি করবো ভেবেছি।

মুরলী—কি আর করবে? সোনা কিনে নিয়ে একটা সুন্দরী খিরিস্তানীকে দিবে।

পলুস—না। তোমাকে দিব।

চমকে ওঠে মুরলী ঃ আমি নিব না।

পলুস—কেন?

দু চোখের ভুরু কাঁপিয়ে কটকট করে তাকায় মুরলী ঃ আমি তোমার রাখনি নই।

—ছিঃ! আতঙ্কিতের মত চেঁচিয়ে ওঠে পলুস ঃ তুমি কি মনে কর যে, আমি মেয়েমানুষ শিকার করে বেড়াই? আমি কি ডাকবাংলার রাতের বেলার বাবু? আমি কি ঈশান মোক্তার?

মুরলীর কঠোর ভাষার ধিক্কারটা পলুস হালদারের মনের গভীরে গিয়ে যেন একটা ক্ষত হয়ে জ্বলছে। খুব দুঃখ পেয়েছে পলুস হালদার। মুরলী লজ্জিত হয়, তবু মুরলীর সন্দেহের অভিমান যেন ভাঙতে চায় না। মুরলী বলে—তবে তুমি কি বট? কি কর তুমি?

পলুস—সিস্টার দিদি আমাকে ভাই বলে। সিস্টার দিদি আমাকে লিখাপড়া শিখালে। সিস্টার দিদি আমাকে কয়লা খাদের কলঘরের চাকরি করে দিলে। আমি চার কুড়ি টাকা তলব পাই, মুরলী। আমি জংলী কিষাণ নই।

পলুস হালদারের কথাগুলিও যেন পাল্টা ধিক্কার; কিষাণী মুরলীর মুখরতার উপর কঠোর আঘাত। পলুস হালদারের চোখ দুটোও যেন নিজের অহঙ্কারের উত্তাপে জ্বলছে। দেখতে পায় মুরলী, পলুস হালদারের সারা মুখের মধ্যে সেই পিয়াসের একটু ছায়াও আর নেই।

পলুস বলে—আমি পরের মাটি চষি না, ভুখা পেট নিয়ে কাঁদি না, আধপেটা খাওয়া খাই না। নিতাই মুদির কাছে গিয়ে ধারের লেগে কাঁদি না, আর কোন বেটা ঈশান মোক্তারের কুঠিতে গিয়ে চিঠা নিতে হাত পাতি না।

ক্ষুদ্র কিষাণ জীবনের আঁতে ঘা দিয়ে কথা বলছে পলুস। মাথা হেঁট করে মুরলী। তাই

বোধহয় দেখতে পায় না পলুস, মুরলীর চোখ দুটো যেন ফেটে গিয়ে ঝর ঝর করে জল ঝরাচ্ছে।

মুরলী বলে—আর কত গালি দিবে বল?

পলুস হালদার এইবার মুরলীর মুখটাকে দেখতে পায় ; বিচলিত হয়ে এগিয়ে এসে মুরলীর হাত ধরে ঃ আমি তোমাকে না, কাউকেই না, কাউকে গালি দিচ্ছি না মুরলী। আমি গাঁয়ের মানুষের দুখের কথা বলছি। আমিও এই দুখে বড় ভুগেছি।

হাত সরিয়ে নেয় না মুরলী। সরিয়ে নেবার ইচ্ছাটাও যেন মুরলীর পুরনো জীবনের মাটির মধ্যে এই মুহূর্তে একেবারে মিশে গিয়েছে। পলুসের জীবনের গল্পগুলি আরও শুনতে ইচ্ছা করে।

পলুস বলে—গোবিন্দপুরে মাটি কাটতে গিয়েছিলাম ; তিনটা দিন কাজ পাই নাই। তিনটা দিন খাই নাই। বেঁহুশ হয়ে গাছতলায় পড়ে ছিলাম।

—কবে? পলুসের হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চোখ মুছে প্রশ্ন করে মুরলী।

—পাঁচ বছর আগে। বিয়া হলো যেদিন, ঠিক তার এক মাস পর। সকালী বলেছিল...।

—সকালী কে?

—সে, খিরিস্তানী হয় নাই যে, যাকে ভাবতে ঘিন্না লাগে। সে বলেছিল, না যেও না। কিন্তু না যেয়ে পারি নাই।

—কেন?

—সকালীকে একটা শাড়ি দিবার বড় ইচ্ছা হয়েছিল। ভেবেছিলাম, একটা মাস মাটি কেটে মজুরি জমা করে সকালীর শাড়ি কিনে নিয়ে গাঁয়ে ফিরবো। কিন্তু...।

—কি?

—সিস্টার দিদি এসে সেই গাছতলায় দাঁড়ালে, ডাকলে। ঘরে নিয়ে গিয়ে ভাত খেতে দিলে। তারপর...।

জোরে নিঃশ্বাস ছেড়ে আবার যেন জীবনের এক প্রচণ্ড কৃতার্থতার আনন্দে হো-হো করে হাসতে থাকে পলুস ঃ তারপর তো এই আমি, তুমি যাকে দেখছো, যার উপর এত রাগ করছো।

চোখ তুলে দেখতে থাকে মুরলী। হ্যাঁ, সিস্টার দিদি সত্যিই যে অদ্ভুত দয়ার জাদুকরী। মাটিকাটা হালদারকে একেবারে একটি নতুন মানুষ করে সাজিয়ে যেন মুরলীর জীবনের কাছে উপহার পাঠিয়ে দিয়েছে। পলুস হালদারের জীবনটাও পাঁচ বছর ধরে লিখা-পড়া শিখে, খিরিস্তান হয়ে আর কলঘরে চাকরি করে যেন মধুকুপির কিষাণী মুরলীকেই ডাক দিয়ে নতুন ঘরে নিয়ে যাবার জন্য তৈরি হয়েছে।

—মুরলী! ডাকতে গিয়ে পলুস হালদারের চোখের পিয়াস ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

—কি বলছো?

—বুঝে দেখ।

—বুঝেছি।

—আমার ঘরে যাবে?

—যাব!

—খিরিস্তান হবে?

—হব।

পলুস হালদারের চোখের পিয়াস নতুন আলো নিয়ে জ্বলজ্বল করে। মুরলীর বুকের দিকে তাকায় পলুস হালদার। কাছে এগিয়ে আসে। কোন আপত্তি করে না, এক পাও পিছিয়ে যায় না মুরলী। নিথর হয়ে, পলুস হালদারের সেই ব্যাকুল পিয়াস বরণ করবার জন্য শাড়ি সায়া

ও জামাতে সাজানো শরীরটাকে বিহ্বল করে দাঁড়িয়ে থাকে।

--মুরলী! পলুস ডাকে। কিন্তু পলুস হালদারের আহ্বানের ভাষাকে আর হিসেব করে বুঝতে চায় না মুরলী। হিসেব করা হয়ে গিয়েছে। যা জানবার ছিল, সব জেনেছে। কোন উত্তর দেয় না মুরলী। দু চোখ দিয়ে একেবারে স্পষ্ট করে জীবনের নতুন সুখের ছবিটাকে দেখতে পাচ্ছে মুরলী। পলুসের ঘরের ঘরণী হয়েই গিয়েছে মুরলীর প্রাণ। কয়লাখাদের কলঘর থেকে কাজ করে ঘরে ফিরেছে পলুস। তাই যেন আদর করে নাম ধরে ডাক দিয়েছে, এত কাছে এগিয়ে এসেছে, আব চাইছে সেই জিনিস, যা পেলে সুখের স্বাদে পাগল হয়ে যাবে পলুস! না, আপত্তি করবে কেন মুরলী?

মুরলীর কোমরে হাত রাখে পলুস হালদার। সেই মুহূর্তে চমকে ওঠে মুরলী। না বুকটা নয়, কোমরটা। কোমরের একটা ব্যথা।

--সর সর, সরে যাও! চেঁচিয়ে ওঠে, আতঙ্কিতের মত ঘোলাটে চোখ তুলে পলুসের মুখের দিকে তাকায় মুরলী। আর, পলুসকে শক্ত হাতের একটা ঠেলায় আলগা করে দিয়ে দু পা পিছনে সরে যায়।

জামকাঠের জীর্ণ কপাটের পিছনে ঘরের ভিতরটা অন্ধকার। দাশুর টাঙ্গিটা কোথায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, দেখা যায় না। দেখতেও পায় নি মুরলী। টাঙ্গিটা হিংস্র হয়ে লাফ দিয়ে উঠে এসে মুরলীর চোখের সামনে দাঁড়ায়ও নি। টাঙ্গির ভয়ে নয়, কোমরের এই ব্যথাটারই ভয়ে চমকে উঠেছে মুরলী, যে-ব্যথাকে ভুল করে ছুঁয়ে দিয়েছে পলুস হালদার। ভুলতে পারে না, ভুলে থাকবার সাধ্যি নেই মুরলীর, এই ব্যথা সৃষ্টি করেছে যে মানুষটা, সে এই তো মাত্র এক ঘণ্টা আগে গোবিন্দপুর থানার কাছে জীবনের ভুলের জবাব দিতে চলে গিয়েছে।

পলুস বলে--কি হলো?

মুরলী--তুমি আমাকে ছুঁয়ে দিলে কোন্ সাহসে? লাজ নাই তোমার?

পলুস--কি?

মুরলী--আমার মরদ ঘরে নাই জেনে, আমাকে একলা পেয়ে...। চোর বট তুমি।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে পলুস হালদার। পলুসের চোখ আর দপ দপ করে না। শিকারীর চোখ নয়, পিয়াসে ব্যাকুল চোখও নয়। একেবারে শান্ত ও ঠাণ্ডা এক জোড়া চোখ। যেন, মুরলীর মুখের এই গালি আর এই ভীত রুষ্ট ক্ষুব্ধ চেহারার মধ্যে শ্রদ্ধা করবার মত কিছু দেখতে পেয়েছে পলুস।

পলুস বলে--সরদার গেল কোথায়?

মুরলী--জান না?

পলুস--না।

মুরলী--গোবিন্দপুর থানার লোক এসে সরদারকে ধরে নিয়ে গেল।

পলুস--কেন?

মুরলী--কয়েদ থেকে ছাড়া পেয়ে ঘরে এসে বসেছিল, থানাতে হাজিরা দিতে যায় নাই। থানার লোক বিশ্বাস করে নাই যে মানুষটা ঘরে ছিল।

পলুস--তোমার সরদার কি দাগী?

মুরলী চেঁচিয়ে ওঠে--দাগী বটে, কিন্তু চোর নয়।

--আমি আর কখনও এই গাঁয়ে আসবো না। বন্দুকটাকে হাতে তুলে নেয় পলুস হালদার। আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যায়।

দাওয়া থেকে নেমে, আঙ্গিনার ঘাস মাড়িয়ে তেমনই দুলতে দুলতে আর মচমচ জুতোর শব্দ বাজিয়ে সড়কের উপরে গিয়ে দাঁড়ায় পলুস হালদার। দেখতে থাকে মুরলী, পলুস হালদার ভুলেও একবার মুখ ফিরিয়ে তাকাল না। যেন এরই মধ্যে ভুলে গিয়েছে পলুস, ওর

পিছনে এই এক ঘণ্টার ইতিহাসে কোন ঘটনা ঘটেছে, মুরলী নামে কোন নারী কোন ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওরই দিকে তাকিয়ে আছে।

চলে গেল পলুস হালদার। কিন্তু মুরলীর চোখ দুটো আবার চমকে ওঠে।

সামনের সড়কের এদিকে ওদিকে আর সেদিকে, নিমের ছায়ার কাছে, কাঁটাশিরীষের ঝোপের কাছে আর বাঁশঝাড়ের কাছে ছোট ছোট এক-একটা ভিড়। এক-একটা বোবা ভিড় যেন খুব সাবধানে উঁকি দিয়ে রয়েছে। মেয়ে-মরদ, বুড়ো-বুড়ি, আর ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে, সবাই। কে জানে কখন এসেছে ওরা? দাশু ঘরামির ঘরের কাছে কোন্ রহস্যের খেলা দেখতে পাবে বলে ওরা আশা করে এসেছে?

কী ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে আর ঘেন্না করে তাকিয়ে আছে জোড়া জোড়া চোখগুলি! ওরা যদি এখনি একসঙ্গে হাত চালিয়ে পথের পাথর তুলে মুরলীর গায়ে ছুঁড়ে মারত, তবু মুরলী বোধহয় একটুও কেঁপে উঠত না ; একটা আর্তনাদও করত না। কিন্তু ধুলো নয়, ঢেলা নয়, পাথরের টুকরোও নয়, ওরা শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে একটা ভয়ানক বিস্ময়ের দৃষ্টি ছুড়ে মারছে ; তাই কেঁপে উঠেছে মুরলীর বুকটা। গাঁয়ের ডাইনী ধরা পড়ে গেলে তার মুখের দিকে ঠিক এইরকমের হিংস্র বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে গাঁয়ের মানুষের চোখ।

মনে পড়ে মুরলীর, অনেকদিন আগে পরেশনাথ পাহাড়ের কাছে কুসুমদিদির শ্বশুরবাড়ির সেই ভেলিমুণ্ডিতে একবার পরব করতে যেতে হয়েছিল। হরতকীর জঙ্গলে দিনে বাঘ ডাকে আর ময়ূর নাচে, সেই ভেলিমুণ্ডি। কুসুমদিদির পেটে ছেলে ছিল তখন। কুসুমদিদির শাশুড়ি সেই কোমরভাঙা বুড়ি, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া সাদা চুলে ভরা মাথাটা দুলিয়ে হাসত ; আর হামা দিয়ে সারা আঙিনা ঘুরে বেড়াত।

পর পর চার দিনের মধ্যে সে-গাঁয়ের চারটে বাচ্চার কাঁচা প্রাণ পাখি-ঠোকরানো নটে ফলের মত পটপট করে ফেটে মরে গিয়েছিল। জ্বর হয়েছে, পেট ফুলেছে, তারপর ওই ফোলা পেট হঠাৎ চুপসে গিয়েছে। তিন ছেলের মা মঙ্গলীও ভেবে রেখেছিল, তার নতুন ছেলের নাম হবে পাঁচু। কিন্তু সেই মঙ্গলীর নতুন ছেলে জন্ম নিয়ে একটা শব্দও করে নি। কেঁপে উঠল বাচ্চার পেটটা, আর তখনি মরে গেল। চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল মঙ্গলী—কে রে, কোন্ ডাইনী আমার ছেইলার প্রাণ নিলে রে!

মার মার, ডাইনী মার! হাতে নিমের ডাল নিয়ে একশো মানুষের ভিড় তেড়ে এল। কুসুমদিদির শাশুড়ি সেই কোমরভাঙা বুড়িকে চুল ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল। ওরা কুলকাঠের আগুনও জ্বালিয়েছিল। কিন্তু বুড়িকে পুড়িয়ে মারতে পারে নি। ভাগ্যিস সড়ক সাহেবের কুলির দল লাঠিসোটা হাতে নিয়ে তেড়ে এসে বাধা দিয়েছিল।

সবার আগে সবচেয়ে বেশি ভয় পেয়ে ঝালদায় পালিয়ে এসেছিল কুসুমদিদি। কুসুমদিদির হাত ধরে মাঠের উপর দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে বেরমোবাজার যাবার মোটরগাড়ি ধরবার জন্য সড়কের উপরে এসে উঠেও মুরলীর বুকের দুরুদুরু থামে নি। বার বার মনে পড়ছিল, ডাইনী মারবার জন্য কী ভয়ানক একটা সাধের জ্বালা গাঁয়ের লোকের চোখে জ্বলছে!

মধুকুপির মানুষের চোখগুলিও চুপ করে জ্বলছে। চোখগুলি যেন নতুন রকমের এক ডাইনীকে দেখছে। শাড়ি সায়া ও জামা গায়ে দিয়ে রূপসী সেজেছে, লাগর রেখেছে, দাশু ঘরামির ঘরের মান আর জাতের মান মেরে কেমন ভালমানুষটির মত ঢং করে দাঁড়িয়ে আছে ঝালদার মহেশ রাখালের বেটি।

ভিড়ের ভিতর থেকে সবার আগে আস্তে আস্তে হেঁটে এগিয়ে আসে হলুদ ছোপানো শাড়ি গায়ে, গালার রসে রাঙানো নখ, ফুলকি মাসী। দাশুর ঘরের দাওয়ার উপর উঠে, একেবারে মুরলীর চোখের কাছে দাঁড়িয়ে ফুলকি মাসী তার দু চোখের চাহনি যেন একেবারে

বিষিয়ে নিয়ে, কিন্তু বেশ একটু চাপা-চাপা স্বরে ধিক্কার দেয়।—ছিঃ, তুই তো আমার মত কপাল করিস নাই, তবে কেন, ছিঃ! যার মরদ খোঁড়া নয়, কানা নয় ; সে মেয়ে ঘরের ভিতরে লোক ডাকে কেন? দাশুর কি হাত নাই, পা নাই? সে কি তোকে খাওয়াতে পরাতে পারতো না? ফুলকি মাসীর চোখ দুটো যেন কোনমতে দুঃসহ একটা ঘৃণার জ্বালা লুকিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল।

আর একটা ছায়া ; হেঁটমাথা হয়ে মুরলী দাওয়ার মাটির যেখানে তাকিয়েছিল, ঠিক সেখানেই আর একটা ছায়া আস্তে আস্তে এসে ছড়িয়ে পড়ে। মুখ তুলেই দেখতে পায় মুরলী, কাছে এসে দাঁড়িয়েছে পল্টনী দিদি।

পল্টনী দিদির চোখ দুটো যেন রাগ করে ছটফট করছে।—ছিয়া ছিয়া, দাশু দাদার মত মানুষের বউ হয়ে তুই এ কি করলি মুরলী? তুই তো আমার মত কপাল করিস নাই, তোর মরদকে কপালবাবা কোন রোগ দেয় নাই, মারেও নাই? তোর কিসের দুখটা ছিল, বল্?

চলে গেল পল্টনী দিদি। পথের দিক থেকে আর একটা মূর্তি, উল্কিকাটা গলা আর ছেঁড়া শাড়ি দিয়ে জড়ানো শরীর, তেতরি ঘাসিন এগিয়ে এসে মুরলীর কাছে দাঁড়ায়।—কি লো মুরলী, তুই তো আমার মত কপাল করিস নাই, তোর মরদকে বাঘে ভালুকে মারে নাই, তবে কেন ধরম সরম ভুলে গেলি? কোন্ দুখে লো? কিসের সুখে লো? বলতে বলতে ছলছল করে ওঠে তেতরি ঘাসিনের চোখ। ছি ছি, চোখ মুছতে মুছতে চলে যায় তেতরি ঘাসিন।

পথের উপর ভিড়ের বোবা বিস্ময় এইবার মুখর হয়ে ওঠে। তিনটে গরুচরানী মেয়ে একসঙ্গে হাতের ঠেঙা দুলিয়ে, যেন বিচিত্র ঠাট্টার রসে চোখ-মুখ মজিয়ে আর হাসিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।—মুরলীর কল কলকলাঁইছে, লাগর লিয়ে ঢলঢলাইছে।

বুড়ো রতনের চাপা গলার স্বর যেন ফোঁসএফাঁস করে—এ কি-রকমটা হলো? দাশু ঘরে ফিরে এলো, তবু মাগি...মাগি জাতপঞ্চকেও ডর করে না?

জটা রাখাল—আমি বলেছিলাম কিনা, সব ধোঁকা, সব ধোঁকা। বলে কিনা গির্জাবাড়ির দিদির দয়া, বলে কিনা সিলাই কল চালিয়ে চিজ পয়দা করে আর টাকা কামায়! সব ধোঁকা। বলেছিলাম কিনা, মাগি কোন খিরিস্তানের সঙ্গে নষ্ট হয়েছে।

গাঁয়ের মানুষের এই পাঁচ বছরের বিস্ময়টা এতদিনে ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গিয়েছে। যে নারীর মরদ পাঁচ বছর ধরে কয়েদ খাটছে, সে নারী কেমন করে আর কিসের জোরে এত সুখে থাকে? এত শাড়ি সায়া আর জামা? এত গরম? করম নাচে না ; গাঁয়ের কোন কিষাণীর হাত ধরতেও যেন ওর ঘেন্না করে, মুরলীর এই পাঁচ বছরের অহংকারের রহস্য আজ ধরা পড়ে গিয়েছে। যা সন্দেহ করেছিল গাঁয়ের মানুষ, তাই সত্য হয়েছে।

আসুক ফিরে দাশু। তারপর বিচার হবে। লজ্জায় ফিসফাস করতে করতে, রাগে গজগজ করতে করতে, আর ঠাট্টায় চিড়বিড় করতে করতে পথের উপর সেই ছোট ছোট ধিক্কার আর ভ্রূকুটির ভিড় আস্তে আস্তে চলে যায়।

হেঁটমাথা তুলে আবার যখন সামনের দিকে তাকায় মুরলী, তখন দেখতে পায়, রক্তমাখা মরা ধনেশটাকে কামড়ে ধরে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে একটা শেয়াল।

গোবিন্দপুর থানা একটু বেশি উদ্বিগ্ন, একটু বেশি ব্যস্ত। রাঁচি, হাজারিবাগ আর পালামৌয়ের পুলিশ জানিয়েছে, গুপী লোহার ও তার গ্যাং খুব সম্ভব দামোদর পার হয়ে গোবিন্দপুরের দিকে গিয়েছে।

রামগড় বাজারে ছোটোলাল মহাজনের বাড়িতে যে ডাকাতি হয়ে গিয়েছে, তার রকম সকম দেখে সন্দেহ করতে হয়, এটাও গুপী লোহারের কাজ। পাঁচ বছর আগে গুমলা থানার হাজত থেকে পালিয়ে ফেরার হয়ে গেল যে সেই গুপী লোহার। ঘরের জানালা দেয়াল

থেকে একেবারে উপড়ে ফেলা, হেঁসো দিয়ে গলা ফাঁসিয়ে ঘুমন্ত মানুষকে খুন করা আর বাক্স ভেঙে শুধু নগদ টাকা আর সোনা রূপো নিয়ে চলে যাওয়া ; সেই ভয়ানক গুপী লোহার ছাড়া ঠিক এই নিয়মে ডাকাতি আর করবেই বা কে? শেষ রাত্রি হওয়া চাই, আর খুব জোরে বৃষ্টি হওয়া চাই, এই রকমের লগ্নে এই পাঁচ বছরের মধ্যে ওই তিন জেলার যেখানে যতগুলি ডাকাতি হয়েছে, সবগুলিই গুপী লোহারের কীর্তি। পুলিশ এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ। কোন হৈ-চৈ হয় না, অঝোর বৃষ্টি আর আকাশভাঙা বাজের কড়কড় শব্দের মধ্যে ডাকাতির সব শব্দ লুকিয়ে, মহাজনের সিন্দুক একেবারে চেঁছেপুছে খালি করে দিয়ে পালিয়ে যায় গুপী লোহার ও তার দল। পাশের বাড়ির মানুষ জেগে থাকলেও ওদের পায়ের শব্দ শুনতে পায় না, জেগে তাকিয়ে থাকলেও ওদের ছায়া পর্যন্ত দেখতে পায় না।

গুপী লোহারের দল বলতেও প্রায় অশরীরী একটা সত্তা বোঝায়। সে দল কোথাও নেই, অথচ সব ঠাঁই যেন আছে। তার মানে, সত্যিই কোন দল সঙ্গে নিয়ে ঘোরে না গুপী লোহার। পুলিশ-রিপোর্ট বলে, নিয়মটা কতকটা পুরনো কালের সেই ঠগীদের মত। তিন জেলার নানা জায়গায় সারা বছর স্বভাব ঢাকা দিয়ে ভালমানুষটির মত কাজ করে গুপী লোহারের লোক। হঠাৎ হাজির হয় গুপী। তারপর একটা ডাকাতি, এবং তারপরেই শুধু ডাকাতির একটা গল্প পিছনে ফেলে রেখে দিয়ে কোথায় গিয়ে যে গা-ঢাকা দেয় গুপী, তা সে-ই জানে।

পালামৌয়ের এক জংলী ডিহিতে গুপী লোহারের ঘরের চিহ্ন আজও পড়ে আছে। লাল মাটির বড় বড় ঢেলা আর ঢিবি। গাঁয়ের লোক বলে, লালমাটি থেকে কাঁচা লোহা গলিয়ে লাঙ্গলের ফলা তৈরি করে বাজারে বেচতে যেত গুপী। তাতে কিন্তু পুরো পেটের ভাত হতো না। গুপীর বউটা তিনদিন উপোসের পর একদিন ভয় পেয়ে, তিনটে ছেলে নিয়ে কোথায় যে পালিয়ে গেল, কেউ জানে না। তারপর গুপী যে কোথায় গেল, তা শুধু গুপীই জানে।

পুলিশের রিপোর্টে বলে গুপী লোহারের ট্রাইব আর ফ্যামিলির রক্তের মধ্যেও ডাকাতিপনার বীজ আছে। গুপী লোহারের বাপ রুপি লোহার যাবজ্জীবন কালাপানি খেটে মরে গিয়েছে। গুপী লোহারের বাপের বাপ দীনু লোহারকেও ধরতে পারা গিয়েছিল। ফাঁসির দড়িতে শেষ হয়েছে, প্রায় দশটা খুন আর পঁচিশটা ডাকাতির নায়ক সেই দীনু লোহারের প্রাণ। ট্রেনি পুলিশের পাঠ্যপুস্তকের ডাকাতি চ্যাপ্টারের ফুটনোটে দীনু লোহারের নামের উল্লেখ আছে। পুলিশ ট্রেনিং কলেজের মিউজিয়ামে আজও রাখা আছে, একটা প্রকাণ্ড টাঙ্গি —কাঁচা মেটে লোহার টাঙ্গি, দীনু লোহারের প্রিয় সেই খুনিয়ারা হাতিয়ার। সে টাঙ্গির মরচে লাল ধুলোকে এখনও শুকনো রক্তের ধুলো বলে মনে হয়।

সাবধান হয়েছে গোবিন্দপুর থানা। ভুবনপুরের দিকে জঙ্গলের কাছে একটা নতুন বীট হাউস খোলা হয়েছে। রামগড়ের দিক থেকে গোবিন্দপুরে আসার সড়কের উপর কঠোর পাহারা রাখা হয়েছে। যত দাগী পাপী আর বদমাসের নামে একটা নতুন লিস্টি করা হয়েছে। পুলিশ মুন্সী চৌধুরীজীও খুব ব্যস্ত। এই গাঁ আর সেই গাঁ ঢুঁড়ে যত দাগীকে টেনে এনে হাজত-ঘর ভরে ফেলা হয়েছে। গোবিন্দপুর বাজারের দুটো বেশ্যাকেও ধরে আনা হয়েছে। সরাইয়ের তল্লাসী করা হয়েছে, কোন নতুন লোক এসেছে কি না! চিমটেধারী একটা সাধুকে সড়কের উপর চুপ করে বসে থাকতে দেখা গিয়েছিল, তাকেও ধরে এনে হাজতে ভরা হয়েছে।

হাজত ঘরের ভিতরে আলো নেই। দরজার গরাদের বাইরে পাহারাদার সেপাইটার পায়ের কাছে একটা কেরোসিনের বাতি জ্বলছে। হাজতঘরের এক কোণে একটা কম্বলের উপর দাশু ঘরামি চুপ করে বসে আছে। দাশুর সামনে শালপাতার ঠোঙ্গায় দুটো রুটি আর গুড়, মাটির ভাঁড়ে জল।

দাশু ঘরামির কাঁধের দু জায়গায় দুটো ক্ষত। দাশুর কাঁধের অমন পাথুরে পেশীও দু জায়গায় ছিঁড়ে গিয়েছে। পুলিশ মুন্সী চৌধুরীজীর পিতল-বাঁধানো লাঠি দাশু ঘরামিকে কবুল করবার জন্য এক ঘণ্টা ধরে নানা কায়দায় গুঁতো খোঁচা আর মার চালিয়ে আজকের মত শান্ত হয়েছে। চৌধুরীজী নিজেই শ্রান্ত হয়ে হাঁফ ছেড়েছে ঃ এটা শক্ত দাগী বটে, আরও ভাল করে না বানালে শালা কবুল করবে না।

হেসে হেসে দাশুর গম্ভীর মুখটাকে দেখবার চেষ্টা করে একটা ছোকরা, আর, মাথার চুল হাতড়ে তামাকপাতার একটা টুকরো বের করে হাতের তেলোতে ফেলে ডলতে থাকে। দাশুর হাতে একটা ঠেলা দিয়ে বলে—খেয়ে নাও গো সরদার। থানা কি তোমার মাগ যে, গোসা করে থাকলে তোমাকে হাতটি ধরে আর চুমাটি খেয়ে খেতে সাধবে?

গামছা গায়ে জড়িয়ে আর একটা লোক কম্বলের উপর পড়ে নাক ডাকাচ্ছিল। তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে লোকটা বলে--কি বলছিস কালু? কার মাগ কাকে চুমা দিল রে?

ছোকরা বলে—তোর মাগ আমাকে।

গামছা গায়ে জড়ানো লোকটা ছোকরার পিঠের উপর একটা লাথি ছুঁড়ে দিয়ে বলে—তা বাপের মাগের চুমা লিবি, তাতে দোষ কেন হবে রে চোট্টা?

ছোকরা বলে—তুই কে রে?

—আমি মহারাজ বোম শঙ্করের প্রজা রে।

ছোকরা দাশুর গায়ে আর একবার ঠেলা দিয়ে বলে—শুনছো সরদার, এ শালা গাঁজা চাষ করে চারবার কয়েদ খেটেছে।

ঘুমিয়েছিল যারা, তারা এক এক করে উঠে বসে আর আশ্চর্য হয়ে যায় ঃ কি হলো? সরদার বেচারা খায় নাই কেন?

ছোকরা বলে—সরদারের উপর বড় জবর মার হয়েছে হে। কাঁধের উপর দুটা জখম হয়েছে।

একটা বুড়ো বলে—তা দাগী হয়েছে যখন, তখন দাগ নিতে হবে। আরও কত নিতে হবে।

এক টিপ খৈনি দাঁতের মাড়ির উপর চেপে ধরে ছোকরাটা হাসতে থাকে ঃ আচ্ছা তোর মত একটা বুড়া বক্‌রাকে ধরে নিয়ে এসেছে কেন? তোকে চেলা করবে কোন ডাকাত? তোকে দেখলে গুপী লোহার যে ঘিন্নায় মরে যাবে রে বুড়া?

বুড়ো—আমি তো তাই জানি হে, কিন্তু থানা কি শুনবে? মুন্সীটা কি আমাকেও ডলে নাই ভাবছো?

—তুই তো জমি নিয়ে ফৌজদারি করেছিলি?

—হ্যাঁ ভাই। সে তো বিশ বছর আগের কথা। আমার বয়স তখন তোর চেয়েও কম।

—আর তুই? পাশের টাকমাথা লোকটাকে প্রশ্ন করে ছোকরা।

বুড়ো হাসে ঃ ওকে শুধিয়ে লাভ নাই। ও বলবে না।

ছোকরা যেন জেদ করে বলে—কেন গো ওস্তাদ, এত লাজ কেন? কার জরুকে ঘরের বার করেছিলে?

টাক মাথা লোকটা গম্ভীরভাবে বলে—মনে কর না কেন, তোর জরুকে।

ছোকরা বলে—হাঁ হাঁ, মনে পড়েছে। জরুটা ঘরে ফিরে এসে কত খুশি হয়ে বললে, দাদার ঘরে ছিলাম ভাল, তুমি মিছা রাগ কর কেন?

দাশু ঘরামির মাথাটা ভারি হয়ে দু হাঁটুর উপর ঝুলে পড়ে। হাজতঘরের ওই অদ্ভুত আলো-ছায়ার ভাষা শুনতে শুনতে মাথার ভিতরটা যেন কামড়াতে শুরু করেছে। দাগী দাগী দাগী ; দাশু ঘরামি মানুষ নয়, মধুকুপির একটা মনিষও নয় ; শুধু একটা দাগী। দাশু ঘরামির পিঠের উপর পুলিসের জুতোপরা পায়ের লাথি পড়েছে, চৌধুরীজীর পিতলবাঁধানো লাঠির

মার কাঁধের উপর দাগ করে দিয়েছে। হালের মহিষ গোঁয়ার হয়ে গেলেও কেউ কখনো তাকে এভাবে মেরে ঘায়েল করে না। দাশুর মাথার ভিতরে যেন একটা গরম হাওয়া ফোঁস ফোঁস করে। সন্দেহ হয়, প্রাণটা বোধহয় একটা পাগলা কুকুরের প্রাণ হয়ে গিয়েছে। নইলে মারে কেন ওরা?

মুরলীর শরীর তুলে গালি দিয়েছে মুন্সী চৌধুরীজী। দাগীর বউকেও বোধহয় একটা কুকুরী বলে মনে করে ওরা। গায়ের ব্যথাগুলি নয়, মধুকুপির কিষাণের সেই পাথুরে অহংকার ক্ষতাক্ত হয়ে জ্বলতে থাকে।

ঠিক ঘুমিয়ে পড়ে নি, কিন্তু চোখের পাতায় যেন একটা ক্লান্তি নেমে এসেছিল ; দাশু ঘরামির চোখের সামনে একটা টাঙ্গির শাণিত হাসি ভাসছে। চমৎকার রক্তমাখা হাসি। ডরানির জলে টাঙ্গিটাকে ধুয়ে ফেলতেই লাল হয়ে গেল ডরানির জল। চমকে ওঠে দাশু, মাথা তোলে আর চোখ মেলে তাকায়। শুনতে পায় দাশু, ছোকরা চোট্টাটা অদ্ভুত একটা আক্ষেপ করছে ঃ গুপী লোহারের নাম শুনলেই থানার পায়জামা ঢিলা হয়ে যায়। আমার সাথে যদি কোনদিন দেখা হতো গুপীর, তবে বলতাম—হে বাপ, তুই কিরপা করে এপাকে আর ডাকা মারতে আসিস না বাপ। থানা তো তোর কড়াপাক মোচের একটা ছাঁটা চুলকেও ধরতে পারে না ; মারে শুধু আমাদিগে।

বুড়ো বলে—গুপী লোহরকে ধরবে, গোবিন্দপুর থানার বাপের সাধ্যি নাই।

—কেন? প্রশ্ন করে গামছা গায়ে জড়ানো রোগা লোকটা।

বুড়ো বলে—জাদু জানে রে ভাই। হেই দেখ খাঁড়া হাতে নিয়ে ছুটে চলে যাচ্ছে, হেই দেখ নাই, একেবারে হাওয়া।

টাকমাথা লোকটা বলে—হাওয়া হবে কেন? কাক হয়, বক হয়, চিল হয়ে উড়ে যায়।

ছোকরা বলে—হাঁ হাঁ, সবই হয় গুপী, শুধু তোর মত বুদ্ধু হয় না।

হঠাৎ দাশুর দিকে তাকিয়ে ছোকরাটা বলে ওঠে—এ সরদারের লেগে আমার বড় দুখ হয়।

বুড়ো—কেন হে?

ছোকরা—আমাদিগের সবটিকে কাল ছেড়ে দিবে, শুধু ছাড়া পাবে না সরদার।

—কেন? বুড়ো দুঃখিতভাবে আবার প্রশ্ন করে।

—কে জানে? মুন্সী বললে, সরদারটা ছাড়া পাবে না। কাল আবার ওর মার হবে। সরদারকে চালান না করে ছাড়বে না মুন্সী।

টাকমাথা লোকটা হাই তুলে বলে—মাগি দুটা ছাড়া পাবে তো হে?

ছোকরা হাসে—হাঁ হাঁ, নিশ্চয় ছাড়া পাবে। কিন্তু তাতে তোর লাভ কিসের রে চাঁদিল? ওদের একটা তো মুন্সীটার খোরাক হয়ে গেছে। সে মাগির ঘরের দরজা খোলা পাবি না।

—আর একটা?

—আর একটা যে আমার বাঁধা বটে রে শালা।

দুই হাঁটুর ফাঁকে শুধু মুখটাকে নয়, কান দুটোকেও গুঁজে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে চেষ্টা করে দাশু। ছোকরা চোট্টাটা যেন দাশু ঘরামির জীবনের মামলার রায় শুনিয়ে দিয়েছে। সবাই ছাড়া পেয়ে ঘরে চলে যাবে, শুধু ছাড়া পাবে না দাশু ঘরামি। আবার মার হবে। এবার হয়তো বুকের পাঁজরের উপর দুটো নতুন গুঁতোর দাগ ফুলে উঠবে। শুধু দাগ আর দাগ। দাশুর দাগী জীবনটা আবার এক হাকিমের এজলাসে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হয়তো তিন বছরের শক্ত কয়েদের আদেশ বরণ করে নেবে। বেশ হবে। সুখী হবে মুরলী, মুরলীর জীবনের সব দুর্ভাবনার কষ্ট মিটে যাবে।

শান্ত হয়ে গিয়েছে হাজতঘর। কম্বলের উপর পড়ে নাক ডাকিয়ে কী আরামে ঘুম দিচ্ছে

হাজতী মানুষগুলো, যত দাগী পাপী আর বদমাস। হিংসে হয় দাশুর, শুধু দাশুর চোখ দুটো কেন জেগে জেগে ছটফট করে? ভোর হতে আর কত দেরি?

দরজার গরাদের ছায়া দাশুর মুখের উপরে লোহার লাঠির মোটা মোটা দাগের মত লেগে রয়েছে। কেরোসিনের বাতির ধোঁয়াটে আলো দাশুর চোখের তারার উপরে ধিকধিক করে। গরাদগুলি কি খুবই শক্ত? দম বন্ধ করে দরজার গরাদের দিকে তাকিয়ে থাকে দাশু।

না, অসম্ভব, সাধ্যি নেই দাশুর। ওই গরাদের উপর মধুকুপির কিষাণ শুধু তার কপালটাকে ঠুকতে পারে, কিন্তু ওই গরাদ ভাঙতে পারে না। ছুটে গিয়ে মধুকুপির একটা মাটির ঘরের জামকাঠের দরজার কাছে শক্ত হয়ে দাঁড়াবার আর সুযোগ হবে না। সুখী হবে পলুস হালদার ; মুরলীকে কাছে পেয়ে শিকারীর দু চোখের আশার পিয়াস এইবার মিটে যাবে।

হাত দুটো থর থর করে কাঁপতে থাকে ; দাশুর যন্ত্রণাময় তন্দ্রাটা যেন ছটফট করে টাঙ্গি টাকে ধরতে চেষ্টা করছে। ওই যে দাশুর ভাগ্যের দুশমন পলুস হালদার আসছে। শিকারী পলুস হালদারের মাথাটা টাঙ্গির একটি কোপে ধড় থেকে খুলে ধুলোর উপর পড়ে গেল। ভাল করে দেখে নে মুরলী, শিকারীটাকে এবার কত জল খাওয়াবি খাওয়া। মুরলীর চোখ পাথর হয়ে তাকিয়ে থাকে, আর দাশু হো-হো করে হেসে মাদল বাজাতে বাজাতে কপালবাবার কাছে পুজো দিতে চলে যায়।

কাক ডাকে, ভোর হয়, হাজতঘরের এক কোণে কম্বলের উপর বসে সাধুটা চিমটে বাজিয়ে ভজন গাইতে শুরু করেছে। উপরের ঘুলঘুলি দিয়ে ভোরের আভা হাজত-ঘরের ভিতরে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধে ভরা অন্ধকারকেও একটু হাসিয়ে দেয়।

ছোকরাটা জেগে উঠেই হাঁক দেয়—উঠ গো মহারাজেরা ; ডাক হবে এখন।

তারপর আর বেশি দেরি হয় না। একটা সেপাই আসে, নাম ধরে এক-একজনকে ডাক দেয়। কম্বল গুটিয়ে এক-একজন লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় আর চলে যায়।

একে একে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে হাজতঘর। চিমটেধারী সাধুটা চলে গেল। বেদিয়া দুটোও চলে গেল। ক্ষেতি দাঙ্গার যত পুরনো দাগীগুলো ছিল, তারাও চলে গেল। হাজতঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে সকালবেলার রোদ ভিতরে চুঁয়ে পড়ে।

ছোকরাটা এক টিপ খৈনি মাড়ির উপর টিপে ধরে আর একটু ব্যথিত স্বরে বলে—তুমি এখন ঘুমিয়ে থাক না কেন সরদার, তোমার তো ডাক হবে না।

—দাশু ঘরামি নিকল আও। সেই মুহূর্তে গরাদ-আঁটা দরজাটাকে ফাঁক করে ডাক দিল সেপাইটা। চমকে ওঠে দাশু। ছোকরাটাও আশ্চর্য হয়ে ফিস ফিস করে—কুছ পরোয়া নাই সরদার। কোন ডর নাই। কোনটি কথা কবুল করবে না ; সব মার হজম করে নিবে।

হাজতঘরের দরজা পার হয়ে সেপাইয়ের পিছু পিছু চলে যায় দাশু, থানার বারান্দায় প্রকাণ্ড টেবিলের কাছে, উর্দিপরা একটা কঠোর ভিড়ের কাছে এসে দাঁড়ায়।

টেবিলের দু দিকে দুটি চেয়ারের উপর বসে দুটি অফিসারের দু জোড়া চোখ দাশু ঘরামির চেহারাটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। বড় দারোগা, শরীরটা ছোট, পেটটা প্রকাণ্ড। কোমর নেই বললেই চলে ; তাই বুকের উপর বেল্ট। ছোট দারোগা খুব লম্বা, মুখটা রোগা, বেল্টটা কোমরের নীচে ঢলঢল করে। বড় দারোগার ভুরু কাঁপে, ছোট দারোগা গলার আঁচিল খুঁটতে থাকেন। তার পরেই দুজনে একসঙ্গে হেসে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেন।

বড় দারোগা গুপ্তবাবু বলেন—চেহারাটা সাংঘাতিক, কিন্তু মুখটা ফুলিশ। তাই নয় কি চ্যাটার্জি?

ছোট দারোগা চ্যাটার্জি হাসেন—ফুলিশ মুখটা একটা পোজ নয় তো, ভেবে দেখুন।

গুপ্তবাবু—ইনোসেন্ট বলেই তো মনে হচ্ছে। তা ছাড়া পলুস হালদার যখন বলেছে যে,

লোকটা এই দুটো দিন ঘরেই ছিল, তখন...।

—কে? কে বটে? দাশু ঘরামির বোবা মুখটা যেন হঠাৎ আর্তনাদ করে ওঠে।

গুপ্তবাবু ভ্রূকুটি করেন--পলুস হালদার।

চ্যাটার্জি--পলুস হালদার মানে...।

গুপ্তবাবু--আরে মশাই, ওই যে, সেই লোকটা, সিস্টার মাদলিনের চিঠি নিয়ে যে লোকটা এসেছিল।

চ্যাটার্জি--বুঝেছি, ম্যান-ইটার মারবার জন্য যাকে বন্দুক দেওয়া হয়েছে।

গুপ্তবাবু--গুপী লোহারের চেহারার একটা ডেসক্রিপশনও পলুসকে দিয়েছি। জ্যান্ত অথবা মৃত...।

চ্যাটার্জি হাসেন ঃ গুপী লোহারকে আর জ্যান্ত ধরা সম্ভব হবে না।

গুপ্তবাবু--মেরেই নিয়ে আসুক না কেন ; পলুসের ভাগ্যে তা হলে...ধরুন তিন জেলার পুলিস প্রত্যেকে দু শো টাকা করে মোট ছ শো টাকা রিওয়ার্ড দেবে। তা ছাড়া...।

চ্যাটার্জি--কিন্তু...আমার আশঙ্কা হচ্ছে...যাই হোক, আপাতত আমার এক মাসের ছুটির ব্যবস্থা করে দিন।

গুপ্তবাবু--তার চেয়ে বরং আমিই এক মাসের ছুটি নিই। আপনি ইন-চার্জ হয়ে থাকুন। এটাই ভাল নয় কি? অন্তত আপনার প্রসপেক্ট হিসাবে?

টেবিলের দু দিকে দুই চেয়ারে বসে দুই অফিসারের মুখ অদ্ভুত একটা মন কষাকষির উত্তাপে আবার গম্ভীর হয়ে যায়। গুপী লোহারের নামটা এই এলাকার নতুন আতঙ্কের খবর হয়ে দেখা দিতেই দুই অফিসারের মনে ছুটি নেবার তাগিদ দেখা দিয়েছে। তাই রোজই একবার এরকমের একটা তর্ক বাধে আর তর্কের শেষে দুজনেই গম্ভীর হয়ে যান।

—খামোখা এত কথা বলেন কেন আপনারা? পুলিস মুন্সী চৌধুরীজীর গলার স্বরে যেন একটা প্রচ্ছন্ন ধমকের আওয়াজ ঘড়ঘড় করে। দুই দারোগা একটু বিচলিতভাবে চৌধুরীজীর মুখের দিকে তাকান।

চৌধুরীজী বলে—কে ছুটি নিবে, কে ছুটি নিবে না, সে আমি বলে দিব। এখন কাজ করুন।

গুপ্তবাবু—বলুন মুন্সীজী, আর কি করবার আছে?

চৌধুরীজী বলে—দাশু ঘরামির উপর কি অর্ডার হয়, বলেন। একটুক তাড়াতাড়ি করেন। আরও দাগীর ডাক বাকি আছে।

—ও হ্যাঁ। গুপ্তবাবু তাঁর বুকের বেল্টে হাত বুলিয়ে, আর চা-এর কাপে শেষ চুমুক দিয়ে দাশু ঘরামির মুখের দিকে তাকান ঃ হ্যাঁ, দাশু ঘরামি, পলুস হালদার যখন বলছে যে, তুমি ঘরে ছিলে, তখন কথাটা আর অবিশ্বাস করলাম না। যাও...ওয়াক আউট ; কিন্তু সাবধান, মাসে অন্তত একদিন এসে হাজিরা দিয়ে যাবে।

আস্তে আস্তে, যেন টলতে টলতে থানার বারান্দা থেকে নেমে, ঘেসো মাঠটা পার হয়ে সড়কের উপর এসে দাঁড়ায় দাশু। এইবার মনে হয়, পা দুটো অনড় হয়ে গিয়েছে। এই মুক্তি বিস্বাদ হয়ে গিয়েছে। এই মুক্তি মুক্তিই নয়।

পলুস হালদার দয়া করেছে। কেন দয়া করে পলুস হালদার? ভয় করে ; জীবনে কোন ভয়ে এমন ভীরু হয়ে যায় নি দাশু ঘরামি।

এখন এই খোলা পথটাকেও প্রকাণ্ড একটা হাজতঘর বলে মনে হয়। এগিয়ে যাবার উপায় নেই। কোথায় যাবে দাশু? কার কাছে যাবে? গিয়ে কি কোন লাভ হবে? ঘর বলতে কি আছে কি? আপন বলতে কেউ আছে কি?

জমিটা আর মুরলীর মুখটা ; দাশুর জীবনের দুটি সাধের ভুল বোধহয়। জমিটাকে

ভালবেসে জেলে যেতে হয়, আর মুরলীকে ভালবেসে হাজতে আসতে হয়। দুটি ভুলে দাগা পেল ; দাশু কিষাণ দাগী হয়ে গেল। তাই কি? কাকে শুধালে জবাব পাবে দাশু? শুধু মনে পড়ে, কপালবাবার কাছে যাওয়া যায়। হ্যাঁ, থানাতে হাজিরা দেওয়া হল, কিন্তু কই, কপালবাবার কাছে হাজিরা দেওয়া হয় নাই তো?

জঙ্গলের ছায়া থেকে একটু আলগা হয়ে, একটা একলা বেলগাছের গোড়ায় সেই সিঁদুর-মাখানো নুড়িগুলি আর খুলিটাও আছে। কিন্তু বড় বড় ঘাসের ভিড়ে প্রায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে কপালবাবার এই আসন। তার উপর আবার মাকড়সার জাল।

বেলপাতা চিবিয়ে আর ক্লান্ত শরীরটাকে প্রায় গড়িয়ে দিয়ে কপালবাবার আসনের কাছে মাথা ঠুকে জীবনের অনেক আশা আর অনেক ইচ্ছার কথা, অনেক ভয় আর অনেক রাগের কথা জানিয়ে যখন উঠে দাঁড়ায় দাশু, তখন দুপুরের ঘুঘুর ডাক আর জঙ্গলের বাতাসের ছোট ছোট আর ঝড়ের শব্দগুলিকেও প্রায় ক্লান্ত করে ফেলেছে।

আর এখানে কোন কাজ নেই। কপালবাবার কাছে যা বলবার ছিল তার সবই প্রায় বলা হয়ে গিয়েছে। পাঁচ বিঘা জমি চাই, আর জমিটাকে ঘিরে গুলঞ্চের বেড়া চাই। আরও কিছু চাই যে কপালবাবা ; কিন্তু সবার আগে মুরলীকে চাই ; আর চাই, মুরলীর পেটে ছেইলাটার প্রাণ যেন বেঁচে থাকে।

কপালবাবার আসনের উপর থেকে ঘাসগুলিকে উপড়ে পরিষ্কার করে দিয়ে আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে দাশু। কপালবাবাও যেন এতক্ষণে একটা মুখঢাকা অভিমানের হাজত থেকে মুক্তি পেল। নুড়িগুলি আর খুলিটা রোদ আর আলোর ছোঁয়া পেল।

কিন্তু কপালবাবারও এই দশা কেন হল? আবার কি ভুল করেছে গাঁয়ের লোক? লড়াইয়ের সময় মুঠো মুঠো কাঁচা পয়সা হাতে পেয়ে কপালবাবাকে ভুলে গিয়েছিল গাঁয়ের লোক ; সেই রকম ভুল আবার হয়েছে মনে হয়। বোধহয় কপালবাবার জঙ্গলের মরা শাল কুড়োতে ও মৌচাক ভাঙতে কেউ আর আসে না। কপালবাবাকে ভয় করতে ভুলে গিয়েছে সবাই। কপালবাবার কাছে পূজা পড়ে নাই অনেকদিন।

কিন্তু আমি তো তোকে ভুলি নাই কপালবাবা ; তবে আমার উপর তোর এত রাগ কেন? আমার জমি লুট হলো কেন? মুরলী আমাকে ঘিন্না করে কেন? আর থানা আমাকে মারে কেন?

ছি-ছি, কপালবাবার উপর আবার এসব অভিমান কেন? ভুল করে দাশুও যে কপালবাবাকে অবিশ্বাস করে ফেলেছে। সন্দেহ করছে দাশু, কপালবাবাও বুঝি মরে গিয়েছে। কপালবাবার কৃপা আর ক্রোধের শক্তি নেই বুঝি?

—মাপ করবি গো কপালবাবা। আর একবার শরীরটাকে মাটির উপর গড়িয়ে দিয়ে, মনের সব বিশ্বাস ঢেলে দিয়ে, আর মাথা ঠুকে ঠুকে যেন প্রাণের ক্লান্তিটাকে ব্যথা দিয়ে নিজেকে জাগিয়ে তোলে দাশু।

হ্যাঁ, যেতে হবে। নিজের গাঁ, নিজের ঘর, আর নিজের মাগের কাছে যেতে ভয় কিসের? কপালবাবা সহায় আছে, কিষাণ দাশুর জীবনের জোর ভেঙে দেবার সাধ্য আছে কার?

জঙ্গলের ঘুঘুর স্বর ক্লান্ত হয়ে আসে। কপালবাবার আসনের কাছ থেকে সরে গিয়ে, কাঁকরে ডাঙার ঢালু ধরে অদ্ভুত এক ক্লান্তিহীন সাহসের নেশায় যেন মত্ত হয়ে হাঁটতে থাকে দাশু।

ছোট একটা বাবলার বন। বাবলার শুকনো সুঁটি পথের উপর ফণা-তোলা মরা সাপের মত ছড়িয়ে রয়েছে। এই পথটুকু পার হলেই ডরানির নতুন পুলের কাছে সড়কের উপর এসে পড়বে দাশু। ডরানির স্রোতের কল কল শব্দ শোনা যায়।

হেসে ওঠে দাশুর মুখ। পাঁচ বছর পর এই প্রথম ডরানির স্রোতের ঠাণ্ডা জল খেয়ে পিয়াস মিটাবার সুযোগ পেয়েছে দাশু। জোর পিয়াসও পেয়েছে।

ডরানির গরম বালু মাড়িয়ে সরু স্রোতের কাছে পৌঁছে, ঠাণ্ডা জল খেয়ে আর হাত-মুখ ও মাথা ধুয়ে আবার বাবলার জঙ্গলের ছায়ার দিকে এগিয়ে যেতেই হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে থমকে দাঁড়ায় দাশু। মস্ত বড় একটা ডুমুর গাছের নীচে চকচকে তিনটে মহিষ আর দুটো বাচ্চা মহিষ খুঁটোয় বাঁধা হয়ে আর ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে জাবর কাটছে। গাছতলায় ছোট একটা খাটিয়া, একটা কম্বল, একটা ঢোলক। লম্বা একটা লাঠি খাটিয়ার কাছে পড়ে আছে। আর একটা লোক খাটিয়ার উপর বসে দাশুরই মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

দাশু এগিয়ে যেয়ে প্রশ্ন করে—তুমি এখানে এসে ডেরা নিয়ে কি করছো হে ভঁইসাল?

লোকটা হাসে ঃ জঙ্গলের ডহর ধরে এসেছি ; একটু জিরিয়ে নিচ্ছি সরদার। ভঁইসগুলাকে আর রোদে হাঁটা করিয়ে কষ্ট দিতে চাই না।

দাশু—জঙ্গলের ডহর ধরলে কেন হে?

—তাতে ডরটা কিসের হে?

দাশু—তোমার ভঁইস যে বাঘের পেটে যাবে হে।

—কিন্তু যায় নাই তো।

লোকটা আবার হেসে ফেলে আর দাশুর মনের প্রশ্নটাকে শান্ত করে দেয় ঃ জঙ্গলের ডহর ধরে আসি কেন বুঝলে না? ভঁইসগুলা পেট ভরে ঘাস আর পাতা খেতে পায়। ঠাণ্ডা ছায়া পায়। গরীব ভঁইসালের অনেক পয়সা বেঁচে যায় হে। তোমাদিগের গাঁয়ের বাজারে ভুসির দর এখন কত?

দাশু—তিন টাকা মণ হবে?

—বুঝ তবে? গরীব ভঁইসাল নিজে ভাত খাবে, না তিন টাকা মণ ভুসি কিনে ভঁইসগুলাকে খাওয়াবে।

দাশু—তুমি আসছো কোথা থেকে?

—তিন জিলার বাজার আর মেলা ধরে, অনেক ঘুরে আর অনেক জঙ্গল টুঁড়ে আসছি হে।

দাশু—যাবে কোথা?

—যাব গোবিন্দপুর।

—গোবিন্দপুর কেন? ভঁইস বেচতে?

—হ্যাঁ, তবে সবগুলাকে বেচতে পারবো না। দুধলি ভঁইসি দুটা থাকবে, শুধু ঐ গাভিনটাকে বেচে দিব। তুমি কিনতে চাও নাকি হে সরদার?

দাশু হাসে ঃ না হে।

—কেন?

—আরে, আমি গরীব কিষাণ বটি, ভঁইসি কিনবার টাকা নাই।

—গরীব হলে কেন?

চমকে ওঠে দাশু। লোকটার প্রশ্ন যেন দাশুর কপালের উপর ভয়ানক একটা টোকা দিয়ে ঠাট্টা করে উঠেছে। দাশু রাগ করে, মুখটাকে শক্ত করে দিয়ে রুক্ষস্বরে জবাব দেয়—ভঁইস বেঁচে তুমি লাট হয়েছ ; ভাগজোতের কিষাণ আর মনিষ কিষাণ গরীব হয় কেন, তুমি বুঝবে না।

—ভাগজোত কর কেন? মনিষ খাট কেন?

আবার একটা রূঢ় ঠাট্টার প্রশ্ন। ভঁইসাল লোকটার চোখ দুটো তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের হাসি হাসছে। চেঁচিয়ে ওঠে দাশু ঃ নিজের জমি না থাকলে কোন্ শালা কিষাণ মনিষ খাটে না আর ভাগজোত করে না?

—নিজের জমি থাকলেই বা তুমি কোন্ লাট হয়ে যাবে?

দাশু হাসে ঃ লাট হব কেন রে ভাই, লাট হতে চাই না। কিষাণ মানুষ, ধান মকাই সরগুজা আর সব্জির ফলান করে বেঁচে থাকতে চাই।

লোকটা হো-হো করে হেসে ওঠে ঃ আগে জমি পাবে, তাতে পাঁচ পহর খাটবে, তাতে যদি ধান ফলে তবে ভাত খাবে। তারপর বাঁচবে। এর চেয়ে যে নরকের খাটুনিও ভাল। এমন বাঁচা বাঁচতে লাজ লাগে না সরদার?

দাশু ভ্রূকুটি করে তাকায় ঃ তুমি কি আমাকে ডরাতে চাও?

লোকটা বলে—না, দুটো ভাল কথা শুনাতে চাই।

দাশু—নেশা করেছ মনে হয়।

লোকটা আবার হো-হো করে হেসে ওঠে। আর খাটিয়ার তলা থেকে একটা হাঁড়ি বের করে ঃ একটুক বসে যাও সরদার।

আকাশের দিকে তাকিয়ে রোদের মেজাজ বুঝতে চেষ্টা করে দাশু। বিকাল হয়ে এল বোধহয়। দাশু বলে—না হে। সাঁঝ হবার আগেই ঘরে পৌঁছতে চাই। এখন আর হাঁড়িয়া নিতে সাধ নাই।

—একটুক নিয়ে যাও ভাই। ভঁইসালের বেরাদারি ঘিন্না কর কেন?

এগিয়ে আসে দাশু। নিজের হাতে শালপাতা মুড়ে একটা নতুন ঠোঙা তৈরি করে দাশুর হাতের কাছে এগিয়ে দেয় ভঁইসাল লোকটা। তারপর হাঁড়ি উপুড় করে যেন মহুয়া-মদের ছোট একটি ফোয়ারাকে দাশুর হাতের ঠোঙার উপর গড়িয়ে দিয়ে বিড়বিড় করে ঃ ডরানির জলে ছাতির পিয়াস মিটে বটে, কিন্তু কলিজার পিয়াস কি মিটে রে ভাই?

মিথ্যা বলেনি ভঁইসাল লোকটা। দাশু ঘরামির বুকটা জানে, পাঁচ বছর ধরে জেলের সেই বিরস কয়েদী-জীবনে, বুকের ভিতরে কলিজাটা কি-ভয়ানক শুকনো পিপাসার তরাস সহ্য করেছে।

ঠোঙাটা যেন পাঁচ বছর আগের আনন্দে রসাল হয়ে টলমল করে ; পাঁচ বছর আগের জীবনে সুগন্ধ ভুরভুর করে। এক চুমুক ঠোঙার টলমল রসালতা বুকের ভিতরে টেনে নেয় দাশু, আর মুখ মোছে।

ভঁইসাল হাসে ঃ তোমার খুব পিয়াস লেগেছে সরদার। আর একটুক নাও।

আপত্তি করে না দাশু। অচেনা এক ভঁইসালের এই নতুন বেরাদারির মাদকতায় দাশুও ধীরে ধীরে মুগ্ধ হয়ে উঠতে থাকে।

ভঁইসাল লোকটাও দাশু কিষাণের সঙ্গে এই হঠাৎ বেরাদারির সৌভাগ্যকে যেন নতুন নেশা দিয়ে মাতিয়ে দিতে থাকে। ওর পিয়াসও থামতে চায় না। হাঁড়িটাকে মুখের কাছে তুলে নিয়ে আর উপুড় করে দিয়ে ঢকঢক করে মহুয়ামদের তরল আনন্দ যেন গিলে গিলে খেতে থাকে।

আস্তে একটা হাঁপ ছেড়ে নিয়ে লোকটা বলে—তুমি কোন্ গাঁয়ে থাক হে?

—মধুকুপি।

—কেন মিছা একটা গাঁয়ের দুখের মধ্যে পড়ে থাক?

—গাঁয়ে যে আমার ঘর আছে গো।

—ঘরই বা রাখ কেন?

—ঘরণী আছে যে।

—দূর দূর। ঘরণী তোমাকে কী সুখ আর কত সুখ দিবে?

—তোমার ঘরণী নাই?

—নাই।

—কেন নাই?

—ঘর নাই।

—ঘর করলেই তো পার।

—তুই আমার ভঁইসটার চেয়েও বোকা বটিস সরদার। ঘর করবো কেন? ঘরে কোন সুখটা আছে?

দাশু মুখ টিপে হাসে ঃ মরদে যে সুখ চায়, সেই সুখ আছে।

—আরে সরদার, সে সুখ কোথায় না পাওয়া যায় বল? বাজারে কি সে সুখের ঘর মিলে না?

—সে ঘরকে কি ঘর বল হে?

—কেন, মাগির ঘরের চালাতে কি পাখি বসে না?

দাশু হাসে ঃ কিন্তু মাগির ছেইলা তো তোমাকে বাপ বলবে না?

—না বলবে তো আমার কোন্ ভঁইসটা মরবে?

—নাঃ, তোমাকে খুব নেশাতে ধরেছে ভঁইসাল।

লোকটা হাসে ঃ আমি ভক্ত বটি সরদার ; সাধুসন্তদের কথা বিশ্বাস করি।

ঢোলকটাকে কোলে তুলে নিয়ে তড়বড় করে হাত চালিয়ে একটা বোল বাজিয়ে নিয়ে লোকটা গেয়ে ওঠে—একেলাহি চলনা ভালা বাপা, চলনা একেলাহি। কোই কিসিকা নেহি রে বাপা, কোই কিসিকা নেহি।

ঢোলকটাকে আরও কিছুক্ষণ তড়বড় করে পিটিয়ে নিয়ে লোকটা বলে—জমি আর জরু, এই দুই চিজ কখনো আপন হয় না। আপন ভেবেছিস কি মরেছিস।

ভঁইসালের লাল চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু করে ; মুখটাকে একজন ভক্তের মুখ বলেই তো মনে হয়। দাশুর বুকের ভিতর দুরু দুরু করে অদ্ভুত একটা ভয়ের ঢোলক বাজতে থাকে।

হঠাৎ হেসে চেঁচিয়ে ওঠে লোকটা ঃ ছেইলাও বাপের কেউ নয় সরদার। হোই দেখ।

একটু দূরে, বাবলার জঙ্গলটা যেখানে বেশ ঘন, সেখানে একটা মহুয়া গাছে ফুল আর ফল ধরেছে। মহুয়ার দিকে তাকাতেই চমকে ওঠে দাশু। গাছের মাথার উপরে একটা ডাল থরথর করে কাঁপছে। থাবা দিয়ে একটা ডাল আঁকড়ে ধরে মহুয়া ঝরাচ্ছে একটা...হ্যাঁ, জানে দাশু, ওটা ভালুক হতে পারে না, ওটা একটা ভালুকী।

গাছের তলার দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় দাশু, যদিও দৃশ্যটা দাশুর চোখের কোন নতুন অভিজ্ঞতা নয়, ভালুকীর দুটো ক্ষুধাতুর বাচ্চা নীচের ঘাসের উপর ঝরে-পড়া মহুয়াকে হুটোপুটি করে শুঁকছে আর খাচ্ছে।

—দেখছো তো। ছেইলা হলো মায়ের ছেইলা, বাপের নয়। বলতে গিয়ে আরও জোরে হাসতে থাকে লোকটা।

চুপ করে তাকিয়ে দেখতে থাকে দাশু। সেই অদ্ভুত ভয়ের জ্বালায় চোখ দুটো আরও লাল হয়ে উঠতে থাকে। লোকটা বলে—যে মরদে মাগ আর ছেইলাকে আপন ভাবে, গাঁ আর ঘরকে আপন ভাবে, তারাই নেশা করে বোকা হয়ে আছে।

দাশু—কিন্তু...।

—আবার কিন্তু কেন? সেদিন আর নাই, জমানা বদলে গিয়েছে সরদার তুমি যা ভাবছো সেটি আর হবে না।

—কি ভেবেছি আমি?

—তুমি গাঁয়ের কিষাণটি হয়ে ঘর বেঁধে, ভাগজোত করে মাগ ছেইলা নিয়ে সুখটি করবে, সেদিন আর নাই।

—কে বললে সেদিন আর নাই?

—আমি বলছি রে ভাই। মাগ বল আর ছেইলা বল, কেউ তোমাকে মিছামিছি পিয়ার করবে না। আগে হিসাব করে বুঝে নিবে, কেন পিয়ার করবো ; তবে পিয়ার করবে। না হয় তো, ভেগে যাবে।

দাশু বিড়বিড় করে ঃ কেন এমনটি হলো বলতে পার।

—আমি বলতে পারি না সরদার, আমি পরমাত্মা নই।

চুপ করে আর চোখ দুটো উদাস করে বসে থাকে দাশু। ডরানির স্রোতের কলকল শব্দ শুনতেও যেন ভয় করছে।

লোকটা কোলের উপর থেকে ঢোলকটাকে সরিয়ে রেখে দাশুর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে ঃ তুইও বুঝে চল সরদার ঃ না হলে বড় দুখ পাবি।

—কি বুঝতে বলছো?

—ওসব গাঁ ঘর মাগ আর ছেইলাকে ডরানির জলে ভেসে যেতে দে না কেন? তুই কেন ভাববি? সাধু-সন্তের কথাটা বিশ্বাস কর, কোই কিসিকা নেহি রে বাপা।

চেঁচিয়ে ওঠে দাশু—তবে কি ক্ষেপা হব, না ভিখমাগা সাধু হব?

বলে—খুব চালাক হবি, একটুও ক্ষেপা হবি না। নগদ সুখের সাধু হয়ে, পেট ভরে আর মন ভরে মজা নিয়ে ঘুরে বেড়াবি।

—সেটা কিসে হয়?

—টাকাতে হয় রে ভাই।

—টাকা কোথায় পাব?

—আমি দিব। দাশুর মুখের দিকে একটা ভয়ানক মোহময় আবেদনের জাদু ছড়িয়ে দিয়ে তাকিয়ে থাকে লোকটা।

—তুমি বা দিবে কেমন করে?

—সেকথা শুধাস কেন? তুই শুধু বল যে, টাকা চাস।

মাথা হেঁট করে ভাবতে থাকে দাশু। সব ভাবনা, সব ইচ্ছা আর সব আশা যেন নেশার ঘোরে এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। মধুকুপির ছোটকালুর আর বড়কালুর চেহারা দুটোও যেন স্পষ্ট করে দেখতে পারা যাচ্ছে না। ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে সবই। মধুকুপির যেন সব শব্দ হারিয়ে, সব গাছপালার রঙ হারিয়ে একটা শুকনো ডাঙা হয়ে গিয়েছে। জামকাঠের পুরনো কপাটটা পচে গলে ছেঁড়া কাঠের আবর্জনা হয়ে পড়ে আছে। ঘর নেই, মুরলী নেই, কেউ নেই।

মন্দ কি? দাশু ঘরামির,জীবনটাও যেন সব দুশ্চিন্তার বোঝা নামিয়ে ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। ঈশান মোক্তারের কুঠিতে গিয়ে চিঠা নেবার জন হাত পাততে আর হবে না।

লোকটা গলার স্বর এইবার যেন এক নতুন জগতের ঢোলকের বোল হয়ে বাজতে থাকে।—টাকা হাতে নিয়ে ডাক দিলে এক রাতের মধ্যে পাঁচটা মাগি পাওয়া যায় সরদার। তারপর নাও না, কত সুখ করে নিতে চাও? খাও দাও, নেশা কর, সরে পড়। ব্যস্, তুমি কার কে তোমার? সাধুসন্তেরা মিছা কথা বলেই নাই্ সরদার।

হঠাৎ হাত তুলে চোখের জল মোছে দাশু। লোকটা চেঁচিয়ে ওঠে, লাল চোখ দুটোও যেন রাগ করে জ্বলে ওঠে ঃ কি হলো হে সরদার?

দাশু বলে—টাকা দিতে চাও, দাও। নিব আমি। শোধ করেও দিব আমি। কিন্তু...তুমি যা বলছো, সেটি হবে না।

—কি হবে না? রুষ্ট হয়ে ক্ষেপা মহিষের মত চোখের তারা দুটোকে উল্টে দিয়ে দাশুর দিকে তাকিয়ে থাকে লোকটা।

দাশু—আমি গাঁ, ঘর, মাগ, ছেইলা ছাড়তে পারবো না। আমি ভাগজোত, ক্ষেতি-খামার

ছাড়তে পারবো না। কিষাণ মানুষ তোমার মত একটা নষ্ট ভঁইসাল হবে কেন?

লোকটার চোখের আক্রোশ আর আবেদনও যেন এইবার আস্তে আস্তে ক্লান্ত হয়ে আসতে থাকে। ক্লান্ত আক্ষেপের মত স্বরে একটা ধিক্কার দিয়ে বলে ওঠে—নাঃ, তোকে আমি মরদ মনে করেই ভুল করছি। বুঝি নাই যে, তুই একটা হিজরা। সুখ নিবার জোর নাই তোর।

চেঁচিয়ে ওঠে দাশু—বেরাদারি করতে ডেকে নিয়ে খুব গালিটি দিয়ে নিচ্ছ ভঁইসাল।

—আমার টাকা নিতে চাও যখন, তখন দুটা শক্ত কথা শুনতে হবে সরদার।

দাশু উঠে দাঁড়ায় ঃ তোমার টাকা চাই না। তুমি আমাকে চিন না ভঁইসাল ; তুমি আমার টাঙ্গি দেখ নাই।

—কে বট তুমি?

—আমি মধুকুপির দাশু ঘরামি। আমার জমির দুশমনকে টাঙ্গিতে ঘায়েল করে পাঁচ বছর কয়েদ খেটেছি। আমাকে যদি জানতে তবে আমাকে ঐ গালিটা দিতে তোমার বুক থরথর করে...।

লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে দাশু তার কথার আক্রোশটাকে হঠাৎ থামিয়ে দেয়, একটু আশ্চর্যও হয়। হাসছে লোকটা, আর চোখ দুটোও ছলছল করছে।

এরকমের নতুন চোখ-মুখ দিয়ে নতুন রকমের কথাও বলে লোকটা—বেশ তো, আমার মত নষ্ট না হলে তো না হলে ; আমার টাকা নিতে রাগ কেন?

—আমি ভিখমাগা নই।

—নিজেকে মিছা গালি দাও কেন সরদার? আমি কি তাই বলছি?

—তুমি টাকা দিবে কেন?

—কে জানে, ইচ্ছা করছে, তোমাকে টাকা দিই। অনেকদিন এমন ইচ্ছা করে নাই।

—তুমি টাকা পাবে কোথা থেকে?

—যেথা টাকা থাকে সেথা থেকে পাব। তোমাকেও পাইয়ে দিব।

—কি বললে?

—টাকা কোথায় না আছে রে ভাই! বাবুরবাজারের মহাজনদিগের হাতে কি টাকার থলি নাই? ঈশান মোক্তারের কুঠিতে কি টাকা নাই?

আস্তে আস্তে এক-পা দু-পা করে করে পিছনে সরে, আর, একবার কেঁপে উঠেই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে দাশু। ভঁইসালের সেই ঢুলু ঢুলু চোখ, উগ্র হাসি ও লাল চাহনির দিকে তাকিয়ে থাকে দাশু, ভঁইসালের মুখের ভয়ানক ভাষার শব্দ শুনতে থাকে।

ভঁইসাল বলে—বল, টাকা নিবে তো?

দাশু প্রায় একটা লাফ দিয়ে আরও পিছনে সরে যায় ঃ না, নিব না।

—কেন? বলতে বলতে এগিয়ে আসে ভঁইসাল।

আরও দূরে সরে গিয়ে দাশু বলে—তোমার টাকা নিতে ঘিন্না করে।

ভঁইসাল—ঘিন্না করে লাভ কি সরদার? টাকা না পেলে জমি করবি, ঘর করবি, মাগ ছেইলা নিয়ে সুখে থাকবি কেমন করে?

দাশু—না, তোমার টাকা নিব না।

আর কোন কথা না বলে, ভঁইসালের মুখের দিকে একটা ভ্রূক্ষেপও না করে হন হন করে হাঁটতে থাকে দাশু।

ভঁইসাল লোকটা চেঁচিয়ে হাসতে থাকে ঃ আমার টাকা নিতে হবে সরদার। আমি দিয়ে ছাড়বো।

চেঁচিয়ে উত্তর দেয় দাশু—দিতে এলে আমিও তোমাকে বুঝিয়ে দিব।

ভঁইসাল—আমাকে চিনতে পারলে না সরদার?

দাশু--চিনে দরকার নাই।

ভঁইসাল লোকটা আরও জোরে চেঁচিয়ে হাঁক দেয়--দরকার আছে হে সরদার। থানাতে গিয়ে বলে দাও, গুপী লোহার এখানে বসে আছে।

থমকে দাঁড়ায় দাশু। মুখ ফিরিয়ে তাকায়। চমকে ওঠে। কাঁপতে থাকে।

গুপী লোহার হেসে ওঠে : থানা তোমাকে অনেক টাকা বকশিশ দিবে, এখনই দৌড়িয়ে যাও আর থানাকে খবরটা শুনিয়ে দাও।

গুপী লোহারের কালো মুখ, ঝকঝকে সাদা দাঁতের হাসি, আর লাল চোখের ঢুলু ঢুলু আবেশ যেন একটা বীভৎস রক্তমাখা জানোয়ারের আহ্লাদের চেহারা। কিন্তু আর এক মুহূর্তও দেরি করে না দাশু। গুপী লোহারের সেই মুখের দিকে দুর্দান্ত লোভীর মত একবার তাকিয়ে নিয়েই সড়কের দিকে ছুটে চলে যায়।

পথে চলতে কোন বাধা নেই। কাঁটা নেই, কাঁকর নেই, এমন কি ধুলোও নেই। একেবারে ঝকঝকে পরিষ্কার একটি পাকা সড়ক।

সড়ক ধরে হন্ হন্ করে হেঁটে এগিয়ে যেতে থাকে দাশু। সড়কের ধারে মাঝে মাঝে গাছের ছায়া দেখতে পেয়েও জিরিয়ে নেবার জন্য থামতে চায় না। ডরানির স্রোতের নতুন পুল অনেক পিছনে ফেলে রেখে অনেক দূর এগিয়ে যায় দাশু।

বিকেলের রোদের এখনও তেজ আছে বেশ। পিঠটা জ্বলছে, আর, সেই সঙ্গে যেন মনের ভিতরে একটা হিসাবও কটকট করে জ্বলছে। কানের কাছে গোবিন্দপুর থানাটা কথা বলছে। তিন জিলার পুলিস তিন দফা বকশিশ দেবে। দুশো, দুশো, আর দুশো, মোট ছশো টাকা। কত জমি কিনতে চাও সরদার? পাঁচ বিঘা দো-আঁশ, না হয় তো দশ বিঘা এঁটেল কিনে ফেল না কেন? নতুন লাঙ্গল কিনবে, এক জোড়া হেলে গরুও কিনতে পার। দাও না, তোমার সাধের ক্ষেতের জমি ঘিরে কত বেড়া দিতে চাও? ভলপ্তের বেড়া, লাল ঝিণ্টের বেড়া, বাঘভেরেণ্ডার বেড়া, ফণীমনসার বেড়া। জেলের বাগানে পাঁচ বছর খেটে অনেক কেরামতি শিখেছো ; তবে তো ইচ্ছা করলে আনারসের বেড়াও দিতে পার।

লাল চোখ দুটো কটমট করে ; আরও জোরে পা চালিয়ে আর ছুটে ছুটে চলতে থাকে দাশু। কোনদিন ভুলেও হিসেব করে জীবনের লাভ-লোকসান বুঝতে পারেনি মধুকুপির যে দেহাতি কিষাণ, সেই দাশু ঘরামির প্রাণটা যেন আজ হঠাৎ হিসাব করে বুঝতে শিখে বিপুল এক লাভের উপহার দু হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরবার জন্য ছুটে চলতে থাকে।

ওই তো, আর বেশি দূরে নয় ; বাবুরবাজার পুলিস ফাঁড়ির আলকাতরা মাখানো থামগুলি দেখা যায়। কিন্তু দাশু ঘরামির ছুটে চলবার খুশি উল্লাস হঠাৎ মাতালের মত টলতে টলতে থেমে যায়। আর এগিয়ে যাবার দরকার নেই, এগিয়ে আসছে পুলিস মুন্সী চৌধুরীজী আর রামাই দিগোয়ার। চৌধুরীজীর পিঠে একটা বন্দুক। রামাই দিগোয়ারের নীল কোর্তা আর টাঙ্গি টাও স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। পিছু পিছু একটা পালকিও আসছে।

কিন্তু এ কি হলো? এই দিকে, এই পথে বাবুরবাজার ফাঁড়ির এত কাছে এরকম ছুটতে ছুটতে কেন চলে এসেছে দাশু? কিসের আশায়? কোন্ লোভ? গোবিন্দপুর থানার কাছে বকশিশ নিতে?

দাশু ঘরামির বুকের ভিতরের সব বুদ্ধির হিসাব যেন আর্তনাদ করে ছিঁড়ে যায়। আর, লাল চোখ দুটো যেন দাশু ঘরামির জীবনের ভীরুতার দিকে তাকিয়ে লজ্জায় ও ঘৃণায় থরথর করতে থাকে। ছিয়া! ছিয়া! মধুকুপির এত তেজ আর এত দেমাকের কিষাণ দাশু ঘরামির প্রাণটা কি ছশো টাকা বকশিশের লোভে সত্যিই হিজরা হয়ে গিয়েছে?

ওই তো, ওই সেই পাপীটা! গোবিন্দপুর থানার কসাইটা! দাঁতাল বনবরাহার মত শুধু তেড়ে এসে মানুষের গায়ে দাঁত বসাতে ভালবাসে। ওর নাম চৌধুরীজী। দাশু ঘরামির

কাঁধের পেশীর উপর দু জায়গায় দুটো গুঁতোর ক্ষত হঠাৎ যেন নতুন অপমানের জ্বালা নিয়ে জ্বলে ওঠে। ওই চৌধুরীজীকে আর ওই রামাই দিগোয়ারকে টাঙ্গি দিয়ে টুকরো করে ডরানির জলে ভাসিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। তা হলে দাশুর কাঁধের ক্ষত দুটোর জ্বালা আজ আর থাকতো না।

কিন্তু টাঙ্গিটা হাতের কাছেই নেই আর বিকালের আলোটাও চারদিকের চোখ জাগিয়ে রেখেছে। তা ছাড়া, ওদের হাতে বন্দুকও আছে। ওদের চোখের নাগাল থেকে এই মুহূর্তে সরে যাওয়াই ভাল।

সড়কের উপর থেকে টপ করে একটা লাফ দিয়ে নীচের একটা পাথরের আড়ালে একটা বড় গর্তের মধ্যে চোর নেকড়ের মত চুপ করে লুকিয়ে পড়ে দাশু। মস্ত বড় পাথর, চারদিকে বাবলার ভিড় ; দাশু ঘরামির এই চোরা চেহারাকে দেখতে পাবে না হিংস্র বনবরাহ ওই চৌধুরীজীও।

অনেকক্ষণ পার হয়ে যায়। কিন্তু কই? নিকটের সড়কে তো কারও পায়ের শব্দ বেজে উঠল না। কোথায় কোন্ দিকে দাগী খুঁজতে চলে গেল ওরা?

উঠে দাঁড়ায় দাশু। উঁকি দিয়ে তাকায় ; সেই মুহূর্তে দাশু ঘরামির দু চোখ থেকে মহুয়ার নেশার সব লাল যেন সাদা হয়ে যায়। বুক কাঁপে দাশুর ; বুকের ভিতর যেন একটা ঝান্নাও গুমরে ওঠে।

এদিকে আসছে না চৌধুরীজী ও রামাই দিগোয়ার। জামুনগড়ার কাঁচা সড়ক ধরে কপালবাবার জঙ্গলের দিকে এগিয়ে চলেছে ওরা। আর বেশি দূর নয়, আর মাত্র আধ ক্রোশ পথ ওরা এগিয়ে যেয়ে জামুনগড়ার সড়কের উপরে দাঁড়ালেই ডুমুর গাছের ছায়াটা ওদের চোখে পড়বে। এখান থেকে এখনও বেশ স্পষ্ট দেখা যায়, ডরানির খাতের পাশে উঁচু এক টিলার কাছে ডুমুরের গাছটা যেন বিকালের রোদে পুড়ে কালো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওখানে ওই ডুমুরের ছায়ায় বসে নেশার ঘোরে ঢুলছে গুপী লোহার। চৌধুরীজীর বন্দুক আজ গুপী লোহারের প্রাণের খবর নিয়ে ছাড়বে।

ওরা যাচ্ছে কাঁচা সড়ক ধরে, বহেড়ার জঙ্গলটাকে ঘুরে ধীরে ধীরে। কিন্তু দাশু তো এখনি কোন চোরাপথে ছুটে গিয়ে আর ওদের আগেই পৌঁছে গিয়ে ভঁইসাল বেচারাকে জানিয়ে দিতে পারে ঃ যাও ভঁইসাল, জলদি সরে যাও। গোবিন্দপুর থানার কসাইগুলো আসছে।

চোরাপথ বলতে দাশুর চোখের নিকটে শুধু একটি পথের ছায়া ভাসে। এই যে সড়কের ধারে এই পাথর থেকে বিশ হাত পরেই শুরু হয়েছে সেকেলে গঙ্গানারায়ণী গড়ের যত ভাঙা ভাঙা ইঁটপাথরের ঢিবি। দুখন গুরুজী গল্প করেছে, অনেক দিন আগে গুরুজীর বাপের বাপও যখন বাচ্চা মানুষ ছিল, তখন ইংরাজের তোপ এক হাজার চুয়াড়কে মেরে এই গড়ের সামনের ডাঙায় তাঁদের লাস ছড়িয়ে দিয়েছিল। এক মাস ধরে শিয়াল আর শকুনের ভোজ চলেছিল। আর সাহেবরাও ঐ গড়ের ফটকে বসে বিলাতী সরাব আর কচি বাছুরের মাংস খেয়ে নেচেছিল। তাই আজও এই ভাঙা গড়ের নাম খানাপিনা।

হাজার চুয়াড়ের রক্তমাংস যে ডাঙার উপর পড়ে পচেছিল আর গলেছিল, সেই ডাঙাটা আজ মুলি বাঁশের জঙ্গলে ছেয়ে রয়েছে। খানাপিনার পুরনো ইঁটপাথরের ফাঁকে ফাঁকে রক্তশোষা গিরগিটি আর বজ্রকীট ঘুরে বেড়ায়। বিশাল করাইত ফণা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। বুড়ো বটের গোড়ার হাঁ-করা ফোকরে হুঁড়ারের বাসা। কোন রাখাল ভুলেও খানাপিনার কাছে গরু চরাতে আসে না।

খানাপিনার এই পুরনো ইঁটপাথর আর মুলি বাঁশের জঙ্গলটার ভিতর দিয়ে এক দমে একটা দৌড় দিলে কেমন হয়? পার হয়ে যেতে কতক্ষণই বা লাগবে? তারপরেই তো মরা

মাটির উপর একটা পুরনো শালবনের ধড় আর যত উইঢিবি। ও-জায়গাটা তো পাঁচ লাফে পার হতে পারা যায় ; তার পরেই ডরানির স্রোত আর সেই ডুমুর গাছের ছায়া।

দাশুও যেন চতুর ক্ষিপ্র ও হিংস্র একটা নেকড়ে ; খানাপিনার পুরনো ইঁটপাথরের উপর লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ছুটতে থাকে। বাঁশের খোঁচায় গায়ের গেঞ্জিটা ফালিফালি হয়ে ছিঁড়ে যায়। গেঞ্জিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দৌড় দিতে দিতে একটা উইঢিবির উপর এসে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়।

কিন্তু তাতে কি আসে-যায়? পুরনো উইঢিবির সাপ নিজেই ভয় পেয়ে কাতরাতে থাকে। গায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেলতেও ভুলে যায় দাশু। সোজা ছুটে এসে ডরানির স্রোত পার হয়ে ডুমুরের ছায়ার কাছে এসে চেঁচিয়ে ওঠে--ভঁইসাল।

কোথায় ভঁইসাল? কেউ নেই। দুধলি ভঁইসি দুটো নেই, গাভিন ভঁইসিটাও নেই, আর বাচ্চা দুটোও নেই। ভঁইসালের খাটিয়া, ঢোলক, লাঠি আর কম্বলও নেই। শুধু মহুয়ামদের শূন্য হাঁড়িটা কাত হয়ে পড়ে আছে।

দাশু ঘরামির লাল চোখ খুশির পুলকে কাঁপতে থাকে। জাদু জানে ভঁইসাল। হেই দেখ আছে, হেই দেখ নাই। কে জানে, হতেও পারে, হয়তো চিল হয়ে বা কাক হয়ে নিকটেই কোথাও লুকিয়ে আছে ভঁইসাল। চারদিকে সাবধানে তাকিয়ে আস্তে আস্তে যেন গোপন মানতের প্রার্থনার মত নরম স্বরে হাঁক দেয় দাশু ঃ জলদি সরে পড় ভঁইসাল, যদি হেথা থাক। গোবিন্দপুর থানার লোক এসে পড়েছে।

সত্যিই একটা কাক ডুমুর গাছের পাতার আড়াল থেকে ডানার শব্দ ছটফটিয়ে হঠাৎ উড়ে চলে গেল। জোরে একটা স্বস্তির হাঁফ ছাড়ে দাশু।

কিন্তু এখানে দাশু ঘরামিরও যে আর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকবার কোন অর্থ হয় না। এই ভয়ানক নিরালায় ডুমুরের ছায়াতে মহুয়া মদের একটা শূন্য হঁড়ির কাছে দাশুকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে বনবরাহ চৌধুরীর চোখ যে হিংস্র আহ্লাদে আবার ঘোলাটে হয়ে উঠবে।

কিন্তু কোন্ পথে ফিরে যাওয়া যায়? ডরানির স্রোতের সেই পুলের দিকে আর যাওয়া যায় না। গোবিন্দপুর থানার এক জোড়া রক্তচোষা মতলব ওই পথ ধরে এদিয়ে এগিয়ে আসছে।

পশ্চিমের আকাশটার দিকে তাকায় দাশু। বিকেলের রোদের তেজ মরে এসেছে। অনেক দূরে মধুকুপি ; ছোটকালু আর বড়কালুর মাথার পাথরে ঠাণ্ডা রোদের লালচে রঙ ধরেছে। ধানকাটা ক্ষেতের উপর ছোট পাখির দল এখনও উড়ুৎ ফুড়ুৎ করে। আর, তার চেয়েও একটু দূরে ডরানির স্রোতের বাঁকের দু পাশে পলাশবনের উপরে তিতিরের ঝাঁক উড়ে বেড়ায়।

ধানক্ষেতের আলের উপর দিয়ে একটা দৌড় দিয়ে পলাশের জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ে দাশু। স্রোতটা এখানে বেশ চওড়া ; স্রোতের কিনারা ধরে চলতে চলতে দাশুর এতক্ষণের রোদে-পোড়া আর পরিশ্রান্ত শরীরটার জ্বালাও শান্ত হয়ে আসতে থাকে। স্রোতের বুকের উপর ছড়ানো বড় বড় পাথরগুলি শেওলায় ঢাকা। পাথরের উপর দাঁড়িয়ে কোঁচবক ঝিমোয়। কুচো মাছের ঝাঁক পাথরের গায়ে শেওলা ঠুকরে খায় আর জলের উপর দাশুর ছায়া দেখতে পেয়ে ছটফটিয়ে পালিয়ে যায়।

দাশুর দু চোখের তারা থেকে মহুয়ামদের নেশার ঘোরে তখনও ঝরে পড়ে নি। বরং, পলাশবনের ছায়ায় স্রোতের পাশে পাশে হেঁটে সে নেশার সুখ এতক্ষণের সব ভয় জ্বালা আর ঘৃণা হারিয়ে আরও ঢুলু ঢুলু হয়েছে।

যেতে যেতে একবার থমকে দাঁড়ায় দাশু। মুখটাও হেসে ওঠে। স্রোতের ধারে একটা ছোট ডাঙার শুকনো ধুলোর উপর হুটোপুটি করে পাখা ঘষছে একটা পাখি। একটা পাপিয়া।

হ্যাঁ, ওটা একটা ভরত পাপিয়া বটে। এত কাছে এমন সুন্দর একটা কলকলে স্রোতের এত ঠাণ্ডা ও এত পরিষ্কার জল থাকতেও ধুলোতে স্নান করছে পাখিটা। যার যেমন স্বভাব।

টি-হা টি-হা টি-হা! পাখিটাও যেন আশ্চর্য হয়ে, দাশু ঘরামিকে একটা মিষ্টি স্বরের ধমক দিয়ে পাখার একটি ঝাপটের জোরে খাড়া উড়ান উড়ে উপরের আকাশে মিলিয়ে গেল। বুকের ধুলো হাত দিয়ে মুছে দাশুও আবার একটা হাঁফ ছাড়ে। কী ভয়ানক পাগল হয়ে গিয়েছিল মাথাটা, তাই বকশিশের লোভে বাবুরবাজার পুলিশ-ফাঁড়ির দিকে ছুটে গিয়েছিল দাশু। ইস্, মধুকুপির কিষাণের মান খুব বেঁচে গিয়েছে। তোর পাও লাগি কপালবাবা।

এগিয়ে এসে একটা পাথুরে ঢিবির কাছে দাঁড়ায় দাশু। স্রোতের কিনারায় এক জায়গায় এদিকে-ওদিকে গোবর শুকিয়ে রয়েছে। গাঁয়ের গরু বোধহয় অনেকদিন আগে পলাশবনে চরতে এসে এখানে জল খেতে এসেছিল। স্রোতের বালুর উপর ছোট একটু জায়গা জুড়ে একটা গড্‌হা। চিকচিক ঝিকঝিক করে না জল। পরিষ্কার স্বচ্ছ জল একটুও কাঁপে না। আঁজলা ভরে জল খেতে ইচ্ছে করে দাশুর।

পাথুরে ঢিবিটার ওদিকে ঝুপ করে একটা শব্দ বেজে ওঠে। যেন হঠাৎ শব্দ করে কেঁপে উঠেছে আহত জলের ঝলক। একটা কোট্‌রা হরিণ কি ভয় পেয়ে জলের উপর লাফ দিয়ে পড়েছে?

এগিয়ে যেতে গিয়েই হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে দাশু। শালপাতার একটা ঠোঙায় পাকা ডুমুর, আর লতা দিয়ে জড়িয়ে বাঁধা নীলকণ্ঠ ময়ূরের পালকের একটা গাদা পাথরটার উপর পড়ে আছে।

পাথরের উপর আরও দুটি জিনিস দেখতে পায় দাশু। ছোট একটি হাঁড়ি, সে হাঁড়ির মুখের কাছে একটা ভোমরা ঘুরে ঘুরে উড়ছে। আর, দু হাত বহর ও পাঁচ হাত লম্বা একটা মেটিয়া শাড়ি পাথরের উপর টান হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে। শাড়িটাকে যেন শুকোবার জন্য মেলে দেওয়া হয়েছে।

স্রোতের পাশে মাটির উপর যদি এক ফোঁটা রক্তের চিহ্নও থাকতো, তবে না হয় বুঝতে হতো যে, বাঘিন কানারানী একটা মাতাল গরু-চরানী মেয়েকে এখান থেকে একটি কামড়ে তুলে নিয়ে এখনি পালিয়েছে। চোখের বিস্ময় সহ্য করতে গিয়ে দাশুর বুকের ভিতরে একটা সন্দেহের ছায়া ছমছম করে। গুপী লোহারের নতুন জাদুর কোন খেলা তো? অনেক জাদু আর অনেক ছল জানে গুপী লোহার। নতুন একটা চেহারা ধরেছে নাকি গুপী লোহার?

শাড়ি আছে যখন, তখন মেয়েমানুষ নিশ্চয়। কিন্তু ডর নেই, লাজ নেই, এখানে এসে পাকা ডুমুর আর হাঁড়িয়া খেয়ে নেশা করে, এমন মেয়েমানুষ কি সত্যিই মেয়েমানুষ? এই বনে যে একা একা কোন গরুও জল খেতে আসে না। সন্ধ্যা হতেও আর বেশি দেরি নেই। এই বনে ভালুক আসে, হুঁড়ার ঘুরে বেড়ায়। আর, আজকাল কানারানীও আসে। সে খবর কি জানে না মাগিটা?

সত্যিই একটা মাগি বটে, না, আর কেউ? না, কোন ক্ষেপী? ধমক দিয়ে আর ভয় দেখিয়ে ওকে এখান হতে না তাড়িয়ে দিলে ওর প্রাণটা যে আজ সন্ধ্যা হতেই জানোয়ারের ক্ষুধার খোরাক হয়ে যাবে।

—কে বট তুমি? পাথরটার উপব উঠে হাঁক দিতেই দাশু ঘরামির গলাা স্বর পাল্টা ধমক খেয়ে চমকে ওঠে। কে যেন ধমক দিয়েছে—খবরদার ; এদিক পানে আসবে না।

এইবার দেখা যায়, শরীরটার গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে দিয়ে গুটিশুটি হয়ে বসে আছে যে, সে সত্যিই মেয়েমানুষ। মুখটাও দেখতে বেশ সুন্দর। নেশার ঘোরে লাল হয়ে টলমল করছে একজোড়া টানাটানা চোখ ; ভেজা চুলের গোছা নুয়ে পড়ে জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে দুলছে। গল্প শুনেছিল দাশু, ডাইনীরা মাঝে মাঝে রূপসী সেজে বোকা মানুষকে ভুলিয়ে রাখে, তারপর

নেশা করিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয় ; তারপর বোকাটার কলিজা চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যায়।

দাশু ঘরামি ভয়ে ভয়ে বলে--শুধাচ্ছি, কে বট তুমি?

--চোখ নাই? দেখতে পাচ্ছ না?

--দেখছি তো। তুমি মেয়েমানুষ।

--তবে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

তবু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে দাশু। দাশুর চোখের বিস্ময়ে বোধ হয় নতুন নেশার ছোঁয়া লেগেছে। কত কাছে, এই তো, দাশুর চোখের কাছ থেকে মাত্র পাঁচ হাত দূরে স্বচ্ছ জলের তরলতার মধ্যে শরীরটাকে ডুবিয়ে, শুধু সুন্দর মুখ আর নেশার চোখ ভাসিয়ে, তাকিয়ে রয়েছে একটা ছলনা।

চেঁচিয়ে ওঠে মেয়েমানুষটা--তুমি সরবে না কি সরদার? কেমন কিষাণ তুমি? লাজ লাগে না তোমার?

--কেন? লাজ কিসের?

—আমি কি তোমার ঘরের গাই যে, আমার এত কাছে এসে দাঁড়াবে আর তাকাবে?

দাশু—কি যে বলছো, বুঝছি না!

মেয়েমানুষটা বলে--বুঝ না কেন? চোখ নাই কি? দেখছো না আমার শাড়িটা কোথায় পড়ে আছে, আর আমি কোথায় আছি?

দাশু ঘরামির চোখের উদ্‌ভ্রান্তি এতক্ষণে পরিষ্কার হয়। সত্যিই একটা মেয়েমানুষ লজ্জা পেয়ে আর ভয় পেয়ে দাশু ঘরামিকে সরে যাবার জন্য অনুরোধ করতে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে।

চলে যাওয়া উচিত, সরে যাওয়া উচিত। কিন্তু দাশুর চোখের কৌতূহল তবু যেন একটা মায়ার আবেশে ছটফট করে। দাশু বলে—কিন্তু তুমি কেমন মেয়েমানুষ গো?

—তোমার ঘরণী যেমন মেয়েমানুষটি, তেমনটি গো।

—তুমি ক্ষেপী বট, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।

—তুমি চালাক বট, মতলব নিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছ।

—তুমি নেশা করেছ।

—তুমিও নেশা করেছ।

—তোমার ডর নাই?

—কিসের ডর?

—জানোয়ারের ডর?

—তোমার মত মানুষদিকে ডরাই ; জানোয়ারদিগে ডরাই না।

—আমি তোমার কোন্ মান নাশ করেছি যে গালি দিচ্ছ?

—সরে যাচ্ছ না কেন? কি দেখবার মতলব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ?

—কিছু দেখতে চাই না। একটা কথা বলে দিতে চাই ; যদি শুন তো বলি।

—কোন কথা শুনতে চাই না। তুমি জলদি সরে যাও।

—কোন্ গাঁয়ে ঘর তোমার?

—তুমি শুধাও কেন?

—শুধালে দোষটা কি বল?

—ভালটা কি, তাই বল?

—আমার ভাল কিছু নাই, তোমার ভাল হতে পারে।

—কেন? আমার কি ভালটা করবে তুমি?

—তোমাকে ঘর পৌঁছিয়ে দিব।

--আমার ঘর নাই।

--মিছা কথা। যদি মেয়েমানুষ হও তো ঘর নিশ্চয় আছে।

--না গো না। আমার নাইহর নাই, শশুরার নাই, কিছু নাই।

--তুমি খুব নেশা করেছ। কেন করলে?

--তাতে তোমার কি?

--আমার কিছু নয়। তুমি মরবে!

--কে মরাবে আমাকে? কোন্ জানোয়ারে?

--জানোয়ারে নয়, মানুষে।

--কোন মানুষের সাধ্যি নাই গো সরদার।

হেসে ওঠে দাশু। কিন্তু মেয়েমানুষটার লাল চোখ শিকরে বাজের চোখের মত কটমট করে ঃ হাস কেন গো সরদার? একবার ছুঁতে এসে দেখ না কেন, কি হয় তোমার?

--কি করবে তুমি?

--তোমার মত কত গাঁওয়ার এই কিষাণীর গা ছুঁতে এসে বুঝে নিয়েছে, আমার দাঁতে আর নখে কত বিষ আছে।

দাশু চেঁচিয়ে ওঠে--তুমি কিষাণী?

--হ্যাঁ গো। তুমি কি মনে করেছ?

--আমি ভেবেছিলাম তুমি একটা বেইদানী।

মেয়েমানুষটার লাল চোখ হঠাৎ ছলছল করে ওঠে ঃ তুমি ভুল বুঝ নাই সরদার। কিষাণী ছিলাম, কিন্তু বেইদানী হয়েছি। আমার কপালটা আমাকে বেইদানী করে দিয়েছে সরদার।...ও কি করছো? ছি।

দাশুর চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ধিক্কার দিয়ে ওঠে কিষাণী। আর চটপট হাত চালিয়ে জলের নীচে বালু ঘেঁটে স্বচ্ছ জল ঘোলা করে দেয়।

হ্যাঁ, খুবই স্বচ্ছ জল। সেই জল যেন এই কিষাণীর শরীরের একটা স্বচ্ছ সাজ। কী অদ্ভুত সাজ! সবই দেখা যায়। আবরণ বটে, তবু আবরণ নয়। কিষাণী গুটিসুটি হয়ে গলা পর্যন্ত শরীর ডুবিয়ে বসে থাকলে হবে কি? দাশু যে কিষাণীর ঢলঢল শরীরের সব ছবি দু চোখ ভরে দেখে ফেলেছে।

দাশু বলে--তোমাকে বড় দুখী মনে হয়।

কিষাণী হাসে ঃ হয় তো হয়। এখন চুপচাপ চলে যাও, আর ঘরে গিয়ে কিষাণীর দুখের কথা ভেবে ভাত খেও না।

কথা বলে না দাশু। কিষাণীও আনমনা হয়ে ওর লাল চোখের নেশার সুখে কি-যেন ভাবে। বিকালের রোদ এবার সব তেজ হারিয়ে একেবারে সিঁদুরে হয়ে স্রোতের জল পাথর আর বালুর উপর যেন রংঝারি ঢালতে থাকে। ঝাঁকে ঝাঁকে তিতির ওড়ে। কুর‍্র্ কুর‍্র্, বনমোরগের দল শব্দ করে উড়ে এসে স্রোতের ধারে বসে আর তখুনি উড়ে পালিয়ে যায়।

দাশু হাসে--তোমাকে বেশ সুখী মনে হয়।

কিষাণী এইবার যেন গর্ব করে চেঁচিয়ে হেসে ওঠে ঃ কেন সুখী হব না? গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরি। মান্‌ঝিদের ঠাঁই ময়ূর-পাখা খরিদ করি। চার আনায় এক গোছা পালক পাই, বেপারীর কাছে চার টাকায় বেচে আসি।

দাশু--তোমার বিয়া হয় নাই?

--বিয়াতে লাভটা কি আছে গো সরদার? মরদের দাসী হতে বলছো?

--ঘরণী কি মরদের দাসী হয়?

--দাসীই হয়। কিন্তু মিছা নিজেকে ঘরণী ভেবে গমর করে।

—দাসী বল আর যা-ই বল, মেয়েমানুষ যদি মরদ না পায় তবে...।

খিলখিল করে হেসে আর দু হাত তুলে খোলা চুল গুটিয়ে পাকিয়ে খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে কিষাণী বলে—ছিয়া ছিয়া!

দাশু—তুমি ক্ষেপী বট।

—আমি ক্ষেপী নই। যে মাগি মরদের গা ছোঁয়, সে মাগি ক্ষেপী।

—ক্ষেপী হয়েও ওরা তোমার চেয়ে সুখী।

—কেন?

—ওরা ছেইলা পায়।

—ছেইলাওয়ালীর কপালে ঝাড়ু।

—কেন?

—ছেইলা যে ডাইন বটে গো। মায়ের রক্ত খায়।...ও কি? আবার?

দু হাতে বালু ঘেঁটে জল ঘোলা করে দিয়ে আবার দাশুর মুখের দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকে কিষাণী।

দাশু বলে—তুমি উঠে এসো!

কিষাণী—তুমি সরে যাও।

দাশু—আমি তাকাব না। এবার উঠে এসে শাড়িটা ধর।

ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে থাকে কিষাণী। নেশায় ভরা লাল চোখে সন্দেহ টলমল করে।

দাশু বলে—বিশ্বাস কর।

কিষাণী—ঠিক তো?

দাশু—হ্যাঁ।

কিষাণীর সন্দেহে ভুল নেই বোধহয়। দাশুর নিঃশ্বাস হঠাৎ উতলা হয়েছে। সত্যিই পলাশবনের এই নিভৃতের স্রোতের কাছে বিকালশেষের সিঁদুরে আলো যেন মহুয়ারসের চেয়েও বেশি মাদক। সারা পলাশবন নেশা চাইছে। নাইহর নাই, শশুরার নাই ; বিয়া করে না, ছেইলা চায় না ; তবু মেয়েমানুষ। এ কেমন মেয়েমানুষ? এমন মেয়েমানুষের শরীরে কোন্ জাদু আছে? দাশু ঘরামির চোখের পিয়াস দুরন্ত হয়ে উঠেছে।

টি-হা টি-হা টি-হা!—ডেকে উঠেছে পাখিটা। কিষাণীও হেসে ওঠে ঃ পাপিহাটা তোমার মত চালাক বটে। সরে যাও এবার ; উঠতে দাও।

সরে যায় দাশু। মাথা হেঁট করে পায়ের কাছে শক্ত পাথরটার দিকে তাকিয়ে চোখ দুটোকেও যেন পাথরের মত শক্ত করে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

উঠেছে কিষাণী। কিষাণীর ছায়াটা দাশুর প্রায় গা ঘেঁষে চলে যায়। বুঝতে পারে দাশু, এইবার কিষাণী ওর শাড়িটাকে তুলে নেবার জন্য হাত নামিয়েছে।

কেঁপে ওঠে দাশুর চোখ। দাশুর লাল চোখের পিপাসার স্বপ্নটা এই মুহূর্তে ঢাকা পড়ে যাবে। ঠকে যাবে দাশু ঘরামির এতক্ষণের তপ্ত নিঃশ্বাসের আশা। মুখ ফিরিয়ে তাকায় দাশু।

কিষাণী রাগ করে আর চিৎকার করে ওঠবার, আর শাড়িটা হাতে তুলে নেবার আগেই দাশু তার বিবশ বুকের সব ধুকপুক শব্দের বেদনা নিয়ে ছুটে এসে কিষাণীকে দু হাতে বুকের উপর জড়িয়ে চেপে ধরে। পৃথিবীর কোন মেয়েমানুষ নয়, এই পলাশবনের মেয়েমানুষ। স্রোতের জলে স্নিগ্ধ করা, হাঁড়িয়ার নেশায় মাতাল করা, আর বিকালের সিঁদুরে আলোতে রঙিন করা একটা রক্তমাংসময় কোমলতা।

দাশু বলে—তোমার দাঁতে নখে বিষ আছে জানি। কিন্তু আমাকে মাপ কর কিষাণী।

—কি? দাঁতে দাঁত ঘষে মুখটাকে কুৎসিত করে নিয়ে প্রশ্ন করে কিষাণী। কিষাণীর নেশার চোখ থরথর করে কাঁপতে থাকে ; কিন্তু কেঁপে কেঁপে যেন ক্লান্ত হতেও থাকে।

দাশুর গলার স্বর এইবার যেন বুকের ভিতর থেকে ফুঁপিয়ে উঠে আবেদন করে ঃ আমাকে ঠকাবে না কিষাণী।

কিষাণী—কেন? তুমি আমার কে?

দাশু—তুমি যা বলবে, তাই।

কিষাণীর লাল চোখের উদ্‌ভ্রান্তি যেন নতুন এক উষ্ণতার আবেশে কোমল হয়ে ছলছল করে। দাঁতের আর নখের হিংস্র অহংকার হঠাৎ জব্দ হয়ে গিয়েছে। ফুঁপিয়ে ওঠে কিষাণী—তা হলে কসম খাও ; আমি যা বলবো, তাই মেনে নিবে।

দাশু—নিশ্চয়।

কিষাণী—তবে আমিও নিশ্চয়।

দাশু—এখনই তো?

কিষাণী—না সরদার, এখন না।

দাশু—কবে?

কিষাণী—পরে।

দাশু—না, এখনই।

আস্তে আস্তে হাঁপাতে থাকে পলাশবনের মেয়েমানুষ। লাল চোখের নেশাটা যেন গলে পড়তে চাইছে। চোখ বন্ধ করে বলে—তুমি আমাকে মরতে বলছো সরদার ! বেশ...কিন্তু কথা দাও যে...।

দাশু—বল।

—তুমি আমার সাথে থাকবে। বিয়া হবে না, তবু থাকবে। আমি তোমাকে ভাত দিব, কাপড় দিব। তোমার নেশার মদ দিব। আমি যেখানে নিয়ে যাব, সেখানে যাবে। আমি না বললে তুমি আমার গা ছুঁবে না। আমি তোমার গা ছুঁলে তুমি না বলবে না। যেদিন চলে যাব সেদিন আর আমাকে খুঁজবে না।

দাশু—তুমি আমাকে বেইদা হতে বলছো?

কিষাণী—হ্যাঁ। যতদিন ভাল লাগবে দুজনে মাগিমরদ হয়ে এক সাথে থাকবো। ভাল লাগবে না যেদিন, সেদিন ছাড় হয়ে যাবে। ছেড়ে যেতে কারও মনে কোন দুখ হবে না।

দাশু—শুধু দুটো দিনের এমন সুখে লাভ কি?

কিষাণী—তবে একটিবারের এমন সুখে লাভ কি? তবে তুমি এখনই পাগল হয়েছ কেন, আর আমাকে এখনই মরতে বলছো কেন?

কিষাণীর মুখের দিকে করুণভাবে তাকিয়ে থাকে দাশু। ফিসফিস করে তপ্ত নিঃশ্বাসের বাতাস দাশুর মুখের উপর ছড়িয়ে দিয়ে কিষাণী বলে—ঢের দিন এক ঠাঁই ভাল নয়। ঢের দিন এক মরদ ভাল নয়। ঢের দিন এক মাগ ভাল নয়। ছেইলাও ঢের দিন ভাল নয় সরদার। দুটা দিন কাছে রাখ, তারপর চালান করে দাও। যে নিবে নিয়ে যাক্। ঢের দিন কারও সাথে মজেছ কি মরেছ। সুখ হবে এতটুকু, দুখ হবে এত!

দপ্ করে, যেন একটা উল্লাসের জ্বালায় দাশুর চোখ দুটো জ্বলে ওঠে ; এই তো ভাল। বড় ভাল কথা, খুব ঠিক কথা, বড় ভাল সুখের কথা বলেছে কিষাণী।

—একটুক বুঝে নিয়ে কথা বল সরদার? যদি না বুঝে থাক, তবে...। কিষাণীর শরীরটা যেন অভিমান করে দাশুর বুকের ছোঁয়া থেকে সরে যেতে চায় ; তাই কেঁপে ওঠে।

পলাশবনের নিভৃতে হঠাৎ কুড়িয়ে পাওয়া যে স্বাদুতা দাশুর লুব্ধ বুকের উপর পড়ে আছে, সে স্বাদুতা হারিয়ে ফেলবার দুর্ভাগ্য সহ্য করতে হলে দাশু ঘরামির রক্তের সুখ বুঝি শুকিয়ে কাঙ্গাল হয়ে যাবে। যেন একটা স্বপ্নের ঘোরে বিড়বিড় করে দাশু—বুঝেছি।

কিষাণী—তবে শুন।

দাশু—বল।

—এই হাঁড়ির মদে আমি ধুতরা মিশিয়েছি।

চেঁচিয়ে ওঠে দাশু—না। তোমাকে আমি মরতে দিব না। এই হাঁড়িকে আমি লাথি মেরে এখনি সোতের জলে ফেলে দিব।

হেসে ফেলে কিষাণী—আমি আমাকে মরাতে চাই না, সরদার।

—তবে কাকে মরাতে চাও?

—বলছি ; তুমি আগে কথা দাও, আমার সাথে যাবে আর সে মাগিকে ধুতুরামারা এই হাঁড়িয়া খাইয়ে দিবে।

—সে মাগিটা কে বটে? ডাইনী বটে কি?

—ডাইনীর চেয়েও খারাপ বটে গো।

—কে?

—মধুকুপির কিষাণী, দাশু ঘরামির মাগ মুরলী।

দাশুর হাত দুটো হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে পলাশবনের মাতাল মেয়েমানুষের নগ্ন শরীরটাকে যেন দু হাতের দশ আঙ্গুলের নখ দিয়ে খিমচে শক্ত করে ধরে রাখে।—কি বললে তুমি?

—হ্যাঁ গো সরদার। ও মাগি একটা খিরিস্তান শিকারীর সাথে নষ্ট হয়েছে। কে জানে, মাগি কোন্ জাদু করে শিকারীটার মন টেনে নিলে। আচ্ছা...হ্যাঁ গো সরদার...একটা কথা বলবে?

—বল?

—ঢং করে একটুক হাসলে, গির্জাবুড়িকে সেধে সেধে দুটা জবর কথা শিখলে, একটা সিলাই কল নিয়ে ঘরঘর করে ফরফর করলে, একটা বাহারী রেশমী শাড়ি পরলে, গায়ে একটা জামা চড়ালে মেয়েমানুষের গতরের সোয়াদ কি মিঠা হয়ে যায়?

—এ কথা কেন বলছো?

—মনের জ্বালায় বলছি গো সরদার। আমার গতরে কী মজা নাই যে, আমাকে পেলে মরদ খুশি হবে না বল? তবু খুশি না হয়ে ভেগে গেল।

—দাশু ঘরামির মাগের নষ্টামির কথা তুমি কোথা থেকে জানলে?

—তেতরি ঘাসিনের ঠাঁই শুনলাম।

—তেতরি ঘাসিনের সাথে তোমার দেখা হলো কোথা?

—বাবুরবাজারে।

—তোমার ঘর বাবুরবাজারে?

—না গো। আমি হালে এসেছি। বাবুরবাজারের কাছে আমার সহিয়ার ঘর আছে। সহিয়ার মরদ পালকিতে খাটে।

—তুমি সেখানে থাক?

—এখন আছি। কাজ ফুরালেই চলে যাব।...এ কি, কি হলো সরদার? সরে যাও কেন?

হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে, ছোট্ট একটা আর্তনাদের মত করুণ স্বরে প্রশ্ন করে পলাশবনের মেয়েমানুষ। কারণ, ওর তপ্ত নিঃশ্বাসের স্বপ্নটাকে বুকের উপর থেকে হঠাৎ ঠেলে আলগা করে দিয়ে দু'পা পিছনে সরে দাঁড়িয়েছে দাশু।

তাড়াতাড়ি শাড়িটা তুলে নিয়ে গায়ে জড়ায় সেই অদ্ভুত নারী, এইমাত্র সর্বস্ব অঙ্গীকার করে ধুতরাবিষ দিয়ে প্রচণ্ড এক হিংসার জ্বালা শান্ত করবার খেলায় দাশু ঘরামিকে সাথী করতে চেয়েছে যে। কিষাণীর মাতাল চোখ দুটোতে যেন ধুলোলাগা একটা ব্যথা কচকচ করছে। আস্তে আস্তে বলে—তুমিও কি আমাকে ঘিন্না করলে সরদার? আমি তোমাকে ঠকাতে চাই নাই।

চেঁচিয়ে ওঠে দাশু--তুমি চল।...সাঁঝ হয়ে এল। তাড়াতাড়ি কর কিষাণী..আমার ডর লাগছে।

দাশুর গলার স্বর যেন দুঃসহ যন্ত্রণায় ফেটে পড়েছে। বুকের ভিতর দাউ দাউ করছে একটা পোড়া বাতাস। এই মুহূর্তে ছুটে পালিয়ে যেতে না পারলে দাশু ঘরামির কলিজাটা ফেটে যাবে ; মধুকুপির মানুষ গল্প করতে গিয়ে হেসে উঠবে, রূপসী ডাইনীর পিছনে ছুটে গিয়েছিল দাশু ; আর ডাইনীটা ওর কলিজা চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে। ইচ্ছা করে নিজেকে মরিয়েছে বোকাটা।

পলাশবনের মেয়েমানুষের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে যখন ডাঙার কাছে পৌঁছায় দাশু, তখন ঝিঁঝির ডাক শুরু হয়ে গিয়েছে। সড়কের উপর উঠতেই দেখতে পাওয়া যায়, দূরে বড়কালুর মাথার উপর একটা তারা ফুটেছে।

দাশু বলে--খিরিস্তান শিকারীটা তোমার কে বটে গো?

--দুশমন বটে। একদিন আমারই কপালে সিঁদুর দিয়েছিল দুশমনটা।

দাশু--তোমার নামটা কি বটে?

--সকালী।

দাশু বলে--তুমি এখন সিধা বাবুরবাজারে চলে যাও, সকালী। আমি আমার গাঁয়ে চললাম।

চেঁচিয়ে ওঠে সকালী--ছিয়া ছিয়া, তুমি আমাকে ঠকালে সবদার!

বড়কালুর মাথার উপর ফুটে-ওঠা বড় তারাটার দিকে আর-একবার তাকায় দাশু। সকালীর হাত থেকে হাঁড়িটা কেড়ে নিয়ে এক আছাড় দিয়ে গুঁড়ো করে দেয়। তারপরেই এক লাফে পিছনে সরে যায়।

--তুমি কে বট সরদার? চেঁচিয়ে ডাক দেয় সকালী।

কোনও উত্তর না দিয়ে ছুটে চলে যায় দাশু। মধুকুপির বাতাসের গন্ধ বুকের ভিতরে না পাওয়া পর্যন্ত দাশুর জীবনের এই বিষাক্ত ভুলের জ্বালা আর লজ্জা বোধহয় কাটবে না।

রাতের মধুকুপির বাতাস বেশ ঠাণ্ডা, অন্ধকারও বেশ নিবিড়। আর নীরবতাও যেন একটা থমথমে নেশার ঘোর।

দাশুর মাথার জ্বালা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। আর, চোখের লালও সাদা হয়ে আসতে থাকে। হাতে-পায়ে ক্লান্তি নেই, কিন্তু দু চোখে একটা অবশ ঘুম-ঘুম ক্লান্তির ভার জোর করে টেনে নিয়ে পথ হাঁটতে থাকে দাশু।

তবু, মাথার ভিতরটা ঝিমঝিম করে থেকে-থেকে ঝাঁঝরের মত বেজে উঠছে। আর মনটাও কথা বলছে। সকালী সকালী! টি-হা টি-হা-টি-হা! সকালী আর দাশু!

দূর দূর। সকালী আর দাশু কেন? ওটা তো পলাশবনের একটা ভয়ানক অভিশাপের ছবি। সে ছবি আবার এতক্ষণ পরেও চোখের উপর ছমছম করে কেন? চোখে তো আর নেশাও নেই। দূর দূর। মনে মনে যেন ধমক দিয়ে আর ঘেন্না করে কুৎসিত একটা ভয়ের ছবিকে খেদিয়ে দিয়ে পথ চলতে থাকে দাশু। কপালবাবার দয়া আছে, তাই সকালীর লাল চোখের ছলছল মায়ার কাছে মরতে গিয়েও মরে পালিয়ে আসতে পেরেছে দাশু।

কিন্তু সকালীর জন্য দুঃখ হয়। হালদারের জন্য যদি প্রাণে এতই পিয়াসের জ্বালা জ্বলে থাকে, তবে যাও না কেন, হারানগঞ্জের গির্জাবাড়ির সিস্টার দিদির কাছে গিয়ে খিরিস্তান হও; শাড়ি পর, জামা পর, ঢং করে হাঁস আর পলুস হালদারের সাথে ঘর কর।

সকালীর উপর একটা রাগও যেন দাশুর মাথার ভিতরে থেকে থেকে জ্বলে ওঠে। তুই মাগি মুরলীকে মরাবার কে রে? মরাতে হলে হালদারকে মরা না কেন, যে তোকে জংলী

মাগি বলে ঘিন্না করে ছেড়ে দিয়েছে, তোকে মাগ বলে মেনে নিতে লাজ পায় যে হালদার?

বড়কালুর কাছের একটা জঙ্গলে হরতকী ভাঙতে গিয়ে কতবার দেখেছে দাশু, নাগিনে নাগিনে লড়াই বেধেছে। গায়ে সোনা রঙের ছোপ, চিকচিক করে চোখ, এই লম্বা এক একটা নাগিন। লিকলিক করে ঘাসের উপর অলসভাবে ঘুরে বেড়ায়। আর, কোন নাগ-নাগিনকে একসঙ্গে দেখতে পেলেই ফণা তুলে নাগিনটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। নাগিনে নাগিনে কি-ভয়ানক হিংসার মারামারি চলে! ছোবল কামড় আর হুটোপুটি। গায়ের সোনা রঙের ছোপ রক্তে আর ধুলোয় ঢাকা পড়ে যায়। নাগটা চুপ করে একদিকে বিঁড়ে পাকিয়ে আর শুধু ফণাটুকু উঁচিয়ে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে। যে নাগিন মরে, সে নাগিন সেখানেই পড়ে থাকে। যে নাগিন বাঁচে, তারই সঙ্গে আবার জড়াজড়ি করে নাগটা। সকালীও যেন হরতকীর জঙ্গলের একটা নাগিন ; নইলে মুরলীকে মরাতে চায় কেন?

তেতরি ঘাসিনটা ভয়ানক মিথ্যুক। মুরলীর নামে মিছা একটা নিন্দার কথা বলে দিয়েছে, আর সকালী নাগিনটাও সে-কথা বিশ্বাস করে ফেলেছে। তেতরি ঘাসিনকে এখন একবার কাছে পেলে ওর টুঁটি টিপে ধরে শুধাতে পারা যেত--কি লো ডাকবাংলার রাতের লুচ্চার দাসী, তুই কি দেখে মুরলীকে সন্দেহ করলি, আর এমন মিথ্যেটা রটালি?

হেসে ফেলে দাশু। সকালীর জন্য মায়া হয়। ভুল করে কাকে জড়িয়ে ধরল সকালী নাগিনটা?

খুব জোরে একটা হোঁচট খায় দাশু, আর ভয় পেয়ে চমকে ওঠে। মুরলীর মরদ দাশু আজ ভুল করে কাকে জড়িয়ে ধরল? মুরলী যে পাগল হলেও সন্দেহ করতে পারবে না, দাশু ঘরামির চওড়া বুকটা দুরদুরে পিপাসায় শতবার ছট্‌ফট করে উঠলেও মুরলী ছাড়া আর কোন নারীকে কাছে টেনে নিতে পারে। দাশু ঘরামির বুকটা কি পাপী হয়ে গেল?

রিমঝিম করে মাথাটা, মুরলীর উপর একটুও রাগ হয় না, বরং একটু মায়া হয়। আর, মনটাও ভীরু ভীরু হয়ে স্বীকার করে, মুরলীর চোখের চাহনিকে সন্দেহ করে টাঙ্গি তুলবার শেষ সাহস দাশুর ; মুরলীর চোখের চাহনিকে সন্দেহ করে টাঙ্গি তুলবার শেষ সাহস দাশুর বুক থেকে ঝড়ে পড়ে গিয়েছে।

পলুস আর মুরলী! দূর দূর! বেচারা পলুস হালদার! হালদারের কথা মনে পড়লে একটুও হিংসে হয় না, বরং করুণা হয়। পথ চলতে চলতে মধুকুপির ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁয়ায় নিঃশ্বাসের জোর আবার জমে উঠতেই দাশুর প্রাণে যেন একটা দেনা শোধের হাসি শব্দ করে বাজতে থাকে। পলুসের দয়াকে পাল্টা দয়া দিয়ে শোধ করে দিয়েছে দাশু। সকালীকে বুকের উপর থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে।

গাঁয়ের পথে ঢুকতে সেই বড় পিপুলের কাছে পৌঁছবার আগেই চমকে ওঠে দাশু। থমকে দাঁড়াতেও হয়। সোরগোলের মত একটা শব্দ। মনে হয় পিপুলতলার কাছেই হৈ-হৈ করে কারা যেন ঠেঙ্গা দিয়ে টিন পিটছে। তবে কি বাঘিন কানারানী আবার কারও গরুর ঘাড় ভেঙেছে? পিপুলতলার কাছে অনেক আগুন জ্বলছে দেখা যায়। অন্ধকার যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে ঘা-ঘা লাল-লাল হয়ে গিয়েছে।

সোজা ছুটে এসে পিপুলতার কাছে দাঁড়াতেই বুঝতে পারে দাশু, মধুকুপির বাতাস তেতে উঠেছে। ঝুরি কাঠের আগুন থেকে তাত উথলে উঠছে ; আর দুখন গুরুজীর বাড়ির দাওয়ার উপর জাতপঞ্চের সভা বসেছে।

কানারানীর ভয়ে চারদিকে আগুন জ্বেলে আর একেবারে টাঙ্গি-বল্লম হাতে নিয়ে সবাই এসে পঞ্চে বসেছে। ছেলেগুলোর হাতে টিন আর ঠেঙ্গা।

গুরুজীর বাড়িটাকে এখান থেকে বেশ স্পষ্ট করে দেখা যায়। এই পাঁচ বছরে গুরুজীর অবস্থা আগের তুলনায় বোধহয় পঁচিশ গুণ ভাল হয়েছে। নইলে বাড়িটার চেহারা এত ফেঁপে

উঠবে কেন?

পিপুলের ছায়ার আড়ালে জাতপঞ্চের চেহারাটাকে ভাল করে দেখতে চেষ্টা করে দাশু। এ কী চেহারা! জোয়ান বলতে দশ বার জনের বেশি হবে না ; আর সবাই বুড়ো। কোথায় গেল নিধি, নটবর, হরিশ আর হরিপদ? দাশুর কাছাকাছি বয়সের আরও তো অন্তত পঞ্চাশজন মানুষ ছিল। তারাই বা কোথায়?

তাছাড়া জাতপঞ্চের সভা গুরুজীর বাড়ির দাওয়াতেই বা বসে কেন? গাঁয়ের মুখিয়া রতন সরদার কি নাই? মরেই গিয়েছে বুঝি?

না, মরে নাই। ওই তো দাওয়ার উপর হাঁটু মুড়ে বসে আছে বড় বুড়া রতন। শুকনো রোগা ও ঝিরঝিরে, একটা ভয়ানক দুঃখী চেহারা নিয়ে বসে আছে।

আর গুরুজী বসে আছে একটা চারপায়ার উপর। বাঃ, মধুকুপির জীবনের নিয়মটাও উল্টে গেল! গুরুজী না হয় ভাল টাকা-পয়সা আছে, কিন্তু জাতপঞ্চের সভায় গাঁয়ের মুখিয়া রতনের চেয়ে উঁচু ঠাঁই বসবে গুরুজী এটা কেমন করে হয়? পাঁচ বছর আগে এমনটা তো কোনদিন হতে দেখে নি দাশু।

যার নাম দুখন কাকা, তারই নাম গুরুজী। মধুকুপিতে জাতের মানুষের মধ্যে একমাত্র দুখন কাকা জোয়ান কালে গোবিন্দপুরে গিয়ে পাঠশালাতে কিছুদিন লেখাপড়া করেছিল। মনে পড়ে দাশুর, অনেকদিন আগে, দাশু তখন ছেলেমানুষ, এই দুখন কাকা একদিন জাতপঞ্চের সভায় সবাইকে জানিয়ে দিল--এবার থেকে দুখন দুখন বলবে না কেউ।

--কেন? বড় বুড়ো ওই রতনই প্রশ্ন করেছিল। রতনের চোখে সেদিন কত তেজ ছিল! দুখন কাকার চেয়ে বয়স বেশি হয়েও রতনের চেহারা সেদিন কী মজবুতই না ছিল!

--জিলা বোর্ড আমাকে এই গাঁ-এর গুরু করে দিয়েছে। পাঁচ টাকা মাসোহারা দিবে জিলা বোর্ড। বলেছিল দুখন কাকা।

জাতপঞ্চ একটু ভয় পেয়েছিল। বড় বুড়াও শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছিল।--তা গুরু হয়েছ যখন, তখন গুরুজী বলতে হবে।

তারপর দুখন কাকা যেদিন ঈশান মোক্তারের কুটির বড় গুমস্তা হল সেদিন থেকে দুখন কাকা বলে ডাকবার সাহসই আর কারও হয় নি। গুরুজী নামটাই স্থায়ী হয়ে গেল।

দুখন কাকা এই গাঁয়ের একমাত্র মানুষ, যে মানুষ জাতে কিষাণ হলেও কোনদিন নিজের হাতে লাঙ্গল ধরে নি। গারুজী হবার আগেও না, গুরুজী হবার পরেও না। গাঁয়ের কোন লোক দুখন কাকার কাছে লেখাপড়া শেখে নি, দুখন কাকাও ভুলেও কোনদিন কাউকে লেখাপড়া শিখতে ডাকে নি। পাঁচ বছর আগে জেলে যাবার আগের মাসেও দেখেছে দাশু পাঁচ টাকা মাসোহারা আনবার জন্য সদরে চলেছে দুখন গুরুজী।

লড়াইয়ের সময় গুরুজীও, কে জানে কেমন করে, অনেক টাকার মানুষ হয়ে গেল। গুরুজী খুব ঘটা করে তার দশ বছর বয়সের মেয়ের বিয়ে দিল। মধুকুপির জীবনের ইতিহাসে সে এক নতুন ঘটনা। দশ বছর বয়সের মেয়ের বিয়ে ; বিয়েতে মন্ত্র পড়ল এক বামুন পূজারী, ভুবনপুরের চক্রবর্তী। সবই অভিনব। গাঁয়ের লাইয়া সনাতন কেঁদে ফেলেছিল ঃ এটা কেমনতর হলো? আমি থাকতে কিষাণের বেটির বিয়েতে একটা বামন এসে কাজ করাবে কেন?

গুরুজীও রাগ করে বলেছিল--রাতুগড়ের জোরদার সহদেব সিংহ আমার কুটুম হয়েছে। আমার বেটা-বেটির বিয়াতে তোমাকে দিয়ে কাজ করালে আমার মান থাকে না হে সনাতন।

জাতের মানুষ হয়েও জাতের দুঃখ থেকে বেশ একটু দূরে সরে গিয়েছে যে, আর জাতের মানের চেয়ে নিজের মান উঁচু করে দিয়েছে, সে মানুষ আবার তার ঘরে জাতপঞ্চের সভা ডাকে কেন?

এই পাঁচ বছরে গুরুজীর চেহারাও বেশ বদলে গিয়েছে। গায়ে খাটো জামা আছে, পরনে বেশ বড় ধুতি আছে, পায়ে খড়ম আছে, আর কপালে হলদে রঙের একটা ফোঁটাও আছে। মাথার সব চুল সাদা হয়ে গিয়েছে। দেখতে ঈশান মোক্তারের ছোট ভাইটির মত মনে হয়।

চারপায়ার উপর বসে বড় বুড়া রতনের দিকে হাত তুলে বেশ কড়া মেজাজের সুরে কি যেন বলছে গুরুজী। এগিয়ে যায় দাশু।

দাশু এসেছে। দাশু এসেছে। সোরগোল পড়ে যায়। যেন হঠাৎ কতগুলি বিস্ময় আতঙ্ক আর বিদ্রূপ একসঙ্গে হৈ-হৈ করে ওঠে। চেঁচিয়ে ওঠে জটা রাখাল—দাশু যখন এসে পড়েছে, তখন আগে ওর বিচার হয়ে যাক্।

দাশু হাসে—তোমরাও কি আমাকে দাগী মনে করলে জটা? আমার মাথা মুড়াতে চাও নাকি?

জটা রাখাল—তা পঞ্চ যদি বলে তবে মুড়াতে হবে।

চমকে ওঠে দাশু। জটা রাখালের মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে বলে—বুঝে কথা বল জটা, কার মাথা মুড়াবার সাহস হয়েছে তোমার? দাশু কিষাণের মাথা?

জটা রাখাল আবার চেঁচিয়ে ওঠে—বাবু দুখন সিংহ এখনি বলে দিবেন, তোমাকে জাতে রাখা উচিত হবে কি হবে না।

—বাবু দুখন সিংহ কে বটে? বলতে বলতে আর দুঃসহ বিস্ময় সহ্য করতে করতে গুরুজীর মুখের দিকে তাকায় দাশু।

—আমি। ভ্রূকুটি করে দাশুর দিকে তাকায় সেই মানুষটি, যাকে এতদিন গুরুজী বলে জেনে এসেছে দাশু।

জটা রাখাল আবার চেঁচিয়ে কি যেন বলতে চেষ্টা করে। বাবু দুখন সিংহ ইসারায় জটা রাখালকে থামিয়ে দিয়ে আর বড় বুড়া রতনের মুখের দিকে ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে বেশ উত্তপ্ত স্বরে আক্ষেপ করে ওঠে ঃ জাতপঞ্চ ডেকেছো, জাতের কথা বল। কেমন করে জাতের সুধার হবে, জাতের মান বড় হবে, সেই কথাটি ভাব। কে তোমাদিগে জমি দিবে কি দিবে না ; ঈশান মোক্তার বীজ-লাঙ্গল দিবে কি দিবে না, পুলিস মুন্সী চৌধুরীজী কেন পরবী নিবে, এসব কথা নিয়ে যদি জাতপঞ্চের সভায় চেঁচাতে চাও তো চেঁচাও, আমি এসবে নাই।

—কেন নাই? চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

—কি বললে তুমি? আরও জোরে চেঁচিয়ে প্রশ্ন করে দুখন সিংহ।

দাশু—জাতের মানুষ দুখ পায়, সে কথাটি ভেবে জাতপঞ্চ চেঁচাবে না তো কে চেঁচাবে?

দুখন সিংহ—যে যার করমফলে ভুগে। চেঁচালে কি হবে?

দাশু—কি বললে দুখন বাবু?

দুখন সিংহ—করমফল।

দাশু—সেটা কি বটে!

দুখন সিংহ—তোমার দশাটি যা বটে।

রতন বলে—দাশুর কথাতে তুমি রাগ কর কেন দুখন বাবু? ঠিক বলেছে দাশু। তুমি পৈতা নিয়েছো, রাজপুত সিংহ হয়েছো, বামন লাগিযে বেটা-বেটির বিয়া দিয়েছো, তুমি বনচণ্ডীর মূর্তি বসিয়েছো, তাতে...।

—তাতে কি? আবার রুষ্ট স্বরে প্রশ্ন করেন দুখন সিংহ—হিংসা করে কথা বল কেন রতন?

রতন বোকার মত হাসে ঃ হিংসা করছি না। তুমি বল, তা হলে কি করলে আমাদিগের দুখটা মরবে?

দুখন সিংহ—আগে জাতের সুধার কর।

রতন—বল, কি করতে হবে?

দুখন সিংহ--ধরম সুধার কর।

রতন--বল কি করতে হবে?

দুখন সিংহ--কুঁকড়া খাওয়া ছেড়ে দাও।

--কেন ছাড়বো? রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করে ওঠে দাশু।

দুখন সিংহ--তা না হলে চক্রবর্তী তোমাদিগের কারও বেটা-বেটির বিয়াতে কাজত করতে রাজি হবে না।

দাশু--না হবে তো না হবে। আমাদিগের বামনে কাজ নাই। আমাদিগের লাইয়া সনাতন কি মরেছে?

সভার ভিড়ের এক কোণ থেকে যেন আর্তনাদ করে ওঠে সনাতন--আমি বেঁচেই আছি দাশু। কিন্তু দুখনবাবু আমাকে মরাতে চায়। বামন চক্রবর্তীকে পাঁচ বিঘা জমি পাইয়ে দিয়েছে দুখনবাবু, আমাকে এক কাঠাও দিবে না বলেছে।

দাশু--কে তোমাকে মরাবে সনাতন? কপালবাবা কি নাই? জাহির বুরু কি নাই? সিনবোঙা কি দেখছে না?

--তুমি চেঁচাচ্ছ কেন দাশু, তুমি বুঝ কি? চোখ পাকিয়ে দাশুর দিকে তাকিয়ে থাকে বাবু দুখন সিংহ।

দাশু--তুমি বুঝিয়ে দাও দুখন বাবু।

দুখন সিংহ--সিনবোঙা আর জাহির বুরুকে পূজবে, কপালবাবাকে মানবে, কুদরাকে তুষবে, আমি মানা করছি না। কিন্তু চারটি মানা মানতে হবে, না হলে জাতের কপালে সুখ নাই।

দাশু--বল, কি মানা মানতে হবে?

দুখন সিংহ--কুঁকড়া খাবে না, কুঁকড়া বলি দিবে না, করমে ঘরের বেটি বহিন বহুড়ি নাচবে না ; আর বেটি বহিনের বিয়ার বয়স বারো বছরের বেশিটি হবে না। আর...।

দাশু--হ্যাঁ, বলে যাও দুখন বাবু। শুন পঞ্চ শুন।

দুখন সিংহ--আর বনচণ্ডীর পূজাও করতে হবে।

দাশু--বনচণ্ডীর পূজা করলে কি লাভ হবে, সেটা একটুক বুঝিয়ে বল দুখন বাবু।

দুখন সিংহ--বনচণ্ডী হলেন মহামায়া। তুমি জান না দাশু, তুমি জেলে ছিলে, এরা সকলে জানে, আমি কত ভক্তি করে দেবীকে এই পিপুলতার ঠাঁই বসিয়েছি। জাতের ভাল মানত করে আমি অনেক ভেবেছি, অনেক করেছি দাশু ; তুমি কিছু জান না। তাই চেঁচাচ্ছ।

মুখ ঘুরিয়ে পিপুলতলার দিকে তাকায় দাশু। দেখতে পায় ; হ্যাঁ, ঠিকই তো, ইঁট দিয়ে গাঁথা ছোট একটা ঘর। ঘরের দরজার কপাটে সিঁদুরের ছাপও দেখা যায়। দুটো লাল জবার গাছও দুলছে।

দুখন সিংহ বসে--বনচণ্ডী কৃপা করলে মানুষ কি না পাবে? আর ভক্তকে দেবী কি না দিবে?

দাশু--জমি দিবে?

দুখন সিংহ--জমির কথা ছেড়ে দাও। ওসব ছার কথা। দেবী পুণ্য দিবে, মোক্ষ দিবে, আত্মার গতি করে দিবে, আর জনম নিতে হবে না।

জাতপঞ্চের সভার ভিড় হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। দুখন সিংহ যেন বীরু ওঝার মত সাদা মাথাটা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে নতুন রকমের ধুলাপড়া পড়ে মধুকুপির বুক নতুন ভয়ে ভরে দিচ্ছে ; তাই হঠাৎ বোবা হয়ে গিয়েছে জাতপঞ্চ। কিছু বুঝতে পারা যায় না, তাই আরও বেশি ভয় করে।

দুখন সিংহ বলে--তোমরা পালা করে চক্রবর্তীর জমি চষে দিয়ে বামনের নমস্কারি দিবে।

চক্রবর্তী খুশি হয়ে তোমাদিগের মাথায় পায়ের ধূলা দিবে। তোমাদের বেটি-বহিনের বিয়াতে কাজ করবে।

ঝুরিকাঠের আগুনে চিড়বিড় করে ফুটতে আর দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। আগুনের ছায়া লেগে দপ্ দপ্ করে জাতপঞ্চের ভিড়ের মুখগুলি।

এই স্তব্ধতার ঘোর কেটে যেতে সময়ও লাগে। শুকনো রোগা ও ঝিরঝিরে বড় বুড়া, গাঁয়ের মুখিয়া রতন আরও কিছুক্ষণ উসখুস করে নিয়ে তারপর আস্তে আস্তে বলে—কেমন পূজাটা নিবে বনচণ্ডী?

দুখন সিংহ—সবই নিবে। চাল পুল আর ফল নিবে। যত ইচ্ছা ছাগবলি দাও, সব নিবে। পয়সাও নিবে। আর, স্নানটি করে ভিজা কাপড়ে মাটির ভাঁড়ে ভরে নিয়ে যে মহুয়ামদ দিবে, তাও নিবে। কিন্তু কুঁকড়া বলি নিবে না।

বড় বুড়া হাঁক দেয়—বল পঞ্চ, বল।

জাতপঞ্চের ভিড়ের মাথাগুলি দুলে ওঠে, কিন্তু চেঁচিয়ে সাড়া দিতে পারে না। দুখন সিংহের কথাগুলি সত্যিই ধুলপড়ার মত পঞ্চের মুখ যেন বেঁধে দিয়েছে।

আবার হাঁক দেয় বড় বুড়া রতন—বল পঞ্চ বল, হ্যাঁ কি না?

—না। চিৎকার করে ওঠে দাশু।

সঙ্গে সঙ্গে জাতপঞ্চের সভার বোবা-বোবা আর ভীরু-ভীরু মুখগুলি ঝুরিকাঠের আগুনের মত নতুন বাতাস পেয়ে চিড়চিড় করে ফুটে ওঠে ঃ না, না, না।

দুখন সিংহ ভ্রূকুটি করে একঠায় দাঁড়িয়ে থাকে ; গলায় চাদর, কপালে হলদে ফোঁটা, পায়ে খড়ম. নতুন মানের মানুষ দুখন সিংহ। জাতপঞ্চের আপত্তির রব কর্কশ কোলাহলের মত বাজতে থাকে।

চেঁচিয়ে ওঠে দুখন সিংহ—কিসের না? বনচণ্ডীর পূজা দিবে না?

বড় বুড়া—তা দিব না কেনে? আমরা কি ভুবনপুরের কালীথানে ছাগবলি দিই নাই? গোবিন্দপুরের ঠাকুরবাড়িতে পূজা দিই নাই? বামনের ঠাকুর যদি পূজা নেয়, তবে পূজা দিব না কেন?

—কিন্তু জাহিরথানে কুঁকড়া বলি দিব। হাত তুলে হাঁক দেয় দাশু।

—নিশ্চয় দিব। চেঁচিয়ে সাড়া দেয় জাতপঞ্চ। সোরগোল ওঠে। এক একটা প্রতিবাদের শব্দ আক্রোশের স্বরে ফেটে পড়তে থাকে।

—গাঁয়ের সব মেয়ে করম নাচবে। নিশ্চয় নাচবে।

—বেটা-বেটির বিয়াতে বামনের দরকার নাই।

—কোন দরকার নাই।

—বামন পুষবার পয়সা নাই।

—বেটি-বহিন ডাগর হবে, তবে বিয়া হবে।

—নিশ্চয় হবে। রাঢ়ির বিয়া হবে, সাগাই বিয়া হবে। সব হবে। যেমনটি হয়ে এসেছে, তেমনটি হবে। জাতের সুধার চাই না।

সোরগোল আস্তে আস্তে থিতিয়ে আসে। জাতপঞ্চের সভাও আস্তে আস্তে হাঁপাতে থাকে। আর দাশুর দু চোখে একটা জয়ের হাসি ঝিক্ ঝিক্ করে। আজকের দিনটা দাশু ঘরামির জীবনে যেন সব বাধা জয় করা একটা অভিযানের দিন।

দুখন সিংহ বলে—বাস্, আমাকে কোনদিন আর কিছু বলতে এসো না। তোমাদিগকে বাঁচাবার সাধ্যি আমার নাই।

হেসে ফেলে দাশু ঃ তুমি জাতের ঘরে বামন ঢুকাতে এসো না দুখন বাবু ; তাতেই জাত বেঁচে যাবে।

এক লাফ দিয়ে ওঠে দাঁড়ায় জটা রাখাল ঃ কিন্তু জাতের ঘরে খিরিস্তান ঢুকলে জাত বাঁচবে কি?

জাতপঞ্চের সভা সেই মুহূর্তে আবার স্তব্ধ হয়ে যায়। বড়া বুড়া রতন আবার ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়। সভায় ভিড়ের চোখগুলি দাশুর মুখের দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে। এইবার মনে পড়েছে সবারই, দাশুর ঘরের গণ্ডগোল নিয়ে জাতের মান যে সমস্যায় পড়েছে, সেই সমস্যার একটা হেস্ত-নেস্ত করবার জন্য আজ বাঘিন কানারানীর উৎপাতের ভয়ে সন্ত্রস্ত এই রাত্রিতে দুখন সিংহের বাড়িতে জাতপঞ্চের সভা ডাকা হয়েছে। দাশু ঘরামি এই পাঁচ বছর ঘরে ছিল না। দাশুর ঘরের দাওয়ার উপর গির্জাবাড়ির মেম এসে খিরিস্তানী শোলোকে গান করে গিয়েছে। তবু ঘর থেকে ভেগে গিয়ে খিরিস্তানী হয়নি দাশুর মাগ মুরলী। কিন্তু গাঁয়ের ঘরে থেকেও, আর দাশু ঘরে ফিরে আসবার পরেও এ কেমন কাণ্ড? দাশু কি জেনেছে যে, মুরলীর সাথে খিরিস্তান শিকারীটার ঢলানি হয়েছে?

জটা রাখাল হাঁক দেয়—বল পঞ্চ, বল।

দুখন সিংহ রাগ করে হাঁক দেয়—তুই মিছা হাঁকিস কেন জটা? এরা সব খিরিস্তান হবে আর মরবে। এদের মরতে দে।

—কে খিরিস্তান হবে রে জটা? কে মরবে গো দুখন বাবু? দাশু ওঠে দাঁড়িয়ে চোখ পাকিয়ে আর গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করে।

জটা রাখাল আবার হাঁক দেয়—বল পঞ্চ, বল। ঠিক কথাটা বল। দাশুর ঘরের কাণ্ডটা বল। বলতে এত লাজ কেন, ডর কেন?

জাতপঞ্চের মেজাজে আবার যেন ঝুরিকাঠের আগুনের আঁচ এসে লেগেছে দুলে ওঠে মাথাগুলি, আর একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে মুখগুলি।—কিসের লাজ?

কে ডরাচ্ছে? কিসের ডর? বল বড় বুড়া, বল।

বড় বুড়া রতন চেঁচিয়ে ওঠে—দাশু ঘরামির ঘরণী মুরলী খিরিস্তান শিকারীটাকে ঘরে ডাকে কেন?

জটা রাখালের গলা আরও বিষাক্ত স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে—শিকারীটা মুরলীর গা ছোঁয় কেন?

দাশুর চোখের সাদাও সেই মুহূর্তে যেন বিষের জ্বালায় লাল হয়ে ওঠে। জাতপঞ্চের মুখের দিকে কটমট করে তাকিয়ে প্রশ্ন করে—কোন্ মিথ্যুক বলেছে? কোন্ কানায় দেখেছে?

—কে না দেখেছে?

—সবাই দেখেছে।

—চুপ কর দাশু।

—চেঁচিও না দাশু।

—ছিয়া ছিয়া ছিয়া!

জাতপঞ্চের ভিড়ের এক-একটা মুখ থেকে এক-একটা রুষ্ট ধিক্কার উথলে উঠতে থাকে। দুখন সিংহের ঠোঁটের ফাঁকে একটা কুটিল হাসি পাকিয়ে পাকিয়ে সাপের মত কিলবিল করতে থাকে। আর চুপচাপ দাঁড়িয়ে যেন পুড়তে থাকে দাশু। মধুকুপির রাতের বাতাসটাই আগুন হয়ে গিয়েছে।

বড় বুড়া রতন বলে—জবাব দাও দাশু।

—জবাব নাই। থরথর করে চোখ কাঁপিয়ে উত্তর দেয় দাশু।

—কোন জবাব নাই? বড় বুড়া রতন ও সেই সঙ্গে পঞ্চের সবাই রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠে।

—মিথ্যা কথা বিশ্বাস করি না।

—কি? জাতপঞ্চের গলা এক সঙ্গে কেঁপে গরগর করে ওঠে।

—মিথ্যা কথা, তোমাদিগের মতলবের কথা, তোমাদিগের হিংসার কথা। বলতে বলতে যেন হঠাৎ পাগল হয়ে জাতপঞ্চের সভার ভিতর থেকে একটা লাফ দিয়ে বাইরে ছিটকে পড়ে দাশু, তারপরেই ছুটে পালিয়ে যায়।

বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। বিশ্বাস করে ফেললে দাশু ঘরামির পাঁজরগুলি এখনি পট পট করে ভেঙে যাবে ; তাই ভয়ানক অভিযোগে মুখর ওই জাতপঞ্চের সভাকে একটা চিৎকার করে ধমক দিয়ে পালিয়ে এসেছে দাশু।

কিন্তু জাতপঞ্চের সভার ঝুরিকাঠের আঁচটা যেন দাশুর গা ঘেঁষে সঙ্গে সঙ্গে চলেছে, দৌড় দিলে এই আঁচটাও সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ায়। ছুটে চলতে আর ইচ্ছা করে না। হাঁটতে গিয়ে পা দুটো বার বার মধুকুপির কাঁকুড়ে মাটিতে ঘষা খায় ; বুকটা হাঁপায়। অবিশ্বাস করবার জোরটাই আস্তে আস্তে নেতিয়ে পড়ছে, আর, ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে নিঃশ্বাসের সাহসও যেন ফুরিয়ে যাচ্ছে।

পলুস হালদারের দয়ার রহস্যটা যেন এই অন্ধকারের মধ্যেই দাশুর চোখ মুখের ব্যথাটাকে দেখতে পেয়ে মুখ টিপে হাসছে। পলুসের ঠাট্টার হাসি, গর্বের হাসি, জয়ের হাসি। গোবিন্দপুর থানার সন্দেহ থেকে দাশুকে ছাড়া পাইয়ে দেবার জন্য থানার কাছে গিয়ে একটা সত্য কথা বলেছে পলুস, ওটা যে পলুসের জীবনের জয়ের হুংকার। দাশু ঘরামি কয়েদ হয়ে দূরে সরে গেলেই বা কি, আর ছাড়া পেয়ে ঘরে থাকলেই বা কি? দাশুকে একটা বাধা বলে মনে করে না পলুস। মুরলীর মুখের হাসির অঙ্গীকার পলুসের আশার পিপাসাকে একেবারে নিশ্চিন্ত করে রেখে দিয়েছে। মুরলীর গা ছুঁয়ে সুখী হবার সুযোগ যখন খুশি তখন পেয়ে যায় পলুস ; পেয়ে গিয়েছে আর পেতেই থাকবে পলুস।

এই তো ঘর। পথের উপর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে দাশু। ওই তো পুরনো জামকাঠের কপাট। কপাটের ফাঁকে আলো দেখা যায়। কে জানে, আলোটা এখন ঘরের ভিতরের কোন্ খুশির ছবি দেখছে? শিকারীটার বুকের উপর কি ঢলে পড়ে আছে মুরলী?

না, আর এগিয়ে যেতে ইচ্ছা করে না। পা টিপে টিপে নিজেরই ঘরের দিকে আজ চোরের মত এগিয়ে যেতে হবে, এই শাস্তি সহ্য করবার আর দরকার কি? কিন্তু একটা চরম জানা না জেনে নিয়ে চলে যাওয়াও যে যায় না। মধুকুপির রাতের জানোয়ারের মত আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে জামকাঠের কপাটের ফাঁকে চোখ ঘষে দাশু।

কিছু দেখা যায় না। কপাটের উপর কান পাতে দাশু। শিউরে ওঠে দাশু ঘরামির পাথুরে গাঁথুনির শরীর ; অভিমান করে ফোঁপাচ্ছে ঘরটা, কথা বলছে ঘরটা।—না আর এখানে থাকবো কেন? থেকে লাভ কি? আমি যাব, নিশ্চয় যাব।

জামকাঠের কপাট দু হাতের দশ আঙুলের নখ দিয়ে আঁকড়ে ধরে দাশু। ঠক ঠক করে মাথাটা কাঁপে। আবার গুন গুন করে কেঁদে এই ঘরটাকে ধিক্কার দিচ্ছে মুরলী—এ ঘরে থাকলে মরণ হবে। এ ঘরে আর থাকবো না। কভি না।

তবে কি পলুস হালদারের বুকের উপর ঢলে পড়ে আবেদন করছে মুরলীর প্রাণ?

না, আর বাধা দেবে না দাশু। টাঙ্গি হাতে তুলে নেবে না। হাতটাকে কপাটের উপর যেন আছড়ে দিয়ে ডাক দেয় দাশু—মুরলী!

খুলে যায় কপাট। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতরটার দিকে উদাসভাবে তাকিয়ে থাকে দাশু। ঘরের ভিতরে কোন নতুন ছায়া নেই। রেড়ির তেলের মেটে বাতিটা শুধু মিটমিট করে জ্বলে। যেন ঘরের শূন্যতাকে দাশুর ক্লান্ত চোখের উপর তুলে ধরে মিট-মিট করে ঠাট্টা করছে বাতিটা।

কেউ নেই? এ কি করে হয়? একটা পাল্টা সন্দেহের চমক লেগে কেঁপে ওঠে দাশু

ঘরামির উদাস চোখ। মুরলীর মুখের দিকে তাকায়। একটা লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে মুরলীর হাত ধরে। ভয় পেয়ে, আশ্চর্য হয়ে, আর যেন হঠাৎ হোঁচট-লাগা একটা ব্যথার জ্বালায় ছটফট করে চেঁচিয়ে ওঠে দাশু ঃ তুই কাঁদছিস কেন মুরলী?

ঘরের মেজের উপর খেজুর পাতার চাটাই ছড়িয়ে পড়ে আছে। দাশুর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মুরলী আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে চাটাইয়ের উপর বসে পড়ে। তার পরেই দু হাত দিয়ে দু হাঁটু জড়িয়ে পেটের উপর চেপে ধরে নিথর হয়ে বসে থাকে।

মুরলীর মাথাটা ভেজা। জলের ঘটিটা কাছেই আছে। ঘরের মেঝের অনেকখানি মাটিও জলে ভিজে কাদা কাদা হয়ে উঠেছে।

—তোর কিসের কষ্ট হলো, বল মুরলী। ডাক দেয় দাশু।

দুই হাঁটু আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরে, যেন ঘোর নেশার বেদনার মত শরীরের একটা বিবশ কষ্টের রহস্যকে ভয় পেয়ে আরও জোরে চেপে ধরে মুরলী। তারপর কেঁদেই ফেলে ঃ সত্যি যে আমার ছেইলা আসছে গো?

আশ্চর্য হয় দাশু ঃ কেন, তুই কি তবে আগে বুঝিস নাই?

ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে মুরলী ঃ আগে বুঝেছিলাম, তোমার ছেইলা আসছে। আজ বুঝলাম গো, এটা আমার ছেইলা বটে!

বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দাশু বুঝতে চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না। মুরলীর প্রাণ আজ কেন হঠাৎ কেঁদে কেঁদে আর হিসাব করে এরকম একটা অদ্ভুত নতুন কথা বলছে? দাশু বলে—কেন বুঝলি, কেমন করে বুঝলি?

মুরলী—এটা যে আমার গতর জ্বলাতে শুরু করলে গো। শুতে পারি না, ঘুমাতে পারি না, দম উগরে উঠছে। আরও কত জ্বালা জ্বলাবে, কে জানে?

মুরলীর কাছে সরে আসে দাশু। মুরলীর ভেজা মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনার সুরে বলে—তুই ঠিক বুঝেছিস। কিন্তু কাঁদিস কেন?

মুরলী—আমি যাব। এ ঘরে আমার ছেইলা বাঁচবে না। আমি এখানে থাকবো না।

দাশু ঘরামির সান্ত্বনার হাত যেন হঠাৎ অপমানের আঘাতে ব্যথিত হয়ে কেঁপে ওঠে। দাশুর মনের একটা হেঁয়ালির ঘোরও কেটে যায়। এই কথা! এতক্ষণ ধরে এই খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর শুয়ে বসে মুরলী তা হলে ওর জীবনের একটা আশার সঙ্গে কথা বলছিল। চলে যেতে চায় মুরলী। কিন্তু কোথায় কার কাছে?

টাঙ্গিটা ঘরের এক কোণে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। সেদিকে নজর পড়লেও দাশুর হাতে আর সেই আক্রোশের জোর হিংস্র হয়ে ওঠে না। কিন্তু এই আক্রোশহীন অলস হাতের একটা অভিমানের জ্বালা দাশুর দু চোখের চাহনিতে ফুটে উঠে অলস হিংস্রতার মত মিট মিট করে জ্বলে। চেঁচিয়ে ওঠে দাশু—জাতপঞ্চ আজ কি বলেছে শুনবি?

মুরলী—কি?

দাশু—তুই খিরিস্তান শিকারীটাকে ঘরে ডেকেছিস। সে-ও তোর গা ছুঁয়েছে।

মুরলী বলে—হ্যাঁ।

—হ্যাঁ! চেঁচিয়ে ওঠে দাশু। দাশুর পাঁজরের হাড় পট পট করে বেজে ওঠে।

মুরলীর গলার স্বরও যেন হিংস্র হয়ে জবাব দেয়—হ্যাঁ। শিকারীটাকে গালি দিয়ে আমি যে খেদিয়ে দিলাম, সে কথাটা জাতপঞ্চ বলে নাই?

দাশু—না।

মুরলী—তবে যাও, জাতপঞ্চকে বলে দাও, পলুস হালদার আর এ গাঁয়ে আসবে না।

বলতে গিয়ে মুরলীর গলার স্বর আবার ভারি হয়ে, অভিমানে ফুঁপিয়ে, আর অনুতাপে করুণ হয়ে কেঁপে ওঠে। হাঁটুর উপর মাথা নামিয়ে চোখ ঘষে মুরলী।

দাশু বলে—গোবিন্দপুর থানার হাজত থেকে আমাকে কে ছাড়া করিয়েছে জানিস?

মুখ তুলে তাকায় মুরলী—কে?

দাশু—পলুস হালদার।

মুরলীর চোখ দুটো ঝিলিক দিয়ে হেসে ওঠে। তারপর যেন অদ্ভুত বিস্ময়ের আবেশে ঢলঢল করতে থাকে। আনমনার মত অপলক চোখ নিয়ে যেন অনেক দূরের একটা বিরাট ছায়ার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে মুরলী।—এটা আবার কেমন কাণ্ড করলে পলুস?

দাশু—হালদারের মনে বড় দয়া। আমার মান রেখেছে পলুস।

মুরলী—মান রাখতে জানে পলুস। গাঁওয়ার কিষাণ নয় পলুস।

দাশুর চোখ জ্বলে ওঠে ঃ গাঁওয়ার কিষাণও পলুস হালদারের মান রাখতে জানে।

মুরলীর ঠোঁটের ফাঁকে ছোট একটা হাসির রেখা সির সির করে ঃ তুমি নেশা করেছ।

দাশু—করেছিলাম, কিন্তু এখন আর নেশা নাই। নেশার কথা নয় ; পলুসের মাগ সকালী মধুকুপির কিষাণ দাশুর কাছেই মরতে চেয়েছিল, কিন্তু...।

মুরলীর চোখের ভ্রূকুটি আরও তীব্র হয়ে ওঠে ঃ কিন্তু কি? সকালীকে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছ?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—তোকে ধুতরা খাইয়ে মরাতে চায় সকালী।

—কেন?

—সকালী শুনেছে, পলুস তোর সাথে ঢলেছে।

—সকালী তোমাকে একথা বলতে আসে কেন?

—আমাকে চিনে নাই। তাই বলে ফেলেছে।

—না চিনুক, কিন্তু বলে কেন?

—ঘর ছাড়া বেদেনী হয়েছে সকালী।

—হয়েছে তো হয়েছে, কিন্তু তোমাকে মনের কথা বলে কেন?

—আমাকে ওর মরদ করে নিতে চায়।

—কেন চায়?

—আমার উপর রাগ করতে পারে নাই।

—কেন পারে নাই?

—আমি সেধেছিলাম, যেন রাগ না করে।

—কেন তুমি সেধেছিলে?

—ভুল হয়েছিল মুরলী।

—কি ভুল?

—সকালীকে ছুঁয়েছিলাম।

—ছুঁতে ইচ্ছা করেছিল?

—হ্যাঁ।

—ছুঁতে ভাল লেগেছিল?

—হ্যাঁ।

—তবে গেলে না কেনে?

—তোকে মরাতে চায় যে মাগি, তার সাথে আমি চলে যাব...আমি পাগল হই নাই মুরলী।

খিল খিল করে হেসে ওঠে মুরলী ঃ তবে পলুসকে তুমি কি দয়াটা করলে বল? তুমি নিজেকে দয়া করেছ। সকালী তোমার মাগকে মরাতে চায় শুনে ভয় পেয়ে ওকে ছেড়ে দিয়েছ।

দাশু—সেটা কি আমার দোষ হলো?

মুরলী—দোষ নয়, কিন্তু গুণ কিসের?

দাশু—সকালীকে খেদিয়ে দিতে পেরেছি।

মুরলী—গরব করবে না গো কিষাণ? ডরানির জলে ভাসিয়ে দাও তোমার গরব।

—কেন? দাশুর গলার স্বর তপ্ত হয়ে ওঠে।

—সকালী যদি তোমাকে ঐ কথাটা না বলতো?

—কি কথা?

—মুরলীকে ধুতরা খাইয়ে মরাবার কথা।

—কি বললি?

—তোমার কপালবাবার নামে কিরিয়া করে বল তো ; তবে কি তুমি সকালীকে খেদিয়ে দিতে পারতে?

যেন বোবা হয়ে আর কাতরভাবে তাকিয়ে থাকে দাশু। এক মুঠো জয়ের ধুলোকে একটা জয়ের পাহাড় মনে করেছিল দাশু! মুরলীর স্বামী হয়েও পলাশবনের একটা নিরালার ইঙ্গিতে দাশু ঘরামির বুকের বাতাস কত সহজে সকালীর লাল চোখের কাছে মরবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল। দাশু ঘরামির এই পাথুরে শরীরও ভুল করতে জানে, ভুল করতে পারে, ভুল করবার জন্য হঠাৎ পাগল হয়ে ওঠে।

খিল খিল করে হেসে ওঠে মুরলী। হাসিটা যেন দাশু ঘরামির মন প্রাণ আর শরীর, যত মরদানি স্বামিপনা আর টাঙ্গির অহংকার মিথ্যে করে দিয়ে ভয়ানক টিটকারির ঝুমুরের মত বাজছে।

হাসি থামিয়ে আর ভেজা চুলের খোঁপাটাকে একটু গুছিয়ে টান করে বেঁধে নিয়ে মুরলী বলে—সকালী বুড়ি বটে কি?

—না।

—সুন্দরী বটে?

—হ্যাঁ।

—তবে?

—কি তবে? বিরক্ত হয়ে রুক্ষ স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে দাশু। কিন্তু মুরলীর মুখের দিকে চোখ পড়তেই ভয় পেয়ে দাশুর পাথুরে গাঁথুনির বুকটাও দুরুদুরু করে। মুরলীর চোখের চাহনিতে যেন একটা ভয়ানক হিসাব, একটা সংকল্প, একটা ইচ্ছার জ্বালা ফুটে রয়েছে।

মুরলী বলে—তুমি সকালীকে ঘরে নিয়ে এসো।

দাশু—ও কথা বলিস না। বল্, তুই চলে যেতে চাস?

মুরলী—হ্যাঁ।

—কেন?

—এ ঘরে সকালী থাকলেই ভাল হবে।

—কেন?

—তুমি যেমন ঘরটি চাও, তেমন ঘরণীটি হবে সকালী। সকালী যেমনটি চায়, এই ঘর তেমনটি কিষাণের ঘর বটে, আর তুমিও তেমনটি মরদ বট।

—তুই কোথায় যাবি? ঝালদা?

—আমার কথা শুধাও কেন? আমার কপাল যেথা নিয়ে যাবে, সেথা যাব।

দাশু হাসে ঃ কপাল যদি মানিস, তবে আর যাবি কেন?

মুরলী—তোমার লাজ লাগে না?

—কিসের লাজ?

—জাতপঞ্চ তোমার যে মাগকে নষ্ট বলে গালি দিয়ে জাতের বার করতে চায়, তাকে নিয়ে আর ঘর করবার সাধ কর কেন?

—জাতপঞ্চ কিছু বুঝে নাই, তাই গালি দিয়েছে। সব কথা শুনলে মাপ করে দিবে জাতপঞ্চ।

—যদি মাপ না করে?

—তবু, তবু তোকে আমি যেতে দিব না।

—আমাকে ঘরে রেখে তোমার লাভ কি?

—আমার মাগ আমার ঘরে থাকবে। আমার ছেইলা আমার কাছে থাকবে। লাভের কথা বলিস কেন? ঘর করা কি কারবার বটে?

—থাকবো তো, কিন্তু বাঁচাতে পারবে কি?

কি বললি? দাশুর গলার স্বর থর থর করে।

—আমার ছেইলাকে বাঁচাতে পারবে?

হঠাৎ দাশু ঘরামির দু চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল ঝরে পড়ে ঃ কেন বাঁচাতে পারবো না?

—বুঝে দেখ।

—কপালবাবার দয়া আছে। আর কি বুঝতে বলছিস?

—বেশ। দাশু ঘরামির মুখের দিতে তাকিয়ে এইবার একেবারে নীরব হয়ে যায় মুরলী। খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর দু হাতে দুই হাঁটু জড়িয়ে চুপ করে বসে থাকে।

তিন হাত উঁচু মাটির দেয়াল, ফুটো-ফাটালে ভরা খাপরার চালা, আর জীর্ণ জামকাঠের কপাট। দাশুও ঘরের মেঝের উপর চুপ করে বসে অনেকক্ষণ ধরে কি যেন ভাবে। তার পরেই এগিয়ে যেয়ে মুরলীর হাত ধরে ঃ তুই কি আমাকে ঘিন্না করলি?

মুরলী—এমন কথা বল কেন?

—আমি' যে সকালীর গতর ছুঁয়ে ফেলেছি।

—বেশ করেছ। শিকারীটাও তো আমাকে...।

দাশু—কিন্তু তুই তো আর সাধ করে ছোঁয়া নিস নাই। আমি যে নিজে সেধে...তুই মাপ কর মুরলী।

মুরলীর চোখের দৃষ্টি হঠাৎ উতলা হয়ে ওঠে। দাশুর মুখের কথাগুলি যেন একটা শিশু মানুষের বিশ্বাসের প্রলাপ, একটা ভয়ানক মিথ্যা প্রশস্তি। কি-যেন বলতে চায়, হাঁটুর উপর মাথা ঘষে কি যেন ভাবতে চেষ্টা করে মুরলী।

দাশু—কি বলবি, বল মুরলী।

আনমনার মত তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী ঃ না, কিছু বলবো না। তুমি মাপটাপ চেয়ে আমাকে হাসাবে না।

শান্ত হয় দাশু। তারপরে ব্যস্ত হয়ে ওঠে ঃ তুই কি আজ কিছু রাধিস নাই, কিছু খাস নাই?

মুরলী ঃ ছেইলার জ্বালায় জ্বলবো, না, রাঁধবো?

দাশু—আমি রাঁধি। তুই শুয়ে থাক।

ঘরের এদিকে ওদিকে যত হাঁড়ি আর ঝুড়ি নেড়ে-চেড়ে আর হাতড়ে হাতড়ে যখন ক্লান্ত হয় দাশু, তখন মুরলী যেন একটা ভ্রূকুটি লুকোতে গিয়ে মুখ টিপে হেসে ওঠে ঃ হোই দেখ,

খাটিয়ার তলে সরাতে মকাইয়ের দানা আছে।

ছোট একটা মাটির সরা, তার মধ্যে আধ সের মত মকাইয়ের দানা। সরাটাকে হাতে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে দাশু।

মুরলী বলে—ওই আছে, আর কিছু নাই। শুখা মরিচ দিয়ে হলুদ জলে সিঝিয়ে নাও।

হ্যাঁ, রাঁধতে হবে ; ক্ষিদেটা যেন পা থেকে মাথা পর্যন্ত সব হাড়মাসের ক্লান্তি জিভ দিয়ে চাটছে। উনানের দিকে তাকায় দাশু।

ভোর হবার আগে মধুকুপির রাতশেষের ফিকে চাঁদের চেহারা যখন কুয়াশায় ভিজে নরম হয়ে প্রায় মুছে এসেছে, আর ভুখা শিয়ালের চেহারা ছোট ছোট চোরা আবছায়ার মত ছটফটিয়ে সড়কের শিশিরভেজা ধুলো শুঁকে শুঁকে পালিয়ে যেতে শুরু করেছে, তখন দাশু ঘরামির ঘুম ভেঙে যায়। বুঝতে পারে দাশুর সেই পাথুরে বুকটাকে দু হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ে আছে মুরলী, যে বুকের সবচেয়ে সাধের আশার প্রতিজ্ঞাকে মুরলীই একটা ভয়ানক প্রশ্নের আঘাত দিয়ে ব্যথিত করেছে।

কিন্তু সে ভয় আর নেই। সেই ভয়টাকে এখন মিথ্যার তামাশা বলে মনে হয়। সে ভয় রাতের বেলাতেই মরে গিয়েছে। দুজনে মিলে সেই শুখা মরিচ আর হলুদজলে সিঝানো আধ সের মকাইদানার গরম গরম ঘাট্টা একই সঙ্গে একই হাঁড়ি থেকে তুলে নিয়ে খেয়েছে। খেতে খেতে ঝালের জ্বালা লেগে যখন মুরলীর গলা ধরেছে, আর খাওয়া থামিয়ে চোখ বন্ধ করেছে মুরলী, তখন মুরলীর মুখের কাছে জলের ঘটি তুলে ধরেছে দাশু। জল খেয়ে লাজুক হাসি হেসে ফেলেছে মুরলী। তারপর, মুরলীর মুখের সেই লাজুক হাসি যেন মধুকুপির রাতের বাতাসের মত জংলা ফুলের গন্ধ পেয়ে ধীরে ধীরে নিবিড় হয়ে উঠেছে। দাশুর বুকের দিকে অপলক চোখ তুলে তাকিয়েছে মুরলী। মুরলীর চোখের চাহনি আরও কালো হয়ে ছটফট করেছে। দাশুর কাছে এগিয়ে এসে, দাশুর গা-ঘেঁসে বসে, দাশুর কাঁধের উপর অলস মাথাটা নামিয়ে দিয়েছে। দাশু বলেছে—কি হলো মুরলী? মুরলী রাগ করে বলেছে—চুপ কর।

সেই মুহূর্তে দাশুর জীবনের সব আতঙ্ক মরে গিয়ে মধুকুপির রাতের বাতাসে মিশে গিয়েছিল। হেসে উঠেছিল দাশুর চোখ। মধুকুপির রাতের বাতাস আর নীরবতার মধ্যে যেন জাদু আছে। মধুকুপির রাতটা যেন একটা দয়ালু ব্যাধি ; পাখি আর পাখিনীকে সারাদিনের ছাড়াছাড়ির অভিশাপ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এক পিঁজরায় রেখে দেয়।

জেল থেকে ফিরে আসার পর থেকে আজ পর্যন্ত মধুকুপির কোন রাত দাশু ঘরামিকে ঠকায় নি। রোদ আর আলো নিয়ে জেগে থাকা দিনগুলি যেন কঠোর ঠাট্টার হাসি ধমক হতাশা আর সন্দেহের উৎপাত। দাশুর জীবনটাকে ঘরছাড়া আর গাঁছাড়া করবার জন্য টানাটানি করে। কিন্তু রাতগুলি যেন একটু ক্ষমা আর মায়া রাখে। ঘর-ভাঙানো ভয়গুলি যেন হঠাৎ-মায়ায় করুণ হয়ে যায়। তারপর হঠাৎ-চমৎকার একটা আশ্বাস হয়ে দাশু ঘরামির উৎপীড়িত বুকটাকে শক্ত করে দু হাতে আঁকড়ে ধরে ; দাশুও সেই স্পর্শের নেশায় যেন দু চোখ ভরে স্বপ্ন দেখে নেয়, সবই ঠিক আছে। ঘর আছে আর ঘরণী আছে ; ছেইলা আসছে, জমি আসবে. এত ভয় করবার কি আছে?

ডাক দিয়ে মুরলীর ঘুম ভাঙিয়ে আর জাগা চোখ দুটোকে দু হাত দিয়ে জোরে জোরে ঘষে নিয়ে দাশু বলে—আমি এখন খাটতে বের হব মুরলী।

জোয়ান কিষাণের নির্ভয় অহঙ্কার ঘুম ভাঙতেই তৈরি হয়েছে ; দিনমানের কঠোর ঠাট্টা ধমক আর ভয়গুলিকে জয় করবার একটা প্রতিজ্ঞা পাঁজর ঠেলে উথলে উঠেছে। দুরুদুরু ভয় দুরে থাকুক, হাতপায়ের গাঁটগুলিতে অদ্ভুত এক আমোদ সিরসির করে।

জামকাঠের কপাট খুলে ঘরের দাওয়ার উপর এসে দাঁড়ায় দাশু। আকাশের দিকে

তাকায়। তারপর চেঁচিয়ে হাঁক দেয়—তুই একটুক তাড়াতাড়ি করবি কি মুরলী ; উনানে আগুন দিতে পারবি?

মুরলী আশ্চর্য হয়ে বলে—কেন?

মুরলীর বিস্মিত সন্দেহটাকে বুঝতে না পেরে দাশু আবার হেসে ওঠে ঃ খাটতে বের হব, কে জানে কত ক্রোশ দৌড়াতে হবে, কত টাঙ্গি মারতে হবে। হাত-পা একটুক কামাই করে না নিলে খাটতে জোর পাব কেন?

উনানের মুখে শুকনো বাঁশপাতা ঠেসে দিয়ে আগুন ধরায় মুরলী ; আর দাশুও টাঙ্গি হাতি নিয়ে তিন লাফে ঘরের বাইরে চলে যায়। এক গাদা বাবলার ছাল হাতে নিয়ে ফিরে আসে। উনানের উপর হাঁড়ি চড়িয়ে বাবলার ছাল জ্বাল দিতে থাকে মুরলী।

কিন্তু ততক্ষণ চুপ করে বসে থাকে না দাশু। একটা হাঁড়ি আর কোদালি হাতে নিয়ে বের হয়ে যায়। দাশু ঘরামির হাতে-পায়ে কাজের প্রতিজ্ঞা যেন প্রচণ্ড এক উৎসাহের নেশা মাতিয়ে তুলেছে। দুই বিঘা চাকরানের মাটি যেখানে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ে আছে, সেখানে ঝামাছড়ানো একটা খাদের মধ্যে জল জমে আছে। হাঁড়ি ভরে জল নিয়ে আসে দাশু। ঝুপঝাপ করে কোদালির মার মেরে বাঁশঝাড়ের কাছ থেকে ভুরভুরে মাটি তুলে নিয়ে আসে। কাদা তৈরি করে দাশু। তারপর ; ঘরের দেওয়ালের ফাটলের উপর তাল তাল কাদা আছড়ে দিয়ে দু হাত চালিয়ে লেপতে থাকে।

দাওয়ার খুঁটো আর চালার দিকে একবার তাকায় দাশু। চালার বাতা কাত হয়ে পড়েছে। চোখের গিঁটগুলি ছিঁড়ে গিয়েছে। টাঙ্গির মাথা দিয়ে খুঁটোটাকে ঠুকে ঠুকে ঘুনের ধুলো ঝরিয়ে আবার চেঁচিয়ে ওঠে দাশু ঃ দু-চার হাত চোপ আছে কি?

মুরলী বলে—না।

না, হলো না। খুঁটোর মাথাটা নতুন চোপের শক্ত গিঁট দিয়ে বেঁধে দেবার এখন আর কোন উপায় নেই।

—দে তবে, কষজলের হাঁড়িটা দে। বাবলার ছাল সিদ্ধ করা জলের হাঁড়িটা কাছে টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে হাত ডোবায় দাশু। বাবলার কষে মজে গিয়ে হাত দুটো আস্তে আস্তে ভোঁতা হয়ে যেতে থাকে। পা দুটোকেও কষজলে ডুবিয়ে বসে থাকে দাশু। আস্তে আস্তে ঝামিয়ে ওঠে পা দুটো। ও-পায়ে এখন কাঁটা আর কাঁকর ফুটলেই বা কি? রক্ত ঝরে পড়লেও টের পাবে না দাশু, আর অনায়াসে ক্রোশের পর ক্রোশ ছুটে বেড়াতে পারবে। বেদনাবোধহীন পা দুটো তবু ক্লান্ত হবে না।

ধুলো শান দিয়ে চকচকিয়ে নিয়ে টাঙ্গিটাকে কাঁধের উপর তুলে নেয় দাশু। গামছা দিয়ে শক্ত করে কোমরটাকে বেঁধে নিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে ঃ আমি চললাম মুরলী। ঘরের গোঁজাতে আমার টাকা আছে, নিয়ে আয়।

মুরলী আবার আশ্চর্য হয় ঃ টাকা?

দাশু হাসে ঃ হ্যাঁ রে, তিন টাকা চার আনা এখনও আছে। আমার জেলের রোজগার।

সত্যিই তিন টাকা চার আনা। ঘরের গোঁজার ভিতর থেকে টাকা আর পয়সাগুলি তুলে নিয়ে এসে দাশুর হাতে তুলে দিয়েই ভ্রূকুটি করে মুরলী ঃ তুমি খাটতে চললে?

—হ্যাঁ।

—টাকা আনতে?

—হ্যাঁ।

—তবে টাকা নিয়ে যাও কেন?

—এ টাকা এখন আর আমার নয় মুরলী। এখনই খরচ হয়ে যাবে।

—কিসে খরচ হবে।

—মানত করেছি, জাহিরথানে কুঁকড়া বলি দিব।

—তারপর? মুরলীর চোখের চাহনি দাশুর জীবনের এই নতুন আহ্লাদের গায়ে যেন জ্বালা ধরিয়ে দেবার জন্য কটকট করে ফুটতে থাকে।

—তারপর আর কি? চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

—আমি কি করবো?

—তুই ঘরে থাকবি।

—ঘরে থেকে করবো কি? সেটা বলে যাও।

—কিষাণের মাগ যা করে, তাই করবি।

—কিষাণের মাগ হাঁড়ি ভরে ভাত রাঁধে।

—তুই হাঁড়ি ভরে ভাত রাঁধবি।

—চাল কোথা পাব যে রাঁধবো?

—আমি নিয়ে আসছি। তুই এত ডর দেখাস কেন? বলতে গিয়ে দাশুর চোখেও একটা কঠোর স্পর্ধাময় ভ্রূকুটি ফুটে ওঠে।

মুরলী বলে—বেশ।

বলেই একটা হাঁড়িতে জল ভরে নিয়ে ঠাণ্ডা উনানের উপর চাপিয়ে দেয় মুরলী। তারপর উনানের কাছে শক্ত হয়ে বসে পড়ে।

দাশু—এ কি করলি?

মুরলী—বসলাম। তুমি চাল নিয়ে এসো, তারপর ভাত রাঁধবো। তার আগে এখান থেকে উঠবো না।

মধুকুপির দিনের আলো আবার দাশুর প্রাণের আশা আর অহংকারের উপর ঠাট্টার কামড় বসিয়ে দিয়েছে। জ্বলতে থাকে দাশুর নিঃশ্বাস। কিন্তু না, দাশু কিষাণের পাথুরে বুকের ভিতর আর কোন ভয় দুরুদুরু করে না। উনানের উপর ঐ হাঁড়িটা এমন প্রকাণ্ড কোন হাঁড়ি নয়। দু সের চাল এনে ফেলে দিলেই ভাতে ভরে যাবে হাঁড়িটা। কিন্তু কি মনে করেছে মুরলী, দাশু কিষাণ আজ তার ঘরণীকে পেট ভরে ভাত খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখবার জোর হারিয়ে অমানুষ হয়ে গিয়েছে?

—আমি আসছি। বলতে গিয়ে হেসে ফেলে দাশু।

মুরলীর সেই গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে, বোধহয় মুরলীর মনের একটা অকারণ সন্দেহের দিকে শান্তভাবে একটা তুচ্ছতার হাসি হেসে চলে যায় দাশু।

ঈশান মোক্তারের কুঠি। বড় গুমস্তা দুখন বাবু তার চোখের একটা হিংস্র ভ্রূকুটি সামলে নিয়ে হেসে ফেলে ঃ পাঁচ বছর কয়েদ খেটে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি দাশু?

দাশু—কোর্ফা হতে চাই, তাতে আবার মাথা খারাপ মনে কর কেন, দুখন বাবু?

দুখন বাবু—কত বিঘার কোর্ফা হতে চাও?

দাশু—পাঁচ বিঘা হলে ভাল হয়।

রশিদার ভোলা হো-হো করে হেসে ওঠে ঃ বুঝলাম। পাঁচ বিঘা কেন দশ বিঘা হলে ভাল হয়। কিন্তু জেল থেকে কত টাকা নিয়ে এলি যে, ভুঁইদার হবার মন করেছিস?

দাশু—এ কথা কেন বলছো রশিদার বাবু?

দুখন বাবু বলে—একশো টাকা সেলামি দিতে পারবে?

রশিদার ভোলা—তারপর আরও চার-পাঁচটা নজরানা আছে।

দুখন বাবু—তারপর বীজ চাই, হাল চাই। তারপর ছটা মাস তোমাদের মা-ভাতারের খোরাক চাই। কত টাকা আছে তোমার যে কোর্ফা হবার সাধ হয়েছে?

দাশু আতঙ্কিত ভাবে তাকায়—টাকা পয়সা একটাও নাই।

দুখন বাবু—তবে পাগলপনা করছ কেন?

দাশু—কিন্তু আমার যে জমি চাই।

রশিদার ভোলা খেঁকিয়ে ওঠে ঃ জমি চাই মানে কি রে? ঈশান মোক্তারের জমিতে মনিষ খাটতে মানে বাধছে?

চুপ করে থাকে দাশু। দুখন বাবু মাথা নাড়ে ঃ মধুকুপির মনিষগুলার আজকাল বড় বাড় বেড়েছে।

রশিদার ভোলা বলে—কয়লার খাদ, নতুন রেল-লাইন আর কারখানাগুলো এদের মেজাজ খারাপ করে দিয়েছে।

দুখন বাবু—নগদ নগদ দেড়-দুই টাকা মজুরি মারে, মেজাজ খারাপ হবে না কেন?

ভোলা—জোয়ানগুলো সব খাদের কাজে গিয়ে ভিড়েছে। শুধু আছে বুড়াগুলা। সেগুলাও আবার আধা ভাগে জোত করতে চায় না।

দাশু—আমি খাদে কাজ নিব না দুখন বাবু। তুমি আমাকে জমি বন্দোবস্ত করে দাও।

দুখন বাবু—কি বন্দোবস্ত করবো বল? আঠার-বাইশ করবে? সেলামি লাগবে না।

দাশু—সেটা কি বটে?

দুখন বাবু—ফলনের চাল্লিশের বাইশ তুমি নিবে, আর কুঠি নিবে আঠার। পোয়ালের আধা তোমার, আধা কুঠির।

দাশু—হ্যাঁ, তাই মেনে নিব। আমাকে পাঁচ বিঘা দো-আঁশ বন্দোবস্ত করে দাও দুখন বাবু।

ভোলা—কিন্তু বীজ লাঙ্গল তুই দিবি, কুঠি দিবে না।

দাশু—এটা কেমনতর হলো? বীজ লাঙ্গল পাব কোথায়? টাকা কই?

ভোলা—তবে এত জমি জমি করিস কেন? টাকা নাই তো মনিষ হয়ে থাক। কুঠির দাওয়ার উপর লম্বা-চওড়া একটা চৌকি। ঈশান মোক্তারের বড় গুমস্তা দুখন বাবু আর রশিদার ভোলা আবার খাতাপত্র ঘাঁটতে থাকে। ঈশান মোক্তারের বিরাট খাটালের পিছনে গোবরের পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে চুপ করে হাঁটু মুড়ে দাওয়ার মেঝের উপর বসে থাকে দাশু। ঈশান মোক্তারের ভাণ্ডারটাও এই পাঁচ বছরে কত বড় হয়ে গিয়েছে। মাচানের পর মাচান, খড় আর মকাইয়ের খোসার এক-একটা পাহাড় মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভাণ্ডারের বড় দরজাটাও খোলা। ভিতরে ধানের পাহাড় দেখা যায়।

দুখন বাবু আর ভোলা রশিদারের কথা শুনে দাশু কিষাণের জমির স্বপ্ন খানখান হয়ে ভেঙে গিয়েছে! গুলঞ্চের বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা সাধের গায়ে আগুন ধরে গিয়েছে। টাকা চাই, নইলে পরের জমির মনিষ হয়ে থাকতে হবে, নিজের জমির মানুষ হওয়া যাবে না।

ভোলা রশিদারের চোখে একটা করুণার ছায়া যেন ছমছম করে ওঠে ঃ যদি ভাগজোত করতে চাস, তবে দশ বিঘা টাঁড় বন্দোবস্ত করে দিতে পারি দাশু। সেলামি লাগবে না, আর বীজও পাবি।

দাশু আক্ষেপ করে—টাঁড় নিয়ে কি হবে?

ভোলা—কোদো ছিটাই কর। যা হবার হবে ; আধা মাল কুঠিকে দিবি।

দাশু—তবে তাই দাও।

দুখন বাবু অপ্রসন্ন হয়ে ভ্রূকুটি করে—বেশ, কাল এসে চিঠা নিয়ে যেও ; ভোলাবাবু রশি ধরে জমি দাগিয়ে দিয়ে আসবে।

দাশু—কিন্তু...।

দুখন বাবু—কি?

দাশু—আজ একটা কাজ দাও দুখন বাবু। আজ খাটতে বের হয়েছি যে।

দুখন বাবু—এখন কোন কাজ নেই দাশু।

দাশু—একটা গো-গাড়ি দাও।

দুখন বাবু—কেন?

দাশু—জঙ্গলে যাব।

দুখন বাবু হাসে ঃ সর্বনাশ! অমন কথাটি মুখে এনো না।

দাশু আশ্চর্য হয় ঃ কেন গো?

দুখন বাবু—কেন জঙ্গলে যাবে? শাল ভাঙ্গতে?

দাশু—হ্যাঁ, একগাড়ি কাঁচা শাল বাবুরবাজারে নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারলে...।

দুখন বাবু—হ্যাঁ, তাতে তোমার দেড় টাকা আর কুঠির দেড় টাকা হবে। কিন্তু তোমার কাছ থেকে দেড় টাকা পেতে গিয়ে যে কুঠির একজোড়া বলদ কানারানীর পেটে চলে যাবে!

দাশু—কানারানী? কোথায় আছে কানারানী?

দুখনবাবু—কোথায় নাই বল? কপালবাবার জঙ্গলে বল, বড়কালুর চটানে বল, ডরানির স্রোতে বল, ডাঙ্গায় বল আর সড়কে বল, বাঘিনটা সবঠাঁই দিনে রেতে যখন-তখন ছুটাছুটি করছে।

ভোলা বলে—গত বছর এই সময়টা এক হাজার টাকার শিশালের আঁশ এই ভাণ্ডারে জমা করেছিলাম। এই বছর এক ছটাকও জমা হয় নাই।

দাশু—কেন গো ভোলা বাবু?

ভোলা—বাঘিনটার ডরে। শিশাল ভাঙতে জঙ্গলে যাবে কে বল্? পচাই পিটাই করবে না, শুধু কাঁচা ছেঁচাই করে এনে দিবে, এমন পাঁচ সের ভিজা আঁশের বদলে এক সের চাল হেঁকেছি, তবু কেউ রাজি হয় নাই।

দাশু উদাসভাবে বলে—কিন্তু আমাকে একটা কাজ দাও। আমার হাত আছে, পা আছে, টাঙ্গি আছে; আমি বুড়া নই।

দুখন বাবু—আমি জানি, তিনটা ভঁইসের মত তাকত আছে তোমার। কিন্তু কাজ না থাকলে দিব কেমন করে? রোপাই হয়ে গেল, এখন তো আর কোন কাজ নাই।

দাশু—আমাকে পাঁচটা টাকা আগাম দাও।

দুখন বাবু মুখ টিপে হাসে—সে কি হে দাশু? আবার বিয়া করবে নাকি?

দাশু—দাও এখন; আমি ধান কাটাইয়ের সময় রোজ খেটে শুধে দিব।

দুখন বাবু—ঈশান মোক্তারের কুঠি সরকারী রিলিফ আফিস নয় দাশু। ওসব বাজে কথা বলো না।

ভোলা রশিদার বলে—এখানে বসে না থেকে বাবুরবাজার যা, না হয় গোবিন্দপুরে চলে যা। মাটি কাট, পাথর বিছাই কর, নয়তো ঘরের চালা মেরামত কর। তুই তো ঘরামির কাজ জানতিস।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় দাশু। আকাশের দিকে তাকায়। বেলা প্রায় দু পহর হল। ছোটকালুর মাথায় শুকনো ঘাস পুড়ে পুড়ে ধোঁয়া ছড়ায়।

ব্যস্তভাবে হনহন করে পথ হাঁটে দাশু। এতক্ষণে একটা ভুল বুঝতে পেরেছে দাশু। আজই ঈশান মোক্তারের কুঠিতে গিয়ে জমির জন্য এতটা সময় আইঢাই করা ভুল হয়েছে। আজ এখনই হাতের কাছ পাঁচ বিঘা জমি না হলেও চলবে। গুলঞ্চের বেড়ার স্বপ্ন আর কয়েকটা মাস পরে সত্য হয়ে উঠলেও চলবে। কিন্তু আজ যে এই মুহূর্তে এই টাঙ্গির জোরে, এই শক্ত হাত দুটো খাটিয়ে অন্তত আজকের মত পেট ভরাবার খোরাক পেতে হবে। দাশুর কপালের সুখ, দাশুর বুকের আশা, দাশুর এই হাতদুটোর অহঙ্কার পরীক্ষা করবার জন্য ঠাণ্ডা উনানের উপর হাঁড়ি চড়িয়ে শক্ত হয়ে বসে আছে মুরলী। কোন ভুল নেই, এতক্ষণে মুরলীর

চোখ হতাশ হয়ে উঠেছে, মুরলীর ঠোঁটে ক্ষিদের জ্বালা জ্বলছে, মুরলীর মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু কোথায় কাজ? তবে কি গোবিন্দপুরে যেতে হবে? কিংবা বাবুরবাজারে?

ডরানির ছোট পুলের কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় দাশু। বাবুরবাজারের দিকে এগিয়ে যেতে ইচ্ছে করে না। পুলিস-ফাঁড়ির রামাই দিগোরার যদি মিছা আবার একটা হাঁক দিয়ে আটক করে ধরে, যদি মুন্সীটা এসে পরবী দাবী করে? দরকার নেই, ওপথে এগিয়ে গেলে দাশুর দাগী-জীবনের ব্যথাটাকে নিয়ে আবার টানাটানির খেলা শুরু করবে রামাই আর পুলিসের চৌধুরীজী। ওদিকে গেলে আজ আর ফিরতেই পারা যাবে না। তাছাড়া গেলেই কি কাজ পাওয়া যাবে? সেই ঠিকাদারবাবু আজও বাবুরবাজারে আছে কিনা কে জানে?

দুরুদুরু করে দাশু ঘরামির বুক। টাঙ্গিটা তেতে গিয়ে পিঠের চাম প্রায় ঝলসে দিচ্ছে, কিন্তু দাশুর ভিতরে ঠাণ্ডা ভয়ের বাতাস সিরসির করে। মুরলীর মুখটা মনে পড়তেই দাশুর চোখের চাহনি ভীরু হয়ে যায়। অন্তত সের দুয়েক চাল নিয়ে মুরলীর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে না পারলে দাশু ঘরামির ভাগ্য যে আর্তনাদ করে উঠবে ; সেই সঙ্গে ধিক্কার দিয়ে হেসে উঠবে মুরলী। কই, মধুকুপির এত তেজ আর দেমাকের মজবুত কিষাণ, মুরলীর মরদ হয়েছে যে, সে মানুষ মুরলীকে উপোষ রেখে মরিয়ে দিচ্ছে কেন? এমন করলে তোমার ছেইলাটাও কি বাঁচবে?

ডরানির ছোট পুলের লোহার উপর যেন মরিয়া হয়ে হাত ঘষে দাশু ; বাবলার কষজলে ঝামানো ভোঁতা হাতে কোন ফোসকা ফুলে ওঠে না। মুরলীর ওই ভয়ানক চোখের সন্দেহের কাছে যেন হার মানতে না হয়, হে কপালবাবা! মুরলীর ওই শূন্য হাঁড়ি ভরে দিতে ক'সের চাল লাগে?

আকাশের দিকে তাকায় দাশু। বেলা বেড়েছে, কিন্তু এখনও সময় আছে। কপালবাবার জঙ্গলের উপর মেঘ ভেসে বেড়াতে শুরু করেছে। কিন্তু বৃষ্টি হবে না বোধহয়। হোক না বৃষ্টি। এই তো মাত্র ক্রোশটাক পথ, ডাঙা ধরে দৌড়ে গেলে ছোটকালুর বাঁয়ে শিশালের জঙ্গলটাকে পাওয়া যাবে। এক মণ শিশালের পাতা কাটতে কত বা সময় লাগবে? আর পাতার বোঝা টেনে নিয়ে ডরানির স্রোতের কাছে এনে ফেলতে এমন কিছু দেরি হবে কি?

হনহন করে হাঁটতে শুরু করে দাশু!

ঝুপ ঝুপ—ঝপাট। দাশু ঘরামির টাঙ্গির তিন কোপে এক একটা টুসটুসে শিশালের নরম ধড় কাটাছাঁটা হয়ে মাটির উপর গড়িয়ে পড়তে থাকে। শিশালের প্রকাণ্ড মঞ্জরীর শুঁড় থর থর করে কাঁপে ; বীজখোল শব্দ করে ফেটে যায়, আর, বীজখোলের রস রক্তের ধারার মত ছিটিয়ে পড়ে মাটি লাল করে।

ঝুপ ঝুপ—ঝপাট। নীরব ও স্তব্ধ জঙ্গলের বুকের ভিতরে শুধু দাশু ঘরামির টাঙ্গির শব্দ বিচিত্র এক খাটুনির উৎসবে মত্ত হয়ে একঘেয়ে ছন্দে বাজতে থাকে। বাবলার কষজলে ঝামাই-করা পায়ের পাতায় কত কাঁটা ফুটে আছে, আর রক্তও ঝরছে ; তবু ব্যথা নেই, জ্বালা নেই। দাশু কিষাণের পা দুটো যেন জীবনের একটা প্রতিজ্ঞার উৎসবে নেচে নেচে ঘুরে বেড়াতে থাকে।

বনমোরগের ঝাঁক উড়ে পালিয়ে গেল। দুটো খরগোশ গর্তের ভিতরে মুখ লুকাল। দাশুও শিশালের রসে-ভেজা টাঙ্গিটাকে মাটিতে মুছে নিয়ে একবার চুপ করে দাঁড়ায়। না, আর দরকার নেই। একটা কচি শালের গা থেকে বুনো লতা ছাড়িয়ে নিয়ে এসে শিশালের পাতাগুলিকে গাদা করে বাঁধে দাশু। ব্যস্, এইবার গাদাটাকে টেনে টেনে ডাঙার উপর দিয়ে গড়িয়ে নিয়ে ডরানির স্রোতের কাছে এনে ফেলতে হবে। তারপর ছেঁচাই পিটাই আর ধোলাই আছে। তারপর, নিশ্চয়, অন্তত সের দশেক আঁশ পেয়ে যাবে দাশু।

পাতার গাদাদুটো টান দিয়ে মাত্র দু-তিন পা এগিয়েছে দাশু, হঠাৎ কচি শালের আড়াল থেকে একটা ঘম কালো ও রোমশ হিংসুটে ছায়া বের হয়ে, বড় বড় নখ ঝোলানো দুটো থাবা তুলে দু পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ায়। রাগে সাদা হয়ে গিয়েছে ভালুকটার ঘোলাটে চোখ। আর দু কষ দিয়ে সাদা ফেনার বুদবুদ ফেটে ঝরে পড়ছে।

এগিয়ে আসছে ভালুকটা। কালো কষের সাদা ফেনা হাসছে। শুধু এক মুহূর্তের জন্য, তার বেশি নয়, দাশুর বুকটা থরথর করে ওঠে। তার পরেই এক মুঠো ধুলো তুলে নিয়ে ভালুকটার চোখের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়ায় দাশু। দাশুর শক্ত মুঠোয় বাঁধা টাঙ্গিটার ফলা রোদ লেগে ঝিকমিকিয়ে হাসতে থাকে।

কিন্তু ভালুকটা একটা লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে দাশুর টাঙ্গির উপর একটা থাবা চালায়। দাশুও টাঙ্গি চালায়। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য! দাশুর হাত থেকে পিছলে গিয়ে পাথরের উপরে ছিটকে পড়ে আর্তনাদ করে ওঠে টাঙ্গিটা। দাশুর মাথার খুলি আঁকড়ে ধরবার জন্য একটা থাবা তুলে ভালুকটা নাচতে থাকে। কিন্তু সেই মুহূর্তে প্রকাণ্ড একটা ছায়া দাশু ঘরামির পিছন থেকে লাফ দিয়ে পাশের একটা ঝোপের আড়ালে ঢুকে পড়ে আর উশখুশ করে। ভালুকটাও হঠাৎ থাবা নামিয়ে নেতিয়ে পড়ে। চার পায়ের উপর বসে শরীরটাকে কুঁকড়ে ঝোপের দিকে একবার তাকায় ভালুকটা। দাশুও দেখতে পায় সেই মুখ জীবনে কোনদিন যে মুখ এত স্পষ্ট করে দেখতে পায় নি। ঝোপের পাতার ভিতর থেকে খোঁচা-খোঁচা গোঁফ ভাসিয়ে একটা নিভু-নিভু কানা চোখ, আর একটা কটমটে কটা চোখের সবুজ আভা ছড়িয়ে দিয়ে তাকিয়ে আছে সেই বাঘিন কানারানী।

একটা লাফ দিয়ে সরে গেল ভালুকটা। কচি শালের পাশ দিয়ে ছুটে গিয়ে উঁইঢিবির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। উশখুশ করে ওঠে ঝোপটা। দেখতে পায় দাশু, কানারানীও নেই। চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকে দাশু, উঁইঢিবির ভিড়ের ভিতর দুই জানোয়ারের চাপা-চাপা গোমরানো রাগ আর হুটোপুটির শব্দ ছটফট করছে। ধুলোও উড়ছে দেখা যায়। ভালুকটাকে কি তাড়িয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে কানারানী?

টাঙ্গিটা হাতে তুলে নিয়ে দৌড় দিয়ে পালিয়ে যেতে গিয়েই থমকে দাঁড়ায় দাশু, তারপরেই শিশালের পাতার গাদা টান দিয়ে হেঁচড়ে নিয়ে ডাঙার দিকে ছুটতে থাকে।

ডরানির স্রোতের কাছে যখন পৌঁছয় দাশু, তখন আর একবার আকাশের দিকে তাকায়। না এখনও সময় আছে। মুরলীর ধিক্কার মিথ্যে করে দেবার সুযোগ এখনও আছে। বিকেল হয়েছে, এই মাত্র। শিশালের পাতা ছেঁটাই পিটাই আর ধোলাই করতে আর কতই বা সময় লাগবে?

টাঙ্গির দু কোপে শালের মোটা ডাল কেটে মুগুর তৈরি করে নেয় দাশু। ডরানির স্রোতের কাছে শিশালের পাতার গাদা টেনে নিয়ে এসে পাথরের উপর ছড়িয়ে দেয়।

ছেঁচা শিশালের কড়া গন্ধে বিকেলের বাতাসে যেন ঝাঁজ ধরে যায়। দাশুর হাতের মুগুর শিশালের উপর আছড়ে আছড়ে পড়ে। থেঁতলানো শাঁস জলে ধুয়ে নিয়ে আবার পিটাই করে। ধুপ ধুপ! ধুপ ধুপ! শিশালের শাঁস ছিটকে এসে দাশুর চোখমুখ পিছল করে তোলে। থুতু ফেলতে গিয়ে বার বার জল বমি করে দাশু।

আকাশের দিকে তাকায় দাশু। বড়কালুর মাথার কাছের আকাশটা আর লাল নয়। ডরানির জল জঙ্গলের ছায়ায় কালো হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যা হয়ে এল।

ধুপ ধুপ! ধুপ ধুপ! যেন থেঁতলানো শিশালের বুকজ্বালা দুর্গন্ধে মাতাল হয়ে দাশুর হাতের মুগুর শিশাল পিটতে থাকে। ভুলতে পারে না দাশু, দাশু ঘরামির ভাগ্যটাকে আজ ঠাট্টা করে একেবারে মিথ্যে করে দেবার জন্য ঠাণ্ডা উনানের উপর শূন্য হাঁড়ি চাপিয়ে অপেক্ষায় বসে আছে মুরলী।

শিশালের আঁশ ধোলাই করতে আরও এক ঘণ্টা সময় গেল। ডরানির জলের স্রোতও ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল। শুধু শব্দ শুনে বোঝা যায়, কলকল করে কোন্ দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে ডরানির জল।

শিশালের আঁশের বোঝা লতা দিয়ে বেঁধে কাঁধের উপর তুলে আর টাঙ্গিটা হাতে নিয়ে ডরানির কিনারা ধরে এগিয়ে যাবার জন্য তৈরি হয় দাশু। বোঝাটা দশ সেরের কিছু বেশি হবে বলে মনে হয়। অন্ধকারের মধ্যে দাশুর চোখের খুশিতে একটা প্রতিজ্ঞার জয় ঝিক করে হেসে ওঠে। তার পরেই শিউরে ওঠে দাশুর চোখ।

গাছের আড়াল থেকে দাশু ঘরামির ছায়াময় কালো চেহারার দিকে তাকিয়ে জ্বলজ্বল করছে একটা সবুজ আগুনের চোখ, তার পাশেই একটা নিভু-নিভু চোখ।

কানারানী! থমকে দাঁড়ায় আর কেঁপে কেঁপে বিড় বিড় করে দাশু। তারপর আর এক মুহূর্তও দেরি করে না। ডরানির খাতের ঘন অন্ধকারের কাছে বুকের সব কাঁপুনি আর উদ্বেগ উৎসর্গ করে দিয়ে আস্তে আস্তে চলতে থাকে।

ডাঙার কাছে এসে উঠতেই আর একবার দেখতে পায় দাশু, একটু দূরে ডাঙার ঘাসের উপর লুটিয়ে পড়ে রয়েছে একটা নিভু-নিভু চোখ, আর একটা জ্বলজ্বলে চোখ। যেন পা-ছোঁয়া মাটির গন্ধ শুঁকতে চায় কানারানী।

ছুটে ছুটে চলতে থাকে দাশু। ডরানির ছোট পুলের কাছে এসে পৌঁছতেই দেখতে পায়, পুলের তলা থেকে হুট্ করে বের হয় কানারানীর ছায়া সেই খানাপিনার বাঁশবনের দিকে চলে গেল। হাঁপ ছেড়ে ওঠে দাশুর মুখ। কানারানী সত্যিই যে পথ দেখিয়ে পৌঁছে দিয়ে গেল। বড় দয়া কানারানীর!

তারপর ঈশান মোক্তারের কুঠি। ওজন করে বার সের কাঁচা আঁশের বদলে আড়াই সের চাল দিয়ে দিল ভাণ্ডারের সরকার। ভোলা রসিদার আশ্চর্য হয়ে হেসে ফেলে—তুই বাঘের চেয়েও জবর জানোয়ার বটিস দাশু!

তারপর, সেই জীর্ণ জামকাঠের দরজা। দরজার ফাঁকে ভিতরের আলো দেখা যায়। কপাটে হাত ঠুকে আস্তে আস্তে ডাক দেয় দাশু—মুরলী।

কপাট খুলে দেয় মুরলী। ঘরে ঢুকেই উনানের দিকে তাকায় দাশু। হ্যাঁ, ঠিকই, মুরলীর প্রতিজ্ঞা একটুও ক্লান্ত বা বিচলিত হয় নি। ঠাণ্ডা উনানের উপর শূন্য হাঁড়ি, দাশু ঘরামির প্রাণের অহঙ্কারকে ঠাট্টা করে মিথ্যে করে দেবার আশায় একটা প্রতিজ্ঞা চোখে মেলে তাকিয়ে রয়েছে।

গামছায় বাঁধা চালের পোঁটলাটা উনানের কাছে ধপ করে ফেলে দিয়ে হাঁপ ছাড়ে দাশু—আড়াই সের চাল আছে।

মুরলী—কোথায় পেলে?

দাশু—জিউ-জান দিয়ে খাটলাম, তাই পেলাম।

নাকে কাপড় দিয়ে মুরলী বলে—শিশাল পিটেছো মনে হয়।

দাশু—হ্যাঁ। ভুল করে একটু দেরি করে ফেললাম। না হলে আরও আগেই আসতাম।

মুরলী—কে তোমাকে দয়া করে খাটতে দিলে?

দাশু চেঁচিয়ে হেসে ওঠে—মানুষ নয়, মানুষ নয়, বাঘিন কানারানী দয়া করেছে।

শিশালের রসে ভিজে পিছল হয়ে রয়েছে দাশু ঘরামির বুক পিঠ আর কাঁধ। ঘরের বাতাসও যেন কড়া দুর্গন্ধের জ্বালায় হাঁসফাঁস করছে। কাঁটার খোঁচায় রক্তাক্ত দাশুর পায়ের পাতায় এখনো ভেজা-ভেজা রক্তের দাগ লেগে রয়েছে। মুরলীর চোখ দুটো শক্ত হয়ে মধুকুপির মনিষের এই প্রচণ্ড মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকে।

—তুই এবার একটু হাস দেখি, মুরলী। একজোড়া ভয়ানক উল্লাসের চোখ কাঁপিয়ে

হাসতে থাকে দাশু।

—কেন হাসবো? মুরলী ভ্রূকুটি করে বিড়বিড় করে উঠতেই মধুকুপির আকাশটা পাল্টা ধমক দিয়ে গরগর করে বেজে ওঠে।

হাঁক ছেড়েছে কানারানী। বড়কালুর আর ছোটকালুর চটানে আহত হয়ে কানারানীর হুঙ্কারের প্রতিধ্বনি এদিক থেকে ওদিকে গড়িয়ে গড়িয়ে বাজতে থাকে।

কাঁপতে কাঁপতে দাশুকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে মুরলী—আমি হাসতে পারবো না।

মুরলীকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে ; আর নীরব হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে দাশু। মধুকুপির আকাশের বুক-কাঁপানো সেই প্রচণ্ড পাশব হুংকারের গরগর শিহর ক্ষীণ হতে হতে বাতাসে মিলিয়ে যায়। শুধু শোনা যায়, সড়কের নিমগুলি স্বস্তির শ্বাস ছেড়ে ঝুরঝুর আরামের শব্দ করছে ; আর হাই তুলে গা ভাঙছে বাঁশের ঝাড়—কট কট, পট পট, কট কট।

শিশালের রসের তীব্র বোট্কা গন্ধ মেখে দাশুর যে ভয়ানক উল্লাসের বুক বাঘ-বাঘ গন্ধ ছাড়ছে, সেই বুক শক্ত করে জড়িয়ে ধরে মুরলীর বুকের থরথর কাঁপুনিও আস্তে আস্তে থিতিয়ে, শেষে একেবারে শান্ত হয়ে যায়। দাশুর মুখে সেই অদ্ভুত হাসিও ধীরে ধীরে নরম হয়ে আসে। একটা হঠাৎ-মায়ার আবেশে দাশুর গলার স্বরও গলে যায়। মুরলীর কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে আদুরে সুরে ফিসফিস করে দাশু ঃ খুব হাসতে পারবি। আমি থাকতে তোর কিসের এত ডর?

মুরলীর থরথর ভয়ের বুকটা এইবার যেন হঠাৎ-ঘৃণার জ্বালায় ছট-ফটিয়ে ওঠে। মধুকুপির মনিষের জীবনটা বাঘ-বাঘ গর্বের বোটকা নিঃশ্বাস ছাড়ছে। দাশুর বুকটাকে হঠাৎ একটা ঠেলা দিয়ে দু-পা পিছিয়ে সরে দাঁড়ায় মুরলী।

গামছায় বাঁধা আড়াই সের চাল ; পোঁটলাটার দিকে তাকিয়ে মুরলীর চোখ দুটো দপদপ করে। মুরলীর কল্পনার একটা হিসাবের সুখ নষ্ট করে দিয়েছে এই আড়াই সের চালের পোঁটলা। মুরলীর জীবনের যে সাধের জেদ কঠোর গর্বে অনড় হয়ে বসেছিল, সেই জেদ চূর্ণ করে দিয়ে পোঁটলাটা যেন হাসছে আর ঠাট্টা করছে। মিছা এত হিসাব করলি মুরলী, তোর ছাড়া পাওয়ার পথ নাই। এখন চুপটি করে মধুকুপির কিষাণী মাগটি হয়ে, কিষাণ ভাতারের বাঘা খাটুনির ওই উপহার, ওই চাল এখন হাঁড়িতে চড়িয়ে ভাত রাঁধতে লেগে যা।

দাশু বলে—কি হলো?

উত্তর না দিয়ে চুপ করে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মুরলী। হেসে ফেলে দাশু।—কানারানীর ধমক শুনে ভয় পেলি, কিন্তু আমার উপর রাগ করিস কেন?

রুক্ষস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী—বাঘিনটা আমাকে ধমকাবে কেন? ওটা কি আমার শাশুড়ি বটে?

হো হো করে চেঁচিয়ে হেসে ওঠে দাশু। দাশুর পাথুরে বুকটা যেন একটা অদ্ভুত খুশির উচ্ছ্বাস সহ্য করতে গিয়ে নাচতে থাকে। কী চমৎকার একটা কথা বলে ফেলেছে মুরলী। দাশুর হাসি থামতে চায় না। মুরলীর কালো চোখের তারা দুটো আরও ক্ষুব্ধ হয়ে দাশুর এই বিনা নেশার উল্লাস দেখতে থাকে।

দাশু বলে হ্যাঁ রে, কানারানী তোর শাশুড়ি বটে। তা না হলে...।

ভ্রূকুটি করে তাকায় মুরলী ঃ তা না হলে কি?

দাশু—তা না হলে ওটা আমাকে ওর ছেইলা বলে মানে কেন, এত দয়াই বা করে কেন?

মুখ টিপে হাসে মুরলী, আর মুখ ঘুরিয়ে হাসি লুকোয়। দাশু বলে—তুই হাসছিস, কিন্তু ভুলিস কেন যে...।

মুরলী আশ্চর্য হয়—কি?

দাশু—মনে করে দেখ, জেল থেকে ছাড়া পেয়ে যে-রাতে ঘরে এলাম, সে-রাতে আমি

তোর উপর মিছা রাগ করে ঘর ছেড়ে চলে যেতে হাঁটা দিয়েছিলাম। তুই কেঁদেছিলি চেঁচিয়েছিলি ; সে রাতে কে তোকে দয়া করেছিল? সে-রাতে আমাকে চলে যেতে পথ দেয় নাই কে? সে-রাতেই যে তোর পেটে ছেইলা এল, মনে নাই কি?

আবার মুখ ঘুরিয়ে হাসি লুকোয় মুরলী। দাশু বলে—কানারানীকে বাঘিন মনে করবি না।

ঠোঁট খুলিয়ে ঠাট্টা করে মুরলী ঃ বনদেবী বটে।

দাশু—বনমাতা বটে। বরাকরের সেই মাতা বুড়ি, এক রাতের মধ্যেই যে বুড়ির ছেইলা, ছেইলার মাগ আর নাতি মরে গেল। বুড়িও গাঁ ছেড়ে দিয়ে সেই যে জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে ঢুকলে, আর বুড়িকে কেউ দেখতে পায় নাই।

মুরলী—মরে গিয়েছে বুড়ি।

দাশু—না, মরে নাই। আমার কথা বিশ্বাস না হয়, সনাতন লাইয়াকে শুধায়ে দেখিস। তুক মন্তর করে মাতা বুড়িটাই বাঘিন হয়ে গেল। কানারানীর ছেইলা আছে ; ছেইলাটিও বাঘিন আছে। নটুবর বলে কানারানীর নাতিও আছে। মুরু পাহাড়ের জঙ্গলে ওরা থাকে। বিশ্বাস না হয় বড় বুড়া রতনকে শুধায়ে দেখিস।

গা-ঝাড়া দিয়ে জোরে একটা হাই তুলে হেসে ফেলে দাশু বলে ঃ কে জানে, আমাকেও কেন ওর ছেইলা বলে মনে করে কানারানী! আমার ঘরের উপর কেন ওর এত দয়া?

মধুকুপির কিষাণের এই অদ্ভুত বিশ্বাসের গল্প শুনতে একটুও ভাল লাগে না মুরলীর। সিস্টার দিদি কতবার এসে কত কথা বলে আর হেসে হেসে ঠিক এইসব জংলী বিশ্বাসের ময়লা ধুয়ে ফেলতে বলেছে। চুপ করে বসে আঙুলের নখ দিয়ে মেঝের মাটির উপর দাগ কাটে মুরলী।

দাশু বলে—নে, আর দেরি করিস না। অনেক রাত হয়েছে, এইবার রেঁধে ফেল।

মুরলী—না।

বড়কালুর পাথরের চটান সেই মুহূর্তে প্রচণ্ড শব্দ করে গুমরে ওঠে। হাঁক ছেড়েছে কানারানী। হাঁকের পর হাঁক, মধুকুপির অন্ধকার আর বাতাসকে যেন কামড় দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ভয়ানক ধমকের শিহর ছড়িয়ে দিচ্ছে। গর্জনের রেশ সড়ক ধরে গড়িয়ে গড়িয়ে পাকুড়তলা দিয়ে এই ঘরের দিকে ছুটে আসছে।

ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী। একটা লাফ দিয়ে সরে এসে দাশুর হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আর কেঁদে ফেলে।

কিন্তু দাশু হেসে ফেলে ঃ কেন মিছা রাগ করে না বললি, আবার শাশুড়ির ধমক খেলি?

মুরলীর মাথায় হাত বোলায় দাশু। তারপরেই হাত ধরে মুরলীকে টেনে নিয়ে এসে উনানের কাছে বসে ঃ নে,' ঝটপট ভাত রেঁধে ফেল। কতক্ষণ না খেয়ে আছিস, তোর কি নিজের জিউ-জানের লেগেও একটুকু ডর নাই?

উনানের কাঠের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। হাঁড়িতে চাল ছাড়ে মুরলী। আর দাশুও তাঁর জীবনের এক নতুন বিশ্বাসের আহ্লাদকে যেন দাউ দাউ করে হাসিয়ে মুরলীর কানের কাছে বাজাতে থাকে ঃ বড় মজা হয়েছে মুরলী। কানারানীর ডরে জঙ্গলের সব গার্ড, সব বেটা ঠিকাদার ভেগেছে। কেউ আর এই তল্লাটে নাই।

মুরলী আশ্চর্য হয়ে তাকায় ঃ তাতে তোমার মজার কি হলো?

দাশু—টিকিট নিতে হবে না, দস্তুরি দিতে হবে না, ভাগ দিতেও হবে না। জঙ্গলের মাল আনবো আর বেচবো। বড় দয়া কানারানীর।

উনানের আগুনের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকে মুরলী। মুরলীর মুখটা থেকে থেকে কেঁপে ওঠে। চোখে হতাশার জ্বালা ছলছল করে। সত্যিই কি কানারানীর দয়ার জোরে মধুকুপির কিষাণের একটা বাঘা-বাঘা গর্ব আর সৌভাগ্য মুরলীর অদৃষ্টকে স্বপ্নছাড়া করে এই

ঘরের ভিতরে চিরকাল আটক করে রাখবে?

দাশু বলে—মুখটা ঘুরিয়ে নে মুরলী ; মিছা ধোঁয়া লাগিয়ে চোখ দুটোকে জ্বলাস কেন?

মুখ ঘুরিয়ে নেয় মুরলী।

একটা দুটো দিন নয়, পর পর অনেকগুলি দিন, প্রায় একটা মাস ধরে দাশু ঘরামির টাঙ্গি আর পাতুরে শরীরের খাটুনি যেন এক-একটা মত্ততার উৎসবের মত মাতামাতি করে মুরলীর আশা হিসাব আর কল্পনাকে ভয় পাইয়ে চুপ করিয়ে রাখে। কোনদিন চাল, কোনদিন মকাই, কোনদিন মাষকলাই এনে ঘরের শূন্য সরা ডালা আর ঝোরা ভরে ফেলে দাশু।

মধুকুপির আকাশে কালো কালো শাওন মেঘ ভেসে বেড়ায়, আর মাঝে মাঝে খুব জোর বৃষ্টি ঝরায়। বড়কালুর বুকের মরা ঝরনার দাগটা আবার প্রাণটা পেয়ে কলকলিয়ে ওঠে।

বড়কালুর পায়ের কাছে বহেড়ার জঙ্গলে সারা রাত ঘরে যে আগুনটা জ্বলেছিল, সেই আগুন শাওনের এক পশলা ঝরানিতে নিভে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে নিশ্চয়। তাজা বহেড়ার গাছগুলি কালো কাঠকয়লা হয়ে জঙ্গলের বুকে ছড়িয়ে আছে। এই তো সুযোগ।

ভোর না হতেই বের হয়ে যায় দাশু ; আর, এক ক্রোশ বুনো পথ প্রায় এক দৌড়ে পার হয়ে গিয়ে পোড়া জঙ্গলের বুকের ভিতরে গিয়ে ঢোকে।। টুকরো টুকরো কাঠকয়লার প্রকাণ্ড বোঝা শালপাতা দিয়ে জড়িয়ে আর লতা দিয়ে বেঁধে মাথায় বয়ে নিয়ে আসে। সোজা গিয়ে ঈশান মোক্তারের কুঠিতে কাঠকয়লার বোঝা আছাড় দিয়ে ফেলে। এক বেলার খাটুনির জোরেই সের দুই চাল রোজগার করে ঘরে ফিরে আসে দাশু।

তিন-চারটে দিন কাঠকয়লা টেনে টেনে পার করে দেবার পর আবার ভাবতে হয়। মধুকুপির আকাশের মেঘের দিকে, আর মধুকুপির চারদিকের যত জংলা সবুজের দিকে তাকিয়ে থাকে দাশু। মধুকুপির ডাঙা আর ক্ষেতগুলির দিকেও তাকায়।

মনে পড়ে, বহেড়া জঙ্গলের কাছে, যেখান থেকে নতুন রেল-লাইনের গুর্‌গুর্‌ শব্দ খুব স্পষ্ট করে শোনা যায়, সেখানে শত শত কচি আর বুড়ো খয়ের গাছের একটা জটলা লুকিয়ে আছে। কে জানে, গোবিন্দপুরের কোন্‌ বাবুর ইজারা হয়ে আছে ওই খয়েরের জটলা?

টাঙ্গিটাকে শানিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায় দাশু। পর পর সাত দিন ধরে খয়েরের ডালপালা আর ধড়ের বড় বড় বোঝা ঘাড়ের উপর তুলে নিয়ে ঘরে ফিরে আসে। মুরলী শুধু ঘরের দাওয়ার উপর চুপ করে বসে তাকিয়ে থাকে। দুটো বড় বড় উনান তৈরি করে আর উনানের উপর বড় মাটির হাঁড়া বসিয়ে খয়ের জ্বাল দেয় দাশু। খয়েরের কালো ক্বাথ টগবগিয়ে ফোটে। দাশু একাই কাঠের হাতা চালিয়ে ক্বাথ ঘাঁটে। আর, দুটো দিন পরে দুই হাঁড়া চিটা খয়ের ঈশান মোক্তারের ভাণ্ডারে নিয়ে গিয়ে ফেলে। বেশি দরাদরি করে না দাশু। খয়েরের বদলে আধ মণ মকাইয়ের একটা বোঝা কাঁধে বয়ে নিয়ে ঘরে ফিরে আসে।

মাঝে মাঝে, টাঙ্গিটাকে অলসভাবে কাঁধের উপর ফেলে দিয়ে মধুকুপির ক্ষেতের আলের উপর দিয়ে অলসভাবে ঘুরেও বেড়ায় দাশু। ঘরে চাল আছে, মকাই আছে ; ভাবনা করবার কিছু নেই। দাশুর দুই চোখ যেন আবার সেই পুরনো স্বপ্নে বিভোর হয়ে মধুকুপির মাটি আর কাদার রঙ খুঁজে খুঁজে ঘুরতে থাকে। কোথায় কালো কালো দো-আঁশ, কোথায় সাদাটে বেলে, আর লালচে এঁটেল? দাশুর চোখের দৃষ্টি মাঝে মাঝে থমকে যায়। ডরানির বাঁকের উত্তর দিকে কী চমৎকার বেলে মাটির গরাঞ্জি এই শাওনেও একেবারে নেড়া হয়ে পড়ে আছে। ছিঃ! কুঠি যদি একটা চিঠা দিত, আর বীজ লাঙ্গল দিত, তবে দাশু যে একা খেটে ওই গরাঞ্জির পাঁচ বিঘা ভরে বেরো ফলাতে পারতো।

অলসভাবে হেঁটে, যেন মধুকুপির মাটির গন্ধে নেশা জমাবার জন্য এক অদ্ভুত পিপাসা নিয়ে ঘুরতে থাকে দাশু। অত দূরে কেন, এই তো কত কাছে, পাকা সড়কটার লাগান একটা ঢালুর এঁটেল বৃষ্টির জলে গলে গিয়ে কেমন সুন্দর লালচে কাদা হয়ে পড়ে রয়েছে। এই

জমিটার বিঘা পাঁচেক জমা নিলে ভাল হয়। ধুন্দুল, শশা আর করলা ফলবে ভাল। আর, কার্তিকের শিশির পড়তেই দু বার হাল ফিরিয়ে চষে নিয়ে কপি আর মটর করা যেতে পারে। চারদিকে জিরা ছড়িয়ে দিতেও পারা যাবে! কিন্তু তার আগে ধঞ্চে বুনে একবার মাটির জো পাকিয়ে নিতে হবে, আর চাই গুলঞ্চের বেড়া।

আগে জমা চাল ফুরিয়ে যায়, তারপর মকাইয়ের দানা। সেদিন আবার টাঙ্গিকে শান দিতে দিতে মুরলীর মুখের দিকে তাকায় দাশু ঃ তুই কি ভাবছিস?

মুরলী—কিছু না।

দাশু--ভাবছিস, মকাইয়ের দানা ফুরিয়ে গেল, এইবার কিষাণটা জব্দ হবে।

চমকে ওঠে মুরলী। মুরলীর মনের হিসাবও হঠাৎ বোকা হয়ে যায়। মধুকুপির কিষাণের চোখ দুটোকে যত বোকা মনে করেছিল মুরলী, তত বোকা তো নয়। মুরলীর এই থমথমে মুখভার, ভ্রূকুটি আর সারাদিনেব আনমনা চাহনি দেখে বুঝতে পেরেছে দাশু, মুরলী এখনও যেন দাশুর এই অহংকারের পতন দেখবার জন্য মনে মনে একটা আশা ধরে রেখেছে।

দাশু হাসে ঃ তুই মিছা ভেবে মনটাকে দুখাস কেন মুরলী? আমি জব্দ হব না।

অবিশ্বাস করতে পারে না মুরলী। তাই দাশুর এই নরম ঠাট্টার শক্ত খোঁচা খেয়েও মুরলীর চোখে আর ভ্রূকুটি শিউরে উঠতে পারে না ; দাশুর এই প্রচণ্ড খাটুনির মাতলামি দেখে মায়া হলেও চোখে জল আনতে পারে না। কিন্তু দাশুর হাসির সঙ্গে সায় দিয়ে হাসতেও পারে না।

—আমি আসছি। টাঙ্গিটা কাঁধে তুলে ঘর থেকে বের হতে গিয়েই চমকে ওঠে, আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকায় দাশু। কড়কড় করে একটা বাজ ফেটেছে। ডাঙার তালগাছের মাথার উপর চিলের ঝাঁক এলোমেলো হয়ে উড়ছে। আর, কালো মেঘের চাপ গলে গিয়ে জটার মত লম্বা হয়ে কপালবাবার জঙ্গলের উপর ঝুলছে। মধুকুপির ক্ষেত মাঠ আর জঙ্গলের সব সবুজ যেন কালিমাখা হয়ে ঘুটঘুট করছে। মধুকুপির সকালবেলা অন্ধকার ঢাকা পড়ে সন্ধ্যার চেয়েও বেশি কালো হয়ে গিয়েছে।

ডাঙার তালগাছগুলিকে প্রায় শুইয়ে দিয়ে একটা ঝড় ছুটে এল। শিলা ঝরতে থাকে। কনকনে ঠাণ্ডা বরফের গোলকের মত এক-একটা আধসেরী শিলা। ঈশান মোক্তারের খাটালে গরুর চিৎকার করুণ হয়ে ছটফট করতে থাকে। তার পরেই শাওনের অঝোর বৃষ্টির শব্দে মধুকুপির সব শব্দ চাপা পড়ে যায়।

জামকাঠের দরজার কাছে চুপ করে এক ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে দাশু। আর ঘরের ভিতরে খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর গম্ভীর মুরলী।

এই বৃষ্টি কি থামবে? দাশুর ভাবনার এই প্রশ্নটাকে যেন ঠাট্টা করে চমকে দিয়ে মধুকুপির আকাশে একটা বিদ্যুতের চমক লিকলিকিয়ে উঠল। তার পরেই আরও জোর বৃষ্টি। দেখতে থাকে দাশু, পাকা সড়কটা যেন একটা স্রোতের ঢল হয়ে গলে গলে ভেসে যাচ্ছে।

কতক্ষণ চুপ করে জামকাঠের দরজার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে দাশু, সেকথা মনে পড়তেই দাশুর ভাবনা দুরুদুরু করে কেঁপে ওঠে। বেশ বেলা হয়েছে, নিশ্চয় চার-পাঁচ ঘণ্টা পার হয়ে গিয়েছে। দেখতে পায় দাশু, একটা মাকড়সা এরই মধ্যে দাশুর হাতের স্তব্ধ টাঙ্গি আর দাশুর মাথার চুলের সঙ্গে একটা জাল জুড়ে দিয়ে তরতর করে আসছে যাচ্ছে আর নাচছে। দাশুর ভাগ্যটা কি আবার একটা পরীক্ষার ভ্রূকুটি দেখতে পেয়ে ভয় পেয়েছে আর অনড় হয়ে গিয়েছে? তা না হলে এই মাকড়সাটা কেন...।

মুখ ফিরিয়ে ঘরের ভিতরে তাকায় দাশু। চমকে ওঠে। ঠাণ্ডা উনানের উপর হাঁড়ি চাপিয়ে উনানের কাছে চুপ করে বসে আছে মুরলী। আঙুলের নখ দিয়ে মেঝের মাটিতে দাগ কাটছে। মুরলীর জীবনের হিসাব আবার দাশু ঘরামির অহংকার ভাঙবার আশায় যেন নতুন হাসি

হাসছে।

বিদ্যুৎ চমকায় ; দেখতে পায় দাশু, হ্যাঁ ঠিকই, মুরলী যেন মাথা হেঁট করে মুখ লুকিয়ে হাসছে। আজ দাশু ঘরামির এই সাধের ঘর উপোস করবে। এক দানা চাল আনবার সাধ্যি নেই, উপায় নেই দাশুর। আজ আবার মুখ টিপে হেসে হেসে দাশুকে প্রশ্ন করতে পারবে মুরলী, কি গো মধুকুপির কিষাণ, মুরলীকে এইরকমটি না খাইয়ে জ্বালালে তোমার ছেইলাটা বাঁচবে তো?

বৃষ্টির ঝরানির শব্দ ছাপিয়ে আর একটা শব্দ। এই শব্দ যেন বড়কালু আর ছোটকালুর সব পাথর গুঁড়ো করে দিয়ে, মধুকুপির ডাঙার পাঁজর কাঁপিয়ে আর গড়িয়ে গড়িয়ে ছুটে আসছে।

—হুড়পা বান! চেঁচিয়ে ওঠে দাশু। সেই ভয়ানক শব্দের হুড়মুড়ে গড়ানির মধ্যেই চাপাচাপা দূরের আর্তনাদের মত একটা চাপা-চাপা করুণ কলরোল শোনা যায়।—হুড়পা বান! হুড়পা বান! সারা মধুকুপির আতঙ্কিত মানুষ চিৎকার করছে আর ঠেঙার বাড়ি মেরে টিন পিটিয়ে হুড়পা বানের হুঁশিয়ারি জানান বাজাতে শুরু করেছে।

পাগল হয়েছে ডরানি। জানে দাশু, বছরে অন্তত একটি দিনে ডরানি এই পাগলপারা কাণ্ডটি করে। কম করে দশটি পাহাড়ের গা থেকে জলের ঢল গড়িয়ে পড়ে ডরানির জলকে হঠাৎ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে পাগল করে দেয়। দশ হাত উঁচু জলের হুড়পা নিয়ে দু পাশের জঙ্গল ভেঙে ভাসিয়ে গড়িয়ে আর ঠেলে ডরানির বান ছুটে এসে ঠিক এই মধুকুপির ক্ষেত আর ডাঙার উপর ছড়িয়ে পড়ে। কিষাণের ঘরের আঙিনার ভিতরেও কলকল করে জলের তোড় তেড়ে আসে। মাঝে মাঝে মাচানের মানুষও মাচানের সঙ্গে টলমল করে জলের উপর পড়ে। কেউ বাঁচে, কেউ বা লাস হয়ে ভেসে চলে যায়। এক হাঁটু জলের তোড়েও রোগা গরু-মহিষ হাঁটু ভেঙে পড়ে যায় আর ভেসে যায়।

চুপ করে দাঁড়িয়ে কি-যেন ভাবে দাশু। কি-যেন মনে পড়েছে দাশুর। ঘরের ভিতর থেকে চোপের দড়ির একটা পুঁটলি হাতে তুলে নিয়ে বের হয়ে আসে দাশু। তারপর সেই শাওনে বৃষ্টির অঝোর ধারার ভিতর দিয়ে ছুটে চলে যায়।

ডরানির ছোট পুলের কাছে এসে যখন থমকে দাঁড়ায় দাশু, তখন বৃষ্টির জোর একটু ক্লান্ত হয়ে এসেছে। কপালবাবার জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে মনে মনে কি-যেন বিড়বিড় করে দাশু। তার পরেই সড়ক থেকে নেমে ডরানির জলের কিনারায় এক হাঁটু জলের উপর শক্ত হয়ে, চোপের দড়ির মুখে ঢেলা বেঁধে নিয়ে মেছুয়া শিকারীর মত তাক করে দাঁড়িয়ে থাকে।

এক ঘণ্টাও অপেক্ষা করতে হয় না। দাশুর কল্পনার আশাকে যেন অজস্র দানে ভরে দেবার জন্য বানভাসি ডরানির জলের উপর দিয়ে বাঁশের ছোট ছোট টাল ভেসে আসতে থাকে। দড়ি ছোঁড়ে দাশু। একবার, দুবার, তিনবার। দুবার ব্যর্থ হয়, তিনবারের খেপ ব্যর্থ হয় না। বাঁশের একটা বড় টাল আটক করে ডাঙার উপর টেনে তোলে দাশু।

বাঁশের টাল টেনে নিয়ে গিয়ে ঈশান মোক্তারের ভাণ্ডারে জমা দিতে এক ঘণ্টার বেশি সময় লাগে না। তারপর আড়াই সের চাল নিয়ে মধুকুপির সেই জামকাঠের দরজার কাছে গিয়ে আবার দাঁড়াতে আধ ঘণ্টারও কম সময় লাগে।

দাশু চেঁচিয়ে ওঠে—উনানে আগুন দে মুরলী।

উনানে আগুন দেয়, হাঁড়িতে চাল ছাড়ে মুরলী। তার পরেই হাঁটুতে মুখ গুঁজে কেঁদে ফেলে।

জাহির থানে মোরগ বলি দিয়ে ঘরে ফিরে আসে দাশু।

মুরলীকে একবার শুধাতে ইচ্ছা করে দাশুর ; এটা তোর কি রকমের ঢং বটে?

হ্যাঁ ঢং বটে, কিন্তু ঠিক মুরলীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার ঢং বলে মনে হয় না। যেন কোন্ এক প্রচণ্ড তামাসার আত্মা মুরলীর চোখ আর মুখের উপর খেয়ালের ছায়া ফেলে খেলা করছে। তা না হলে এরকম কাণ্ড করবে কেন মুরলী? মুরলীরই মরদ তার ওই অদ্ভুত রকমের শক্ত-শক্ত হাড়মাসের জাদু দিয়ে তৈরি হাত-পায়ের খাটুনি; পাথরের পাটার মত পোক্ত বুকের সাহস, আর শান দেওয়া একটা নির্ভয় টাঙ্গির জোরে দুর্ভাগ্যের এক-একটা কঠোর মতলব ছিন্নভিন্ন করে এই ঘরের প্রাণকে উপোস করা কষ্টের জ্বালা থেকে বাঁচাবার জন্য চাল আর মকাই নিয়ে আসে, তখন কেন কেঁদে ফেলে মুরলী? আর ঘরের ডালা ও সরা যখন শূন্য হয়ে যায়, যখন চাল আর মকাইয়ের শেষ দানাও ফুরিয়ে যায়, তখন কেন মুরলীর মুখটা হেসে ওঠে?

নিজেকেও একবার শুধাতে ইচ্ছা করে দাশুর, মধুকুপির কিষাণেরও প্রাণের ঢং এমনতর হয়ে গেল কেন? মুরলী যখন কেঁদে ফেলে, তখন দাশুর মুখটা কেন অদ্ভুত এক অহংকারের আরামে হেসে ওঠে? আর মুরলী যখন মুখ টিপে হাসে, তখন ভয় পেয়ে দুরুদুরু করে কেঁপে ওঠে কেন দাশু কিষাণের পাথুরে বুক?

ছোট মধুকুপির গেঁয়ো প্রাণ আর চেহারার উপরেও কদিন ধরে একটা প্রচণ্ড তামাসার আত্মা যেন খেয়ালের ছায়া ফেলে ফেলে খেলা করছে। মধুকুপির আকাশ রোদের জ্বালায় পুড়ে পুড়ে হাসে, আর মধুকুপির মাটি বানভাসির জলে ডুবে আর ভিজে গিয়ে ছলছল করে। পূব আর দক্ষিণের দিক সবচেয়ে বেশি ভেসেছে। বাবলা বনে এক বুক, আর ঢালুর ক্ষেতগুলির উপর এক কোমর জল। উঁচু উঁচু ডাঙার পিঠগুলি শুধু ভেসে আছে। তার উপর শকুনের ঝাঁক জিরোয়। কপালবাবার জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যাবার উপায় নেই। সব খাত জলে ভরে আছে। সাবাই ঘাসের এত বড় জঙ্গলটা পচেই যাবে বলে মনে হয়। পলাশবনের গা ঘেঁষে ডুবো ডাঙ্গার উপর বড় বড় জয়ঢাকের মত মরা গরুর ফোলা-ফাঁপা লাস ভাসে ; আর ডাঙার শকুন উড়ে এসে ডানা ধড়ফড়িয়ে পলাশের পাতা ঝরায়।

শুকনো শুধু পশ্চিমটা আর উত্তরটা। নেড়া নেড়া পাথুরে টিবি আর কাঁকুরে ডাঙা ধরে যত খুশি এগিয়ে যেতে পারা যায়, সোজা ভুবনপুর পৌঁছে যাওয়া যায়, পায়ে এক ছিটে কাদা লাগবে না। কারণ কাদাই নেই ; ক'টা দিনের শাওনে ঝরানিতে মাটি গলেছিল ঠিকই, কিন্তু এই ক'দিনের রোদের ঝাঁঝে সেই গলানি এখন শুকিয়ে খটখটে হয়ে গিয়েছে।

টাঙ্গিটা কাঁধে নিয়ে মিছে তিনটে দিন এদিক ওদিক ঘুরে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মিছে ছুটোছুটি করে ঘরে ফিরে এসেছে দাশু। জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যাবার পথগুলি যদি জলে ডুবে না থাকত, তবে অন্তত এই ক'দিনের মধ্যে মণ দুয়েক বুনো লতা উপড়ে নিয়ে এসে, ছেঁচে পিটে আর পাকিয়ে এক গাদা দড়ি তৈরি করে, আর গিরিমাটি দিয়ে সুন্দর করে রাঙিয়ে নিয়ে ঈশান মোক্তারের ভাণ্ডারে জমা দিতে পারা যেত। কম করেও পাঁচ সের চাল দিত ঈশান মোক্তারের ভাণ্ডারী। কিন্তু মিছে আশা। টাঙ্গি হাতে নিয়ে ডরানির ছোট পুলের কাছে দাঁড়িয়ে আর জঙ্গলের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ঘরে ফিরে এসেছে দাশু।

চার দিনের পর সেই দিন, শেষ এক পোয়া চাল আধ হাঁড়ি জলে ফুটিয়ে নিয়ে ফেনভাত খেয়ে ঢেঁকুর তুলতে গিয়েই চমকে ওঠে দাশু ; আর, মুরলী যেন ঢেঁকুর চাপা দিতে গিয়ে হেসে ফেলে।

সে রাতের ঘুমটাও বার বার ছিঁড়ে যায়। দাশুর চোখের উপর অদ্ভুত এক ভয়ের জ্বালা বার বার ছটফট করে। মুরলীর কোমরের উপর হাত রাখতে ভয় করে। এক পোয়া চালের ফেনভাতের আধা ভাগ খেয়ে মানুষের ভুখ মরে না। মুরলীরও ভুখ মরে নি, মুরলীর পেটটা যেন ভয়ানক এক অভিমানে চুপসে রয়েছে। ঘুমন্ত মুরলীর পেটের উপর হাত বোলাতে গিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে দাশুর বুক। মুরলীর এই পেটের উপর চুমো খেতে গিয়ে যে ধুকপুক

শব্দ শুনে কাল রাত্রিতেও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল দাশুর কলিজা, সেই ধুকপুক শব্দও কি চুপসে শান্ত হয়ে গেল? দাশুর ছেইলার প্রাণটাও কি উপোস সহ্য করতে গিয়ে অভিমান করে নিথর হয়ে গিয়েছে?

দাশুর চোখের জ্বালা ভিজে যায়। দু হাত দিয়ে ঘষে ঘষে চোখ মোছে দাশু।

ভোর হয়ে এল বোধহয়। কাক ডাকতে এখনও দেরি আছে। কিন্তু আর দেরি না করে এখনি বের হয়ে যাওয়া ভাল। খাটুনি খোঁজবার একটা উপায় বের করবার জন্য বেশি সময় পাওয়া যাবে। তা ছাড়া, ঠাণ্ডা উনানের উপর হাঁড়ি চড়িয়ে দাশুর মুখের দিকে অদ্ভুত রকমের একটা দৃষ্টি তুলে তাকাবে মুরলী, সে দৃশ্য দেখবার আগেই বের হয়ে যাওয়া ভাল।

—শুনছিস মুরলী?

—কি বলছো?

—আমি বের হলাম।

মুরলীর হঠাৎ-জাগা চেতনার কোন ধিক্কারের শব্দ শোনবার আগেই, মুরলীর মুখে ঝিক করে সেই রহস্যের হাসি ফুটে ওঠবার আগেই টাঙ্গি কাঁধে নিয়ে বের হয়ে যায় দাশু।

কিন্তু বৃথা, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মধুকুপির খোলা সড়কের এক ক্রোশের হাওয়া আর আলোর মধ্যে দাশু যেন কয়েদীর মত লোহার বেড়ি দিয়ে বাঁধা একটা শাস্তির ভারে অসহায় হয়ে আস্তে আস্তে ঘুরে বেড়ায় ; ছটফট করে আর মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে থাকে। বানভাসির জল সবে মাত্র সরতে শুরু করেছে। ডাঙার গা থেকে ঝরনার মত জলের ধারা নেমে খাতের ভিতর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। কে জানে আর কতদিন লাগবে, কবে সব জল আবার টেনে নেবে ডরানি, আর জঙ্গলে যাবার পথগুলি শুকিয়ে যাবে?

পলাশবনের কাছে উড়ন্ত শকুনের ছায়া যখন সন্ধ্যার অন্ধকারে ঝাপ্‌সা হয়ে যায়, তখন আস্তে আস্তে হেঁটে ঘরে ফিরে আসে দাশু। পুরনো জামকাঠের দরজার উপর হাতের ঠেলা দিয়ে একটা শব্দ করবার সাহসও দাশুর হাতের হাড়মাস থেকে যেন আলগা হয়ে ঝরে পড়ে গিয়েছে। হাত কাঁপে, বুক কাঁপে দাশুর। পেটের ভিতরে ক্ষুধার জ্বালাটাও যেন ভয় পেয়ে সিরসির করে।

দাশুর জীবনের প্রতিজ্ঞা আজ হেরে গিয়েছে। শূন্য হাতে এই ঘরের ভিতরে ঢুকে আজ শুধু চুপ করে তাকিয়ে দেখতে হবে, মুরলীর মুখের সেই রহস্যের হাসি কাটারির শান দেওয়া হাসির মত জ্বলছে। আজ একেবারে শূন্য হাঁড়ি আর ঠাণ্ডা উনানের দিকে তাকিয়ে দাশু ঘরামির এই সাধের ঘরের প্রাণ উপোস করবে, আর ঘুমোতে না পেরে ছটফট করবে।

দরজা খুলে দেয় মুরলী। কিন্তু মুরলীর মুখের দিকে তাকায় না দাশু। খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর একটা আহত ও ক্লিষ্ট জীবনের পিণ্ডের মত অনড় হয়ে বসে থাকে।

মুরলীও কোন কথা বলে না। কিন্তু নিঝুম হয়ে মেঝের উপর বসেও থাকে না মুরলী। উঠে যায় ; দাওয়ার উপর বসে অনেকক্ষণ ধরে দাঁতন করে আর মুখ ধুয়ে নিয়ে, তারপর ঢকঢক করে এক ঘটি জল খেয়ে যেন একটা শান্তির হাঁপ ছাড়ে মুরলী। তারপর ঘরের ভিতরে ঢুকে শুয়ে পড়ে।

ছটফট করে উঠে দাঁড়ায় দাশু ; রেড়ির তেলের মেটে বাতিটাকে জ্বালিয়ে নিয়ে ঘরের দেয়ালের ও চালার ফাঁকে হাতড়ে হাতড়ে কি-যেন খুঁজতে থাকে।

মুরলী বলে—কি খুঁজছো?

দাশু—আমার কাঁড়-বাঁশটা আছে কি নাই?

মুরলী—নাই।

দাশু—কেন?

মুরলী—পচে গিয়েছিল, ফেলে দিয়েছি।

তবু কি-যেন খুঁজতে থাকে দাশু। ধামন কাঠের ধনুকের সেই বাঁকটা কি নাই? ধনুকের তাঁতটাও কি পচে গিয়েছে? এক গোছা তীরও তো ছিল।

—কি খুঁজছো? আবার মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করে মুরলী।

—আমার ধনুকটা আর তীরগুলা কি নাই?

—আছে।

হ্যাঁ আছে। চালার বাঁশের সঙ্গে গোঁজা ধনুকটা আর তিনটা তীর নামিয়ে নিয়ে ধুলো ঝাড়ে দাশু। ধনুকের ছিলার তাঁত ছিঁড়ে গেলেও পচে যায় নি। আর তীরের ফলাগুলি মরচে পড়ে ময়লা হয়ে গিয়েছে, এই মাত্র।

ছিলার ছেঁড়া তাঁতে নতুন করে গিঁট বাঁধে দাশু। ধামনকাঠের বাঁকের দুই মুখ টেনে নতুন করে ছিলার ফাঁসে ফাঁসিয়ে ধনুকটাকে জীইয়ে তোলে। তীরের ফলার মুখগুলিকে ঘষে ঘষে চকচকে করে।

বাতির কাছে তীরের ফলা এগিয়ে নিয়ে দেখতে থাকে দাশু ; দাশুর চোখের তারা দুটোও তীরের ফলার মত ঝিকঝিক করে জ্বলতে থাকে। যেন জীবনের এক ভয়ানক অভিশাপের কলিজা বিঁধে রক্তের ফোয়ারা ছড়িয়ে দেবার জন্য, আর সেই রক্তের লোনা স্বাদ পেট ভরে খেয়ে নাচবার জন্য দাশু কিষাণের চোখের তারায় একটা প্রচণ্ড বুনো আশা নাচতে শুরু করেছে। পেটের ভিতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে, বুকের একটা নিঃশ্বাস হঠাৎ যেন গুঁতো খেয়ে শিউরে ওঠে। কিন্তু উপোসের জ্বালা ভুলে গিয়ে একটা কল্পনার নেশায় খুটখাট করে খেলা করতে থাকে দাশু। অলস জিভটাকে এলিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে ঠোঁট চাটে।

একটা শব্দ। ঘরের নীরবতার গুমোট যেন মুখ লুকিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠেছে। চমকে ওঠে দাশু। মুরলীর দিকে তাকায়।

মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে আর পাশমোড়া দিয়েছে মুরলী। দু হাতে মুখ ঢাকাও দিয়েছে। ঠিক বুঝতে পারে না দাশু, খিলখিল করে হেসে উঠল, না, খিলখিল করে কেঁদে উঠল মুরলী।

বাতি নিভিয়ে দিয়ে চুপ করে বসে থাকে দাশু। মধুকুপির রাতের প্রহরের সব ক্লান্তি যেন ঝিঁঝির ডাকের সঙ্গে কান্না মিশিয়ে দিয়ে বাজতে থাকে। দাশুও জাগা চোখের একটা আক্রোশ ঘরের অন্ধকারে লুকিয়ে রেখে চুপ করে বসে থাকে। ভোর হতে আর বাকি কত?

ডাঙাটা এদিকে আধ ক্রোশ আর ওদিকে আধ ক্রোশেরও বেশি হবে। মাঝে মাঝে বুড়ো বয়সের এক-একটা বট, তা ছাড়া ডাঙার বাকি সব ঠাঁই জুড়ে ফণীমনসা, বাঘভেরেণ্ডা আর ময়নাকাঁটার ঝোপ। এই ডাঙাটা জলে ডোবে নি। পাকুড়তলার কাছ থেকে হাঁটা দিলে এই ডাঙায় পৌঁছতে এক ঘণ্টার বেশি সময়ও লাগে না। পৌঁছতেও খুব বেশি অসুবিধা নেই। পাকুড়তলা থেকে ডাঙার পশ্চিমের গড়ানি পর্যন্ত এক হাঁটুর কম জল ছপছপ করে।

পাঁচ বছর আগে এই ডাঙার ঝোপের আড়ালে বসে ঢোলক পিটিয়ে একটা ছাগলা হরিণকে ভয় পাইয়ে দিয়ে ঝোপের ভিতর থেকে বের করেছিল দাশু। কাঁড়-বাঁশ চালাতে হয় নি। একটা পাথর ছুঁড়ে ছাগলা হরিণটাকে ঘায়েল করেছিল। সুরেন মান্‌ঝিও ফাঁদ পেতে এই ডাঙার ঝোপঝাড়ের ভিতরে কত খরগোশ আর ছাগলা হরিণ কতবার ধরেছে।

ডাঙার বাকি তিন দিকে জল ; সে জলে ঢালুর আর খাতের সব ঝোপঝাপ ডুবে রয়েছে। শুধু পূব দিকের জলে টান ধরেছে। পাথরের চটানের ধাপে ধাপে প্রপাতের মত জল গড়িয়ে পড়ছে। টানের জোর কম নয় ; জলের শব্দেরও বেশ রাগ আছে।

ধনুক আর তিনটে তীর এক হাতের মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরে ডাঙার ঝোপঝাপের ভিতর দিয়ে পা টিপে টিপে ঘুরতে থাকে দাশু। ভোরের দিকে অন্ধকার মুছে গিয়েছে অনেকক্ষণ। সকাল বেলার লালচে রোদ ঝলক দিয়ে ডাঙার বুকে লুটিয়ে পড়েছে। সেই

বুড়ো বটও আছে। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে দাশু। পাঁচ বছর আগে শত শত পাখিতে ছেয়ে থাকত যে বট, সেই বটের কাছে দাঁড়িয়ে একটা পাখির ডাকও শোনা গেল না।

রোদের তাত বাড়ে। দাশু ঘরামির আদুড় শরীর ঘামে ভিজে গিয়ে চকচক করে। বুড়ো বটের মাথার দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় দাশু, একটা হরিয়াল ঘুঘুর ছায়াও কোথাও উশখুশ করে না।

ঝোপঝাপও কত ফাঁকা হয়ে গিয়েছে! এক কণা ধুলোও নেই। শুধু কাঁকর আর কাঁকর, আর ভোঁতা ভোঁতা কালো পাথরের ধড়। মাঝে মাঝে ঘেসো সবুজের ছোট ছোট ছিটা দেখা যায়। শাওনের জলে ধোয়া হয়ে পরিষ্কার কাঁকরগুলি ঝকঝক করে ; দাশুর পায়ের চাপে করকর করে বাজে।

ফণী-মনসার চেহারাও কত ফ্যাকাসে ; উইঢিবির সঙ্গে জড়াজড়ি করে পড়ে আছে এক একটা ঝোপ। বাঘভেরেণ্ডার পাতায় মাকড়সার ছেঁড়া জাল সাদা জটার মত গুটলি পাকিয়ে পড়ে আছে। ময়না কাঁটার শুধু কাঁটা আছে, পাতা প্রায় নেই। এই শাওনের জলেও সবুজ হয়ে ওঠে নি ঝোপগুলি। ছাগলা-হরিণ ধরবার আশা ছেড়ে দেয় দাশু। এখানে ছাগলা-হরিণ থাকতে পারে না।

কিন্তু খরগোশও কি নেই? ঝোপঝাপে এত গর্ত ; এই সবই যে খরগোশের গর্ত। কিন্তু কই? এতক্ষণ ধরে তাক করে পাথরের আড়ালে বসে আছে দাশু, তবু গর্তের মুখ থেকে একটাও খরগোশের মুখ উঁকি দিয়ে তাকাল না কেন? সবই কি হুড়পা বানের শব্দ শুনে ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছে? কিংবা, এই রুক্ষ আর শুকনো ডাঙাটাকে ঘেন্না করে চলে গিয়েছে?

শক্ত করে ধনুকটাকে এক হাতের মুঠোয় আঁকড়ে ধরে, আর এক হাতে একটা তীর দোলাতে দোলাতে আবার ঝোপঝাপের যত ছায়া আর যত রন্ধ্রের দিকে অপলক চোখের জ্বালাময় পিপাসা ছুঁড়ে দিয়ে ঘুরতে থাকে দাশু। একটা গর্তের কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়। এক গাদা শুকনো পাতা জড়ো করে গর্তের মুখে ফেলে দিয়ে আগুন ধরায়। পোড়া পাতার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ; চাপ-চাপ ধোঁয়া হেলেদুলে ভাঙে আর ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বৃথা।

গর্তের মুখ থেকে কোন আতঙ্কিত খরগোশের মূর্তি হুট করে বের হয়ে আসে না। ধোঁয়ার জ্বালা লেগে দাশুরই চোখ দুটো জ্বলতে থাকে।

বেলা বাড়ে। দাশুর চোখ দুটো ঠিক দিনের বেলার নেকড়ের মত হিংসুটে ক্ষুধার জ্বালায় কুঁচকে শীর্ণ হয়ে চারদিকের যত ঝোপঝাপের ছায়ার দিকে তাকায়। দাশুর ছায়াটাও যেন লোভী জানোয়ারের মত ঝোপঝাপের গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঘুরতে থাকে। এত বড় ডাঙার মধ্যে কি একটাও মাংসল প্রাণ কোথাও লুকিয়ে নেই? না থাকলে চলবে কি করে? দাশুর জীবনের স্বপ্ন যে উপোসের জ্বালায় চুপসে মরে যেতে বসেছে!

ডাঙার এদিকে ওদিকে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে নীরব ঝোপগুলিকে জখম করে ছুটতে থাকে দাশু। তারপর ক্লান্ত হয়ে একটা উইঢিবির কাছে বসে পড়ে ধুঁকতে থাকে।

কিন্তু বসে থাকতে পারে না। উইঢিবির ধুলো গায়ের ঘামের সঙ্গে জড়িয়ে কাদা হয়ে যায়। দাশুর চেহারাও একটা আহত জানোয়ারের মত দেখায়। আবার ডাঙার ঝোপঝাপের সব ছায়া আর সব গর্তের দিকে চোখ রেখে এদিক থেকে ওদিকে ছুটতে থাকে দাশু।

হঠাৎ চমকে ওঠে, থমকে দাঁড়ায় দাশু। দাশুর ঘামে-ভেজা মুখের উপর যেন এতক্ষণে সফল স্বপ্নের আশীর্বাদ ঝরে পড়েছে। সাদা দাঁতের দুই পাটি ঘষা খেয়ে আস্তে একটা শব্দ করে ওঠে, যেন সাদা হাসির উল্লাস ঠিকরে পড়ে।

একটা খরগোশ। বেশ বুড়ো হয়েছে খরগোশটা। মাথার রোঁয়া অনেকখানি ঝরে পড়ে গিয়েছে। একটা পা খোঁড়া। চোখের কোণে পিঁচুটি। বুড়ো খরগোশটা ফণী-মনসার ছায়ার

কাছে মরা ঘাসের মূল খুঁড়ে খুঁড়ে বের করছে, আর সামনে দু পায়ের ছোট দুটি থাবা দিয়ে তুলে ধরে খাচ্ছে। এত বড় ডাঙার ঝোপঝাড়ের মধ্যে বোধ হয় এই বুড়ো খরগোশটাই একলা পড়ে আছে ; ডরানির বানের শব্দ শুনেও পালিয়ে যেতে পারে নি।

ধুলোতে হাত ঘষে নিয়ে হাতের ঘাম মুছে, ধামনকাঠের ধনুকে একটা টোকা দিয়ে আর তীর জুড়ে দিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়ায় দাশু। কিন্তু বৃথা, সেই মুহূর্তে এক লাফ দিয়ে ফণী-মনসার ঝোপের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল খরগোশটা।

কিন্তু যাবে কোথায়? হেসে ওঠে দাশু। বুড়ো খরগোশের পেটও ক্ষিদেয় জ্বলছে যে, নইলে মরা ঘাসের মূল খাবে কেন? বের হয়ে আসতেই হবে, আর কতক্ষণই বা কোন্ গর্তে লুকিয়ে থাকতে পারবে?

ধনুকে তীর জুড়ে আর নিথর হয়ে একঠায় দাঁড়িয়ে থাকে দাশু। দাশুর চোখের চাহনিটাও যেন লালায় ভরে গিয়ে চকচক করে। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট দুটোকে চেটে চেটে ভিজিয়ে তোলে দাশু।

বেলা বাড়ে। দাশুর চোখের আশাও ক্লান্ত হয়ে যেন নেতিয়ে পড়ে। আবার সরে গিয়ে অন্য দিকে তাকায় দাশু। মরিয়া হয়ে ছুটতে থাকে। হ্যাঁ, সেই বুড়ো খরগোশটাই এতক্ষণ বাঘভেরেণ্ডার ছায়ার কাছে সবুজ ঘাসের একটা ছিটার কাছে বসে ছিল ; দাশুর ছায়া দেখতে পেয়েই দৌড় দিয়েছে।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছুটছে বুড়ো খরগোশ। তীর চালায় দাশু। কিন্তু খরগোশটার খাড়া কান দুটো কী ভয়ানক চতুর। কান দুটো দিয়ে মাথা ঢেকে আর মাথাটাকে চকিতে নামিয়ে দিয়ে একটা ঝোপের ভিতরে লাফ দিয়ে পড়ল খরগোশটা। ডাঙার পাথরের উপর মিছা আছাড় খেয়ে পড়ে তীরটা দু টুকরো হয়ে ভেঙে গেল।

কিন্তু সেই ঝোপের কাছে একটা লাফ দিয়ে এগিয়ে যায় দাশু। আবার ধনুকে তীর জুড়ে দিয়ে ছটফট করে লাফাতে আর হাঁপাতে থাকে। কিন্তু কই? ঝোপের ভিতরে কোন ভীরু খরগোশ মুখ গুঁজে পড়ে নেই। পালিয়েছে ধূর্ত ঠগটা। দাশু ঘরামির ক্ষুধার লালা আর জ্বালার সঙ্গে যেন ঠাট্টার খেলা খেলে বেড়াচ্ছে খরগোশটা।

আবার সরে যায় দাশু। চলতে চলতে একটা গর্তের কাছে থমকে দাঁড়ায়। গর্তের মুখের কাছে যেন এইমাত্র হালকা ধুলো উড়েছে ; তারই রেশ এখনও রয়েছে। দাশুর সারা মুখ জুড়ে আবার একটা আশাময় সন্দেহের হাসি থমথম করে। বাঘভেরেণ্ডার আগডালের কচি পাতা ছিঁড়ে নিয়ে এসে গর্তের মুখের কাছে ফেলে দিয়ে একটু আড়ালে সরে দাঁড়ায় দাশু। ধনুকে তীর জুড়ে দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁপাতে থাকে।

বিকালের আলো লাল হয়ে এসেছে। আকাশের দিকে চোখ পড়তেই দুরু দুরু করে কেঁপে ওঠে দাশুর কাদাটে ঘামে পিচ্ছল হয়ে যাওয়া বুকটা। ওই খরগোশটাকে বিঁধে নিয়ে ঘরে ফিরতে হবে ; কিন্তু সময় যে আর বেশি নেই। কখন্ বের হবে খরগোশটা?

আশায় রঙীন হয়ে চমকে ওঠে দাশুর চোখ। গর্তের ভিতর থেকে মুখ বের করে কচি পাতার উপর ছোট থাবা এগিয়ে দিয়েছে খরগোশটা। তীর ছাড়ে দাশু। কিন্তু বৃথা। খরগোশটা মাথা কাত করে একটা লাফ দিয়ে গর্তের মুখ থেকে বের হয়েই দৌড় দেয়। দাশুর তীর গর্তের মুখের কাছে আছাড় খেয়ে পড়ে এক মুঠো ধুলো উড়িয়ে আর তিনখান হয়ে ভেঙ্গে যায়।

বুড়ো খরগোশের তিন পায়েও এত জোর ছিল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছুটলেও কত জোরে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে যাচ্ছে। দাশুও যেন ওর প্রাণ মন ও শরীর এক উদ্দাম লোভের নেশায় মাতিয়ে নিয়ে খরগোশটার পিছু পিছু ধাওয়া করে ছুটতে থাকে।

একটা পরিষ্কার পাথরের উপর বসেছে খরগোশটা। খোঁড়া পায়ের ধুলো চাটছে।

জিরোচ্ছে ; হ্যাঁ, জিরোতে থাকুক। দাশুও একটা পাথরের আড়ালে হাঁটু পেতে বসে, আর খরগোশটার দিকে অপলক চোখের নজর রেখে হাঁপধরা বুকের ধড়ফড়ানি একটু জুড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে। এইবার খুব সামলে, খুব সাবধানে, শেষ তীরের মরণবিঁধ ছুঁড়তে হবে।

খরগোশটা বুড়ো হলেও খুব ডাগর। কিন্তু মুড়োটা ফেলে দিতেই হবে, ঘা আছে মাথায়। পিছনের টেংরি দুটো পল্টনী দিদিকে দিলে দু সের হাঁড়িয়া পাওয়া যাবে নিশ্চয়। পল্টনী দিদির ঘরে আগে তো সব সময় হাঁড়িয়া জমা থাকত। এখনও কি নাই? আছে নিশ্চয়।

খরগোশের মাংস তেঁতুল-ঝাল দিয়ে শাকপাতার সঙ্গে রাঁধলে স্বাদ ধরে ভাল। যদি বেলা থাকে, তবে কোনারের কচি পাতা যোগাড় করতে পারা যাবে। একটু দূরে যেতে হবে ; ওই ওদিকে, হোই পশ্চিমের টাঁড়ের দিকে, যেখানে অনেকগুলি কোনার গাছ সেদিনও দেখতে পেয়েছে দাশু। এক হাঁড়ি গরম গরম শাকমাংস আর পাঁচ চুমুক হাঁড়িয়া। খুশি হবে না কি মুরলী? হেসে ফেলবে না কি মুরলী?

দু কান খাড়া করে আকাশপানে তাকিয়েছে খরগোশটা। মরা বিকালের ছায়া-ছায়া আলো আর লালচে আভা মেখে টুকটুক করছে খরগোশটার লাল চোখ। দাঁতে দাঁতে চেপে তীর ছাড়ে দাশু।

বিঁধেছে। তীরটা যেন একটা গোঁ ধরে ছুটে গিয়ে খরগোশটার পেটে লেগেছে। তীর-গাঁথা হয়ে বুড়ো খরগোশের ধড় একটা ডিগবাজি খেয়ে পাথরের উপর থেকে ছিটকে পড়ে গিয়েছে। ধামনকাঠের বাঁক হাতে তুলে লাফাতে লাফাতে ছুটে আসে দাশু। পাথরটার উপর উঠে দাঁড়ায়।

সেই মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে পাথরটারই মত প্রাণহীন একটা নিরেট কালো চেহারা নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে, যেন একটা নির্মম শূন্যতার দিকে তাকিয়ে থাকে দাশু। নেই, কিছু নেই। পাথরের ওপারের কাদার ওপরে শুধু কয়েক ছিটে রক্তের দাগ। খরগোশের ধড়টা খাতের জলের ভিতর পড়েছে আর স্রোতের টানে উধাও হয়ে গিয়েছে।

বানভাসির জল ফিরতি টানে হুড়মুড় করে খাত ধরে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে। দাশু ঘরামির মাগ ছেইলা ঘর জমি আর গুলঞ্চের বেড়া, সব গুঁড়ো হয়ে আর হুড়মুড় করে ভেসে গড়িয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে। জলের শব্দ যেন একটা হিংস্র ঠাট্টার গান। চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকে দাশু।

কাঁপতে থাকে দাশু। গায়ের সব ঘাম শুকিয়ে যায়। ঠোঁট দুটো মরা গাছের পাতার মত শুকিয়ে কুঁকড়ে যায়। মধুকুপির আকাশে সন্ধ্যার কালো ছায়াও সিরসির করে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

ধামনকাঠের বাঁকের উপর ভর দিয়ে চলতে থাকে দাশু। ঘরে ফিরতে গিয়ে দাশুর অন্তরাত্মা যেন আহত জানোয়ারের মত জখম হয়ে টলছে। পাকুড়তলা পার হবার সময় পথের মাটির উপর ধপ করে একবার বসেও পড়ে ; অনেকক্ষণ বসেই থাকে দাশু। দাশু ঘরামির হাতের শেষ তীরটা যেন দাশুর ভাগ্যটাকে বিঁধে রক্তাক্ত করে দিয়ে বানভাসির জলের ফিরতি টানে ভাসিয়ে দিয়েছে।

পুরনো জামকাঠের দরজার কাছে ডাকতে গিয়েই ফুঁপিয়ে ওঠে দাশু ঃ জলদি আমাকে এক ঘটি ঠাণ্ডা জল দে, মুরলী।

দরজা খোলে মুরলী। এক ঘটি জল এনে দাশুর হাতে তুলে দেয় ; আর রেড়ির তেলের মেটে বাতির পলতে উসকে দিয়ে দাশুর মুখের দিকে একবার তাকায়।

মুরলীর মুখের দিকে তাকাতে বুক কাঁপে দাশুর। দু হাঁটুর উপর মাথা পেতে খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর নিঝুম হয়ে বসে থাকে।

জানে না দাশু, অনুভব করবারও শক্তি বোধহয় নেই, কত রাত হয়েছে। হঠাৎ মনে হয়,

ঘরটাই টলমল করে নড়ে উঠেছে। কিন্তু পরমুহূর্তে বুঝতে পারে, দাশুর মাথাটাকে একটা ঠেলা দিয়ে তুলে ধরেছে মুরলী। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় দাশু ঃ কি?

মুরলী বলে—আমাকে আবার কি শুধাতে চাও? তুমি বল।

দাশু—কি বলবো বল?

মুরলী—তুমি কি ভেবেছো? নিজে মরবে, আমাকে মরাবে আর আমার ছেইলাটাকেও মরাবে?

—না মুরলী, না। কখনো না। এমন কথা বলিস না। মুরলীর একটা হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে দাশু।

হাত ছাড়িয়ে নেয় মুরলী। মুরলীর শুকনো মুখের উপর কি-ভয়ানক ঘৃণার জ্বালা ছটফট করছে। কালো চোখের তারা দুটো ধিকধিক করছে। চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী—আমার ছেইলাকে বাঁচাতে পারবে না যে, সে আমার মরদ কেন হবে?

চুপ করে মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে দাশু। একটা বোবার মুখ, একটা বধিরের চোখ।

আবার চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী—মধুকুপির কিষাণের আর সে জোর নাই।

ও কি? কিসের শব্দ? জামকাঠের দরজায় কে যেন হাত বুলিয়ে আস্তে আস্তে শব্দ করছে। আস্তে আস্তে ডাকছে—সরদার ভাই আছ কি হে?

চমকে ওঠে দাশু। আশ্চর্য হয়ে দরজার দিকে ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে থাকে মুরলী।

আবার ডাক ; শান্ত স্নিগ্ধ ও মায়ানিবিড় একটা আহ্বানের স্বর—আছ কি হে সরদার?

দাশু ঘরামির মুমূর্ষু অস্তিত্ব যেন নতুন প্রাণ পেয়ে জেগে ওঠে। লাফ দিয়ে উঠে, ঘরের দরজা খুলে বাইরের দাওয়ার উপর এসে দাঁড়ায় দাশু।

দাওয়ার উপর দাঁড়িয়ে আছে যে আগন্তুক, তার এক হাতে একটা বড় লাঠি, আর এক হাতে একটা হাঁড়ি, আর কাঁধের উপর ছোট একটা কম্বল।

শব্দ না করে গুঁড়ো গুঁড়ো নরম বৃষ্টি ঝরে পড়ছে। আকাশে আবার শাওনে মেঘ জমেছে। বিদ্যুতের ঝিলিক খেলছে আকাশে। আগন্তুকের মুখটা দেখতে পেয়েছে দাশু।

এগিয়ে এসে আগন্তুকের হাত ধরে চেঁচিয়ে ওঠে দাশু—ভঁইসাল, তুমি কোথা থেকে এলে ভাই?

ভঁইসাল হাসে ঃ যেথা থেকেই আসি না কেন, তোমার কাছেই তো এলাম!

দাশু—কেন?

ভঁইসাল এইবার গলার স্বর নরম করে নামিয়ে নিয়ে ফিসফিস স্বরে যেন আবেদন করে ঃ টাকা নিবে সরদার?

ভঁইসালের হাত ধরে ছটফট করে দাশু ঃ হ্যাঁ ভাই, টাকা চাই। কিন্তু বেশি চাই না।

ভঁইসাল—হাঁ হাঁ, সে তো ঠিক কথা। জমি কিনবে, নতুন ঘর বানাবে, মাগ-ছেইলাকে খাওয়াবে, পূজা-পরব করবে, করম নাচবে, এই তো?

দাশু—হ্যাঁ ভাই।

ভঁইসাল—তবে এসো।

দাশু—কোথায় যেতে বলছো হে?

ভঁইসাল—আমার সাথে এসো।

দাশু—টাকা?

ভঁইসাল—টাকা আজই পাইয়ে দিব, এসো।

মেঘে ভরাট আকাশ আর বিজলী হানে না ; শুধু গরগর করে। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া

ছুটে বেড়ায়। গুঁড়ো বৃষ্টির ঝরানি বাতাসের এক-একটা আচমকা ঝাপটায় এলোমেলো হয়ে যায়। জমাট অন্ধকার কিন্তু একটুও কাঁপে না।

আকাশ বাতাস আর মাটি একসঙ্গে তাল পাকিয়ে কালো হয়ে গিয়েছে। পথের কাদা যেন পচা-পচা কালো মাংস ; পথের জল ঠাণ্ডাঠাণ্ডা কালো রক্ত। পথ চলতে চলতে দাশুর কানের পাশে ফিসফিস করে হাসে গুপী লোহার ঃ আঃ, বড় মিঠা রাত সরদার!

দাশু বলে—একটুক জিরাতে হয় ভঁইসাল।

—জিরাবে? আশ্চর্য হয় গুপী।

—হ্যাঁ। হাঁপ ছাড়ে দাশু।

—পিয়াস লেগেছে? প্রশ্ন করে গুপী।

—হ্যাঁ। একটা গাছের তলায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে দাশু, আর হাঁপাতে থাকে।

দাশুর হাতের কাছে হাঁড়িটাকে এগিয়ে দিয়ে হেসে ফেলে গুপী ঃ নাও সরদার, দম তক পিয়াস মিটিয়ে নাও।

এক চুমুকে হাঁড়ির প্রায় অর্ধেক খালি করে দিয়ে আবার হাঁপ ছাড়ে আর হেসে ওঠে দাশু ঃ বাঃ, বড় ডাল মাল। আবগারী জল বটে কি?

গুপী—আবগারী জলে কি এত তেজ আর ফুরতি থাকে রে ভাই? এটা ঘরের চোলাই বটে ; আধা মেওয়া আর আধা মহুয়া।

দাশু—মজাদার বাস পেলাম যেন।

গুপী—হ্যাঁ রে ভাই ; মৌরির রস দিয়ে মজালে মালের বাস এমনটি মিঠা হয়ে থাকে।

দাশু—কোথা থেকে পেলে?

গুপী হাসে ঃ জামুনগড়ায় আমার একটা ভক্ত আছে ; সে বেটা দিলে।

দাশুর বুকে আর হাঁপ ধরে না। আর এক মুহূর্তও জিরিয়ে নেবার দরকার হয় না। গুপীর নিঃশ্বাসের শব্দের সঙ্গে নিজেরও বুকের উতলা বাতাসের শব্দ মিশিয়ে দিয়ে আর প্রায় ছুটে ছুটে চলতে থাকে।

সড়ক ছেড়ে দিয়ে বাঁ দিকের ডাঙার উপর নামে গুপী। এইবার গুপী একটা হাঁফ ছাড়ে আর হাঁড়িটাকে মুখের কাছে তুলে নিয়ে চুমুক দেয়। তার পরেই হেসে ওঠে ঃ একটা কথা শুধাই সরদার?

দাশু—কি কথা?

গুপী—সরদারিন তোমাকে এত ডাঁটে কেন?

দাশু—কে বললে?

গুপী হাসে ঃ দরজার কান পেতে সব শুনেছি।

দাশু—তবে আর শুধাও কেন?

—কদিন খাও নাই?

—দুই দিন।

—সরদারিনও কি খায় নাই?

—না।

—সরদারিনের পেটে ছেইলা আছে কি?

—হ্যাঁ।

ধমকের সুরে আক্ষেপ করে গুপী—ছি ছি, তুই বড় দুখী বটিস সরদার।

উত্তর না দিয়ে চুপ করে শুধু শুনতে থাকে দাশু। তারপর ব্যস্ত হয়ে বলে—চল ভাই।

গুপী লোহার যেন দাশুর এই যন্ত্রণাক্ত ব্যস্ততার তাড়া তুচ্ছ করে আর আনমনা হয়ে একটা স্বপ্নালু আরামের আবেশে গা ঢেলে দিয়ে ডাঙার ঘাসের উপর বসে পড়ে আর নিঝুম

হয়ে যায়। তারপর হাঁড়িতে চুমুক দিয়ে নিয়ে ঢেঁকুর তোলে।—তোমার ঘরটি বড় ভাল ঘর, সরদার। ফিসফিস করে গুপী।

দাশুও চুপ করে বসে দু' চোখের মিঠা-মিঠা নেশার জ্বালা নিয়ে ডাঙার অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে।

গুপী—তোমার ঘরণীও বড় ভাল। চোখ দুটা বড় মিঠা।

আবার যেন নিঝুম হয়ে যায় গুপী। আবার মুখে হাঁড়ি ঠেকিয়ে আর একচুমুক মাদকতার আরাম টেনে বুক ভরে নিয়ে আবার বিড় বিড় করে—তোমার ছেইলাটাও বড় সুন্দর ছেইলা হবে হে।

দাশু বলে—আর কত জিরোবে?

গুপী তবু যেন আনমনার মত বিড়বিড় করে একটা নেশালস তন্দ্রার সঙ্গে কথা বলতে থাকে ঃ বড় ভাল হবে। তোমার খুব সুখ হবে। নিজের মাগ, নিজের ছেইলা, নিজের ঘর, নিজের জমি! তুমি বড় চালাক বট সরদার।

বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে দাশু—উঠ ভাই।

—কেন?

—আমাকে টাকা পাইয়ে দিবে না?

হেসে ফেলে গুপী ঃ দিব। হাতির দাঁতও ভাঙে সরদার ; কিন্তু গুপী লোহারের বাত ভাঙ্গে না।

ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায় গুপী লোহার। কম্বলের ভাঁজের ভিতর থেকে দুটো হেঁসো বের করে।—এই নাও, ধর।

দাশুর হাতের কাছে একটা হেঁসো এগিয়ে দেয় গুপী লোহার। আর দাশুও যেন অদ্ভুত এক জ্বালাময় ভক্তির নেশায় লুব্ধ হয়ে গুপী লোহারের সেই হিংস্র দীক্ষার শাণিত হাতিয়ার শক্ত করে আঁকড়ে ধরে।

—চল। হাঁক দেয় গুপী লোহার। গুপী লোহারের সঙ্গে প্রায় ছুটে ছুটে হাঁটতে থাকে দাশু।

এক ক্রোশ শেষ হবার আগেই ডাঙা শেষ হয়। মাটির উপর পা ঘষে আর একটু আশ্চর্য হয়ে দাশু বলে—এটা কেমন ডহর বটে?

—এটা রেল-লাইন। চল।

আবার চলতে থাকে গুপী লোহার। পিছু পিছু দাশু। দু পাশে সরকারী শালবন, মাঝখান দিয়ে নতুন রেল-লাইন। জঙ্গল ভেদ করে কে জানে কোন্ দিকে চলে গিয়েছে নতুন রেল লাইন? এদিক ওদিক তাকিয়ে আকাশের অন্ধকারের দিকে চোখ বুলিয়ে বুঝতে পারে দাশু, বড়কালুর হরতকীর জঙ্গল আর পাথরের চটান খুব কাছেই রয়েছে। বড়কালুর গা বেয়ে বর্ষাজলের হাজার ঝরণা ঝরে পড়ছে, তারও শব্দ শোনা যায়।

চলতে চলতে আবার আশ্চর্য হয় দাশু। একটু দূরে, এই সরকারী শালবনের মাথার উপর যেন একটা আভা থমকে রয়েছে। বৃষ্টিতে ভেজা জঙ্গলটাও কি আগুনে পুড়ছে?

তারপর আর বেশিক্ষণ নয় ; আর খুব বেশি দূর এগিয়ে যেতেও হয় না ; দাশু যেন একটা নতুন জাদুর বিস্ময় সহ্য করতে গিয়ে ভয় পেয়ে গুপী লোহারের একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে, আর থমকে দাঁড়ায় ঃ কোথায় এলাম?

গুপী লোহার বলে—চুপ থাক।

বড় বড় খুঁটির উপর বড় বড় আলো। সারি সারি টিনের শেড। থাক দিয়ে সাজানো বড় বড় কাঠের স্তূপ। এখানে ইঁটের আর ওখানে কাটা পাথরের এক একটা গাদা। হাতির মত এক-একটা বয়লট এখানে ওখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। শত রকমের সরঞ্জাম আর

কলকজা বড় বড় ঠাঁই জুড়ে পড়ে আছে। তিরপাল ঢাকা দিয়ে গুঁড়ো বৃষ্টির ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে এক একটা কল এখানে-ওখানে যেন ঘুমিয়ে রয়েছে।

আস্তে আস্তে, শালের ছায়ার আড়াল দিয়ে পা টিপে পিটে হাঁটতে থাকে গুপী লোহার। পা টেনে টেনে চলতে থাকে দাশু। লাইনের পাশে একটা খাতের অন্ধকারের মধ্যে নামে গুপী লোহার, পিছু পিছু দাশু। উঁকি দিয়ে শুধু চোখ দুটোকে ভাসিয়ে দিয়ে দূরের একটা টিনের একচালার দিকে তাকিয়ে থাকে গুপী লোহার।

—কি দেখছো ভঁইসাল? দাশু চাপাস্বরে কথা বলে।

গুপী লোহার বলে—আছে।

—কে?

—হোই যে লাল কম্বল।

দেখতে পায় দাশু, টিনের একচালার ভিতরে শান বাঁধানো মেজের উপর ছড়িয়ে রয়েছে শত শত কাঠের বাক্স ; কে জানে কোন্ মালে ভরে আছে বাক্সগুলি। সেই সব বাক্সের সারির ফাঁকে ফাঁকে শুয়ে আছে মানুষ ; একটা দুটো নয়,অনেক। হাত-পা গুটিয়ে ছোট ছোট মড়ার মত অসাড় হয়ে পড়ে আছে ঘুমন্ত মানুষগুলো ; কুলি-মজুর বলে মনে হয়। হ্যাঁ, লাল কম্বলে ঢাকা হয়ে একটা মানুষও ঘুমিয়ে পড়ে আছে।

দাশু—লাল কম্বলটা কে বটে?

গুপী—ঠিকাদার বটে। কুলিদিগকে কাল সকালে হপ্তা দিবে শালা। শালার মাথার কাছে টাকার থলি আছে।

—ভঁইসাল ভাই। ডাকতে গিয়ে কেঁপে ওঠে দাশুর গলার স্বর।

—কি বটে? রুক্ষ স্বরে ফিসফিস করে গুপী লোহার।

—টাকা চাই না। ফুঁপিয়ে ওঠে দাশু।

—কি? গলার স্বর চেপে আস্তে একটা ধমক হানে গুপী লোহার।

ধপ করে বসে পড়ে দাশু। গুপী লোহারের পায়ে হাত রেখে আর গলার স্বর ঠকঠকিয়ে অসহায়ের মত যেন আবেদন করে—টাকা চাই না।

দাশুর পিঠে হাত বুলিয়ে যেন স্নেহার্দ্র স্বরে কথা বলে গুপী লোহার।—কেন মিছা গোলমাল করছো?

—মাপ কর ভাই।

—আমি নিজেকেই মাপ করি না, তোমাকে মাপ করবো কেমন করে? উঠ, যাও, চুপচাপ এগিয়ে যাও ; আস্তে কম্বলটা ঠেলে দিবে, মুখটাকে চেপে ধরবে, আর হাঁসুয়া দিয়ে টুঁটির উপর তিনটা ঘষা মেরে, টুঁটির নলীটা ছিঁড়ে দিয়ে...।

—না না, কভি না। কাঁপতে থাকে দাশুর গলার স্বর।

দাশুর মাথায় হাত বুলিয়ে গুপী লোহার বলে—কথা শুন, সরদার ; ওর মাথার কাছে হাত চালালেই টাকার থলিটা পেয়ে যাবে। এত বড় থলি সরদার!

—আমাকে আর এসব কথা বলো না।

—কেউ জেগে নাই সরদার। কেউ দেখতে পাবে না। সব শালা চৌকিদারের বাচ্চা ঘুমে বেহুঁশ হয়ে আছে।

—আমি ঘরে ফিরে যাই।

—আমি তোমার নিকট খাড়া থাকবো সরদার। কোন শালা তোমার পানে এসেছে কি আমি ওর খবর নিয়ে ছেড়েছি।

—না।

—কেন?

—মানুষ মারতে বলো না।

—মানুষ? মারতে বলছে কে তোমাকে? ওটা যে ঠিকাদার বটে!

—ওর প্রাণ তো মানুষেরই প্রাণ বটে?

—সাপের প্রাণ বটে। সাপ সাপ! সাপের যেমন বিষ থাকে, ওর তেমন টাকা আছে।

দাশু করুণভাবে হাসে ঃ তবে আর বিষ ছিনিতে বল কেন?

গুপী লোহারও হাসে ঃ ওর বিষ বটে, কিন্তু তোমার যে ওষুধ বটে গো। সাপের বিষ ছিনে নিয়ে ওষুধ করতে হয়। দেখ নাই ওঝারা কি করে?

দাশু উঠে দাঁড়ায় ঃ না ভাই।

হাতের হেঁসোর-ছুঁচালো মুখটাকে দাশুর বুকের উপর চেপে ধরে, রুষ্ট নিঃশ্বাসের ঝাঁজ দাশুর মুখের উপর ছড়িয়ে দিয়ে গুপী লোহ'র বলে—চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক। তুমি না পার, আমি টাকা আনছি।

—না, আমি টাকা নিব না।

—নিতে হবে। তুই শালা তোর মাগ-ছেইলাকে মারবি কেন রে? তুই নিজে ভুখা গরুর মত হেঁপে মরবি কেন রে?

গুপী লোহারের গলার স্বর কাঁপতে কাঁপতে ফুঁপিয়ে ওঠে। যেন গুপী লোহারের একটা স্বপ্নের আহ্লাদ পুড়ে গিয়ে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। উন্মত্তের মত হাত-পা ছুঁড়ে দাশুর পিঠে বুকে ও পেটের উপর ঘুষি চড় আর লাথি ছুঁড়তে থাকে গুপী। খাতের ভেজা মাটির উপর গড়িয়ে পড়ে যায় দাশু।

গুঁড়ো ঝরানি নয়, বেশ জোরে শব্দ করে আর ঝরঝর করে ঝরে পড়ছে বৃষ্টি। হাঁপাতে থাকে গুপী লোহার।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় দাশু। পাথরের পাটার মত বুক, শক্ত আর দুরন্ত পেশী দিয়ে তৈরী সেই দাশু, সেই মজবুত কিষাণ। দাশু কিষাণের ওই দুই হাত ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তে ক্ষিপ্ত হয়ে গুপী লোহারের মাথাটাকে থেঁতলে দিয়ে জিভটাকেও একটানে উপড়ে ফেলে দিতে পারে। একটা লাফ দিয়ে গুপীর সামনে এগিয়ে আসে দাশু।

দু' হাত দিয়ে গুপী লোহারের হাত দুটোকে যেন অদ্ভুত এক আদরের আবেগে কাছে টেনে নিয়ে দাশু বলে—তোমার হাতে মার খেতে আমার লাজ নাই। তোমাকে দুখ দিলাম, তুমি মারবে না কেন? দশবার মারবে।

গুপী লোহারের দু'চোখে একটা হিংস্র বিস্ময় করুণ হয়ে ছলছল করে। দাশুর মুখের কাছে চোখ নিয়ে দেখতে থাকে। তার পরেই হাতের হেঁসোর উপর ফুঁ দিয়ে হেঁসোটাকে শক্ত করে চেপে ধরে দোলাতে দোলাতে ছটফট করে গুপী ঃ কিন্তু টাকা তোমাকে নিতেই হবে সরদার। টাকা দিয়ে ছাড়বো আমি।

—না ; দয়া কর ভাই।

—না, কোন দয়া নাই। তুমি থাক, আমি এখনই আসছি।

ছুটে চলে যায় গুপী লোহার। গুপী লোহারের ছুটন্ত ছায়ার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই চোখ বন্ধ করে দাশু। আর, চোখ মেলতেই দেখতে পায়, টিনের একচালার মেঝের উপর সেই লাল কম্বলের কাছে পৌঁছে গিয়েছে গুপী লোহার।

কেঁপে ওঠে দাশুর বুক। খাতের ভিতর থেকে একটা লাফ দিয়ে বের হয়ে শালবনের অন্ধকারের দিকে তাকায়। ছটফট করে পা দুটো। এই জল, এই কাদা, আর বৃষ্টির এই ঝরানি যেন একটা গলাকাটা যন্ত্রণার রক্তে লাল হয়ে দাশুর হাড়মাস গুলে ফেলছে। হাঁটু দুটো টলমল করছে। টান হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে টলতে থাকে দাশু। পালিয়ে যাবার জন্য দৌড়তে চায় দাশু, কিন্তু দৌড়তে পারছে না।

চমকে ওঠে দাশু। একটা ছায়া ছুটে এসে দাশুর পাশে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে কাশে ঃ চল সরদার।

—কি করলে ভঁইসাল? কাঁপতে কাঁপতে যেন কান্না চেপে প্রশ্ন করে দাশু।

টাকার থলিটাকে দাশুর পিঠের উপর আছাড় মেরে একবার বাজিয়ে দিয়ে গুপী লোহার আবার কাশে। গুপী লোহারের গলায় যেন রক্তমাখা একটা হাসির শ্লেষ্মা ঘরঘর করে ঃ সাপের বিষ ছিনে নিয়ে এলাম।

দাশু—সাপটার কি করলে?

গুপী লোহার—বাপের বাড়ি রওনা করিয়ে দিলাম।

—কি বললে? দাশুর নেশার বুক খুব আস্তে আর্তনাদ করে ওঠে।

হেসে ফেলে গুপী লোহার ঃ একদিন তুমিও যাবে আর আমিও যাব সরদার, চিন্তা কর কেন?

রক্তমাখা হেঁসোটাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দাশুর পিঠে একটা ধাক্কা দেয় গুপী লোহার ঃ চল।

আর নতুন রেল-লাইন ধরে নেয় ; শালবনের ভিড়ের ভিতর দিয়ে, সরু সরু খাত ধরে, জলকাদা মাড়িয়ে আর বৃষ্টির অঝোর ধারায় যেন একটা ছুটন্ত স্নানের ভয়ানক পুণ্যে গা ভিজিয়ে, হন্ হন্ করে হেঁটে যেতে থাকে গুপী লোহার আর দাশু।

বৃষ্টির ঝরানি থেমে যায়। আবার বৃষ্টির গুঁড়ো উড়তে থাকে। আকাশের দিকে চোখ তুলে গুপী বলে—রাত আর বেশি নাই।

কথা বলে না দাশু। গুপী লোহার বলে—ডহর ভুল করো না সরদার।

না, ডহর ভুল করে না দাশু। হরতকীর জঙ্গলটা যখন ধরতে পারা গিয়েছে তখন সেই শুকনো ডাঙার কিনারায় গিয়ে পৌঁছতে কোন ভুল হবে না। পৌঁছতে কতক্ষণই বা লাগবে?

হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় গুপী লোহার ঃ তোমার হিস্যা তুমি এখনই নিয়ে নাও সরদার।

সেই মুহূর্তে যেন এক ঝলক ঠাণ্ডা আগুনের আভা গুপী লোহার আর দাশুর মুখের উপর এসে আছড়ে পড়ে। চোখ ধাঁধানো কটকটে আভা। ক্ষণিকের মত অন্ধ হয়ে আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে গুপী লোহার আর দাশু।

দাশুর কানের কাছে ছোট্ট একটা চিৎকার আছড়ে দিয়ে ছটফট করে ওঠে গুপী লোহার ঃ পালাও, জলদি পালাও।

সঙ্গে সঙ্গে বুনো অন্ধকারের বুকটা যেন প্রচণ্ড আর্তনাদ করে ফেটে গেল। বন্দুকের শব্দ। গুলিটা ছুটে এসে ঠিক দাশুর পায়ের কাছে মাটিতে বিঁধেছে। কেঁপে উঠল মাটি।

চোখ মেলতে চেষ্টা করে দাশু, কিন্তু পারে না। সেই চোখ-ধাঁধানো আলোটা যেন দাশুর চোখের উপর কামড় দিয়ে ঝুলে রয়েছে।

—ভঁইসাল! বিড়বিড় করে ডাকে দাশু। কিন্তু কোন সাড়া শুনতে পায় না। গাছের গায়ে হেলান দিয়ে মরা গাছের মত পড়ে থাকে। আর, সেই বুনো অন্ধকারের ভিতর থেকে একটা বন্দুকের নল আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে ঠিক দাশুর বুকের কাছে থামে।

—অ্যাঁ? দাশু সরদার! বন্দুকের নলের মুখটা যেন চমকে উঠে, আশ্চর্য হয়ে, আর দুলতে দুলতে চেঁচিয়ে উঠেছে।

চোখ মেলে তাকাতে চেষ্টা করে দাশু, আর পলুস হালদারও তার হাতের টর্চ কাত করে দাশুর চোখের সামনে শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। যেন একটা হিংস্র জয়ের আমোদে হো-হো করে হেসে ওঠে পলুস হালদার।—তোমাকে দাগী বলেছিলাম বলে সরদারিন বড় রাগ করেছিল।

বাঘিন কানারানীকে এক গুলিতে সাবড়ে দেবার আশায় জঙ্গলে এই একান্তে গেছো মাচানের উপর রাতজাগা চোখ নিয়ে বসেছিল যে শিকারী, তারই আশার কাছে কানারানীর

চেয়েও চমৎকার একটা জানোয়ার ধরা পড়েছে। টর্চ ঘুরিয়ে দাশুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত আর একবার দেখে নিয়ে পলুস হালদার প্রশ্ন করে।—সাথীটা ভেগেছে বুঝি?

দাশু মাথা নাড়ে ঃ হ্যাঁ।

পলুস বলে—সাথীটা কে বটে? গুপী লোহার?

—হ্যাঁ।

—খুনিয়া ডাকাতি করে এলে?

—আমি করি নাই।

—গুপী লোহার করেছে?

—সে তো বললে, করেছে।

—কত টাকা পেলে?

—পাই নাই।

—গুপী লোহার সব নিয়ে ভেগেছে?

—হ্যাঁ, কিন্তু...।

—কি?

—আমাকেও হিস্যা দিবে বলেছিল।

—তুমি হিস্যা চেয়েছিলে?

—না।

দাঁতে দাঁত ঘষে হাসতে থাকে পলুস হালদার ঃ মধুকুপির দাশু সরদার বড় সাচ্চা, বড় ভালমানুষ বটে। হিস্যা নেয় না, কিন্তু খুনিয়া ডাকাতি করে। কি বল সরদার? ঠিক বলি নাই?

উত্তর দেয় না দাশু। পলুস হালদার বন্দুকটাকে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে, একটু দূরে গাছের মাথার উপর টর্চের আলো ফেলে মাচানটার দিকে একবার তাকায়, তারপরেই আক্ষেপ করে ঃ নাঃ, বড় ঠকে গেলাম সরদার। তোমার লাস নিয়ে থানাতে জমা দিলে পাঁচ টাকাও পাওয়া যাবে না।...যাও, ঘরে যাও।

তবুও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দাশু। পলুস হালদার ধমক দিয়ে বলে—যাও ; সরদারিনকে বলবে, পলুস হালদার চোর নয়।

—কি বলছো? দাশু ঘরামির অসাড় চোখ দুটো যেন হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে উঠে।

পলুস ভ্রূকুটি করে—চোখ বড় করে তাকাও কেন সরদার? তোমাকে মায়া করে ছেড়ে দিলাম।

দাশু—কেন মায়া করলে?

পলুস বলে—তোমার সরদারিনকে মায়া করি, তাই।

কাক ডাকে নি, ভোরও হয় নি, তবু বেশ ফিকে হয়ে গিয়েছে অন্ধকার। ডাঙ্গা পার হয়ে সড়কের উপর উঠতেই বুঝতে পারে দাশু, এই সড়কটাই সোজা ভুবনপুরে চলে গিয়েছে।

আকাশে মেঘ নেই, দু-তিনটে মর-মর তারা ছাড়া আর কিছুই নেই। সড়কের জল আর কাদাকে জল আর কাদা বলে মনে হয়। আর, সড়কের এক পাশে একই জায়গায় গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে যে গাছ দুটো, সে গাছ দুটোকেও চেনা যায়।

দুটো লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে গাছের গায়ে হাত দেয় দাশু। হ্যাঁ, যা ভেবে লাফিয়ে উঠেছে দাশুর ক্ষুধাকাতর প্রাণটা, দাশুর হাতে তারই ছোঁয়া লেগেছে। থোকা ডুমুর যেন থোকা থোকা আঁচিলের মত গাছ দুটোর গা ছেয়ে রয়েছে।

কোমরে জড়ানো গামছটাকে খুলে নিয়ে মাটির উপর ছড়িয়ে দেয় দাশু। ভোরের ভালুকের মত দু থাবা দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে ডুমুর ঝরাতে থাকে। ডুমুরের রাশ গামছা দিয়ে

শক্ত করে বেঁধে আর কাঁধের উপর তুলে নিয়ে দৌড়ে হাঁটতে থাকে।

কাক যখন ডাকে, তখন মধুকুপির সেই মেটে ঘরের জাম কাঠের দরজার কাছে পৌঁছে যায় দাশু। কপাট খুলে দেয় মুরলী। ঘরে ঢুকেই গামছার গিঁট খুলে মেজের উপর ডুমুরের রাশ ছড়িয়ে দিয়ে দাশু একটা হাঁপ ছাড়তেই মুখ ফিরিয়ে নেয় মুরলী ; আর খেজুর পাতা চাটাইয়ের উপর এলিয়ে শুয়ে পড়ে।

উনানের মুখে শুকনো বাঁশপাতা ঠেসে দিয়ে আগুন জ্বালে দাশু। জ্বলন্ত আগুনের আভা মুরলীর মুখের উপর ছটফট করে। মুরলীর চোখ দুটো মর-মর তারার মত আস্তে আস্তে কাঁপে। তার সঙ্গে যেন একটা জ্বালাময় শ্লেষও কাঁপছে। আর কিছু নয়, গামছা দিয়ে জড়ানো ডুমুরের একটা বোঝা। রাতের বুকের ভিতর ঢুকে ডাকাতি করে কী অদ্ভুত ঐশ্বর্যের সম্ভার নিয়ে ঘরে ফিরেছে মধুকুপির দাশু কিষাণ! মুরলীর চোখের চাহনিতে একটা ক্লান্ত অভিশাপ হাসতে থাকে।

কিন্তু দাশুর হাত-পায়ের ব্যস্ততা সত্যিই একটা নেশার জ্বালায় দুরন্ত হয়ে উঠেছে। কাঁচা ডুমুরের রাশ যেন একরাশ প্রাণময় স্বাদুতার সম্ভার। দাশুর চোখের চাহনিতে লালা ঝরছে। হাঁড়ি ভরে ডুমুর সিদ্ধ করে দাশু। ডুমুরের জাউ কাঠি দিয়ে ঘাঁটে, তার আগে চারটে শুকনো লঙ্কা, চার চিমটি নুন আর গুঁড়ো হলুদ ছড়িয়ে দেয়।

মাটির তেলাই ডুমুরের জাউয়ে ভরে নিয়ে মুরলীর হাতের কাছে যখন এগিয়ে দেয় দাশু, তখন খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর উঠে বসে মুরলী। মধুকুপির কিষাণের অদ্ভুত রোজগারের উপহার সেই গরম জাউ স্পর্শ করতে গিয়ে হেসে ফেলে মুরলী ঃ সারা রাত ধরে ভিখ মেগে শেষে এই চিজ নিয়ে এলে?

দাশু বলে—মধুকুপির কিষাণ ভিখ মাগে না।

মুরলী আবার হাসে ঃ তবে কি করে? চুরি?

—না।

—তবে ডাকাতি?

—না। চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

—তবে?

উত্তর দেয় না ; উত্তর দিতে পারে না দাশু। মহেশ রাখালের মেয়ের কালো চোখের ওই অদ্ভুত চাহনি, কুঞ্চিত ঠোঁটের কুটিল হাসি আর এই কঠোর প্রশ্নের আঘাতে অভিভূত হয়ে শুধু বোবার মত তাকিয়ে থাকে। তারপর সরে যায়। জাউয়ের হাঁড়িটাকে হাতে নিয়ে বাইরের দাওয়ার উপর গিয়ে বসে।

দূরের পাকুড়বনের মাথার উপর দিয়ে ভোরের আলো গড়িয়ে এসে দাশুর মুখের উপর পড়ে। হাঁড়ির জাউ চেটেপুটে খেয়ে ঢেঁকুর তোলে দাশু। হাত চাটে আর ঘটি তুলে ঢক ঢক করে জল খায়। মধুকুপির কিষাণের উপোষ করা আত্মাটা এতক্ষণে জ্বালা ভুলতে পেরেছে আর শান্ত হয়েছে।

ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আর দাওয়ার কিনারায় বসে মুখ ধোয় মুরলী। দাশুও মুখ ধোয়, জল ঢেলে হাত-পায়ের কাদা মুছতে থাকে। চড়ুয়ের ঝাঁক ঘরের চালার উপর বসে কিচিরমিচির করে। সকাল বেলার হাওয়ায় বাঁশঝাড়ের জটিল চেহারা দুলতে থাকে।

দাওয়ার উপর আবার স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে দাশু। আর উঠে দাঁড়াতে ইচ্ছা করে না। ব্যস্ত হয়ে উঠবার সাধ ক্লান্ত হয়ে এসেছে। দাশু কিষাণের হাতে-পায়ে এমন অবসাদ কোনদিন দেখা দেয় নি। ঘরের ভিতরের দিকে তাকাতেও আর কোন ব্যাকুলতা নেই।

পলুস হালদারের দয়া। এই দয়াতেও কী অদ্ভুত হিসাব। মুরলীকে মায়া করে বলে দাশুর বুকের কাছে বন্দুকের নলটাকে এগিয়ে নিয়ে এসেও গুলি মারে নি পলুস। শিকারী

পলুসের স্বপ্নটা একটুও ভীরু নয়। দাশু কিষাণকে একটা দুর্বল কাঠবিড়ালীর চেয়েও দুর্বল বলে মনে করে পলুস। তাইতো অনায়াসে দাশুকে ছেড়ে দিতে পেরেছে।

—তুই মিছা কেন পলুসকে চোর বলেছিস মুরলী, ছি!—হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

কেঁপে ওঠে মুরলী ঃ কি বললে?

দাশু—পলুস হালদারের বড় দয়া। তোর উপর কত মায়া! তাই আমাকেও মায়া করে।

দাশুর কাছে এগিয়ে এসে শক্ত হয়ে দাঁড়ায় মুরলী ঃ কে বললে? কোথায় গিয়েছিলে তুমি?

দাশু হাসে—পলুসের সাথে দেখা হলো, পলুসই বললে।

মুরলীর নিরুত্তর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে দাশু। মুরলীর কালো চোখের তারা দুটোর মধ্যে শুধু একটা দুরন্ত পিপাসার ছটফটানি দেখতে থাকে দাশু।

দাশু বলে—পলুসের সাথে যদি আবার দেখা হয়, তবে ওকে একটা কথা বলে দিব।

—কি কথা বলবে?

—বলবো, তোমাকে চোর বলে গালি দিয়ে মুরলীর বড় দুখ হয়েছে ঃ ভুল করেছে মুরলী। তোমার কাছে মাপ চেয়েছে মুরলী।

—হ্যাঁ বলে দিও। চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী।

দাশু আশ্চর্য হয়ে বলে—কেন মুরলী? বেচারা পলুসের উপর তোর এত রাগ কেন?

কথা বলে না মুরলী, দাওয়ার মাটির উপর বসে পড়ে, দু হাঁটুর উপর মাথাটা নামিয়ে দিয়ে চুপ হয়ে থাকে।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে দাশু। মুরলী মুখ তুলে তাকায় ঃ কি হলো? হাসছো কেন?

দাশু—আজ আর খাটতে বের হব না।

মুরলী—কেন? তা হলে খাবে কি?

দাশু—খেতে ইচ্ছা নাই।

মুরলী—আমার তো ইচ্ছা আছে।

দাশু—সে তুই ভেবে দেখ।

মুরলী—আমাকে চলে যেতে বলছো?

দাশু—না।

মুরলী—তবে?

দাশু—এখানে থাকবি। আমি যেদিন খাব সেদিন খাবি। আমি যেদিন খাব না, সেদিন তুইও খাবি না।

মুরলী—কেন?

দাশু—কিষাণের মাগ হলে এমনটি হবে ; উপায় নাই।

মুরলী—তুমি মরবে, আর আমাকেও মরাবে, কেমন?

দাশু—হ্যাঁ।

—কিন্তু আমার ছেইলাটা? সেটা মরবে কেন? চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী। মুরলীর চোখে সকালবেলার আলোর ছায়া আগুন হয়ে জ্বলতে থাকে।

—না না না। ছেইলাটা মরবে না। বলতে বলতে মাথা হেঁট করে আর ছটফট করতে থাকে দাশু। মুরলীর একটি প্রশ্নের আঘাতে দাশু কিষাণের সব কথার কৌশল আহ্লাদ আর উল্লাস ভয় পেয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে।

কে জানে কেন, মুরলীর চোখে সকালবেলার আলোর ছায়া আগুন হয়ে জ্বলতে জ্বলতেই হঠাৎ যেন ছাই হয়ে যায়, আর সেই ছাই ভিজেও যায়। ঝাপসা চোখ দুটো মুছে নিয়ে. দাশুর মাথায় হাত রেখে ডাক দেয় মুরলী—শুনছো?

—কথা বলিস না ; তোর কথা শুনলে আমার কলিজাতে তরাস লাগে। মাথা সরিয়ে নেয় দাশু।

মুরলীর গলার স্বর আরও কোমল হয়ে যায় ঃ কেন? আমাকে ডর লাগে কি?

—হ্যাঁ।

—কেন গো? আমি কি তোমার দুশমন?

দাশু কিষাণের জীবনের সব আতঙ্কের জ্বালার উপর যেন বড়কালুর ঝরনার ঠাণ্ডা জলের ধারা ঝরে পড়েছে। একটা নতুন বিস্ময়ের আবেগে টলমল করে ওঠে দাশু কিষাণের বুক। মুখ তুলে, অদ্ভুত রকমের চোখ করে মুরলীর মুখের দিকে তাকায়।

মুরলী বলে—আমার কথা শুনবে?

দাশু—বল।

মুরলী—তুমি একবার হারাণগঞ্জে যাও।

দাশু—কেন?

মুরলী—সিস্টার দিদির সাথে ভেট কর।

চমকে ওঠে দাশু—কেন?

মুরলী—তোমাকে ভাল কাজ পাইয়ে দিবে সিস্টার দিদি।

দাশু—ভাল কাজ?

মুরলী—হ্যাঁ, কলের কাজ। হারাণগঞ্জে, গোবিন্দপুরে, ভুবনপুরে কত নতুন কল হয়েছে, তুমি সে খবর জান না। কত কিষাণ কত ভাল কাজ নিয়ে সুখ করছে, সে কথা তুমি শুন নাই।

দাশু—সিস্টার দিদি আমাকে কেন কাজ দিবে? ওটা আমাকে কাজ দিবার কে?

মুরলী—আমি বলছি, দিবে। কিন্তু...।

দাশু—কি?

মুরলী—তুমি খিরিস্তান হবে।

—না। খবরদার, এমন কথা বলবি না। চেঁচিয়ে ওঠে দাশু। দাশুর নিঃশ্বাস রাগী সাপের মত হিসহিস করে শব্দ ছাড়ে।

মুরলী বলে—তোমার পায়ে পড়ি, আমার কথা শুন। আমার মাথার কিরা, তুমি একটু বুঝে দেখ।

—কি বুঝতে বলছিস?

—সেদিন আর নাই। গাঁয়ের মাটিতে সুখ নাই। খেটে মরবে, কিন্তু বাঁচতে পারবে না।

—আমাকে কলের কুলি হতে বলছিস?

—পরের জমির মনিষ হয়ে তোমার কি মানটা থাকছে, বল?

—কপালবাবা দয়া করলে নিজের জমি হবে না কেন? মনিষ হয়ে থাকবো কেন? নিজের জমির কিষাণ হব। একটু সবুর কর মুরলী। আমাকে একটু দম নিতে দে।

—হবে না। যত ইচ্ছে দম নাও, তবু কিছু হবে না। চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী।

—কেন? দাশুর চোখের তারা তীরের ফলার মত চিকচিক করে।

—তোমার কপালবাবা মরেছে।

—খবরদার! খিরিস্তানীর মত কথা বলবি কি আমি তোর...।

—টাঙ্গি মারবে? হেসে ফেলে মুরলী।

চুপ করে, হঠাৎ মেজাজের উত্তাপ সামলে নিয়ে আবার মাথা হেঁট করে দাশু। মুরলী বলে—তবে আমাকে যেতে দাও।

দাশু গম্ভীরস্বরে বলে—না।

মুরলী—তবে খেতে দাও।

দাশু—দিব।

মুরলী—কি খেতে দিবে? জঙ্গলের ডুমুর?

দাশু কিষাণের পাথরের পাটার মত বুকটা হঠাৎ যেন চুপসে যায়। চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী—বল, কি খেতে দিবে? কথা বল? কথা বলতে মধুকুপির কিষাণের এত ডর কিসের?

গেঁয়ো মধুকুপির একটা মূক ও বধির আত্মার উপর যেন তীর মেরে খেলা করছে মুরলী। হাত-পা গুটিয়ে একেবারে অনড় হয়ে বসে থাকে দাশু। কিন্তু একটু পরেই চমকে উঠতে হয়। নিকটেই সড়কটা গোঁ-গোঁ শব্দ করছে। তারপরে, একেবারে নতুন একটা উল্লাসের সাড়া যেন ধোঁয়া ছড়িয়ে ছুটতে ছুটতে দাশু কিষাণের ঘরের কাছে এসে থেমে যায়।

একটা মালবহা মোটর গাড়ি। সে গাড়ির চালা নেই। ঝুপঝাপ করে গাড়ির ভিতর থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে নামতে থাকে এক-একটা মূর্তি। হাতে গাঁইতা ; কালো কপনি পরা আর কালো ধুলোয় ভরা মাথা, এক-একটা চেহারা।

—দাশু দাদা কবে ফিরে এলে হে! চেঁচিয়ে ওঠে সুরেন মান্‌ঝি।

এগিয়ে আসে সুরেন। মালকাটা মান্‌ঝির দল সড়কের উপর বসে জিরোতে থাকে ; বিড়ি টেনে ধোঁয়া ছাড়ে আর গল্প করে।

সুরেন মান্‌ঝির চেহারার দিকে তাকাতে গিয়ে দাশু কিষাণের চোখের বিস্ময়টাও করুণ হয়ে যায়। এ কি চেহারা! কালো ধুলো মেখে গাঁইতা কাঁধে নিয়ে সুরেন মান্‌ঝি যেন শখের ডাকাত সেজেছে।

—কেমন আছ দাশু দাদা? সুরেন মান্‌ঝি এসে একগাল হাসি হেসে দাশুর চোখের সামনে দাঁড়ায়।

—তুমি কেমন আছ বল।

—সুখে আছি গো দাদা! কয়লা খাদে খাটি। ঈশান মোক্তারের জমিতে থুক ফেলে দিয়ে চলে গিয়েছি ; মালকাটার কাজ নিয়েছি!

—কেন? জঙ্গলের শাল ভেঙে...।

—হুর্‌র্‌, সেদিন আর নাই দাশু দাদা। টাঙ্গির দিন নাই।

—তবে কিসের দিনটা বটে? বলতে গিয়ে দাশুর গলার স্বর রুক্ষ হয়ে ওঠে।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে সুরেন ঃ গাঁইতার দিন বটে। গাঁইতা মেরে এক টব কয়লা উঠাও, মজুরি এক টাকা দুই আনা। দুই টব উঠাও, কত হয় হিসাব করে বুঝে নাও।

অনেকক্ষণ ধরে দুই চোখ অপলক করে সুরেন মান্‌ঝির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে দাশু। যেন সব নিঃশ্বাসের জোর দিয়ে একটা সন্দেহ জয় করবার চেষ্টা করছে। এ কি বলছে সুরেন? সত্যিই কি কয়লাখাদের কাজে এত সুখ আছে?

কয়লার ধুলোতে পুরু আর কালো হয়ে গিয়েছে সুরেন মান্‌ঝির ধুতি। সেই ধুতিকে আবার একটা কালো গামছা দিয়ে শক্ত করে কোমরবাঁধা করেছে। গামছার পাকের ভিতর থেকে ছোট একটা ডিবে বের করে সুরেন, আর ডিবের ভিতর থেকে একটা সিগারেট বের করে দাশুর হাতের কাছে এগিয়ে দেয় ঃ ধর দাশু দাদা। তুমি আগে পাঁচ ফুঁক দিয়ে নাও।

দাশু কিষাণের বুকের ক্লান্ত হাড়ের উপর একটা নতুন বিস্ময়ের চমক ঠোকাঠুকি করে বাজতে থাকে। প্রাণপণে হিসেব করতে চেষ্টা করে দাশু ; তাই তো! দুই টব মাল উঠালে দুই টাকা চার আনা মজুরি পাওনা হয়। সুরেন মান্‌ঝির কথাগুলিও যে ভয়ানক এক মায়াময় প্রতিশ্রুতির ডাকাত হয়ে দাশুর জীবনের অবসাদের উপর নতুন নেশার জ্বালা ছুঁড়ে মারছে। দিন দু টাকা চার আনা রোজগার হলে যে দাশু কিষাণের এই ঘরের প্রাণটা দু বেলা ভরপেট খাওয়ার আনন্দে আবার ঝুমুর গেয়ে উঠবে।

সুরের মান্‌ঝির উপহার, সেই সিগারেটে দুটো লম্বা লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে দাশু আনমনার মত বিড়বিড় করে কথা বলে—কিন্তু, দিন দুই টব মাল উঠাতে পারা যাবে কি সুরেন? তোমরা কি পার?

হেসে উঠে সুরেন ঃ তেমন তেমন দিন হলে তিন টব মাল উঠাতে পারি।

দাশু—কিন্তু, এখনই গেলে কি ওরা কাজ দিবে আমাকে?

চেচিয়ে ওঠে সুরেন—এখনই দিবে। রোজ নতুন মালকাটা ভর্তি করছে কোম্পানি। তুমি ভাবছো কেন?

দাশু—আগাম কিছু দিবে কি কোম্পানি?

সুরেন—না, আগাম নিবার দরকারও হয় না দাশু দাদা। হপ্তা পুরা হয়েছে কি পুরা সাতটি দিনের মজুরি হিসাব করে হাতে হাতে নগদ নগদ দিয়ে দিবে খাজাঞ্চি।

দাশু—কিন্তু আমার যে সাতটা দিনেরও খোরাক নাই সুরেন। আমি যাব কেমন করে, বল?

সুরেন মান্‌ঝির চোখ দুটো হঠাৎ একটু বিষণ্ণ আর একটু বিস্মিতও হয় ঃ এমন দশাটা তোমার কেন হলো দাশু দাদা?

দাশু—কপালবাবা জানে।

সুরেন চুপ করে কি-যেন ভাবে, তারপর নিজের মনের আবেগে চেঁচিয়ে ওঠে—হুর্‌র্‌, ওসব ভাবনা এখন রাখ।...সরদারিনের হাতে কত টাকা তুমি দিয়ে যেতে চাও?

নিজের কোমরের গামছায় হাত দেয় সুরেন। তারপর এগিয়ে যেয়ে সব মান্‌জির কাছ থেকে একটা-দুটো করে সিকি আধুলি বা টাকা তসীল করে। তখনি ফিরে এসে দাশুর হাতের কাছে এক মুঠো টাকা-সিকি-আধুলি তুলে দিয়ে সুরেন বলে—এই নাও দশ টাকা। হপ্তা পেলে শুধে দিও।

টাকা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ হতভম্বের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে দাশু। কেউ যেন হঠাৎ এসে দাশু কিষাণের প্রাণটাকে এই মধুকুপির মাটির বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে একটা প্রকাণ্ড কালো কবরের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। দাশু কিষাণের আত্মার অহঙ্কার এতদিনে মাথা নিচু করে আর হাত পেতে যেন ঘুস নিচ্ছে। কিষাণের জীবন কয়লা-খাদের মালকাটা হয়ে গাঁইতা হাতে তুলে নেবে। দাশুর বুকের ভিতরে যে সত্যিই একটা যন্ত্রণার কান্না ছটফট করে উঠতে চাইছে। চোখের কোণের জল মোছে দাশু।

সুরেন মান্‌ঝি চেঁচিয়ে ওঠে ঃ হেই দেখ! এটা আবার কি শুরু করলে? কাঁদ কেন?

জামকাঠের দরজার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ ধরে সব কথাই শুনছিল যে মুরলী, সেই মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে সুরেন মান্‌ঝি এইবার চেঁচিয়ে হেসে ওঠে ঃ হেই দেখ, সরদারিন হাসে আর সরদার কাঁদে ; এমনটি তো কভি দেখি নাই।

ঠিক কথা। মুরলীর মুখের উপর ছোট একটা হাসির ছায়া এতক্ষণ ধরে কে-জানে কিসের জন্য সিরসির করে কাঁপছিল। মধুকুপির কিষাণ এতদিন মাটির লোভ ছেড়ে দিয়ে খাদের কাজে নেমে যেতে বাধ্য হল। হার মেনেছে দাশু। তাই বোধহয় হেসে উঠেছে মুরলী। সুরেন মান্‌ঝির কথায় চমকে ওঠে দরজার আড়ালে সরে যায় মুরলী। এগিয়ে আসে দাশু।

মুরলীর হাতের কাছে টাকা রেখে দিয়ে দাশু বলে—চললাম।

মুরলী গম্ভীর হয়—কেন চললে?

দাশু—তোর লেগে। আর ছেইলাটার লেগে।

মুরলী—কি বলছো তুমি?

দাশু—তুই ঘরে থাক্‌। হপ্তা পরে ঘর ফিরবো।

মুরলী—হপ্তা পরে আবার চলে যাবে তো?

দাশু—হ্যাঁ।

মুরলী—এমন দশাকে কি ঘর করা বলে? মাগে-মরদে এমন ঘর করে?

দাশু—আগে তুই বেঁচে থাকবি, তবে তো তোর সাথে ঘর করবো।

মুরলী—ছিঃ!

দাশু—কি?

মুরলী—মানুষে এমন করে গাইও পুষে না ; কিন্তু মধুকুপির কিষাণ শুধু খোরাক দিয়ে মাগ পুষতে চায়।

দাশু—তুই বিশ্বাস কর মুরলী।

মুরলী—আবার কি বিশ্বাস করতে বলছো?

দাশু—আমি মালকাটা হয়ে মরবো না, আমি মধুকুপির মাটি ছেড়ে দিব না, কভি না।

মুরলী ভ্রূকুটি করে ঃ পাগলপারা কথা বল কেন?

দাশু—না। আমি টাকার লেগে যাচ্ছি। টাকা জমাবো। ফিরে আসবো। জমি কিনবো। তুই বিশ্বাস কর। আউশ আমন ফলাবো ; রবি করবো। পাঁচ বিঘা কেন, দশ বিঘা জমি নিয়ে ছিটাই রোপাই করবো। তুই দেখে নিবি।

—বেশ, দেখে নিব। খুব জোরে একটা নিশ্বাস ছেড়ে চুপ করে মুরলী, আর মুখ ঘুরিয়ে নিয়েই কেঁদে ফেলে। কী কঠোর দাশু কিষানেরই এই জেদ! এখনও মুরলীর মুক্তির আশা বিনাশ করবার আশায় মাতাল হয়ে রয়েছে কিষাণের প্রাণ।

সড়কের উপর দাঁড়িয়ে থাকা নীরব ট্রাকটা জোরে হর্ন বাজায়। সুরেন মান্‌ঝি ডাক দেয় —চলে এসো দাশু দাদা।

ট্রাকের উপর মালকাটা মান্‌ঝিরদের গাঁইতাগুলি বড় বড় লোহার নখের মত হেলে দুলে চিকচিক করছে। ঘর ছেড়ে আস্তে আস্তে হেঁটে ট্রাকের দিকে চলে যায় দাশু।

শুনতে পায় দাশু ঘরের ভিতরে গুনগুন করে কাঁদছে মুরলী। শব্দটা গুনগুন করে গাওয়া গানের শব্দের মত। যেন মুরলীর অদৃষ্টেরই আক্ষেপের গুঞ্জন। পাঁচ বছর আগে, দড়িবাঁধা কোমর নিয়ে পুলিসের পিছু পিছু চলে যাবার সময়েও দাশু কিষাণের পায়ের জোর এত নরম হয়ে যায় নি।

এজরা ব্রাদার্সের কলিয়ারি। মধুকুপির এত কাছে এই পাঁচ বছরের মধ্যে এরকম একটা কালিমাময় রাজ্য গড়ে উঠেছে, কল্পনা করতে পারে নি দাশু। দু ক্রোশ দূর থেকে যে খাদের চিমনির ধোঁয়াকে কালো মেঘের গুঁড়ো বলে মনে হয়, আজ একেবারে সেই চিমনির কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে দাশু, কী ভয়ানক কালো হল্‌কার মত ধোঁয়া উগরে চলেছে চিমনিটা। চারদিকে কী অদ্ভুত ব্যস্ততা! কত রকমের শব্দ আর কত ঘরবাড়ি! একদিকে সারি সারি কয়লার পাহাড় দেখা যায়। সুরেন মান্‌ঝি বলে—ওটা ডিপো বটে।

কয়লা খাদে কাজ চলছে দিনরাত। লোয়ার মধুকুপির সীম, সত্তর পুট পুরু কয়লার স্তর, হাই গ্রেড কয়লার এক বিরাট ভাণ্ডার হাতের কাছে পেয়েছে এজরা ব্রাদার্স। যেমন ব্যাঙ্কার্স অর্ডার, তেমনই লোকো অর্ডার ; কোম্পানির অফিসের খাতাপত্রও প্রচুর প্রফিটের আশা ও উন্মাদনায় চঞ্চল হয়ে রয়েছে। নতুন নতুন ম্যাপ নিয়ে ম্যানেজার সর্বক্ষণ ব্যস্ত। কম্পাস বাবুও ব্যস্ত। ওভারম্যান আর সর্দার দিনের শিফ্‌ট্‌ সেরে আবার রাতের শিফটে যাবার জন্য তৈরি হয়।

নিকটেই লোডিং স্টেশন। ওয়ে ব্রিজের কাছে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি চল্লিশ-টনী জাহাজী ওয়াগন। দিনরাত ওয়াগনে কয়লা লোড করছে রেজিং ঠিকাদারের কুলির দল। তাড়া দেয় ওয়াগনের পাইলট, আর এক ঘণ্টাও ওয়াগন আটক করে রাখা সম্ভব নয়।

লোডিং বাবু, রেজিং ঠিকাদার আর পাইলটের সঙ্গে তর্কাতর্কি চলে! তারপর কে জানে কেমন করে হঠাৎ একটা নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

এজরা ব্রাদার্সের কয়লা খাদ ; একটা পিট আর দুটো ইনক্লাইন। ধাওড়ার দিকে যেতে যেতে সুরেন মান্‌ঝি বলে—হোই দেখ দাশু দাদা, ওটা ডুলি খাদ বটে।

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখতে থাকে দাশু ; খাদের মুখের ভিতর থেকে তারবাঁধা লোহার ডুলি উঠছে আর নামছে। নামছে মানুষ, উঠছে কয়লা। কি-রকম অদ্ভুত ফোঁস-ফোঁস আর ধক্‌পক্ শব্দ ছাড়ছে ডুলি খাদের মুখের কাছে একটা কলঘর। নীল রঙের পায়জামা পরা আর মাথায় কালো কাপড়ের ফেটি বাঁধা এক-একটা লোক কলঘরের কাছে ঘুরে বেড়ায়। সুরেন মান্‌ঝি বলে—ওরা খালাসী বটে ; কেউ পঞ্চাশ, কেউ ষাট, কেউ আশি টাকা মাইনা পায়। ওরাও একদিন তোমার আমার মত দেহাতী মনিষ ছিল।

আর একটুও দূরে, পর পর দুটো খাদের মুখের ভিতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়ে আসছে কয়লার সারি সারি চলন্ত স্তূপ। সুরেন মান্‌ঝি বলে—ঐ দুটো সিঁড়ি খাদ বটে। মাল নিয়ে টবগাড়ি কেমন উঠছে দেখ।

ডিপোর কাছে গুঁড়ো কয়লার বিরাট আকারের এক-একটা ঢিবির কোলের উপর কালো কালো খরগোশের মত হুটোপুটি করছে কারা?

সুরেন মান্‌ঝি হাসে—পাথর বাছাই করছে ছোঁড়ারা। এক মণ বাছলে একটা ছোঁড়া দশ আনা মজুরি মারে। ভাবছো কেন?

দাউ দাউ করে পুড়ছে ছোট ছোট কয়লার পাহাড়। দাশুর চোখের বিমূঢ়তাও যেন সেই জ্বালার হল্কা লেগে দপ্ দপ্ করতে থাকে।

সুরেন মান্‌ঝি বলে—রাঙী কয়লা জ্বলছে দেখ, দাশু দাদা।

—কেন জ্বলছে সুরেন?

সুরেন—জলের দাগে দাগী রাঙী কয়লা জ্বলায়ে নরম কোক তৈয়ার হচ্ছে।

দু পাশে কয়লার ধুলো বড় বড় ঢিবি করে সাজানো। চলতে চলতে দাশুর মাথার চুল আর ভুরুর উপর কয়লার ধুলোর প্রলেপ কখন্ কখন্ পুরু হয়ে জমে গিয়েছে তাও বুঝতে পারে নি দাশু।

হঠাৎ, একটা ঢিবি যেন খিল খিল করে হেসে ওঠে ঃ হেই মান্‌ঝি, ভাল মানুষটিকে কোথা থেকে নিয়ে এলে?

সুরেন মান্‌ঝি হেসে হেসে ধমক দেয়—তাতে তোদিগের চোখ ফাটে কেন?

আবার এক ঝলক হাসি খিল খিল করে ঃ মানুষটি বড় উদাস বটে: দেহাতী বটে কি?

সুরেন বলে—হ্যাঁ।

চোখ মুছে নিয়ে দেখতে থাকে দাশু, একদল মেয়ে ঝুড়ি হাতে নিয়ে কয়লার ধুলোর উপর পা ছড়িয়ে বসে রয়েছে। যেন গুঁড়ো কয়লা দিয়ে তৈরী এক একটা চটুল মেয়ে-চেহারা সব লজ্জা এলোমেলো করে দিয়ে ঢলাঢলি করছে আর হাসছে।

—এরা কে বটে সুরেন?

—এরা ময়লা কামিন বটে। টালিতে কয়লাগুঁড়ো বোঝাই করে। এরাও রোজ মজুরি পায় বারো আনা। ভাবছো কেন?

এটা খুব লম্বা ও টানা একচালার কাছে এসে থামে সুরেন মান্‌ঝি। দেখতে পায় দাশু, এক এক জায়গায় কালো কালো পিণ্ডের মত মানুষের ধড় জড়ো হয়ে রয়েছে। ঘুমোচ্ছে মালকাটার দল।

সুরেন বলে—এটা আমাদিগের ধাওড়া বটে। কাঁচা ধাওড়া। কোম্পানি বলেছে, পাকা ধাওড়া জলদি বানিয়ে দিবে। তখন মান্‌ঝিন আর ছেইলাগুলোকে আর গাঁয়ে রাখবো না।

চমকে ওঠে দাশু ঃ কেন সুরেন? এই কালা কয়লার নরকের মধ্যে ঘরের মানুষগুলাকে আনবে কেন?

সুরেন হাসে ঃ নরক বলো না দাশু দাদা। যেখানে দানাপানি সেখানে ঘর।...হাঁ চল, তোমাকে এখনি ভর্তি করিয়ে দিয়ে গাঁইত্র পাইয়ে দিব।

সুরেন মান্‌ঝির পিছু পিছু হেঁটে ঠিকাদারের অফিসঘরের কাছে এসে দাঁড়ায় দাশু। দাঁড়িয়ে আছে আরও প্রায় বিশ জন দেহাতী। দুটো ভীত চোখের করুণ দৃষ্টির সব বেদনা নিয়ে দেখতে থাকে, আর বুঝতেও পারে দাশু, এতগুলি মানুষ বোধহয় তারই মত দুর্ভাগ্যের যন্ত্রণায় গাঁয়ের ঠাণ্ডা মাটি, গাছের ছায়া, কাদার গন্ধ আর সবুজ ঘাসের ছোঁয়া থেকে তাড়িত হয়ে এই কয়লার কালো গহ্বরের কাছে আত্মদান করতে এসেছে।

অফিস-ঘরের সামনে মুড়ি আর গুড় ঝুরিতে সাজিয়ে নিয়ে দোকান করেছে একটা লোক। দুই ঠোঙা মুড়ি আর দুই ঢেলা গুড় কিনে হাঁক দেয় সুরেন—চটপট খেয়ে নাও, দাশু দাদা।

তারপর আর বেশি দেরি হয় না। এক ঘটি জল খেয়েই তৈরি হয় সুরেন, সুরেনের সঙ্গে অফিস-ঘরের ভিতরে ঢুকে নাম লেখায় দাশু। মধুকুপির দাশু কিষাণ যেন এক নিমেষের অদৃষ্টের নতুন লিখনের কৌতুকে এজরা ব্রাদার্সের মালকাটা হয়ে যায়। একটা ঢিবরি, এক ছটাক কেরোসিন তেল আর গাঁইতা হাতে তুলে নিয়ে ফ্যালফ্যাল করে চারদিকে তাকায় দাশু।

ওভারম্যান হাঁক দেয়—ব্যস্, আর দেরি কেন?

সরদার ডাক দেয়—সব হাজির হ্যায়?

হ্যাঁ, সবাই হাজির আছে। সরদারের পিছু পিছু মালকাটা দলের সঙ্গে নতুন মালকাটা দাশু কিষাণের মূর্তিও চলতে থাকে।

সুরেন বলে—হ্যাঁ, বেশ ফুর্তি নিয়ে কাজে লেগে যাও, দাশু দাদা।

দাশু—কোথায় নিয়ে যাচ্ছে রে ভাই?

সুরেন—ডুলি খাদে নয়, সিঁড়ি খাদে। তড়বড় করে নেমে যাও, ঝপাঝপ গাঁইতা মার, টব ভর্তি কর। ব্যস্ ভাবছো কেন?

কেরোসিনের ঢিবরি হাতে ঝুলিয়ে আর গাঁইতা কাঁধে নিয়ে মালকাটা দলের হল্লা হাসির সঙ্গে একটা নীরব গম্ভীরতার মত হেঁটে হেঁটে যখন সিঁড়ি খাদের মুখের কাছে এসে থামে দাশু, তখন কেঁপে ওঠে বুকটা। গাঁইতা ঢিবরি ফেলে দিয়ে সেই মুহূর্তে পালিয়ে যাবার জন্য পা দুটো ছটফট করে ওঠে। যেন হাঁ করে রয়েছে একটা ঘুটঘুটে কালো আর অন্ধ দানোর প্রকাণ্ড মুখ। কে জানে, কত নীচে কোন্ ভয়ানক অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছে এই মরণের সুড়ঙ্গ! যে মাটির উপরটা এত সুন্দর, সে মাটির ভিতরটা এত কুৎসিত, কোনদিন কল্পনা করতে পারে নি দাশু। কিন্তু কি আশ্চর্য, সুরেন মান্‌ঝি বলেছে, এই কুৎসিত সুড়ঙ্গের ভিতরে নাকি পয়সা ছড়ানো আছে।

ঢিবরি জ্বালে মালকাটার দল। দাশুও কাঁপা হাতে ঢিবরি জ্বালে। তারপর, আবার চলতে শুরু করে। ডাইনে বাঁয়ে আর মাথার উপর কালো-কালো কাটাছাঁটা নিরেট পাথর ; তার উপর নিজেরই প্রকাণ্ড কালো ছায়ার বিরাট পা দুটোর দিক তাকালে ভয় পায় দাশু ; একটা দানব যেন দাশুর পাশে পাশে হেঁটে চলেছে।

মোটা তারের কাছি, যেটা সুড়ঙ্গের ভিতরে গড়িয়ে গিয়েছে, তারই উপর ঝন্‌ঝন্ একটা শব্দ যেন নেচে নেচে বাজতে শুরু করে। আর, অনেক দূরের প্রতিধ্বনির মত একটা ঘণ্টার শব্দও শোনা যায়। সরদার হাঁক দেয়—খবরদার!

অতল থেকে কয়লা বোঝাই টবগাড়ি উঠছে। হামাগুড়ি দিয়ে উঠে আসছে ঘড়াং ঘড়াং

প্রবল শব্দে এক একটা জন্তু। হাবিস শুরু করেছে নীচের টালোয়ান। মালকাটার দলের সঙ্গে দাশুও সুড়ঙ্গের পাশ ঘেঁষে চলতে থাকে, নীচের দিকে, আরও কালো এক ভয়ানক রহস্যের দিকে!

—ডাইনে ঘুরে। হাঁক দেয় সরদার।

একটা ছোট সুড়ঙ্গের ভিতরে ঢুকে মাথা হেঁট করে কুঁজো হয়ে মালকাটার দলের সঙ্গে এগিয়ে যেতে থাকে দাশু। পায়ের তলায় পচ্‌পচ্‌ করে কাদা। সরদার বলে—ভয় নাই, আর গ্যাস নাই ; ধুর কয়লার উপর জল মেরে পাথরের গুঁড়া বিছাই করা হয়েছে।

—আবার ডাইনে ঘুরে, পৌঁছা সুঁদ।

ডাইনে ঘুরে আরও কুঁজো হয়ে হাঁটতে থাকে মালকাটার দল আর দাশু।

—ব্যস। সরদারের হাঁকের সঙ্গে সঙ্গে সবাই থমকে দাঁড়ায়।

কয়লা আর কয়লা, স্তরে স্তরে দাঁড়িয়ে আছে কয়লার নিরেট কালো শরীর। কয়লার খাঁজের গায়ে ঢিবরি ঝুলিয়ে দিয়ে জিরোতে থাকে মালকাটার দল। একটু দূরে শাবল মেরে কয়লার গায়ে বিঁধ দিয়ে বারুদ ঠাসছে চারজন মালকাটা। বেঁটে লাঠি আর সেফ্‌টি ল্যাম্প হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ওভারম্যান, পরনে খাঁকি হাফপ্যাণ্ট, গায়ে গেঞ্জি আর মাথার প্রকাণ্ড টাকে কালো ধুলোর আবরণ।

—আওয়াজ হবে। তৈয়ার হও। হাঁক দেয় সরদার!

শিথিলভাবে গাঁইতার গায়ে হাত ঠেকিয়ে দিয়ে তৈরি হয় পুরনো মালকাটার দল। আর, নতুন মালকাটা দাশু যেন একটা বিভীষিকার সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে ভয়ে আক্রোশে হিংস্র হয়ে গাঁইতাটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে।

বারুদ ফাটে। নিরেট কয়লার বুকটা প্রচণ্ড আর্তনাদ তুলে ফাটা-ফাটা হয়ে যায়।

—কাজ শুরু করো গাঁতি। হাঁক দেয় সরদার।

গাঁইতা হাতে তুলে ফাটল-ধরা কয়লার বুকের উপর লাফিয়ে পড়ে দাশু।

ডরানির বানের জল নেমে গিয়েছে। আবার শুকিয়ে খটখটে হয়ে গিয়েছে মধুকুপির ডাঙা। বানভাসি পলি দশ দিনের রোদেই শুকিয়ে ধুলো হয়ে গিয়েছে ; ছোট ছোট ঝড়ো হাওয়ার ফুৎকারে সেই ধুলোও সারা দুপুর ধরে ডাঙার বুকের উপর ছোট ছোট ঘুরনি ছুটিয়ে নেচে বেড়ায়।

ডরানির স্রোতের হাঁটুজল আবার ছলছল করে, আর সেই স্রোত পার হয়ে ঈশান মোক্তারের খাটালের গরু আবার ঘাসের গন্ধ খুঁজতে খুঁজতে পলাশবনের ছায়ার দিকে চরতে চলে যায়। কারণ, আর একটা আতঙ্কের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পেরেছে মধুকুপির প্রাণ। বাঘিন কানারানী আর এই তল্লাটে নেই। বাবুরবাজার ফাঁড়ির পুলিশ এ-গাঁয়ে আর ও-গাঁয়ে ঘুরে আবার জানান দিয়ে চলে গিয়েছে, এইবার একটু হেঁটে ছুটে, একটু ঘরের বার আর গাঁয়ের বার হয়ে কাজ করতে থাক সবাই। আর ডর নাই।

সড়কের উপর দিয়ে গো-গাড়ির যাওয়া-আসার সাড়াও শোনা যায়। এমন কি, সন্ধ্যা পার হয়ে যাবার পরেও। জামুনগড়ার কাঠুরিয়ারা জানতে পেরেছে, এই পথে বাঘের ডর আর নেই। থানা বলেছে, বাঘটা এ বছর একটু আগেভাগে, শীত দেখা দেবার অনেক আগেই চলে গেল। গোবিন্দপুর থানার সব ভাড়াটে শিকারী মাচান তুলে দিয়ে আবার যে-যার ঘরে ফিরে গিয়েছে।

কিন্তু আর-একটা ভয়, যে-ভয়ের জন্য ঈশান মোক্তারের কুঠি রাতের বেলায় নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে পারে না। বাবুরবাজারের ধানের পাইকার আর ইঁটের ঠিকাদারও সন্ধ্যার পর থেকে আতঙ্কিত বুক আর ঘুমহারা চোখ নিয়ে রাত কাটায়। গোবিন্দপুর থানার বড়বাবু আর

ছোটবাবুর তর্কাতর্কিও যখন-তখন আরও তীব্র ও আরও মুখর হয়ে উঠতে থাকে।

এই আতঙ্কের নাম গুপী লোহার। কোন সন্দেহ নেই, বড়কালু ওয়েস্ট নামে নতুন রেলহেডের স্টোর ইয়ার্ডের ভিতর যে খুনের কাণ্ড ঘুমন্ত ঠিকাদারের লাল কম্বলটাকে রক্তে চুবিয়ে দিল আর টাকার থলি নিয়ে সরে পড়ল, সেই খুন গুপী লোহারেরই হাতের একটা ভয়ানক হেঁসোর শাণিত হিংসার কাজ। বাবুরবাজারে প্রতিদিন দু-চারটা ধানের গাড়ি এসে জমা হলেও কোন পাইকার আসে না।

মধুকুপির আতঙ্ক বলতে শুধু এই কুঠির আতঙ্ক। কারণ, গুপী লোহার যে মধুকুপির কোন মনিষের মেটে ঘরের ভিতরে উঁকি দিতেও আসতে পারে না, এই সহজ ও সরল সত্য কে না বুঝতে পারে? সিন্দুক নামে একটা বস্তু, ও তার ভিতরে নগদ টাকা নামে আর-একটি বস্তু শুধু এই কুঠি ছাড়া মধুকুপির আর কারও ঘরে নেই, থাকতেও পারে না। আজকাল বড় গুমস্তা দুখন বাবুর টাকার বাক্সটাও ঈশান মোক্তারের এই কুঠির সিন্দুকটার ভিতরে থাকে।

তাই আতঙ্কিত কুঠি শেষ পর্যন্ত তারই অনুগ্রহের শরণ নিয়েছে, যার ইচ্ছায় আর ইঙ্গিতে গোবিন্দপুর থানার বড়বাবু আর ছোটবাবুর বিচার-বিবেচনা, এমন কি ছুটি নেবার চেষ্টাও ওঠা-বসা করে। পুলিশ মুন্সী চৌধুরীজীর আশ্বাস পেয়েছে ঈশান মোক্তারের কুঠি। কুছ ডর নেই ; আমি সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি, কুঠিতে ডাকা মারবার কোনও মওকা পাবে না খুনেরা পাপী গুপী লোহার।

বাবু দুখন সিংয়ের বাড়ির সামনে পিপুলতলার ছায়ার ছোট একটি টাট্টুঘোড়া আজ সকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়ার একটা পা একটা খুঁটোর সঙ্গে বাঁধা দড়ির প্রান্ত দিয়ে বাঁধা। ঘোড়ার সামনে ঘাসের স্তূপ। লেজের ঝালর দুলিয়ে গায়ের মাছি তাড়ায় আর ঘাস খায় চৌধুরীর ঘোড়া। আর, বনচণ্ডীর ছোট দেউলের পাশে রক্তজবার গা ঘেঁষে একটা খাটিয়া পাতা হয়েছে। তার উপর বসে আছে চৌধুরী। রামাই দিগোয়ার মাটির উপর উবু হয়ে বসে চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

ঈশান মোক্তারের কুঠি আজ চৌধুরীকে খুশি করার ব্রত পালন করেছে। কুঠি পাঠিয়েছে, মস্ত বড় কাঠের থালার উপর সাজানো পরোটার দুটি স্তূপ আর এক হাঁড়ি অড়হরের ডাল। পিতলের একটি ডেক্‌চি, আর ভিতরে কালো পাঁঠার মাংস, বিনা পেঁয়াজে রাঁধা। একটি নতুন গামছা ; গামছার এক কোণে দশ টাকার নোট গেরো দিয়ে বাঁধা।

জাতপঞ্চের বড় বুড়া রতনকে ডেকে এনে চৌধুরীর সামনে হাজির করেছে রামাই দিগোয়ার।

চৌধুরী বলেছে—কুঠি পাহারার জন্য বিশজন বেগার চাই। যেখান থেকে পার, যেমন করে পার সন্ধ্যা হবার আগেই লোক নিয়ে এসে জমায়েত করে ফেল। তা না হলে আমি সবার আগে তোমাকে চালান দিব বুড়া।

রতন—বেগার খাটতে বলছেন কেন বাবু? কিছু পয়সা দিবার আজ্ঞা করেন।

—চুপ। একটা পয়সাও না। সরকারী কাজে বেগার খাটতে হবেই। পিতল বাঁধানো লাঠিটাকে মাটিতে ঠুকে চৌধুরী গর্জন করে উঠতেই বড় বুড়া রতন চুপ করে চলে গিয়েছে।

সারা দুপুর আর বিকাল পিপুলের ছায়ায় খাটিয়ার উপর ঘুমিয়ে পার করে দেবার পর সন্ধ্যা দেখা দিতেই আবার ব্যস্ত হয়ে হাঁকডাক করে চৌধুরী। লোক নিয়ে আসে বড় বুড়া রতন। কুঠির জন্য বিশজন মানুষ পাহারায় লাগিয়ে দিয়েই চৌধুরী একটা হাঁপ ছাড়ে ঃ এইবার গলাটা একটু ভিজাতে চাই রামাই ; বন্দোবস্ত কর দেখি।

আগেই বন্দোবস্ত করে রেখেছিল বাবু দুখন সিং। দুখন সিংয়ের চাকর দুটি মহুয়া সরাবের বোতল আর সরা ভর্তি ছোলাভাজা নিয়ে এসে চৌধুরীর হাতের কাছে রাখে।

টিম টিম করে আলো জ্বলে। চৌধুরীর গলা ভিজে যাবার পর এতক্ষণের গম্ভীর মুখটাও

নতুন রকমের মেজাজে প্রসন্ন হয়ে ওঠে।

—নে রামাই। এটাতে পোয়াভর আর এটাতে ছটাকভর আছে। বোতল দুটোকে রামাইয়ের হাতে তুলে দিয়ে চৌধুরী বলে—তাড়াতাড়ি পিয়ে নে রামাই ; তারপর চল, একটা রাউণ্ড দিয়ে আসি।

বলতে বলতে অদ্ভুতভাবে হাসির টেঁকুর তুলতে থাকে চৌধুরী। তিন চুমুকে বোতল খালি করে আর গলা ভিজিয়ে রামাই বলে—হুজুর আজ ফাঁড়িতে ফিরবেন কি?

চৌধুরী হাসে ঃ তুই জানিস। যদি জায়গা করে দিস তবে আর ফিরবো কেন?

হেসে ওঠে রামাই ঃ তবে চলেন হুজুর।

আর দেরি হয় না। পিপুলতলার অন্ধকার থেকে টলমল করে হাঁটতে হাঁটতে বের হয়ে আসে দুটি ছায়ামূর্তি। ঘোড়ার উপরে চৌধুরী, আর ঘোড়ার মুখের লাগামের কড়া ধরে রামাই দিগোয়ার। খুট্‌ খুট্‌, ঠুক্‌ ঠুক্‌, ঘোড়ার খুরের নাল সড়কের বুকের উপর ছোট ছোট শব্দ শিউরে দিয়ে আস্তে আস্তে চলতে থাকে। সেই সঙ্গে ছোট ছোট হাসির টেঁকুরও বাজে। মাঝে মাঝে নেশাতুর নিঃশ্বাসের বাতাসও যেন তপ্ত হয়ে ফোঁস ফোঁস শব্দ করে ওঠে ; মধুকুপির এই সন্ধ্যার ঠাণ্ডা অন্ধকারের গা শুঁকে শুঁকে একটা নরম-গরম মাংসল স্বাদুতা খুঁজে বেড়াচ্ছে দুটি টলমল খুশির ক্ষুধা।

সড়ক থেকে নেমে মেঠো পথ ধরে কিছু দূর এগিয়ে যায় এই ছায়াময় অভিযান। রাংচিতার ঝোপের উপর জোনাকি জ্বলে ; তারই গা ঘেঁষে ছোট একটা মাটির ঘর।

গলা ফাঁটিয়ে হাঁক দেয় রামাই—খবরদার!

রামাইয়ের এই হাঁকের মধ্যে যেন একটা বিভীষিকা আছে। রাংচিতার জোনাকির দল কেঁপে ওঠে ; আর কেঁপে ওঠে মাটির ঘরের ভিতরে লুকিয়ে আর ঘুমিয়ে পড়ে থাকা একটা প্রাণ।

ঘরের দরজার কাছে এসে আর একবার গলা কাঁপিয়ে হাঁক দেয় রামাই—মিঠুয়া ঘাসী আওয়াজ দাও।

ঘরের ভিতরে হাঁউমাঁউ করে কেঁদে ওঠে একটা মেয়েমানুষ ; যেন মেয়েমানুষটার বুকের সব পাঁজর ভয় পেয়ে একসঙ্গে আর্তনাদ করে ফেটে গিয়েছে।

রামাই দিগোয়ার হাসে ঃ বাইরে বের হয়ে এসে কথা বল, তেতরি।

দরজা খুলে বের হয়ে আসে তেতরি ঘাসিন। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে চেঁচাতে থাকে ঃ তুই আবার মানুষটার নাম ধরে হাঁক দিলি কেন রামাই?

রামাই হাসে—তাতে ভয় পাস কেন?

তেতরি গুনগুন করে কাঁদে—মরা মানুষের নাম ধরে হাঁক দিলে যে বড় ডর লাগে। তুই এটা বুঝিস না কেন? তোকে কত বললাম, কত পরবী দিলাম, তবু তুই মানলি না রামাই!

চৌধুরী—কি বটে রামাই? মাগি কাঁদে কেন?

রামাই হাসে ঃ ওর মরা মরদের নাম হেঁকেছি বলে ভয় পেয়ে কাঁদছে। কিন্তু আমার দোষ নাই হুজুর। থানাতে দাগীর খাতায় ওর মরদ মিঠুয়া ঘাসীর নাম লিখা আছে।

চৌধুরী হাসে—তুই কেন মিছা এত রস করিস রামাই? যখন জানিস যে লোকটা নাই, তখন ওর নাম হেঁকে লাভ কি?

রামাই—থানা যদি নামটা না কাটে, তবে আমি বা কেন...।

চৌধুরী—ওসব কথা এখন রাখ্‌ রামাই। এখানে এলি কেন বল?

রামাই ফিসফিস করে ঃ তেতরির ঘরে থাকবেন কি হুজুর?

চৌধুরী—নাঃ।

রামাই—তবে চলেন হুজুর।

আবার খুট্ খুট্, ঠুক্ ঠুক্। ঘোড়ার ঘুরের নাল পথের কাঁকর পাথরের উপর দিয়ে ছোট ছোট চোরা শব্দের টোকা মেরে মেরে চলতে থাকে। সড়ক ধরে অনেক দূর এগিয়ে আসার পর আবার মেঠো পথে নেমে দূরের একটা ঘুটঘুটে অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে চৌধুরী আর রামাই দিগোয়ারের অভিযান।

পাকুড়তলার কাছে পৌঁছেই একটা কুঁড়ে ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে হাঁক ছাড়ে রামাই--খবরদার! ভরত শিয়ালগীর আওয়াজ দাও।

ঘরের ভিতর থেকে আওয়াজ দেয় একটা উগ্র কণ্ঠস্বর। চিৎকার করে রামাইয়ের নামে অভিশাপ বর্ষণ করে পল্টনী দিদি।--মর্ মর্ মর্, মুখপোড়া খালভরা। তোর ঘরে জোড়া মড়া মরে না কেন? তোর মাগ দশবার রাঁড় হয় না কেন?

সেই চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমানুষের কান্নার করুণ শব্দ মেশামেশি হয়ে অদ্ভুত এক বিলোপের মত বাজতে থাকে।

হি-হি করে গলা কাঁপিয়ে হাসতে থাকে রামাই। চৌধুরী বলে—এটা যে একটা ক্ষেপী শিয়ালী বটে, রামাই?

রামাই—হ্যাঁ, হুজুর। কিন্তু জিনিসটা ভাল। মাগি লড়াইয়ের সময় অনেক সলজারের অনেক পয়সা খেয়েছে, কিন্তু এখন তালপাখা বেচে আর কাঁদে ; আর নিজেরেই ভুখা পেটটাকে গালি গিয়ে চিল্লাচিল্লি করে।

গলা কেশে নিয়ে বন্ধ দরজাটার দিকে তাকিয়ে আবার চেঁচিয়ে রুক্ষ স্বরে ধমক দেয় রামাই—গালি দিবি না পল্টনী ; খবরদার! বের হয়ে এসে মুন্সীজীকে সেলাম দে।

পল্টনীর চিৎকার হঠাৎ ভয়ে রুদ্ধ হয়ে যায়। কাঁপতে কাঁপতে একটা ঢিবরি জ্বালে পল্টনী। তার পরেই দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়িয়েই কাঁদতে থাকে ঃ আপনি এই কশাইটাকে একটুক বলে দেন হুজুর ; ও যেন আর মানুষটার নাম ধরে হাঁক না দেয়।

চৌধুরী—কেন?

পল্টনী—কপালবাবা দয়া করে মানুষটাকে কবেই নিয়ে গিয়েছে হুজুর। মিছা সেই মানুষটার নাম হেঁকে এই কশাইটা মজা করে কেন?

রামাই—দাগীর খাতায় ভরতের নাম লিখা আছে ; আমি কি করবো বল?

চৌধুরীর মুখেও বিচিত্র কৌতুকের হাসি মিটমিট করে ঃ বেশ বেশ, বলে দিচ্ছি, আর তোর মরদের নাম হাঁকবে না রামাই।

কথা শেষ করে আর ঘরের ভিতর উঁকি দিতে গিয়েই চমকে ওঠে চৌধুরী--তোর ঘরের ভিতর ওদুটা কেমন জানোয়ার বটে রে পল্টনী?

পল্টনী দিদির দুই ছেলে, ধবধবে ফরসা আর নীলচে চোখ, কটা আর মোটা, ঘরের ভিতরে একগাদা ছেঁড়া কাঁথার উপর বসে ঠক্ঠক্ করে কাঁপছে। চৌধুরীর চোখের বিস্ময়কে আরও চমকে দিয়ে হাসতে থাকে রামাই--ও দুটো সলজারের দয়া বটে।

রামাইয়ের দিকে কটমট করে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে পল্টনী—তাতে তোর চোখ পুড়ে কেন রে ডাইনের বেটা?

—চুপ। ধমক দেয় চৌধুরী।

পল্টনীও মাটির উপর ধপ্ করে বসে পড়ে আর কপালে হাত দিয়ে গুনগুন করে কাঁদতে থাকে ঃ ধমক দিলে আমি মানবো কেন হুজুর! আমার কটা আর মোটার উপর ডাইনের নজর পড়েছে হুজুর। একবার দেখেন হুজুর, আমার কটা আর মোটার হাড়মাসের কী দশা হয়েছে।

কটা আর মোটা ; একটা সাত বছর, আর একটা ছ বছর বয়সের ধবধবে সাদা ও রোগা জিরজিরে অপার্থিব প্রাণী। চৌধুরীর সেই বিস্মিত চাহনির রকম দেখে যেন আরও আতঙ্কিত

হয়ে কুঁকড়ে যেতে থাকে কটা আর মোটা।

—মরে গেলাম গো মা। চেঁচিয়ে ওঠে কটা।

—তুই এখানকে আয় গো মা। ফোঁপাতে থাকে মোটা।

—চল রামাই। বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে চৌধুরী।

চৌধুরীর কাছে এগিয়ে এসে, আর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে রামাই ঃ পল্টনীর ঘরে থাকেন না কেন, হুজুর।

—না। ভাল জায়গা থাকে তো চল, নয় তো ফাঁড়ি ফিরে চল।

মাথা চুলকোয় রামাই ; কি যেন ভাবে। তারপর, যেন একটা নতুন আবিষ্কারের আনন্দে হঠাৎ ছটফট করে ওঠে ঃ ভাল জায়গা আছে হুজুর। সেটাও দাগর ঘর বটে। কিন্তু...।

চৌধুরী—কি?

রামাই—দাগীটা যদি ঘরে না থাকে, তবে...তবেও একটুক বুঝে সুঝে কাজ নিতে হবে, হুজুর।

খুট্ খুট্, ঠুক্ ঠুক্! টাট্টু ঘোড়ার খুরের নাল আবার পাকা সড়কের উপর দিয়ে ছোট ছোট শব্দ বাজিয়ে চলতে থাকে।

খুব বেশি দূর এগিয়ে যেতে হয় না। কয়েকটা নিমগাছ, আর একটা বাঁশঝাড় যেখানে পথের দু পাশে দাঁড়িয়ে রাতের বাতাসে গা দুলিয়ে অন্ধকার নাড়ছে, সেখানে এসেই হাঁক ছাড়ে রামাই—খবরদার!

চৌধুরীর নেশার আবেশ একটা বিপুল আশার চমক সহ্য করতে গিয়ে কেঁপে ওঠে ঃ হাঁ গাঁ রামাই। বড় ভাল জায়গাতে এসেছিস।

রামাই হাঁক দেয়—দাশু ঘরামি আওয়াজ দাও।

কোন আওয়াজ নেই। একটা নীরব ও নিস্তব্ধ মাটির ঘর ; জামকাঠের জীর্ণ কপাট ভিতর থেকে বন্ধ। এই ঘরের সামনে এসে এই প্রথম হাঁক দিল রামাই। এই পাঁচ বছর ধরে এই ঘরের ভিতরে একটা সুন্দর চেহারার মেয়েমানুষ একলা পড়েছিল ; তবু কোন রাতে এই ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াবার সাহস পায় নি রামাই। কিন্তু আজ যে কোন সন্দেহ নেই, এই ঘর দাশু ঘরামি নামে এক দাগীর ঘর। আজ অনায়াসে এই ঘরের দরজার উপর লাঠির বাড়ি মারতে পারে ; দাগীর ঘুম ভাঙিয়ে দাগীকে ঘরের বাইরে আনতে পারে রামাই। আর দাগীর কোন ভুলের আঁচ পেলে জোর গলায় পরবী দাবিও করতে পারে।

—সরদার ঘরে আছ কি নাই? আবার ডাক দেয় রামাই।

কোন সাড়া শোনা যায় না। ঘরের ভিতর একটা বাতিও জ্বলে ওঠে না।

নিরুত্তর ঘরটার উপর যেন একটা আক্রোশ নিয়ে আবার হাঁক দেয় রামাই—সরদারিন কি নাই?

কপাটের উপর রামাইয়ের টাঙ্গির হাতলের বাড়ি লাফিয়ে লাফিয়ে আছড়ে পড়তে থাকে।

রামাই বলে—আওয়াজ দাও সরদারিন।

—কে বট? ঘরের ভিতর থেকে একটা ভীত কণ্ঠস্বর ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে প্রশ্ন করে।

—আমি রামাই দিগোয়ার।

—তুমি এখানে আস কেন?

দাগীর হাজিরা নিতে এসেছি। তোমার মরদ দাশু ঘরামিকে দেখতে চাই।

—সে নাই।

—কোথায় গেল?

—কয়লা খাদে।

—তবে তুমি বের হয়ে এসো।

—না।

—খবরদার। মুন্সীজী দাঁড়িয়ে আছেন। জলদি বের হয়ে এসো।

—না।

—তোমার বয়ান নেবেন মুন্সীজী।

—আমি কিছু বলতে পারবো না।

—বলতে হবে।

—না।

—আমরা তোমার বাপের বাড়ির মানুষ নই গো সরদারিন ; আমরা থানার মানুষ। যা বলছি, চুপচাপ শুন আর মেনে নাও।

দাগীর ঘরটা এইবার কোন উত্তরই না দিয়ে একেবারে নীরব হয়ে যায়।

জামকাঠের কপাটের উপর মুখ রেখে আস্তে আস্তে ফিসফিস করে রামাই ঃ বাতিটা জ্বাল সরদারিন। একবারটি বের হয়ে এসো। মুন্সীজীর কাছে একটুক বসো। একটুক হেসে কথা বল। মুন্সীজী তোমার উপর বড় খুশি হবেন।

দাগীর ঘরটা তবু যেন একটা বধির কবরের মত নীরব হয়ে থাকে। ঘরের ভিতরে বাতি জ্বলে না ; কোন সাড়াও শোনা যায় না।

দরজার দিকে এইবার আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে স্বয়ং চৌধুরী। নেশাক্রান্ত নিঃশ্বাসের জ্বালাটা আহত অজগরের মত ফুঁসে ওঠে ঃ একটা লাথি মেরে দরজাটাকে ভেঙ্গে ফেল রামাই। তারপর দেখি, সরদারিনের গতর ভাল, না, গমর ভাল?

জামকাঠের যে জীর্ণ কপাট বাচ্চা-নেকড়ের থাবার আঘাত সহ্য করতে গিয়ে নড়বড় করে, সে কপাট ভেঙে দু টুকরো করে ফেলতে কতটুকুই বা জোরের দরকার।

কিন্তু আর কোন জোরের দরকার হয় না। ঘরের ভিতরে রেড়ির তেলের মেটে বাতির আলো জ্বলে ওঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে খুলে যায় কপাট। দরজার চৌকাঠের কাছে বাতিটাকে রেখে দিয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায় মুরলী।

মুরলীর আদুরে শরীরের উপর শুধু দেড় হাত বহরের একটা মোটা খেরো শাড়ির আবরণ ; এক পাক দিয়ে জড়ানো একটা বিচিত্র শিথিলতা। রেড়ির তেলের মেটে বাতির শিখাটা নেচে নেচে জ্বলে, সেই সঙ্গে মুরলীর মুখের উপর একটা অদ্ভুত হাসির শিখাও যেন জ্বলে জ্বলে নাচে। দেড় বোতল সরাবের নেশায় টলমল চৌধুরীর নতুন পিপাসার সব আক্রোশের উপর যেন একটা বিস্ময়ের কুহক ছড়িয়ে দিয়েছে মুরলীর এই মূর্তি ; চৌধুরীর চোখে পলক পড়ে না। রামাই দিগোয়ারও কথা বলতে ভুলে যায়।

কথা বলে মুরলী। আস্তে ঘাড় দুলিয়ে সড়কের অন্ধকারের দিকে একবার তাকায়, তারপর মুখ ফিরিয়ে আর ভুরু বাঁকা করে বাতিটার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপরেই ঠোঁটে ঠোঁট চেপে দূর আকাশের তারার মত একটা মিটিমিটি হাসি মুখের উপর ফুটিয়ে তুলে চৌধুরীর মুখের দিকে তাকায়। কি যেন শুনলাম, কি যেন দেখবে বলে তুমি এখনি কসম খেলে চৌধুরীজী?

চৌধুরী—অ্যাঁ? অ্যাঁ? কিসের কসম?

মুরলী—কি দেখবার ইচ্ছা হয়েছে? আমার গমর ভাল, না, গতর ভাল?

গলা কাশে মুরলী, রামাই দিগোয়ার ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। আর, সরু কোমরের উপর যেন একটা মত্ত ঝুমুরের ঢং হঠাৎ মোচড় দিয়ে দুলিয়ে ও খিলখিল করে হেসে ওঠে মুরলী ঃ আমার গতর ভাল, গমরও ভাল। কিন্তু...।

চৌধুরী বিড়বিড় করে ঃ রাগ করো না সরদারিন।

মুরলী—কেন রাগ করবো না বল? যে লোক মেয়েমানুষের সাথে কথা বলতে জানে না, মেয়েমানুষের মন বুঝে না, সে লোক এখানে আসে কেন?

চৌধুরীর গলার স্বর আরও মৃদু হয়ে যেন অনুনয় করে ঃ ওসব কথা ভুলে যাও। তুমি এখন খুশি হয়ে দুটা কথা বল।

হেসে ছটফট করে দু পা পিছনে সরে গিয়ে ভাঙা খোঁপাটাকে শক্ত করে জড়িয়ে বাঁধতে চেষ্টা করে মুরলী ঃ খুশি কর, তবে তো খুশি হব।

চৌধুরী—কি চাও বল?

মুরলী—সরাব কই? শাড়ি কই?

চৌধুরী—কুণ্ঠিতভাবে হাসে ঃ সব দিব। সব দিব।

মুরলী—দেবতার নামে কিরা করে বল।

চৌধুরী—হে বৈকুণ্ঠনাথ, হে বিষ্ণু ভগবান, কিরা করে বলছি।

আবার ভুরু বাঁকিয়ে আড়চোখে তাকিয়ে হেসে ওঠে মুরলী ঃ তোমার চৌধুরিনের দোহাই?

চৌধুরী এইবার চেঁচিয়ে হেসে ওঠে, আর চোখের চাহনিটাও টলমল করে ঃ আরে হ্যাঁ, তাই বটে। তুমি বড় বেশি নখড়া জানিস সরদারিন।

মুরলী—আমিও কিরা করলাম।

চৌধুরী—কিসের কিরা?

আঁচল তুলে মুখ চাপা দিয়ে হেসে ওঠে মুরলী ঃ সব দিব।

ব্যস্তভাবে ডাকে চৌধুরী—রামাই।

রামাই—হুজুর।

চৌধুরী—তুই এখন তবে...।

রামাই—আমি ঈশান মোক্তারের কুঠিতে চললাম হুজুর। আপনি এখানে থাকেন।

আবার হেসে ওঠে মুরলী ঃ আজ নয় চৌধুরীজী।

চমকে ওঠে চৌধুরী ঃ অ্যাঁ, কি বটে? কি বললে সরদারিন?

মুরলী—আজ নয় ; এখানেও নয়। আমাকে নিয়ে যেতে হবে।

চৌধুরী বিড়বিড় করে ঃ নিয়ে যেতে হবে?

চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী ঃ হ্যাঁ, যেখানে নিয়ে যাবে সেখানে যাব। আমাকে ঘর দিবে, শাড়ি দিবে, সরাব দিবে, সুখে রাখবে। মেয়েমানুষের মন বুঝতে পার না, কথা বল কেন?

চৌধুরী ডাক দেয়—রামাই।

রামাই—বলেন হুজুর।

চৌধুরী—সরদারিন ভাল কথা বলছে।

রামাই—খুব ভাল কথা। এমন গতর, এমন সুরত, আর এমন মিঠা রংঢং, এই মানুষ কিষাণের ঘরে থাকবে কেন? কোন্ সুখে? দাগীর মাগ হয়ে এর কোন্ ইজ্জতটি হবে?

চৌধুরী—তবে গোবিন্দ বাবুর বাজারে একটা ঘর নিতে হয়।

রামাই—ভাল হয় হুজুর।

মুরলীর দিকে দু পা এগিয়ে আসে চৌধুরী ঃ বল, কবে যাবি সরদারিন?

দু পা পিছিয়ে সরে যায় মুরলী ঃ অমন হুকুম করলে যাব না। ডর দেখালে যাব না।

চৌধুরী বিচলিত হয় ঃ না না, হুকুম করছি না, ডর দেখাচ্ছি না। আমি তোকে সাধছি।

যেন রূপের গমরে আর অভিমানে ফুঁপিয়ে ওঠে মুরলী ঃ আমাকে পায়ে ধরে সেধে নিয়ে যাবে, তবে যাব। তা না হলে যাব না, মেরে ফেললেও না।

ঝুঁকতে ঝুঁকতে আরও এক পা এগিয়ে যেয়ে মাটির উপর উবু হয়ে বসে পড়ে চৌধুরী ;

আর ব্যাকুলভাবে হাত দুটোকে ছুঁড়ে দিয়ে মুরলীর দু পায়ের পাতা ছুঁয়ে ফেলে ঃ আমি সাধছি, সরদারিন।

আবার হেসে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে সরে যায় মুরলী ঃ ঢের হয়েছে। এবার ঘরে যাও, আর...।

চৌধুরী—বল।

মুরলী—একটা খবর দিয়ে ঝালদা থেকে আমার বাপকে নিয়ে এসো।

চৌধুরী—শুনে নে রামাই।

মুরলী—আমার বাপ, মহেশ রাখাল।

এইবার সত্যিই ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলে মুরলী ঃ বুড়া বাপের সাথে একবার দেখা না করে আমি যাব না, কভি না।

রামাই—কাঁদ কেন? আমি বলছি, কালই তোমার বাপকে ঝালদা থেকে ডেকে এনে...।

চৌধুরী—সে তো হলো, তারপর?

মুরলীর চোখমুখ আবার প্রসন্ন হয়ে ওঠে, আর ঠোঁটের ফাঁকের সূক্ষ্ম হাসিটাও দূরের তারার আলোর মত আবার মিটমিট করে কাঁপে ঃ তারপর আর কি? তোমরা খবর দিও, কবে যেতে হবে।

রামাই বলে—ব্যস্, এখন চলেন হুজুর।

মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে ডাকে চৌধুরী—সরদারিন! তোর ভাল গমর তো দেখলাম, কিন্তু...

মুরলী—কি?

চৌধুরী—কিন্তু তোর এত ভাল গতর, কানে কানে একটা কথা বলতে চাই শুনবি?

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে মুরলী ঃ আর কোন কথা বললে আমি আবার কেঁদে ফেলবো গো বাবু। আজ আর কিছু শুনবো না।

ছুটে গিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দেয় মুরলী। রেড়ির তেলের মেটে বাতিটাও এক ফুৎকারে নিভে যায়।

খুট খুট, ঠুক ঠুক, টাট্টু ঘোড়ার খুরের নাল সড়কের বুকের উপর টোকা দিতে দিতে চলে যাচ্ছে। সে শব্দ শুনতে শুনতে খেজুরপাতার চাটাইয়ের উপর যেন আছাড় খেয়ে পড়ে মুরলী, আর মেঝের মাটির উপর কপালটাকে ঘষে ঘষে ছটফট করতে থাকে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সারা শরীর একটা যন্ত্রণার জ্বালায় জ্বলছে।

পুরনো জামকাঠের এই নড়বড়ে কপাট, আর এই মাটির ঘর ; দাশু ঘরামি নামে একটা দাগীর ঘর। বাইরের অন্ধকার থেকে যে-কোন সাপ আর বাঘ এই ঘরের ভিতরে ঢুকে দাগীর মাগের মাংস গিলে খাবার জন্য হাঁ করবে। অসহ্য। এই মুহূর্তে এই ঘরের মাটির উপর থুতু ফেলে দিয়ে চলে যেতে ইচ্ছা করে।

না, এখনই চলে যাওয়া যায় না। খবর পেয়ে ঝালদা থেকে চলে আসুক বুড়া মহেশ রাখাল। তারপর আর এক মুহূর্ত দেরি করবে না মুরলী। বাঁচতে হবে, পেটের ছেলেটাকে বাঁচাতে হবে ; কয়লাখাদের মালকাটা হপ্তা পরে ঘরে ফিরে এসে দেখুক, ভাত নাই, মান নাই আর কোন সুখের আশা নাই যে ঘরে, সে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছে মুরলী।

স্তব্ধ রাতের বাতাসে অনেক দূর থেকে কলের বাঁশির ক্ষীণস্বরের কাঁপুনি ভেসে আসছে। কয়লাখাদের কাজের বাঁশিটা আজ এই রাতে কঁকিয়ে কঁকিয়ে কাঁদছে কেন বোঝা যায় না। খেজুরপাতার চাটাইয়ের উপর শুয়ে চোখ বুজতে গিয়ে চোখের উপর একটা আতঙ্কের ছবি দেখে আবার ছটফট করে মুরলী। কী ভয়ানক ছবি! কালো লেংটি পরা, সারা গায়ে কয়লার ধুলো, চোখের চারদিকে ঘামে ভেজা কয়লাগুঁড়ো কাদা হয়ে রয়েছে, আর কাঁধে একটা

গাঁইতা ; একটা ভয়ানক জীব এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাক দিচ্ছে—কপাট খোল মুরলী।

মুরলীর বুকের পাঁজরগুলি একটা প্রচণ্ড শাস্তির রূপ দেখে শব্দ করে চমকে ওঠে। কানের কাছে একটা ঠাট্টার হাসিও বাজছে। হাসিটা পলুস হালদারের হাসি ঃ কি মুরলী? আমাকে চোর বলে গালি দিয়ে ভাগিয়ে দিলে, তবে এখন কাঁদ কেন? এখন হাস না কেন? সুখ কর না কেন?

খেজুরপাতার চাটাই ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় মুরলী। বাতি জ্বালে। খাটিয়ার তলা থেকে টিনের তোরঙ্গটাকে টেনে আনে। দেড় হাত বহরের মোটা খেরো শাড়িটাকে এক টানে নামিয়ে ফেলে। নীল রঙের শাড়ি, মোলায়েম আর মিহি জমিন! গোলাপী রঙের ব্লাউজ। লেসের ঝালর লাগানো সায়া। জীবনের সব চেয়ে বড় সাধের ইচ্ছার অভিসারে এখনি যেন ছুটে চলে যেতে চায় মুরলী।

সিস্টার দিদি যেমনটি সাজ করতে শিখিয়ে দিয়েছেন, নিজের হাতে মুরলীকে যে সাজে কতবার সাজিয়েছেন, সেই সাজে নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে আয়নাটাকেও মুখের কাছে তুলে ধরে মুরলী। চিরুনি চালায়, নতুন করে খোঁপা বাঁধে। গোটানো বিছানাটাকে ঘরের এক কোণ থেকে তুলে নিয়ে এসে খাটিয়ার উপর পাতে। নরম তুলোর তোশক বালিশ আর চাদর। সেলাই কলটাকেও আবার হাতের কাছে টেনে নেয়। গাঁটরি করে বাঁধা লেসগুলিকেও হাতের কাছে রাখে।

ঘর্ ঘর্, ঘর্ ঘর্—কল চালিয়ে কাপড়ের টুকরোর উপর সুতোর নক্‌শা আঁকে মুরলী ; গেঁয়ো মধুকুপির যত দীনতা আর হীনতার বিরুদ্ধে গর গর করে যেন নতুন আক্রোশের গান গাইছে মুরলীর প্রাণের ফিরে-পাওয়া একটা সাধ।

পিলাই কাটাই। এজরা ব্রাদার্সের কয়লাখাদের ভিতরে ও বাইরে একটা ব্যস্ততার মহোৎসব।

বিকাল থেকে পিলার কাটাই শুরু হয়েছে। সন্ধ্যা পার হয়ে রাতেরও প্রায় আধ প্রহর পার হয়ে গিয়েছে। হাবিস করে হয়রান হয়ে যাচ্ছে টালোয়ান। অফুরান ক্ষুধার আবেগে খাদের গভীরে নেমে যাচ্ছে শূন্যেদের টবগাড়ি ; আর এক একটা বিশ হন্দরের উদর ভর্তি করে চাপ চাপ কয়লার টুকরোতে পরিপূর্ণ হয়ে উপড়ে উঠে আসছে। ম্যানেজার দু বার খাদের ভিতরে গিয়ে পিলার কাটাইয়ের ব্যবস্থা তদারক করে গিয়েছেন।

আজ সব ব্যাপারেই অতিরিক্ততা। বেশি করে মালকাটা লাগানো হয়েছে। বেশি করে টবগাড়ি ছাড়া হয়েছে। টবের হিসাব করবার জন্য দুজন বেশি মুন্সী খাদের নীচে নেমে গিয়েছে। একজনের জায়গায় তিনজন ওভারম্যান কাজে নেমেছে। ফার্স্ট এড্ সরঞ্জাম নিয়ে ডাক্তারও খাদের ভিতরে নেমেছেন।

দখিনা সুঁদের আগুতে আর মাল নেই ; পাথরের ফাঁড় দেখা দিয়েছে। সেখানে আজ পিলার কাটাইয়ের মহোৎসব। ছাড় কয়লার যে-সব পিলার পাথুরে ওভারবার্ডেন মাথায় নিয়ে চুপ করে সারি সারি দাঁড়িয়ে ছিল, তারই উপর আছাড় খেয়ে পড়ছে শত শত গাঁইতার কোপ। কয়লা-গুঁড়োর ঝটকা উড়ছে, হাজার শালের রোলা দিয়ে ঠেকানো পাথুরে ছাদের একটা অন্ধ আক্রোশের ভার পট্ পট্ শব্দ করে ফাটছে। মাঝে মাঝে বিদীর্ণ পাষাণের শব্দ রাক্ষুসে হুংকারের মত ফেটে পড়ছে।

মালকাটার বুকের পাঁজর কেঁপে উঠলেও মালকাটার হাতের গাঁইতার দুঃসাহস একটু বিচলিত হয় না। পিলারের উপর কোপ দিয়ে কয়লার এক-একটা প্রকাণ্ড চাঙ্গড় টেনে এনে টব বোঝাই করছে সবাই। যে টব বোঝাই করতে অন্যদিন চার ঘণ্টা লাগে, সে টব আজ এক ঘণ্টায় ভরে ফেলেছে এক একজন মালকাটা। আজকের রোজগারের আশাও একটা

ভয়ানক নেশা ; লুঠেরো ডাকাতের মত হিংস্র হয়ে আর মরিয়া হয়ে যেন একটা ভাণ্ডার লুঠ করছে মানকাটার দল। তারই মধ্যে দেখা যায়, সব চেয়ে বেশি দুরন্ত দুঃসাহসে মরিয়া হয়ে গাঁইতা চালিয়ে যাচ্ছে মধুকুপির দাশু ঘরামি।

সরদার হাঁক দেয়—খবরদার! দাশু ঘরামি, খবরদার! আর আগে যাবে না, খবরদার!

কিন্তু দাশু বোধহয় শুনতে পায় না। মজুরী লুট করবার এই প্রচণ্ড মহোৎসবে মন-প্রাণ লুটিয়ে দিয়ে গাঁইতা চালিয়ে যাচ্ছে দাশু। এরই মধ্যে পাঁচ টব বোঝাই করে ফেলেছে দাশু ; কিন্তু তবু শ্রান্তি নেই। জিরোতে চায় না দাশু।

ছাদ ফাটে, কালো ধুলোর ঝট্‌কা ছোটে, শালের রোলা ছিটকে পড়ে, আর মাথার উপরে অন্ধ পাথরের ভার গুমরে গুমরে আরও কাছে নেমে ঝুলতে থাকে। সরদার হাঁক দেয়—খবরদার!

বার বার হুঁশিয়ারি দাগ এক লাফে টপকে গিয়ে ভাঙা পিলারের চাঙড় টেনেছে দাশু। চিৎকার করে ধমক হাঁকে সরদার ঃ মরবি নাকি রে দেহাতী গাধা। দাশুর গাঁইতার উপর লাঠি মেরে, দাশুকে ধাক্কা দিয়ে পিছনে সরিয়ে দেয় সরদার। চুপ করে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকে দাশু।

সেই মুহূর্তে আতঙ্কিত হয়ে হাঁক ছাড়ে সরদার—গাঁইতা রোকো, মালকাটা। পিছে হঠো, মালকাটা। ঢিবরি নিভাও, মালকাটা। সুঁদ ছাড়ো, বাইরে ভাগো মালকাটা!

বেজে উঠেছে গ্যাসবাবুর হুইসিল। গ্যাস দেখা দিয়েছে। আতঙ্কের হুইসিলটা বাজতে বাজতে খাদের মুখের দিকে চলে যায়। ঢিবরি নিভিয়ে দিয়ে ওভারম্যানের সেফটি ল্যাম্পের সঙ্কেতের দোলানি লক্ষ্য করে মালকাটার দল ছুটতে থাকে।

কিন্তু একটা মিনিট পার না হতেই দখিনা সুঁদের অন্ধকারময় বিরাট রন্ধ্রটা যেন গুমরে ওঠে ; আর, প্রচণ্ড হাওয়ার একটা ঝাপ্টা ছুটে চলে যায়। মুখ থুবড়ে পড়ে যায় তিনটা মালকাটা। গ্যাসের হাওয়া ফেটেছে।

খাদের মুখের কাছে সাইরেনের করুণ আর্তনাদ শিউরে শিউরে বাজতে থাকে। খোলা ভাঙা পার হয়ে দূরের মধুকুপির বড়কালুর আর ছোটকালুর মাথার উপর দিয়েও এই আতঙ্কের ক্ষীণ স্বর ভেসে চলে যায়। মাথা গুনতির পর দেখা গেল, চারজন মালকাটা নেই। দুশ্চিন্তিত ম্যানেজার বিচলিত স্বরে হাঁকডাক করেন ঃ রেস্ক্যু! রেস্ক্যু!

টর্চ দড়ি স্ট্রেচার আর জল নিয়ে খাদের ভিতরে নামবার জন্য যে রেস্ক্যু পার্টি প্রস্তুত হয়, তাদেরই একজনের মুখের দিকে তাকিয়ে ম্যানেজার বলেন—এক শো টাকা বকশিশ দেব, পলুস।

পলুস বলে—বহুৎ আচ্ছা স্যার।

কে না জানে, কলঘরের বড় মিস্তিরি এই পলুস হালদার এর আগে তিনবার এই খাদেরই তিনটে দুর্ঘটনায় রেস্ক্যুর কাজ করেছে। তিনবার বকশিশ পেয়েছে কলঘরের বড় মিস্তিরি পলুস হালদার। আর এক মুর্হূতও দেরি না করে সুড়ঙ্গের ঢালু ধরে খাদের গভীরে প্রায় দৌড়ে দৌড়ে নেমে যেতে থাকে পলুস আর রেস্ক্যু দল!

দখিনা সুঁদের মুখের কাছে এক জায়গায় জড়সড় হয়ে বসে ছিল যারা, তারা হলো জামুনগড়ার তিনজন দেহাতী মালকাটা। হাওয়ার ঝটকার চোট বুকে পিঠে লেগেছিল, হঠাৎ দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আর মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল। তাই মুখের এখানে-ওখানে চাম ছড়ে গিয়েছে, জখমগুলি সাংঘাতিক কিছু নয়। জখমের চেয়ে ওদের হতভম্ব চোখ আর মুখগুলি বেশি করুণ। এক হাতে নেবানো ঢিবরি আর অন্য হাতে গাঁইতা ধরে যেন একটা আতঙ্কের ভারে অনড় হয়ে বসে ছিল ওরা।

পৌঁছে যায় রেস্ক্যু দল ; কলঘরের বড় মিস্তিরি পলুস হালদার, তিনজন মেশিন খালাসী,

তিনজন কুলী মেট আর কম্পাউণ্ডার। রেস্কু্য দলের হাঁকডাকে চমকে ওঠে তিন মালকাটা। উঠে দাঁড়ায়, জল খায়, তারপর হাঁপ ছেড়ে হাসতে থাকে। একজন কুলি মেটের হেপাজতে তিন মালকাটাকে খাদের বাইরে রওনা করিয়ে দিয়ে সুঁদের ভিতরে টর্চের আলো ছোঁড়ে পলুস।

বিপদ যত ভয়ানক বলে মনে হয়েছিল, তত ভয়ানক নয়। গ্যাসে আগুন লেগেছে বলে মনে হয় না। বোধহয় সুঁদের ছাতের শেষ দিকটা ধসেছে ; তাই প্রচণ্ড হাওয়ার ঝটকা ছুটে গিয়েছে।

কিন্তু আর একটা মালকাটা কোথায়? গ্যাসে জখম হয়ে সুঁদের ভিতরে কোথাও পড়ে আছে কি।

উপর থেকে তিনটে টবগাড়ি জলে ভরা বড় বড় ড্রাম নিয়ে নেমে আসে। তিন মেশিন খালাসী একসঙ্গে হাত লাগিয়ে পাম্প চালায় ; হোস পাইপ হাতে তুলে নিয়ে সুঁদের ভিতরে জলের ফোয়ারা ছড়াতে থাকে পলুস হালদার।

—গ্যাস মরে এসেছে বোধহয়। বিড়বিড় করে কম্পাউণ্ডার।

—না মরলেও এই গ্যাসের তেজ নাই মনে হয়। ফিসফিস করে একজন কুলি মেট।

—তোমরা এখানে থাক। আমি একটুক তল্লাস করে দেখি। ভেজা গামছা নাকের কাছে ধরে রেখে, আর টর্চ হাতে নিয়ে সুঁদের ভিতরে এগিয়ে যায় পলুস। একশো টাকা বকশিশের সবটুকু পেতে হলে যে সাহস আর বুদ্ধি দরকার, তার সবটুকু কলঘরের বড় মিস্তিরি এই পলুস হালদারের আছে।

টর্চের আলো ছড়িয়ে দেখতে থাকে পলুস। না, কোন জখমী মালকাটার শরীর সুঁদের ভিতরে কোথাও পড়ে নেই। মাঝে মাঝে ভিতরের দিক থেকে গুম গুম শব্দ, আর ছোট ছোট হাওয়ার ঝটকা ছুটে আসছে। তবে কি ছাদের ধসে চাপা পড়ে গুঁড়ো হয়ে গেল মানুষটা?

গ্যাসের তেজ নাই ঠিকই ; আরও ভিতরে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় পলুস। কী আশ্চর্য , পলুসের পায়ের কাছেই পড়ে আছে একটা ঢিবরি। দেখে খুশি হয় পলুস। না, ধস চাপা পড়ে নি বোকা মালকাটা ; এতদূর যখন পালিয়ে আসতে পেরেছে, তখন এদিকেই কোথাও না কোথাও পড়ে আছে। সুঁদের গায়ের ডাইনে বাঁয়ে টর্চের আলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেখতে থাকে পলুস ; তারপর একটা লাফ দিয়ে এগিয়ে যেয়ে একটা মানুষের হাত চেপে ধরে।

যেন কালো পাথরের হাত-পা দিয়ে তৈরী একটা মজবুত চেহারার লোক, কয়লার গুঁড়োতে চোখ মুখ ছেয়ে গিয়েছে ; সুঁদের গায়ে হেলান দিয়ে, মাথা ঝুঁকিয়ে, চোখ বন্ধ করে আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গাঁইতাটাকে তবু শক্ত করে এক হাতে আঁকড়ে ধরে রেখেছে লোকটা। লোকটার নাক দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে।

লোকটার মুখের উপর টর্চের আলো সুস্থির করে ধরে রেখে, ভেজা গামছা দিয়ে লোকটার চোখ নাক মুখ মুছে দিতে থাকে পলুস ঃ ডর নাই, কথা বল মালকাটা।

লোকটার কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে থাকে পলুস। তারপর চমকে ওঠে, দু পা পিছিয়ে সরে যায়।

লোকটার নাক মুখ চোখ থেকে কয়লাগুঁড়োর আবরণ ভেজা গামছার জলে ধুয়ে যেতেই ফুটে উঠেছে একটা চেনা মুখ। এই তো সেদিন, এক জঙ্গলের নিভৃতে ঘোর কালো রাতের অন্ধকারে একটা গাছের কাছে পলুসের হাতের এই টর্চেরই আলোর ঝাঁজ সহ্য করতে গিয়ে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল এই মুখটা ; এরই নাম দাশু ঘরামি, পলুসের দয়ায় আর ক্ষমার যে মানুষটার প্রাণ বার বার দুবার অনেক শাস্তির মার থেকেই রেহাই পেয়ে গিয়েছে। এই

লোকটা আজও মুরলীর মত নারীর জীবনের মরদ হয়ে আছে। মুরলীর দুর্ভাগ্য ; আর পলুস হালদারের বুকের সেই দুর্বার পিয়াসের ও দুর্ভাগ্য।

দাশুর কাছে এগিয়ে এসে, দাশুর দু কাঁধের উপর হাত রেখে আর শক্ত একটা ঝাঁকুনি দিয়ে হেসে ওঠে পলুস—মধুকুপির দাশু ঘরামি বটে কি?

চোখ মেলে মিটমিট করে তাকায় দাশু। জোরে জোরে দুবার নিঃশ্বাস টানে ; তারপর চোখ বড় করে একটা নিথর ও অপলক দৃষ্টি তুলে পলুস হালদারের ছায়াময় অস্পষ্ট মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর থরথর করে কেঁপে ওঠে। এখানেও পলুস হালদার! দাশুর জীবনের সেই অভিশাপের মূর্তি!

পলুস হাসে ঃ মুরলীর মরদ, মধুকুপির কিষাণ এখানে কেন? কী অদ্ভুত পলুসের এই হাসির শব্দ! কিষাণের ঘরের সাধ আর শান্তির শত্রু হয়েছে। দো-আঁশ মাটির আর সবুজ ক্ষেতের শত্রুটা কথা বলছে। মধুকুপির মাদল-ঝুমুরের শত্রু সেই পলুস হালদার দাশুর ভাগ্যটাকে ঠাট্টা করছে। পরম জয়ের আনন্দে হি-হি করে হাসছে কালো নরকের দানব। দাশুর বুকের ভিতর থেকে যেন এক ঝলক তপ্ত রক্ত উথলে উঠে দাশুর চোখের উপরে ছড়িয়ে পড়ে। চোখ দুটো হঠাৎ লাল হয়ে রক্তপিপাসু নেশার জ্বালায় ছটফট করতে থাকে।

গাঁইতার হাতল দুহাতের মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরে আর-একবার কেঁপে ওঠে দাশু। তারপর একটা লাফ দিয়ে এগিয়ে যেয়ে পলুসের মাথা লক্ষ্য করে গাঁইতা তোলে।

—এ কি? তুমি কি পাগল হয়ে গেলে সরদার? পলুসের হাসিটা করুণ আর্তনাদ হয়ে কেঁপে ওঠে। পলুসের হাতের টর্চও থরথর করে কাঁপে। কিন্তু দাশুর গাঁইতার মুখটাও চিকচিক করে একটা শাণিত হাসি কাঁপাতে থাকে। দাশুর হাতের বধির গাঁইতা পলুস হালদারের এই আর্তস্বরের আবেদন যেন শুনতেই পায় নি। পলুসের মাথার উপর লাফিয়ে পড়ে একটা কোপ দিয়ে কাঁচা রক্তের ফোয়ারা পান করার জন্য দুরন্ত পিপাসার আক্রোশ নিয়ে আবার দুলে ওঠে গাঁইতা।

চেঁচিয়ে ওঠে পলুস—তুমি আমাকে মারবে কেন সরদার? ভুলে যাও কেন, আমি তোমাকে কত দয়া করেছি, তোমাকে কত সাজার ভয় থেকে বাঁচিয়েছি। আমি যে তোমার জখমের রক্ত এখনই নিজের হাতে মুছে দিয়েছি।

দয়া! পলুস হালদারের এই দয়াই যে দাশু ঘরামির অদৃষ্টের সবচেয়ে কঠোর সাজা। আর সহ্য হয় না এই দয়া। দাশুর নিশ্বাসের শব্দ আরও রুষ্ট হয়ে ঘড়ঘড় করতে থাকে। গাঁইতাটাকে একবার নামিয়ে দিয়ে আবার পলুসের মাথার উপর কোপ দেবার জন্য তুলে ধরে আর লাফিয়ে ওঠে দাশু।

—দয়া কর সরদার। 'পলুসের বুকে ভিতর থেকে আরও করুণ ও আরও ভীরু স্বরের একটা আবেদন ঠিকরে বের হয়ে কাতরাতে থাকে।

দয়া চাইছে পলুস হালদার। দাশু ঘরামির জীবনকে বার বার দয়া করে নিষ্ঠুর দেমাকের বিষে ভয়ংকর হয়ে উঠেছে পলুস হালদারের জীবনের যে অহংকার, সেই অহংকার এইবার দাশুর মুখের দিকে ভিক্ষুকের মত তাকিয়েছে।

দাশুর হাতের গাঁইতা যেন পলুসের ভীরু প্রাণের প্রার্থনার শব্দ শুনে লজ্জায় পড়ে ; নেতিয়ে পড়ে গাঁইতা। গাঁইতাটাকে মাটিতে নামিয়ে একহাতে অলসভাবে শুধু একটু ছুঁয়ে ধরে, আনমনার মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে দাশু।

একটা লাফ দিয়ে এগিয়ে আসে পলুস। আর, গাঁইতাটাকে হাতে তুলে নিয়েই পিছনে সরে যায়, কয়লার ধুলোর উপর শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। দাঁতে দাঁতে ঘষে চেঁচিয়ে ওঠে—কিষাণের বাচ্চা কিষাণ!

দুহাত দিয়ে নিজেরই চুলের ঝুঁটি খিমচে ধরে কাঁপতে থাকে দাশু।

—দাগী, ডাকু, চোট্টা, দেহাতী ভিক্ষুক! পলুসের মুখের এক-একটা গালির গর্জন যেন দাশুর বুকের উপর গাঁইতার কোপ মারতে থাকে।

দাশুর লাল চোখ দুটোও যন্ত্রণায় কুঁচকে যেতে থাকে।

—তোকে আমি এখানে মেরে এখানেই পুঁতে দিতে পারি। একটা লাথি মেরে এক রাশ কয়লার ধুলো দাশুর গায়ের উপর ছুঁড়ে দিয়ে চিৎকার করে পলুস।

—তাই দাও না কেন। চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

—না।

—কেন?

—মুরলীকে বুঝাতে চাই, তুই কত ছোট আর আমি কত বড়।

—তাতে তোমার লাভ কি?

—তাতে মুরলী আমার হবে।

—কি?

—হ্যাঁ। তোর ঘরে থুক ফেলে দিয়ে মুরলী আমার কাছে ছুটে আসে কিনা দেখি।

—তুমি কি চাও যে, মুরলী তোমার কাছে চলে আসুক?

—চাই।

—মুরলীকে সে কথা বল না কেন?

—বলেছি।

—কি বলে মুরলী?

—একবার বলে যাব, একবার বলে যাব না। কাছে ডেকে নিয়ে কোমর ছুঁতে দেয়, আবার চোর বলে গালিও দেয়। মুরলীকে আমি চিনে নিয়েছি সরদার। লাফ দিবার আগে একটুক ছটফটিয়ে নিচ্ছে মুরলী। দেখ নাই কি, সতের জলে লাফ দিবার আগে হরিণগুলা কেমনতর ছটফট করে?

বলতে বলতে চেঁচিয়ে হেসে ওঠে পলুস। সেই ভয়ানক হাসির প্রতিধ্বনি সুঁদের পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকি খেয়ে আর গুমরে গুমরে গড়াতে থাকে। আর দাশুর লাল চোখের দৃষ্টি সেই মুহূর্তে মড়ার চোখের দৃষ্টির মত ঘোলা হয়ে যায়। যেন একটা অন্তহীন শূন্যতার দিকে তাকিয়ে দাশুর চোখ দুটো গলে গলে ঝরে যাচ্ছে। না ; মুরলী নেই। পলুস হালদারের হাতের ছোঁয়া কোমরের উপর বরণ করে কবেই মরে গিয়েছে মুরলী।

না না না, অসম্ভব। মহেশ রাখালের মেয়ের প্রাণ এত কপট হতে পারে না। দাশুর বুকের কাছে শুয়ে দাশুর ছেইলার প্রাণ বরণ করে নিয়েছে যে মুরলী, তার কোমর পরের লোভের ছোঁয়া যেচে নিতে পারে না। যতই হিসেব করে হাসুক কাঁদুক মুরলী, হিসেব করে দাশুর ভালবাসার চোখে এমন ভয়ানক ধুলো দিতে পারে না।

—তুমি মিথ্যুক বট হালদার। হুংকার দিতে চেষ্টা করে দাশু। কিন্তু পারে না। গলার স্বর জড়িয়ে যায়, আর বুকটা হাঁসফাঁস করে।

—তুমি একটা গাঁওয়ার বট দাশু। পলুসের ঠাট্টাও হুংকার দিয়ে বেজে ওঠে।

কেঁপে কেঁপে হাঁপ ছাড়ে দাশু ; চওড়া বুকটা যেন সব নিঃশ্বাস হারিয়ে চুপসে যায়। না, পলুসের এই ঠাট্টার হুংকার মিথ্যা হুংকার নয়। জাতপঞ্চও যে ঠিক এই রকম হুংকার দিয়ে মুরলীর কোমরের দুর্নাম ঘোষণা করেছে। দাশুর চোখ দুটোও যে স্পষ্ট করে দেখেছে, পলুসের নাম শুনলেই মুরলীর চোখের তারা দুটো ছটফট করতে থাকে। তবে আর এই মিথ্যা লড়াই লড়ে হয়রাণ হওয়া কেন?

তবু বিড়বিড় করে দাশু ঃ তুমি যা খুশি বল হালদার। মুরলী না বললে আমি বিশ্বাস করবো না। দুনিয়া বললেও আমি বিশ্বাস করবো না। আমি মুরলীকে শুধাবো।

—আর কবে শুধাবে? গাঁইতাটা কাঁধে তুলে আর দাশুর চোখের উপর টর্চের আলো দুলিয়ে আবার হেসে ফেলে পলুস।

দাশু—আমি আজই এই কয়লাখাদের নরক ছেড়ে দিয়ে গাঁয়ে চলে যাব।

—যেতে দিলে তো যাবে?

—কি বললে?

—তোমাকে যে আজই গোবিন্দপুর থানাতে যাওয়া করাবো। তুমি গুপী লোহারের সাকরেদ বট ; তুমি আমাকে খুন করতে গাঁইতা উঠিয়েছিলে। এত শক্ত পাপীকে আর মাপ করা চলে না। তোমার ফাঁসি যদি না হয়, তবু তো দশ বছরের শক্ত কয়েদ হবে।

—যা ইচ্ছা হয় কর হালদার, কিন্তু আমাকে একবার গাঁয়ে যেতে দাও।

—কেন?

—মুরলীকে একবার শুধাতে চাই।

—মুরলীকে শুধায়ে কি হবে?

—জেনে নিব, কি চায় মুরলী।

—যদি বলে পলুসের ঘরে যেতে চাই?

—তবে পলুসের ঘরে যাবে মুরলী।

—তুমি যেতে দিবে?

—দিব।

—তোমার কপালবাবার নামে কিরা কর।

—কপালবাবার নামে কিরা করছি হালদার। চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

—তবে এসো। আমিও কসম করছি, তোমার নামে থানাতে এজাহার দিব না।

টর্চের আলো ফেলে আগে আগে চলতে থাকে কলঘরের বড় মিস্তিরি পলুস হালদার। আর, পলুসের ছায়ার পিছু পিছু দাশু। আশার পিছু পিছু একটা হতাশা। জয়ের পিছু পিছু একটা পরাজয়। ব্যস্ততার পিছু পিছু একটা ক্লান্ততা।

—চল বাপ। আর এ গাঁয়ে থাকবো না। এখানে থাকলে তোমার বেটির জান মান আর সুখ কুকুরে ছিঁড়ে খাবে।

বলতে বলতে কেঁদে ফেলে মুরলী ; আর মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে বুড়ো মহেশ রাখাল ঃ চল, চল, এখনই চল।

ভুবনপুর ফাঁড়ির চৌকিদার ঝালদাতে গিয়ে যখন খবর দিয়েছিল, তখন ঠিক বুঝতে পারে নি মহেশ রাখাল, এই খবরের অর্থ কি? যে মেয়ে এই পাঁচ বছরের মধ্যে একবারও বাপের বাড়ি আসবার কথা মনেও করে নি সে মেয়ে আজ বাপকে ডাকে কেন? বাপের বাড়িতে ফিরে আসতে চাইছে, তাই বা কি করে হয়? এই মুরলীই যে বার বার তিনবার মহেশ বুড়াকে মধুকুপির এই ঘরের দরজা থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে ঃ না আমি যাব না। যতদিন না সরদার ঘরে ফিরে আসে, ততদিন এঘরেই থাকবো। মেয়ের সেই দেমাকের কথাগুলি আজও মহেশ রাখালের মনে পড়ে।

কিন্তু আজ আর এক মুহূর্তও মধুকুপির আলোছায়ার ছোঁয়া সহ্য করতে পারছে না মুরলী। যার জন্য পাঁচ বছর অপেক্ষায় ছিল মুরলী, সেই দাশু কিষাণের ছায়াকেও ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবার জন্য ছটফট করছে মুরলীর প্রাণ। কেন? জানতে পেরেছে মহেশ রাখাল, দাশু কিষাণ মানুষ নয় ; দাশু একটা দাগী। মুরলীর কপালের সুখ মরাতে চায়। মুরলীর পেটের ছেইলাকে বাঁচিয়ে রাখবারও মুরোদ নাই। আর, দাগীর ঘরণীর গতর লুঠ করবার জন্য শয়তানের লোভ রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি এসে ঘরের দরজা ভাঙতে চায়।—চল চল,

এখনই চল ! আবার চেঁচিয়ে ওঠে মহেশ রাখাল।

ভুবনপুর থেকে যে গো-গাড়িতে চড়ে মধুকুপি এসেছে মহেশ রাখাল, সেই গো-গাড়ি সড়কের উপর দাঁড়িয়ে আছে। বড়কালুর গায়ে বিকালের রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। আর দেরি করবার সময় নেই। দেরি করা উচিতও নয়। রামাই দিগোয়ার নামে সেই শয়তানের চর যদি হঠাৎ এসে যায়, তবে মুরলীর এত কষ্টের চালাকিটা আবার বিপদে পড়বে।

সেলাইয়ের কল, টিনের তোরঙ্গ, সুতোর নক্‌শা আর লেসের গাঁটরি, আয়নাটা আর চিরুনিটাও, আর গোটানো জড়ানো বিছানাটা ; মুরলীর নিজের রোজগারের যত গৌরব আর আশাময় ভাগ্যের যত উপহার এক এক করে তুলে নিয়ে গো-গাড়ির ভিতরে রাখে মহেশ রাখাল। জামকাঠের জীর্ণ কপাট ভেজিয়ে দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ায় মুরলী। মুরলীর নীল রঙের রেশমি শাড়ির চুমকি বিকালের রোদের আলোতে ঝিকমিক করে হাসে।

কিন্তু চমকে ওঠে মুরলী। এ কি! সড়কের উপর এত মানুষের ভিড় কেন? কি ভেবেছে ওরা? যেন মুরলীর মুক্তির পথ আটক করে গেঁয়ো মধুকুপির একটা মতলব শক্ত হয়ে সড়কের উপর দাঁড়িয়েছে। তাই কি? ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে থাকে মুরলী।

সব চেয়ে আগে চেঁচিয়ে ওঠে সনাতন লাইয়া ঃ দাশু দাদা ঘরে নাই ; আর সরদারিন ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে ; এটা কেমন কাণ্ড বটে?

গরুচরানি মেয়েগুলি ফিকফিক করে হাসে। ফুলকি মাসী, পল্টনী দিদি আর তেতরি ঘাসিনের চোখ ধিকধিক করে জ্বলতে থাকে। ছিয়া ছিয়া ছিয়া। ভিড়ের মুখে মুখে একটা চাপা ধিক্কারের রব ফিসফিস করে।

মহেশ রাখাল হুমকি দেয় ঃ আমার বেটিকে আমি নিয়ে যাচ্ছি ; তাতে তোমাদিগের কি? তোমরা এখানে ভিড় কর কেন?

মহেশ রাখালের চোখের সামনে এগিয়ে এসে রোগা চেহারাটাকে একেবারে ক্ষেপিয়ে নিয়ে একটা গর্জন করে জাতপঞ্চের বড় বুড়া রতন ঃ এই গাঁ মধুকুপি বটে, ঝালদা নয়। এখানে তোমার বেটি তোমার কেউ নয় ; আমার গাঁয়ের বউ। দাশুর ঘরণীকে তুমি নিয়ে যেতে পারবে না।

—নিয়ে যাব। মহেশ রাখাল চিৎকার করে।

—যেতে দিব না। বড় বুড়া রতনের গর্জনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ভিড়ের গলাও চেঁচিয়ে ওঠে। সড়কের পাশে বাঁশঝাড়ও কটকট শব্দ করে দুলতে থাকে।

মুরলীর মুক্তির পথে বাধা। সেই বাধা নিরেট হয়ে সড়কের উপর দাঁড়িয়ে থাকে । বিকাল ফুরিয়ে আসে। বড়কালুর মাথার পিছনে সূর্য ডুবে যায়। সন্ধ্যার আবছা আঁধারের সঙ্গে ডাঙার বুকের বাতাসও ঠাণ্ডা হয়ে ফুরফুর করে। তবু ভিড় নড়ে না।

হঠাৎ সব হল্লার রব শান্ত হয়ে যায়। ভিড়ের মুখগুলি নীরব হয়ে আর চোখগুলি অপলক হয়ে দেখতে থাকে, সড়কের একটার পর একটা নিমের কালো ছায়া পার হয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে এগিয়ে আসছে দাশু।

থমকে দাঁড়ায় দাশু। সড়কের গো-গাড়ির দিকে একবার, আর মহেশ রাখালের মুখের দিকে একবার তাকায়। দাশুর চোখে কোন ভ্রূকুটি নেই। শুকনো শ্রান্ত উদাস মুখের উপর কোন আক্ষেপ আর কোন আক্রোশ নেই।

মুরলীর দিকে তাকায় ; আর এগিয়ে গিয়ে একেবারে মুরলীর চোখের সামনে দাঁড়ায় দাশু। মুরলীর সরু কোমরে রেশমি শাড়ির ঘের রঙীন পালকের মত কাঁপছে আর দুলছে। দাশুর চোখে-মুখে একটা অদ্ভুত শান্ত হাসির শিহর খেলতে থাকে।

—আমি তোকে শুধাতে এসেছি, মুরলী। মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে এই সন্ধ্যার ফুরফুরে বাতাসের চেয়েও মৃদুস্বরে কথা বলে দাশু।

--কি?

--এই ঘরে থাকবি না?

--না।

--কার ঘরে যেতে চাস? পলুসের ঘরে?

--হ্যাঁ।

--পলুসকে কোমর ছুঁতে দিয়েছিলি?

--হ্যাঁ।

--এতদিন কেন বলিস নাই?

--বলবার দরকার হয় নাই।

--ভাল কথা।

--আর কি শুধাতে চাও?

--কিছু না। আমার ছেইলা তোর কাছে আছে, মনে রাখিস। আমাকে ছাড়লি, কিন্তু ওকে ছাড়িস না।

--কেন ছাড়বো? ছেইলা কি আমার নয়?

--নিশ্চয়। ভঁইসাল ভাই বড় ঠিক কথাটি বলেছিল।...আচ্ছা।

দৌড়ে গিয়ে ঘরের ভিতরে ঢোকে দাশু। কিন্তু তখনি আবার ফিরে আসে। দাশুর হাতে কেঁদকাঠের একটা কুচকুচে কালো লাঠি। লাঠি দুলিয়ে ভিড়ের দিকে তাকিয়ে দাশুও যেন প্রচণ্ড এক মুক্তির আনন্দে মরিয়া হয়ে হাঁক ছাড়ে ঃ জাতপঞ্চ শুনে যাও।

হুড়মুড় করে দৌড়ে এসে সড়কের ভিড়টা ঘরের দরজার কাছে জড়ো হয়। ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে দাশুর এই বিকট আনন্দের অর্থ বুঝতে চেষ্টা করে মুরলী। মহেশ রাখালের বুক দুরদুর করে কাঁপতে থাকে।

--মহেশ রাখালের বেটি আমার ঘর করবে না, পঞ্চ। ওকে চলে যেতে দাও। পঞ্চের কাছে আবেদন করে দাশু।

সনাতন লাইয়া চেঁচিয়ে ওঠে ঃ তবে এখনি সিঁদুর মাটি করুক মহেশ রাখালের বেটি।

বড় বুড়া রতন হাঁক দেয়--তবে এখনি পাতপানি চিরে ফেল, দাশু।

গরুচরানি মেয়েগুলি চেঁচায়--ওর হাতের বালা এখনি ভেঙে দাও, দাশু দাদা।

লাল গালার বালা আছে যে হাতে, সেই হাতটা দাশুর চোখের সামনে এগিয়ে দিয়ে তেমনি ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে থাকে মুরলী। কেঁদমাঠের কালো কুচকুচে লাঠির একটি বাড়ি দিয়ে মুরলীর হাতের বালা ভেঙে দু টুকরো করে দেয় দাশু। মুরলীও সেই মুহূর্তেও সেই হাত নামিয়ে আর চিমটি দিয়ে মাটির ধুলো তুলে নিয়ে সিঁথির সিঁদুরের উপর ঘষে দেয়। আর, বড় বুড়া রতন একটা পাকুড়পাতার উপর এক ঘটি জল ঢেলে দিয়ে পাতাটাকে দাশুর হাতের কাছে এগিয়ে দেয়।

জটা রাখাল এগিয়ে এসে বড় বুড়া রতনের কানের কাছে চেঁচিয়ে ওঠে ঃ নাম বলতে হবে, নাম বলুক দাশু। তা না হলে পাতখানি চিরা হয় না।

রতন--কার নাম?

জটা রাখাল--যার সাথে নষ্ট হয়েছে সরদারিন।

--খিরিস্তান পলুস হালদার। চেঁচিয়ে ওঠে দাশু। আর, ভেজা পাকুড়পাতা ছিঁড়ে দু টুকরো করে দেয়।

মহেশ রাখালের পিছু পিছু হেঁটে আর এগিয়ে যেয়ে গো-গাড়ির ভিতরে উঠে পড়ে মুরলী।

ভিড় ভাঙে, ভিড়ের হল্লাও মিলিয়ে যায় ; তার আগে মিলিয়ে যায় গো-গাড়ির চাকার

শব্দ। সন্ধ্যার অন্ধকারে মধুকুপির ডাঙা কাঁপিয়ে ঝিঁঝির ডাকের যে শব্দ উথলে ওঠে, জামকাঠের দরজার কাছে বসে সেই শব্দ শুনতে শুনতে যেন নিঝুম হয়ে যায়, দাশু ঘরামির শূন্য মন, ক্লান্ত প্রাণ, আর পাথুরে ছাঁদে গড়া অলস শরীরটাও।

এই শূন্যতা ক্লান্তি আর আলস্যও যে অদ্ভুত এক বিস্ময়ের জ্বালায় জ্বলছে। কত সহজে, মধুকুপির সব মায়া আর সব আক্রোশ তুচ্ছ করে চলে গেল মহেশ রাখালের বেটি।

অনেক তারা ফুটেছে আকাশে। ঘরের ভিতরে ঢুকে রেড়ির তেলের মেটে বাতিটা জ্বালতেই দেখতে পায় দাশু, ঘরের এক কোণে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে টাঙ্গিটা। না ; এই টাঙ্গিরও সাধ্যি হল না : মুরলীর পথ আটক করবার মত কোন জোর এই মাটিমাখা মধুকুপির প্রাণের মধ্যেই নেই। খেজুরপাতার চাটাইয়ের উপর গড়িয়ে পড়ে, আর দুহাত দিয়ে দুই চোখ চেপে চেপে ধরে ছটফট করতে থাকে দাশু।

হঠাৎ গুমরে ওঠে মধুকুপির রাতের বাতাস। বড়কালু আর ছোটকালুর সব পাথর একটা ভয়ানক গর্জনের প্রতিধ্বনি সহ্য করতে গিয়ে গুম্ গুম্ করে বাজতে থাকে। হাঁক ছেড়েছে বাঘিন কানারানী।

বেশি দূরে নয় জঙ্গলের ভিতরেও নয়। বাঘিন কানারানীর গর্জন যেন ভুবনপুরে যাবার সেই সড়কের উপর ছুটোছুটি করছে, যে সড়কের কাঁকর মাড়িয়ে আজই কয়লাখাদের মালকাটা জীবনের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়ে মধুকুপিতে ফিরে এসেছে দাশু। কিন্তু, মহেশ রাখালের বেটি যে এখন গো-গাড়িতে চড়ে, নীল রঙের রেশমি শাড়িতে সাজানো গতর নিয়ে আন-মরদের পিয়াস আর পিয়ার নেবার জন্য এক ভয়ানক আশার অভিসারে ওই সড়ক ধরেই এগিয়ে চলেছে! কানারানীর হাঁক, যেন প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত একটা আপত্তির হাঁক। কানারানীর হাঁকে এমন ভয়ানক রাগের ধমক কোনদিন শুনতে পায় নি দাশু।

মহেশ রাখালের বেটির অভিসারের পথ আটক করেছে কি কানারানী? আতঙ্কিত গো-গাড়িটা কি মরণভয়ে ভীরু হয়ে এক ছুট দিয়ে আবার এই পথে ফিরে এসে এই ঘরের সামনে ওই সড়কের উপর দাঁড়াবে? গো-গাড়ির ভিতর থেকে একটা লাফ দিয়ে বের হয়ে এসে জামকাঠের এই জীর্ণ কপাটের উপর মাথা ঠুকে আছড়ে পড়ে করুণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠবে কি মুরলী?—কানারানী আমাকে যেতে দিলে না।

কে জানে কত রাত হয়েছে! এল কি মুরলী? সত্যিই ফিরে আসবে কি মুরলী? জানে না দাশু, অদ্ভুত এক আশার শব্দ শোনবার জন্য বন্ধ দরজার দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ দুটো কখন ক্লান্ত হয়ে মুদে গিয়েছে।

বাঘিন কানারানীর হিংস্র ধমকের হাঁক আর শোনা যায় না। মানঝিপাড়ার আতঙ্কের হল্লাও অনেকক্ষণ হল ক্লান্ত হয়ে শেষে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। ঝিঁঝি ডাকা রাতটাও যেন নিজের ক্লান্তিতে এখন একেবারে নীরব হয়ে ঝিমোতে শুরু করেছে।

কয়লা-খাদের ধাওড়া থেকে বিদায় নেবার সময় সুরেন মানঝির কাছে দেনার হিসাব মিটিয়ে দেবার পর বার বার দু বার স্নান করেও মনে হয়েছিল দাশুর, এই কদিনের মালকাটা জীবনের কালো ধুলো জলে ধুয়ে গেলেও বুকের ভিতর সেই ধুলো যেন ভয়ানক এক অভিশাপের ময়লার মত এখনো লেগে আছে।

মধুকুপির ফিরে যাবার পথে ভুবনপুর সড়কেরই ধারে গালা-বাজারের কাছে আবগারী ভাটিখানার বোতলা সরাব বিক্রি হয় যে লাইসেনী দোকানে, সেই দোকানের দাওয়ার উপর কিছুক্ষণ জিরোতে হয়েছিল। আর, একটু জিরোতে বসেই বুঝতে পেরেছিল দাশু, গলার ভিতর বড় পিয়াস, মাথার ভিতর বড় জ্বালা!

সুরেনের দেনা চুকিয়ে দেবার পরও মালকাটা জীবনের সেই উন্মত্ত রোজগারের বারোটা টাকা দাশুর কোমরের গোঁজের ভিতরেই ছিল। বুকের ভিতরের ময়লা ধুয়ে ফেলতে হবে।

এক টাকা খরচ করে এক বোতল সরাব গিলে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে ছিল দাশু। মাথার জ্বালাকেও সেই নেশা দিয়ে শান্ত করে নিয়েছিল দাশু। সেই নেশার রেশ অনেকক্ষণ হল ক্লান্ত হয়ে দাশুর চোখে একটা স্বপ্নের ঘোর ধরিয়ে দিয়েছে। ঘুমিয়ে পড়েছে দাশু।

স্বপ্নটাও যেন একটা ভাদুরে বিকালের বৃষ্টি। রিমঝিম করে বাজে, আর ঝির ঝির করে ঝরে পড়ে। তারপর বড়কালুর মাথার উপরে আকাশের এপার-ওপার জুড়ে রঙিন রামধনু ফুটে ওঠে। দাশুর কাঁধের উপর ছেইলাটা, বুকের কাছে মাদলটা, পাশে পাশে মুরলী। ধানের ক্ষেতের আলের উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে আখড়ার দিকে যেতে যেতে দাশুর মাদলের বোল ভেজা বাতাসে মিষ্টি শব্দের শিহর তুলে বাজতে থাকে--দিপির দিপাং ধিতাং ধিতাং!

দাশুর স্বপ্নের মাদল যেন আর্তনাদ করে ছিঁড়ে যায়। চমকে ওঠে, ঘুম ভেঙে যায় দাশুর। মনে হয়, রাতের বাতাস একটা বন্দুকের গুলির শব্দে আহত হয়ে গুমরে উঠেছে।

ঠিকই, আবার বন্দুকের গুলির শব্দ। ভুবনপুর সড়কের দিক থেকে সেই শব্দের গোমরানি বাতাসে গড়িয়ে এসে আস্তে আস্তে এই মধুকুপির অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

খেজুর পাতার চাটাই থেকে এক লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় দাশু। আর একটা লাফ দিয়ে একেবারে দরজা পার হয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায়। হ্যাঁ, সড়কে এখনও বেশ অন্ধকার আছে, আকাশে তারা আছে। রাত ভোর হতে বাকি আছে।

ফিরে এসে ঘরের ভিতরে ঢুকে দু হাতে বুক চেপে ধরে কাঁপতে থাকে দাশু। কার বন্দুক? কে গুলি ছাড়ল? কে মরল? কানারানী আর হাঁক দেয় না কেন?

খেজুরপাতার চাটাইয়ের উপর আবার গড়িয়ে পড়ে ছটফট করে দাশু। একটা ভয়ানক সন্দেহের বেদনার সঙ্গে মনে মনে লড়াই করতে থাকে। না না না, মিছা সন্দেহ। কানারানী আছে, নিশ্চয় আছে। এখনি আবার হাঁক দিবে কানারানী। ও যে বনমাতা! ও যে মধুকুপির কিষাণ দাশুকে ওর মানুষ ছেইলা বলে মনে করে। মুরলীও যে ভয় পেয়ে ওকে শাশুড়ী বলে মেনে ফেলেছিল। কিন্তু কই, সেই কানারানী আর হাঁক দেয় না কেন?

কখন ভোর হবে? ভোরের আলোর অপেক্ষায় ছটফট করতে করতে আবার কখন যে ঘুমে অসাড় হয়ে গিয়েছিল ছেঁড়া স্বপ্নের বেদনা, তাও বুঝতে পারে নি দাশু। ঘুম ভাঙে যখন, তখন বাঁশঝাড়ের মাথার উপর সকালের রোদ লুটিয়ে পড়েছে। ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াতেই চমকে ওঠে দাশু।

মানঝিপাড়ার একদল লোক সামনের সড়ক দিয়ে যেন একটা উল্লাসের ঝড়ের মত ছুটে চলে গেল। কিন্তু এ কি ভয়ানক কথা চেঁচাতে চেঁচাতে চলে গেল ওরা !—কানারানী মরেছে! কানারানী মরেছে!

কলকল করে হেসে আর চেঁচিয়ে ছুটতে ছুটতে ছুটতে চলে গেল একদল গরুচরানী মেয়ে।—ডর কেনে ডরানি এল গুড়ুম ভাই, চল শিয়ালিন বিহা করবি কানারানী নাই।

মরা কানারানীর মুখ দেখবার জন্য ছুটে যাচ্ছে ওরা? তাই তো। দাশুরও পাদুটো টলমল করে ওঠে। তার পরেই যেন একটা বদ্ধ আর্তনাদের জ্বালায় পাগল হয়ে ঘরের দাওয়া এক লাফে পার হয়ে সড়কের উপর এসে দাঁড়ায়। ছুটতে থাকে দাশু।

খুব বেশিদূর ছুটে যেতে হয় না। ভুবনপুর সড়কের পাশে সেই জোড়া ডুমুরের কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় দাশু। সড়কের পাশেই ঘেসো মাঠের উপর কাত হয়ে পড়ে আছে একটা গরুর গাড়ি। গাড়ির একটা গরু গোবরমাখা ধড় নিয়ে গাড়ির কাছেই পড়ে আছে, এখনও যেন মরণ আতঙ্কে গরুটা ধুঁকছে। আর, ডুমুরের ছায়ায় চুপ করে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে একজন। চিনতে পারে দাশু আর ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখতে থাকে, এই তো সেই গাড়িয়াল লোকটা। আর ওই তো সেই গাড়ি, মুরলীকে মধুকুপির কিষাণের ঘর থেকে তুলে নিয়ে আন-মরদের বুকের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য কাল সন্ধ্যাতে যে-গাড়িটা যাত্রা

শুরু করেছিল।

সড়কের ডাহিনে যে মাঠ, সে মাঠের শেষদিকে একটা খাত, আর খাতের চারদিকে কেঁদ ও বাবলার ভিড়। চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে দাশু, সেই খাতের কাছে অনেক মানুষ জমা হয়েছে।

হাঁপ-ধরা বুকের ঢিপ ঢিপ শব্দ সামলে নিয়ে ফিস্ ফিস্ স্বরে প্রশ্ন করে দাশু।—কি ব্যাপার বটে গাড়িয়াল?

উত্তর দেবার জন্য মুখ তুলেই দাশুকে চিনতে পারে আর চমকে ওঠে গাড়িয়াল লোকটা। আস্তে আস্তে বলে—বাঘিনটা মরেছে সরদার।

—কে মারলে?

উত্তর দিতে গিয়ে আবার যেন একটু কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে গাড়িয়াল ঃ কয়লা খাদের বড় মিস্তিরী, পলুস হালদার।

—সে এখানে কেমন করে এল?

—আমি ডেকে নিয়ে এলাম।

—কেন?

—বাঘিনটার ডরে।

—কি করেছিল বাঘিনটা?

—সে আর শুধাও কেন? কি করে নাই বল? একটি থাবা মেরে গরুটাকে ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেল আর টুঁটি ফেড়ে দিল বাঘিনটা।

সড়কের বাঁয়ে যে মাঠ, সেই মাঠের আর-এক দিকের শকুনের ভিড় একটা সাদা পিণ্ডের চারদিক ঘিরে নিরেট হয়ে বসে আছে। সেই দিকে হাত তুলে ফুঁপিয়ে ওঠে গাড়িয়াল লোকটা ঃ হোই দেখ। এক মাসও হয় নাই সরদার, তেইশ টাকা দিয়ে গরুটাকে খরিদ করেছিলাম।

গাড়িয়ালের এই ফোঁপানির কোন করুণতার শব্দ যেন দাশুর কান স্পর্শও করে নি। চেঁচিয়ে ওঠে দাশু—আর কি কসুর করেছিল বাঘিনটা?

—বুড়া মহেশ রাখালকে ঘায়েল করলে ; থাবা মেরে বুড়ার একটা হাত ছেঁচে দিলে বাঘিনটা।

—আর কি করলে?

—যমের বেটি আমার গাড়িটার কি দশা করেছে দেখ। সে কী লাফ, কী রাগ আর কী ধমক সরদার! এক থাবা দিয়ে গাড়ির ছাপর ভাঙ্গলে, সরদারিনের যত জিনিস কামড় দিয়ে এক-একটা আছাড় দিয়ে ছিটিয়ে দিলে। সিলাইয়ের কলটাকে লাথি মারলে।

—আর কি?

—আমাকে ছিঁড়ে দিত যমের বেটি ; কিন্তু আমি পালাতে পেরেছিলাম, সরদার।

চেঁচিয়ে ওঠে দাশু—সরদারিনের কি হলো বল?

—সরদারিনের গায়ে একটা আঁচড়ও দাগে নাই বাঘিনটা। সরদারিন নিজেই ভয়ে বেহুঁশ হয়ে গেল।

ছলছল করে দাশুর চোখ, সেই সঙ্গে সারা মুখ জুড়ে অদ্ভুত এক প্রসন্নতার হাসি। দাশুর অন্তরাত্মা যেন কানারানীর এক অদ্ভুত করুণার রহস্যের দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতার হাসি হাসছে। মুরলীকে ব্যথা দেয় নাই কানারানী ; ভুলে নাই কানারানী, মুরলীর পেটে যে দাশুর ছেইলার প্রাণটা ঘুমিয়ে আছে।

কানারানী! কেঁপে কেঁপে বিড় বিড় করে দাশুর ঠোঁট দুটো। গাড়িয়াল লোকটা এইবার আতঙ্কিতের মত দাশুর মুখের দিকে তাকিয়ে কি-যেন ভাবতে থাকে।

দাশু বলে—ওরা গেল কোথায়?

গাড়িয়াল ভয়ে ভয়ে বলে—সে কথা বললে তুমি আমার উপর রাগ করবে না তো সরদার?

—না।

—আমি ছুটে গিয়ে কয়লাখাদে খবর দিতেই খাদের সাহেব মটরগাড়িতে বড় মিস্তিরীকে আর আমাকে তখনি রওনা করিয়ে দিলে। মিস্তিরী বড় ভাল শিকারী বটে।

—সে আমি জানি।

—মিস্তিরী সরদারিনকে জানে বলে মনে হলো।

—হ্যাঁ, জানে।

—সরদারিনও মিস্তিরীকে...।

—কি?

—বড় পিয়ার করে মনে হলো।

—কেমন করে বুঝলে?

—মিস্তিরী এসেই সরদারিনকে কোলে তুলে নিলে ; আর সরদারিনও মিস্তিরীর গলা জড়িয়ে ধরলে।

দাশুর চোখ দুটো হঠাৎ তপ্ত হয়ে রাঙ্গী কয়লার আগুনের মত লাল হয়ে জ্বলতে থাকে। আরও ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে গাড়িয়াল লোকটা।—আর আমি কিছু বলবো না, সরদার।

—বল গাড়িয়াল। শুনতে বড় মজা লাগছে!

—আর তেমন কিছু বলবারও নাই, সরদার। বুড়া আর বুড়ার বেটিকে মটরগাড়ি করে কয়লাখাদের হাসপাতালে রওনা করিয়ে দিলে মিস্তিরী।

—তারপর কি হলো, সেটা বল না কেন?

—তারপর বন্দুক হাতে নিয়ে এই ডুমুরের উপর মিস্তিরী বসলে ; আর ওই ডুমুরের উপর আমি।

—তারপর?

—শেষ রাতে চাঁদ উঠলো যখন, তখন বাঘিনটা আবার এল।

—তারপর?

—পর পর দুটো গুলি মেরেছিল মিস্তিরী। একটা গুলি বাঘিনের গলা ফুটা করে দিলে। আর একটা গুলিতে বাঘিনটার পা ভেঙে গেল।

—তারপর?

—আর শুধাও কেন সরদার? মরা বাঘিনকে দেখতে সাধ থাকে তবে দেখে নাও। মিস্তিরী খাদে খবর দিতে চলে গিয়েছে, এখনি খাদের লোক এসে বাঘিনের লাস বাঁশ-দড়ি করে বেঁধে গোবিন্দপুর থানায় নিয়ে যাবে। হোই যে, ওরা দেখছে দেখ।

হ্যাঁ, দেখতে সাধ আছে বইকি। আস্তে আস্তে হেঁটে মাঠ পার হয়ে কেঁদ আর বাবলার ছায়াময় ভিড়ের কাছে এসে মানুষের ভিড়ের মাথার উপর দিয়ে উঁকি দেয় দাশু। ভাল করে দেখবার জন্য আরও এগিয়ে যেয়ে একেবারে খাতের কিনারায় এসে মাটির উপর উবু হয়ে বসে পড়ে, বুকের ভিতরের একটা যন্ত্রণা চাপতে চেষ্টা করে।

খাতের ভিতরে একটা কালো পাথরের উপর মাথা রেখে যেন ঘুমিয়ে রয়েছে কানারানী। কাদামাখা গোঁফ নেতিয়ে পড়েছে। লেজ দিয়ে ভাঙা পা জড়িয়ে ধরে রেখেছে, কানা চোখের উপর পিঁচুটি জমে রয়েছে। একটা বোলতা কানারানীর শিথিল চোয়ালের উপর সুড় সুড় করে হেঁটে বেড়াচ্ছে। মরবার আগে বোধহয় কাঁকরের উপর খুব জোরে মুখ ঘষেছিল কানারানী, তাই মুখটা পানখাওয়া মুখের মত লাল হয়ে রয়েছে। গলার ফুটো থেকে ঝরে

পড়া রক্ত লাল কাদার মত পাথরের উপর পড়ে আছে।

কাঁধের গামছা হাতে তুলে নিয়ে বার বার চোখ মোছে দাশু। একটা বুড়ি সাধুনীর শান্ত ও উদাস মুখের মত দেখতে কানারানীর এই মুখটা। সাধুনীটা যেন ভীরু সংসারের যত হিংসুটে সোরগোল আর ঝামেলা থেকে পালিয়ে এসে কেঁদ-বাবলার ঘন ছায়ার এই ঠাণ্ডা শান্তির মধ্যে লুকিয়ে পড়েছে।

না, আর কিছু দেখবার নেই। লোকের ভিড়, আর বাবলা ও কেঁদের ছায়ার ভিড়ের কাছ থেকে আস্তে আস্তে সরে যায় দাশু!

রেড়ির তেলের মেটে বাতিটা মিটি মিটি জ্বলে। উনানের আগুন চিড়চিড় করে। একলা ঘরের ভিতরে শুধু নিজের ছায়াটাকে সঙ্গে নিয়ে মকাইয়ের ঘাট্টা রাঁধে দাশু। তার আগে ছোট হাঁড়ি মুখের কাছে তুলে নিয়ে ঢক ঢক করে হাঁড়িয়া মদ গিলে নেয়।

নেশা দিয়ে একটা আশাকে যেন জীইয়ে রাখতে চায় দাশু। একদিন নিশ্চয় ফিরে এসে এই ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াবে মুরলী, আর দাশুর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলবে। আশার ছবিটা মাঝে মাঝে যেন কথা বলে ফেলে ঃ এই দেখ সরদার ; তোমার ছেইলাকে তোমার কাছে নিয়ে এসেছি।

রেড়ির তেলের মেটে বাতি নিবিয়ে দিয়ে নেশাতুর চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়তে গিয়ে আরও একটা আশার ছবি দেখতে থাকে দাশু। ডরানির ধারে পাঁচ বিঘা ভাল দো-আঁশের কানালি কিংবা গরাঙ্গি। ধান ফলেছে। সব্জী ধরেছে। সব্জীক্ষেতের গুলঞ্চের বেড়ার উপর বসে কালা কোকিল ডেকেই চলেছে। আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে মুরলী।—কবে এমন ভাল ক্ষেত জোত করলে আর সব্জী ফলালে গো ছেইলার বাপ?

তাই তো হবে। মুরলীর ঐ লোভী আশার হাত দুটো কি চিরকাল পলুস মিস্তিরীর গলা জড়িয়ে ধরে থাকতে পারবে? ক্লান্ত হবে না কি হাত দুটো? দেখা যাক্, কতদিন মিস্তিরির ঘরের সুখের স্বাদ ভাল লাগে মুরলীর?

হ্যাঁ, ঈশান মোক্তারের কাছ থেকে পাঁচ বিঘা দো-আঁশ নিতেই হবে। জাতপঞ্চের সভা ডেকে বলতে হবে, ঈশান মোক্তার কেন আমাদিগে শুধু মনিষ খাটাবে, পঞ্চ? বিনা নজরানায় জমি বন্দোবস্ত দিবে না কেন? জমি নিব, জমি নিয়ে ছাড়ব।

ঘুমিয়ে পড়বার আগে জমিহারা জীবনের এই নতুন প্রতিজ্ঞার জ্বালাটা নেশার আবেশে নরম হয়ে হেসে ওঠে। কিষাণের ঘরের সুখের খবর পেয়ে আবার ফিরে এসে এই ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছে মুরলী। বলছে মুরলী—আমাকে কি আর ঘরে নিবে না সরদার? আমি যে তোমার মুরলী বটে গো।

দাশু কিষাণের জীবনের অহংকার ধন্য হয়ে যায়।—দেখলি তো, বলেছিলাম কিনা, এই ঘরেই অনেক সুখ হবে, অনেক মাদল বাজবে...।

দিপির দিপাং, ধিতাং ধিতাং! সত্যিই যে মাদল বাজছে। ধড়ফড় করে উঠে বসে আর ভাঙা ঘুমের চোখ ঘষে দাশু।

ভাদ্রের সকালবেলার রোদ মধুকুপির ক্ষেতের বুকে ঝলমল করে। করম এসেছে। আখড়াতে মাদল বাজছে। করম গাছ ঘিরে ঝুমুর নাচের আসর এই সকালেই মত্ত হয়ে উঠেছে। গান গেয়ে উঠেছে মধুকুপির মাটিমাখা প্রাণ। হলুদ-ছোপানো শাড়ি, আর খোঁপাতে ধানের শিষ ; করম পূজতে আর ঝুমুর নাচতে দলবেঁধে চলে যাচ্ছে গরুচরানী মেয়েগুলি!

কিন্তু এত হাসে কেন ওরা? ঝুমুর গেয়ে বৃষ্টি ডাকবে, আর নেচে নেচে খুব সোহাগে ঢলে ঢলে হাত তুলে জল ছিটিয়ে করমের হাঁড়ির মাটিতে বীজ ফলাবে মেয়েগুলি ; কোমর দুলিয়ে ধানের আঁটি মাথায় তুলে নিবার সাধও দোলাবে ; কিন্তু জমি কই? আপন জমি না

হলে যে এই নাচ নেশা আর গানেতে মনের সুখ ভরে না।

তবু দাশুর প্রাণটা আজ আর একলা হয়ে পড়ে থাকতে চায় না। একটা মাদল হাতে নিয়ে মধুকুপির এই উৎসবের মধ্যে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে।—কিন্তু ও কে বটে? এদিকপানে ছুটে আসে কেন?

সড়কের নিমগাছের ছায়ার দিক থেকে ব্যস্তভাবে হেঁটে এসে, আর একেবারে দাশুর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকে সনাতন।

খুশি হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে দাশু—আমাকে একটা মাদল দিবে সনাতন?

সনাতন হাসে—তা দিব। কিন্তু দুখনবাবু আবার জাতপঞ্চকে ডেকেছে। তুমি যাবে কি?

—কেন?

—রাগ করেছে দুখনবাবু ; গাঁয়ের বউ বেটি বহিন করমে যদি নাচে, তবে জাত ভাগ করবে দুখনবাবু।

—কি করবে দুখনবাবু? ভ্রূকুটি করে দাশু।

—আর একটা পঞ্চ করবে দুখনবাবু। যাদিগের বউ বেটি বহিন নাচবে, তাদিগের ভাত-ভাইয়ারিতে আসবে না দুখনবাবু।

দাশুর ভ্রূকুটিও আস্তে আস্তে কেঁপে কেঁপে হিংস্র হয়ে উঠতে থাকে। মধুকুপির প্রাণের এত রকমের শত্রুও ছিল !—চল। দাঁতে দাঁত চেপে, একটা আক্রোশে চাপতে চাপতে সনাতনের সঙ্গে চলতে থাকে দাশু।

পিপুলতলার ছায়ার কাছে মধুকুপির মনিষদের সমাবেশ আজকের উৎসবের দিনেও বেশ একটু বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে। মনে হয়, উৎসবের আনন্দটা হঠাৎ আহত হয়েছে, যদিও মনিষদের সাজের মধ্যে রঙিন উৎসবের ছিটেফোঁটা দেখা যায়। কারও কারও কোমর হলুদ-ছোপানো গামছা দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। মনে হয়, করমের নাচে যাবার জন্য ওরা মাদল হাতে নিয়ে মাত্র তৈরী হয়েছিল। কারও কারও রুক্ষ চুলের উপর তেলের প্রলেপ পড়েছে। স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে কালো কোঁকড়া চুলের রাশ। দু-চার চুমুক হাঁড়িয়ার পাতলা নেশার আবেশও কারও কারও চোখে এই সকালেই ফুটে উঠেছে। কিন্তু সকলেই জানে, রাগ করেছে দুখনবাবু।

নিকটেই যে বনচণ্ডীর মন্দির, তারই কাছে ঝুমকো জবার গা ঘেঁষে একটি চৌকির উপর বসে আছেন যিনি, তিনিই হলেন বনচণ্ডীর সেবাইত চক্রবর্তী। আজকের জাতপঞ্চের সভার দিকে তাকিয়ে চক্রবর্তীর চোখ দুটোও কি-যেন আশা করে রয়েছে।

সভার একেবারে মাঝখানে একটি চারপায়ার উপর বসে আছে দুখনবাবু। আর জাতপঞ্চের বড় বুড়া রতন তার শীর্ণ শরীরটাকে কুঁকড়ে নিয়ে সভার এক কোণে অসহায়ের মত বসে আছে।

সভার কাছে এসে দাঁড়ায় সনাতন লাইয়া, তার পিছনে দাশু। দাশুর মুখের দিকে একবার আড়চোখের দৃষ্টি হেনে সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে যায় দুখনবাবু।

চেঁচিয়ে ওঠে দাশু ঃ জাতপঞ্চের সভায় দুখনবাবু চারপায়ার উপর বসে, আর বড় বুড়া রতন মাটির উপর বসে কেন? তুমি চারপায়া থেকে নেমে যাও দুখনবাবু।

—কেন নামবো? দাঁতে দাঁত ঘষে দাশুর মুখের দিকে তাকায় দুখনবাবু।

দাশু বলে—জাতপঞ্চের সভায় চারপায়ার উপর যদি কেউ বসে, তবে বড় বুড়া রতন বসবে। তুমি না, আম্মিও না।

দুখনবাবু—ঈশান মোক্তারের কুঠিতে তোমরা যখন কাজ মাগতে আস, তখন তোমাদের বড় বুড়া কোন্ চারপায়াতে বসে হে?

দাশু—কুঠিতে তুমি বড় গুমস্তা বট। সেথা তুমি চারপায়াতে বসবে, আর মনিষেরা

ভুঁইয়ের উপর বসবে। কিন্তু, জাতপঞ্চের সভায় তুমি জাতের মানুষ বট। হেথা বড় বুড়ার মান তোমার মানের চেয়ে বড়। তুমি চারপায়া থেকে নেমে যাও, আর ভুঁইয়ের উপর বস।

দাশুর মুখের দিকে আর একবার কটমট করে তাকিয়ে চারপায়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় দুখনবাবু। কিন্তু সুঁইয়ের উপর বসে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায় জটা রাখাল ও আরও কয়েকজন। বাবু দুখন সিংহের উপর এই অপমানের আঘাত সহ্য করতে গিয়ে ওরা ব্যথিত হয়েছে। দাশুর মুখের দিকে রুষ্টভাবে তাকিয়ে কি-যেন বলতে চেষ্টা করে জটা রাখাল। দাশু চেঁচিয়ে ওঠে—চুপ।

বড় বুড়া রতন তার শীর্ণ শরীরটাকে টান করে উঠে দাঁড়ায়, যেন নতুন মান পেয়ে বড় বুড়ার বিমর্ষ প্রাণটা হঠাৎ বলীয়ান হয়ে উঠেছে। বড় বুড়া বলে—কেন জাতপঞ্চ ডেকেছ, সেই কথাটা বলে ফেল দুখনবাবু।

দুখনবাবু—সেদিন যে-কথা বলেছিলাম, আজ আবার সে-কথাই বলছি। জাতের সুধার চাই।

দাশু—সেটা কি বটে?

দুখনবাবু—গাঁয়ের বউ বেটি বহিন করমে নাচবে না।

দাশু—নাচবে।

দুখনবাবু—তবে জাতের সুধার হবে কেমন করে বল? যদি বামন না মান, যদি বনচণ্ডীর পূজা না কর, যদি বেটি-বহিনের বিয়া দিতে লাজের বয়স পার করে দাও, তবে জাতের ভাল হবে না, পঞ্চ।

দাশু—জাতের ভাল হবে দুখনবাবু, যদি তুমি জাতের একটা কথা মান।

—কি কথা?

—জাতের মানুষকে জমি পাইয়ে দাও।

—জমি! চেঁচিয়ে ওঠে দুখনবাবু।

দাশু—হ্যাঁ ; তোমার জাতের মানুষ ঈশান মোক্তারের জমিতে শুধু মনিষ খাটে, তাতে তোমার কি দুখ হয় না? যত ভাল ভাল দো-আঁশ আর দুই-ফসলী মাটিতে আমাদিগে মনিষ খাটাবে ঈশান মোক্তার, আর ভাগজোত করতে দিবে যত টাঁড় জমি ; এটা কেমনতর বিচার বটে?

দুখনবাবু—কি চাও তোমরা?

দাশু—আমরা আর মনিষ খাটবো না। আমরা ভাল জমি ভাগজোত করবো। কুঠি বীজ লাঙ্গল দিবে।

দুখনবাবু—নজরানা?

দাশু হাসে—তোমার গরীব জাতভাই নজরানা দিতে পারে কি দুখনবাবু? তুমি কি সেকথা জান না?

দুখনবাবু হেসে ফেলে—গরীব হয়ে গরীবের মত কথা না বলে ডাকাইতের মত কথা বলছো কেন?

দাশু—আমাদিগে তুমি ডাকাইত বলছো?

দুখনবাবু—হ্যাঁ। তোমার ঈশান মোক্তারের জমি লুটে নিবার কথা বলছো।

দাশু—লুটে নিলে দোষ কি?

দ্খনবাবু—কি বললে?

দাশু—যদি ঈশান মোক্তারের ভাল জমি ভাগজোত করতে না পাই, তবে মধুকুপির কোন কিষাণ ওর জমিতে মনিষ খাটবে না।

দুখনবাবু হাসে—ভিন গাঁ হতে মনিষ আসবে, দাশু। ঈশান মোক্তারের চিন্তা নাই।

দাশু—তবে শুনে রাখ দুখনবাবু, ভিন গাঁ হতে মনিষ এলে ওরা মরবে।

দুখনবাবু—কে মারবে ওদিগে?

জাতপঞ্চের নীরব মুখগুলির দিকে তাকিয়ে আর হাত দুলিয়ে চিৎকার করে দাশু—জবাব দাও পঞ্চ।

বড় বুড়া রতন উঠে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশজন মনিষের রুক্ষ ও কঠোর হাত একসঙ্গে দুলে ওঠে। চেঁচিয়ে ওঠে জাতপঞ্চের ভিড় ঃ আমরা মারবো। মধুকুপির কিষাণের টাঙ্গি এখনও মরে নাই।

কেঁপে ওঠে দুখনবাবুর চোখ দুটো। জটা রাখালের দলও ভীরুর মত আস্তে আস্তে সরে গিয়ে দুখনবাবুর পিছন দিকে দাঁড়ায়।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে কি-যেন ভাবতে থাকে দুখন। তারপর হঠাৎ লজ্জিত হয়ে আর মৃদু হাসিতে চোখমুখ স্নিগ্ধ করে নিয়ে হাতজোড় করে জাতপঞ্চের উত্তেজিত মুখগুলির দিকে তাকায়। সেই মুহূর্তে শান্ত হয়ে যায় জাতপঞ্চের মত্ত আক্রোশের মুখরতা আর চেহারার রুদ্রতা।

—কি বলছো দুখনবাবু? বড় বুড়া রতন শান্ত স্বরে প্রশ্ন করে।

দুখনবাবু বলে—ঠিক ঠিক ঠিক ; খুব ঠিক কথা বলেছে পঞ্চ। আগে জমি চাই। আমি ঈশান মোক্তারকে বলে তোমাদিগে ভাগজোতের ভাল জমি পাইয়ে দিব। এক পয়সা নজরানা দিতে হবে না।

দাশু একটা লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে দুখনবাবুর একটা হাত জড়িয়ে ধরে। ছলছল করে দাশুর উৎফুল্ল দুটো চোখের আশা তুমি জাতের দুখ বুঝেছ, তোমাকে কপালবাবা অনেক সুখ দিবে। অনেক দুখে তোমাকে কড়া কথা বলেছি দুখনবাবু ; তুমি রাগ করবে না।

শান্তভাবে হাসতে থাকে দুখনবাবু, সেই সঙ্গে দুখনবাবুর চোখ দুটোও অদ্ভুতভাবে যেন ধিকধিক করে হাসতে থাকে ঃ না হে দাশু, দুখন সিংহ রাগ করে নাই। দুখন সিংহ যদি বেঁচে থাকে, তবে তোমাদিগে জমির সুখ পাইয়ে দিবে। আমি আজই ঈশান মোক্তারের দরবারে যাব।

দিপির দিপাং।

আঁটি আঁটি ধান কাটি কানালির মাটি গো। কিষাণের ধিয়াপুতা কত সুখে খাটি গো! হে করম দয়া কর !

করম ডালে জল ঢেলেছে মেয়েরা। ঝুমুর গেয়েছে আর নেচে নেচে সারা হয়েছে। আর দাশুও যেন জমিহারা জীবনের সব অভিমান মুছে ফেলে মাদল হাতে নিয়ে সারা দুপুর আর বিকেলে মত্ত হয়ে উৎসবের আসরে একটা জয়ের নাচ নেচেছে। হাঁড়িয়ার তরল নেশার রসে দাশুর অমন পাথুরে পাটার মত বুকের ভিতরটা যেন ভিজে কাদা হয়ে গিয়েছে। জমি হবে, জমি হবে। বাবু দুখন সিংহ বলেছে, জাতের সব মানুষকে জমি পাইয়ে দিবে।

জমির স্বপ্নের মধ্যেই বার বার যার সুন্দর মুখের ছবিটা ফুটে ওঠে, সে আজ মধুকুপির এই মাদল-বাঁশির মত্ত উল্লাসের আসর থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছে। কিন্তু দাশুর জীবনের এই সঙ্গীবিহীন শূন্যতার বেদনাও যেন আজকের একটা আশাময় মত্ততার কলরবে ভরে গিয়েছে। মুরলী আজ নেই ; কিন্তু আসবে। দেখি, কেমন করে না এসে থাকতে পারে মুরলী? দাশু কিষাণের জমিতে ধানের শিস যেদিন দুলে উঠবে, সেদিন কয়লাখাদের বড় মিস্ত্রিরীর ঘর মুরলীকে আটক করে রাখতে পারবে কি? কখনই না।

বিকেল হতেই মাদল রেখে দিয়ে আর সনাতন লাইয়ার হাত ধরে টলতে টলতে ঘরে ফিরে আসে দাশু। সনাতন বলে—আজ সাঁঝে আর আখড়াতে যেও না দাশু।

দাশু হাসে—তুমি আমার নাচ দেখে ভয় পেলে নাকি সনাতন?

সনাতন--হ্যাঁ।

দাশু--কেন?

সনাতন--তুমি সরদারিনকে ভুলতে পার নাই।

দাশু--তুমি কেমন করে বুঝলে?

সনাতন--নাচতে নাচতে কাঁদলে কেন?

জলে ভরে যায় দাশুর চোখ : হ্যাঁ সনাতন। করমের দিনে মুরলী আমার কাছে নাই, এ কেমন দয়া করলে কপালবাবা?

সনাতন--ওসব কথা আর মিছা কেন মনে কর দাশু?

দাশু--কিন্তু মুরলী একদিন আসবে।

সনাতন--কেন?

দাশু--আমি ওকে আনা করাবো।

সনাতন--কেমন করে?

দাশু--জমি নিব, ক্ষেতজোত করবো, নতুন মাটি দিয়ে ঘর বানাবো। মুরলী তখন না এসে পারবে কেন? জমি নাই, তাই মুরলী নাই।

সনাতন হাসে--হলে বড় ভাল হয় দাশু। কিন্তু...।

দাশু--কি?

সনাতন--মধুকুপির কপাল ভাল নয় দাশু। আমার বড় ডর লাগছে।

দাশু--ছিয়া! গাঁয়ের লাইয়া হয়ে তুমিও এমন ডরের কথা বল, সনাতন?

সনাতন বোধহয় দাশুর এই অভিযোগের উত্তর দিত ; কিন্তু সনাতন সত্যিই একটা নতুন ভয়ে ভীরু হয়ে সড়কের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সড়কের উপর দাঁড়িয়ে দাশু কিষাণের ঘরের এই জীর্ণ জামকাঠের দরজার দিকে তাকিয়ে আছে একটা লোক। আধবুড়া চেহারার একজন বাবু মানুষ। গায়ে কালো কাপড়ের জামা। মালকোঁচা দিয়ে পরা ধুতি। পায়ে ধুলোমাখা একজোড়া জুতো, আর হাতে ছাতা ও একটা থলি। বাবু মানুষটা অপলক চোখ তুলে দাশুর ঘরের দিকে তাকিয়ে আছে। বাবু মানুষটার মুখটা মিটমিট করে হাসছে মনে হয়।

--ও কে বটে সনাতন? প্রশ্ন করে দাশু।

সনাতন--ওটা হারানগঞ্জের সিস্টার দিদির লোক। খিরিস্তান বটে। তোমার সরদারিনের যত সিলাই নকশা এই লোকটা কিনে নিয়ে যেত। এতদিন বাঘিন কানারানীর ডরে আসে নাই।

দাশুর লাল চোখ দপদপ করে--সিস্টার দিদির লোক আবার হেথা আসে কেন?

সনাতন--কে জানে?

দাশুর রুষ্ট গলার স্বরের শব্দ বোধহয় শুনতে পায় সিস্টার দিদির লোকটা। সেই মুহূর্তে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে হনহন করে হেঁটে পাকুড়তলার দিকে চলে যায়।

আবার কারা যেন গল্প করতে করতে ভুবনপুরের দিক থেকে সড়ক ধরে আস্তে আস্তে হেঁটে আসছে।

সনাতন বলে--বাস্, আর কি? কানারানী নাই। আবার শুরু হলো দাশু।

দাশু--কি?

সনাতন--কয়লাখাদের ঠিকেদারের লোক আবার গাঁয়ে ঢুকছে।

দাশু--কেন?

সনাতন--মালকাটা যোগাড় করতে।

হঠাৎ হতভম্ব হয়ে যায় দাশু। ঠিকেদারের লোকগুলি মধুকুপির কিষাণের ঘর ভাঙবার

জন্য কী কুৎসিত আনন্দের হাসি হেসে কত সহজে মধুকুপির মাটি মাড়িয়ে এগিয়ে আসছে। আস্তে আস্তে বিড়বিড় করে দাশু ঃ একটুক ডেঁটে দিলে কেমন হয়, সনাতন?

সনাতন ভয় পেয়ে দাশুর হাত চেপে ধরে ঃ তুমি ঘরের ভিতরে যাও আর শুয়ে থাক। হাত ধরে দাশুকে টেনে নিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে সনাতন চলে যায়।

নিঝুম হয়ে ঘরের ভিতরে খেজুরপাতার চাটাইয়ের উপর বসে থাকে, আর মাঝে মাঝে একটা অস্বস্তির জ্বালায় ছটফট করে দাশু। আজকের জয়ের উৎসবটার সব সুখ যেন বিস্বাদ হয়ে গেল। কয়লাখাদের ঠিকেদারের লোক গাঁয়ের ঘরে ঢুকে হাঁক দিয়ে মজুরির লোভ দেখাবে। মধুকুপি যে শূন্য হয়ে যাবে। সিস্টার দিদির লোক, ঐ পাপটা আবার মধুকুপির কোন্ কিষাণের ঘরের আশা ছিঁড়ে নিয়ে যাবার জন্য চোরনেকড়ের মত গাঁয়ের পথে ঘুরঘুর করছে? তুই কেন মরলি কানারানী? পাপগুলো যে মধুকুপির ঘরে ঢুকতে আর ভয়ে করে না!

না, বড় জোর নেশা ধরেছে। ঠিক বলেছে সনাতন। এখন ঘুমিয়ে পড়লেই ভাল হয়। খেজুরপাতার চাটাইয়ের উপর গড়িয়ে পড়ে দাশু। কিন্তু সেই মুহূর্তে করুণ চিৎকারের মত একটা বুকফাটা কান্নার শব্দ শুনে ধড়মড় করে উঠে বসে। কে কাঁদে? এমন সুন্দর করমের দিনে মধুকুপির কার প্রাণের দুখ এমন করে কেঁদে উঠল?

ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াতেই দেখতে পায় দাশু, সড়কের উপর দাঁড়িয়ে আর অনেক দূরের দিকে তাকিয়ে ছটফট করছে, দু হাত ছুঁড়ে বুক চাপড়ে আর চিৎকার করে কাঁদছে পল্টনী দিদি।

পল্টনী দিদির পরনে একটা ছেঁড়া ঘাগরা। ময়লা একটা কাঁথা গায়ে জড়ানো। মাথার চুলগুলি ক্ষেপী ভিখারিনীর চুলের মতো এলোমেলো হয়ে মাথার চারদিকে ঝুলে রয়েছে।

দৌড় দিয়ে এগিয়ে আসে দাশু ঃ কি হলো পল্টনী?

—নিয়ে গেল, নিয়ে গেল। ডাইনে আমার ছেইলা দুটাকে ছিনে নিয়ে গেল দাশুদাদা। চেঁচিয়ে কাঁদতে থাকে পল্টনী।

আশ্চর্য হয় দাশু ঃ কে ডাইন? তোমার ছেইলা ছিনে নিয়ে যায় কেন ডাইন?

সড়কের অনেক দূরে, চলমান কয়েকটা ছায়ার দিকে তাকিয়ে বুক চাপড়ায় পল্টনী দিদি ঃ হারানগঞ্জের সিস্টার দিদির লোক আমার ছেইলা দুটাকে অনাথবাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে, দাশুদাদা। কটা রে, মোটা রে! আমাকে এত দুখ দিতে কেন এসেছিলি রে!

সড়কের অনেক দূরের সেই চলমান ছায়ার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে দাশু, হ্যাঁ, আধবুড়ো বাবুটা ছাতা হাতে নিয়ে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে চলে যাচ্ছে। বাবুটার দুই পাশে ছোট চেহারার দুটো কচি ছেলে.রোগা-রোগা দুটো ছায়ার মতো হেঁটে চলেছে।

বুকের উপর চাপড় মেরে কান্নাটাকে গুমরে তোলে পল্টনীদিদি—সিস্টার দিদি কতবার এসে ছেইলা দুটাকে টেনেছে, তবু ছাড়ি নাই গো। বাঘিনের ডরে মাঠে যেতে দিই নাই? গো। ডাইনের ডরে বাজারে যেতে দিই না গো!

—পল্টনী! চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

—কি দাশু দাদা?

—তুই কাঁদিস না।

আরও জোরে চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে পল্টনীদিদি। দাশুও সেই মুহূর্তে ছুটে গিয়ে ঘরের ভিতর থেকে সেই মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা টাঙ্গি হাতে তুলে নিয়ে এসে আবার পল্টনীদিদিকে সান্ত্বনা দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—আমি এখনই তোর কটা আর মোটাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসছি।

কিন্তু কী আশ্চর্য, পল্টনীদিদি হঠাৎ কান্না থামিয়ে, আর, একটা ঝাঁপ দিয়ে দাশুর গায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে দাশুর টাঙ্গিটাকে শক্ত করে দু হাত দিয়ে চেপে ধরে ঃ তুমি থাম

দাশুদাদা। তোমার পায়ে পড়ি দাশুদাদা।

--কি বলছিস পল্টনী? হতভম্ব হয়ে পল্টনীদিদির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে দাশু!

পল্টনীদিদি বলে--মারতে হলে আমাকে মার। সিস্টার দিদির লোক কোন কসুর করে নাই।

--কেন?

--আমি ছেড়ে দিয়েছি, তবে না আমার কটা আর মোটাকে নিয়ে গেল। আস্তে আস্তে ফোঁপাতে থাকে পল্টনীদিদি।

--কেন ছেড়ে দিলি?

ময়লা কাঁথার কোণা তুলে চোখ মোছে পল্টনীদিদি ঃ তিন দিন হলো ছেইলা দুটা কিছু খায় নাই। খেতে দিতে পারি নাই দাশুদাদা।

দাশুর লাল চোখের জ্বালা হঠাৎ জল হয়ে ঝরে পড়ে। কথা বলতে গিয়ে দাশুর গলার স্বর ভেঙ্গে যায় ঃ কেন খেতে দিতে পারিস নাই?

--যে মাগির মরদ নাই, জমি নাই, সে মাগি তালপাখা বেচে আর কতদিন ছেইলা পুষতে পারে? আমার কটা আর মোটা আমার বুকের উপর থেকেও মরবে, তার চেয়ে সিস্টার দিদির অনাথবাড়িতে গিয়ে বেঁচে থাকুক। সেটা ভাল বটে কি না দাশুদাদা?

দাশুর শক্ত হাতের মুঠো হঠাৎ শিথিল হয়ে যায়। গেঁয়ো গর্বের টাঙ্গিটা অলস অক্ষম ও অসার বস্তুপিণ্ডের মত যেন একটা আবর্জনা হয়ে ধপ করে সড়কের ধুলোর উপর লুটিয়ে পড়ে।

আরও কিছুক্ষণ গুনগুন করে কাঁদে পল্টনীদিদি। তারপর সেই মৃদুস্বরের কান্নাটা যেন ধিক্কার দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে ঃ গাঁয়ে আর থাকবো না, দাশুদাদা।

--কেন? আস্তে আস্তে টাঙ্গিটাকে আবার অলসভাবে হাতে তুলে নিয়ে উদাসস্বরে প্রশ্ন করে দাশু।

--গাঁয়ের ঘরে মান নাই, ভাত নাই, কিছু নাই।

--কিন্তু যাবি কোথায়?

--কয়লাখাদে যাব।

--কি বললি? ভ্রূকুটি করে দাশু।

--হ্যাঁ দাশুদাদা। ময়লা কামিন হয়ে খাদে খাটবো। ঠিকেদার বললে, দশ ঘণ্টা খাটলে এক টাকা সওয়া টাকা মজুরি হবে।

--কিন্তু তুই কি শুনিস নাই, দুখনবাবু গাঁয়ের সব মানুষকে ভূমি পাইয়ে দিবে? জমি কর পল্টনী, মনের সুখে ক্ষেত-জোত কর। গাঁয়ের বার হবি কেন?

হেসে ফেলে পল্টনী-- দুখনবাবুর নাম নিও না দাশুদাদা। গাঁয়ের দুখ দেখে সাপও কাঁদবে, কিন্তু দুখনবাবু কাঁদবে না।

--কেন?

--ডাকাইতের কুকুরও যে ডাকাইত বটে।

--ডাকাইতটা কে বটে?

কুঠিয়াল বাবুটা গো, তোমাদিগের ঈশানবাবু। আমার পাঁচ-পাঁচটা ছাগল ধরে নিয়ে গিয়ে কাটলে আর সাহেবদিগে খাওয়ালে ; আজ তক দামটা দিলে না। টাকা মাগতে গেলে ডাকাইতটা বলে, রাতে এসে টাকা নিয়ে যাবি।

দাশু--কিন্তু খাদের ঠিকেদার বেটা কোন্ দয়ার দেবতা বটে? সে বেটা কি গাঁয়ের দুখে কাঁদে বলে গাঁয়ে ঢুকেছে?

পল্টনী--জানি না দাশুদাদা। কিন্তু গাঁয়ে আর থাকবো না।

—ঠিকেদার বেটা কোন্‌দিকে গেল? হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে, আর লাল চোখ দুটোকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে প্রশ্ন করে দাশু।

—দাশুদাদা! পল্টনীর গলার স্বরেও একটা আতঙ্ক কেঁপে ওঠে!

—কি?

—তুমি মিছা মাথা গরম করে খাদের ঠিকাদারের সাথে মারামারি বাধিও না।

পল্টনীর আতঙ্কের আবেদন তুচ্ছ করে, আর পল্টনীর আতঙ্কিত মুখটার দিকে একটা ভ্রূক্ষেপও না করে হনহন করে হেঁটে সড়ক ধরে এগিয়ে যায় দাশু।

কিছু দূরে এগিয়ে যেয়েই থমকে দাঁড়ায়। সড়কের পাশেই যে অড়হরের ক্ষেত, তার পিছন দিকে একটা মেটে ঘরের কাছে চিৎকারের হানাহানি চলেছে। যেন একটা কঠোর হুংকারের সঙ্গে একটা করুণ অট্টহাসির ঝগড়া চলেছে। ওটাই যে তেতরি ঘাসিনের ঘর। কয়লাখাদের ঠিকেদার বেটা কি ভয় দেখিয়ে তেতরিকে ময়লা কামিন করে নিয়ে যাবার জন্য গর্জন করছে?

তেতরির ঘরের বেড়ার কাছে এসে দাঁড়াতেই একটা নির্মম লজ্জার ধাক্কা খেয়ে চমকে ওঠে, আর চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ে দাশু। বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে পড়ে আছে একটা সাইকেল। বেড়ার ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখতে পায় দাশু, ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে বাবুরবাজার ডাকবাংলার খানসামা। খানসামার পা ঘেঁষে একটা রোগা কুকুর হাঁ করে আর জিভ ঝুলিয়ে দিয়ে যেন একটা ঘটনার জন্য লোলুপ হয়ে ওৎ পেতে বসে আছে।

চিৎকার করে খানসামা—যাবি কি না বল মাগি?

—না, যাব না। বলতে বলতে একটা লাল রংয়ের ছেঁড়া সায়া হাতে তুলে নিয়ে পটপট করে ছিঁড়ে মাটির উপর ছুঁড়ে ফেলে দেয় তেতরি। রোগা কুকুরটা এক লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ছেঁড়া সায়ার টুকরো কামড়ে ধরে আর ছুটে পালিয়ে যায়।

খানসামা—মনে করে দেখ তেতরি, ভুখা মরে যেতিস কিনা, যদি আমি তোকে দশটা টাকা দাদন না করতাম।

তেতরি—সব মনে আছে ; কিন্তু তুমি এখন যাও।

খানসামা বলে—তা হলে আমার টাকা ফেরত দে।

তেতরি—না, দিব না।

খানসামা—তা হলে বল, কবে ফেরত দিবি।

তেতরি—সে বলবো না। যেদিন পারবো ফেরত দিব।

খানসামা—সে হবে না। হয় আমার টাকা ফেরত দে, নয় আমার সাথে চল। কলকাতা থেকে ভাল বাবুসাহেব এসেছে। তাদিগে খুশী করে দিয়ে চলে আয়। তোর দুটা টাকা হবে, আমারও কিছু হবে।

তেতরি—না, যাব না।

খানসামা—তবে তোর ঘরের মাল বের করে দে।

তেতরি—তাই নিয়ে যা।

ঘরের ভিতরে ঢোকে তেতরি। পিতলের একটা থালা আর একটা ঘটি নিয়ে এসে খানসামার দিকে ছুঁড়ে দেয় ঃ নিয়ে যা।

খানসামা—এতে কি দশ টাকা উসুল হয়?

আবার ঘরের ভিতরে ঢুকে একটা রূপার হাঁসুলির আধখানা টুকরো হাতে করে নিয়ে এসে খানসামার দিকে ছুঁড়ে দেয় তেতরি।

খানসামা চেঁচিয়ে ওঠে—হলো না। আর কি আছে বের করে দে।

একটুও বিচলিত না হয়ে একটাও কটু কথা না বলে যেন একটা নতুন অদ্ভুতকারের

আনন্দে হেসে ওঠে তেতরি ; আর, খানসামার দস্যুতাকেও তুচ্ছ করে।—আর কিছু নাই। তুমি এবার চলে যাও।

—না, যাব না। এতে উসুল হয় নাই। আবার চিৎকার করে খানসামা।

—তা হলে আমার মাথায় লাঠি মার, আমার লেহু পিয়ে নিয়ে চলে যাও। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হাসতে থাকে তেতরি।

—তোর মত মাগির লেহু পিয়েও আমার রাগ যাবে না। তেতরির মুখের দিকে তাকিয়ে হুংকার ছাড়ে খানসামা।

ঘরের বেড়া মড়মড় শব্দ করে কাতরে ওঠে। ঘরের দরজার কাছে এগিয়ে এসে চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।—খানসামাটা যায় না কেন তেতরি? ভেবেছে কি?

দাশুর লাল চোখ আর হাতের চকচকে টাঙ্গির দিকে চোখ পড়তেই তেতরি ঘাসিনের মুখ শুকিয়ে যায় ঃ যাচ্ছে দাশুদাদা, এখনি চলে যাবে। তুমি ওকে কোন কথা বলবে না।

দাশু বলে—ওকে ঝাড়ু মার না কেন, তেতরি!

আর এক মুহূর্তও দেরি করে না খানসামা। থালা ঘটি আর হাঁসুলির টুকরো হাতে তুলে নিয়েই সরে যায়। দৌড়ে গিয়ে সাইকেলটাকে ধরে, আর অড়হর ক্ষেতের কিনারা ধরে উড়ন্ত ছায়ার মত পালিয়ে যায়।

হাঁপ ছাড়ে দাশু ঃ তুই ওকে ঘরের চিজ ছেড়ে দিলি কেন?

তেতরি হাসে ঃ পাপের ধার শুধে দিলাম। ভাল হলো দাশুদাদা।

দাশু আশ্চর্য হয়ে তাকায় ঃ তুই যেন কি মনে করেছিস তেতরি।

তেতরি—আর গাঁয়ে থাকবো না।

চমকে ওঠে দাশু ঃ কোথায় যাবি?

তেতরি—কয়লাখাদে যাব, কামিন খাটবো।

দাশু—খাদের মালকাটার ঠিকেদার এসেছিল?

তেতরি—হ্যাঁ।

দাশু—কোন্‌দিকে গেল?

তেতরি—মানঝিপাড়ার দিকে গেল।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবে দাশু। তারপর অসহায়ের মত চোখ তুলে অড়হরের ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলে—কয়লাখাদে যাবি?

তেতরি—হ্যাঁ ; এমন গাঁয়ের এমন ঘরে থাকলে গতর পচে যাবে। মরে যাব গো দাশুদাদা। মানও নাই ভাতও নাই, এমন গাঁয়ে কেন থাকবো?

দাশু—জমি যদি পাস, তবে?

তেতরি—কে দিবে জমি?

দাশু—ঈশান মোক্তার দিবে। দুখনবাবু বলেছে, জমি পাইয়ে দিবে।

তেতরি হেসে ওঠে ঃ দিবে না। ওরা আমাদিগে কখনো জমি দিবে না।

দাশু বিরক্ত হয় ঃ কেন দিবে না?

তেতরি—ওরা যদি জমি দিবে, তবে আমাদিগে দুখ দিবে কে?

কী কঠোর অবিশ্বাস! যেমন পন্টনী, তেমনি তেতরি ; ঈশান মোক্তার আর দুখনবাবুকে বিশ্বাস করবার মত একটা প্রাণী বলেও ওরা মনে করে না। পন্টনী আর তেতরির এই অবিশ্বাসের জ্বালা দেখে দাশুর মনের ভিতরেও একটা ভয়-ভয় অস্বস্তি শিউরে উঠতে থাকে।

চলে যায় দাশু। অলস হাতের মুঠোর মধ্যে টাঙ্গির হাতল শিথিলভাবে চেপে ধরে, আস্তে আস্তে হেঁটে, অড়হরের ক্ষেত পার হয়ে আবার সড়কের উপর এসে দাঁড়ায়।

সূর্য ডুবে যাচ্ছে। ছোটকালুর মাথার পিছনটা লাল হয়ে উঠেছে। ডরানির বুকের উপর দিয়ে বকের সারি উড়ে চলেছে। কিন্তু ওরা কারা?

চমকে ওঠে দাশু। একটা আশার চমক। মনে হয়, পল্টনী আর তেতরির এই অবিশ্বাসের হাসি, একটু বেশিরকমের রাগী দুঃখের হাসি। সত্যিই যে জমি পাইয়ে দেবে দুখনবাবু। সত্যিই যে ঈশান মোক্তারের দরবারে গিয়েছিল দুখনবাবু।

বেশ কিছু দূরে হলেও এখান থেকেই ওদের চিনতে পারা যায়। সড়ক থেকে নেমে কুঠির পথে সবার আগে এগিয়ে চলেছে যে, সে হল ঈশান মোক্তারের বড় ছেলে লালবাবু। পাঁচ বছর আগে দেখা লালবাবুর সেই চেহারা অনেক বদলে গিয়েছে। সেই রকমই ধবধবে ফরসা সুন্দর চেহারা আর বড় বড় কোঁকড়া চুল বটে, কিন্তু সেই কাঁচা মুখটি আর নেই। এক জোড়া কালো গোঁপ নিয়ে লালবাবুর মুখটা বেশ গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। বড় হয়েছে, বেশ ডাগর হয়েছে লালবাবুটা!

আগে আগে লালবাবু। তার পিছনে দুখনবাবু। তার পিছনে দুটো পালোয়ান চাকর। একটা চাকরের হাতে বন্দুক, আর একটা চাকরের হাতে ব্যাগ। আরও পিছনে একটা মোটরগাড়ি। বোধ হয় গাড়িটার তেল ফুরিয়েছে, অনেক লোক হল্লা করে গাড়িটাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। তার মধ্যে জটা রাখালের মুখটা বেশ স্পষ্ট করে চিনতে পারা যায়। গলার স্বর সবচেয়ে বেশি জোরে বাজিয়ে আর চেঁচিয়ে হাঁক দিচ্ছে জটা রাখাল ঃ রাজাবাবু এইলেন, কত দয়া করলেন, হেঁইও।

—হেঁইও! একসঙ্গে দম ছাড়ে গাড়ি-ঠেলা ভিড়টা।

জটা রাখাল—রাজাবাবু খুশি হে, কত আশা পুষি হে, হেঁইও!

—হেঁইও!

বিকালের লাল আলোতে রঙিন হয়ে উঠেছে মধুকুপির ক্ষেত আর ডাঙ্গা। আখড়াতে করমের মাদল বাজতে শুরু করেছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকে দাশু। গাড়ি-ঠেলা ভিড়টাও বিশ্বাসের গান গাইছে। মধুকুপির বুকের উপর আশা আর আশ্বাসের উৎসব মেতে উঠেছে।

ওই তো লালবাবু ; মনে পড়ে দাশুর জেলে যাবার ঠিক আগের বছরে শীতের সময় যে-বার বড় ভাল গম ফলেছিল ডরানির কানা নালার দু পাশে, সে-বার ডরানির দহের নতুন হাঁস শিকার করতে এসেছিল লালবাবু। শীতের সকালে দহের জলে নতুন হাঁস ভাসতে দেখে ছেলেমানুষের চোখে সে কী খুশি, মুখে সে কী হাসি! ছেলে মানুষ হয়েও কী সুন্দর বন্দুক চালাতে পারত লালবাবু। সেদিন দাশুই তো লালবাবুকে কাঁধে চড়িয়ে ডরানির কনকনে ঠাণ্ডা জল পার হয়ে শিকার খেলাতে ওপারে নিয়ে গিয়েছিল।

মধুকুপির কিষাণের দুখ বুঝতে পেরেছে কি লালবাবু? তাই তো মনে হয়। হে কপালবাবা, তাই যেন হয়! পল্টনী আর তেতরির সন্দেহ যেন মিথ্যা হয়!

কপালবাবার জঙ্গলের দিকে তাকায় দাশু। কপালবাবা ছাড়া মধুকুপির কিষাণের আর কেউ সহায় নাই। এখনই কি কপালবাবার আসনের কাছে গিয়ে একবার মাথা ঠেকিয়ে চলে আসতে পারা যায় না? সন্ধ্যা হয়ে এল, কিন্তু তাতে কি আসে যায়? এক দৌড়ে যাওয়া, আর এক দৌড়ে ফিরে আসা, রাত হলেও কতই বা রাত হবে?

কপালবাবার আসনের কাছে মাথা ঠেকিয়ে যখন উঠে দাঁড়ায়, তখনও আকাশের সব তারা ফুটে ওঠে নি। ফিরে আসবার পথে ডরানির পুল পার হয়ে মধুকুপির মাটির উপর এসে দাঁড়াতেই থমথমে অন্ধকারের মধ্যে শিয়ালের দল আগ-রাতের প্রথম হাঁক হেঁকে ডাঙার উপর দিয়ে ছুটে চলে গেল।

কিন্তু কই মাদলের শব্দ শোনা যায় না কেন? করম পরবের উল্লাস এত তাড়াতাড়ি আগ-রাতের পহরে ক্লান্ত হয়ে আর নীরব হয়ে যাবে, এ কেমন পরব? বড় বুড়া রতনের কলিজায় না হয় জোর নাই ; কিন্তু সনাতন লাইয়ার কি হল? মাদল পিটতে আর হাঁড়িয়া টানতে সনাতনেরও কি সাধ নাই, আর কলিজার জোর নাই? একজনারও কি হুঁশ নাই, দম নাই? হাঁপিয়ে পড়েছে মেয়েগুলিও ; গরুচরানী জগমোতি বধুনি আর কালিমণি? ওরাও কি বমি করে করে ঝুমুর গান থামিয়ে দিল, আর নাচ ছেড়ে দিয়ে ভুঁইয়ের উপর লুটিয়ে পড়ল?

না, আখড়াতেই যেতে হবে। সড়ক থেকে নেমে একটা চষা ক্ষেতের আলের উপর দিয়ে হন্তদন্ত করে হাঁটতে থাকে দাশু। চিনতে পারে দাশু, এই ক্ষেত হল ঈশান মোক্তারের সেই ক্ষেত, জেলে যাবার আগে রোজ এক সের চালের সিধা আর চার আনা নগদ পেয়ে যে ক্ষেতে বরবটি বুনেছিল দাশু। কেমন ফলন হয়েছিল, নিজের চোখে দেখে যেতে পারে নি।

কিন্তু এ কি? আবার কাঁদে কে? যেন দুই হাতে মুখ ঢাকা দিয়ে আর লুকিয়ে লুকিয়ে ভয়ানক করুণ স্বরের একটা কাঁদুনির গান গাইছে কেউ। ওই যে একটা ঘর, ঘরের সামনের ছোট আঙ্গিনায় টিম টিম করে একটা বাতি জ্বলছে। ওটা তো ফুলকি মাসীর ঘর।

হলুদ-ছোপানো শাড়ি পরে, নারকেল তেলে চুল ভিজিয়ে খোঁপা বাঁধে, লাল গালার রস দিয়ে নখ রাঙায়, সে ফুলকি মাসী আজ কাঁদে কেন? ঈশান মোক্তারের সেবা করবার জন্য জীবনটাকে বাঁধা দিয়েছে যে ফুলকি, কুঠি থেকে বছরের সিধা যার জন্য বরাদ্দ করা আছে, ঈশান মোক্তারের কাছ থেকে জমি খয়রাত পেয়েছে যে, সে ফুলকির প্রাণ আবার কিসের ব্যথায় কাঁদে?

এগিয়ে যেয়ে ফুলকি মাসীর আঙ্গিনার উপর দাঁড়ায় দাশু। ফুলকি মাসীর চাপা কান্নার স্বর ডানাভাঙা চিলের আর্তস্বরের মত আরও করুণ তীক্ষ্ণতায় কেঁপে কেঁপে বেজে ওঠে ঃ আর এ গাঁয়ে থাকবো না দাশু।

আবার সেই অভিশাপের শব্দ! কী আশ্চর্য, ফুলকি মাসীও যে পল্টনী আর তেতরির মত সেই এক ধিক্কারের ভাষায় মধুকুপির মাটিকে গালি দিয়ে অপমান করছে।

—তোমার আবার কাঁদতে সাধ হলো কেন মাসী? ফুলকির মুখের দিকে ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে প্রশ্ন করে দাশু।

আবার মুখের উপর আঁচলচাপা দিয়ে কাঁদতে থাকে ফুলকি। ঘরের দাওয়ার এক কোণ থেরে মরা জীবের মত একটা অনড় চেহারা হঠাৎ নড়ে ওঠে। ফুলকির স্বামী খোঁড়া তিনকড়ির গলার স্বরটাও যেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে একটা অদ্ভুত কথা বলে—লালবাবু ফুলকির কোমরে জুতাপায়ে লাথি মেরেছে।

—কেন? গর্জন করে দাশু।

তিনকড়ি বলে—ফুলকি জানে। আমাকে শুধাও কেন?

—কি মাসী? তোমার ঈশান মোক্তারের ছেইলা হয়ে লালবাবু তোমাকেই জুতার ঠোকর মারে কেন? ফুলকির কাছে এগিয়ে এসে আবার প্রশ্ন করতে গিয়ে দাশুর দাঁত কড়মড় করে বেজে ওঠে।

হঠাৎ মুখের উপর থেকে চাপা আঁচল সরিয়ে খোঁড়া তিনকড়ির দিকে হিংস্রভাবে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে ফুলকি—তুই আমার জ্বালা বুঝবি কি রে খোঁড়া গরু। তোর লেগেই তো আমাকে মরতে হয়েছে রে মড়া! তোকে পুষবার লেগে সিধা মাগতে গিয়ে যে আমার ধরম করম সব গেল রে কপালপোড়া। তুই মানুষ হলে ভিখ মেগে খেতিস, জরুর ভাত খেতিস না।

খোঁড়া তিনকড়ির চেহারাটা আবার একটা মড়া জানোয়ারের মত গুটিয়ে পাকিয়ে অনড় হয়ে যায়। ফুলকি বলে—ঈশান মোক্তারের বেটা আমার সিধা বন্ধ করে দিলে, জমিটাও ছিনে

নিলে।

—কেন?

—আমি ওর সেবা করতে রাজী হই নাই।

দু হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাতে থাকে ফুলকি ঃ আমি ভাবি নাই দাশু, বুড়া মোক্তারের বেটাও আমাকে এমন কথা বলবে। যাকে ছেইলা বলে মানি, সে আমাকে মাগি বলে মনে করে আর গতর ছুঁতে চায় ; কী কপাল করেছিলি রে ফুলকি!

দাশুর লাল চোখের কোণে জলের ফোঁটা কাঁচা রক্তের ফোঁটার মত টলমল করে। ফুলকি মাসীকে সান্ত্বনা দেবার মত কোন ভাষা আর খুঁজে পায় না দাশুর মন। দাশুর পাঁজরের হাড়গুলি যেন পুড়ছে। সারাদিনের একটা ভুয়া আশার নেশা এইবার একেবারে ছাই হয়ে ঝরে পড়ে গিয়েছে। লালবাবু একটা অভিশাপ, দুখনবাবু একটা হিংসা। মধুকুপির কিষাণের প্রাণের সব সুখ শুষে নিয়ে রক্তমাখা জিভ দুলিয়ে নাচবার জন্য দুই পিশাচের মতলব আরও কঠোর হয়ে উঠেছে।

টাঙ্গিটা কাঁধের উপর তুলে, আর নিজের মুখের চেহারাটাকেও একটা আক্রোশের পিশাচের মত বীভৎস করে তখনি একটা দৌড় দিত দাশু, কিন্তু ফুলকি মাসী আগে উঠে এসে দাশুর হাতের টাঙ্গি চেপে ধরে ঃ তুমি ওদিক পানে আর যেও না, দাশু।

দাশু—কি বলছিল মাসী?

ফুলকী—তুমি কুঠিতে যেও না।

দাসু—কেন?

ফুলকি—যেয়ে লাভ নাই। কুঠির দয়া আর চাই না দাশু। আমি এ গাঁয়ে আর থাকবো না।

দাশু—কোথায় যাবে?

ফুলকি—কয়লাখাদে যাব।

আস্তে একবার চমকে ওঠে দাশু। মাথার ভিতরের সব আক্রোশের উত্তাপও যেন হঠাৎ শিউরে ওঠে আর ঠাণ্ডা হয়ে যায়। মাথা হেঁট করে একটা হাঁপ ছাড়ে দাশু ঃ ছেড়ে দে মাসী, ঘরে যেতে দে।

ঘরের দিকেই এগিয়ে যেতে থাকে দাশু। চযা ক্ষেতের মাটিব তেল মাড়িয়ে, টলতে টলতে সড়কের উপর এসে উঠে একবার পিপুলতলার দিকে চোখ পড়ে দাশুর। অনেক আলো জ্বলছে পিপুলতলায়, আর বেশ নতুন রকমের একটা হল্লার শব্দও বাজছে। বাবু দুখন সিং আবার একটা নতুন অভিশাপের উৎসব মাতিয়ে তুলেছে বুঝি! চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ঘরে ফিরে যাবার পথে এগিয়ে যেতে থাকে দাশু।

ঘরের কাছে এসে পৌছতেই দেখতে পায় দাশু দাওয়ার উপর একটা ছায়া বসে আছে ঃ কে বটে? ডাক দেয় দাশু।

—আমি সনাতন।

—কি বটে সনাতন?

দুখনবাবু নতুন জাতপঞ্চ চালু করলে। যারা ঈশান মোক্তারের জমিতে মনিয খাটতে রাজী আছে, শুধু তাদের নিয়ে নতুন জাতপঞ্চ হলো। ভটা রাখালের দল আছে। সাধু, ভনু আর পচুও আছে। শুন নাই পিপুলতলার হল্লা?

—শুনেছি। কিন্তু...।

দাশুর হাত ধরে টান দেয় সনাতন ঃ না দাশু। আজ আর ওদের কিছু বলতে যেও না। তুমি ঘরে থাক।

দাশু চেঁচিয়ে ওঠে—কিন্তু কাল আমাদিগের জাতপঞ্চ ডাকতে হবে সনাতন। ডর করলে চলবে না।

--বেশ, বেশ। তাই হবে দাশু। দাশুকে ঘরের ভিতরে ঠেলে দিয়ে আর দরজার কপাট ভেজিয়ে দিয়ে চলে যায় সনাতন।

ওদিকে পিপুলতলায় চারটে খুঁটির গায়ে চারটে লণ্ঠনের আলোর কাছে বনচণ্ডীর নামে শপথ করে যে নতুন জাতপঞ্চ হেসে আ. চেঁচিয়ে উঠল, সেই জাতপঞ্চের সভার মাঝখানে দুখনবাবুর পাশে তখন আর একটি চৌকির উপর বসেছিল, একজন, বেশ হাসি-হাসি মুখ, বনচণ্ডীর সেবাইত চক্রবর্তী।

দুখনবাবুর প্রাণের আশা উৎসাহ আর প্রতিজ্ঞার সৃষ্টি এই জাতপঞ্চ জাতের সুধার মেনে নিয়েছে। না, ঘরের ব˘ বেটি বহিন আর নাচবে না। লাজের বয়স হবার আগেই বেটি-বহিনের বিয়া দিতে হবে। বিয়ার কাজে বামনে মন্তর পড়বে। কেউ আর কুঁকড়া খাবে না।

তা ছাড়া, জমি চাই না। কুঠির জমিতে বাপদাদারা যেমনটি মনিষ খেটে এসেছে, সবাই তেমনটি মনিষ খাটবে।

আর, আর একটা প্রস্তাব করল দুখনবাবু, আর চক্রবর্তীও বুঝিয়ে দিল। জাতের তিনটা ভাগ দল। জাতিয়া, খাদিয়া, আর কুঁকড়াশী। যারা বামন মানবে তারা জাতিয়া ; যারা কয়লাখাদে কাজ নিয়ে মালকাটা আর ময়লাকামিন হবে, তারা খাদিয়া। যারা কুঁকড়া খাওয়া ছাড়বে না, তারা কুঁকড়াশী। ভাত-ভাইয়ারীতে জাতিয়ারা সবার আগের সারিতে বসবে, পরের সারিতে খাদিয়ারা ; শেষ সারিতে কুঁকড়াশী। যদি খাদিয়া আর কুঁকড়াশীরা এই নিয়ম না মানে, তবে জাতিয়ারা তাদের সাথে কোন ভাত-ভাইয়ারীতে বসবেই না।

জটা রাখাল বলে—বড় ভাল নিয়ম হলো, দুখনবাবু।

বনচণ্ডীর প্রসাদ বিতরণ করে চক্রবর্তী ; জাতপঞ্চের সভা যখন ভাঙে, তখন পিপুলতলার ছায়ার অন্যদিকের একটা চৌকির উপর নড়ে চড়ে বসে একটি প্রসন্ন মূর্তি, আর টেঁকুর তুলে নিয়ে সরাবের বোতলটাকে তারই পায়ের কাছে উবু হয়ে বসে থাকা একটি বিনীত মূর্তির এগিয়ে দিয়ে বলে--নে রামাই, একটু তাড়াতাড়ি কর।

পুলিশ মুন্সী চৌধুরীর হাত থেকে সরাবের বোতলটা হাতে তুলে নেয় রামাই দিগোয়ার। আজই দুপুরে লালবাবুকে সঙ্গে নিয়ে গোবিন্দপুর থানাতে গিয়ে এজাহার দিয়েছিল দুখনবাবু, মধুকুপির একদল দুর্দান্ত কিষাণ কুঠির ভাণ্ডার লুট করতে চায়।

কুঠিতে লালবাবু আছে, বন্দুক আছে আর দুটো পালোয়ান চাকরও আছে। আর, এখানে আছে পুলিশ মুন্সী চৌধুরীজী ও রামাই দিগোয়ার। চৌধুরীর কাঁধেও বন্দুক। আর কিসের পরোয়া? কার ডর? বড়বুড়া রতনের শীর্ণ কণ্ঠের হুংকার, দাশু দাগী আর সনাতন লাইয়ার চিৎকারকে বার ঘণ্টার মধ্যেই জব্দ করে দিয়েছে দুখনবাবু। চৌধুরীর আশ্বাসে প্রসন্ন আর নির্ভয় হয়ে নতুন জাতপঞ্চ চালু করে ফেলেছে দুখনবাবু। শালুর রুমালে বাঁধা দশটা টাকার নগদ উপহার চৌধুরীর খাকি কোটের পকেটের ভিতরে অনেকক্ষণ হল ঠাঁই পেয়েছে।

—আর কি চাই, আজ্ঞা করেন চৌধুরীজী। চৌধুরীর কাছে এগিয়ে এসে বিনীতভাবে প্রশ্ন করে দুখনবাবু।

—একটা গো-গাড়ি চাই দুখনবাবু।

গো-গাড়ি আসতেও দেরি হয় না। তারপরেই পিপুলতলার সড়কের উপর দিয়ে দুটি ছায়ামূর্তি যেন দুলে দুলে হাঁটতে শুরু করে। চৌধুরীর পায়ের ভারী বুটের শব্দ খট খট করে বাজে। রামাই দিগোয়ারের খালি পা পথের কাঁকর ঘষে ঘষে চলে। পিছনে গো-গাড়ির চাকাতেও যেন একটা লালসার্ত স্বরের শিহর। চৌধুরী ডাকে—রামাই।

—বলেন হুজুর।

—সরদারিনের হাসিটা বড় মিঠা, নয় কি?

রামাই—হ্যাঁ হুজুর...বাস্...এই তো ওর ঘর। আপনি এখানে গাড়ির কাছে একটুকু দাঁড়ান ;

আমি সরদারিনকে ডেকে নিয়ে আসছি।

জীর্ণ জামকাঠের দরজার উপর আস্তে আস্তে টোকা দিয়ে একটা আদুরে আহ্বানের নরম শব্দ বাজিয়ে ডাক দেয় রামাই—সরদারিন ; আমরা এসেছি গো। গো-গাড়িও এনেছি।

দরজা খুলে যায়। ঘরের ভিতর বড় অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছটফট করছে যে ছায়াটা, তারই দিকে তাকিয়ে রামাই দিগোয়ার বলে—তুমি যেমনটি বলেছিলে, তেমনটি বন্দোবস্ত হয়েছে সরদারিন। গোবিন্দপুর বাজারে তোমার লেগে ঘর নিয়েছেন চৌধুরীজী।

ঘরের ভিতরের ছায়াটা আরও অস্থির হয়ে ওঠে। রামাই হাসে—আরও ভাল খবর আছে, সরদারিন। দাশুর নামে থানাতে অনেক এজাহার পড়েছে। জঙ্গলের শিশাল চুরি, খয়ের চুরি, আর কাঠকয়লা চুরি। গত মাসে থানাতে হাজিরাও দেয় নাই দাগীটা। কাল ওর গেরেপ্তারি হবে। আবার পাঁচ বছর ধরে জেলের ভাত খাবে দাগীটা। তোমার কোন ভাবনা নাই সরদারিন। এসো...চলে এসো। চৌধুরীজী দাঁড়িয়ে আছেন। আর দেরি কর কেন, সরদারিন?

ঘরের ভিতরের ছায়াটা আবার ছটফট করে ওঠে। তার পরেই একেবারে শান্ত হয়ে যায়। দরজার চৌকাঠ পার হয়ে ধীরে ধীরে ঘরের বাইরে দাওয়ার উপর এসে দাঁড়ায় ছায়াটা।

—তুই কে বটিস? চিৎকার করে দু পা পিছিয়ে যায় রামাই দিগোয়ার। তার পরেই একটা প্রচণ্ড আতঙ্কের ডাক ছাড়ে—জলদি আসেন হুজুর। দাগীটা ঘরে আছে।

একটা ঝোলার ভিতর থেকে হাতকড়া আর দড়ি বের ক'রে, কাঁধের বন্দুকটা হাতে তুলে নিয়ে দোলাতে দোলাতে ছুটে আসে চৌধুরী ঃ শালকে বেঁধে ফেল রামাই।

কোন আপত্তি করে না, নড়েও না দাশু। রামাই দিগোয়ার দাশুর দুটো হাত শক্ত করে চেপে ধরে, হাতকড়া পরিয়ে দেয় চৌধুরী। দাশুর কোমরটাকেও দড়ি দিয়ে দু পাক বেঁধে নিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে চৌধুরী—সরদারিন গেল কোথায়?

দাশু—ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছে।

চৌধুরী—যাবেই তো ; তোর মত দাগীর ঘরে থাকবে কেন মুরলীর মত মাগি? কিন্তু ভাল ঠগিন বটে মাগিটা!

রামাই বলে—মাগিটা এই দাগীটার চেয়েও চালাক আর বদমাশ বটে হুজুর।

দাশুর কোমরের দড়ি ধরে টান দেয় চৌধুরী ঃ চল।

গোবিন্দপুর থানার হাজতঘরে সাতটা দিন আর রাত পার করে দেবার পর যেদিন জেল হাজতে চালান হয় দাশু, সেদিন দাশুর প্রাণ যেন একটা দুঃসহ জ্বরের জ্বালা থেকে মুক্তি পেয়ে হাঁপ ছাড়ে। গোবিন্দপুর থানার পিশাচটা, চৌধুরীজী যার নাম, তার ছায়া আর চোখে দেখতে হবে না। ঐ ঘড়ঘড়ে স্বরের হাঁকডাক আর শুনতে হবে না।

যখন তখন এসে মুরলী কিষাণীর নাম করে এক-একটা গালভরা লালসার গালি আর ঠাট্টার বুলি চেঁচিয়ে বলতে ও হেসে উঠতে বড় মজা পায় চৌধুরী। মুরলীর মত কিষাণীর আগুনপারা যৈবনটি, গতরের ঠাটটি, আর বুকটির ও কোমরটির বাহারটি কি এক ভাতারের বশ হতে পারে রে বোকা কিষাণ? মাগি ঘরের বার হয়েছে, বেশ হয়েছে। চৌধুরীজীর কথা শুনে হাজত-ঘরের বন্দী যত কালো-কালো মুখগুলিও হো-হো করে হেসে ওঠে।

ভেজা ঠোঁটের সরস হাসিটাকে জিভ দিয়ে চেটে চৌধুরী আক্ষেপ করে ঃ কিন্তু মাগিটা বড় চালাক বটে হে, সরদার। খিরিস্তান পলুস হালদারের সাথে ঢলেছে। মাগি শেষে মেমসাহেব হয়ে যাবে নাকি হে?

হাজত-ঘরের ভিড় আবার হেসে ওঠে। চৌধুরীজীর চোখে হঠাৎ ছোট একটা ভ্রূকুটি শিউরে শিউরে কাতরাতে থাকে।—বড় শক্ত ঠাঁই নিয়েছে মাগি। খোঁজ নিয়ে জেনেছি,

হারানগঞ্জে গিয়ে সিস্টার দিদির আদরের কবুতরটি হয়েছে মাগি। তা না হলে ওকে টেনে এনে থানার ভাত খাইয়ে ছাড়তাম হে।

--সিস্টার দিদি কওন ছে? হাজত-ঘরের ভিড়ের ভিতর থেকে একটা রুক্ষ মুখ দুপাটি দাঁতের সাদা বের করে হেসে ওঠে।

চৌধুরী—হারানগঞ্জের সিস্টার দিদির নাম শুনিস নাই মেডুয়া? এত বড় লাল মুখ, নীল চোখ, আর সাদা চুলের ঝুঁটি ; বিলাতী বুড়ির একটা ভাই যে লাট সাহেব হয়েছিল হে! আজাদী হবার পর বিলাত পালিয়েছে সিস্টার দিদির লাট ভাই। কিন্তু, সিস্টার দিদির ভঁাট তবু মরে নাই।

ছোটকালুর বহেড়া জঙ্গলের একটা নেকড়ে একবার ডরানির বানভাসির যত মড়ার মাংস খেয়ে খেয়ে পাগল হয়ে গিয়েছিল। নেকড়েটার গলার স্বরও বদলে গিয়েছিল। মনে হয় দাশুর, গোবিন্দপুর থানার এই চৌধুরীর গলার স্বরের মধ্যে সেই পাগল নেকড়েটারই গলার স্বর ঘড়ঘড় করছে। একদিন ধানক্ষেতের আলোর কাছে দেখতে পেয়ে নেকড়েটাকে কাটবার জন্য টাঙ্গি হাতে নিয়ে তাড়া করেছিল দাশু। কিন্তু পালিয়ে গিয়েছিল নেকড়েটা।

সেই ব্যর্থতার আর অক্ষমতার আক্ষেপ তবু সহ্য করা যায়। কিন্তু চৌধুরীজী নামে এই নেকড়েটাকে সেদিন রাতের অন্ধকারে ঘরের দরজার কাছে পেয়েও টাঙ্গির এক কোপে কেটে দু টুকরো করে দেবার ইচ্ছা কেন হয় নি, সে কথা এখন ভাবলে একটা জ্বালাময় আক্ষেপ দাশুর মনের ভিতরে ছটফট করে ওঠে। ভুল হয়েছিল ; বড় খারাপ ভুল। সে ভুলেরই শাস্তি। একটা লুচ্চা লোভের ঠোঁট-চাটা নেকড়ে মুরলীর নাম করে যা-খুশি তাই বলে নিচ্ছে ; আর দাশুকেও তাই নিজের কানে শুনতে হচ্ছে। আর যে সহ্য করতে পারা যায় না।

তাই জেল হাজতে যাবার দিনে দাশুর প্রাণটা সাত দিনের অভিশাপের গ্রাস থেকে সরে যাবার সৌভাগ্যে খুশি হয়ে ওঠে। গোবিন্দপুরের ছোট জেলখানা ; ফটকটা পুরুলিয়ার জেলখানার ফটকের মত দরাজ নয়। কিন্তু গোবিন্দপুরের ছোট জেলখানার ভিতরের সব্জী-বাগানটা দেখতে কী চমৎকার! মাটিটা লাল এঁটেল বটে ; কিন্তু পচা হিঞ্চের সবুজ সার দিয়ে মাটি মজানো হয়েছে নিশ্চয় ; তা না হলে মাটির রংয়ে এত কালোকালো দানা কেন, আর গন্ধটাও সোঁদা কেন? বাগানের একদিকে পুঁই আর লাউয়ের লতা মাচান উপচে ঝুলে পড়েছে। আর একদিকে শুধু চষা হয়ে পড়ে আছে মাটি। ওখানে ফুলকপির চারা লাগানো হবে বলে মনে হয়, নয়তো মূলা আর পালং।

জেল-হাজতে প্রথম রাতেই আধা-ঘুমের ঘোরে হেসে ফেলে আর জেগে উঠে কম্বলের উপর কিছুক্ষণ বসে থাকবার পর বুঝতে পার দাশু, কেন হেসে উঠল মনটা, আর মাথার ভিতরে একটা স্বস্তির আরামই বা বোধ হচ্ছে কেন?

মনে পড়েছে দাশুর, নেকড়ের মাংসাশী আহ্লাদের চক্রান্তটাকে কী সুন্দর বুদ্ধির খেলায় বেকুব করে দিয়েছে মুরলী! ওর প্রাণের আর গতরের মান বাঁচিয়ে পালিয়ে যেতে পেরেছে! তুই সত্যিই হিসাব জানিস, বড় ভাল হিসাব জানিস, মুরলী।

ভাল হয়েছে। খুব ভাল। দাশুর আধা ঘুমের স্বপ্নটা যেন মুরলীর সৌভাগ্য দেখে খুশি হয়েছে। না, আর আক্ষেপ করার কিছু নেই। মুরলী যখন নিরাপদ, তখন পাঁচ বছরের কয়েদ নির্ভাবনায় সহ্য করতে পারা যাবে।

পাঁচ বছর? সত্যিই কি আবার পাঁচ বছরের শক্ত সাজা হবে? যদি হয়, হেই গো কপালবাবা, দাশু কিষাণের প্রাণটাকে বাঁচিয়ে রাখবে তো? মুরলীর পেটে যে দাশু কিষাণের ছেইলা আছে। দেখতে কেমনটি হল, দেখতে কত ভাল লাগে নিজের ছেইলার মুখটা, সে সুখ জীবনে না বুঝে নিয়ে মরে যেতে ইচ্ছা করে না।

না, মরব কেন? দাশুর জীবনের আশা আর প্রতিজ্ঞা আবার আশ্বস্ত হয়ে তন্দ্রাময় হাসি

হাসে ; কলঘরের বড় মিস্তিরি খিরিস্তান পলুসের ঘরের সুখের গৌরবকে হার মানতে বাধ্য করবে যে দাশু, সে দাশু মরবে না। জেল থেকে ফিরে এসে ক্ষেতজোত করবে, নতুন মাটির ঘর তুলবে। আঙিনায় খড়ের মাচানের পাশে বসে সাঁঝের চাঁদের দিকে তাকিয়ে যখন মাদল বাজাবে দাশু তখন আঙিনার দিকে মুরলীকে আস্তে আস্তে আর হেসে হেসে এগিয়ে আসতে দেখে একটুও আশ্চর্য হবে না দাশু—আমি তো জানতাম মুরলী, একদিন তোর ফিরে আসতে হবে। কিন্তু...তুই বল এবার, আজ আমি তোকে কেমন করে ঘরে ঢুকতে বলি?

—কেন সরদার? আমার লেগে কি তোমার মনে একটুকও মায়া নাই?

জেল-ফটকে বিউগল বাজে। হাজত-ঘরের দরজার বাইরে ভারী বুটের শব্দ শোনা যায়। দাশু কিষাণের ঘুমভাঙা চেতনার মধ্যে একটা অভিমান যেন নীরবে গুনগুন করে, সত্যিই কি মধুকুপির গরীব কিষাণকে আবার পাঁচ বছরের কয়েদ খাটাবে কপালবাবা?

তারপর আর বেশি দেরি হয় না। জেল ফটকে সকাল নটার ঘন্টা বাজতেই রুটি-গুড় আর জল খেয়ে যখন হাঁপ ছাড়ে দাশু, তখন হাজতঘরের দরজা খুলে যায়। দড়ি-বাঁধা কোমর নিয়ে দুই সিপাহীর পাহারায় গোবিন্দপুরের আদালতের পথে এগিয়ে যেতে হয়। তিনটে চুরির অপরাধ, থানায় হাজিরা না দেবার অপরাধ, আর ঈশান মোক্তারের ভাণ্ডার লুট করবার জন্য হাঙ্গামা মাতাবার অপরাধ। পাঁচটি অপরাধের বিচার বরণ করতে হবে। দাশু জানে, চৌধুরীজীই জানিয়ে দিয়েছে—এই পাঁচ কসুরের জন্য তোকে চালান করা হয়েছে রে দাগী।

জেল-হাজত থেকে আদালত, দাশুর জীবনটা আবার আসামী হয়ে দুই সিপাহীর পাহারায় আনাগোনা করে। প্রায় রোজই আধ ক্রোশেরও বেশি পথের লাল ধুলো মাড়িয়ে আদালতে যেতে হয়। আসামীর কাঠগড়ায় একবার দাঁড়াতেও হয়। কে জানে কি বলেন আর কি লেখেন হাকিম! তারপর আবার কোমরের দড়িতে টান দেয় সিপাহী। কাঠগড়া থেকে নেমে আসতে হয়। আবার জেলের পথে ফিরে যেতে হয়, আবার জেল-হাজতের নিভৃতে কম্বলের উপর শুয়ে বসে শুধু ভাবনা। সেই ভাবনার মধ্যে একটা ক্ষেত আর গুলঞ্চের বেড়া, একটা নতুন মাটির ঘর ; মুরলী আর মুরলীর ছেইলা, মাদল আর মহুয়ার মায়া তন্দ্রাময় হয়ে ওঠে। ভোরের বিউগল বাজলে তবে সেই তন্দ্রার ছবি ভাঙে।

কে জানে কবে বিচার শেষ হবে? আদালতের বাইরে একটা আমবাগান। তারই ছায়ায় বসে আসামী দাশুর কোমরের দড়ি ধরে হাঁকের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে রোজই হাঁপিয়ে ওঠে সিপাহী দুজন।

হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে সিপাহী গোকুল সামন্ত—এ অর্জুন সিং?

—কি হো? মাথা ঝেঁকে ক্লান্ত চোখের আলস্য ঝেড়ে ফেলে উত্তর দেয় অর্জুন সিং।

গোকুল সামন্ত বলে—ভালা পাগল হয়েছে আদালত। এক বেটা দেহাতী চাষার ছুটকা চুরির মামলা খতম করতে আর কতদিন নিবে? রোজ রোজ সাক্ষী রে ; সাবুদ রে ; তারিখ রে। আর আমাদিগের দিনভর হয়রানি রে! ভালা, এতদিনে যে কোলের ছেইলার মোচ গড়ায়ে যায় হে।

অর্জুন সিং মুখ কুঁচকে দাঁতের ব্যথা চাপতে চেষ্টা করে ঃ মত্ কহো ভাইয়া! থোড়াসা শিশাল, দো-চার সের কত্থা, ইতনাসা কোয়লা, সাড়ে চার রূপাইয়াকা মাল চোরিকে মামলা ; ইসকে লিয়ে শও শও রূপেয়া খরচা! ইয়ে তো মামলা নেহি ; তামাশা হ্যায় ভাইয়া!

দাশুর মুখের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে একটা রাগের হাঁক ছাড়ে সিপাহী গোকুল সামন্ত—তোমার লাজ লাগে নাই সরদার? মাগের কানে কোন্ সোনার মাকড়ি পরাতে সাধ হয়েছিল যে সাড়ে চার টাকার মাল চুরি করলে? সত্যি চুরি করেছিলে কি?

দাশু হাসে ঃ হ্যাঁ, চুরি বল তো চুরি। ডাকাতি বল তো ডাকাতি, লুঠ বল তো লুঠ! যাদিগের মাল তাদিগের হুকুম না নিয়ে ওই সাড়ে চার টাকার মাল তুলে এনেছিলাম।

অর্জুন সিং--সে তো হলো, কিন্তু ঈশান মোক্তারের ভাণ্ডার লুঠ করবার লেগে তুমি যে...,

গোকুল সামন্ত চেঁচিয়ে ওঠে--দূর দূর! দুখন গুমস্তার মত শয়তানের এজাহার তুমিও বিশ্বাস কর সিংজী?

অর্জুন সিং--কি সরদার? ঝুট বটে কি?

দাশু--হ্যাঁ।

গোকুল সামন্ত--নিশ্চয় তোমার উপর ওর রাগ আছে?

দাশু--হ্যাঁ।

গোকুল--তবে আর তোমার ছাড়া নাই সরদার। চৌধুরী আর দুখনবাবু, ওরা দুজন হল দুটা ভগবান ; আর থানাটা ওদের বৈকুণ্ঠ। ওদের দয়া খণ্ডাবে, কারও বাপের এমন জোর নাই।

অর্জুন সিংয়ের চোখ আবার ঢুলুঢুলু হয়। ঘুমের আবেশে মাথা ঝুঁকিয়ে বিড়বিড় করে অর্জুন সিং--সাড়ে চার রূপৈইয়ার মাল চোরি না করে ভিখ মাংনা যে ভাল আছে রে ভাই। কাজ না মিলে তো ভিখ মাংগো। বাজারে বাজারে রাম নাম হাঁকতে চলো, আউর ভিখ মাংগতে চলো। পুনভি হোবে, ভুখবি মিটবে।

দাশুর চোখ দুটো হঠাৎ ভয় পেয়ে থরথর করে কেঁপে ওঠে। এ কি ভয়ানক অদৃষ্টের খবর শুনিয়ে দিয়ে ঘুমের আরামে মাথা ঝুঁকিয়ে ঢুলতে শুরু করেছে সিপাহীটা! ওর কপালে হলুদ রংয়ের কত বড় তিলক! মধুকুপির কিষাণের জীবনটা কি সত্যিই ভিক্ষুক হয়ে যেতে চলেছে?

দাশু কিষাণের পাথুরে ছাঁদের বুকটাও ধড়ফড় করে ওঠে ; সত্যিই একটা ভিক্ষুকের নাকি সুরের চিৎকার আদালতের চারদিকের সব সোরগোলের বুক ভেদ করে উথলে উঠেছে। ভীরু কুকুরের আর্তনাদের মত একটা আবেদনের ভাষা যেন কেঁউ কেঁউ করে ভিড়ের ভিতর ঘুরছে।

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখতে থাকে দাশু, নাকি সুরের গানের মত সুর করে ছড়া কাটছে ভিক্ষুকটা--দাতা দেবতা, দেবতা দাতা। দাতার মাথায় সোনার ছাতা।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে আসছে ভিক্ষুকটা, আর পথের ভিড়ের মানুষগুলির চোখের সামনে একটা টিনের কৌটা দুলিয়ে বুড়ো কুকুরের মত ধুঁকে ধুঁকে নাকিসুরের বুলি ছাড়ছে--বাবা গো বাবা। একটা পয়সা যে তোমার পানের পিক গো বাবা! দুটা পয়সা যে তোমার চা-পানির থুক গো বাবা! খোঁড়া সাধুকে একটা-দুটো পয়সা দয়া কর গো বাবা!

সড়ক থেকে নেমে আমবাগানের ভিড়ের কাছে এগিয়ে আসে ভিক্ষুকটা ; আর, দাশুর চোখের কাছ দিয়ে যেতে যেতে হাঁক দেয়--বাবা গো বাবা!

দাশুর বুকের পাঁজরগুলি যেন এক সঙ্গে ছিঁড়ে গিয়ে একটা প্রচণ্ড শব্দ ছাড়ে--মেসো হে, ও তিনকড়ি মেসো!

থমকে দাঁড়ায় ভিক্ষুকটা। হ্যাঁ, মধুকুপির তিনকড়ি মেসোই বটে। বটের আঠা আর ধুলো মাথায় মেখে বড় বড় চুলের জটা করে, গিরিমাটি দিয়ে রঙিন করা এক ঠুকরো কাপড় কোমরে জড়িয়ে, আর বুকের উপর এক মুঠো ছাই ছড়িয়ে দিয়ে সাধু সেজেছে যে তিনকড়ি, সে তিনকড়িও দাশুর মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে। তারপর আস্তে আস্তে খুঁড়িয়ে দাশুর আরও কাছে এগিয়ে আসে।

সিপাহী গোকুল সামন্ত বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে,--না না না, আসামী হয়ে পাব্লিকের সাথে কথা বলবে না সরদার।

অর্জুন সিং চোখ মেলে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেঃ হাঁ হাঁ হাঁ ; রুল আছে, কারও সাথে বাতচিত করবে না আসামী।

দাশু—এ আমার গাঁয়ের মানুষ বটে।

সিপাহী গোকুল সামন্ত কি-যেন ভাবে। তারপর নরম স্বরে বলে—আচ্ছা, দুটা একটা কথা বলে নাও।

—তুমি এ কেমন দশাটি করলে মেসো? তিনকড়ির মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করতে গিয়ে দাশুর গলার স্বরে একটা রাগের ঝাঁজ তপ্ত হয়ে ওঠে।

তিনকড়ি বলে—ফুলকিকে আর দুখ দিতে চাই না দাশু, তাই...।

দাশু—তাই ভিখমাগা হয়ে গেলে?

তিনকড়ি—হাঁ রে বাপ।

দাশু—মাসী কি বলে?

তিনকড়ি—তোমার মাসী গাঁ ছেড়েছে, কয়লাখাদে চলে গিয়েছে। আমিও গাঁ ছেড়ে দিলাম দাশু।

দাশু—মাসীর সাথে তুমিও খাদে গেলে না কেন?

তিনকড়ি হাসে ঃ না দাশু, আর নয়। তোমার মাসী সুখে থাকুক ; আমার ভাত আমি করে নিব।

তিনকড়ির ফ্যাকাশে চোখ দুটো হঠাৎ লাল হয়ে ওঠে আর জলে ভরে যায়। তারপরেই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ব্যস্তভাবে চলতে থাকে তিনকড়ি।

বাবা গো বাবা! বুড়া কুকুরের আর্তনাদের মত শব্দটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, ধুঁকতে ধুঁকতে আর টিনের কৌটা দুলিয়ে দুলিয়ে আদালত এলাকার ভিড়ের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে দাশু।

মরেছে, তিনকড়ি মেসো মরেই গিয়েছে! গাঁ ছাড়ল আর ভিখমাগা হল যে, তার আর মরণের বাকি কি আছে? দাশুর বুকের ভিতরের আতঙ্কটা আরও ভয়াল হয়ে ওঠে।

দুপুর পার হতে চলল। আমবাগানের ছায়াও গরম হয়ে উঠেছে। আজও কি মামলার রায় দিবে না হাকিম? ছটফট করে দাশু কিষাণের প্রাণ। দাশুর প্রাণটা যেন ভিক্ষুক হয়ে যাবার ভয় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই মুহূর্তে কয়েদ হয়ে যেতে চায়।

জানে না দাশু, কতক্ষণ ধরে এই ভয়াতুর ভাবনার মধ্যে ছটফট করতে করতে ঝিমিয়ে পড়েছিল মন ; চোখ বন্ধ করে দুই হাঁটুর উপর মাথা পেতে দিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকবার পর আবার চোখ দুটো একটা ব্যাকুল পিপাসায় চঞ্চল হয়ে ওঠে। এদিক-ওদিক তাকায় দাশু। না, জেলে যেতে ইচ্ছে করে না ; এক ঝটকা দিয়ে অর্জুন সিংয়ের হাত থেকে কোমরের দড়িটা ছিনিয়ে নিয়ে এই মুহূর্তে ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছা করে।

রোদ পড়ে বড়কালুর গায়ের ঝরনা চিকচিক করছে, কাছে গিয়ে দেখে আসতে ইচ্ছে করে। পলাশবনের ছায়ায় তিতির ডাকছে, একবার শুনে আসতে ইচ্ছে করে। জামকাঠের জিরজিরে কপাটের গায়ে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। ডরানির জল বড় ঠাণ্ডা! ছোটকালুর জঙ্গলের কেঁদ আর পিয়াল বড় মিঠা। সনাতনের মাদলের আওয়াজ আরও মিঠা। না, জেল যেতে চাই না কপালবাবা। তোমার দাশু কিষাণকে ছাড়া পাইয়ে দাও। দাশুর যে ঘর আছে, গাঁ আছে ; মুরলীও যে একদিন এসে পড়বে ; মুরলীর কাছে দাশুর ছেইলা যে আছে!

টিহা টিহা টিহা! আমবাগানের ছায়া আর বাতাস মিটা করে দিয়ে শিউরে ওঠে একটা পাখির ডাক। চমকে ওঠে দাশুর বুক। দাশুর স্বপ্নকে যেন ঠাট্টা করছে পাখিটা। কী সর্বনাশ ; এটা কি সেই পাপিয়া?

নিশ্চয় সেই পাপিয়ার ডাক। তা না হলে দাশু কিষাণের এত কাছে এসে দাঁড়িয়ে আর দাশুর মুখের দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠবে কেন সকালী?

বেদেনী সকালীর কালো চোখ দুটোও হাসছে। দেখতে একটু রোগা আর শুকনো হয়েছে সকালী। কিন্তু মুখটা যেন আরও সুন্দর হয়েছে। সকালীর কাঁকালে একটা ঝুড়ি। ঝুড়িতে লাল টুকটুকে একগাদা পাকা তেলাকুচা। সকালীর হাতে জ্যান্ত তিতিরের একটা মালা। মধুকুপির পলাশবনের একটা বিহ্বল স্মৃতি এই আমবাগানের ছায়ার ভিতরে ঢুকে দাশুর দড়ি-বাঁধা কোমরের দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হাসছে।

—এটা তোমার কে বটে হে সরদার? সকালীর মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বিরক্ত হয়, আর প্রশ্ন করে সিপাহী গোকুল সামন্ত।

দাশু বলে—আমার কেউ নয়। কিন্তু...।

গোকুল—কি?

উত্তর দেয় না দাশু। যেন সকালীর হাসির স্বরের জ্বালা সহ্য করবার জন্য মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকায়।

আরও কাছে এগিয়ে আসে সকালী ঃ আমি তো তোমার কেউ নই ; কিন্তু মুরলী তোমার কে বটে সরদার? একবার বল শুনি। মুরলীকে নিয়ে কেমন সুখের ঘর করছো, খবরটি একবার বল।

টিহা টিহা টিহা! আমবাগানের পাপিয়া ভয়ানক ঠাট্টার আমোদে আত্মহারা হয়ে পাতার আড়ালে লুটোপুটি করে ডাকতে থাকে।

গোকুল সামন্ত একবার অর্জুন সিংয়ের মুখের দিকে তাকায়। অর্জুন সিং মাথা নেড়ে বলে—হ্যাঁ, দু-চারটি বাতচিত হোবে, এই তো। হোনে দেও ভাই।

গোকুল বলে—তোমরা একটুক আস্তে কথা বল, সরদার।

হাতের দড়ির তিনটে পাক আলগা করে দিয়ে একটু দূরে সরে গিয়ে বসে অর্জুন সিং। গোকুল সামন্ত আরও একটু দূরে। সরদারটার করুণ মুখের চেহারা দেখে দুজনের আপত্তি আর সাবধানতাও যেন একটু করুণ হতে চাইছে।

ফিস ফিস করে চাপা গলার স্বরে যেন একটা আক্রোশের জ্বালা দাশুর কানের কাছে ছড়িয়ে দিয়ে হাসতে থাকে সকালী ঃ যে মুরলীর লেগে আমাকে ঠকালে, সে মুরলী এখন কোথায় আছে সরদার?

মাথা হেঁট করে দাশু।

সকালী—নিজেই ছুটে এসে সকালীর বুক ছুঁয়ে দিলে, শেষে সকালীকে ঠেলে দিয়ে পালিয়ে গেলে সরদার। ছিয়া ছিয়া ; মরদে কি মেয়েমানুষকে এমন দুখও দেয়?

দাশু—আমার দোষ হয়েছে। মাপ করবে কি?

হেসে ফেলে সকালী ঃ তুমি মুরলীকে চিনেছ কি?

—চিনেছি।

—কিন্তু মুরলীকে ঘিন্না কর কি?

চমকে ওঠে আর বোকা বোবার মত শুধু ঠোঁট নাড়ে দাশু। সকালীর মুখের দিকে অসহায়ের মত তাকিয়ে থাকে।

সকালী হাসে ঃ তবে বল সরদার। আমার মরদ হতে ইচ্ছা হয় কি?

দাশু কিষাণের মাথার রক্তে একটা নেশার স্মৃতি চনচন করে ওঠে। বুকের উপর একটা নগ্ন কোমলতার স্মৃতি তৃপ্ত হয়ে ওঠে। চোখের উপর স্বচ্ছ জলের তরলতা দিয়ে গড়া একটা মধুরতার ছবি টলমল করে।

সকালী বলে—কিসের গাঁ, কিসের ঘর, কিসের বিয়া সরদার? সব ভুলে যাও। আমার

সাথে থাক। আমার মরদ হয়ে মন ভরে সুখ কর। আমি তোমাকে ভাত দিব, কাপড় দিব, হাড়িয়া দিব। যেদিন ইচ্ছা হবে চলে যেও। ইচ্ছা হলে সকালীকে টুঁটি চিপে মেরে রেখে চলে যাও।

—সকালী! আস্তে ডাকতে গিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

কিন্তু সেই মুহূর্তে আদালতের বারান্দার উপর এসে হাঁক দিয়েছে পিয়াদা। দাশু আসামীর মামলার হাঁক।

একটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় সিপাহী গোকুল সামন্ত আর অর্জুন সিং।

—বাস্, আর বাতচিত হোবে না, খবরদার! দাশুর কোমরের দড়ি ধরে টান দেয় অর্জুন সিং।

ঝুড়ির তেলাকুচা সরিয়ে শালপাতায় মোড়া একটা বস্তু বের করে কাতরভাবে মিনতি করে সকালী—একটুক সবুর করেন সিপাহীজী।

—ওটা কি বটে? চোখ বড় করে তাকায় গোকুল সামন্ত।

সকালী—মকাইয়ের খইয়ের দুটা মোয়া বটে। সরদারকে মোয়া দুটা খেয়ে নিতে দেন সিপাহীজী।

—আর না। খবরদার। ধমক দেয় অর্জুন সিং।

আমবাগানের ছায়ার মধ্যে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সকালী। ব্যস্তভাবে হেঁটে দড়ি-বাঁধা কোমর নিয়ে আদালত ঘরের দিকে চলে যাচ্ছে সরদারের যে পাথুরে ছাঁদের চেহারাটা, সেই দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কাঁকালের ঝুড়ির দিকে তাকায় সকালী। লাল হয়ে ওঠে আর চিকচিক করে সকালীর কালো চোখ। সকালীর ভেজা চোখে টুকটুকে লাল পাকা তেলাকুচার ছায়া পড়েছে।

আদালত এলাকার ভিড় বেশ ফাঁকা হয়ে যায়। বিকালের আমবাগানের ছায়া বেশ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কিন্তু চলে যায় না, আর সরেও যায় না সকালী। এক ঠায় দাঁড়িয়ে আদালত ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ঢং ঢং করে চারটা ঘণ্টা বাজল। আদালত ঘর থেকে বের হয়েছে দাশু। দড়ি-বাঁধা কোমর নিয়ে ব্যস্তভাবে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে আসছে। দাশুর কোমরের দড়ি শক্ত করে ধরে আছে অর্জুন সিং। গোকুল সামন্ত প্রকাণ্ড লাঠি ঘাড়ে তুলে আর দাশুর প্রায় গা ঘেঁষে ঘেঁষে মচমচ করে হেঁটে আসছে।

সকালীর হাতে মকাইয়ের মোয়া দুটো কেঁপে ওঠে। সকালীর চোখের কাছ দিয়েই যেতে যেতে হেসে ওঠে দাশু ঃ তিন বছর কয়েদ হলো সকালী। ফিরে আসি, তারপর তোমার মোয়া যদি খাওয়াতে চাও...।

অর্জুন সিং হাঁকে—খবরদার, আর বাতচিত নেহি।

সড়কে দাঁড়িয়ে তাকালে সবার আগে চোখ পড়বে গির্জাবাড়ির চূড়া, তারপরেই চোখ পড়বে তিন হাত উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা সমাধিভূমি। সারি সারি, আবার এদিকে ওদিকে ছড়ানো যত ঢিবি, ঢিবিগুলির উপর কাঠের ক্রস। কোনটা হেলে পড়েছে, কোনটা ক্ষয়ে গিয়েছে, আবার খাড়া দাঁড়িয়ে আছে কোনটা। সমাধিভূমির ফটক পার হয়ে ভিতরে ঢুকতে গেলেই প্রথমে যে ছায়াময় প্রকাণ্ড একটা আমগাছ চোখে পড়ে, সেটাই বোধহয় এই সমাধিভূমির সব গাছের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বয়সের গাছ। সে গাছের কাছে পাথর-বাঁধানো যে সমাধি আজও শক্ত হয়ে বসে আছে, সেটাই হল সবচেয়ে পুরনো সমাধি। সমাধিক পাথুরে বুকের উপর লেখা আছে সমাহিতের নাম—ফাদার হার্ন।

ফাদার হার্নের নাম নিয়ে পঞ্চাশ বছর আগে গড়ে উঠেছিল যে হার্নগঞ্জ, তারই আজকের

নাম হারানগঞ্জ। ডাঙার পর ডাঙা পার হয়ে ছড়িয়ে গিয়েছে ফাদার হার্নের পঞ্চাশ বছর আগের স্বপ্নের উপনিবেশ। একটা কনভেন্ট আছে। দুটো স্কুল আছে। একটা অনাথবাড়ি আছে। আর আছে একটা কুষ্ঠী আশ্রম--লেপার আসাইলাম।

এক-একটা ডাঙার বুকের উপর এক-একটা বসতির রূপও চোখে পড়ে। লাল খাপরার চালা আর চুনকাম করা দেয়াল, ছোট ছোট ঘরগুলি পরিষ্কার ছকের ছবির মত ফুটে রয়েছে। এইসব ঘরে যারা থাকে, তারা সবাই খিরিস্তান। প্রতি রবিবারের সকালবেলায় গির্জাবাড়ির ঘণ্টা যখন ডিং ডাং করে বাজতে থাকে, তখন এইসব ঘরের ভিতর থেকেই ছোট ছোট ভিড় বের হয়ে আসে আর প্রেয়ার সাধবার জন্য গির্জাবাড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

এরাও চারদিকের নানা গাঁয়ের নানা জাতের মানুষ। কিন্তু সেইসব গাঁয়ের আর জাতের স্মৃতি ওদের জীবন থেকে মুছে গিয়েছে। আজ ওরা শুধু হারানগঞ্জের মানুষ। একই বিশ্বাস, একই আশ্বাস আর একই প্রীতির শাসনে ঘষামাজা একটা নতুন জীবনের মানুষ। ওদের জীবন মাটি-কোপানো আর লাঙল-ঠেলা জীবন নয়। সকাল হলে কিংবা দুপুর হতেই ওরা সাইকেলের সওয়ার হয়ে চারদিকের দু ক্রোশ তিন ক্রোশ পথ পার হয়ে চলে যায় মতিডিহিতে রেলওয়ের মেরামতি কারখানাতে, এজরা ব্রাদার্সের যত কয়লাখাদের কল-ঘরে, রামনগরের পটারিতে, আর কলিয়াবাগের ফ্যাক্টরিতে। এইসব কল খাদ আর কারখানার বিলাতী মালিকেরা আজও হারানগঞ্জের মানুষকে কাজ দিতে আর কাজের সুবিধা দিতে ভুলে যান না। তা ছাড়া, যে সিস্টার মাদলিনের স্নেহে হারানগঞ্জের খিরিস্তান কলোনি আজও লালিত হয়ে চলেছে, তাঁর ইচ্ছার সুপারিশও কেউ তুচ্ছ করতে পারেন না। সিস্টার দিদির এক চিঠিতে একদিনেই চাকরি হয়ে যায়, এই কথা এই কলোনির বাইরের মানুষও জানে।

খিরিস্তান হোক আর অখিরিস্তান হোক, সিস্টার দিদিকে কে না শ্রদ্ধা করে? এই হারানগঞ্জে আর এই হারানগঞ্জের চারদিকের অন্তত পঞ্চাশটা গাঁয়ের ঘরে ঘরে যেয়ে সুখদুঃখের খবর নিয়ে জীবনের ত্রিশটা বছর এখানেই পার করে দিলেন যিনি, তাঁর মুখে সদা-সর্বদা একটা ক্লান্তিহীন আনন্দের শান্ত হাসি ফুটেই রয়েছে। সে হাসি দেখলে নিতান্ত অখিরিস্তান অভক্তের মনেও ভক্তি দেখা না দিয়ে পারে না। সদরের সদরালা থেকে শুরু করে থানার কনস্টেবল পর্যন্ত সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে, আর একটু ভয়ও করে বোধহয়। ঝড়-বাদলের দিনেও যখন ষাট বছর বয়সের সিস্টার মাদলিন তাঁর সেই নীল রঙের ছোট সাইকেলে চড়ে তিন ক্রোশ পথ পার হয়ে জংলী ডিহির এক নতুন খিরিস্তান চাষীকে জ্বরের ওষুধ খাওয়াবার জন্য ছুটে যেতে থাকেন, তখন তাঁর মুখের সেই শান্ত হাসি যেন অদ্ভুত এক জেদের জ্বালায় দপদপ করে জ্বলে। তখন তাঁকে দেখতে একটু অদ্ভুত রকমের লাগে বইকি! যারা দেখতে পায়, তারা আশ্চর্য হতে গিয়ে একটু ভয়ও পায় ; সিস্টার দিদির দয়া যেন একটা একরোখা প্রতিজ্ঞার অভিযান।

বেশি দিন হয় নি, এই তো মাত্র দিন পনর আগে এইরকমই একটা একরোখা প্রতিজ্ঞার আবেগে নীল রঙের সাইকেলে চড়ে এক সকালে হারানগঞ্জ থেকে ভুবনপুরের দিকে ছুটে গিয়েছিলেন সিস্টার দিদি। মধুকুপির সেই সুন্দর চেহারার কিষাণী মেয়েটি গাঁ থেকে তাড়িত হয়ে, বাঘের হামলা থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে আর ছুটে এসে এজরা ব্রাদার্সের কয়লাখাদের হাসপাতালে ঠাঁই নিয়েছে, খবর পেয়েই তার সঙ্গে দেখা করতে আর একটি দিনও দেরি করেন নি।

কয়লাখাদের হাসপাতালের ঘরে ঢুকেই মুরলীকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন সিস্টার দিদি ঃ মুরলী, লাভলি মুরলী বহিন, চল, তোমাকে এখনই আমার কনভেন্টে নিয়ে যাব।

সিস্টার দিদির দয়া, আর সিস্টার দিদির হাসি। দেখতে পেয়ে মুরলীর প্রাণটাই হেসে ওঠে। কল্পনা করতে পারে নি মুরলী, এত তাড়াতাড়ি এত বড় সৌভাগ্য এত কাছাকাছি এসে

মুরলীর জীবনের আশাকে জড়িয়ে ধরবে।

পলুস হালদারের দিকে চোখ পড়তেই একটু আশ্চর্য হন সিস্টার দিদি ঃ তোমার কি খবর পলুস?

পলুস—খবর ভাল বটে দিদি, এখন শুধু তোমার দয়া চাই।

—বল ভাই, কিরকম দয়া মাংতা হ্যায়! আচ্ছা নোকরি?

পলুস—না দিদি।

—তবে?

হঠাৎ মুরলীর মুখের লাজুক হাসিটা সিস্টার দিদির চোখে পড়ে যায়। সেই মুহূর্তে যেন বিপুল কৃতার্থতার আনন্দে হেসে ওঠে সিস্টার দিদিরও চোখ দুটো ঃ খুব ভাল কথা। মুরলীর সাথে তোমার বিবাহ হবে, অতি ভাল কথা বটে।

সিস্টার দিদির সঙ্গে হারানগঞ্জে চলে যাবার আগে শুধু একবার ক্ষণিকের মত গম্ভীর হয়ে মহেশ রাখালের কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিল মুরলী ঃ তুমি ভাল হয়ে ঘরে চলে যেও বাপ। আমি হারানগঞ্জে চললাম।

—ঝালদা যাবি না? চমকে উঠেছিল বুড়ো মহেশ রাখাল।

—না। হেসে ফেলে মুরলী ঃ আমার যেথা যাবার ছিল সেথা যাচ্ছি বাপ ; তুমি রাগ করো না।

মুখ ফিরিয়ে নেয় মহেশ রাখাল। মুরলীর মুখের দিকে আর তাকায় না।

এই হাসিমুখ নিয়েই রওনা হয়ে হারানগঞ্জের কনভেণ্টে চলে এসেছে মুরলী। হারাণগঞ্জের কনভেণ্টের জীবনও এত ভাল লাগবে, কল্পনা করতে পারে নি মুরলী। সবই নতুন, তাই সবই ভাল লাগে। মুরলীর কালো চোখের চাহনি সব সময় যেন হেসে হেসে ঝকঝক করে। ঘরটা কী সুন্দর! ঘরের দেয়ালে একটা জানলা, সে জানলার কাছে দাঁড়ালে গির্জাবাড়ির চূড়াটা দেখা যায়।

কনভেণ্টের মেয়েরা খিলখিল করে হাসে। কী মিষ্টি কলরবের ঝুমুর! মেয়েগুলির খোঁপার ছাঁদও দেখতে কত ভাল লাগে। বার বার দেখতে ইচ্ছে করে। অনেকক্ষণ ধরে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকবার পর মুরলীর মনের আশা আবার হেসে ওঠে।

ডিং ডাং, ডিং ডাং, গির্জার ঘণ্টার শব্দ শোনা যায়। শুনতে শুনতে আনমনা হয়ে যায় মুরলী। আর বেশিদিন বাকি নেই, সিস্টার দিদি বলেছে একদিন গির্জাবাড়িতে গিয়ে ঈশাই মানবে মুরলী। তার কয়েক দিন পরেই...।

ভাবতে গিয়ে মুরলীর চোখের চাহনি নিবিড় হয়ে ওঠে, আর ঠোঁট দুটোও নিবিড় হাসির আবেগে ফুলে ফুলে কাঁপে।

সিস্টার দিদি এসে একদিন মুরলীকে বলে গেলেন—যদি ইচ্ছা কর, তবে বিবাহের পর এখানে এসে রোজ লেখাপড়া শিখে যেতে পার বহিন। ওই দেখো ওই মেয়েটি, উহার নাম মেরিয়া, মেয়েটি ছয় মাসের মধ্যে বাইবেল পড়তে শিখে ফেলেছে।

মুরলীর সারা মুখ জুড়ে আবার একটা স্বপ্নময় আশার হাসি ঝিলিক দিয়ে ফুটে ওঠে ঃ হ্যাঁ দিদি, দয়া করে আমাকে লিখাপড়া শিখিয়ে দিও।

সিস্টার দিদি—নিশ্চয়, নিশ্চয়, আমি যে সব সময় খিরিস্তানের সেবার জন্য বলিদান হয়ে আছি।

তারপর আর দেরি হয় না। গির্জাবাড়িতে গিয়ে ঈশাই মেনে নিয়ে সিস্টার দিদির প্রার্থনার গান শুনতে হল ; মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে সস্নেহে আশীর্বাদ করলেন সিস্টার দিদি ঃ ধরম বুঝে করম করবে, ধরমের মান রাখবে, খিরিস্তান বেরাদারী আর সিস্টারীর সেবিকা হবে ; সুখী হও জোহানা।

জোহানা! নামটা যেন মুরলীর নতুন অদৃষ্টের জন্মোৎসবের ধ্বনি! বেদীর মোমবাতির আলোর দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে মুরলী, এই জীবনটাকে কিষাণীর কষ্টের জীবন বলে আর ধিক্কার দেবার দরকার হবে না। গির্জাবাড়ির ঘরভরা ভিড়ের গলায় একটা আশীর্বাদের গান বেজে চলেছে ; শুনতে শুনতে বিভোর হয়ে যায় মুরলীর মন, হাসতে হাসতে গির্জাবাড়ি থেকে কনভেণ্টের ঘরে ফিরে এসে জানলার কাছে দাঁড়ায় মুরলী। দেখতে পায়, জানলার দিকে তাকিয়ে আর চোখমুখ হাসিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যাচ্ছে পলুস হালদার। হাত তুলে, হাতের পাঁচটা আঙুল দেখিয়ে মুরলীর মনের চঞ্চলতাকে সান্ত্বনা দেয় পলুস। এই তো, আর মাত্র পাঁচটা দিন বাকি।

সেই পাঁচটা দিনও মুরলীর চোখ আর মুখ শুধু হেসে হেসে তৃপ্ত হয়ে যায়। কনভেণ্টের মেয়েরা এসে পলুসের নাম ধরে কী সুন্দর আর কত নতুন রকমের ঠাট্টা করে! সে ঠাট্টার ভাষাও নতুন রকমের।

--কে কাকে বেশি ভালবাসে জোহানা?

মেরিয়ার প্রশ্নের হাসি শুনে চমকে ওঠে মুরলী ঃ কি বলছো বহিন?

মেরিয়া--তুমি পলুসকে বেশি বেসেছ, না, পলুস তোমাকে বেশি বেসেছে?

হেসে ফেলে মুরলী ঃ গড জানে!

মেরিয়া--গড তো জানে ; কিন্তু তুমি জান কি না?

মুরলী--আমি জানি না।

মেরিয়া--বিয়ার পরে জানতে চাও?

মুরলী--হ্যাঁ।

মেরিয়া--আগে জান নাই?

মুরলী--না।

মেরিয়া মুখ টিপে হাসে ঃ একবারও না?

--না গো না ; ছিয়া! বলতে বলতে মাথা হেঁট করে হাসতে থাকে মুরলী। মুরলীর কোমরে একটা মৃদু চিমটির আদর বুলিয়ে দিয়ে চলে যায় মেরিয়া।

পাঁচদিন পরে মেরিয়া নিজের হাতে মুরলীর খোঁপাটাকে নতুন ছাঁদে বেঁধে দিল। রঙিন ফুলের মালা দিয়ে খোঁপা জড়িয়ে নিয়ে গির্জাবাড়িতে গিয়ে আবার বেদীর মোমবাতির আলোকের দিকে যখন তাকায় মুরলী, তখন মুরলীর জীবনের আশা পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। মুরলীর পাশে দাঁড়িয়ে আছে পলুস হালদার।

আবার সিস্টার-দিদির প্রার্থনার গান শুনে, আর ঘরভরা ভিড়ের আশীর্বাদী গানের কোরাস শুনে যখন গির্জাবাড়ির বাইরে এসে দাঁড়ায় পলুস হালদার আর জোহানা হালদার, তখন ফুলের সাজ পরা একটা গো-গাড়ি গির্জাবাড়ির ফটকের কাছে সড়কের উপর চঞ্চল হয়ে ওঠে।

মেরিয়ার মিষ্টি ঠাট্টার ভাষা শুনে হেসে হেসে আর মুগ্ধ হয়ে গো-গাড়ির ভিতর ঠাঁই নেয় হারানগঞ্জ কলোনির এক নবদম্পতি। চলতে থাকে গো-গাড়ি।

মুরলী--তোমার ঘর কি এখান থেকে ঢের দূর বটে?

পলুস হাসে--না।

লাল খাপরার চালা ; আর ইঁটের দেয়াল ; একখানি ঘর। ছোট দাওয়া ; দাওয়ার উপর ছোট্ট একটা রোঁয়াভরা আদুরে কুকুর। ঘরের দিকে চোখ পড়তেই হেসে ওঠে মুরলীর কালো চোখের চাহনি।

গো-গাড়ি থেকে নেমে ঘরের দিকে এগিয়ে যায় পলুস আর মুরলী। আদুরে কুকুরটা এক লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে মুরলীর কোলের উপর উঠতে চায়। কুকুরটাকে কোলে তুলে নেয়

মুরলী। পলুস হাসে ঃ কুকুরটা বড় চালাক বটে!

মুরলী—কেন?

পলুস—তোমাকে চিনে নিয়েছে।

মুরলী হাসে ঃ কি চিনলে?

পলুস—তোমার কোল নরম বটে।

মুরলীর মুখের হাসি আরও মিষ্টি হয়ে ওঠে। ঘরের ভিতরে ঢুকে মুরলীর মুখের এই মিষ্টি হাসিটাই যেন চমকে ওঠে। এই চমকও একটা নতুন চমক। নিজের এমন রূপের ছবি নিজেই কখনও দেখতে পায় নি মুরলী।

পলুসের ঘরের ভিতরে একটা কাঠের বাক্সের উপর প্রকাণ্ড একটা আয়না। সেই আয়নার বুকে মুরলীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা পূর্ণ প্রতিচ্ছবি ঢলঢল করছে। মুরলীর চোখ দুটো কত কালো আর কেমন টানা-টানা, আজ এই প্রথম ভাল করে দেখতে পেল মুরলী। মুরলীর ঠোঁটের হাসিটা যে এমন ফুলে ফুলে কাঁপে, তাও আগে কোন দিন দেখতে পায় নি মুরলী। ফুলের মালা জড়ানো খোঁপা, আর রঙিন আঁচলের শাড়ি পরে পলুসের পাশে দাঁড়ালে কেমন দেখায় মুরলীকে, আয়নাতে তারও ছবি দেখতে পেয়ে ধন্য হয়ে যায় মুরলীর দুই চোখের সাধ।

পলুসের পরনে সাদা পেন্টালুন, গায়ে নীল রঙের একটি কামিজ, গলায় রামধনুর মত পাঁচমিশালী রঙের একটা রুমাল জড়ানো। মুরলীর হাত ধরে দাঁড়িয়ে হাসছে পলুস। মনে হয় মুরলীর, এই পলুস হালদার মুরলীকে একটা ভয়ানক বাঘ-ডাকা জঙ্গলের ভয় থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে মুরলীর স্বামী হয়েছে। পলুসের পাশে দাঁড়াতে পেরেছে, তাই না আজ নিজেকেও এত ভাল করে দেখতে চিনতে আর বুঝতে পারছে মুরলী।

পলুস বলে—আয়নাটা তোমার লেগে কিনেছি, জোহানা।

মুরলী হাসে ঃ কবে কিনলে? যেদিন আমার হাতের জল খেলে, সেদিন কি?

পলুস—না, কাল গোবিন্দপুর বাজার থেকে কিনে এনেছি।

মুরলী আবার চোখ টিপে হাসে ঃ এত দেরিতে কিনলে কেন? বিশ্বাস কর নাই বুঝি।

পলুস—বিশ্বাস করেছিলাম জোহানা, তুমি আমার কাছে না এসে পারবে না। সেটা কোন কথা নয়। কথা হলো, বাঘিনটাকে মেরে গোবিন্দপুরের থানা থেকে পঁচিশ টাকা বকশিশ পেলাম। ভাবলাম, বকশিশের টাকা দিয়ে সবার আগে যে জিনিসটা কিনবো, সেটা জোহানার জিনিস হবে। তাই আয়নাটা কিনলাম।

পলুসের কাঁধের উপর মাথা লুটিয়ে দেয় মুরলী। মুরলীর শরীর যেন একটা নেশার আবেশে অলস হয়ে গিয়েছে। মুরলীকে দু হাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে ডাক দেয় পলুস—জোহানা!

উত্তর দেয় না মুরলী। পলুসের বুকে লুটিয়ে পড়ে থাকা নতুন জীবনের ছবিটাকেই আয়নার দিকে তাকিয়ে দুই কালো চোখের পিপাসা মিটিয়ে নিতে থাকে মুরলী।

পলুস বলে—তোমার জ্বর হলো না তো, জোহানা?

মুরলী—না।

পলুস—গা এত গরম কেন?

মুরলী হাসে—গা জানে।

মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে পলুস হালদার। মুরলীর চোখ দুটো যেন হঠাৎ বিদ্যুতের মত একবার হেসে উঠল। তারপরেই ভিজে গেল।

—কাঁদলে কেন জোহানা? প্রশ্ন করতে গিয়ে পলুস হালদারের গলার স্বরে একটা বিস্ময়ও কেঁপে ওঠে।

মনে মনে একটা প্রবল কুণ্ঠার সঙ্গে লড়তে গিয়ে হেরে গিয়েছে মুরলী ; এই চোখের জল বোধহয় সেই পরাজয়ের ব্যথার একটা বানভাসি তরলতা। দাশু কিষাণ নামে একটা মানুষের ছায়াকে যেন হঠাৎ দেখতে পেয়েছে মুরলী, আর সেই ছায়াটাকে জোর করে ঠেলে সরিয়ে দিতে গিয়ে চোখ দুটো ভিজে গিয়েছে।

জোরে একটা হাঁপ ছেড়ে নিয়ে মুরলী বলে--না, কিছু নয় পলুস। মনে পড়েছে, তোমাকে একদিন বড় দুখ দিয়েছিলাম। ভেজা চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে মুরলী।

--কবে? আরও আশ্চর্য হয় পলুস।

--তুমি আমাকে ছুঁয়েছিলে বলে গালি দিয়েছিলাম।

হো-হো করে হেসে ওঠে পলুস ঃ সে কথা আজ আবার মনে কর কেন জোহানা?

মুরলী--তোমার রাগ হয় নাই কি?

পলুস--হ্যাঁ, হয়েছিল।

মুরলী--আজও রাগ আছে কি?

পলুস হাসে--আছে।

মুরলী--তবে?

--আঃ, তোমার প্রাণটাও বড় নরম বটে জোহানা। মুরলীর নরম গতরের অদ্ভুত উষ্ণতার স্বাদ যেন প্রাণের ভিতরে বরণ করে নেবার জন্য মুরলীর এই অভিমানভীরু অথচ ছলনাহীন সরু কোমরটাকে নিবিড় আগ্রহের বাঁধনের মত দু হাতে জড়িয়ে ধরে পলুস হালদারও জীবনের এক নতুন নিঃশ্বাসের নেশায় ফিসফিস করে ঃ আজ আমি যে তোমারই মরদ বটি জোহানা ; আমাকে সাধতে হবে কেন?

মুরলী বলে--চুপ কর।

চুপ করে পলুস হালদার।

কিন্তু লাল খাপরার চালা আর ইঁটের দেয়াল, এই ছোট ঘরটা যেন দুরন্ত এক নিশ্বাসময় ব্যস্ততার মধ্যে ফিসফাস করতে সুরু করেই হঠাৎ একটা আতঙ্কের রূঢ় চিৎকার ছেড়ে কেঁপে ওঠে। চেঁচিয়ে ওঠে পলুস--জোহানা!

আর মুরলীও হঠাৎ আতঙ্কে বিব্রত হয়ে নিরাবরণ শরীরটার শিহরিত লজ্জা লুকিয়ে ফেলবার জন্য মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে থাকা রঙিন শাড়ির আঁচলটাকে একটা থাবা দিয়ে আঁকড়ে ধরে ; কিন্তু গায়ে জড়াতে পারে না। মুরলীর হাতটাকে শক্ত করে চেপে ধরে পলুস আবার ডাক দেয়--জোহানা! মুরলী ভ্রূকুটি করে--কি?

পলুস--এ তোমার কেমন কোমর বটে?

মুরলীর চোখ দুটো ছলছল করে হাসে ঃ তুমি যা বুঝেছ, তাই বটে পলুস।

পলুস--আমাকে আগে বল নাই কেন?

--মুরলী--আগে না বলে কি কোন দোষ হলো?

পলুস--হ্যাঁ।

মুরলী আশ্চর্য হয় ঃ আগে বললে কি তুমি আমাকে ঘরে নিতে না?

পলুস--তোমাকে নিতাম, কিন্তু সরদারের ছেইলাকে নিতাম না।

ফুঁপিয়ে ওঠে মুরলী--সরদারের ছেইলা ভাবছো কেনে পলুস, ও যে আমার ছেইলা!

পলুসের চোখের হাসিটা যেন কটমট করতে থাকে ঃ তা হয় না জোহানা। কোন পাগলেরও পরের ছেইলার বাপ হতে সাধ হয় না।

কাঁপতে কাঁপতে চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী--কিন্তু ও যে আমারও ছেইলা বটে গো! আমাকে এত মায়া কর তুমি, আমার ছেইলার লেগে তোমার মায়া হয় না কেন পলুস?

পলুস--তোমার এই ছেইলাকে ওর বাপের ঘরে রেখে এলে ভাল করতে।

কেঁদে ফেলে মুরলী ঃ তা হলে আমার ছেইলা যে মরে যেত পলুস!

—মরে যেত যদি, তবে মরে যেত। কিন্তু আমি পরের সাধের বোঝা মাথায় নিব কেন?

মুরলীর বুক কাঁপিয়ে দিয়ে একটা করুণ আর্তনাদের তীক্ষ্ণ স্বর ঠিকরে বের হয় ঃ এমন কথা বলতে হয় না পলুস।

মুরলীর হাত ছেড়ে দিয়ে সরে যায় পলুস। শাড়িটাকে তুলে নিয়ে এলোমেলো করে গায়ে জড়িয়ে মেঝের উপর বসে আয়নার দিকে দুটো ভীরু চোখ তুলে দেখতে থাকে মুরলী, পুড়ে গিয়েছে মুরলীর মুখের হাসি। ঠোঁট দুটো কয়লার টুকরোর মত কালো হয়ে গিয়েছে। বিয়ের ফুল খোঁপা থেকে খসে পড়ে গিয়ে মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছে।

আস্তে আস্তে মুরলীর কাছে এগিয়ে এসে মুরলীর মাথায় হাত দিয়ে পলুস বলে--যা হবার হয়েছে, কিন্তু তুমি এত ভাবছো কেন জোহানা?

পলুসের কথাগুলি অদ্ভুত এক সান্ত্বনার ভাষার মত মুরলীর কানের কাছে বাজতে থাকে। চমকে ওঠে মুরলী ; শুকনো ঠোঁটের পোড়া হাসিটাই আবার সজীব হয়ে ওঠে ঃ কি বলছো?

পলুস—হারানগঞ্জের অনাথবাড়ি আছে ; তুমি ভাবছো কেন?

—এমন কথা বলো না পলুস। আবার আর্তনাদের মত শিউরে ওঠে মুরলীর গলার স্বর।

—কিসের ডর জোহানা?

—তুমি বুঝে দেখ। তোমার কুকুরটা আমার নরম কোলে বসবে, কিন্তু আমার ছেইলাটা অনাথবাড়িতে যাবে...তোমার পায়ে পড়ি পলুস ; একটুক বুঝে দেখ।

পলুস হাসে ঃ আমি বুঝেছি জোহানা ; তুমি বুঝছো না।

মুরলী—আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না।

পলুস—সিস্টার দিদিকে একবার শুধিয়ে দেখ ; তবে বুঝবে আমি ঠিক কথা বলছি কি না।

সিস্টার দিদি! নাম শুনেই মুরলীর চোখ দুটো চমক দিয়ে হেসে ওঠে। কথায় কথায় হঠাৎ যার নাম করে ফেলেছে পলুস হালদার, তারই দয়া যে আলোকের মত পথ দেখিয়ে মুরলীর জীবনকে নতুন সুখের জগতে নিয়ে এসেছে। এই নামটা মনে পড়লেই নির্ভয় হয়ে যায় মুরলীর জীবনের আশা। সিস্টার দিদির নীল চোখের চাহনির সামনে দাঁড়ালেই মুরলীর কালো চোখে যেন ভরসার বিদ্যুৎ হেসে ওঠে। সাচ্চা দেবী বটে সিস্টার দিদি, ভুবনপুরের মাঈথানের মাটির দেবীর মত মিথ্যা দেবী নয়। মধুকুপির দুখি কিষাণী মাঈথানের দেবীর পায়ের কাছে ফুল আর গুড় রেখে দিয়ে কতবার ছেইলা চেয়েছিল, কিন্তু পেয়েছিল কি? পায় নাই। কাছে গিয়ে চাইলেও মাটির দেবী দয়া করতে জানে না। আর, সিস্টার দিদির কাছে চাও বা না চাও, সাচ্চা দেবীর মত নিজেই ছুটে এসে দয়া করে। যখন ইচ্ছা তখন সিস্টার দিদির হাতের ছোঁয়া কপালে বুলিয়ে নিতে পারা যায়। মুরলীর গালে টোকা দিয়ে, মুরলীর চিবুক টিপে আজই তো বার বার আদর করেছে সিস্টার দিদি ঃ আমি তোমার দুখ মিটাতে সব সময় রেডি আছি বহিন জোহানা! যখনই দরকার হবে, আমাকে ডাকবে।

মুরলীর বুকের ভিতরে মানতের মত একটা আবেদনের ভাষা নীরবে বিড়বিড় করতে থাকে—আমি তোমার কাছে মানত করছি সিস্টার দিদি, আমার ছেইলা আমাকে পাইয়া দাও।

পলুস বলে—আমার কথাটা কানে গেল কি?

হেসে ওঠে মুরলী ঃ শুনেছি।...হ্যাঁ...সিস্টার দিদি যা বলবে, তা তুমি মেনে নিবে তো?

পলুস—নিশ্চয় মেনে নিব। কিন্তু...।

মুরলী—কি?

পলুস—তুমি মেনে নিবে তো?

মুরলীর কালো চোখের হাসি আবার ঝিলিক দিয়ে ওঠে ঃ নিশ্চয়। সিস্টার দিদির বিচার না মেনে নিব তো কার বিচার মেনে নিব, বল?

খুশি হয় পলুস। পলুসের এতক্ষণের গম্ভীর ও করুণ একটু বিষণ্ণ যে-মুখের উপর একটা দুশ্চিন্তার ছায়া থমকে ছিল, সেই মুখটাও হেসে ওঠে ঃ ঠিক বলেছো জোহানা ; সিস্টার দিদির বিচার বড় ভাল বিচার। হোই পাহাড়টা, ডরানি নদীটা আর হাতিয়া তারাটাও ভুল হয়, কিন্তু আমাদিগের সিস্টার দিদির ভুল হয় না।

মুরলী খিলখিল করে হাসে ঃ বড় ভাল কথা বলেছ, পলুস।

পলুস—হ্যাঁ জোহানা ; পাহাড়ের পাথরও ফাটে আর ধুলা হয়ে যায় ; ডরানির জল ক্ষেতের ধান মারে, আর হাতিয়া তারাতেও কালা বাদল আনে না। কিন্তু, সিস্টার দিদির দয়া দেখ ; যার যেমনটি দুখ, তার লেগে তেমনটি দয়া। তোমাকে দাগী কিষাণের ঘরের দুখ থেকে বাঁচায় ; আর আমাকে ক্ষেপী কিষাণের জংলী সাধের মার থেকে বাঁচায়।

মুরলী—বেঁচে থাকুক সিস্টার দিদি ; আমাদিগের মত পাপী-তাপীর দুখ মিটাতেও আরও বয়স নিয়ে, শ' বছরের বুড়া হয়ে বেঁচে থাকুক সিস্টারদিদি।

পলুস—সে আর বলতে হবে না। সিস্টার দিদির সাথে সাথে ইঞ্জেল থাকে ; কোন ডেভিলের সাধ্যি নাই সিস্টার দিদির গায়ে একটা ঢেলা ফেলতে পারে। শুনবে তো বলি...বাবুরবাজারে আমি নিজের চোখে দেখেছি...।

ধড়ফড় করে, একটা দুরন্ত কৌতূহলের আমোদে নড়ে-চড়ে বসে, আর দুই চোখ অপলক করে পলুসের মুখের দিকে তাকায় মুরলী ঃ বল।

পলুস—বাবুরবাজারে দেখেছিলাম, সিস্টার দিদি পথ হেঁটে চলেছে ; আর পথের পাশের কাঁটাঝাড়ের ভিতর হতে একটা গরলের শয়তান...।

মুরলী—কি?

পলুস—তিন হাত লম্বা একটা কালা করাইত ফণা উঁচা করে সিস্টার দিদিকে কামড়াবার জন্য তেড়ে এল। দেখলাম জোহানা, তখনি একটা চিল এসে ছোঁ মেরে গরলের শয়তানটাকে তুলে নিয়ে চলে গেল।

মুরলীর কালো চোখের বিস্ময় বিশ্বাসের আবেশে একেবারে নিবিড় হয়ে সুস্থির আলোর মত জ্বলতে থাকে।

পলুস বলে—ভুবনপুরের মানঝিদের একটা ওঝা বাজারের ভিড়ের ভিতরে লুকিয়ে থেকে সিস্টার দিদির পিঠের দিকে তাক করে তীর ছেড়েছিল। কিন্তু...।

মুরলীর সুস্থির চোখের চাহনিতে যেন একটা তীর বিঁধেছে। কেঁপে ওঠে চোখ দুটো ; গলার স্বরও কাঁপে—সিস্টার দিদির গায়ে লাগে নাই তো?

পলুস হাসে—না জোহানা ; লাগবে কেন? শয়তানের মতলব কি সিস্টার দিদিকে ছুঁতে পারে? তীরটা লেগেছিল এক বেটা মানঝির হাতে ; সে বেটা মানঝি হলো ওঝারই ভাইটা।

মুরলী—মরে নাই পাপীটা?

পলুস—কোন্ পাপীটা?

মুরলী—দুটাই, ওঝাটা আর ওর ভাইটা?

পলুস—না, মরে নাই। কিন্তু দুটারই কয়েদ হয়েছিল। ওঝাটা সাত বছর, আর ভাইটার তিন বছর।

মুরলীর চোখের চাহনি ধিকধিক করে। দাঁতে দাঁত চেপে আর নরম ঠোঁট দুটোকে শক্ত করে নিয়ে একটা ধিক্কার ছাড়ে মুরলী—মরলেই ভালো হতো।

পলুস হাসে ঃ হ্যাঁ, মরলে ওদের ভালো হতো। কয়েদ হবার সাজা যে কী কষ্টের সাজা, সেটা সে-ই বুঝে, যার কয়েদ হয়। কয়েদের চেয়ে মরণ ভাল।

চমকে ওঠে মুরলী। হঠাৎ একটা যন্ত্রণার তীর যেন বুকের ভিতরে গিয়ে বিঁধছে। এদিকে ওদিকে তাকিয়ে, আর বার বার হাঁপ ছেড়ে যেন মনটাকে একটা মিথ্যা স্মৃতির মিথ্যা বেদনা

থেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে। কিছুক্ষণ উদাসভাবে তাকিয়েও থাকে, তারপরেই হেসে ওঠে ঃ তোমার কপাল বড় ভাল, এমন সিস্টার দিদির দয়া তুমি পেয়েছ।

পলুস—তুমি কি পাও নাই?

মুরলী হাসে—তুমি বেশি পেয়েছ।

পলুস--কেন? আমার তো মনে হয়, তুমি বেশি পেয়েছ।

মুরলীর ঠোঁট দুটো হঠাৎ শিউরে ওঠে, যেন একটা লাজুক কৌতূহলের পিপাসা চাপতে চেষ্টা করে।

পলুস—কি বটে জোহানা?

মুরলী মুখ ফিরিয়ে বলে—আমার কাছে এসে বসো, তবে বলবো।

উঠে এসে, মুরলীকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে, মুরলীর অলস লাজুক শরীরটাকে তুলে নিয়ে একটা চারপায়ার উপর বসিয়ে দেয় পলুস ; আর নিজেও মুরলীর গা ঘেঁষে বসে।

মুরলী বলে—মেরিয়া একটা কথা বলেছিল।

—কি?

—তুমি আমাকে বেশি বাস, না, আমি তোমাকে বেশি বাসি?

—এ কথা কেন শুধাও, জোহানা!

—বুঝতে চাই, সিস্টার দিদি কাকে বেশি দয়া করলে?

—আমি বুঝেছি, আমি তোমাকে বেশি পেয়ার করি।

—আমি বুঝেছি, আমি।

পলুস কৃতার্থভাবে হাসে ঃ এ তো ভাল ঝগড়া বটে।

পলুসের গলা জড়িয়ে ধরে মুরলী ঃ বিচার হয়ে যাক না কেন?

—জোহানা! ডাকতে গিয়ে পলুসের গলার স্বরে যেন হঠাৎ-আকুল পিপাসা ছলছল করে।

—চুপ কর পলুস। বলতে গিয়ে পলুসের গলার রামধনু রঙের রুমালের উপর মুরলীর খোঁপাটা ঘষা খায় আর ভেঙে পড়ে।

পলুস বলে—তুমি এখনও কিছু খাও নাই, জোহানা। আগে খেয়ে নাও।

মুরলী—না।

পলুস—আমার কথা শুন।...হোই দেখ, কত খাবার জমা হয়ে রয়েছে।

ঘরের দেয়ালে কাঠের তাকের উপর নানারকমের খাবার, তার নানারকমের রূপ আর রঙ। নানারকমের বাসন ; কালো পাথর, সাদা মাটি আর কাঁসাপিতলের বাসন। মুরলীর চোখে সবই নতুন লাগে। মুরলীর জীবনের জন্য এক নতুন গেরস্থলির বিচিত্র যত উপহার তাকের উপরে সাজানো রয়েছে। চঞ্চল হয়ে ওঠে মুরলীর চোখের দৃষ্টি।

পলুস বলে—হোই দেখ, ওটা হলো কেক, যেটা সিস্টার দিদি দিলে। আর, চিনামাটির বড় বাটিতে কবুতরের তরকারি, আমি নিজের হাতে রেঁধেছি। আর্থারবাবুর বউ থালা ভরে পেঁড়া দিয়ে গেল। আর, হোই দেখ, চারটা পাউরুটি এনে রেখেছি।

—আমি এতটা ভাবি নাই পলুস! বলতে বলতে পলুসের বুকের কাছ থেকে একটু আলগা হয়ে আর ঘরের চারদিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখতে থাকে মুরলী। কী সুন্দর ঘর! ওদিকে চৌকির উপর পাতা বিছানা। বিছানার উপর পাশাপাশি একজোড়া বালিশ। দেয়াল ঘেঁষে কাঠের একটা আলনা, তার উপরে পলুসের জামা-কাপড় সাজানো। এক কোণে একটা লোহার উনান, তার পাশে ঝুড়ির মধ্যে খাদের কয়লা। দেয়ালের গায়ে পলুসের বন্দুক আর টোটার মালা। ঝকঝক আর তকতক করছে মুরলীর নতুন জীবনের সুখের ঘর।

—এ ঘর আমার ঘর, পলুস! চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী।

—হ্যাঁ, জোহানা। হাসতে থাকে পলুস।

পলুসের মাথায় হাত বুলিয়ে আস্তে আস্তে ফিসফিস করে মুরলী ঃ এ পলুস আমার পলুস বটে।

পলুস—হ্যাঁ।

মুরলী—এসো।

পলুস—আগে খেয়ে নিবে না?

মুরলী রাগ করে ফুঁপিয়ে ওঠে ঃ না। যাকে ছুঁতে গিয়ে তুমি দুই-দুইবার দুখ পেলে, তার উপর তোমার এখনও রাগ হয় না কেন?

পলুস—জোহানা!

মুরলী—না, আগে এসো। আগে আমাকে বুঝে নিতে দাও, এটা আমারই মরদের ঘর বটে।

আবার কি একটা হোঁচট খেয়েছে মুরলীর জীবনের আশা? তা না হলে, এত রাত হয়ে যাবার পরেও বিছানা থেকে উঠে বসতে আর উৎসবের খাবারগুলি খেতে চায় না কেন মুরলী?

যেন ওইসব বাহারদার খাবারের কোন স্বাদ নেই। এই ঘরের বাতাসেও কোন স্বাদ নেই। আর, এই বিছানাটারও কোন স্বাজ নেই। বিস্বাদ হয়ে গিয়েছে মুরলীর অতৃপ্ত শরীরটার রক্ত।

নতুন সুখের ঘরে এসে মুরলীর আশার প্রাণ যে বিহ্বলতা নিয়ে বুকের উপর পলুসের পিয়াস বরণ করেছে, কী আশ্চর্য, সেই বিহ্বলতাই হঠাৎ হতাশ হয়ে গিয়েছে। পলুসের পিয়াস যেন একটা অসার দৌরাত্ম্য, মুরলীর আশার নিঃশ্বাসকে শেষ পর্যন্ত দীর্ঘশ্বাস করে ছেড়ে দিয়েছে। দম বন্ধ করে যেন একটা উপদ্রবের লোলুপ চেষ্টাকে ঢোক গিলে কোন মতে সহ্য করেছে মুরলী ; তারপর, পলুসের ক্লান্ত ও তৃপ্ত শরীরের অলস স্পর্শটাকে বেশ একটু কঠোরভাবে একহাতের ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছে—ভাল সুখের ঘর বটে! ভাল মরদের ঘর বটে।

—কি হলো জোহানা?

—কিছু না।

বার বার অনুরোধ করে পলুস ঃ এবার উঠে বসো জোহানা।

মুরলী—না।

পলুস—কেন?

মুরলী—ও খাওয়া তুমি খেয়ে নাও ; আমার সাধ নাই।

পলুস—এটা কেমনতর রাগ বটে?

উত্তর দেয় না মুরলী। বিছানার এক পাশে, যেন পলুস হালদারের ছোঁয়া থেকে গতর বাঁচিয়ে চুপ করে কুঁকড়ে পাকিয়ে একটা আশাহত প্রাণের লাসের মত পড়ে থাকে।

আশ্চর্য হয়, ব্যথিত হয়, শেষ পর্যন্ত মনে মনে একটু উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পলুস ঃ তুমি যদি না খাও, তবে আমি একাই খেয়ে নিব।

মুরলী—হ্যাঁ, একা খাবে না? একা খেতেই জান। তুমি তো আর মধুকুপির একটা কিষাণের মত...

পলুস ভ্রূকুটি করে—কি বললে?

ঘরের অন্ধকারে পলুসের ভ্রূকুটি মুরলীর চোখে পড়ে না। উত্তর দেয় না মুরলী।

পলুস—কথাটা কানে যায় নাই কি?

মুরলী—কি কথা?

পলুস--আমার কথা নয়, তুমি এখনই যে কথাটা বললে।

মুরলী—বললাম তো, মধুকুপির কিষাণেরা একা খেতে জানে না ; ওরা গাঁওয়ার বটে।

আলো জ্বালে পলুস হালদার। খাবারও খায়। সবই দেখতে পায় মুরলী। কিন্তু মুরলীর সারা অন্তরাত্মা যেন একটা দুঃসহ বিস্বাদের ভারে ক্লিষ্ট হয়ে নতুন ঘরের বিছানার এক পাশে পড়ে থাকে।

আবার কখন ঘর আঁধার হয়ে গিয়েছে, জানে না মুরলী। ঘুম ভাঙে যখন, তখন মুরলীর গায়ের উপরে ঘুমন্ত পলুসের অলস একটা হাতের ভার ঘুমন্ত আদরের মত পড়ে ছিল। কিন্তু চমকে ওঠে মুরলী ঃ কে? কে? তুমি কে বটে গো?

মুরলীর ভাঙা ঘুমের বিস্ময় হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে পলুসের হাতটাকে একটা ঠেলা দিয়ে নামিয়ে দেয়।

জেগে ওঠে পলুস ঃ কি হলো জোহানা? কিসের ডর?

মুরলী—অ্যাঁ...না, ডর নাই, কিন্তু তুমি এখানে কেন?

পলুস হাসে ঃ আমি যে তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি।

মুরলী—তুমি আমাকে ছুঁবে না ; দয়া কর পলুস।

পলুস—আমার যে তোমাকে আবার ছুঁতে সাধ হয়েছে জোহানা ; আমার জোহানা।

মুরলী—না, না, না। তোমার মিছা আদরের জ্বালা ভাল লাগে না পলুস।

বলতে বলতে বিছানা থেকে নেমে যায় মুরলী। পলুস বিব্রতভাবে বলে—কি হলো?

মুরলী—আমি ভুঁইয়ের উপরে চাটাই পেতে শুয়ে থাকি।

পলুস—তোমার মাথায় কোন দোষ আছে নাকি?

মুরলী—আছে বুঝি?

পলুসের এতক্ষণের নিরেট ধীরতা এইবার একটা আক্রোশের ধমক হয়ে ফেটে পড়ে ঃ কিষাণীর মত ভুঁইয়ের উপর শুতে সাধ হয়েছে বুঝি।

মুরলী—হয়েছে বুঝি।

পলুস—কিন্তু এটা কিষাণের ঘর নয়।

মুরলী—নয় বুঝি।

পলুস—তুমি কি আমার সাথে হাসি করছো জোহানা?

মুরলী—না পলুস। হাসি করবো কেন?

পলুস--তবে?

মুরলী—আমাকে ঘুমাতে দাও।

ঘরের মেঝের উপর চাটাই পাতে মুরলী। হঠাৎ ব্যাকুলভাবে এগিয়ে এসে মুরলীর হাত ধরে পলুস ঃ আমি বুঝেছি।

—কি?

—তোমার মনে দুখ হয়েছে।

—কিসের দুখ?

—আমি তোমাকে আজ কিছু দিঁই নাই।

—কি বললে?

মুরলীর শূন্য গলায় হাত বুলিয়ে পলুস বলে—তোমার গলাটা খালি। একটা হাঁসুলিও নাই।

মুরলী হাসে ঃ তাতে আমার গলার কোন দুখ নাই।

পলুস—আমি কালই গোবিন্দপুর বাজারে গিয়ে তোমার লেগে একটা চিজ কিনে নিয়ে আসবো।

মুরলী—দরকার নাই।

পলুস—আমি নিয়ে আসবোই। চাঁদির সুতলির মালা, তার সাথে তিনটা সোনার মটরদানা।

মুরলী হেসে ফেলে ঃ ফাঁসি দিবে নাকি গো?

হেসে হেসেই পলুসের হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সরে যায় মুরলী।

পলুস—বিছানাতে আসবে না?

মুরলী—না।

রাত আরও গভীর হয় যখন, তখন ভুঁইয়ের উপর ঘুমের ঘোরে অচেতন মুরলীও জানতে পারে না যে, মুরলীকে আবার বার বার ডেকে শেষে একবারে চুপ হয়ে গিয়েছে পলুস।

কিন্তু হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে মুরলী—ও কিসের আওয়াজ পলুস! হায় বাপ, এ কেমন আওয়াজ!

বিছানার উপর ধড়মড় করে উঠে বসে পলুস ঃ ডর নাই জোহানা, ওটা নদীর সোতের আওয়াজ বটে।

মুরলী—কোন্ নদী?

পলুস—ডরানি।

আরও ভীরু হয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে মুরলীর গলার স্বর ঃ এখানে আবার ডরানি আসে কেন পলুস?

পলুস—এই তো, হারানগঞ্জের ডাঙা পার হয়েছ কি শালের জঙ্গলটা ধরেছ ; আর, তার পরেই ডরানির সোত। পৈঁছা হাওয়া ছাড়লেই সোতের আওয়াজ এদিক পানে ছুটে আসে।

মুরলীর বুকের পাঁজর একবার শিউরে উঠেই অলস হয়ে যায়। পৈঁছা হাওয়া যেন দূরের ডরানির ঠাণ্ডা স্রোতের ঝুরুঝুরু ঝরানির শব্দ তুলে নিয়ে এসে মুরলীর বুকের উপর ছড়িয়ে দিয়েছে।

এই তো, ঘরের এই অন্ধকারটা যে সেই ঘরের অন্ধকারের মত গাঁয়ের গায়ের গন্ধে ভরে যাচ্ছে। বাঁশঝাড়ের ধড়টা কটমট করে দুলছে মনে হয়। জামকাঠের কপাটটা কাঁপে। আখড়ার ঝুমুর থেমে এল বুঝি। এত রাতে মাদল বাজায় কোন্ কিষাণ? আর, কি আশ্চর্য...মুরলীর গা ঘেঁষে এই তো শুয়ে আছে সেই মরদ মানুষটি। শিলের পাটার মত সেই বুকটা।

—কি গো সরদার, মুরলীকে ছুঁতে আর সাধ হয় না কি?

—তোর সাধ হয় কিনা বল?

—কিসের সাধ?

—আমাকে ছুঁতে।

—কি বল সরদার? তোমার মত মরদের গতর যে সোনা বটে গো। তুমি না ছুঁলে যে মুরলীর হাড়মাস মিঠা হয়ে যায় না।

—তবে বল না কেন মুরলী?

—বলছি তো, এসো।

জোহানা! একটা একেবারে অচেনা ও অজানা ডাক রূঢ় আওয়াজের আঘাতের মত মুরলীর তন্দ্রাতুর শরীরের উতলা সাধের উপর যেন আছড়ে পড়েছে। ঘুম ভেঙে, ভুঁইয়ের চাটাই-এর উপর ধড়মড় করে উঠে বসে মুরলী।

পলুস হাসে—সকাল হয়ে এলো, জোহানা।

মুরলী—হলো তো...কিন্তু তুমি চেঁচালে কেন?

পলুস—আমি গোবিন্দপুর চললাম।

মুরলী—কেন?

পলুস—মনে নাই?

মুরলী—না।

পলুস—চাঁদির সুতলির মালা, আর তিনটা সোনার মটরদানা।

মুরলী—আমি ওসব চিজ নিব না পলুস।

পলুস—নিতে হবে। তোমাকে হাসতে হবে। তোমাকে দুখ দিবার লেগে আমি তোমাকে বিয়া করি নাই।

সাইকেলটাকে ঘরের ভিতর থেকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে ঘরের বাইরে চলে যায় পলুস হালদার।

ডরানির স্রোতের ঝুরুঝুরু ধরানির শব্দ আর শোনা যায় না। ভোরের আলো দেখে ভয় পেয়ে পৈঁছা হাওয়া কি মরে গেল? তা না হলে মুরলীর চোখে আর ঘুমের আবেশ লাগে না কেন? মুরলীর নিশ্বাসের শব্দই বা কেন মাঝে মাঝে থমকে যায়? আর, বার বার কেন চমকে উঠে, দু হাতে চোখ ঘষে, হাই তুলে ও গা-মোড়া দিয়ে শয়ান শরীরটাকে স্বপ্নে-পাওয়া একটা নেশার মিথ্যা আদর থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ধড়ফড় করে উঠে বসতে হয়?

ঘরের ভিতরে আবছা আঁধার, কিন্তু বাইরে পাখি ডাকে। তবু খুব বুঝতে পারা যায় আর এই আবছা আঁধারেই চিনতে পারা যায়, এই ঘর পলুসের ঘর বটে।

—তুমি চলে গেলে কিগো? ভেজানো দরজার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী। ব্যস্তভাবে এগিয়ে গিয়ে কপাট খুলে পথের দিকে তাকায়।

ভোরের আলোর ঝলক মুরলীর চোখের উপর লুটিয়ে পড়ে। ধাঁধিয়ে যায় চোখ ; সঙ্গে সঙ্গে মুরলীর প্রাণটাও যেন ধাঁধিয়ে যায়। কি হল? কোথায় গেল পলুস? যেন রাতের মুরলীকে ভয় পেয়ে ভোর হতে না হতেই পালিয়ে গেল বেচারা।

রাতের আঁধারে যেন জংলা বিষের গন্ধ আছে। সেই গন্ধে মুরলীর বুকের বাতাসও জংলা হয়ে যায়। তা না হলে পলুসের মত মানুষকে একটা অবহেলার ঠেলা দিয়ে বুকের কাছে থেকে সরিয়ে দিল কেন মুরলী? ছিয়া ছিয়া, এ কেমন ভুল!

পথের উপরে রোদ ঝলমল করে আর দেখতে পাওয়া যায়, অনেক দূরের সেই পিয়ালবনের গা ঘেঁষে ডাইনে বেঁকে গিয়েছে পথটা, তারপরেই বড় সড়ক। মনে পড়ে মুরলীর, গোবিন্দপুরে গিয়েছে পলুস, মুরলীরই মুখের সেই হাসির জন্য চাঁদির সুতলির মালা আর সোনার মটরদানা আনতে, যে হাসি দেখতে না পেয়ে বড় দুখ পেয়েছে বেচারা। কেন হাসবো না পলুস? আমি যে হেসে আর বেঁচে থাকবার লেগে তোমার কাছে এসেছি। আমি যে তোমারই জোহানা বটি গো।

মুরলীর প্রাণের একটা উতলা আক্ষেপ যেন কাতর অনুনয়ের মত মুরলীর মুখে বিড়বিড় করে।—তুমি সিস্টার দিদির বিচার মেনে নিবে। আমার ছেইলা তোমারই ঘরে থাকবে পলুস। আমার লেগে তোমার কত মায়া!

মুরলীর বুক ঠেলে কৃতজ্ঞতার যত ব্যাকুল কথা উথলে ওঠে। রাগ হয় এই গতরটারই উপর। একটা বোকা ভীরু আর জংলী গতর। কে বললে, পলুসের ছোঁয়া পেলে জোহানার এই শরীরের হাড়মাস মিঠা হয়ে যাবে না?

মিথ্যে নয়, পলুস হালদারের হাত ধরবার জন্য, পলুসের বুকের উপর লুটিয়ে পড়বার জন্য ভোরের আলোয় বিহুল মুরলীর এই শরীরের হাড়মাসের পিয়াস যেন এখনই সিক্ত হয়ে উঠেছে। কখন ফিরে আসবে পলুস?

ছোট্ট কালো কুকুরটা বড় বড় রোঁয়ায় ভরা শরীর ; কোথা থেকে ছুটে এসে মুরলীর গায়ের উপর লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কুকুরটাকে দু হাতে সাপটে ধরে বুকের উপর তুলে

নেয় মুরলী।

কুকুরটার মুখ এক হাতে টিপে, জোরে একটা আদরের ঝাঁকুনি দিয়ে হেসে ওঠে মুরলী ঃ ভাল লোভী বটে এটা! হিংসা করবি না তো রে কুটু? সেটাকে ভাই বলে বুঝতে পারবি কি? চুমা নিতে চাস তো এখনই বলে দে।

ছোট্ট কালো রোঁয়াভরা নরম দেহ কুকুরটার মুখের উপর গাল ঠেকিয়ে দিয়ে সারা শরীরটাকে দোলাতে থাকে মুরলী।

টুং করে একটি মিষ্টি শব্দের শিহর মুরলীর কানের কাছে চমকে ওঠে। সাইকেলের ঘণ্টির আওয়াজ। মুরলীও চমকে ওঠে, মুখ ফিরিয়ে তাকায়। সঙ্গে সঙ্গে মুরলীর মুখের হাসিটাও যেন রঙিন ফোয়ারার মত উথলে ওঠে। সিস্টার দিদি এসেছে।

সাচ্চা দেবী বটে সিস্টার দিদি। যেন মুরলীর জীবনের একটা গোপন মানতের ভাষা, আর মুরলীর সুখ ও আশার একটা ভয়ের আর্তনাদ শুনতে পেয়ে নিজেই ছুটে এসেছে সিস্টার দিদি।

—জোহানা বহিন, ভাল আছ? সিস্টার দিদির নীল চোখে স্নেহময় হাসির আভা ভোরের আলোর চেয়েও সুন্দর হয়ে ঝলমল করে।

—আমি তোমার ঠাঁই যাব ভেবেছিলাম, সিস্টার দিদি। চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী।

—কেন বহিন? বলতে বলতে এগিয়ে এসে আর সাইকেলটাকে ঘরের দেয়ালের গায়ে হেলিয়ে দিয়ে বারান্দার উপর ওঠেন সিস্টার দিদি।

ছুটে গিয়ে ঘরের ভিতর থেকে ছোট একটা চারপায়া নিয়ে এসে সিস্টার দিদির সামনে রেখে দিয়ে হাঁপ ছাড়ে মুরলী ঃ বসো দিদি।

সিস্টার দিদি—হ্যাঁ, বল, আমার ঠাঁই কেন যাবে ভেবেছিলে?

কেঁপে ওঠে মুরলীর চোখ। মাথা হেঁট করে। ধপ করে মেঝের উপর বসে পড়ে মুরলী। তারপর সারা শরীর কুঁকড়ে নিয়ে সিস্টার দিদির কোলের উপর মাথা পেতে দেয়। মুরলীর মাথায় হাত বুলিয়ে সিস্টার দিদি স্নিগ্ধ স্বরে হাসেন ঃ বল জোহানা।

মুরলী—আমার পেটে ছেইলা আছে দিদি।

চমকে ওঠেন সিস্টার দিদি—লর্ড!

—দিদি! ফুঁপিয়ে ওঠে মুরলী।

—বুঝলাম, তুমি আমার উপদেশ মান নাই জোহানা। সিস্টার দিদির গম্ভীর গলার স্বর যেন একটা গম্ভীর ভর্ৎসনা।

মুরলী—ভুল হয়েছে দিদি।

সিস্টার দিদি—হ্যাঁ, খুব ভুল। পরের সন্তান পেটে নিয়ে পলুসের ঘরে এসেছ তুমি। তুমি পলুসকে বিপদে ফেলেছো জোহানা।

—বিপদ কেন হবে দিদি?

—পলুস যদি বিপদ মনে করে, তবে বিপদ নিশ্চয়।

—তুমি পলুসকে বুঝিয়ে দিলে কোন বিপদ হবে না, দিদি।

—পলুস কি বলে?

—সে চায় না। আমার এই ছেইলাকে পরের ছেইলা মনে করে পলুস।

হেসে ফেলেন সিস্টার দিদি ঃ পলুস ঠিক মনে করেছে।

—তুমি বলে দিলে পলুস মেনে নিবে।

—কি বলবো?

—আমার ছেইলা আমার কাছে থাকবে।

—আমি পলুসের উপর অবিচার করতে পারি না জোহানা। ওকে তুমি বিয়ে করো

পলুসের ইচ্ছা যদি না থাকে, তবে পরের সন্তান ওর ঘরে তুমি রাখবে কেন? পলুসকে তুমি অকারণে শাস্তি দিবে কেন? এতটা অধিকার তোমার নাই জোহানা।

—কিন্তু আমার উপর অবিচার কর কেন, দিদি?

—না, তোমার উপরেও অবিচার করতে চাই না। সেই কথাই বলছি, শুন।

—বল দিদি। সিস্টার দিদির হাঁটুর উপর চোখ ঘষে মুরলী।

—তিন-চারটি মাস পরে তুমি আমার অনাথবাড়িতে চলে আসবে।

—না দিদি। চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী। তীব্র করুণ ও ভীরু একটা আর্তনাদ ; যেন জীবনের আশার পথে একটা রক্তলোলুপ বাঘের ছায়া দেখতে পেয়েছে মুরলী। মুরলীর পেটের ছেইলাকে খেতে চায় ওই বাঘ।

—হ্যাঁ বহিন, ইউ মাস্ট। সিস্টার দিদির গলার স্বর একেবারে শান্ত ও অবিচল।

মুরলীর মাথাটা একবার কেঁপে উঠেই স্তব্ধ হয়ে যায় ; আর একেবারে অলস হয়ে একটা নির্জীব পাথরের ঢেলার মত সিস্টার দিদির হাঁটুর উপর পড়ে থাকে।

—আমি তোমাকে উত্তম উপদেশ দিলাম, তোমারই জীবনের সুখ আর শান্তির জন্য। তুমি বুঝে দেখ জোহানা। সিস্টার দিদির গলার স্বরে যেন একটা সান্ত্বনার সাড়া ফুটে ওঠে।

মুখ তোলে মুরলী। সিস্টার দিদির মুখের দিকে একজোড়া অবুঝ চোখের কাতর দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে ছটফট করতে থাকে।

সিস্টার দিদি আবার গম্ভীর হন ঃ তুমি আমার কথা বুঝতে পার নাই মনে হয়।

—বুঝি নাই দিদি।

—তবে, তুমি বল। আমি কি করতে পারি?

—তুমি যা বলবে দিদি, তাই হবে।

—অনাথবাড়িতে যাবে? কিছুদিন থাকলেই মন অনাথ হবে। তুমি সংসার চাইলে পাবে?

—যাব।

—অনাথবাড়িতে ছেইলা রেখে দিয়ে আবার স্বামীর ঘরে চলে আসবে?

—হ্যাঁ, দিদি।...কিন্তু।

—কি?

—ছেইলাটার কি হবে?

—অনাথবাড়িতেই থাকবে, বড় হবে।

—ভাল কথা দিদি, কিন্তু আরও ভাল হয়, যদি তুমি ছেইলাটাকে...।

—কি?

—একটুক বড় করে নিয়ে ওকে ওর বাপের কাছে দিয়ে দাও।

—নো, নেভার। তুমি খুব অধম কথা বলছো জোহানা। আমার অনাথবাড়ি ধর্মবাড়ি আছে, হাসপাতাল নহে। ধমক দিয়ে উঠে দাঁড়ান সিস্টার দিদি।

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে মুরলী। সিস্টার দিদির কথাগুলিকে একটা ভয়ানক রাগী রহস্যের গর্জন বলে মনে হয়। বুঝতে পারে না মুরলী, সিস্টার দিদির মত এত শান্ত ও এত মায়ার মানুষ এই সামান্য আবেদনের উপর এত রাগ করে কেন।

—সিস্টার দিদি! আস্তে আস্তে ডাক দেয় মুরলী।

সিস্টার দিদি—না বহিন। খিরিস্তান হয়েও তোমার মনে ধরমের গরব নাই ; এ বড় দুঃখের কথা বহিন। তুমি তোমার সেই ধরমহীন পুরাতন স্বামীর জন্য এখনও দরদ কর।

—না দিদি।

—নিশ্চয়। তা না হলে, তুমি কেন আমাকে অখিরিস্তানের ছেইলার ধাই হতে বলছো, জোহানা?

—তবে কি উপায় হবে, বল দিদি।

—তোমার ছেইলা অনাথবাড়িতে থাকবে, খিরিস্তান হবে। তা না হলে মানুষ হবে কেমন করে?

বুকের ভিতরের সব নিশ্বাস ফুঁপিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে মুরলী ঃ তাই ভাল দিদি।

হেসে ওঠে সিস্টার দিদির স্নেহাক্ত নীল চোখ ঃ সুখী হও জোহানা। তোমার কোন ভাবনা করবার দরকার হয় না।

মুরলীর কাছে এগিয়ে আসেন সিস্টার দিদি। মুরলীর মাথায় আবার হাত বোলাতে থাকেন ঃ তুমি ভুলে যাও কেন জোহানা, তুমি নতুন হয়ে গিয়েছ? পুরানা জীবনের সহিত তোমার আর কোন সম্পর্ক নাই। আছে কি?

—না দিদি।

—তবে আর পুরানা ঘরের কথা মনে কর কেন? মায়া কর কেন?

—না দিদি, মায়া আর করবো কোন্ সাধে?

—ঠিক বুঝেছ জোহানা। তোমার যা কিছু পেতে সাধ হবে, সব এই ঘরেই পাবে। এই ঘর সুখী খিরিস্তানের ঘর।

—হ্যাঁ দিদি।

—আচ্ছা, আমি এবার চলি বহিন...হ্যাঁ, পলুস কোথায়?

—গোবিন্দপুরে গেল।

—কেন?

হঠাৎ লজ্জা পেয়ে মাথা হেঁট করে মুরলী।

সিস্টার দিদি—কি জোহানা? পলুস আজই গোবিন্দপুরে গেল কেন?

মুরলী—চিজ সওদা করতে।

সিস্টার দিদি—কি চিজ?

মুরলী—চাঁদের সুতলির মালা আর সোনার মটরদানা।

ঝিক করে সুন্দর এক খুশির হাসি চমকে ওঠে সিস্টার দিদির মুখে ঃ তোমার সৌভাগ্য জোহানা ; কত ভাল স্বামী তোমার। আমার কাছে না এলে কি এই সুখ পেতে বহিন?

মুরলী—একটা কথা কি তোমার মনে আছে, দিদি?

—কি?

—তুমি আমাকে লিখা-পড়া শিখাবে বলেছিলে।

—মনে আছে বহিন। কিন্তু তুমি কি এখনও চাও?

—চাই দিদি।

—তবে আমার কনভেণ্টের স্কুলে ভর্তি হও।

—স্কুল যে বড় দূর বটে দিদি।

—পলুসকে বল, তোমার জন্য গো-গাড়ি ঠিক করে দেবে. যেতে চার আনা আসতে চার আনা, রোজ আট আনা গো-গাড়ির ভাড়া দিবে।

—কে দিবে?

—দিবে তোমার পলুস। আবার কে? তোমার সাধ মিটাবে. তোমার সব সুখ এনে দিবে পলুস। তা না হলে তোমাকে ঘরণী করেছে কেন পলুস?

হেসে ওঠেন সিস্টার দিদি ; আর, মুরলীর গম্ভীর মুখটাকে যেন একটা প্রবল স্নেহাক্ত আশ্বাসের আবেগ দিয়ে হাসিয়ে দেবার জন্য মুরলীর থুতনি টিপে ধরেন ঃ এইবার হাস বহিন। হাস...আমি বলছি হাস—এক দুই তিন... হ্যাঁ।

হেসে ফেলে মুরলী ; এই হাসি একেবারে নতুন হাসি। জীবনের যত পুরনো মায়ার

বিভীষিকা থেকে মুক্তি পেয়ে হেসে উঠেছে মুরলীর প্রাণ। ঝকঝকে তকতকে শান্ত ঠাণ্ডা নিথর হাসি।

চলে যান সিস্টার দিদি।

কিন্তু ঘরে ফিরতে আর কত দেরি করবে পলুস?

দুপুর হয়ে যাবার পর একবার ঘরের জানালা খুলে বাইরের মাঠের দিকে তাকিয়েই জানালা বন্ধ করে দেয় মুরলী। রোদের জ্বালায় মাঠটা পুড়ছে না হাসছে, বোঝা যায় না।

কিন্তু আর দেরি করে না মুরলী। বালতি হাতে নিয়ে নিকটের ইঁদারার কাছে এগিয়ে যায়। জল তোলে। স্নান করে। তারপর, নিজেরই ভেজা শরীরের স্নিগ্ধতায় মুগ্ধ হয়ে আর ভেজাশাড়ির শব্দ শুনতে শুনতে ঘরে ফিরে আসে। রঙিন শাড়ি, জামা আর সায়াতে সুন্দর করে সেজে নিয়ে আয়নার দিকে তাকায় মুরলী। আর, খুশি হয়ে নিজেরই নরম ঠোঁটের নতুন হাসিটাকে দেখতে থাকে। ঝকঝকে তকতকে হাসি। মুরলীর নতুন জীবনের হাসি ; যে হাসি পলুসের এই তকতকে ঝকঝকে ঘরের শোভার সঙ্গে বড় সুন্দর মানায়।

পলুসের ফিরে আসতে আরও দেরি হবে বলে মনে হয়। কিন্তু মুরলী আর দেরি করে না। এগিয়ে যেয়ে দেয়ালের তাকের উপর থেকে থালা গেলাস আর বাটি নামিয়ে নিয়ে মেঝের উপর রাখে। এই ঘরে দুখ পেতে আসে নাই মুরলী। মিছা ক্ষুধা পুষে রেখে কষ্ট পাওয়া উচিত নয়।

কবুতরের তরকারি, পলুস বেচারা কত সাধ করে নিজের হাতে রেঁধেছে। চিনেমাটির সাদা থালার উপর কবুতরের তরকারি ঢেলে নেয় মুরলী। পাঁউরুটি ছিঁড়তেও দেরি করে না।

খাওয়া শেষ হবার পর, নতুন জীবনের স্নিগ্ধ ও তৃপ্ত শরীরটাকে নরম বিছানার উপর এলিয়ে দিতেও দেরি করে না মুরলী।

কিন্তু ঘুমিয়ে পড়তে দেরি করে মুরলী ; সিস্টার দিদির হাসির ঝঙ্কার এখনও মুরলীর কানের ভিতরে বেজে চলেছে। মুরলীর চোখ দুটো অপলক হয়ে যেন এই নতুন জীবনের অনুভবগুলির জন্য অপলক শ্রদ্ধার মত জেগে থাকে। আর নরম ঠোঁটের উপর ছড়িয়ে থাকে সেই ঝকঝকে তকতকে ঠাণ্ডা হাসি।

ঘরের দরজার কাছে আগন্তুক পায়ের শব্দ শোনা যায়। শোনা যায়, একটা সাইকেলের ধড় যেন হঠাৎ লাফিয়ে উঠে ঝনঝন করে বেজে উঠেছে। আস্তে আস্তে দরজার দিকে মুখ ফেরায় মুরলী।

হ্যাঁ, পলুস ফিরে এসেছে।

ঘরে ঢুকেই একটু আশ্চর্য হয়ে থমকে দাঁড়ায় পলুস। পলুসের উদ্বিগ্ন মুখটা হাসতে চেষ্টা করেও হেসে ওঠবার জোর পায় না ঃ কি বটে জোহানা?

মুরলী—কি?

পলুস—তুমি হাসছো মনে হয়।

মুরলী—হ্যাঁ।...তুমিই যে বলেছ, আমাকে হাসতে হবে।

পলুস—কিন্তু এ কেমন হাসি বটে? তোমার কি...।

মুরলী—না গো, আমার মাথা খারাপ হয় নাই।

পলুস—সে-কথা নয় ; তোমার কি...।

মুরলী—না গো, আমার অসুখ করে নাই।

পলুস—তবে কেন...।

মুরলী চেঁচিয়ে হেসে ওঠে—কি পলুস?

পলুস হাসে—এটা মিঠা হাসি, না মিঠা ছুরি?

আরও জোরে চেঁচিয়ে হেসে ওঠে, আর বিছানার উপর উঠে বসে মুরলী ঃ সিস্টার দিদি

এসেছিল।

—কি বললে সিস্টার দিদি?

—তুমি যা বলেছ, তাই বললে।

—কি বলেছি আমি?

—আমার ছেইলাটা অনাথবাড়িতে থাকবে।...বড় ভাল কথা বলেছিলে পলুস, আমি বুঝি নাই। আমার ছেইলা অনাথবাড়িতে থাকবে, তোমার মত ভাল খিরিস্তান হবে ; আমার কিছু ভাবনা নাই। সিস্টার দিদির বড় দয়া।...কই, আমার লেগে কি চিজ নিয়ে এসেছ দেখি?

কাগজে মোড়া একটা জিনিস পকেটের ভিতর থেকে বের করে পলুস। খুশির আবেগে চঞ্চল হয়ে একটা ছোঁ মেরে পলুসের হাত থেকে কাগজের মোড়কটা তুলে নিয়েই আয়নার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় মুরলী।

আস্তে আস্তে যেন হাঁপাতে হাঁপাতে কথা বলে পলুস—চিজটার দাম নিল আশি টাকা দশ আনা।

পলুসের কথা বোধ হয় শুনতেই পায়না মুরলী। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রূপোর সুতলির চকচকে হার গলায় পরতে থাকে। হারের সঙ্গে তিনটে সোনার মটরদানা দুলছে। আয়নার দিকে তাকিয়ে গলার এই নতুন গৌরবের রূপ দেখতে দেখতে মুরলীর কালো চোখের চাহনি ছটফট করে ঃ আরও দুটা দানা হলে ভাল হতো পলুস।

পলুস—হ্যাঁ, ভাল হতো।

মুরলী—দিবে কি?

পলুস—দিব।

আয়নার কাছ থেকে সরে এসে আবার বিছানার উপর বসে মুরলী আমি সিস্টার দিদির ইস্কুলে যাব, পলুস।

—কেন?

—লিখা-পড়া শিখতে।

—কিন্তু, ইস্কুল যে অনেক দূর বটে।

—গো-গাড়িতে যাব। রোজ আট আনা ভাড়া লাগবে।

—মাসে যে পনের টাকা লাগবে!

—লাগুক না কেন?...হ্যাঁ, আমার সিলাই কলটা মেরিয়ার কাছে পড়ে আছে। ওটা আনিয়ে দাও।

—দিব।

জানালা খুলে দিয়ে বাইরের পথ, মাঠ আর আকাশের দিকে তাকিয়ে কি-যেন ভাবতে থাকে মুরলী। নিকটে ও দূরে ছোট ছোট বসতির ঘরগুলির দিকেও তাকায়। গির্জার চূড়াটাকেও একটা সুন্দর দূরের ছবির মত দেখতে পাওয়া যায়।

—চল পলুস। যেন একটা দুর্বার খুশির আবেগে চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী।

—কোথায় যাবে?

—চল, তোমার হারানগঞ্জের খিরিস্তানদিগের ঘর দেখে আসি। আর্থারবাবুর ঘরণী দেখতে কেমনটি গো?

—বেশ তো, দেখে এসো একদিন।

—এখনই চল।

—আমি যে এখনও খাই নাই।

—খেয়ে নাও।

—তুমি খেয়ে নিয়েছ মনে হয়।

—হ্যাঁ।

বিছানার উপর গড়িয়ে পড়ে মুরলী। আর পলুস হালদার যেন একটা অনিচ্ছার ক্লান্ত মূর্তির মত আস্তে আস্তে হেঁটে ইঁদারার দিকে চলে যায়। হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে ফিরে এসে ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে মুরলীর মুখের দিকে আবার কি-যেন আশা করে তাকিয়ে থাকে পলুস।

মুরলী—খেয়ে নাও পলুস। মিছা দেরি কর কেন?

আর দেরি করে না পলুস। বিছানা থেকে নামবে না মুরলী ; পলুসের খাবার নিজের হাতে সাজিয়ে দিতে মুরলীর প্রাণে কোন ব্যস্ততা নেই। তাকের উপর রাখা পাউরুটি আর বাটির কবুতরের তরকারি একটা থালাতে ফেলে দিয়ে চুপ করে খেতে থাকে পলুস।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যখন চুল আঁচড়ায় মুরলী, তখন ঢক-ঢক করে এক ঘটি জল খেয়ে নিয়ে জোরে একটা নিশ্বাস ছাড়ে পলুস হালদার ঃ চল জোহানা।

ছোট ছোট ঘর, লাল খাপরার চালা। হারানগঞ্জের ডাঙার বুকের উপর এদিকে-ওদিকে ছকের ছবির মত সাজানো এক একটা বসতির কাছে পলুস আর মুরলীকে এগিয়ে আসতে দেখেই ঘরের মানুষগুলি হেসে হেসে আর হল্লা করে পথের উপর ছুটে আসে। মেয়েরা চেঁচিয়ে ওঠে—হোই দেখ, পলুস আর পলুসের ঘরণী জোহানা আসছে।

—হেই মা, পলুসের ঘরণীর রূপটা দেখ না কেন মা? চেঁচিয়ে ওঠে আর্থারবাবুর মেয়েটা।

আর্থারবাবুর বউ হাসে—আমি দেখছি ; তুই দেখে নে।

পলুসের পাশে দাঁড়িয়ে, আর মুখের সেই সুন্দর তকতকে ঝকঝকে হাসির শিহরটুকু ফুটিয়ে রেখে খিরিস্তান ভাই আর বহিনদের ছটফটে উল্লাসের মুখগুলিকে দেখতে থাকে মুরলী। মুরলীর বুকের ভিতরটাও যেন একটা নতুন গরবের স্বাদে ভরে যায়।

পলুসের একটা হাত শক্ত করে ধরে মুরলী। এগিয়ে যায় পলুস আর মুরলী। ভাবতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে যায় মুরলীর মন। পলুসের পাশে মুরলী, আর মুরলীর পাশে পলুস, যেন সারা হারানগঞ্জের আত্মা খুশি হয়ে আর মুখর হয়ে এই মিলনের ছবিকে আশীর্বাদ করছে।

জনের মা, বুড়ি আনিয়া, মুরলীর হাতে একগাদা ফুল তুলে দিল ঃ গড বাবা দয়া করেন ; সুখে থাক গো বহিন।

আরও এগিয়ে যায় পলুস আর মুরলী। বিকালের সূর্য বড় তাড়াতাড়ি লাল হয়ে গির্জার চূড়ার পিছনে নেমে পড়ছে। বড় সড়কের দু'পাশের আমগাছের মাথার উপর হুটোপুটি করে কাক আর কবুতর।

পলুস বলে—আর কত ঘুরবে জোহানা? এক ক্রোশ তো হাঁটা হলো।

—এটা কার ঘর বটে পলুস? সড়কেরই এক পাশে একটা বাড়ির দিকে তাকিয়ে, আর, যেন একটা বিস্ময়ের চমক লেগে মুগ্ধ হয়ে যায় মুরলী।

—এটা রিচার্ড সরকারের বাড়ি বটে।

—দাওয়ার উপর বসে আছে যে, সে কে বটে?

—রিচার্ডবাবু।

—বাবুটা এখানে থাকে কেন?

—রিচার্ডবাবু ডাক্তার বটে।

—খিরিস্তান বটে কি?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু...খিরিস্তান যদি হবে, তবে...।

—কি?

—তবে তোমাকে আমাকে দেখেও আসে না কেন? কথা বলে না কেন?

হেসে ফেলে পলুস ঃ ডাক্তার রিচার্ডবাবু আমাদিগে দেখে ছুটে আসবে না।

—কেন না?

—রিচার্ডবাবু আমাদিগের আর্থারবাবুর মত ত্রিশ টাকার মাস্টারবাবু নয় জোহানা, কল-ঘরের মিস্তিরীও নয়। রিচার্ডবাবুর কত নাম, কত মান, কত টাকা!

ধবধবে সাদা একটা ছোট বাংলো বাড়ি। কাছে দাঁড়িয়ে দেখলেও ছবি বলে ভুল হয়। লাল টালির চালার উপর সবুজ লতা ছড়িয়ে আছে। লতার ফুলগুলি নীল। বাড়ির দরজায় আর জানলায় রঙিন রেশমি কাপড়ের ঝালর উড়ছে। বাড়ির চারদিকে ইঁটের খাটো দেয়াল আর ফুলের কেয়ারি। ছোট একটা ফটক, ফটকের মাথার উপর লতার বিতান। বাড়ির বারান্দার উপরে একটি চেয়ারের উপর বসে খবরের কাগজ পড়ছে ডাক্তার রিচার্ড সরকার।

দেখতে পায় মুরলী ; রিচার্ডবাবু মানুষটাও জোয়ান বটে। চোখে চশমা আছে। পায়ে জুতোমোজাও আছে।

পেন্টালুনের পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছে নিয়ে রিচার্ড সরকারও একবার পথের দিকে তাকায়। তারপরেই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে খবরের কাগজ পড়তে থাকে।

পলুস বলে—চল জোহানা।

মুরলী চলতে চলতে বলে—বাবুটা কি গির্জায় যায় না?

পলুস—যায়।

মুরলী—আঁধার হয়ে এল।

পলুস—হ্যাঁ।

হাত বাড়িয়ে দিয়ে মুরলীর একটা হাত ধরতে গিয়ে চমকে ওঠে পলুস। পলুসের হাতটাকে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছে মুরলী।

পলুস—কি বটে, জোহানা?

মুরলী—কিছু না। আমি কানা নই, হাত ধরতে হবে না।

ঘরে ফেরবার পথের উপর সন্ধ্যার আঁধার ঘন হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। পথের দু পাশের গাছগুলি যেন কতগুলি ঘন ছায়ার ধড়। আর, পলুস হালদার যেন একটা লঘু আবছায়া।

মুরলীর সঙ্গেই হেঁটে চলেছে পলুস ; আর পলুসের দু পায়ের শক্ত চামড়ার জুত মচমচ শব্দ করে বেজেও চলেছে। কিন্তু পলুস যেন মুরলীর চোখেই পড়ছে না। যেন একলা হয়ে একটা অচেনা পথে হেঁটে চলেছে মুরলী।

একটাও কথা বলে না মুরলী, ভুলেও একবার পলুসের গা ছুঁয়ে ফেলে না। এই তো, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে, বিকালের আলোতে পথ হাঁটবার সময় আর্থারবাবুর মেয়ের চোখের সামনে যে পলুসের হাত ধরতে গিয়ে মুরলীর প্রাণটা গর্বে ভরে গিয়েছিল, সেই পলুস যেন সন্ধ্যার আঁধারের ছোঁয়া লাগতেই ছোট্ট একটা ছায়া হয়ে গেল, এইটুকু একটা মরদের ছায়া। পলুসের হাতটা মুরলীর হাত স্পর্শ করবার চেষ্টা করতেই হঠাৎ ছটফটিয়ে সরে গিয়েছে মুরলীর হাত।

পলুসও কোন কথা বলে না। ভাবতে গিয়ে শুধু আশ্চর্য হয় পলুস, মিথ্যা নয় বোধহয়, জোহানার মাথায় দোষ আছে। কে জানে দিনের বেলাতে যে মানুষ এত হাসে, রাত এলেই সে মানুষ এত রাগে কেন? কিংবা হতে পারে, এটা জোহানার গতরের আর গমরের রীত বটে।

কিন্তু এ কেমন রীত? অদ্ভুত! পথ চলতে চলতে পাশের মুরলীর ছায়াময় চেহারাটার দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে পলুস। গায়ের কাপড়ে আগুন লাগলেও কোন মেয়ে বোধ হয় এতটা বে-লাজ হয়ে যেতে পারে না ; কিন্তু শরীরের সব লাজ একেবারে খুলে মেলে ও

আলুথালু করে দিয়ে হেঁটে চলেছে জোহানা। খোঁপাটা ভেঙে গিয়েছে, কাঁধ পিঠ আর বুকের উপর ছড়িয়ে পড়েছে চুল। শাড়িটাকে কোমর থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে, আর গুটিয়ে পাকিয়ে এক হাতে চেপে রেখেছে। সায়াটাও যেন জোহানার এই পথ-চলার উদ্দামতার একটা বাধা ; এক হাতে সায়াটাকে তুলে ধরে রেখেছে। ভেবেছে কি জোহানা? হারানগঞ্জের এই রাতের আঁধারও একটা জঙ্গল? এই সড়কটা কি গাঁয়ের ক্ষেত? আর, সময়টা কি ভুঁইমানতের লজ্জাহীন লগন?

ভাগ্য ভাল, ঘরে ফেরবার পথে কোন সাইকেলের আলো বা পথচারীর লণ্ঠন, কিংবা কোন ছোকরার টর্চ ছুটে আসে নি। কিন্তু ঘরে ফিরে এসেই বা কি হল?

আলো জ্বালে পলুস হালদার। কিন্তু কথা বলে না মুরলী। যেমন পলুসের মুখের দিকে তাকায় না মুরলী, তেমনই নিজের সাজ-হারানো এই আলুথালু বেলাজ চেহারার দিকেও তাকাতে ভুলে যায়।

পলুস বলে—তুমি একটুক ঠিক হয়ে নাও, জোহানা।

মুরলী—কি?

পলুস—আর্থারবাবুর মেয়ে, কিংবা জনের মা, না হয় তো আর কেউ এখনই এখানে এসে যেতে পারে। তোমাকে এমনটি উদাস দেখলে ওরা যে তোমাকে ক্ষেপী মনে করে ডরাবে। শাড়িটা পরে নিয়ে ঠিক হয়ে বসো জোহানা।

চমকে ওঠে না, ব্যস্ত হয়ে ওঠে না, লজ্জা পেয়ে শিউরেও ওঠে না মুরলী। কিন্তু আস্তে আস্তে শিথিল হাত দুটোকে নেড়ে চেড়ে যেন আনমনা চিন্তার আবেশে অলস হয়ে যাওয়া শরীরটাকে শাড়ি দিয়ে জড়াবার চেষ্টা করে।

পলুস বলে—এইবার রাঁধতে হয়, জোহানা।

পলুসের মুখের দিকে তাকায় মুরলী ; কিন্তু মুরলীর চোখে কোন আগ্রহের সাড়া নেই। পলুসের কথাটা শুনতে পেয়েছে, এই মাত্র।

—শুনলে কি জোহানা? চেঁচিয়ে ওঠে পলুস।

—শুনেছি। চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী ঃ কিন্তু আমাকে রাঁধতে বল কেন?

পলুসের চোখ দুটো দপ্ করে জ্বলে ওঠে ঃ তোমার ঘরে তুমি রাঁধবে না তো কে রাঁধবে?

—ভাল আমার ঘর! বিড় বিড় করে মুরলী।

—কি বললে? প্রশ্ন করতে গিয়ে পলুসের স্বরটাও দপ্‌দপ্ করে জ্বলে!

মুরলী মুখ ফেরায় ঃ তোমার লোহার উনান আর তোমার খাদের কয়লা ; তুমি জান কেমন করে আগুন জ্বালতে হয়। আমি জানি না।

হেসে ফেলে পলুস—সে কথাটা বল ; মিছা ঘরের দোষ দাও কেন?

উনানে আগুন ধরায় পলুস। রান্নাও শুরু করে পলুস। ফেন-ভাত, কুরথির ডাল, আর মশলা দিয়ে ডিম। চামচে ভরে ঘি নিয়ে, সেই ঘি এলাচ-দারুচিনির সঙ্গে ফুটিয়ে কুরথির ডালে ছোকা দেয়। পলুসের ঘরের বাতাস আবার স্বাদু গন্ধের বাষ্পে ভরে উঠে থমথম করে। কিন্তু ততক্ষণে বিছানার উপর এলিয়ে পড়েছে আর ঘুমিয়ে পড়েছে মুরলী।

সেই মুহূর্তে ঘরের খোলা দরজার চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতরে উঁকি দিয়ে হেসে ওঠে জনের মা আনিয়া বুড়ি ঃ দেখতে এলাম পলুস, তোমার ঘরণী কেমনটি রাঁধে আর কি রাঁধলে?

চমকে ওঠে পলুস, আর মনে মনে নিজেরই একটা সৌভাগ্যকে ধন্যবাদ জানায়। মান বেঁচেছে পলুসের ; পলুসের এই ঘরের মান বেঁচে গিয়েছে। ভাগ্যিস রান্নাটা হয়ে গিয়েছে, আর ভাগ্যিস মুরলী ঘুমিয়ে পড়েছে।

জনের মা আনিয়া বুড়ির দুটো জ্বলজ্বলে কৌতূহলের চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে পলুস ঃ এই তো, কত কি রাঁধলে, তারপর ঘুমিয়ে পড়লে বেচারা। জ্বর হয়েছে ; তবুও রাঁধলে, আমার মানা শুনলে না।

জনের মা—আহা, জ্বর কেন হলো গো? আহা, বড় ভাল রাঁধে তোমার ঘরণী। এত সুবাস কি এই কুরথি ডালের সুবাস বটে পলুস?

পলুস—হ্যাঁ গো দিদি।

জনের মা—আহা, গড বাবা করেন, জোহানার হাত মিঠা হয়ে থাকুক।

ধড়ফড় করে উঠে বসে মুরলী। জনের মা বলে—ভাবনা নাই জোহানা ; জ্বর সেরে যাবে।

চলে গেল জনের মা।

পলুস হাসে—বুড়ি জেনে গেল, তুমি রেঁধেছ।

মুরলী—তুমি বলেছ?

পলুস—হ্যাঁ।

মুরলী—তাতে কার মান বাড়লে?

পলুস—তোমার।

মুরলী—ভাল মান বটে।

পলুসের চোখ আবার কেঁপে ওঠে। জোহানার প্রাণের সেই জংলী নেশার রাগটা যেন এখনও ক্ষেপী হয়ে নিজেরই জীবনের এই নতুন ঘরের সুখ আর মানের উপর ঢিল ছুঁড়েই চলেছে।

চেঁচিয়ে ওঠে পলুস—কিন্তু খাওয়ার চিজগুলা ভাল বটে। একবার দেখে নাও। এ খাওয়া কখনো খেয়েছ কিনা ভেবে দেখ।

কথাটা মিথ্যে নয়, একেবারে খাঁটি সত্য। ঝালদার মহেশ রাখালের বেটি মুরলী, মধুকুপির দাশু কিষাণের ঘরণী মুরলী জীবনে এমন স্বাদের খাবার কোনদিন খেতে পায় নি। কলঘরের মিস্তিরি, আশি টাকা মাইনের পলুস হালদারের এই ঝকঝকে তকতকে ঘরের অহংকার কিষাণী মুরলীর জীবনের সেই রিক্ততাকে যেন একটা কঠোর ঠাট্টার বাড়ি মেরেছে।

মাথা হেঁট করে মুরলী। চোখ দুটো জলে ভিজে যায়। কিষাণী মুরলীর দীন জীবনের সেই রিক্ততার স্মৃতিটাই বোধহয় কেঁদে ফেলেছে। কিন্তু শুখা মরিচ দিয়ে সিঝানো ডুমুরের জাউ, আর মকাইয়ের দানা ; স্বাদ ছিল না কি? ভাল লাগে নাই কি?

মুরলী বলে—আমি খাব না পলুস। তুমি খেয়ে নাও।

পলুসের মুখটা ধীরে ধীরে কঠোর হয়ে উঠতে থাকে। দুই চোখের উপরে একটা সন্দেহের ছায়াও কাঁপে। পলুসের এই ঘরের রাতের জীবনের সব সুখ মিথ্যে করে দিয়ে জোহানা যেন ওরই জীবনের একটা ভয়ানক অভিমানের শোধ তুলছে।

—এই ঘর কি তোমার ভাল লাগছে না জোহানা? দাঁতে দাঁত চেপে প্রশ্ন করে পলুস। কিন্তু উত্তর দেয় না মুরলী।

—আমি জানি, কেন এই ঘর তোমার ভাল লাগছে না ; আবার চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলে পলুস। পলুসের চোখে যেন তীক্ষ্ণ একটা হিসাবের শাণিত আভা জ্বলজ্বল করে।

স্তব্ধ হয়ে বসে শুধু শুনতে থাকে মুরলী। মুরলীর কাছে এগিয়ে এসে মুরলীর নীরব মুখটার দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকে পলুস।—এ ঘরের ভাত খেতে মনে সাধ লাগে না, এ ঘরের বিছানায় শুতে সাধ লাগে না, মাটিতে চাটাই পেতে গতর ঢেলে দিয়ে ঘুমিয়ে আর মরে যেতে সাধ হয় ; বটে কিনা জোহানা?

মুরলীর হেঁট মাথাটাকে এক হাতে আস্তে একটা ঠেলা দিয়ে গর্‌গর্‌ করে পলুস—আমার ছোঁয়া নিতে ভাল লাগে না, নিলেও ভাল লাগে না ; নয় কি জোহানা?

যেন বুঝতে পেরেছে পলুস, পলুসের পিয়াস বুকের উপর বরণ করেও কেন তৃপ্তিহীন বিস্বাদের জ্বালায় ক্ষুব্ধ হয়ে এই ঘরটাকে ধিক্কার দেয় জোহানা। পলুস হালদারের চোখে যেন একটা ক্রূর কৌতুকের অভিসন্ধি হাসতে থাকে।

উত্তর দিতে চায় না মুরলী ; কিন্তু পলুস হালদার এখনই সেই উত্তর জোহানার এই সুন্দর গতরের রক্তমাংসের কাছ থেকে আদায় করে নিয়ে বুঝে ফেলতে চায়, কেন এই ঘরের সুখকে সুখ বলে মনে করতে পারছে না জোহানা।

—জোহানা। মুরলীর কাছে এগিয়ে যেয়ে আর চোখের সেই ক্রূর কৌতুকের তীক্ষ্ণ হাসিটাকে যেন একটা ধূর্ত মৃদুতা দিয়ে ঢেকে মুরলীর হাত ধরে পলুস।

হাত ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে মুরলী ; কিন্তু পলুসের হাত যেন প্রচণ্ড আগ্রহে কঠোর হয়ে মুরলীর হাতটাকে আঁকড়ে ধরে, আহত হরিণের বেদনা-দুরন্ত শরীরটাকে জব্দ করবার জন্য শিকারীর হাত যেমন কঠোর হয়ে হরিণের শিংটাকে মুচড়ে দেয় আর আঁকড়ে ধরে থাকে। ভয় পেয়ে চমকে ওঠে মুরলী ঃ হাতটা ভেঙে দিতে সাধ হয়েছে কি?

পলুস—তোমার ছেইলাটা যদি অনাথবাড়িতে না যায়, এখানেই থাকে, তবে...তবে বড় ভাল হয় না কি জোহানা?

—বড় ভাল হয় পলুস। গড বাবা তোমাকে অনেক দয়া করবে পলুস। চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী।

পলুস হাসে ঃ সে কথাটি ভাবছি ; তোমার ছেইলা এই ঘরেই থেকে যাক না কেন?

পলুসের বুকের উপর মাথা এলিয়ে দেয় মুরলী ঃ হাতটা ছাড় পলুস।

পলুসের মুখের হাসি উগ্র হয়ে ওঠে ঃ কেন জোহানা?

মুরলী ঃ আঃ, ছাড় পলুস, ব্যথা লাগছে, এমন করে ঘরণীর হাত ধরতে নাই।

মুরলীর হাত ছেড়ে দেয় পলুস। মুরলীও দু হাতে পলুসের গলা জড়িয়ে ধরে একটা ইচ্ছার আবেশে বিহ্বল হয়ে পলুসের বুকের উপর মাথা গুঁজে দেয়।

পলুসের বুকের উপর ছোট্ট একটা দাঁত-ফোটান মিষ্টি কামড়ের জ্বালা চিন করে ফুটে ওঠে। চমকে ওঠে পলুস ঃ কি বটে জোহানা?

—চুপ কর পলুস।

রাতটাও চুপ হয়ে যায়। রাতটা আরও নিঝুম হয়ে যায় যখন, তখন বিছানার কোমলতার উপর লুটিয়ে পড়ে থাকে পলুস আর পলুসের ঘরণী জোহানা। পলুসের একটা হাতও নিবিড় তৃপ্তিতে অলস মুরলীর কোমরের উপর পড়ে থাকে ; আর পলুসের সেই হাত নরম করে ধরে রাখে মুরলী। মুরলীর সেই কঠোর অভিমানের শরীরটা নির্ভয় হয়ে পলুসের উষ্ণ নিশ্বাসের আদরে গলে গিয়েছে। হাড়মাস মিঠা হয়ে গিয়েছে। পুরুষ বটে পলুস ; কত সহজে মুরলীর ইচ্ছাটাকে সুখের জলে চুবিয়ে দিল পলুস। পলুসের কানের কাছে একটা সফল স্বপ্নের আনন্দ ফিসফিস করে শুনিয়ে দেয় মুরলী ঃ হ্যাঁ পলুস, এ ঘর আমার মরদের ঘর বটে। আমার ছেইলার বাপ বটে তুমি!

মুরলীর হাতের মুঠো থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে বসে পলুস ; তারপর একটা লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে যায়। যেন পলুসের গায়ে ভয়ানক এক অপমানের জ্বালা লেগেছে। মুরলীর এই তৃপ্তির ভাষা যে মধুকুপির কিষাণীর রাতের গতরের বুনো আহ্লাদের একটা চিৎকার। পলুসের কাছ থেকে নয়, জোহানার পেটের ছেইলাকে নিজের ছেইলা বলে মেনে নিয়ে আদরের ঘরে ঠাঁই দিতে রাজি হয়েছে যে, তার কাছে থেকে কত সহজে সুখ নিয়ে খুশি হয়ে গেল জোহানার গা-গতর আর প্রাণ! ওর নামটা জোহানা, প্রাণটা মুরলী।

পরীক্ষা করে যা বুঝতে চেয়েছিল পলুস, তা খুব ভাল করেই বোঝা হয়ে গেল। ভাল হল। জোহানাকে চিনতে পারা গেল। এইবার জোহানাও ভাল করে চিনে ফেলুক আর বুঝে

ফেলুক, পলুস হালদারের এই ঘর খিরিস্তানের পরিষ্কার ভালবাসার ঘর ; এখানে কপটতা করে সেরে যাবার সুযোগ নেই।

মুরলীও একটু আশ্চর্য হয়ে উঠে বসে।—তুমি সরে গেলে কেন?

পলুস—এখনও খাই নাই ; খেতে হবে কি না?

মুরলী—আমিও তো খাব।

পলুস—সে তুমি খেয়ে নিও, যখন তোমার খেতে সাধ হবে।

মুরলীর চোখ দুটো হঠাৎ ভীরু হয়ে তাকিয়ে থাকে ঃ এমন কথা ঘরণীকে বলতে নাই।

ভাতের থালা আর ডালের বাটি হাতের কাছে টেনে নিয়ে হাসতে থাকে পলুস, আর হাসিটাও এইবার একটা সার্থক কৌতুকের আমোদে কুৎসিৎ হয়ে কাঁপতে থাকে ঃ ভাল ঘরণী তুমি!

—কি বললে? চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী।

পলুস—পরের ছেইলা নিয়ে আমার ঘরে সুখ করবে যে, সে আমার ঘরণী হবে কেন?

—তোমার পায়ে পড়ি পলুস, এমন কথা বলো না। কেঁদে ফেলে মুরলী।

পলুস—ঠিক কথা বলছি ; তুমি যেমন হিসাব করে সুখ নিবে, আমিও তেমন হিসাব করে সুখ নিব। আমি তোমাকে ঠকাবো না, তুমিও আমাকে ঠকাবে না জোহানা।

—আমি তোমাকে কখনো ঠকাবো না, পলুস।

—ভাল কথা ; তবে আমার ঘরে কিষাণের ছেইলাকে রাখতে সাধ করো না।

—কিন্তু তুমি যে আমাকে সকালে পলুস...তুমি যে বললে, আমার ছেইলা এখানে থাকবে! বিমূঢ়ের মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বিড়বিড় করে মুরলী।

খাওয়া থামিয়ে মুরলীর দিকে তাকিয়ে এইবার চেঁচিয়ে হেসে ওঠে পলুস—তোমাকে ঠকাই নাই জোহানা। একটুক মজা করে শুধু বুঝে নিলাম, তুমি আমাকে কেমনটি ঠকাও আর মনে মনে...।

—কি? মুরলীর কালো চোখের তারায় যেন জঙ্গলের আগুনের জ্বালা ঝিলিক দিয়ে ফুটে ওঠে।

পলুস বলে—তুমি তোমার ছেইলার বাপের কাছ থেকে সুখ নিতে চাও, আমার থেকে নিতে চাও না। তুমি তোমার ছেইলার বাপকে সুখ দিতে চাও, আমাকে দিতে চাও না।

নীরব হয়ে যায় মুরলী।

এক ঘটি জল ঢক ঢক করে খেয়ে আরও ভয়ানক একটা সন্দেহের ঢেঁকুর তোলে পলুস ঃ তুমি আমাকে ছুঁয়ে থেকেও মনে মনে তোমার ছেইলার বাপের মরদানি নিয়ে সুখ কর। তোমার গতর বড় চালাক বটে জোহানা। ও চালাকি এ ঘরে চালাতে চেয়েছ কি ঠকেছ! আমি হিসাব জানি। মধুকুপির একটা কিষাণীর চেয়েও ভাল হিসাব জানি। আমার নাম পলুস হালদার।

বিছানা থেকে নামে মুরলী। ঝকঝকে ও তকতকে এই ঘরের দরজার দিকে অপলক চোখ তুলে আর নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

জোরে একটা নিশ্বাস ছেড়ে নিয়ে ঘরের কোণের দিকে তাকায় মুরলী। চাটাইটা তুলে নিয়ে এসে মেঝের উপর পাতে। আর, বিষমাখা তীরের বিঁধ লাগা জানোয়ারের মত মুখ থুবড়ে গড়িয়ে পড়ে। ছোট একটা আর্তনাদও মুরলীর ঠোঁট কাঁপিয়ে শিউরে ওঠে ঃ হে কপালবাবা!

—খবরদার জোহানা। চেঁচিয়ে ওঠে পলুস ঃ এটা খিরিস্তানের ঘর বটে, এখানে জংলী ধরমের ডাক ডেকে পাপ করবে না, খবরদার।

না, আর কোন আর্তনাদ করে না মুরলী। ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে পলুসও বিছানার

উপর গড়িয়ে পড়ে।

হারানগঞ্জের ডাঙার ঝোপেঝাপে ঝিঁঝি ডাকে। বিছানার উপর শুয়ে বারবার চোখ চেপে ধরে পলুস ; ঘুমটা এসে এসেও যেন ঝিঁঝির ডাকের শব্দে চমকে ওঠে আর পালিয়ে যায়।

হায়, হায়, এ কেমন ঝিঁঝির ডাক! কুলডিহার ডাঙাতেও রাতের ঝিঁঝি এখন ডাকে নাকি? মাটি কেটে গঞ্জ থেকে গাঁয়ে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায় নাকি? সেই ঝিঁঝির গান শুনতে বড় ভাল লাগে যে!

হ্যাঁ বাবা বড়পাহাড়ী। বড় ভাল তোমার দয়া! তুমি আঁধার পথের সাদা ফ়ুল। পথ ঠাহর হয় ; পথ হাঁটতে কোন ডর নাই।

দূর দূর দূর, হেই হেই হা, দুর্‌র্‌! পাথরের উপর কোদাল ঠুকে চেঁচিয়ে উঠলেই ছটফট করে দৌড় দিয়ে পালিয়ে যায় পথের হুঁড়ার আর ভালুক।

তিতির মিতির ধিপাং ধিতির ; তিতির বোলে না গো! কেনে নয়ান ছিপে যাস গো! বাঁশি শুনে হাস গো! তিতির মিতির হা!

চেঁচিয়ে গান গেয়ে ঘরের দরজার কাঁচা বাঁশের ঝাঁপ ধরে একটা টান দিতেই ঘরের ভিতরের বাতিটা হেসে ওঠে। তার চেয়ে ভাল হাসি হাসে সকালী।

—এ কি সকালী? তুই এখনো ঘুমাস নাই কেন? এখনো খাস নাই বুঝি।

সকালী হাসে ঃ তুমি এসে খাওয়াবে, তবে তো খাব।

—ঘরে কিছু নাই বুঝি?

—না।

—নাই তো নাই, এইবার খেয়ে নে।

—কি?

—এই যে গঞ্জ থেকে নিয়ে এলাম ; মুড়ি আছে, গাজর আছে, নিমক আছে।

কোঁচড় থেকে ছোট সওদার সম্ভার একটা বাঁশের ডালাব উপর উপুড় করে ঢেলে দেয় পলুস। সকালী বলে—তুমি খেয়ে নাও।

—না, তুই আগে না খেলে আমি খেতে পারবো না।

—কেন গো?

ঘুমের মধ্যেই হঠাৎ ছটফট ক'রে হাত বাড়িয়ে কি-যেন ধরতে চেষ্টা করে আর ফুঁপিয়ে ওঠে পলুস।—হায় বাবা বড়পাহাড়ী!

মেঝের চাটাই-এর উপর ধড়ফড় করে উঠে বসে আর হেসে ওঠে মুরলী।—কি বটে পলুস?

—কি জোহানা?

—ছিয়া ছিয়া! কার নাম ধরলে?

—কার নাম?

আবার হেসে ওঠে মুরলী।—ঘুমাও পলুস। গড বাবা দয়া করেন, ভাল করে ঘুমিয়ে নাও।

—তুমি কি এখনও খাও নাই, জোহানা?

—না।

—খাবে না?

—না।

চুপ করে পলুস হালদার। আলো জ্বালতে ইচ্ছা করে। জোহানাকে হাত ধরে সেধে খাওয়াতে ইচ্ছা করে। কিন্তু রাতটা যেন একেবারে নীরব হয়ে গেল। ঝিঁঝির ডাক আর নেই।

পৈঁছা হাওয়াটা মেতে উঠলো বোধহয়। ডরানির স্রোতের ঝুরঝুর ঝরানির শব্দ ভেসে আসছে। ঘুমিয়ে পড়েছে মুরলী। কী আরামের ঘুম! মুরলীর নিশ্বাসের শব্দটা যেন আখড়ার

নাচুনি মেয়ের ক্লান্ত বুকের শব্দের মত তালে তালে দুলছে।

কি যেন বলছে জোহানা। পলুসের কান দুটো উৎসুক হয়ে ওঠে। ঘুমন্ত জোহানার নিশ্বাস যেন ফিসফিস করে থেমে-থেমে হেসে উঠছে।—ক্ষেতের মাটিতে...জাদু চালতে...হবেক কি?

আরও সতর্ক হয়ে আর নিশ্বাস বন্ধ করে একটা চোরা রহস্যের ভাষা ধরবার জন্য কান পেতে থাকে পলুস। হ্যাঁ, আবার ফিসফিস করে উঠেছে জোহানা ঃ তবে এসো সরদার...বড় ভাল আঁধার হয়েছে সরদার।

জোহানার স্বপ্নের প্রলাপ ; জোহানার প্রাণটা এখন ওর সেই জংলী স্বামীর হাত ধরে ভুঁইমানতের বীভৎস উৎসবের মধ্যে লুটিয়ে পড়ে উলঙ্গ মিলনের সুখ চাইছে। এমন জোহানাকে আর কতদিন সহ্য করা যাবে? জোহানাই বা এই ঘর কতদিন সহ্য করতে পারবে? ছেইলা নিয়ে আবার কিষাণের ঘরে পালিয়ে যাবে না কি?

মাথা টিপে, চোখ বন্ধ করে আর স্তব্ধ হয়ে বসে যেন এই সন্দেহের জ্বালাটাকে নিঝুম করে দিতে চেষ্টা করে পলুস। নিজেরই বুকের টিপ টিপ শব্দ শুনতে শুনতে আনমনা হয়ে যায়।

এখান থেকে অনেক দূরে, যেখানে ডরানির স্রোতের শব্দ নেই, কিন্তু ঘন মহুয়াবনের ঝড়ের শব্দ আছে, সেই কুলডিহার একটা কুঁড়ে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এক ঘটি জল চাইতে গিয়েও বুকটা টিপ টিপ করে!

—ঘরে আসে না, ঘরণীর লেগে মায়া নাই যার, ঘরণীর গতর ছুঁতে ঘিন্না করে যে, খিরিস্তান আবার ঘরের জল খেতে চায় কেন?

—দিবে না?

—না।

—তুমি খিরিস্তান হবে না?

—না।

—তবে মর।

—আমিও বড়পাহাড়ীর কাছে তোমার মরণ মানত করলাম। দেখে নিব আমি, তুমি কাকে নিয়ে কত সুখ সেধে ঘর কর।

কী ভয়ানক হিংস্র হয়ে সকালীর চোখ দুটো জ্বলছে! ভয় পেয়ে বিড়বিড় করে পলুস—এমন কথা বলতে নাই সকালী।

—বড়পাহাড়ীকে এত ডর কেনে গো খিরিস্তান? হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে হিংস্র হাসি হাসতে থাকে সকালী।

—না না না...। বিড়বিড় করে যেন একটা বোবা বেদনার পিণ্ড উগরে ফেলতে চেষ্টা করে পলুস।

—পলুস, ও পলুস! একটা ঘুম-ভাঙানো শব্দের আঘাত পেয়ে চমকে জেগে ওঠে পলুস।

মুরলী বলে—কিসের ডর পলুস? গোঙ্গার মত চেঁচিয়ে উঠলে কেন?

পলুস একটা স্বস্তির হাঁপ ছাড়ে ঃ না, কিছু না।

পেঁছা হাওয়া কি মরে গেল? রাত ভোর হতে আর কত বাকি? চুপ করে বিছানার উপর বসে আবার ঘুমন্ত মুরলীর নিশ্বাসের শব্দ শুনতে থাকে পলুস।

আবার চমকে ওঠে পলুস। সাবধানে কান পাতে।

—জোহানা! আস্তে আস্তে ডাকে পলুস।

বিড়বিড় করে মুরলী—নাও সিস্টার দিদি...আমার কলিজা নাও...ডাইনে নজর দিবে না তো...ঢের আদর হবে তো...তবে নাও...তোমাদিগের ধরম বড় ভাল বটে গো দিদি।

শান্ত হয়ে যায় পলুসের প্রাণের এতক্ষণের জ্বালা। না, চলে যাবে না জোহানা। চলে

যেতে কোন সাধ নেই জোহানার।

জানে না পলুস, কখন ভোর হল, পাখি ডাকল আর হারানগঞ্জের ডাঙার উপর ছকের ছবির মত ছড়ানো যত ঘরের লাল খাপরার চালার উপর কাঁচা রোদের আলো হেসে হেসে লাল হয়ে গেল। ঘুমিয়ে আছে পলুস। পলুসের স্বপ্নে আর কোন আর্তনাদ নেই। পলুসের বুকটা সব উদ্বেগ থেকে মুক্ত হয়ে নাকডাকা আরামের শব্দের সঙ্গে উঠছে আর নামছে।

কিন্তু মুরলী জানে, কখন কেমন করে হারানগঞ্জের কালো রাতের শেষ আঁধার আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে গেল, পাখি ডাকল আর পূবের আকাশটা লাল হয়ে হেসে উঠল। ভোর হবার আগেই মেঝের চাটাইয়ের উপরে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসেছে মুরলী, আর দু হাতে চোখ মুছে নিয়ে, ব্যস্তভাবে দরজা খুলে বাইরের বারান্দার উপর এসে দাঁড়িয়েছে। যেন মুরলীর স্বপ্নের মধ্যেই অনেকক্ষণ ধরে ভোরের আলো দেখবার জন্য একটা পিপাসা ছটফট করছিল।

ছোট্ট কালো কুকুরটা, রোঁয়ায় ভরা নরম তুলতুলে কুটু, একটা লাফ দিয়ে মুরলীর গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কুকুরটার নখের সঙ্গে মুরলীর শাড়ির আঁচলও জড়িয়ে যায়। আঁচলটাকে আস্তে আস্তে সেই আবদেরে নখরবন্ধন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কুকুরটাকে একটা ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দেয় মুরলী।

কিন্তু ভোরের আলোর আভা মুরলীর মুখের উপর যখন ছড়িয়ে পড়ে, ঠিক তখনই হেসে ওঠে না মুরলী। মুখ ঘুরিয়ে আর ঘুম-ভাঙা চোখের চাহনিটাকে বড় সড়কের আমের সারি ছাড়িয়ে আরও দূরে ছড়িয়ে দিয়ে যখন গির্জার চূড়াটাকে স্পষ্ট দেখতে পায় মুরলী, তখন মুরলীর কালো চোখের আঁধারের উপর যেন হঠাৎ ভোর হয়ে যায়, চোখের তারা দুটো খুশির ঝিলিক দিয়ে চমকে ওঠে, আর আভাময় মুখটা হেসে ঢলঢল করতে থাকে।

আজ রবিবার! আর কিছুক্ষণ পরেই গির্জার ঘণ্টার সেই ডিং ডাং শব্দের সুরেলা শিহর বাতাসে ভেসে ভেসে ডাঙার এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে যাবে। হারানগঞ্জের ভালমানুষেরা প্রেয়ার সাধবার জন্য দলে দলে চারদিকের যত সড়ক আর মেঠো পথের উপর দিয়ে গির্জাবাড়ির দিকে চলতে শুরু করবে।

আর দেরি করে না মুরলী। ইঁদারা থেকে জল তুলে নিয়ে এসে মুখ ধুয়ে আর চুল ভিজিয়ে নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ায়। পলুসই মুরলীর জন্য যে শাড়িটা কিনে এনে রেখেছে, সাদা গোলাপের কুঁড়ির মত দেখতে রেশমী বুটি বসানো লাল রঙের যে ফিনফিনে শাড়িটা, সেই শাড়ি গায়ে জড়ায়।

খোঁপা বাঁধতে গিয়ে সাদা সিঁথিটার দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে মুরলী। ভাল, খুব ভাল ; সিস্টার-দিদি বলেছে, সিঁথিটা এইরকমটি থাকবে ; রঙ দিবার দরকার নাই।

কিন্তু মেরিয়া যে বলেছে, সিঁথিতে রঙ নাই বা দাগলে জোহানা, কিন্তু তোমার যে নরম নরম ওঠ দুটা...।

মনে পড়তেই মুরলীর মুখের হাসি রঙিন হয়ে ওঠে। মুরলীর ঠোঁট দুটোকে লোভীর মত টিপে টিপে আদর করে মেরিয়া বলেছিল—এ দুটা রঙাতে হবে জোহানা।

—লাজ লাগে মেরিয়া।

—রাখ তোমার লাজ। ওঠ না রঙালে মরদে লুভাবে কেন?

মেরিয়ার সেই মিষ্টি হাসির ধমকটাও যেন কানে শুনতে পায় মুরলী, মনেও পড়ে যায় ; বিয়ের দিনে মেরিয়া যে জিনিসটা মুরলীকে উপহার দিয়েছে, সেটা মুরলীর তোরঙ্গের মধ্যেই আছে। ছোট একটা শিশি, তার মধ্যে গালার রসের মত নরম একটা জিনিস, ঠোঁট লালচে করার রঙ।

তোরঙ্গ থেকে শিশিটা বের করে নিয়ে হেসে হেসে দুই ঠোঁটের উপর একটা নতুন

আশার টকটকে লাল প্রলেপ ছড়াতে থাকে মুরলী।

—পলুস পলুস!

মুরলীর গলার স্বর সকালবেলার পাখির ডাকের মত একটা মিষ্টি কলরব হয়ে বেজে ওঠে। চমকে জেগে ওঠে পলুস।

ডিং ডাং, ডিং ডাং, গির্জার ঘণ্টার শব্দ ভেসে আসছে। চেঁচিয়ে হেসে ওঠে মুরলী—তুমি কেমন খিরিস্তান বটে গো!

—কি বটে? আশ্চর্য হয়ে মুরলীর রঙিন ঠোঁটের দিকে তাকায় আর চোখ ঘষে পলুস।

—আজ যে রবিবার বটে। গির্জা যেতে হবে না?

পলুসের চোখ যেন একটা অবুঝ বিস্ময় সহ্য করতে গিয়ে অপলক হয়ে তাকিয়ে থাকে। এ কোন্ জোহানা? রাতের বেলা যে জোহানার বুকের ভিতর থেকে ভয়ানক একটা নিঃশ্বাসের বেদনা ডুকরে উঠেছিল, ভুল করে কপালবাবার নাম হেঁকেছিল যে জোহানা, সেই জোহানা রাতের আঁধার মরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যেন নতুন করে বেঁচে উঠেছে। কী সুন্দর সেজেছে জোহানা। গির্জাতে গিয়ে প্রেয়ার সাধবার জন্য ছটফট করছে খিরিস্তানী জোহানার নতুন জীবনের বিশ্বাস।

হ্যাঁ, গির্জা যেতে হবে। পলুসের জীবনে গির্জা যাবার আনন্দটাও যে নতুন হয়ে দেখা দিল। আজ আর একা নয়, পরের সঙ্গেও নয় ; নিজের ঘরণী এই জোহানাকে সঙ্গে নিয়ে সকালবেলার আলোর ভিতর দিয়ে মেঠোপথ আর সড়ক ধরে ধরে গির্জাবাড়ির দিকে চলে যাবে পলুস। রাতটা যেন কতগুলি মিথ্যা ভয় সন্দেহ আর ঘৃণার উপদ্রব ঘটিয়ে পলুস আর জোহানার জীবনের মিল ছিন্নভিন্ন ক'রে দিয়ে একটা ভয়ানক ঠাট্টার খেলা খেলেছিল।

পলুস বলে—ভাবতে বড় দুঃখ লাগছে জোহানা...।

মুরলী—কি আবার ভাবতে লাগলে তুমি?

পলুস—ভাবছি, রাতের বেলাটা কেন তুমি ভুল কথা বলে আর ভুল রাগ রেগে, আমাকে দুখ দাও।

মুরলী হাসে ঃ আর ভুল হবে না। তুমি দেখে নিও।

পলুসও হাসে ঃ ঠিক বটে তো?

মুরলী—খুব ঠিক।

পলুস—কি ঠিক?

মুরলী—তুমি যেমনটি চাও।

পলুস—সেটা কি বটে, বুঝেছ কি?

মুরলী—তুমি তো বুঝিয়ে দিয়েছ।

পলুস—কি?

হেসে ফেলে মুরলী ঃ হিসাব করে দিব আর নিব।

চমকে ওঠে পলুস—হ্যাঁ...ঠিক...কিন্তু...।

মুরলী—নাও, আর দেরি করো না।

আর দেরি করে না পলুস। হাতমুখ ধুয়ে আর সাজ সেরে নিয়ে মুরলীকে ডাক দিতে গিয়েই বুঝতে পারে পলুস, মুরলী ঘরের ভিতরে নেই। ঘরের বাইরে এসে দেখতে পায় পলুস, মুরলী একেবারে সড়কের উপরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, আর দূরের গির্জাবাড়ির চূড়ার দিকে পিপাসিতের চোখের মত চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে।

—চল। পলুস কাছে এসে ডাক দিতেই যেন তরতর করে এগিয়ে যায় মুরলী।

পলুসের মুখের হাসি হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে যায়। সকালবেলার রোদে ঝাঁজ নেই, বাতাসটাও ঠাণ্ডা ; কিন্তু পথ হাঁটতে ক্লান্তি বোধ করে পলুস। গির্জা যাবার আনন্দটাই নেতিয়ে পড়তে

থাকে। কারণ, পলুসের পাশে পাশে নয়, পলুসের আগে আগে, যেন আবার একটা সাধের আবেগে একলা হয়ে হেঁটে চলেছে মুরলী।

পলুসের বুকের ভিতরে ছোট একটা অভিমানের নিশ্বাস হাঁসফাঁস করে। শুধাতে ইচ্ছে করে, আমিই যদি না দেখতে পেলাম, তবে কার লেগে ঠোঁট দুটা রঙালে জোহানা? আগে আগে চল কেন?

গির্জাবাড়ির ফটকের কাছে পৌঁছে যাবার পর আরও একবার আশ্চর্য হয় পলুস। জোহানা পিছুপানে একটিবারও তাকালো না। গির্জাঘরের ভিতরে উধাও হয়ে গেল।

প্রেয়ার শেষে ভাল মানুষেরা গির্জাঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আবার যে-যার ঘরের পথের দিকে যখন এগিয়ে যেতে থাকে, তখন পলুসও ভিড়ের ভিতর থেকে বের হয়ে মুরলীর আনমনা ও একলা চেহারাটার কাছে এগিয়ে এসে বলে—চল।

মুরলী বলে—একটুক থাম ; মেরিয়ার সাথে দুটা ভাল কথা না বলে চলে গেলে মেরিয়া রাগ করবে।

পলুস—মেরিয়া?

মুরলী—গির্জা-ঘরে আছে, এখনই আসবে। কিন্তু...।

পলুস—কি?

পলুসের মুখের দিকে তাকিয়ে মুরলী হাসে—মেরিয়ার সাথে আমার ভাল কথা হবে, তুমি হেথা থাক কেন?

গির্জাবাড়ির সামনে সড়কের উপরে একটা গাছের ছায়ায় যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল পলুস আর মুরলী, সেখান থেকে সরে গিয়ে একটু দূরে সড়কেরই পাশের ল্যাম্পের খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ায় পলুস ; আর মুরলীর দিকে তাকিয়ে সিগারেট ধরাতে গিয়ে হাসতে চেষ্টা করে। মুরলীও পলুসের দিকে তাকিয়ে আর মুখ টিপে হাসতে থাকে।

দেখতে পায় পলুস, জোহানার মুখটেপা হাসিটা হঠাৎ চমকে উঠল। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে গির্জাবাড়ির ফটকের দিকে তাকিয়ে কি-যেন দেখছে জোহানা। দেখতে দেখতে জোহানার চোখের তারা দুটো যেন দুরন্ত হয়ে কাঁপতে শুরু করেছে। জোহানার নরম ঠোঁটের লাল রঙের প্রলেপ যেন ভিজে গিয়ে চকচক করছে। কি দেখছে, কাকে দেখছে জোহানা? মেরিয়া আসছে কি?

মুখ ঘুরিয়ে গির্জাঘরের ফটকের দিকে তাকায় পলুস। দেখতে পায় পলুস, ফটকের দিক থেকে আস্তে আস্তে হেঁটে এদিকেই আসছে রিচার্ড সরকার। সাহেবী সাজে সাজা রিচার্ড সরকারের গলার টাই ফুরফুর করে উড়ছে। রোদ লেগে ঝকঝক করছে রিচার্ডের পায়ের জুতোর পালিশ।

সড়কের উপর উঠে গাছের ছায়ার কাছে এগিয়ে এসেই রিচার্ড সরকার আনমনার মত একবার থমকে দাঁড়ায়। মুরলীর মুখের দিকে তাকায়।

মাথা হেঁট করে মুরলী। ফিনফিনে শাড়ির আঁচলটা হাতে তুলে নিয়ে যেন সারা শরীরের একটা দুর্বহ অস্বস্তির শিহর ঢাকতে চেষ্টা করে।

চোখের চশমা খুলে হাতে তুলে নিয়ে রিচার্ড সরকারও যেন একটা চকিত বিস্ময়ের আবেগ সামলাবার জন্য চশমার কাচ মুছতে থাকে। মুরলীর সেই রঙিন ঠোঁটের শোভাটাকে যেন দেখবার চেষ্টা করছে রিচার্ড সরকারের চোখ। মুখ তোলে মুরলী ; রিচার্ড সরকারের দিকে তাকায়। ব্যস্তভাবে চলে যায় রিচার্ড সরকার।

দেখতে পায় পলুস, কবরথানের ফটকের কাছে এগিয়ে যেয়ে কাঠের গুমটির ভিতর থেকে সাইকেলটাকে বের করল রিচার্ড ডাক্তার ; আর সেদিকেই ছুটে চলে গেল, যেদিকে আর কিছুদূর এগিয়ে গেলে জেলাবোর্ডের সড়কটা পড়ে ; তারপর আর কতই বা দূরে রিচার্ড

ডাক্তারের সেই ফুলবাড়ির মত দেখতে সুন্দর বাড়িটা?

মুরলীও এইবার ব্যস্ত হয়ে ওঠে। তরতর করে হেঁটে পলুসের কাছে এগিয়ে এসে ডাক দেয় মুরলী—চল।

পলুসের চোখ দুটো কুঁচকে গিয়ে একটা বিস্ময়ের জ্বালা চাপতে চেষ্টা করে। পলুস বলে—দেখা হলো?

মুরলী—হ্যাঁ।

ভ্রূকুটি করে পলুস ঃ কার সাথে দেখা হলো?

চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী—না না, দেখা হয় নাই। কারও সাথে দেখা হয় নাই। মেরিয়া আসে নাই।

পলুস—সে তো দেখলাম। কিন্তু তুমি এখনই ঘরে যেতে চাও কেন?

মুরলী—হেথা আর থাকতে হবে কেন? কি দরকার?

পলুস—মেরিয়ার সাথে দুটা ভাল কথা বলবে কে?

হেসে ফেলে মুরলী ঃ হায় গড! ভুলে গেলাম কেন? আর একটুক থাক পলুস। আমি মেরিয়ার কাছে যাই। ওকে একবার শুধিয়ে আসি।

পলুস—কি শুধাবে।

ভ্রূকুটি করে মুরলী—তুমি কি দারোগা বট? মিছা এত কথা শুধাও কেন?

পলুস বলে—হোই দেখ, মেরিয়া তোমাকে খুঁজছে।

মুখ ফিরিয়ে গির্জাবাড়ির ফটকের দিকে তাকায় মুরলী। আর দেখতে পায়, সত্যিই মেরিয়া যেন রাগ ক'রে আর ব্যস্ত হয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাউকে খুঁজছে।

—মেরিয়া বহিন গো! হাত তুলে হাঁক দিয়ে মেরিয়ার কাছে যাবার জন্য যেন ছটফটিয়ে ওঠে মুরলী।

মুরলীর একটা হাত চেপে ধরে পলুস ঃ মেরিয়াকে কি শুধাতে চাও? পলুসের চোখের চাহনি মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে একটা ভয়ানক সন্দেহের জবাব খুঁজছে ; কাঁপছে চোখ দুটো।

দপ ক'রে জ্বলে ওঠে মুরলীর চোখ ঃ ছিয়া ছিয়া!

—কিসের ছিয়া! কাকে ছিয়া করছো তুমি?

মুরলী—ছিয়া করছি তোমাকে, খিরিস্তান হয়েও যে মানুষ গাঁওয়ার কিষাণের মত ঘরণীর মনকে...।

পলুস—কি?

মুরলী—বুঝতে পারে না।...এ কেমন হাত ধরার রীত?

পলুসের হাতের মুঠো থেকে হাত ছড়িয়ে নিয়ে মুরলী বলে—চল, ঘরে যাই।

পলুসের মুখের আর কোন কথা শোনবার জন্য এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে না মুরলী। সড়ক ধরে এগিয়ে যায়।

আগে আগে মুরলী ; পিছনে পলুস। যেন পলুসকে পিছনে ফেলে রেখে এগিয়ে যাবার জন্য মুরলীর প্রাণের অভিমানে একটা নতুন নেশার জ্বালা লেগেছে। গির্জাবাড়ি যাবার সময় মুরলীর প্রাণটা যে উৎসাহে হেসে হেসে পলুসের আগে আগে ছুটেছিল, ঘরে ফেরবার পথে সেই উৎসাহটাই যেন রাগ করে জ্বলছে।

—জোহানা! মুরলীর পিছু পিছু হনহন করে হাঁটতে হাঁটতে বার বার একটা চাপা আক্রোশের ডাক ডাকে পলুস। ঠাট্টার ভাষাও মাঝে মাঝে রাগী ধিক্কারের মত বেজে ওঠে—ঠোঁটের লাল কাকে দেখাতে চাও জোহানা? আগে আগে চল কেন?

কিন্তু মুখ ফিরিয়ে তাকায়ও না মুরলী ; মেরিয়ার উপহারের রঙ দিয়ে যে ঠোঁট রঙিন

করেছে মুরলী, সেই ঠোঁট যেন নতুন স্বাদে ভিজে গিয়েছে। একটা নতুন আশার ছোঁয়া হঠাৎ এসে মুরলীর ঠোঁট এঁটো করে দিয়েছে। পলুস হালদার ধমক দিলেই মুরলীর রঙিন ঠোঁটের এই স্বপ্নময় স্বাদ ঝরে পড়ে যাবে কেন?

ঘরে ফিরে এসেও যখন পলুসের সঙ্গে একটা কথাও বলতে ভুলে যায় মুরলী, তখন পলুস হালদার চুপ করে চারপায়ার উপর বসে থাকে। এই দিনের আলোতেও ভয়ানক একটা অন্ধকারের ঘোর দেখতে পাচ্ছে পলুস। জোহানার মাথার দোষে শুধু এই ঘরের রাতের জীবন নয়, দিনের জীবনও বিষিয়ে যাবে। আজ থেকে তারই শুরু দেখা দিল বোধহয়।

জোহানা কি রাঁধতে রাজি হবে? দরজার চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের রোদের দিকে তাকিয়ে যেন স্বপ্ন দেখছে জোহানা। এমন মানুষকে অনুরোধ করতেও যে ইচ্ছে হয় না। বরং মনে হয়, এই মুহূর্তে একটা লাফ দিয়ে উঠে, এই অলস অস্বস্তির ভার থেকে মনটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে, ওই উনান আর ওই সব থালা বাটি আর ডেকচি আছাড় দিয়ে গুঁড়ো করে দিতে পারলেই ভাল হতো।

পলুস ডাকে—জোহানা?

মুরলী—কি?

পলুস—আমাকে বলতে হবে, তুমি মেরিয়াকে কি শুধাতে চাও?

পলুসের কাছে এগিয়ে এসে শক্ত হয়ে দাঁড়ায় মুরলী ঃ শুধাতে চাই, ভাল লিখাপড়া শিখতে কতদিন লাগে?

পলুস —আর কি শুধাতে চাও?

মুরলী—লুসিয়া দিদি যে বাজনা বাজিয়ে ধরমের গান করে, সে বাজনা শিখতে কত দিন লাগে?

পলুসের গলার স্বর যেন একটা ক্ষীণ হাহাকারের মত বেজে ওঠে ঃ আর কি শুধাতে চাও?

মুরলীর নরম ঠোঁটও কুঁকড়ে কুটিল হয়ে অদ্ভুতভাবে হাসতে থাকে ঃ আর যদি কিছু মনে নেয় তো শুধাবো।

কী প্রচণ্ড সাধের কথা বলছে জোহানা! কত বড় স্বপ্নের কথা! কলঘরের বড় মিস্তিরীর ঘর এত বড় সাধ আর স্বপ্নের মানুষকে সুখ দিয়ে ধরে রাখবার জোর পাবে কোথায়? জোহানাকে যে সত্যিই অনেক দূরে এগিয়ে যাবার আর বড় হয়ে যাবার নেশায় পেয়েছে।

পলুস করুণভাবে হাসে—তোমার এত সব সাধ কি সত্যি সাধ বটে জোহানা?

মুরলী—সাধ না তো কি বটে?

পলুস—হিসাব বটে।

মুরলী ভ্রূকুটি করে ঃ হিসাব হবে কেন?

পলুস—হ্যাঁ জোহানা।

মুরলী—তাতে তুমি চোখ মুখ তিতা কর কেন? তুমিই বা কি কম হিসাব জান।

পলুস—আমি কবে হিসাব করলাম?

মুরলী—মনে নাই কি?

পলুস—না।

মুরলী—মধুকুপির কিষাণের ঘরের দরজার কাছে এসে জল চেয়েছিল কে?

চমকে ওঠে পলুস ঃ আমার পিয়াসকে হিসাব বলছো কেন?

মুরলী হেসে ফেলে ঃ তোমার পিয়াস লাগে নাই পলুস, তবু জল চেয়েছিলে। হাঁ কি না?

শুকনো, ভীরু ও বেদনার্ত একটা মুখ নিয়ে বিড়বিড় করে পলুস—হ্যাঁ।

কলকল করে হেসে ওঠে মুরলী—কিষাণের ঘরণীর মন নিবার মতলব করে বেশ তো হিসাব করতে পেরেছিলে।

পলুস—কিন্তু তুমি তো জল দিয়েছিলে।

মুরলী—কেন দিয়েছিলাম? জান না?

পলুস—না।

মুরলী—খিরিস্তান শিকারীকে মন দিবার সাধ হয়েছিল।

পলুস—তুমি হেসেছিলে যে, সেটাও কি...।

মুরলী—হ্যাঁ গো, মিছা কথা বলবো কেন, সেটাও হিসাব বটে।

মাথা হেঁট করে আর এক হাতে কপাল টিপে যেন মাথার ভিতরের একটা কামড়ের জ্বালা সহ্য করতে চেষ্টা করে পলুস। আস্তে আস্তে বলে—তুমি যে আজ এত ভাল সেজে নিয়ে গির্জা গেলে, সেটাও কি তোমার হিসাব?

—রাঁধতে হবে না বুঝি! ভ্রূভঙ্গী করে আর মিষ্টি ধমকের ঝংকার দিয়ে পলুস হালদারের প্রশ্নটাকে সরিয়ে দিয়ে উনানের কাছে এগিয়ে যায় মুরলী।

—গোবিন্দপুর বাজারে আবার যেতে হবে কিনা? আবার চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী।

—কেন?

—আরও দুটো সোনার মটরদানা আনতে হবে কিনা? না, জোহানাকে দিয়ে সস্তার দাসীর মত শুধু রাঁধিয়ে নিতে চাও? বলতে বলতে মুখ ফিরিয়ে পলুসের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে মুরলী।

সেই হাসি ; ঝকঝকে তকতকে ঠাণ্ডা হাসি। মুরলীর সেই হাসি সহ্য করতে গিয়ে বার বার ভয় পেয়ে শিউরে ওঠে পলুস হালদারের চোখ।

আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে পলুস। পলুসের এই ঘরের জীবনটাকে যেন হেসে হেসে জাগিয়ে রেখে, আর হেসে হেসে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে তর তর করে পার হয়ে যাচ্ছে দিনগুলি আর রাতগুলি। পুরো দুটো মাস পার হয়ে গেল, কিন্তু এই ঘরের ভিতরে আর কোন অভিমানের আর্তনাদ ফুঁপিয়ে ওঠে নি, কোন আক্ষেপ চিৎকার করে ওঠে নি, কোন আক্রোশ গর্জন করে ওঠে নি। পলুসের নিশ্বাসের সেই ভয়টাই যেন আশ্চর্য হয়ে মরে গিয়েছে।

কত শান্ত হয়ে গিয়েছে জোহানা। পলুসের সব ইচ্ছার শাসন একেবারে মাথা পেতে মেনে নিয়েছে। এই দু মাসের মধ্যে ভুলেও একটা রাগের কথা বলে নি। ঝড় থেমে যাবার পর জঙ্গলের চেহারা যেমন বড় বেশি শান্ত হয়ে যায়, জোহানার চেহারাও সেই রকমের শান্ত। নতুন জীবনের ঘরে ঠাঁই নিতে এসে ওর বুকের ভিতরে একটা ভয়ের ঝড় উতলা হয়ে উঠেছিল। সেই ঝড় সামলে নিয়েছে জোহানা। জোহানা এখন হাসে, সব সময় হাসে। আতঙ্কিত হবার, রাগ করবার এবং আপত্তি করবার একটা ছুতোও খুঁজে পায় না পলুস।

মনে পড়ে পলুসের, সেই যেদিন পলুসের সঙ্গে প্রথম গির্জায় গিয়ে প্রেয়ার সেধে ঘরে ফিরে এল জোহানা, সেদিন লোহার উনানে খাদের কয়লার আগুন ধরিয়ে ভাত ডাল আর বড়ির তরকারি রান্না করবার পর শুধু কিছুক্ষণ চুপ করে বসে ছিল। অদ্ভুত রকমের উদাস হয়ে গিয়েছিল জোহানার মুখটা। মেঝের উপর হাতের আঙুল বুলিয়ে হাবিজাবি দাগ এঁকে এঁকে কী যেন ভেবেছিল। ব্যস্, তারপর আর নয়, আর কোনদিন জোহানাকে মুখভার করে বসে থাকতে দেখে নি পলুস। মাঝে মাঝে আনমনার মত বসে থাকে বটে ; কিন্তু জোহানার এই আনমনা মুখটাও হাসতে থাকে।

এজরা ব্রাদার্সের কয়লাখাদের কলঘরের বড় মিস্তিরী পলুস হালদার রোজই সকালবেলা কাজে বের হবার জন্য যখন সাইকেলটার দিকে এগিয়ে যায়, তখন মুরলীও তার জীবনের

একটা সাধের কাজে বের হবার জন্য আয়নার কাছে এগিয়ে সাজ করে। ভোর হতেই ঘুম থেকে উঠে যেন একটা উৎসাহের নেশায় চঞ্চল হয়ে রান্না করে মুরলী। ছুটে ছুটে ছটফট করে কাজ করে।

পলুস একদিন বলেছিল—রাঁধাটা তো তুমি একাই করলে, খাওয়াটা দুজনে একসাথে হতে পারে কি?

মুরলী হাসে ঃ হলে ভাল হয়।

কোন আপত্তি করে নি মুরলী ; পলুসের সঙ্গে এক থালাতে ভাত খেয়ে পলুসের সাধের দাবিটাকে হাসিয়ে দিয়েছে। পলুসের বুকের ভিতরে যে আশা বিষণ্ণ হয়ে মুষড়ে পড়েছিল সেই আশা যেন নীরবে কলরব করে একটা কৃতজ্ঞতার প্রেয়ার সেধে ফেলে, এই তো, ঠিক সুখ দিলেক গড বাবা। জোহানাও ভুল কথা বলে নাই ; সুখ নিতে আর সুখ দিতে জানে জোহানা।

কয়লাখাদের কলঘরের বড় মিস্তিরী ভুবনপুরের দিকে চলে যায় ; আর মুরলী চলে যায় হারানগঞ্জের সড়ক আর মেঠো পথ ধরে সেই দিকে, যেদিকে কনভেন্টের বাড়িটা বুড়ো বুড়ো বটের প্রকাণ্ড একটা কুঞ্জের পাশে লালরঙা চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঐ কনভেন্ট বাড়ির কাছেই একটা বাড়ি, যেটা হল স্কুলবাড়ি। অনাথবাড়িটা আরও একটু দূরে ; এবং আরও কিছু দূরে আসাইলাম। শুনেছে মুরলী, আসাইলামের কুষ্ঠীরাও সিস্টার দিদির দয়ায় ওষুধ পায় আর ভাত পায়। সিস্টার দিদির উপদেশ মেনে নিয়ে যারা ঈশাই মানে আর প্রেয়ার সাধে, তাদের রোগের জ্বালাও দূর হয়ে যায়।

মুরলীকে হেঁটে হেঁটে স্কুলবাড়িতে যেতে হয়। হেঁটে হেঁটে ফিরে আসতে হয়। ভুবনপুরের সড়ক ধরবার আগে এক-একদিন হঠাৎ সাইকেল থেকে নেমে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে পলুস। মুখ তুলে যেন হারানগঞ্জের ডাঙার শোভা দেখবার জন্য পিপাসিতের মত তাকিয়ে থাকে। এক-একদিন দেখতেও পায়, হ্যাঁ, ওই তো মেঠোপথ ধরে তরতর করে হেঁটে কনভেন্ট বাড়ির দিকে চলে যাচ্ছে জোহানা। বেচারা জোহানা!

মুরলীর সাধের কাজে যাওয়া-আসার দরকারে পলুসের কাছে মুরলীর যে দাবী ছিল, সেই দাবী সহ্য করা পলুসের পক্ষে সম্ভব হয় নি। গরুর গাড়ির ভাড়া ; যেতে চার আনা আর আসতে চার আনা। তার মানে মাসে পনের টাকা। আশি টাকা মাইনে থেকে পনের টাকা শুধু এরকম একটা সাধের কাজে খরচ করিয়ে দেওয়া যে উচিত হয় না, সেটা বুঝেছে মুরলী। পলুসের আপত্তির কথা শুনে শুধু দু চোখ অপলক করে পলুসের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিল মুরলী, তার পরেই হেসে উঠেছিল। কাচের বাটির শব্দের মত ঝনঝনে ঠাণ্ডা হাসি।

—হাসলে কেন জোহানা?

—হাসালে হাসবো না কেন?

—কিসে হাসালাম?

—ঘরণীকে সুখ দিবার লেগে পনেরটা টাকা হয় না কেন?

পলুসের চোখ যেন হঠাৎ একটা খোঁচা খেয়ে চমকে ওঠে, গলার স্বরও ভীরু হয়ে যায় ঃ তা তুমি কি বুঝতে পার না?

—খুব বুঝি। হেসে ওঠে মুরলী।

—তবে আর রাগ কর কেন?

—হেই নাও! রাগ করব কেন? গো-গাড়ি না হবে তো না হবে ; আমি পায়ে হেঁটে ইস্কুলে যাব।

সত্যিই তো, একটুও রাগ করে না জোহানা। স্বামীর জীবনের একটা অক্ষম অঙ্গীকারের মুখরতাকে কত সহজে ক্ষমা করে দিয়ে হেসে উঠেছে। কিন্তু আর একটা অঙ্গীকার ; সেই

অঙ্গীকারও এখনও পালন করতে পারে নি পলুস।

হেসে হেসে একদিন প্রশ্ন করে মুরলী—কই? বলেছিলে যে আরও দুটো সোনার মটরদানা দিবে, সে জিনিস আজও আনলে না কেন?

চমকে ওঠে পলুস ঃ আর টাকা নাই। বকশিশগুলো পেতে দাও, তারপর...।

—কিসের বকশিশ?

--বাঘিনীটাকে মেরেছি ; রেল কোম্পানি আর খাদের সাহেব যে বকশিশ দিবে, সেটা পেয়ে নিই, তারপর...।

--দেখ, রেল কোম্পানি আর খাদের সাহেবের দয়াতে যদি ঘরণীকে খুশী করতে পার।

মুরলীর মুখে হাসিটাকে সন্দেহ করতে চেষ্টা করেছে পলুস। মনে হয়েছে, জোহানার মনের একটা ভয়ানক ঠাট্টা কাচের বাটির মত ঝনঝন করে হাসছে। কিন্তু মুরলীই সেই মুহূর্তে পলুসের মনের এই সন্দেহের চেষ্টাটাকেও লজ্জা দিয়ে হাসিয়ে দিয়েছে ঃ দুটা সোনার মটরদানা না পেলে জোহানা মরে যাবে না।

রবিবার গির্জা যাবার আনন্দটাও আর ব্যথিত হয় না। পলুসের ইচ্ছার শাসন মেনে নিয়েছে মুরলী।

পলুস বলেছে—তুমি যদি আমার সাথে সাথে হেঁটে গির্জা যাও, তবে চল। না হয় তো, তুমি যাও, আমি যাব না।

পলুসের কথা শুনেছে, পলুসের মুখের দিকে তাকিয়ে আর ভ্রূকুটি করে নি মুরলী। শুধু কিছুক্ষণ চুপ করে চোখ বড় করে তাকিয়েছিল, আর, তার পরেই হেসে ফেলেছিল ঃ তোমার সাথে সাথে যাব।

পলুস—আমার সাথে যাবে, আমার সাথে আসবে। পথের উপর মিছা থামাথামি করবে না।

মুরলী—হ্যাঁ গো ; তোমার সাথে যাবে আর আসবে তোমার ঘরণী। পথের উপরে থামবে না, আর ডাঙার ঘাসটার দিকেও তাকাবে না।

এর মধ্যে অনেকগুলি রবিবারে গির্জাতে যাবার দরকারও হয়েছে। পলুসের মনও একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছে। না, জোহানার মাথায় দোষ আর ক্ষেপে ওঠে না। ঘরণী যেমনটি করে, ঠিক তেমনটি পলুসের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে গির্জাতে যায় জোহানা। আর কেমন ভালটি হয়ে, পলুসেরই পাশে থেকে, এদিক-ওদিক কোন দিকে নজর না তুলে প্রেয়ার সাধে ; আর পলুসেরই সাথে একটানা হেঁটে ঘরে ফিরে আসে।

হ্যাঁ, একটা রবিবারে ঘরে ফেরার সময় পলুসের মন আবার চমকে ওঠে, কারণ, পথের পাশে সাইকেল হাতে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে ডাক্তার রিচার্ড সরকার। কত বড় চোখ করে জোহানাকে দেখছে ডাগদরটা! কিন্তু...না...জোহানা ওর পানে একটিবারও নজর করলে না।

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে রিচার্ড ডাক্তারের ছায়া মাড়িয়ে, পলুসেরই সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঘরে ফিরে আসে মুরলী। পলুস হালদারের মাথার ভিতর থেকে যেন একটা দুঃস্বপ্নের যন্ত্রণার ঘোর কেটে যায়। ইস্কুলে যায়, সিস্টার দিদির কাছে লেখা-পড়া শেখে ; আর মেরিয়ার কাছে নিশ্চয় গানও শেখে জোহানা। না না, হিসাব নয়, জোহানার এসব সাধ ভাল সাধ বটে।

মাঝপথে সাইকেল থামিয়ে পলুসের আর ভাবনা করবার দরকার হয় না। ভাবনা করবার ইচ্ছা হয় না। ভাবনা করা উচিত নয়। পলুসের মুখটাও প্রসন্ন হয়ে হেসে ওঠে। আর, সেই মুহূর্তে একলাফ দিয়ে সাইকেলে উঠে ভুবনপুর সড়কের দিকে উধাও হয়ে যায় পলুস।

কয়লা-খাদের কলঘর থেকে কাজের ছুটির পর, সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে উঠবার আগেই পলুস হালদারের সাইকেল উদ্দাম হয়ে হারানগঞ্জের দিকে ছুটতে থাকে। পড়ন্ত রোদের রঙে

লাল হয়ে গিয়েছে গির্জাবাড়ির চূড়া। ঘরে ফিরতেও আনন্দ আছে। কারণ ঘরে ফিরেই দেখতে পাবে পলুস, জোহানা আগেই ঘরে ফিরে এসে উনানের উপর ভাতের হাঁড়ি চাপিয়ে দিয়েছে ; আর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলের ফিতা হাতে নিয়ে গুনগুন করে গান গাইছে। বেশ সুন্দর কথা আর সুন্দর সুরের গান।—দেখ মরিয়ম কাঁদে যীশুর কবরে।

কত তাড়াতাড়ি ভাল গান শিখে ফেলেছে জোহানা। তাড়াতাড়ি ভাল লিখাপড়াও শিখে ফেলেছে কি? হ্যাঁ, আজই পথে দেখা হতে সিস্টার দিদি হেসে হেসে বলেছে--জোহানা বহিন এইবার তোমাকে আশ্চর্য করে দিবে পলুস।

—কেন দিদি?

—আর একটা মাস সবুর কর, তারপর বুঝবে!

—কি বুঝতে হবে দিদি?

—তুমি কি দুটা দিন হারানগঞ্জের বাইরে গিয়ে থাকবে না?

—হ্যাঁ, থাকতে হবে দিদি ; মাস পুরা হলে, বন্দুকের লাইসেনে সহি নিতে গোবিন্দপুরে গিয়ে তিন-চারটা দিন থাকতে হবে।

ঝিক করে হেসে ওঠে সিস্টার দিদির নীল চোখ ঃ বেশ তো, কোন চিন্তা নাই। জোহানা বহিন তোমাকে চিঠি লিখবে।...এখন বুঝেছ পলুস?

ভাল কথা। কী সুন্দর আশ্বাসের কথা বলে আর হাসতে হাসতে চলে গেলেন সিস্টার দিদি।

রাতের রান্না আর খাওয়ার পালা শেষ হয়ে যাবার পর যখন ঘরের মেঝের উপর চাটাই পেতে, কেরোসিন তেলের ল্যাম্পের কাছে বই সেলেট আর খাতা ছড়িয়ে দিয়ে পড়তে বসে মুরলী, তখন চারপায়ার উপর বসে পলুস হালদার মুরলীরই কালো চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হেসে ফেলে। সুখের হাসি, তৃপ্তির হাসি, আর, একটু গর্বের হাসিও বটে। পলুস হালদারকে চিঠি লিখে ধন্য হবার জন্য যেন একটা মানত করেছে জোহানা। তাই লেখাপড়া শিখছে। পলুসও তো কিছু লেখাপড়া জানে। জোহানার চিঠির সব ভাল কথা পড়ে ফেলতে পারবে পলুস।

—জোহানা! ডাক দেয় পলুস।

পড়ার বইয়ের দিকে চোখ রেখে উত্তর দেয় মুরলী—কি?

পলুস হাসে ঃ চিঠিতে কি কথা লিখবে জোহানা?

চমকে উঠে মুরলী মুখ তুলে তাকায়। মুরলীর কালো চোখের তারা থরথর করে কেঁপে ওঠে—কিসের চিঠি?

পলুস—যে চিঠিটা তুমি লিখতে চাও।

মুরলী—কাকে চিঠি লিখবো? কি ভাবলে তুমি?

পলুস—আমাকে যে চিঠিটা লিখবে, যখন আমি গোবিন্দপুরে গিয়ে তিনটা দিন থাকবো।

একটা হাঁপ ছেড়ে নিয়ে হেসে ওঠে মুরলী ঃ এই কথাটি বল না কেন? আমার চিঠি পেতে তোমার সাধ হয়েছে।

—আমার সাধ হবে না তো কার সাধ হবে?

—ভাল সাধ হয়েছে তোমার!

চমকে ওঠে পলুস ; চোখের দৃষ্টিও যেন হঠাৎ আঘাতে বিমূঢ় হয়ে ফ্যালফ্যাল করতে থাকে। পলুসের প্রাণের এত বড় একটা বিশ্বাসকে ঠাট্টা করে হেসে উঠেছে জোহানা। পলুসের মুখটা ব্যথিতভাবে বিড়বিড় করে—থাম জোহানা। তোমার এত হাসি আমার ভাল লাগে না।

মুরলী—আমাকে কি তুমি হাসতেও দিবে না? তবে তোমার ঘরে এলাম কেন?

একটু ব্যথিত না হয়ে, কোন অভিমানে, একটুও বিষণ্ণ না হয়ে, এই অভিযোগের কথাগুলিকেও হেসে হেসে ছড়াতে থাকে মুরলী।

কী যেন বলতে চেষ্টা করে পলুস। কিন্তু বলতে পারে না। চারপায়ার উপর চুপ করে বসে সুখী জোহানার বেদনাহীন প্রাণের একটা শব্দ শুনছে পলুস, কিন্তু শুনে সুখী হতে পারছে না। যেন একটা ফাঁকা প্রতিধ্বনি এই ঘরের ভিতরে হেসে হেসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর চেয়ে ভাল ছিল, জোহানা যদি একটু ঝগড়া করত, ভ্রূকুটি করে তাকাত, আর কেঁদে ফেলত।

বই পড়া শেষ না হতেই যখন হঠাৎ চমকে উঠে বুঝতে পারে মুরলী, হাত ধরেছে পলুস, তখন বই বন্ধ করে হেসে ওঠে মুরলী। পলুসের সেই ইচ্ছার কাছে সেই মুহূর্তে শরীরটাকে এগিয়ে দেয়। কয়লা-খাদের বয়লটের কলকব্জাও মাঝে মাঝে ভুল করে। কিন্তু পলুসের ঘরণী জোহানা যেন কলের চেয়েও নিখুঁত। কোনও ভুল করে না।

কী আশ্চর্য, পলুস হালদারের কাছে জোহানার এই অবাধ বাধ্যতাই যেন বিস্বাদ হয়ে একটা চরম অতৃপ্তির জ্বালা হয়ে উঠেছে! পলুসের ইচ্ছার নিশ্বাস যতই তপ্ত হয়ে উঠুক, সে নিশ্বাসের তপ্ততা মুরলীর মুখের উপর যতই নিবিড় হয়ে লুটিয়ে পড়ুক, মুরলীর ঠাণ্ডা মুখটা কিন্তু ঠাণ্ডা হাসির কলের মত শুধু হাসতে থাকে। সেই হাসি সহ্য করতে না পেরে পলুসের শরীরের রক্ত যেন তেতো হয়ে যায়।

আরও কতদিন পার হয়ে গেল। ডরানির স্রোতের শুরু যেখানে, সেখানে শালবনের মাথার উপর দিয়ে নতুন মাসের পাতা-ঝরানো ঠাণ্ডা হাওয়া দিনের বেলায় হুটোপুটি করে আর রাতের বেলায় কুয়াশায় ভিজে গিয়ে চুপ করে থাকে। আর, মুরলীর মুখের হাসিটাকে যেন ভয় করে করেই পলুস হালদারের প্রতিদিনের প্রাণটা হাঁপাতে থাকে। ভাল লাগে না ; দুঃসহ বোধ হয়। সব চেয়ে দুঃসহ মনে হয় তখন, মুরলীর মুখটা পলুসের বুকের একটা দুরন্ত ইচ্ছার কাছে এসেও যখন হাসতে থাকে।

সে রাতে হারানগঞ্জের আকাশে চাঁদ ছিল। আর খোলা জানালা দিয়ে ঘরের বিছানার উপর চাঁদের আলো ছড়িয়েও পড়েছিল। মুরলীর চোখের উপরে অনেকক্ষণ ধরে পলুসের যে চোখের চাহনি উপুড় হয়ে পড়েছিল, সেই চোখই হঠাৎ একটা দুঃসহ ক্ষোভের জ্বালায় জ্বলে ওঠে! ফুঁসে ওঠে পলুসের গলার স্বর ঃ তুমি হাস কেন জোহানা? এখন কি হাসতে হয়? কোন মেয়েমানুষে কি এখন হাসে? মরদের মান নাশ কর কেন জোহানা?

মুরলী হাসে ঃ হাসি লাগে, তাই হাসি।

সর্বনাশ! ওই ঠাণ্ডা হাসি কী ভয়ানক একটা শীতলতার অভিশাপ! মুরলীর এই শান্ত ও ঠাণ্ডা হাসির অভিশাপ থেকে বাঁচবার জন্য পলুসের নিশ্বাসের আশা একটা নিবিড়-বিহ্বল মুখের ছবিকে কল্পনায় টেনে এনে বুকের কাছে ধরে রাখে। যেন রাগ করে ফুঁপিয়ে রয়েছে সেই ছবির ঠোঁট দুটো, ব্যথার সুখে ভুরু দুটো কুঁচকে রয়েছে, পলুসের ইচ্ছার সব ব্যাকুলতা বরণ করবার জন্য কী সুন্দর গম্ভীর হয়ে রয়েছে সেই মুখ।

পলুসের বুকের কাছ থেকে যখন ছাড়া পেয়ে বিছানার এক পাশে সরে যায় মুরলী তখন মুরলীর সেই নীরব ঠাণ্ডা হাসিটা যেন একটা ধূর্ত ঝনঝনে আওয়াজ করে বেজে ওঠে।

—কি হলো? বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করে পলুস।

মুরলী হাসে ঃ চোখ মুদে নিয়ে কাকে ভাবলে গো?

—কি? চেঁচিয়ে ওঠে পলুস।

মুরলী হাসতে হাসতে মুখ ফিরিয়ে নেয় ঃ সকালীকে ভাবলে কি?

চমকে ওঠে, মাথা হেঁট করে, ভীরু বোবার মত তাকিয়ে থাকে পলুস। কী ভয়ানক

জোহানার সন্দেহ, আর কী ভয়ানক সত্য এই সন্দেহ! পলুস হালদারের বুকের ভিতরে লুকানো অপরাধটা কত সহজে জোহানার চোখে ধরা পড়ে গেল।

--জোহানা! জোহানা! আতঙ্কিতের মত বার বার ডাকতে থাকে পলুস।

মুরলী বলে--আমি একটুও রাগ করি নাই। তুমি ঘুমাও।

--না ঘুমাব না ; আমি জবাব নিয়ে ছাড়ব। বলতে বলতে যেন আগুনে পোড়া প্রাণীর মত ছটফট করে মুরলীর একটা হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে পলুস।

--হাত ছাড়। আমি রাগ করি নাই, তুমি রাগ কর কেন? বলতে বলতে মুরলীর শয়ান চেহারাটা হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে বিছানার উপর উঠে বসে।

পলুস--তুমি আমাকে হেসে হেসে ঠকাবে কেন? এত বড় ঠগিন তুমি হবে কেন?

মুরলীর চোখ দুটো জ্বলে ওঠে : কাকে ঠগিন বলছো তুমি?

--তোমাকে।

--কে আমাকে ঠগিন করলে?

--কি বললে? জোহানার হাতটাকে পিষে দেবার জন্য পলুস হালদারের হাতের কব্জির হাড় কড়মড় করে বেজে ওঠে।

চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী--হাত ভেঙে দিলেও আমি কাঁদবো না পলুস। আমি হাসবো। হেসে হেসে সিস্টার দিদিকে বলবো, এই দেখ দিদি, তোমার আদরের খিরিস্তান, তোমার পলুস ভাই আমার হাত ভেঙে দিলে।

মুরলীর হাত ছেড়ে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে পলুস।

নীরব ও স্তব্ধ পলুস হালদারের এই চেহারা যেন একটা জব্দ হিংস্রতার চেহারা। মুরলীর মুখের দিকে অপলক হয়ে তাকিয়ে থাকে আর কটমট করে পলুস হালদারের যে চোখ দুটো, সেই চোখ দুটোও যেন এক জোড়া অসহায় ও অক্ষম আক্রোশের চোখ। আর, মুরলী যেন পরম নিশ্চিন্ততার সুখে, দুর্ভাবনাহীন একটা আমোদের আবেশে পলুস হালদারের সেই কটমটে চোখের করুণতার দিকে তাকিয়ে আছে। মুরলীর মনে কোন আতঙ্ক নেই ; মুরলীর চেহারা স্তব্ধ হয়ে যায় নি। বেশ সুন্দর ছটফট করে দু হাত চালিয়ে ভাঙা খোঁপাটাকে পরিপাটি করে বাঁধতে থাকে আর হাসতে থাকে মুরলী।

অনেকদিন আগে, কয়লা-খাদের কলঘরে রাতের ডিউটি সেরে ভোরবেলায় হারানগঞ্জের ফেরবার সময় ভুবনপুর সড়কের ধারে পিয়াশালের ছোট্ট জঙ্গলটার দিকে তাকাতেই একটা মজার দৃশ্য দেখতে পেয়েছিল পলুস হালদার। একটা গো-বাঘা হুঁড়ার সেদিন দুটো গাছের মাঝখানের ফাঁকের মধ্যে আটকে গিয়েছিল, আর মরা পিয়াশালের প্রকাণ্ড একটা ডাল হুঁড়ারের কোমরটাকে চাপা দিয়ে পড়েছিল। হুঁড়ারটা সেই চাপা পড়া কোমর নিয়ে একেবারে অনড় হয়ে শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছিল, এক পাও এগিয়ে যাবার সাধ্যি ছিল না। হুঁড়ারটার চোখের সামনে, ওর সেই হিংস্র মুখের কাছ থেকে মাত্র তিন হাত দূরে একটা খরগোশ একেবারে নিশ্চিন্ত মনের আরামে দূর্বা ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিল। হুঁড়ারটার সেই জব্দ মুখের দিকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে খরগোশের লাল চোখ দুটোতে যেন একটা ধূর্ত আনন্দের হাসি টলমল করছিল।

মুরলীর মুখটাও ঠিক সেইরকম ধূর্ত আনন্দের হাসি হাসছে। চুপ করে বসে দেখতে থাকে পলুস ; ঘর থেকে বের হয়ে ইঁদারার দিকে চলে গেল মুরলী ; মুখ ধুয়ে আর জল নিয়ে ফিরে এল। দেয়ালের তাকের উপর থেকে থালা ডিশ আর বাটি নামাল। থালা ভরে ভাত, বাটি ভরে ডাল আর ডিশ ভরে শাক-মাংস নিয়ে মেঝের উপর বসে পড়ল মুরলী।

মটর শাক আর সরষের শাক দিয়ে হরিয়াল ঘুঘুর মাংস রান্না করেছে মুরলী। আজই সকালে একটা মান্‌ঝি ছোঁড়ার কাছ থেকে চার আনা দিয়ে ঘুঘুটা কিনেছিল পলুস। পলুসই

মুরলীকে বলে গিয়েছিল—ইস্কুলবাড়ি থেকে আজ ফিরবে যখন, তখন বুড়া জুলিয়াসের ঘরে যেয়ে ওর ক্ষেতের মটর শাক আর সরষের শাক কিনে নিয়ে এসো জোহানা। এক আনাতে ঢের শাক হবে। ঘুঘুটার হাড়মাস ভাল করে ছেঁচে নিবে ; নিমক ঝাল বেশি দিবে না। শাক-মাস সিঝে যাবার পর কাঁচা পেঁয়াজের কুচা ঢেলে দিবে।

যা বলে রেখেছিল পলুস, তাই করেছে মুরলী। শাক-মাসের যেমনটি স্বাদ চেয়েছিল পলুস, ঠিক তেমনটিই স্বাদ ধরেছে গরম-গরম শাক মাস। চুপ করে বসে দেখতে থাকে পলুস, পিয়াশালের জঙ্গলের সেই খরগোশটার মত নিরাতঙ্ক মনের একটা সুখের ঝোঁকে পেটভরে ভাত ডাল আর শাক-মাস খেয়ে নিল মুরলী। পলুসের উপর অভিমান করে উপোসী থাকবে আর পেটের ক্ষুধাটাকে দুখাবে, এই জোহানা সেই জোহানা নয়। গতরের উপর বড় দরদ জোহানার। পেটটার উপর বড় মায়া। পেটের ভিতরের একটা মায়াকে বড় যত্ন করে খাইয়ে বাঁচিয়ে আর পুষে রাখছে জোহানা।

মুরলীর নামে যদি পাল্টা একটা অভিযোগ করে সিস্টার দিদির কাছে বলতে পারা যেত—জোহানা আমার ঘরের সুখ নাশ করছে দিদি, তবে কি একটা বিচার করত না, আর মুরলীকে একটা ধমক দিয়ে সাবধান করে দিত না সিস্টার দিদি? কিন্তু...ভাবতে গিয়ে ভয় পায় পলুস হালদার, মুরলীর নামে কি অভিযোগ করবে পলুস? মুরলী শুধু হাসে, এই অভিযোগের কথা শুনলে সিস্টার দিদি যে নিজেই হেসে ফেলবে, আর পলুসকেই ধমক দিয়ে সাবধান করে দেবে ঃ তোমার কি মাথা খারাপ হলো পলুস ; বেচারা জোহানা যে এত হাসে, সে তো সুখের কথা বটে।

আর, মুরলী যদি ঐ ভয়ানক ঠাণ্ডা হাসির নেশায় খিলখিল করে হেসে সিস্টার দিদির কাছে পলুসেরই বুকের ভিতরের একটা গোপন অপরাধের কথা শুনিয়ে দেয়, তবে? সিস্টার দিদির নীল চোখ দপ্ করে আগুন হয়ে জ্বলে উঠবে। কেন পলুস? খিরিস্তান হয়েও তোমার মনে আজও জংলী পাপ লুকিয়ে থাকে কেন? জোহানার স্বামী হয়েও তুমি মনে মনে এখনও সকালীর মুখটাকে ভাব কেন? ছিঃ পলুস, ছিঃ!

না, উপায় নেই, সিস্টার দিদির কাছে পাল্টা অভিযোগ করবার কিছু নেই। বরং মুরলীই অভিযোগ করতে পারে—দেখ দিদি, আমি তোমার পলুস ভাইয়ের সব কথা আর সব ইচ্ছা মেনে চলি, দাসীর মত খাটি আর ভালমানুষের মত হাসি ; আমি কোন্ দোষ করলাম দিদি?

কল্পনায় দেখতে পায় পলুস আর চোখ দুটো ভয় পেয়ে কেঁপে ওঠে। জোহানার মাথাটাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে আদর করছে সিস্টার দিদি, আর পলুসের দিকে ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে সাবধান করে দিচ্ছে—আমার জোহানা বহিনকে দুখ দিলে তোমার ভাল হবে না পলুস। মনে রেখো, আমি তোমাকে কয়লা খাদের কলঘরে চাকরি পাইয়ে দিয়েছি।

মেঝের উপর আর চাটাই পাতে না মুরলী। আবার খোঁপা ভেঙে চুল এলো করে দিয়ে বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ে। ঘরণী যেমনটি করে, ঠিক তেমনটি ; মুরলীর আচরণে কোন ভুল নেই, কোন খুঁত নেই। শুনলে সিস্টার দিদি যে আশ্চর্য হয়ে উঠবে, জোহানা বহিন কোন দোষ করে না, এটা কি দোষ বটে পলুস? তোমার বুদ্ধি কি খারাপ হয়ে গেল পলুস?

কিন্তু পলুসের স্তব্ধ শরীরটা মাঝে মাঝে কাঁপে, আর বুকের ভিতরে একটা বিমূঢ় বেদনা থেকে থেকে গুমরে ওঠে।—তুমি বিশ্বাস কর দিদি, তোমার জোহানা বহিনই ঠাণ্ডা হাসি হেসে আমার কলিজার সব জোর খারাপ করে দিচ্ছে। জোহানার গতর বড় ঠগ গতর। কত ঠাণ্ডা ওর শ্বাস, কত শক্ত ওর ঠোঁট দুটা। জোহানার চোখ দুটা এত হাসে বলেই যে আমার মন দুখায়, আর জংলী সকালীর চোখ দুটা মনে পড়ে যায়। আমাকে যে পাপী করে দিলে তোমারই জোহানা বহিনের হাসিটা।

ঘুমিয়ে পড়েছে মুরলী। চুপ করে বসে মুরলীর মুখের দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকে

পলুস। মুরলীর শিথিল শাড়িটাও যেন ঘুমের ঘোরে এলিয়ে পড়ে আছে। হ্যাঁ, কি ভয়ানক ঠগ গতর, কত স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মুরলীর সরু কোমরের খাঁজ নতুন রক্তমাংসের আহ্লাদে ভরাট হয়ে গিয়েছে।

জ্বলতে থাকে পলুসের নিশ্বাসের বাতাস। এতদিনে একটা ভয়ানক বেহায়া রহস্যের অর্থ বুঝতে পেরেছে পলুস হালদার। যে মানুষের হাতটাকে পিষে দেবার জন্য কড়কড় করে বেজে ওঠে পলুসের কব্জির হাড়, সেই মানুষ তবুও কেন এই ঘরের দরজার কপাট আর ঘর ছেড়ে চলে যায় না? সে মানুষ হেসে ওঠে কেন? পলুসের এই ঘরের সব শাসন এত সহজে মাথা পেতে নিয়ে এত শান্ত হয়ে থাকে কেন সেই মানুষ?

কি ভেবেছে জোহানা? অনাথবাড়িতে না গিয়ে ওর পেটের ছেইলাকে এই ঘরের ভিতরেই রাখতে আর বুকে জড়িয়ে ধরতে পারবে বলে ভরসা করছে? তাই কি এই ঘরের হুকুমের প্রতি এত বাধ্যতা? তাই কি ভুলেও একবার অনাথবাড়ি যাবার নাম করে না?

মুরলীর পেটের দিকে তাকিয়ে পলুস হালদারের চোখ দুটোও হিংস্র হয়ে উঠতে থাকে। বিষ আছে জোহানার পেটে। ওই বিষ আছে বলেই জোহানার গতরটা এমন ঠগ হয়েছে। তাই পলুসের ছোঁয়াকে একটা অসার কৌতুকের ছোঁয়া বলে মনে করে জোহানা, আর মুখ টিপে ঠাণ্ডা হাসি হাসে।

জোহানার এই শরীরকে পলুসের স্পর্শ না করাই উচিত ছিল। এই ঘরটাও বোধহয় পলুসের বৃথা উল্লাসের রকম-সকম দেখে মুখ টিপে হেসেছে, আর ঠাট্টা করেছে। এমন জোহানাকে ছুঁয়ে লাভ কি পলুস? এমন জোহানার গতর বুকের কাছে টেনে নিয়ে যতই আদর কর না কেন, তাতে তোমার ছেইলা তো আসবে না পলুস। যে আসবে, সে হলো একটা কিষাণের ছেইলা।

প্রহরের পর প্রহর রাতের আঁধার পান করে যেন নেশা করেছে হারানগঞ্জের ডাঙার যত ঝোপঝাপের ঝিঁঝি। বাতাস উতলা হলেও ঝিঁঝির স্বর নেতিয়ে পড়েছে। পলুস ডাকে—জোহানা!

ধড়ফড় করে উঠে বসে মুরলী ঃ কি? সকাল হয়েছে কি?

পলুস—সকাল হবে এখনই।

মুরলী—বেশ তো।

পলুস—না, বেশ নয়। তুমি আজ আর ইস্কুলবাড়ি যাবে না।

মুরলী আশ্চর্য হয়ে তাকায় ঃ কেন?

পলুস—তুমি আজ অনাথবাড়ির হাসপাতালে যাবে।

মুরলীর কালো চোখের তারা দুটো জ্বলে জ্বলে হাসতে থাকে ঃ এত তাড়াতাড়ি কর কেন পলুস? মেরিয়া বলেছে, আর এক মাস পরে...।

পলুস—না, আজ তোমাকে যেতে হবে।

—কেন?

—তোমার মতলব ভাল নয়।

—কিসে বুঝলে?

—আমি সব বুঝি জোহানা। চিৎকার করে ওঠে পলুস ঃ তুমি আমার এই ঘর থেকেই তোমার পেটের বিষ খালাস করতে চাও।

—বিষ?

—হ্যাঁ বিষ বটে। তুমি ভেবেছ, দিনগুলো হেসে হেসে পার করে দিবে, অনাথবাড়ির হাসপাতালে যাবে না, আর আমার ঘরের ভিতরে বসে কিষাণের ছেইলার নাড়ি ছুঁয়ে ছল-কাঁদা কেঁদে আমাকে ভুলাবে। সে হবে না, কভি হবে না জোহানা।

মুরলীর চোখের তারা এইবার ধিক ধিক করে হাসে ঃ না পলুস। তুমি বড় ভুল ভাবলে পলুস। জোহানা আর কভি তোমার কাছে কাঁদবে না, তোমার কাছে মাপ মাগবে না।

—তবে আর কথা বল কেন?

—শুধাই, এত তাড়াতাড়ি কর কেন?

—আমার মনে ডর আছে।

—কিসের ডর?

—না, ডর নয়। আমার ঘিন্না লাগে।

—কাকে ঘিন্না লাগে?

—তোমার ঠগ গতরকে।

—ঠগ গতর বল কেন?

—তোমার এই গতর ছুঁলে আমার এই ছেইলা আসবে না ; কিন্তু আমি যে আমার ছেইলা পেতে চাই জোহানা। বলতে বলতে পলুসের চোখ দুটো যেন ক্ষুধাকাতর পাগলের চোখের মত ছটফট করে জ্বলতে থাকে।

—এই তোমার ডর! হেসে ওঠে মুরলী। সে হাসির শব্দ যেন একটা ঠাণ্ডা কৌতুকের প্রেতের মত শরীরহীন প্রতিধ্বনি হয়ে পলুস হালদারের ঘরের বাতাসে ঢলে ঢলে গড়াতে থাকে।

ঝিঁঝির ডাক বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ঘরের জানালার ফাঁকের উপর বাইরের আকাশের আভাস হেসে উঠেছে। পলুস হালদারের মুখের দিকে তাকিয়ে বড় সুন্দর শান্ত হাসি হাসে মুরলী ঃ তোমার বড় ভাল সাধ হয়েছে পলুস। কিন্তু...।

—কি?

—হাসপাতাল যদি এখনই আমাকে নিতে না চায়? যদি একটা মাস পরে আসতে বলে?

—সে আমি মানবো না।

—তোমার হাসপাতাল নয় পলুস। সিস্টার দিদির হাসপাতাল।

—তুমি আমাকে মিছা ভুলাবার ছল করো না। তোমাকে আজ হতে হাসপাতালে থাকা করাবো আমি।

—তবে যে টাকা লাগবে পলুস। মেরিয়া বলেছে, আগে ভাগে ভর্তি হলে মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা লাগে।

—টাকা দিব।

মুরলীর চোখ দুটো আশ্চর্য হয়ে হাসতে হাসতে যেন বড় হয়ে ওঠে ঃ কয়লাখাদের বড় মিস্তিরী কত টাকা পায়? মাসোহারা অনেক বেড়েছে কি?

ভ্রূকুটি করে পলুস। যেন একটা জ্বালাময় হুংকার কোনমতে চেপে রেখে, আস্তে আস্তে আর শক্ত করে চিবিয়ে কথা বলে পলুস—ডুমুরের জাউ খেয়ে কাঁদতো যে কিষাণী, সে আবার এমন কথা শুধায় কেন?

বিছানা থেকে নেমে জানালা খোলে মুরলী। বাইরের আকাশের এক ঝলক আভা ঘরের ভিতর এক ঝলক হাসির মত লুটিয়ে পড়ে। ছটফট করে ঘরের ভিতরে ঘুরতে থাকে মুরলী। বই আর খাতা একটা ঝুলির মধ্যে ভরে। আলনার শাড়ি জামা আর সায়া ধরে টান দেয়। ঝটপট চোখমুখ ধুয়ে নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ায়।

—চল পলুস, চল। চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী। মুরলীর মুখটা ক্ষেপী হাসুনির মুখের মত অদ্ভুতভাবে হাসতে থাকে। মুরলীর ছটফটে শরীরটা ক্ষেপী নাচুনির শরীরের মত অদ্ভুতভাবে দুলতে থাকে।

অদ্ভুতভাবে ছুটে ছুটে চলতেও থাকে মুরলী, পিছনে পলুস। অনাথবাড়ির হাসপাতালের

কাছে যখন দুজনে পৌঁছে যায়, তখন সকালবেলার রোদও বেশ তপ্ত হয়ে উঠেছে।

অনাথবাড়ির সেই হাসপাতাল, যে হাসপাতালে দাইয়ের কাজ করে জনের মা আনিয়া বুড়ি। হাসপাতালের বারান্দায় বেঞ্চির উপর চুপ করে বসে থাকে মুরলী। বারান্দার উপর আস্তে আস্তে হেঁটে পায়চারি করে পলুস। তারপর সাইকেল ছুটিয়ে আসাইলামর অফিসে গিয়ে পনের মিনিটের মধ্যে ফিরে আসে ; হাতে একটা চিঠি।

সিস্টার দিদির চিঠি নিয়ে এসেছে পলুস। সিস্টার দিদি হেসে হেসে স্নেহার্দ্র স্বরে বলেছে--হ্যাঁ পলুস, ডাক্তার যদি বলে যে জোহানার এখনই ভর্তি হওয়া ভাল, তবে এখনই ভর্তি হবে জোহানা। টাকা লাগবে না। আমি চিঠিতে এই কথা লিখে দিলাম।

সেই চিঠি মুরলীর হাতে তুলে দেয় পলুস। চিঠিটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে ভর্তি হবার প্রতীক্ষায় বসে থাকে মুরলী।

জনের মা আনিয়া বুড়ি এসে বলে--ভাবনা করবে না জোহানা। এখনই তোমার ডাগদারি হয়ে যাবে। তারপর গড বাবার দয়া...ভাবনা করবে না জোহানা।

বুঝতে পারে নি মুরলী, কখন চোখ দুটো একটা অলস স্বপ্নের ভারে ছোট হয়ে প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শাড়ির আঁচলের খুঁট দুই নরম ঠোঁটের একটা শক্ত যন্ত্রণা দিয়ে কামড়ে ধরে নিজেরই এই অপেক্ষার নিঃশ্বাসের শব্দগুলিকে শুনতে থাকে মুরলী। চোখ মেলে তাকিয়েও যেন দেখতে পায় না মুরলী, পলুস হালদারের শক্ত ছায়াটা কেমন ক'রে চলন্ত প্রহরীর মত ওরই চোখের সামনে আনাগোনা করছে।

জনের মা আনিয়া বুড়ি হঠাৎ এসে আদর করে মুরলীর হাত ধরে চেঁচিয়ে ওঠে ঃ চল জোহানা।

থমকে দাঁড়ায় পলুস হালদার। জনের মা আনিয়া বুড়ির সঙ্গে হেঁটে হেঁটে বারান্দার শেষ দিকে ছোট ঘরটার কাছে এগিয়ে যেয়ে যখন দাঁড়িয়ে পড়ে মুরলী, আর ঠেলা দিয়ে দরজা খোলে আনিয়া বুড়ি, তখন বুঝতে পারে পলুস, এইবার জোহানার উপর একটা ডাক্তারী কাজ হবে, আর ভর্তি হয়ে যাবে জোহানা। দেখতে পেয়েছে পলুস, ঘরের ভিতরে মস্ত বড় একটা টেবিল ; সেই টেবিলের উপর একটা বালিশও আছে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে পলুস, সিস্টার দিদির চিঠিটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়লো জোহানা। আর, জনের মা আনিয়া বুড়ি জোহানার ঝুলিটাকে হাতে নিয়ে...কে জানে কোন্ ঘরের দিকে চলে গেল।

চমকে ওঠে পলুস হালদার। পলুস হালদারের চোখ আর কান শিউরে দিয়ে এক জোড়া চকচকে জুতোর শব্দ পলুসেরই ছায়া মাড়িয়ে চলে গেল। গটমট করে হেঁটে এগিয়ে যেয়ে, ছোট ঘরের ভিতরে ঢুকেই দরজার কপাট বন্ধ করে দিল ডাক্তার রিচার্ড সরকার।

বারান্দার উপর এক ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকে পলুস। গলায় জড়ানো রামধনু রঙের রুমাল ঘামে ভিজে যায়। চোখ দুটো কেঁপে কেঁপে ক্লান্ত হয়। বন্ধ নিশ্বাস বুকের ভিতরে যেন দুম দুম শব্দ করে কিল মারে।

ছোট একটা ঘর, সে ঘরের ভিতরে একটা ভয়ানক নীরবতার মধ্যে শুধু দুটি মানুষ ; জোহানা আর রিচার্ড সরকার। এ কি হল? জোহানার ঠগ গতরটাকে চিনতে আর বুঝতে এত দেরি করে কেন ডাক্তারটা? এত কি দেখবার আছে? ওই ভয়ানক ডাক্তারী চোখ দুটোর সব দেখা এখনো শেষ হয় না কেন? জোহানাও কি এখনও লাজ পেয়ে গতর ঢাকে নাই? ওরা দুজনে কি গায়ে গায়ে ছোঁয়া-ছুঁয়ি করে সুখ-দুখের কথা বলাবলি শুরু করে দিল?

ঘরের দরজা খুলে যায়। তেমনই গটমট করে হেঁটে, ডাক্তারী সরঞ্জামের ব্যাগ এক হাতে ঝুলিয়ে, আর গলার টাই ফুরফুরিয়ে চলে গেল ডাক্তার রিচার্ড সরকার।

আর, আস্তে আস্তে হেঁটে, যেন একটা সুখী শরীরের আলস্যের ভার টানতে টানতে

পলুসের সামনে এসে দাঁড়িয়েই চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী--যাও পলুস।

—কি? বলতে গিয়ে পলুসের ঠোঁট দুটো ভীরু হয়ে বিড়বিড় করে।

—তুমি এখন ঘরে যাও পলুস।

—তুমি কি যাবে না?

--হে গড! কলকল করে হেসে ওঠে মুরলী--তুমি এ কেমন কথা বলছো? আমি ঘরে যাব কেন?

—তুমি যে বললে, তাড়াতাড়ি নাই। একমাস দেরি আছে।

--হ্যাঁ, ঠিক বলেছি!

—তবে এখন ঘর চল না কেন?

—না পলুস।

—কেন জোহানা?

—ডাক্তার বললে।

—কি বললে ডাক্তার?

—আমার এখনই হাসপাতালে থাকা ভাল।

—কেন এমন কথা বলে ডাক্তার। ভ্রূকুটি করে, আর, যেন একটা চিৎকার চাপতে চেষ্টা করে পলুস।

মুরলী হাসে ঃ সে কথা আমাকে শুধাও কেন? ডাক্তারটাকে শুধালেই পার।

জনের মা আনিয়া বুড়ি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে যেন আদরের আবেগে চেঁচাতে থাকে—জোহানা, জোহানা বহিন, তোমার বড় ভাল ঠাঁই হয়েছে বহিন। চল বহিন।

মুরলীর হাত ধরে টান দেয় আনিয়া বুড়ি। আনিয়া বুড়ির সঙ্গে চলতে থাকে মুরলী। জোহানার মুখের সেই ঠান্ডা হাসিটা আরও ঝিকমিক করে। আনিয়া বুড়ির হাত ধরে একটা নতুন আহ্লাদের জগতের দিকে চলে যাচ্ছে জোহানা। শুনতেও পাওয়া যায়, আনিয়া বুড়ি কী ভয়ানক মুখর হয়ে বকবক করতে করতে চলে যাচ্ছে ঃ গড বাবা দয়া করেন, গড বাবা দয়া করেন।

আর দেরি করে না পলুস। বারান্দা থেকে নেমে, সাইকেলটাকে হাতের কাছে টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে, সড়কের দিকে এগিয়ে যায়।

অনেক দূরে, ভুবনপুর খাদের কলঘরের চিমনি থেকে কালো ধোঁয়ার ফোয়ারা উথলে উঠে ভুবনপুরের আকাশের রোদটাকে কালো করে দিচ্ছে। সেই দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই সাইকেলের উপর লাফ দিয়ে উঠে বসে পলুস আর উধাও হয়ে যায়।

অনাথবাড়ির ছোট হাসপাতালের ছোট একটা ঘরে ছোট একটা খাটিয়া। বালিশ আছে, দুটো কম্বল আছে, আর একটা চাদরও আছে। ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে নিকটে একটা তাল গাছ দেখা যায় ; অনেক রাতে তালের মাথার উপর একটা মাদি শকুন মাঝে মাঝে পাখা ধড়ফড়িয়ে ছটফট করে। কিন্তু দুপুর বেলা রোদের তাতে যখন তালের মাথায়ও ঝলসে যেতে থাকে, তখন ডানা ছড়িয়ে দিয়ে শান্ত হয়ে বসে থাকে মাদি শকুনটা। রোদে ভাজা-ভাজা হয়ে যায় শকুনটা, তবু নড়ে না। শকুনটার ডিম ফুটেছে কি ফুটে নাই, কে জানে? বুঝতে পারে না মুরলী। শুধু উদাসভাবে তাকিয়ে দেখতে থাকে।

লিখতে আর পড়তে কখনও মন লাগে, কখনও লাগে না। কিন্তু কিছুই ভাল লাগে না। মুরলীর গতর ছুঁয়ে নিজের ছেইলা পেতে চায় পলুস, কিন্তু পলুসের ছায়ার কাছে এগিয়ে যেতেও যে মুরলীর মন ঘৃণা বোধ করে, দুঃসহ জ্বালায় ভরা একটা ঘৃণা। মুরলীর ছেইলাকে অনাথবাড়ির অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায় যে, তাকে ছেইলা দিবার জন্য এই শরীরটা

ছেড়ে দেবার আগে বিষ খেয়ে মরে যাওয়াও ভাল।

কিন্তু মরতে যে একটুও ইচ্ছে করে না। অথচ পলুসের ওই ঘরের আশ্রয় ছাড়া যে আর কোন আশ্রয়ও নেই। হাসপাতাল থেকে পলুস হালদারের ঘরে ফিরে যাবার পর, পলুস হালদারের সেই হিংস্র আহ্লাদের দাবী মুরলীর শরীরটাকে ক্ষুধাতুর জন্তুর মত আঁকড়ে ধরতে চাইবে। এই ভয়। হাসপাতালে ভর্তি হবার পর থেকে দিনের পর দিন শুধু এই ভয় সহ্য করতে গিয়ে দিন দিন হতাশ হতে হয়। মুরলীর নিঃশ্বাস জ্বলতে থাকে। সে অভিশাপ সহ্য করতে পারবে না মুরলী।

এখনও দরকার আছে, তাই পলুসের ঘরটা চাই, পলুসের টাকাও চাই ; কিন্তু পলুসকে চাই না। পলুস যেন মুরলীর গা ছুঁতে না পারে ; এমন উপায় কি হয় না?

যারা বিনা টাকাতে এই হাসপাতালে ভর্তি হয় আর এইরকম ঘরে থাকে, তারা সকালে উঠেই নিজের হাতে ঘর ঝাঁট দেয় আর বিছানার চাদর নিজের হাতেই সাবান দিয়ে কাচে। দেখতে পায় মুরলী, পাশের ঘরে যে মোটাসোটা বহুড়িটা থাকে, একমাসেরও বেশি হল যার একটা সুন্দর মোটাসোটা বাচ্চাও হয়ে গিয়েছে, তার ঘরে দুটো দাই দিনরাত খাটে। বহুড়িটাকে কোন বাবুর বহুড়ি বলে মনে হয়। বহুড়িটার গায়ে কতরকমের গয়না! খাটের উপর বসে পানের ডাবর হাতের কাছে নিয়ে পান সাজে আর খায়, সব সময় হাসে। হাসপাতালের ভাত মুখে দেয় না, ছোঁয়ও না। রোজই দু বেলা একটা লোক এসে বহুড়িটার ঘরে নানারকম ভাল ভাল খাবার পৌঁছে দিয়ে যায়।

এই বহুড়িটাই একদিন মুরলীকে জিজ্ঞেস করে—তুমি নিজে খাট কেন গো বহিন? তুমি কি খয়রাতী বট?

মুরলী হাসে—হ্যাঁ গো দিদি।

—টাকা দিতে পারে না কি তোমার সোয়ামি?

—না।

—কেন? কি কাজ করে তোমায় সোয়ামি?

—কয়লা-খাদের কলঘরে কাজ করে।

—মিস্তিরী বটে কি?

—হ্যাঁ।

—নাম কি?

—পলুস হালদার।...কিন্তু তুমি নাম শুধাও কেন দিদি?

গায়ের গয়না দুলিয়ে হাসতে থাকে বহুড়িটা—ওই কয়লা-খাদ যে আমার খাদ বটে।

মুরলী আশ্চর্য হয় ঃ তোমার খাদ কেন হবে? ওটা সাহেবের খাদ!

—হ্যাঁ গো বহিন, সাহেবেরই খাদ বটে ; কিন্তু খাদের সব টাকা যার জিম্মায় থাকে, সে মানুষটা যে আমারই...।

—তোমার সোয়ামি?

—ছিঃ, সোয়ামি কেন হবে ওই মুখপোড়া?

মুরলীর বুক দুরুদুরু করে ঃ তোমাকে যে কেমনটি মনে হয় দিদি।

—কেমনটি মনে হয়? করালী খাদের খাজাঞ্চিটা আমার কে বটে, বল দেখি বহিন? পান মুখে দিয়ে ঢলে ঢলে হাসতে থাকে মেয়েলোকটা।

—আমার বলতে ডর হয় দিদি। সত্যিই ভীরুর মত চোখ করে মেয়েলোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে মুরলী।

মেয়েলোকটা বলে—হ্যাঁ, এক সালও হয় নাই। খাজাঞ্চিটা আমাকে ঝরিয়া থেকে আনা করিয়ে ওর ঘরে রেখেছে। লোকটা কিন্তু ভাল বটে বহিন ; বড় ভাল ভেড়াটি বটে। ওর সব

টাকা আমি ছিনে নিই, তবু রাগ করে না।

মুরলী—বাবুটার ঘরে আর কেউ নাই?

—বাবুটার আর-একটা ঘর আছে, সেথা ওর মাগ ছেইলা থাকে। মাগকে দশটা টাকা পাঠাবে যদি, তবে আমাকেই হাত ধরে সাধে বাবুটা, তুমি দয়া কর বিজু, দয়া করে দশটা টাকা দাও। বড় ভাল ভেড়া বটে। ঝরিয়ার বিজু বাঈ-এর মত রাখনি পেলে কে না ভেড়া হবে গো?

মুরলী—কিন্তু একদিন যদি তোমাকে...।

বিজু বাঈ-এর চোখ দুটো যেন একটা ঠাট্টার রসে চিকচিক করে ওঠে ঃ খেদিয়ে দেয় যদি? দেয় তো দিবে।

মুরলী—তোমার এই ছেইলার দশা কি হবে?

বিজু বাঈ—আমার ছেইলার দশা আবার কি হবে? আমার কাছে থাকবে। বড়টি হবে। আমার যা টাকা আছে তাতে...।

মুরলী—কি?

বিজু বাঈ—তাতে আমার ছেইলা একদিন একটা রাজপুত কি বামনের বেটিকে বিয়া করে ঘরে নিয়ে আসবে। টাকাতে কি না হয় বহিন?

বিজু বাঈ-এর হাসির শব্দ শুনতে শুনতে, আর বিজু বাঈ-এর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মুরলীর মুখটা যেমন করুণ তেমনই উদাস হয়ে যায়।

বিজু বাঈ বলে—তুমি মুখটাকে কালা কর কেন বহিন? কি হয়েছে তোমার?

উত্তর দেয় না মুরলী।

পানের পিক গিলে আর দোক্তার ঝাঁজে নাক কান লাল করে নিয়ে বিজু বাঈ আবার হাসে ঃ ভাবনা কর কেন?

মুরলী—আমার যে ভাবতে হয় দিদি। তুমিও ছেইলা নিয়ে ঘরে ফিরে যাবে, কিন্তু আমি শুধু ওই ঝোলাটা হাতে নিয়ে ফিরে যাব।

বিজু বাঈ-এর লাল নাক আর কান যেন হঠাৎ-আতঙ্কে শিউরে ওঠে ঃ না না ; এমন কথা ভাব কেন বহিন? মা কালী দয়া করবে, তোমার পেটের সব বিপদ নাশ হয়ে যাবে। সুন্দর ছেইলা হবে তোমার।

মুরলী—কিন্তু সে সুন্দর ছেইলাটাকে ঘরে নিয়ে যাবার উপায় নাই।

—কে এমন হুকুমটি দিলে?

—হুকুম দিলে আমার ঘরের মানুষ।

—মানুষটা ক্ষেপা বটে কি?

—একটুকুও ক্ষেপা নয়। বড় ভাল হিসাব জানে।

—হিসাব কেন? তোমার ছেইলা কি ওর ছেইলা নয়?

—না, আমার আগের সোয়ামির ছেইলা।

—তাই বল না কেন? ভাতারে রাগ করেছে? বিজু বাঈ-এর আতঙ্কিত মুখটা এইবার একটা আক্রোশের জ্বালায় কুৎসিত হয়ে যেন মুরলীকেই ধিক্কার দিতে থাকে ঃ ভাতারগুলো যে এমন ছুঁচা হয়, আগে বুঝ নাই কেন? ভাতার কর কেন?

মুরলী ভ্রূকুটি করে ঃ তুমি এ সব কথা আমাকে বলবে না।

বিজু বাঈ মুখ বেঁকিয়ে হাসে ঃ কেন বলবো না গো? সোয়ামিগুলা ছুঁচা বটে যে গো! মাগের পেটের হিসাব নিবার লেগে কিচকিচ করে। ভাতারের চেয়ে ভেড়ারা ঢের ভাল।

মুরলী—কেন ভাল?

বিজু বাঈ—মাগির পেটের হিসাব নিবার লেগে কিচকিচ করে না ভেড়ারা। ভুবনপুর

একদিন যাবে তো দেখতে পাবে, আমার এই ছেইলাকে কোলে নিয়ে কত আদর খাটছে খাজাঞ্চিটা।

মুরলী--বাবুটা ওর নিজের ছেইলাকে কোলে নিয়ে আদর খাটবে, তাতে আর...।

হি হি! হি হি! হাসতে হাসতে এলিয়ে পড়ে বিজু বাঈ। বিজু বাঈ-এর বাজুবন্ধের সোনার ঝালরও যেন একটা দুরন্ত কৌতুকের আমোদে নীরব হি হি হাসি হেসে কাঁপতে থাকে। বিজু বাঈ বলে—এটা খাজাঞ্চির ছেইলা নয় বহিন ; এটা একটা ঠিকাদারের ছেইলা। খাজাঞ্চিটা সবই জানে।

মুরলীর হতভম্ব মুখটার দিকে অনেকক্ষণ ধরে তীব্র একটা চাহনি হেনে তাকিয়ে থাকে বিজু বাঈ। তারপর ফিসফিস করে বলে—তোমার যদি ঘরে ফিরে যেতে মন না করে, তবে বল বহিন। আমি তোমার...।

বিজু বাঈ-এর মুখের দিকে মুরলীও তীব্র একটা চাহনি ছড়িয়ে দিয়ে কি যেন ভাবতে থাকে। তার পরেই মুখ নামিয়ে নিয়ে দেয়ালের গায়ে নখের দাগ বোলাতে থাকে। মুরলীর জীবনের একটা আশা যেন একটা সুযোগ পেয়ে এইবার ভয়ানক কঠোর হয়ে উঠেছে আর হিসাব করছে।

মুরলী বলে—তুমি আমার মতলবের একটা কথা আগে শুনবে কি?

—বল।

—তোমার বাবুটাকে বলে কলঘরের বড় মিস্তিরীকে বদলি করিয়ে দিতে পার?

আর একটা পান মুখের ভিতরে পুরে দিয়ে বিজু বাঈ ফিসফিস করে--খুব পারি। খাদের মানিজারবাবু খাজাঞ্চিটাকে খুব মানে।

মুরলী—তবে তাই কর।

বিজু বাই যেন ফোঁসফোঁস করে হাসে ঃ তবে তাই মনে রেখ বহিন, আমাকে খবর দিলেই...।

বিজু বাঈ-এর ঘরের দরজার কাছ থেকে ছুটে এসে নিজের ঘরের ভিতরে ঢুকেই হাঁপাতে থাকে মুরলী। মুরলীর নিঃশ্বাসের শব্দ যেন বিজু বাঈ-এর হাসির শব্দের মত ফোঁসফোঁস করতে থাকে। মুরলীর মনের একটা আক্রোশের হিসাব এতক্ষণে তৃপ্ত হয়েছে।

কিন্তু আর ভয় নেই। বিজু বাঈ নামে ওই ভয়ানক হাসির মেয়েমানুষটা যদি সত্যিই দয়া করে, তবে পলুসের স্পর্শের ভয় থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে মুরলীর জীবন।

কিন্তু, তারপর?

ডাক্তার রিচার্ড সরকারের চোখ দুটো এমন উদাস রকমের চোখ কেন? যে-দিন প্রথম ডাক্তারী হল, সেদিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আরও তিনবার মুরলীর এই শরীর চোখে দেখে চলে গিয়েছে রিচার্ড। মুরলীর কোমরে দুবার সুই দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু রিচার্ডের ঠাণ্ডা চোখ দুটো ভুলেও একবার আশ্চর্য হয়ে যায় নি। মুরলীর বুকের দিকে তাকিয়েও মুরলীর বুকের বিচলিত শিহরটা দেখতে পায় নি বোধ হয়। আর মুরলীর চোখের দিকে তাকিয়ে মুরলীর চোখের আশাটাকে একটুও বুঝতে পারে নি।

না, রিচার্ডের উপর রাগ করবার কোন দরকার হয় না। এই মুরলীকে দেখে আশ্চর্য হবে কেন রিচার্ডের মত মানুষ? রিচার্ডের বাড়ির ফটকে কী সুন্দর ফুলের বাহার রঙিন হয়ে রয়েছে! রিচার্ডের মনের ভিতরেও ফুলের বাগান আছে। শুধু এই সুন্দর গতরটা ছাড়া মুরলীর জীবনের আর কোন্ সুন্দরতা আছে, যার জন্য লুব্ধ হবে রিচার্ডের মত মানুষের মন?

রিচার্ডের বাড়ির চেহারাটা বার বার মনে পড়ে। বাড়িটা এখান থেকে খুব কাছে, কিন্তু মুরলীর জীবন থেকে অনেক দূরে। কে জানে, গড বাবা দয়া করবে কি? রিচার্ডের মত মানুষ একদিন মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হবে কি?

অনেক রাত হয়ে গিয়েছে। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালে নিকটের তাল গাছটাকে আর দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু...এ কি? এত বেশি ছটফট করে পাখা ধড়ফড় করছে কেন মাদি শকুনটা? শকুনের বাসাতে এমন করুণ কান্নার মত শব্দ বেজে ওঠে কেন? কাঁদছে কি শকুনের ছা?

ধড়ফড় করে মুরলীর বুকটা। মুরলীর সারা শরীর জুড়ে যেন একটা যন্ত্রণার আবেশ কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে। পেটটা ছিঁড়ে যাবে বুঝি। কোমরটা যেন একটা মাতাল বেদনার রসে ভার হয়ে গিয়ে থরথর করছে। ভিজে যাচ্ছে মুরলীর সায়া। দরজার কাছে এসে, শক্ত করে কপাটটাকে আঁকড়ে ধরে, চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী—আনিয়া দিদি গো!

জনের মা আনিয়া বুড়ি ছুটে এসে হাত ধরে বলে—গড বাবা দয়া করেন। ডর নাই বহিন।

মুরলীর একটা হাত সস্নেহে ও শক্ত করে আঁকড়ে ধরে মুরলীকে একটা বড় ঘরের দিকে নিয়ে যায় আনিয়া বুড়ি।

কথা ছিল, আর সাত দিন পরেই হাসপাতাল ছেড়ে বাড়ি চলে যাবে মুরলী। কিন্তু বুকের কাছে তোয়ালের উপর শোয়ানো একটা বাচ্চা মানুষের তুলতুলে দুটো পিপাসী ঠোঁটের কাঁপুনির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই জনের মা আনিয়া বুড়ির দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকায় মুরলী ঃ আর দুটা দিন থাকি না কেন আনিয়া দিদি?

আনিয়া বুড়ি বলে—মিছা আর থাক কেন বহিন?

এর পরেও আরও সাতটা দিন পার হয়ে যায়। সকাল হতেই মুরলীর ঘরের ভিতরে ঢুকে শক্ত হয়ে দাঁড়ায় বড়দিদি, হাসপাতালের মেট্রন। বড়দিদির কালো মুখে সাদা দাঁতের হাসি ঝকঝক করে। কোমরে শক্ত করে একটা তোয়ালে জড়ানো আছে। বড়দিদির মোটা মোটা হাত দুটোও যেন একটা লোভনীয় বস্তুকে ছোঁ মেরে আঁকড়ে ধরবার জন্য আস্তে আস্তে দুলছে।

মুরলী বলে—আর কটা দিন থাকি না কেন বড়দিদি?

বড়দিদি কি-যেন ভাবেন, তারপর আবার হাসতে হাসতে চলে যান।

কিন্তু সন্ধ্যা হতেই ঘরের ভিতর এসে ঢুকলেন সিস্টার দিদি ঃ না জোহানা বহিন ; আর তোমার এখানে থাকা উচিত হবে না। আমি পলুসকে খবর দিয়েছি।

মুরলী কাঁপতে কাঁপতে বলে—কি খবর দিলে দিদি?

সিস্টার দিদি—পলুস গো-গাড়ি নিয়ে সকালবেলাতেই এখানে আসবে, আর তোমাকে নিয়ে যাবে।

মুরলীর মাথায় হাত বুলিয়ে, মুরলীর থুতনি টিপে আদর করে, ব্যস্তভাবে যখন চলে গেলেন সিস্টার দিদি, তখন মুরলীর সেই ছোট ঘরের জানালার কপাটে একটা দুরন্ত হাওয়ার ঝাপটা এসে আছড়ে পড়ে।

হ্যাঁ, ঝড় শুরু হয়েছে। হারানগঞ্জের আকাশ কালো হয়ে গিয়েছে ; একটাও তারা দেখা যায় না। তালগাছের মাথা থেকে শিশু-শকুনের কান্নার স্বর ঝড়ের বাতাসের সঙ্গে জড়াজড়ি করে ছুটে এসে মুরলীর কানের ভিতর বিঁধতে থাকে।

—এটা যে এখনো কাছে আছে গো, আমার বুক ছুঁয়ে পড়ে আছে গো। কাল সকালে আর থাকবে না।

বাচ্চাটার ঘুমন্ত মুখটার দিকে তাকিয়ে আর ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে মুরলী। কপালের উপর জোরে জোরে চাপড় মারে, আর চুলের গোছা খিমছে ধরে ঃ ছিনে নিবে, ছিনে নিয়ে চলে যাবে ডাইনের বেটিরা!

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় মুরলী। জানালা দিয়ে বাইরে ঝড়ো অন্ধকারের ভয়াল

চেহারাটার দিকে তাকায়। তারপর, ঘরের মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে বিড়বিড় করতে থাকে--এ কেমন সুখের নরক গো কপালবাবা! ছিয়া ছিয়া ছিয়া!

উঠে দাঁড়ায় মুরলী। ঘরের দরজার কপাট ভেজিয়ে দিয়ে বিছানার কাছে এগিয়ে আসে। হাতের এক টানে পটপট করে গায়ের জামার বোতামগুলিকে ছিঁড়ে আল্‌গা করে দিয়ে নিজেরই বুকের অদ্ভুত চেহারাটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে। কী ভয়ানক মায়ার জলে ফুলে আর ফেঁপে ভেজা-ভেজা হয়ে রয়েছে, টনটন করছে বুকটা! বাচ্চাটার ঘুমন্ত মুখের কাছে বুক এগিয়ে দিয়ে, আর. এক হাতে নিজেরই এলোমেলো চুলের গোছা খিমছে ধরে একেবারে নিঝুম হয়ে যায় মুরলী।

দূর দূর দূর! যেন একটা স্বপ্নের ঘোরে বিড়বিড় করতে করতে উঠে বসে মুরলী। দূর দূর! যেমন তোমার গড বাবা, তেমনই তোমার কপালবাবা ; সব মিছা, সব ঠগ।

ঘুম-ভাঙা ভেজা চোখ দু হাত দিয়ে ঘষে ঘষে আবার ছটফট করে মুরলী। ভাল অনাথবাড়ি করেছে সিস্টার দিদি, বাঘিন কানারানীটার মত মানুষখাগী একটা অনাথবাড়ি। এমন অনাথবাড়ি ডরানির জলে ভেসে যায় না কেন?

মেঝের উপর বসে, খাটিয়ার গায়ে কপাল ঠেকিয়ে দিয়ে আর চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকে মুরলী। চোখ দুটা যে জ্বলছে গো কপালবাবা, ঘুমাতে পারা যাবে কি? বুকটা যে জ্বলে গেল গড বাবা! একটুক জল খেতে দিবে কি? আনিয়া দিদি কোথা গেলে গো?

আবার উঠে দাঁড়ায় মুরলী। ঘরের দরজার কপাট খুলে ডাক দেয় মুরলী—আনিয়া দিদি গো।

কোন সাড়া শোনা যায় না। আনিয়া দিদি ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চয়। অনেক রাত হল বুঝি। কেউ জেগে নাই বুঝি। হাসপাতালের ফটকের কপাটে কি তালা লাগায় ওরা?

চোরের মত সতর্ক ও তীক্ষ্ণ চোখের চাউনি তুলে চারদিকে তাকায় মুরলী। না, কেউ জেগে নেই। নিকটেও কেউ নেই। পাশের ঘরের দরজায় তালা। কবেই চলে গিয়েছে বিজু বাঈ।

রাতের এই আঁধারটা বড় ভাল। ডাকাতেরা আর চোরেরা বড় ভালবাসে এমন আঁধার। লুঠ করে নিয়ে পালিয়ে যেতে কোন বাধা নেই। কেউ দেখবে না।

কোথায় যাব গো! মুরলীর বুকের ভিতরে একটা অসহায় প্রশ্নের শব্দ যেন হাহাকার ছড়াতে থাকে। হারানগঞ্জের এই আমের বাগিচা পার হয়ে, সড়ক ধরে হেঁটে হেঁটে ভুবনপুর পৌঁছে যেতে কত সময় লাগে গো কপালবাবা? ভুবনপুর থেকে সকালবেলাতেই একটা মোটর গাড়ি ছাড়ে, বাবুরবাজারের দোকানীদের নিয়ে যায় সেই গাড়ি। বাবুরবাজার থেকে হাঁটা দিলে মধুকুপির ডাঙার মাটি ধরে ফেলতেই বা কত সময় লাগবে? কিষাণের ঘরটা আছে কি? আছে নিশ্চয়। কিষাণটা ছেইলার লেগে ভাবছে আর কাঁদছে যে গো!

লোভী চোরের মত একটা লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে বাচ্চাটাকে তোয়ালে দিয়ে জড়িয়ে নেয় আর বুকের কাছে তুলে ধরে মুরলী। পা টিপে টিপে ঘর থেকে বের হয়। পা দিয়ে দরজার কপাট ঠেলা দিয়ে দরজা ভেজিয়ে দেয়। বারান্দা পার হয়ে এসে সিঁড়ির কাছে দাঁড়ায়। ফটকের দিকে তাকায়।

—হায় রে গড বাবা। হায় রে তোমার দয়া। বলতে বলতে কাঁপতে থাকে মুরলী।

ভোর হয়ে গিয়েছে। বাইরের আকাশ ফর্সা হয়ে গিয়েছে। হাসপাতালের দারোয়ান, আনিয়া বুড়ির বড় ছেলে জন গুনগুন করে গান গেয়ে ফটকের কাছে ঘুরঘুর করছে।

একটা দৌড় দিয়ে ফিরে এসে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ে মুরলী। বাচ্চাটাকে বিছানার উপর শুইয়ে দেয়. তারপর মেঝের উপর বসে আর খাটিয়ার গায়ে মাথা ঠেকিয়ে দিয়ে পড়ে থাকে।

ঝড় নেই, ভোরের বাতাস বড় মৃদু হয়ে গিয়েছে। ঘুমিয়ে পড়ে মুরলী।

খোলা জানালা দিয়ে মুরলীর ঘুমন্ত মুখটার উপর যখন রোদের ঝলক এসে লুটিয়ে পড়ে, তখন আবার একটা নতুন শব্দ শুনে চমকে ওঠে মুরলীর বুকের পাঁজর। চোখ মেলে তাকায় মুরলী। হ্যাঁ, শুনতে পায় মুরলী, ঠিকই, কতগুলি দুরন্ত ও নির্মম পায়ের শব্দ এই ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে।

উঠে দাঁড়ায়। দরজার কাছে এগিয়ে যায় মুরলী। দেখতেও পায়, কালো মুখে সাদা দাঁতের হাসি ঝিকমিকিয়ে, গটমট করে জুতোর শব্দ বাড়িয়ে ঘরের দিকে আসছে বড় দিদি। পিছনে আনিয়া বুড়ি। মুরলীর ছেইলা এখনই অনাথবাড়িতে চালান হবে। আর দেরি নেই।

বিছানার কাছে এগিয়ে এসে তোয়ালে দিয়ে বাচ্চাটার মুখ ঢেকে দিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে মুরলী। আর, একবারও ফিরে তাকায় না। ঝোলাটাকে হাতে নিয়ে ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে যায়।

ফটক পার হয়ে সড়কের উপর এসে দাঁড়াতেই দেখতে পায় মুরলী, ব্যস্তভাবে হেঁটে এগিয়ে আসছে পলুস। পলুসের পিছু পিছু একটা গো-গাড়িও আসছে।

গো-গাড়ির দিকে ছুটে যায় মুরলী। আর, যেন বনবিড়ালীর মত লঘু শরীরের ফূর্তির আবেগে একটা লাফ দিয়ে উঠে গাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ে। দেখতে পেয়ে হেসে ওঠে পলুস হালদারের চোখ। সেই ভয়ানক বোঝার ভার খালাস করে দিয়ে কত হাল্কা হয়ে গিয়েছে জোহানা! কী সুন্দর দুলে উঠল জোহানার সরু কোমরটা!

আগে আগে গো-গাড়িটা চলে। পিছনে পলুস। পলুসের মুখের দিকে একটা ভ্রূক্ষেপও করতে ভুলে গিয়েছে মুরলী। গাড়ির ভিতরে খড়ের গদির উপর বসে, দু হাতে দু হাঁটু জড়িয়ে আর মাথা হেঁট করে, মুরলী একেবারে নীরব হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু পলুসের কপালটা বার বার রাগ করে কুঁচকে উঠতে থাকে। পলুস ডাকে—জোহানা!

উত্তর দেয় না মুরলী।

পলুসের গলার স্বর গো-গাড়ির চাকার শব্দের মত কর্কশ হয়ে ক্যাঁচক্যাঁচ করে ওঠে ঃ কথাটা শুনলে কি জোহানা?

পলুসের গলার স্বরের এই কর্কশ শব্দটা হঠাৎ একটা আতঙ্কের ডাক হয়ে কেঁপে ওঠে ঃ এ কি? তোমার এ কি হলো জোহানা?

কথা বলে না মুরলী। গাড়ির ছইয়ের গায়ে এলিয়ে পড়েছে মুরলী। চোখ বন্ধ। মাথাটা কাত হয়ে ঝুলছে।

—থাম হে গাড়িয়াল। চেঁচিয়ে ওঠে পলুস। গরুর নাকের দড়ি ধরে আচমকা টান দেয় গাড়িয়াল। গো-গাড়িটাও আচমকা থেমে যায়।

ফ্যালফ্যাল করে পলুস হালদারের চোখ দুটো। কী অদ্ভুত কাণ্ড! গাড়িটা যে ডাক্তার রিচার্ড সরকারের বাড়ির ঠিক ফটকের কাছে এসে থেমে গিয়েছে। ফটকের লতার ফুলগুলি দুলছে। ফুলগুলির সুবাসও ভুরভুর করছে। আর, পলুসের আতঙ্কের ডাক শুনতে পেয়ে ব্যস্তভাবে বাড়ির বারান্দা থেকে নেমে এইদিকেই ছুটে আসছে ডাগদরটা!

বাঃ, বড় ভাল সময় ভেবে রেখেছিল জোহানা, তা না হলে ঠিক এখানেই এসে জোহানা বেহুঁশ হয় কেন? বাঃ, বেশ মূর্ছা! ঠগ মূর্ছা বটে কি? হ্যাঁ, কেমন বেলাজ হয়ে জোহানার গতরটা ঢুলছে! বুকের উপর কাপড় নাই। বুকের জামাটাও ভিজা! ডাগদরটা যে এসে যাবে এখনই।

রিচার্ড সরকার কাছে এগিয়ে এসে গাড়ির ভিতরে উঁকি দেয় ; সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত এক দয়ালু স্বরে আক্ষেপ করে ওঠে ঃ অ্যাঁ? জোহানা হালদার বলে মনে হচ্ছে।

পলুস বলে—হ্যাঁ।

বাড়ির বারান্দার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে রিচার্ড—জলদি এক ঘটি জল নিয়ে এস দাই।

দাইটা এক ঘটি জল হাতে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে। কিন্তু ডাক্তারের মায়াময় ব্যাকুলতা আর তর সইতে পারছে না। রিচার্ড সরকারের হাত দুটো এত বিচিত্র আদরের কায়দাও জানে! এক হাতে মুরলীর থুতনি ছুঁয়ে মুরলীর ঝুলে-পড়া মাথাটাকে তুলে ধরে ; আর এক হাত দিয়ে মুরলীর চোখের উপরে ছড়িয়ে-পড়া চুলের একটা গোছা সরিয়ে দিয়ে মুরলীর মুখের বেদনার রহস্যটাকে যেন মুগ্ধ হয়ে দেখতে থাকে রিচার্ড। মুরলীর চোখের পাতা ফাঁক করে কালো চোখের মণিটাকেও যেন লোভীর মত একবার দেখে নিল রিচার্ড।

যেন একটা বিকট তামাশা! পলুস হালদারের স্তব্ধ চোখ দুটো দুঃসহ আতঙ্ক সহ্য করতে গিয়ে বার বার শিউরে উঠতে থাকে। ডাগদরটা জোহানাকে এখনই বুকে চেপে ধরবে মনে হয়।

জলের ঘটি হাতে নিয়ে দাইটাও কাছে এসে দাঁড়ায়। মুরলীর চোখে-মুখে বার বার জল ছিটিয়ে দিয়ে রিচার্ড ডাক্তার মুরলীর মুখের দিকে আবার চুপ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। ডাগদরটা জোহানার এই ভিজা মুখটাকে রুমাল দিয়ে এখনই আদর করে বার বার মুছে দিবে বুঝি, আর...।

—জোহানা! চেঁচিয়ে ওঠে পলুস।

রিচার্ড বলে—আঃ, একটু আস্তে ডাক দিন ; চেঁচিয়ে কোন লাভ নেই।

কিন্তু পলুস হালদারের এই রূঢ় চিৎকারের শব্দটা সার্থক হয়। সত্যিই মুরলীর চোখের পাতা আস্তে আস্তে নড়তে থাকে। চোখ মেলে একটা লক্ষ্যহীন উদাস সাদাটে দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে মুরলী।

রিচার্ড আস্তে আস্তে ডাকে—শুনছেন? বলুন...কিসের কষ্ট? মাথা ঘুরছে কি?

মুরলীর ভেজা মুখটা বিড় বিড় করে ঃ বড় জ্বালা গো দিদি।

রিচার্ড—জ্বালা? কোথায় জ্বালা?

আস্তে আস্তে মুখটাকে এদিকে-ওদিকে ঘুরিয়ে, তারপর হেঁট মাথা হয়ে নিজেরই বুকের জামাটার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে মুরলী—ভিজে গেল যদি, তবে আবার জ্বলে কেন?

দাইটা চট করে হাতের এক টানে মুরলীর শাড়ির আঁচলটাকে নামিয়ে মুরলীর বুকের উপর ছড়িয়ে দেয়।

পলুস হালদারের দিকে তাকিয়ে রিচার্ড বলে—এখনও পুরো হুঁশ হয় নি।

পলুসের চোখ দুটো কুঁচকে ওঠে ঃ হয় না কেন?

রিচার্ড—কি বললেন?

পলুস—হুঁশ পুরা হতে কত সময় নিবে?

রিচার্ড—কত আর সময় নেবে? বড়জোর আর দশ-পনের মিনিট। কিন্তু...তারপর একটু জিরিয়ে নেওয়া দরকার।

পলুস—ঠিক আছে।

রিচার্ড—না, ঠিক নেই। এখানে রাস্তার ওপর একটা গো-গাড়ির ভিতরে পড়ে না থেকে, আমার ঘরের ভিতরে কিছুক্ষণ বসে থাকলে আপনার...উনি আপনারই স্ত্রী নিশ্চয়?

পলুস—হ্যাঁ।

রিচার্ড—উনি এখন কিছুক্ষণ আমার ঘরে বসে জিরিয়ে নিন ; একটু ঘুমিয়ে নিতে পারলে আরও ভাল হয়। তারপর...।

পলুসের কোন প্রশ্ন বা উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে রিচার্ড সরকারের ইচ্ছাটাও যেন একটা মায়াময় ব্যস্ততায় ছটফট করে ওঠে। দাইটার দিকে তাকিয়ে আদেশ করে রিচার্ড—হাত

ধরে খুব সাবধানে আস্তে আস্তে হাঁটিয়ে ঘরের ভিতরে নিয়ে যাও। সোফার ওপর শুইয়ে দাও...একটু বাতাস করো...ঘুমোতে চাইলে মাথায় হাত বুলিয়ে দিও...আর ঘুম ভাঙ্গলেই এক গেলাস গরম দুধ খেতে দিও।...আমি চলি।

সড়কের উপরে একটা লোক, নিশ্চয় রিচার্ড ডাক্তারের চাকর হবে লোকটা, একটা সাইকেল ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। রিচার্ড ডাক্তার ব্যস্তভাবে গটমট করে হেঁটে সাইকেলটার দিকে এগিয়ে যায়। একটা স্বস্তির হাঁপ ছেড়ে এতক্ষণে বুঝতে পারে পলুস, রিচার্ড ডাক্তার কাজে বের হয়ে যাচ্ছে। জোহানাকে নিয়ে আদরের ঘাঁটাঘাঁটি করবার আর কোন ইচ্ছা রিচার্ড ডাক্তারের নেই।

না, রিচার্ড ডাক্তারের কোন দোষ নেই। একটা দুঃখী মেয়েমানুষের উপর একটা দয়া করেছে রিচার্ড ডাক্তার। দয়া করা যে ওর রোজের কাজ বটে। ডাগদরটার হাতের আদরে কোন মতলব নাই।

দাইটার কাঁধে হাত রেখে আস্তে আস্তে হেঁটে রিচার্ডের বাড়ির ফটকের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে মুরলী।

রিচার্ড বলে—আস্তে দাই, খুব আস্তে।

সেই মুহূর্তে চমকে ওঠে পলুস। কী আশ্চর্য আর কী ভয়ানক চতুর মতলবে মাতাল হয়ে টলে উঠেছে জোহানার শরীরটা! দাইটা জোহানাকে আর ধরে রাখতে পারছে না। জোহানার মাথাটা আবার কাত হয়ে হেলে পড়েছে। এই মুহূর্তে এই সড়কের উপর লুটিয়ে পড়বে জোহানা।

এক লাফে এগিয়ে এসেই জোহানাকে ধরে ফেলে রিচার্ড সরকার। পলুস হালদারের স্তব্ধ চোখ দুটো আবার সেই সন্দেহের জ্বালা সহ্য করতে থাকে। জোহানার শরীরের চতুর কষ্ট যেন রিচার্ড ডাক্তারের হাত দুটোকে কাছে পাওয়ার জন্য আবার নতুন একটা কায়দা করে আরও ভয়ানক একটা ঢং ধরেছে। ঠিকই, জোহানার মতলব জয়ী হয়েছে। এক হাতে জোহানার একটা হাত শক্ত করে ধরে, আর এক হাতে জোহানার কাঁধটাকে জড়িয়ে ধরেছে রিচার্ড। চেঁচিয়ে উঠেছে রিচার্ড—শিগগির আসুন আপনি, কি-যেন আপনার নাম?

রিচার্ড আবার ডাক দেয়—শিগগির এখানে আসুন পলুসবাবু।

কিন্তু দয়ালু রিচার্ডের এই ডাক যেন একটা করুণাময় বিদ্রূপের আহ্বান। জোহানাকে বুকের কাছে ধরে রেখে রিচার্ড সরকার জোহানারই স্বামীকে কাছে ডেকে একটা অদৃষ্টের দৃশ্য দু চোখ ভরে দেখে নিতে বলছে। ব্যস্ত হয় না পলুস। সড়কের কাঁকরের দিকে তাকিয়ে, আস্তে আস্তে হেঁটে রিচার্ড আর মুরলীর সেই ছায়া দুটোর কাছে এসে দাঁড়ায়, যে ছায়া দুটো জড়জড়ি করে এরই মধ্যে একেবারে মিলে-মিশে এক হয়ে গিয়েছে।

রিচার্ড বলে—চিন্তা করবেন না। ভয়ের কিছু নেই।

মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে ডাক দেয় রিচার্ড—শুনছেন?

মুরলীর চোখ দুটো যেন ঘুমের আবেশে ছোট হয়ে গিয়েছে। ভুরু টান করে তাকাতে চেষ্টা করে মুরলী। জোরে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে ফিস ফিস করে ঃ আর দুটা দিন থাকি না কেন দিদি...।

পলুসের দিকে মুখ ফিরিয়ে রিচার্ড বলে—আপনি ধরুন।...নিন, তাড়াতাড়ি করুন।

পলুসের হাত দুটো যেন কলের মত আপনি নড়ে ওঠে ; আর, পলুসের সেই এগিয়ে-দেওয়া হাতের উপর মুরলীকে আস্তে আস্তে ছেড়ে দিয়ে রিচার্ডও একটা হাঁপ ছেড়ে নিয়ে বলে—নিন, কোলে তুলে নিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে আসুন।

মুরলীর বিবশ শরীর পলুসের হাতের উপরেও তেমনই বিবশ হয়ে এলিয়ে পড়ে যায়। মুরলীকে দু হাত দিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে পলুস হালদারের মন আবার আশ্চর্য হয়। এ

কি? সত্যিই যে বেহুঁশ হয়েছে বেচারা জোহানা। মিছা এতক্ষণ ধরে জোহানার ভয়ানক একটা কষ্টকেই ভয়ানক একটা মতলবের চালাকি মনে করে নিজেকে মিছা কষ্ট দিয়েছে পলুস। পলুসের বুকের কাছে মুরলীর মাথাটা হেলে পড়েছে। কিন্তু...কই...জোহানা তো কোন কায়দা করে পলুসের বুকের কাছ থেকে মাথাটাকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করছে না। ছিয়া, ছিয়া, বড় ভুল রাগ করা হয়েছে। ছলছল করে পলুসের চোখ। ক্ষেপা মানুষেও বোধ হয় এমন ভুল করে না, এত রাগ করে নিজের ঘরণীর মনকে এত সন্দেহ করে না। এই তো সেই মানুষ, যে মানুষ বাঘিনের ভয়ে মর-মর হয়ে ভুবনপুরের সড়কের পাশে ডাঙার উপর একদিন পড়েছিল। আর, পলুস হালদার ছুটে এসে যাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে কোলে তুলে নিয়েছিল।

পলুসের জীবনেরও একটা মর-মর বিশ্বাস এইবার নতুন বাতাস পেয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে। মুরলীর বিবশ শরীরের ভার আড়াআড়ি করে দুটো শক্ত হাতের উপর শুইয়ে দিয়ে মুরলীকে বুকের উপর তুলে ধরে পলুস। বুকের কাছে ফিরে-পাওয়া একটা সুস্বপ্নের স্বাদ অনুভব করে পলুস। রিচার্ড সরকারের পিছু পিছু আস্তে আস্তে হেঁটে এগিয়ে যেতে থাকে। রিচার্ডের যত দয়ালু উদ্বেগ আর মায়াময় ব্যস্ততার আশ্রয় নিতে একটুও খারাপ লাগে না। ফটকটা পার হবার সময় লতার পাতার উপর থেকে অনেকগুলি রঙিন ফড়িং উড়ে এসে মুরলীর ভাঙা খোঁপাটার উপর বসবার জন্য ফরফর করে ; লতার একটা ফুল মুরলীর মাথাটাকে ছুঁয়েও দিল। মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে পলুসের মনটা নীরবে প্রার্থনা করতে থাকে—দয়া করেন গড বাবা ; আমার জোহানার যেন হুঁশ হয়ে যায়!

ঘরের ভিতরে একটা সোফার উপর মুরলীকে শুইয়ে দেয় পলুস। দাইটা পাখা হাতে নিয়ে মুরলীর মাথার কাছে বসে। রিচার্ড সরকার হাতের ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই পলুস হালদারের দিকে তাকায় ; আস্তে আস্তে কথা বলে—আমি চললাম। আপনি একটুও চিন্তা করবেন না। এই ধরুন, আর একটা ঘণ্টার মধ্যে, একটু ঘুম হলেই উনি সুস্থ হয়ে যাবেন। তারপর ওঁকে নিয়ে যাবেন। আপনি ততক্ষণ বাইরের বারান্দায় কিংবা বাগানে একটু ঘুরে ফিরে...।

চলে যায় রিচার্ড ডাক্তার। পলুসও ঘর ছেড়ে বাইরে এসে বারান্দার উপর যেন নিশ্চিন্ত কৃতজ্ঞতার মূর্তির মত চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে, সাইকেলে চড়ে চলে যাচ্ছে রিচার্ড ডাক্তার। কত মান, কত টাকা! তবু মনে কত দয়া! পলুস হালদারের মত মানুষের ঘরণীকে দয়া করে রিচার্ড ডাক্তার। করবে না কেন? বড় মানুষ যদি ভাল মানুষ হয় তবে সে যে দাই-দাসীদিগেও দয়া করে।

—আমাকে দয়া করেন গো বাবু। সড়কের উপরে গো-গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে হাঁক দেয় গাড়িয়াল।

তাই তো, গাড়িয়াল বেচারা আর কতক্ষণ অপেক্ষায় থাকবে?

ঘরের ভিতর থেকে দাইটা বের হয়ে এসে বলে—গাড়িটাকে চলে যেতে বল পলুসবাবু।

পলুস—কেন গো? ওর কি হুঁশ হয় নাই?

—হঁইছে, কিন্তু একটুকু নিঁদ না নিয়ে যাবে কেন? ডাগদরের কথাটি মানতে হবে।

পলুস হাসে—তবে তো তুমি ওকে গরম দুধও খাইয়ে ছাড়বে।

—হঁ গো বাবু।

—তবে তো...।

—তুমি একবার ঘরে ঘুরে এসো বাপ। মিছা কেন এত সময় এখানে পড়ে থাকবে?

—আমি একবার খাদ ঘুরে আসি না কেন?

—এইসো।

চলে যায় পলুস। আর, মাত্র দুটি ঘণ্টা ঘুমের পর মুরলীর শয়ান শরীরটার সব আলস্য যেন ভয় পেয়ে রিচার্ড সরকারের সেই সুন্দর সাজানো ঘরের একটি সোফার উপর ছটফট করে জেগে ওঠে। জোরে জোরে দু হাত দিয়ে চোখ ঘষে আর দেখতে থাকে মুরলী।

ঘরের ভিতরে ঢুকে দাইটা চেঁচিয়ে হেসে ওঠে ঃ পলুসবাবু চলে গেল, সে ফিরে এসে তোমাকে ঘরে নিয়ে যাবে।

--কোথায় গেল পলুস?

--খাদে গেল।

--এখানে পলুস আমাকে নিয়ে এল কেন?

দাইটা হাসে ঃ পলুস লিয়ে আসে নাই গো, তুমি এইসেছো।

থরথর করে কাঁপতে থাকে মুরলী ঃ এ ঘর যে ডাগদর রিচার্ডবাবুর ঘর মনে হয়।

--হঁ গো।

—আমি এখানে কেন আসবো? আমি কি ক্ষেপী?

--তুমি বেহুঁশ হয়েছিলে গো।

এইবার দাইটার কথার হেঁয়ালি আর ওই হাসির অর্থ বুঝতে পারে মুরলী। হ্যাঁ, গো-গাড়ির ভিতরে বসে থাকতে থাকতেই মাথার ভিতরটা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল, গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, আর কলিজার ভিতর থেকে যেন এক ঝলক মিষ্টি ব্যথার জল উথলে উঠে বুকের জামাটাকে ভিজিয়ে দিল! তারপর...পলুস রাগ করে ধমক দিলে, রিচার্ডবাবুও এসে ডাক দিলে...তারপর...।

দাইটা বলে—ডাগদরবাবু বলে গেল, তুমি এখন জিরিয়ে লিবে, তবে ঘরকে যাবে।

মুরলীর কালো চোখের সব আতঙ্কিত বিস্ময় হঠাৎ বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে হেসে ওঠে ঃ এই কথাটি না বলে মিছা ভুল কথা বলে আমাকে ডরাও কেন?

ঘরের চারদিকের যত আসবাব, দেয়ালের যত ছবি, জানালার আর দরজার যত রঙিন পর্দা আর...আরও কত সুশ্রী বিচিত্রতার সম্ভার নিয়ে রিচার্ড ডাক্তারের এই ঘরের অহংকার কী সুন্দর সুখের হাসি হাসছে!

কিন্তু ও কে? ও যে ঠোঁট দুটোকে মিষ্টি করে শিউরে নিয়ে, আর চোখের তারা দুটোকেও হাসিয়ে নিয়ে সোজা মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

মুরলীর মুখটা করুণ হয়ে যায় ঃ ও কে বটে গো দাই?

—কে?

—ওই যে। ছোট একটা ভীরু ভ্রূকুটি তুলে যাকে দেখিয়ে দেয় মুরলী, সে হল একটা ছবি। বেশ বড় একটা ছবি। ছবির সোনা-রঙের ফ্রেম আর পুরু কাঁচ ঝকঝক করে। সেই সঙ্গে ঝকঝক করে ছবির মুখটা।

সাদা শাড়িতে সেজেছে ছবির সেই নারী, জামাটাও সাদা। জামার হাতের কিনারায় নীল সুতোর জাল। খোঁপাতে সাদা ফুল। গলায় একটা সোনার হার, তার সঙ্গে এক টুকরো ঝকঝকে সাদা পাথর দুলছে। সিস্টার দিদির পায়ে যে রকম জুতো, সেই রকমের জুতো। হাতে একটা বই। পায়ের উপর পা তুলে একটা সোফার উপরে বসে আছে সেই নারী। তার শাড়িটা ভাঁজে ভাঁজে ফুলে ফেঁপে পায়ের উপর লুটিয়ে রয়েছে। পড়তে পারে মুরলী, ছবির পায়ের কাছে নাম লেখা আছে—স্টিফানা মাধবী সরকার।

--কে বটে গো দাই? প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী।

দাই বলে রিচার্ডবাবুর ঘরণী।

মুরলীর বুকটা যেন একটা নির্মম ঠাট্টার আঘাত পেয়ে গুমরে ওঠে। আস্তে আস্তে মাথা হেঁট করে মুরলী। ভয়ে ভয়ে বিড় বিড় করে—রিচার্ডবাবুর ঘরণী কোথায় গেল?

বুকের উপর দু হাত দিয়ে ক্রুশ বানায় আর ঝুঁকে পড়ে দাইটা ঃ দুখের কথা কেন আর বলা করাও? বেচারা কবেই মাটি নিয়েছে.

মুরলীর চোখে আবার তীব্র ও তীক্ষ্ণ একটা দীপ্তির বিদ্যুৎ হেসে ওঠে ঃ কবে?

দাই—এই তো, তিন সাল হলো।

মুরলী—আবার বিয়া করে নাই কেন রিচার্ডবাবু?

দাইটা চোখ বড় করে ঃ বলো না, বলো না, এমন কথা বলতে নাই।

—কেন?

—ঘরণীকে আজও ভুলে নাই রিচার্ডবাবু। উয়াকে ছাড়া...।

ছবির দিকে ইঙ্গিত করে দাইটা বলে—উয়াকে ছাড়া আর কোন ভালমানুষের বিটিকে ভাবে না, কখনো ভাববেক নাই রিচার্ডবাবু।

স্টিফানা মাধবী সরকার! দেয়ালে টাঙানো প্রকাণ্ড রঙিন ছবিটার দিকে অপলক চোখ নিয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে মুরলী।

দাই বলে—হোই যে বাজা, সে বাজা কত ভাল বাজাতো রিচার্ডবাবুর এই ঘরণী। বাবুকে রোজ রোজ কত ভাল গীত শুনাতো বেচারা। দেখ কেনে, ঘরের আসবাবের যত রংদার ঢাকা, সব ওই ঘরণীর হাতের কাজ বটে। হায় গড, এমন মানুষ মাটি লেয় কেনে?

সোফা থেকে উঠে দাঁড়ায় মুরলী। দাইটা চেঁচিয়ে ওঠে।—গরম দুধ না খেয়ে...।

মুরলী হাসে—না গো। আমি এখন ঘর যাই।

দাই—বাবু আমাকে ডাঁটবেক যে গো।

মুরলী হাসে ঃ তুমি আমাকে দুষে দিও।

দাই—কিন্তুক পলুসবাবু যে তুমাকে লিতে আসবেক।

মুরলীর চোখ দুটো দপ্ করে জ্বলে ওঠে ঃ আসুক না কেন, ওকে যা ইচ্ছা হয় বলে দিও।

পলুস হালদারের এই ঘর যেন মুরলীর জীবনের একটা ক্ষণকালের সাজঘর। এই ঘরের বাইরে এমন একটা ঠাঁই আছে, যেখানে গিয়ে মুরলীকে নতুন একটা রূপ নিয়ে কারও চোখের পিপাসা জয় করবার কঠোর পরীক্ষা স্বীকার করে নিতে হবে। শুধু চেহারাটাকে নয় ; মুরলী যেন ওর প্রাণটাকেও নতুন করে সাজাতে চায়।

মুরলীর প্রাণের যা কিছু কাজ, তার সবই এই ঘরের বাইরের কাজ। স্কুল আছে ; কনভেণ্টে গিয়ে মেরিয়ার কাছে বসে সেলাই শেখার কাজ আছে। নিজের সেলাইয়ের কলটাকে মেরিয়ার কাছেই রেখে দিয়েছে মুরলী। এরই মধ্যে তিন রকমের ছাঁট-কাট শিখে নিয়ে নিজেরই গায়ের শোভার জন্য তিনটে শখের ব্লাউজ তৈরী করেছে।

মেরিয়ার চেয়েও ভাল গাইতে পারে লুসিয়া দিদি, কনভেন্টের স্কুলের বড় টিচার। লুসিয়া দিদির বাড়িতে যে পিয়ানো বাজনাটা আছে, সেটা গির্জাঘরের পিয়ানোর চেয়েও দেখতে ভাল। লুসিয়া দিদি বলেছে—তুমি যদি ঠিক ঠিক রোজ সন্ধ্যায় একটিবার এসে পিয়ানোতে হাত সাধতে পার জোহানা, তবে তিন মাসের মধ্যে তুমি তিনটা প্রেয়ার গাইতে আর বাজাতে শিখে ফেলবে।

তাই আর ঠিক সন্ধ্যার আগে ঘরে ফিরে আসতে পারে না মুরলী। ফিরতে রাত হয়ে যায়। আর পলুসও রাত দশটা পর্যন্ত একা একা ঘরের শূন্যতা সহ্য করতে গিয়ে যেন হাঁপাতে থাকে ; মুরলী ঘরে ফেরামাত্র রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠে পলুস—তুমি একটুক বুঝে চল জোহানা।

—কি বুঝতে বলছো?

—লিখা-পড়া শিখতে হলে এমন ক্ষেপীটি হতে হবে কেন?

হেসে ফেলে আর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আয়নার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় মুরলী। আর পলুস হালদারের চোখ দুটো মুরলীর সেই চেহারার দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে কুঁচকে যেতে থাকে।

ডরানি স্রোতের ওপারে পিয়ালের জঙ্গলের মধ্যে একটা বনবিড়াল আছে। অনেকবার দেখেছে পলুস, রঙিন রোঁয়ায় ভরা ইয়া মোটা একটা লেজ পিঠের উপর ফেলে দিয়ে স্রোতের ধারে বসে থাকে বনবিড়ালটা। কেন বসে থাকে, তা-ও জানে পলুস। স্রোত পার হয়ে এপারে এসে জোলাদের বস্তির মুর্গী চুরি করে খেতে চায় বনবিড়ালটা, কিন্তু স্রোতের জল পার হবার সাধ্যি নেই। তাই একটা উপায় বের করে নিয়েছে ধূর্ত বনবিড়াল। ওপারের বেনা ঘাসের বন থেকে বের হয়ে যখন ভুবনপুরের চাষীদের মহিষগুলি সাঁতার দিয়ে স্রোত পার হয়ে এপারে আসে, তখন একটা মোষের পিঠের উপর ঝাঁপ দিয়ে চড়ে বসে বনবিড়ালটা ; আর এপারে এসেই এক ছুট দিয়ে কচু ও ওলের বাদাড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে।

জোহানার প্রাণও কি সেই বনবিড়ালটার প্রাণের মত চালাক বটে? সন্দেহ হয়, আর এই সন্দেহ সহ্য করতে গিয়ে পলুসের বুকের হাড় কটকট করে বাজে। জোহানাও একটা স্রোতের বাধা পার হয়ে ওপারে চলে যাবার মতলব ধরেছে। তাই এই ঘরের আশ্রয় আজও ছেড়ে দিতে পারছে না জোহানা। আশি টাকা মাইনের মিস্তিরীর সাহায্য এখনও তুচ্ছ করতে পারছে না। কিন্তু পলুস হালদারকেও কি ভুবনপুরের বোকা মহিষের মত শুধু একটা সাহায্যের প্রাণী বলে মনে করে জোহানা?

—জোহানা? চেঁচিয়ে ওঠে পলুস।

—কি বটে? ছোট একটা ভ্রূকুটি করে হাসতে থাকে মুরলী।

পলুস—তোমার আর ইস্কুলে যেয়ে কাজ নাই।

মুরলী—কেন?

পলুস—না ; তোমার এত লিখা-পড়া করবার দরকার নাই। তোমার আর গানা-বাজা শিখতে হবে না। মেরিয়ার সাথে এত হাসাহাসি করে কাজ নাই। এত পাউডার দিয়ে মুখ মেজে লাভ কি? এ ঘরের মানুষের এত ঠাটে কাজ কি?

মুরলী ঠোঁট কুঁচকে হাসে—তুমি যে আমাকে কিষাণীর মত একটা গাঁওয়ারিন হতে বলছো।

পলুস—হতে দোষ কি? কিষাণীরা কি মানুষ নয়?

শাড়ির আঁচল তুলে মুখের একটা উচ্ছল হাসির শব্দ চাপা দেয় মুরলী—তবে...তবে মিছা কেন...।

পলুস—কি?

মুরলী—বেচারী সকালীকে ছাড়লে?

শিউরে ওঠে পলুস। পলুসের কলিজার গায়ে যেন একটা ছুরির খোঁচা লেগেছে। একটা ঢোঁক গিলে, বুকের ভিতরে গুমরে ওঠা একটা হাহাকারের শব্দ গিলে নেয় পলুস। একটা লাফ দিয়ে উঠে এসে মুরলীর হাত শক্ত করে চেপে ধরে।—তোমার চালাকি আর চলতে দিব না।

—কিসের চালাকি?

—বুঝে দেখ।

—বুঝিয়ে দাও।

—আমি তোমাকে ঘরের আয়না করে রাখবার লেগে বিয়া করি নাই। আমার ছেইলা চাই।

কটমট করে তাকায় মুরলী—আমার গতর তোমার হুকুমের দাসী নয়।

—হ্যাঁ, দাসী বটে। তোমার ফাঁকি আমি আর মানবো না। বিয়া করলে যাকে, তার ছুঁয়া

তোমাকে নিতে হবে। আজই নিতে হবে।

পলুসের চাহনির রকম দেখে ভয় পায় মুরলী ; পলুসের মুখের ভাষায় ওর যে দাবী দুরন্ত হয়ে উঠেছে, সে দাবী তুচ্ছ করবার অধিকার নেই মুরলীর। পলুস হালদার ছুটে গিয়ে যদি সিস্টার দিদির কাছে নালিশ করে বসে—দেখ দিদি, তোমার জোহানা বহিন ওর মরদের পিয়াস মিটাতে চায় না, মরদকে ছেইলা দিতে চায় না, তবে যে সিস্টার দিদি নিজেই ছুটে এসে জোহানাকে ধমক দিয়ে ধরম-করম বুঝিয়ে দেবে ; সিস্টার দিদির নীল চোখের রাগও জ্বলজ্বল করবে—ছিঃ, জোহানা বহিন, আমার খিরিস্তান ভাই পলুসকে দুখ দিলে তোমার ভাল হবে না।

ভুল হয়েছে। পলুসের মুখের দিকে কটমট করে তাকিয়ে পলুসকে তুচ্ছ করবার জোর এখনও মুরলীর জীবনে আসে নি। দেরি আছে এখনও। কে জানে কত দেরি? ততদিন পলুসের এই ঘরের আশ্রয় মেনে নিতেই হবে। কিন্তু পলুসের ছোঁয়া? না, কভি না ; যেমন করেই হোক, পলুসের এই দুরন্ত ইচ্ছার সাহসটাকে জব্দ করে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। কয়লা-খাদের কলঘরের মিস্তিরীকে কি ভেড়াটি করে দিতে পারা যায় না?

মুরলীর কটমটে চাহনি হঠাৎ একটা অভিমানের চাহনির মত ভঙ্গি ধরে করুণ হয়ে যায়। পলুসের চোখের হিংস্র ঘোলাটে চাহনিও মুরলীর এই অভিমানের চেহারাটার দিকে তাকিয়ে একটু আশ্চর্য হয়। জোহানার মুখটাকে দুখিনীর মুখ বলে মনে হয়। কিসের দুখ? কেন ছলছল করে বেচারা জোহানার চোখ?

—কি বটে জোহানা? গলার স্বর মৃদু করে একটা সান্ত্বনার কথা বলতে চায় পলুস।

মুরলী বলে—তোমার লাজ লাগে না পলুস? ঘরণীর সুখের সাধ মিটাতে পার না, দাসী বলে হাঁক দিয়ে ঘরণীর গতর ছুঁতে চাও...ছিয়া ছিয়া!

পলুস—তোমাকে আমি কোন্ দুখটা দিলাম?

মুরলী—কোন্ দুখটা না দিলে? কটা শাড়ি দিলে? কেমন খাওয়া খাওয়ালে? কোন্ সোনার জিনিসটা আনলে? ঘরণীকে খুশী না করে ঘরণীর গতর ছুঁতে চায়, এমন মরদ কেমন মরদ বটে?

হেসে ফেলে পলুস ঃ তাই বল না কেন?

মুরলীর অভিমানও এইবার যেন দুরন্ত হয়ে ওঠে ঃ তাই তো বলছি। তাই শুনে নাও। আমার খুশি পুরা না হলে আমি তোমার ছুঁয়া নিব না। কভি না। মেরে ফেললেও না।

পলুস বলে—শুনলাম জোহানা। কিন্তু...।

ব্যস্ত হয়ে ওঠে মুরলী—না, আর তোমার কিন্তুতে কাজ নাই। আমি ইস্কুলে চললাম ; আজ আমার লেগে আসমানী রঙের পাঁচ গজ রেশমী কাপড় নিয়ে আসবে।

চমকে ওঠে পলুস ঃ পাঁচ গজ কেন? বিশ টাকা লাগবে যে!

মুরলী হাসে ঃ হ্যাঁ, পাঁচ গজ চাই। দুটা কুঁচিদার সায়া পাঁচ গজের কম কাপড়ে হবে না।

—রেশমী কাপড়ের সায়া? পলুসের গলার স্বরে যেন একটা ভয়-পাওয়া বিস্ময় চমকে ওঠে।

মুরলী মুখ টিপে অদ্ভুত একটা লাজুক হাসি হাসে ঃ হ্যাঁ গো ভালমানুষ! মেরিয়া বলেছে...।

পলুস—কি?

মুরলী—বলেছে, জোহানা বহিনের মত নরম কোমরের মানুষ মোটিয়া কাপড়ের সায়া পরে কেন? পলুস ভাই কি কঞ্জুস বটে, না রেশমী কাপড় চোখে দেখে নাই?

পলুসের চোখে তবু সেই আতঙ্ক আর সেই বিষণ্ণ বিস্ময় সিরসির করে। ভয় পেয়েছে আশি টাকা মাইনের মিস্তিরী।

পলুসের এই ভীরু চোখের করুণতার দিকে তাকিয়ে মুরলীর চোখ দুটো খুশি হয়ে ধিকধিক করে হাসতে থাকে। মুরলীর প্রাণও যে চায় ; এই রকম ভয় পেয়ে স্তব্ধ হয়ে যাক কলঘরের মিস্তিরীর আহ্লাদ। মুরলীকে খুশি করবার আশা যেন অভিশাপ হয়ে পলুসের আশি টাকা মাইনের জীবনের সব মুরোদ চুরমার করে দেয়। মুরলীর খুশির দাবী মেটাতে গিয়ে রিক্ত নিঃস্ব ও ভিক্ষুক হয়ে যেদিন ফুঁপিয়ে উঠবে পলুস, না জোহানা, আর টাকা নাই ; সেদিন মুরলীও মনের সুখে ধিক্কার দিয়ে হেসে উঠবে, তবে আর জোহানার গতর ছুঁতে সাধ কর কেন?

যেমন দিনের পর দিন চলতে থাকে, তেমনই মুরলীরও দাবির পর দাবি চলতেই থাকে : টাকা দাও পলুস। আমার আরও পাঁচটা নতুন বহি চাই। খাতা চাই, কাগজ চাই। ছবি আঁকবার রং চাই।

কনভেন্টের স্কুলের বড় টিচার লুসিয়া দিদি বলেছে, পঁচিশ টাকা চাই, তবে মুরলীর লেখাপড়ার এইসব নতুন দরকারের জিনিসগুলি কিনে আনতে পারা যাবে। টাকা দিয়েছে পলুস। টাকা দেবার সময় হাসতে গিয়ে শুধু একটু গম্ভীর হয়েছে পলুস : তোমার লিখাপড়ার দাম যে বড় বেশি দাম বটে জোহানা।

মুরলী শুধু হাসে ; সেই পরিষ্কার ঠাণ্ডা হাসি : যদি না পার, তবে বল না কেন, ঘরণীর একটা সাধ পুরা করবারও জোর নাই তোমার?

আবার ভয় পেয়ে চমকে ওঠে পলুস। পলুস হালদারকে জীবনের এক ভয়ানক পরাভব স্বীকার করে নেবার জন্য হেসে হেসে অনুরোধ করছে মুরলী। জোহানার হাসি যেন একটা ক্ষমাহীন শর্তের হাসি। কলঘরের বড় মিস্তিরী ক্ষণিক দুর্বলতার ভুলে ভীরু হয়ে যে মুহূর্তে এই অক্ষমতা স্বীকার করে ফেলবে, সেই মুহূর্তে খিল খিল করে আরও ভয়ানক ক্ষমাহীন হাসি হেসে উঠবে। জোহানা। জোহানা যে তা হলে এই ঘর ছেড়ে তখনই দরজার দিকে দৌড় দেবে ; মুখটা ফিরিয়ে নেবে, আর ফিরে আসবেও না। বলে দেবে, খুব বলে দিতে পারবে জোহানা, তোমার ঘরে তুমি থাক গো মিস্তিরী। এমন ঘরে জোহানা থাকে না।

কয়লা-খাদের সর্দারদের কাছ থেকে প্রায়ই টাকা ধার করে পলুস। কারণ, মুরলীর ক্ষুধাটারও দাম দিন দিন বড় বেশি বেড়ে চলেছে। রান্না করতে বসলেই ঘি আর মাখনের হাঁক ছাড়ে মুরলী। রোজ খাসির মাংস না পেলে রাঁধতেই ভাল লাগে না। ভাল আনাজ না পেলে রাঁধতে ইচ্ছাই করে না। ভুবনপুর থেকে বাড়ি ফেরবার পথে রোজই একটা পাঁউরুটি কিনে আনে পলুস। নিজের জন্য নয়, মুরলীরই জন্য। গোবিন্দপুর গিয়ে রাংতা মোড়া চায়ের একটা প্যাকেট আর চা তৈরির যত সরঞ্জামও কিনে আনতে হয়েছে। লতাপাতা আঁকা চীনামাটির পেয়ালা, ডিশ আর কেটলি ; আর পেতলের জালি দিয়ে তৈরি একটা ছাঁকনিও। একদিন লুসিয়া দিদির ঘরে গিয়ে চায়ের উৎসবের স্বাদ নিয়ে মুরলী যে ওর পিপাসার রুচিটাকেও নতুন করে ফেলেছে। তাই, যে-সব জিনিস আনতে বলে দিয়েছে মুরলী, গোবিন্দপুরের বাজারের দোকানে দোকানে ঘুরে বেছে বেছে ঠিকই সেই সব জিনিস কিনে নিয়ে এসেছে পলুস। মুরলী বলে, গুড় দিয়ে চা খেতে হয় তো তুমি খাও পলুস, আমি খাব না।

পলুসের শুকনো মুখটা কেঁপে কেঁপে হাসতে চেষ্টা করে : ভাব কেন জোহানা? তোমার লেগে চিনি নিয়ে আসবো ; দুই সের চিনিতে হবে না কি?

মুরলী—হলে হবে ; না হয় তো আরও নিয়ে আসবে। আর যদি তোমার ডর লাগে, তবে আনবার দরকার নাই।

পলুস—কিসের ডর?

মুরলী—চিনি কিনতে যদি পয়সার কমতি হয়, তবে...।

পলুস ভ্রূকুটি করে ঃ চিনির দামকে তো ডরি না, ডরি তোমাকে।

মুরলী মুখ টিপে হাসে ঃ কেন?

পলুস—চিনি তো আর তোমার মত...।

পলুসের মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে মুরলীই চেঁচিয়ে হেসে ওঠে ঃ আমার মত ঠগ নয়।

পলুস হাসে ঃ দাম পেলে চিনি খুশি হয় আর মিঠাও হয়। কিন্তু তুমি দাম পেয়েও মিঠা হতে চাও না।

মুরলী হাসে ঃ দুই সের চিনি দিয়ে জোহানাকে কিনে নিতে চাও ; জোহানাকে তুমি এত সস্তার সওদা মনে কর কেন, পলুস?

হাসপাতাল থেকে ঘরে ফেরবার পর এই তো মাত্র একটা মাস পার হয়েছে। মুরলীর মুখটা একটু রোগা রোগা হয়ে আরও সুন্দর হয়েছে। কালো চোখ দুটো আরও কালো হয়েছে। কী সুন্দর ঝরঝরে হয়ে গিয়েছে শরীরটা! রঙিন শাড়ির আঁচল দিয়ে জড়ানো সরু কোমরটা ফুলেলা লতার মত সব সময় দোলে। পলুস হালদারের চোখ বার বার পিপাসু হয়ে তাকিয়ে থাকে। মনে পড়ে পলুসের, হ্যাঁ, আর ভাবনা করবার কিছু নাই। জোহানার এই গতর ঠগ গতর নয়। পলুসকে এইবার ছেইলা দিতে পারবে জোহানা।

কিন্তু এক মাস ধরে পলুসের চোখের এই পিপাসার বিরুদ্ধে শরীরটাকে কী কঠোর সাবধান রেখেছে মুরলী। ঘুমের ঘোরেও চমকে জেগে ওঠে মুরলী ঃ না না না ; তুমি সর পলুস। আমাকে মিছা জ্বালাবে না তুমি। পলুসের হাত ঠেলা দিয়ে সরিয়ে বিছানার উপর ধড়ফড় করে উঠে বসেছে মুরলী।

—সোয়ামিকে ছেইলা দিবে না, কেমন ঘরণী বট তুমি? মুরলীর গায়ে ঠেলা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে পলুস। মুরলীও যেন ভাঙা ঘুমের বেদনার চোখ ঘষে ঘষে ছটফট করেছে, আর বিছানা থেকে নেমে গিয়ে বিড়বিড় করছে।—দূর দূর।

চিৎকার করে ওঠে পলুস—কাকে দূর দূর কর?

পলুসের চিৎকারের শব্দ শুনে বাইরের বারান্দার কোণে ঘুমন্ত কুকুরটাও চিৎকার করে ওঠে। মুরলী খিল খিল করে হাসে ঃ কুকুরটা কার ছেইলা বটে পলুস? তোমার বটে কি?

মুরলীর হাসির শব্দ শুনে পলুসের কান দুটো জ্বলতে থাকে। আবার চেঁচিয়ে ওঠে পলুস।—পলুস হালদারের ঘর রগড়ের ঘর নয়। এমনটি আর চলবে না জোহানা।

মুরলীর চোখ দুটো আবার অভিমানে কাতর হয়ে পলুসের দিকে তাকায়। পলুসের তপ্ত মেজাজটাও করুণ হয়ে যায়।—কি বটে?

মুরলী—আমি কি তোমার ধমকের কামিন?

পলুস হাসে ঃ না জোহানা। বল না কেন, আর কি চাও তুমি?

মুরলী—বলতে তো পারি ; কিন্তু দিতে পারবে কি?

পলুস—নিশ্চয় দিব।

হার মানেনি পলুস। পাঁচটা নতুন শাড়ি কিনতে হয়েছে। গোবিন্দপুরও তিনবার যেতে হয়েছে, সাবান পাউডার আর গন্ধতেল কিনে আনতে হয়েছে। কিন্তু মুরলীর দাবীর ভাষা যেন বিকার রোগীর গানের মত থামতেই চায় না।—রূপার সুতলির হার আর দুটা সোনার মটরদানা ; এমন জিনিস ছুঁতে আমার ঘিন্না লাগে পলুস।

—কেন?

—আমি দেহাতের কিষাণী নই ; জোহানাকে খুশী করতে চাও তো এইরকমটি নিয়ে এসো।

সত্যিই একটা বই খুলে একটা সোনার হারের ছবি দেখিয়ে দেয় মুরলী। ফ্যালফ্যাল করে

তাকিয়ে থাকে পলুস ঃ এটার দাম যে দুশো টাকার বেশি হবে।

—তবে বল না কেন, দিতে পারবে না!

আবার পলুসের বুকের ভিতরে একটা ভীরু নিঃশ্বাসের আতঙ্ক চমকে ওঠে। এ তো সোনার হারের দাম নয় : জোহানার এই সুন্দর গতর স্পর্শ করবার দাম। এই দাম দিতে না পারলে জোহানাকে হাতে ধরে বুকের কাছে টানবার কোন অধিকার হবে না। সেই ভয়ানক শক্ত শর্তের সত্যটি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে জোহানা।

ভুবনপুরের কাবুলী মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার করে দুশো ষাট টাকা দামের হার গোবিন্দপুর থেকে কিনে আনতে আর বেশি দিন দেরি করে না পলুস। সেই হার গলায় পরে ; গলায়, ঘাড়ে, বুকে আর মুখে পাউডার ছড়িয়ে, আর নরম ঠোঁটের উপর লাল রঙের প্রলেপ বুলিয়ে রবিবারের সকালে যখন গির্জা যাবার জন্য তৈরি হয় মুরলী, তখন আবার একটা বিস্ময়ের জ্বালা সহ্য করতে গিয়ে বিড় বিড় করে পলুস ঃ প্রেয়ার সাধতে যাবে, তাতে এত ঠাটের কি দরকার হয়?

কোন উত্তর না দিয়ে ঘরের দরজা পার হয়ে সড়কের উপর গিয়ে দাঁড়ায় আর গির্জাবাড়ির চূড়াটার দিকে তাকায় মুরলী। ডিং ডাং ডিং ডাং—হারানগঞ্জের বাতাস যেন গান গেয়ে মুরলীর প্রাণের একটা স্বপ্নকে কাছে ছুটে আসবার জন্য আহ্বান করছে। পলুস গির্জায় যাবে কি যাবে না, এই প্রশ্ন আর মুরলীর জীবনে নেই। পলুসের রওনা হবার আগেই রওনা হয়ে যায় মুরলী। মুরলীর সেই ছুটন্ত উল্লাসের দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে সেদিন গির্জা যাওয়াই বন্ধ করে দিয়ে ঘরে বসে থাকে পলুস।

সেদিন গির্জা থেকে ফিরে এসে মুরলীও একটু আশ্চর্য হয়। এত রোদ উঠেছে, এত বেলা হয়েছে, তবু এখনও কয়লা-খাদের কলঘরে যাবার জন্য পলুসের কোন ব্যস্ততা নেই। আজ কি সারাটা দিন ঘরে বসে থেকে আর মুরলীকে সামনে বসিয়ে রেখে মুরলীর গলায় সোনার হারটাকে ঘাঁটাঘাঁটি করবে পলুস?

পলুস ডাকে—জোহানা?

মুরলীর চোখের পাতা কেঁপে ওঠে। পলুসের আহ্বানের স্বর যেন একটা দুরন্ত গর্বের স্বর। সন্দেহ করে পলুসের মুখের দিকে তাকায় মুরলী ; সেই মুহূর্তে বুঝতে পারে, ঠিকই সন্দেহ করা হয়েছে। জোহানাকে এখনই বুকের কাছে পাওয়ার জন্য পলুসের চোখে নিবিড় পিপাসার ভাব টলমল করছে। পলুসের তাকাবার ভঙ্গীটাও যেন একটা কঠোর প্রতিজ্ঞার ভঙ্গী।

—কি পলুস? হাসতে চেষ্টা করে মুরলী।

পলুস—এসো।

না, আর উপায় নেই—পলুসের জীবনের হিসাব এইবার প্রচণ্ড হয়ে যেন একটা জয়ের উল্লাস ভোগ করতে চাইছে। হার মানে নি পলুস ; আশি টাকা মাইনের মিস্তিরী দুশো ষাট টাকা দামের সোনার হার নিয়ে এসে মুরলীকে উপহার দিয়েছে। খুশি না হবার যে আর কোন উপায় নেই মুরলীর। আর, পলুসের এই আহ্বান মিথ্যে করে দেবার জন্য সরে থাকবার মত কোন ছুতোই যে কল্পনা করতে পারে না মুরলী।

কলঘরের এই মিস্তিরীটার ছোঁয়া নিতে হবে, ওকে ছেইলা দিতে হবে। হায় গড, এ কোন্ ডাকাইত এসে জোহানার গতর লুঠ করতে চায়? এটার ছায়া ছুঁতেও যে ঘিন্না করে। এটাই তো সেই ডাকাইতটা, মুরলীর পেটের ছেইলাকে মুরলীর কোলে উঠতে দেয় নাই যে ; এ ডাকাইতের মার খেয়ে রক্ত বমি করে মরে যাওয়া ভাল, তবু ওর ছেইলা পেটে নিব না। না না না...কভি না।

চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী—না।

পলুস—কি?

মুরলী—তুমি আমাকে ছুঁ'বে না।

হিংস্র ক্ষুধাব বাঘের মত লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে মুরলীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পলুস। মুরলীর গায়ের শাড়িটাকে এক টান দিয়ে খসিয়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। মেঝের উপর লুটিয়ে বসে পড়ে মুরলী। মুরলীর গায়ের জামাটা তিন টানে ফরফর করে ছিঁড়ে তিন ফালি নেকড়া করে দিয়ে দূরে ছুঁড়ে দেয় পলুস।

রেশমী কাপড়ের কুঁচিদার সায়া, বড় নরম আর বড় মোলায়েম, মুরলীর সরু কোমর ঘিরে নরম পালকের সাজের মত দুলছে যে রঙিন আবরণ, সেটাকেও তিন টান দিয়ে ফালি ফালি করে ছিঁড়ে দেয় পলুস। পলুসের নিঃশ্বাসের বাষ্প আর মুখের আঠা-আঠা থুথুর কণা মুরলীর আদুড় বুকের উপর ছিটকে পড়তে থাকে। দু হাতে শক্ত করে মুরলীর কোমরটাকে যেন চুপসে দিয়ে জড়িয়ে ধরে পলুস—জোহানা, খবরদার!

দুই হাত দিয়ে পলুসের মাথাটাকে ঠেলে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী—না।

—জোহানা।

—না।

এক পাটি দাঁতের সাদা হিংস্রতা দিয়ে নিজেরই ঠোঁটের উপর কামড় বসিয়ে নিয়ে পলুসের মুখটা বীভৎস হয়ে ওঠে। মুরলীর যে অবাধ্য ও উদ্ধত হাঁটুটা বজ্রপাথরের বাধার মত কঠোর হয়ে পলুসের বুকের হাড়ে ঠেকে রয়েছে, পলুসের একটা হাত মাংসাশী আক্রোশের থাবার মত নখ বের করে মুরলীর সেই হাঁটুটাকে আঁকড়ে ধরে। বাধাটাকে নুইয়ে শুইয়ে আর মেঝের উপর চেপে রাখতে গিয়ে পলুসের হাতের হাড়ের গিঁটগুলি মটমট করে বাজতে থাকে।

চমকে ওঠে পলুস। হঠাৎ কুকুরটা ডেকে উঠেছে। সেই সঙ্গে আর একটা ডাকও শোনা যায়—বড় মিস্তিরী ঘরে আছ? কয়লা-খাদের চাপরাসী ছটু মিঞার গলার স্বর।

পলুসের হাত কেঁপে ওঠে। হাতের হাড়ের সব আক্রোশও যেন নেতিয়ে পড়ে। উত্তপ্ত কপালের সব ঘাম হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

—বড় মিস্তিরী! কয়লা-খাদের খাজাঞ্চির গলার স্বর।

দরজা খুলে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ায় পলুস। খাজাঞ্চি বলে—তুমি আজ কাজে যাও নাই কেন?

পলুস—ঘরে কাজ ছিল।

খাজাঞ্চি—যাই হোক ; তোমার এখনই রওনা হতে হবে। ম্যানেজার সাহেবের অর্ডার।

পলুস—কোথায় যেতে হবে?

খাজাঞ্চি—তুমি এখনই বাবুরবাজারে গিয়ে রামগড়ে যাবার বাস ধরবে। তারপর রেলের টিকিট কেটে সোজা চলে যাবে ডালটনগঞ্জ। সেখান থেকে তিন ক্রোশ হবে, মৌপুর সিমেণ্টের কারখানা। আমাদেরই মালিকের কারখানা।

পলুস—সেখানে আমার কি কাজ?

খাজাঞ্চি—তুমি অন্তত একটা বছর সেখানে কলঘরে কাজ করবে। তোমাকে বদলি করা হয়েছে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পলুস। খাজাঞ্চি এইবার একটু রুক্ষস্বরে হুকুম করে—চলে এসো মিস্তিরী। সড়কে আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তোমাকে এখনই বাবুরবাজারে পৌঁছে দিয়ে চলে যাব। ম্যানেজার সাহেবের অর্ডার।

ব্যস্তভাবে কথা বলতে বলতে খাজাঞ্চি হঠাৎ নিজেই যেন একটু অব্যস্ত হয়ে যায়। দু বার ঢোঁক গিলে ও তিনবার গলাখাঁকারি দিয়ে আর ভুরু টান করে দরজার দিকে তাকায়। যার রূপের কথা বলতে বলতে বার বার দোক্তা আর পান মুখে পুরেছিল বিজু বাঈ, দরজার

কাছে তারই রূপ দেখতে পেয়েছে খাজাঞ্চি। কী চমৎকার বেলাজ হয়ে, আদুড় শরীরের উপর শুধু একটা গোলাপী রঙের রেশমী শাড়ির ফিনফিনে বাহার এলোমেলো করে জড়িয়ে আর ছড়িয়ে, আর কী সুন্দর মুচকি হাসিটি হেসে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে মিস্তিরীর বউটা! এমন জিনিস ঘরের বার হতে চায়? ঠিকই বলেছে বিজু বাঈ, খবর পেলে লাখটাকার বাবু ওই তেজবাবু নিজেই গাড়ি হাঁকিয়ে ছুটে এসে এই ঘরের দরজায় দাঁড়াবে আর হাজার টাকা আগাম দিয়ে ওকে লুফে নিয়ে চলে যাবে।

আবার গলাখাঁকরি দেয় খাজাঞ্চিবাবু, পলুসের হতভম্ব মুখটার দিকে তাকিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—চল হে মিস্তিরী। দেখতে দেখতে একটা বছর পার হয়ে যাবে, তারপর ফিরে এসে হারানগঞ্জের হাওয়া যত খুশি খেতে চাও খেয়ো। এখন আর মিছিমিছি...।

মুরলীর কালো চোখের তারা দুটো ঝিলিক দিয়ে হেসে ওঠে, হেসে উঠেছে একটা মুক্তির আশ্বাস। আঃ, গড বাবা তোমার ভাল করেন বিজু বাঈ।

দরজার কাছ থেকে সরে ঘরের ভিতরে চলে যায় মুরলী। আর, পলুস হালদারও ঘরের ভিতরে ঢুকে মুরলীর সেই উৎফুল্ল গোলাপী চেহারাটার দিকে একজোড়া হিংস্র চোখের জ্বালা ছুঁড়ে দিয়ে তাকিয়ে থাকে। তার পরেই ঝোলার মধ্যে কাপড়-চোপড় ভরে, একটা বালিশকে কম্বলে জড়িয়ে নিয়ে, আর দেয়ালের গায়ে ঝোলানো বন্দুকটাও তুলে নিয়ে এক হাতে জড়িয়ে ধরে পলুস।

—আমি তো চললাম। বলতে গিয়ে পলুসের দাঁতে দাঁতে ঘষা খেয়ে যেন একটা জব্দ অদৃষ্টের আক্ষেপ শব্দ করে বেজে ওঠে।

মুরলী বলে—যাও না কেন? আমি না বলবো কেন?

পলুস—তুমি আর এ ঘরে থাক কেন? যেথা মন চায় এখনই চলে যাও।

মুরলী—কেন যাব? আমি এ ঘরেই থাকবো।

পলুস—খাবে কি? কে টাকা দিবে?

মুরলী—তুমি দিবে।

পলুস—আমি দিব না।

মুরলী—বেশ, দিও না। সিস্টার দিদিকে বলবো, পলুস হালদার ওর ঘরণীকে ভুখা রেখে মরাতে চায়।

চমকে ওঠে পলুস। একটা ভয়ের চমক। সিস্টার দিদি বিরূপ হলে পলুসের চাকরি যে একটি অভিযোগের চিঠিতেই খতম হয়ে যাবে। পলুসের আশি টাকা মাইনের জীবনের সবচেয়ে বড় নির্ভয়ের মধ্যেই যে সবচেয়ে বড় ভয় লুকিয়ে আছে ; সেই ভয়টাকে খুঁচিয়ে দিয়ে মুরলীর ঠোঁট দুটো কী ভয়ানক চতুর হাসি হাসছে!

কিন্তু সিস্টার দিদির কি বিচার নাই? কোন্ সাহসে এত ডর দেখায় জোহানা? নিজেরই ঘরের মরদের পিপাসাকে আজ অপমান করে যে পাপ করেছে জোহানা, জোহানার সেই পাপ কি মাপ করতে পারে সিস্টার দিদি?

চেঁচিয়ে ওঠে পলুস।—আমি সিস্টার দিদিকে বলবো।

—কি বলবে?

—যা বলবার বলবো।

ভ্রূকুটি করে মুরলী—কবে বলবে?

পলুসের চোখে যেন শেষ প্রতিজ্ঞার আর চরম মীমাংসার শেষ আশাটা তপ্ত হয়ে জ্বলতে থাকে ঃ যেদিন ফিরে আসবো।

—এসো তবে। একেবারে নির্বিকার শান্ত ও প্রসন্ন একটা মুখ নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে মুরলী।

বাইরে থেকে খাজাঞ্চির হাঁক শোনা যায়—এসো মিস্তিরী।

চলে গেল পলুস।

পলুস খালদারের এই খবটাকে সহ্য করতে আর ইচ্ছা হয় না। এই একলা জীবনটাকেও সহ্য করতে ভাল লাগে না। কনভেণ্টের স্কুলে যাবার সময়, প্রেয়ার সাধবার জন্য গির্জাবাড়িতে যাবার সময়, আর মাঝে মাঝে লুসিয়া দিদির বাড়িতে পিয়ানোর বাজনা সাধতে যাবার সময় যখন এই ঘরের দরজার শিকল তুলে দিয়ে তালা বন্ধ করে মুরলী, তখন মুরলীর নিঃশ্বাসের শব্দও ছটফট করে ফুঁপিয়ে ওঠে ঃ আর কতদিন?

প্রথম একটা মাস রোজই ঘরের নিভৃতে চুপ করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একবার না একবার একটু আনমনা হতে হয়েছে। আয়নার বুকের উপর আঙুল বুলিয়ে আশার হিসাব তে গিয়ে হিসাবটা মাঝে মাঝে হিজিবিজির মত হয়ে গিয়েছে। দুশ্চিন্তায় পড়তে হয়েছে। টাকা পাঠাবে কি পলুস? যদি না পাঠায়, তবে?

একটা মাস শুধু একটু ভাবতে ভাবতে পার হয়ে গেল। কিন্তু, শুধু একটি মাস, তারপর আর নয়। পলুসেরই পাঠানো চল্লিশটা টাকা ডাকপিওনের কাছ থেকে হাতে তুলে নিতে গিয়ে মুরলীর প্রাণ যেন মুখ টিপে হেসে ওঠে। কলঘরের মিস্তিরী এখনও বোঝে নি যে, জোহানাকে নিয়ে আর ওর ঘর করা হবে না, হতে পারে না। ঘর করবার জোর আর ওর নেই। কয়লা-খাদের একটা সর্দার কিংবা কলঘরের একটা খালাসীর বেটিকে বিয়া করে নিয়ে এসে এই ঘরে থাকুক না কেন পলুস।

পরের মাসগুলি যেন চমৎকার এক নির্ভাবনার হাওয়ায় ফুরফুর করে উড়ে যেতে থাকে। ফিরে আসে নি পলুস। এক মাস পরে নয়, দু মাস পরেও নয়। ছটা মাস পার হয়ে গিয়ে ফাল্গুনের দিন এসে হারানগঞ্জের ডাঙার যত আম নিম আর অশত্থের গায়ে নতুন পাতার উৎসব ছড়িয়ে দিল. তবু ফিরে এসে শেষ প্রতিজ্ঞার হিসেব নিকেশ করবার সুযোগ পেল না পলুস। ছুটি পায় নি বুঝি পলুস মিস্তিরী।

কনভেণ্টের একটি ঘরে মেরিয়ার কাছে বসে লেস বুনতে বুনতে মুরলীর হাতের কাঁটা দুটোও যেন ব্যাকুল হয়ে ছটফট করতে থাকে। কথা বলতে গিয়ে মুরলীর মুখের হাসিও কলকল করে।

মেরিয়া বলে—তুমি তো হাসছো জোহানা, কিন্তু পলুস বেচারা যে এখন...।

মুরলী—কি?

মেরিয়া—কত তরাস ভুগছে বেচারা!

মুরলী—কেন, কিসের লেগে?

মুরলীর কোমরে একটা মৃদু অভিযোগের চিমটি কেটে হেসে ওঠে মেরিয়া—এটার লেগে।

মুরলীর মুখটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়। বেশ একটু বিরক্ত হয়ে ভুরু কুঁচকে বিড়বিড় করে—ছিয়া ছিয়া! এমন কথা আর বলবে না মেরিয়া ; শুনতে ভাল লাগে না।

মেরিয়াও হঠাৎ হাসি থামিয়ে মুরলীর মুখের দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকায়। ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে—পলুস কি তোমাকে চিঠি দেয় নাই?

মুরলী—কেন চিঠি দিবে? দরকার কি?

আরও আশ্চর্য হয় মেরিয়া—তুমি চিঠি দিয়েছ কি?

মুরলী চেঁচিয়ে ওঠে—আমি কেন চিঠি দিব? দরকার কি?

মেরিয়ার চোখের বিস্ময় এইবার কি-যেন সন্দেহ করে মুরলীর মুখের এই অদ্ভুত রাগটার দিকে মায়া করে তাকিয়ে থাকে। হ্যাঁ, কোন্ ঘরণী না এইরকম রাগটি করে, ঘরের মরদ যদি তাকে একা ঘরে রেখে দিয়ে দূর দেশে চলে যায়, আর ছয়টি মাসের মধ্যে একবারও ঘরে না

আসে? জোহানার যে লিখাপড়ার বড় সাধ আছে ; আরও কত কিছু শিখবার লেগে দিনরাত কত খাটছে বেচারা। তাই পলুসের সঙ্গে মৌপুর সিমেন্টের কারখানাতে যেতে পারে নি জোহানা। সেটা কি-এমন অপরাধ হল যে, চিঠি না দিয়ে জোহানার মনটাকে এত কঠোর সাজা দিচ্ছে পলুস? তাই তো জোহানার মনের রাগ আর অভিমান এমন কঠোর হয়ে উঠেছে!

মেরিয়া হাসে--কবে ফিরবে পলুস?

মুরলী--জানি না।

মেরিয়া--কতদিনের বদলি?

মুরলী--এক বছর।

মেরিয়া মুখ টিপে হাসে--তবে তো আরও ছটা মাস বটে জোহানা।

মুরলী--হবে।

মেরিয়া চোখ টিপে হাসে--বড় ভাল হবে।

মুরলী বিরক্ত হয়ে ভ্রূকুটি করে--কেন?

মুরলীর গায়ের উপর ঢলে পড়ে আর খিলখিল করে হেসে ওঠে মেরিয়া--যত বেশি রাগ হবে, যত বেশি দিন মিছা যাবে, মজাও তত বেশি জমবে।

মুরলী আবার ভ্রূকুটি করে--কিসের মজা?

মেরিয়া--ফিরে আসুক পলুস ভাই ; তারপর দেখ না কেন, এক বছরের হিসাব কিরকমটি নিয়ে ছাড়ে!

--ছিয়া ছিয়া! গম্ভীর হয়ে মেরিয়ার এই অসার খুশির মূর্খতা আর মুখরতাকে যেন ধিক্কার দেয় মুরলী, আর মেরিয়াকে একটা ঠেলা দিয়ে সরিয়েও দেয়। তারপর ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের সড়কের দিকে তাকিয়ে থাকে।

বিকেল হয়েছে। তাই সড়কের দিকে তাকাতে হয়। মেরিয়ার ঘরে বিকেল পর্যন্ত বসে থাকার উদ্দেশ্য শুধু মেরিয়ার সঙ্গে হাসি-গল্প সেলাই আর লেস বোনবার জন্য ব্যস্ত-ব্যাকুল একটা সাধের সাধনা নয়। বিকেল হলে এই সড়কের উপর দিয়ে সাইকেলে চড়ে রোজ একটি মানুষকে চলে যেতে দেখতে পায় মুরলী, ডাক্তার রিচার্ড সরকার। কিন্তু রিচার্ড সরকারের চোখ দুটো আজও উদাস হয়ে রয়েছে। জানালার দিকে তাকিয়েও যেন বুঝতে পারে না রিচার্ড, কেউ সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। কিংবা, মুরলীকে দেখতে পেয়েও যেন চিনতে পারে না। অথবা চিনতে পেরেও একবার মুখ ফিরিয়ে তাকাবার দরকার আছে বলে মনে করে না। রিচার্ডের মত মানুষের চোখের কাছে একটা বিস্ময়ের শোভা হয়ে উঠতে মুরলীর জীবনে এখনও যে অনেক চেষ্টার কাজ বাকি আছে! রিচার্ডের চোখের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার সময় এখনো আসে নি।

সড়কের উপর দিয়ে রিচার্ড সরকারের সাইকেল-চড়া মূর্তিটা চলে যেতেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে মুরলী।--আমি চলি মেরিয়া। লুসিয়া দিদির সাথে আজ আমার ঝগড়া আছে।

মেরিয়া--কেন জোহানা?

মুরলী--লুসিয়া দিদি আজও আমাকে কিছু শিখালে না কেন?

মেরিয়া আশ্চর্য হয়--তিন-তিনটা গান গাওয়া করতে আর বাজাতে শিখে ফেলেছো তুমি, আর কত শিখবে জোহানা? আর কত চাও তুমি?

মুরলী--ওরকম তিনটা টিটাং টিটাং শিখে কিছু হবে না। লুসিয়া দিদি যে মঙ্গল কোরাস বাজায় সেটা, যদি না শিখে নিতে পারি তবে...।

মেরিয়ার চোখের বিস্ময় আবার সন্দিগ্ধ হয়--তবে কি?

--তবে তোমার মাথা। হাসতে হাসতে মেরিয়ার গালে একটা মৃদু আহ্লাদের চড় মেরে

চলে যায় মুরলী।

ঘরে ফিরে এসে হাঁপ ছাড়ে মুরলী ; কিন্তু এটা ক্লান্তিভরা জীবনের হাঁপ নয়। পলুসের এই ঘরের ভিতরে মুরলীর একলা-জীবন যেন অক্লান্ত চেষ্টা আর ব্যস্ততার জীবন। মাঝরাতের ঘুমভীরু পাখির ডাকও যখন ক্লান্ত হতে হতে শেষে একেবারে চুপ হয়ে যায়, তখনও জ্বলন্ত বাতির কাছে খোলা-বই রেখে পাঠ মুখস্থ করে মুরলী। কাগজের পাতা ভরে খোলা-বইয়ের চমৎকার ভাষার কথাগুলি লিখে লিখে পড়ে। তারপর আর-একটা বই হাতের কাছে টেনে নেয়।

কী সুন্দর হিসাবের কথা লিখেছে এই বইটা, আট আনা দামের এই সরল-অঙ্ক। রোজের বাজার খরচ থেকে প্রতিদিন সাত আনা পয়সা বাঁচিয়ে জমা করে রাখতে পারলে কতদিনে তুমি ভুবনপুরের মেলা থেকে একটা ভাল গরু কিনতে পারবে? সে ভাল গরুর দাম সত্তর টাকা।

লিখে লিখে হিসাব করে মুরলী। হাসতে থাকে মুরলীর দুই চোখের তারা ; সত্যিই গভীর রাতের কালো আকাশের তারার মত ঝিকিমিকি হাসি। কী ভেবেছে মেরিয়া, ঠিক হিসাব করতে পারবে না জোহানা? তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ মেরিয়া বহিন ; কোন হিসাবকে ডরায় না জোহানা।

সরল অঙ্কের প্রশ্নটাকে একটুও ভয় করে না মুরলী। কিন্তু সত্যিই ভয় পায় তখন, যখন হিসাব করে বুঝতে পারে যে, মাত্র আর ছটা মাস পরেই এই ঘরে ফিরে আসবে পলুস হালদার। তখন কী হবে উপায়? মুরলীর যে আরও অনেক কিছু শেখবার বাকি আছে। এখনও যে ঠিক তৈরী হতে পারে নি মুরলী। এখনও যে পলুসের পাঠানো টাকা হাত পেতে নিতে হয়। রিচার্ড সরকার যে এখনও মুরলীর মুখের দিকে ভাল করে তাকাতে চায় না।

যতদূর সাধ্যি, মন-প্রাণের সব চেষ্টা নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি তৈরী হতে চায় মুরলী। হে গড, এই ছয়টা মাস যেন বেশি তাড়াতাড়ি করে ফুরিয়ে না যায়! কিন্তু মাসগুলি যেন বড় তাড়াতাড়ি হারানগঞ্জের আকাশের মেঘ হয়ে, ডাঙ্গার ধুলোর ঝড় হয়ে আর জঙ্গলের শালের ফুল হয়ে উড়ে ঝড়ে শেষ হয়ে যেতে থাকে। ছুটোছুটি করে বার বার লুসিয়াদিদির কাছে যেয়ে, পিয়ানোতে হাত চালিয়ে সুর ঢালতে শিখেও বুঝতে পারে মুরলী, আশার কাজটা সোজা সহজ কাজ নয়। পুরা পাঁচটা মাস পার হয়ে গেল, তবু মঙ্গল কোরাসের সুরটা ঠিকমত তুলতে পারছে না মুরলী। লুসিয়াদিদি কিন্তু আশা করে হাসে—হবে হবে, আরও দুতিনটা মাস লাগবে, তোমার হাতে খুব ভাল সুর খেলবে, জোহানা।

আরও দু-তিনটা মাস? হায় আশা! মুরলীর প্রাণের সব আশার সুর স্তব্ধ করে দেবার জন্য আর একমাস পরেই যে মিস্তিরী পলুস হালদার এসে পড়বে।

যতক্ষণ কনভেন্টের স্কুলবাড়ির ভিতরে ঘোরাঘুরি আর ছুটোছুটি করে মুরলী, ততক্ষণ মুরলীর আশার প্রাণটাও যেন শান্ত ও নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে। কিন্তু ঘরে ফিরে এসে যখন একলা হয়ে যেতে হয়, তখন মনটা মাঝে মাঝে খুব অশান্ত হয়ে ছটফট করে। একদিন স্বপ্ন দেখে চমকে উঠেছে বুকটা ; কিন্তু ঘুম ভাঙতেই স্বপ্নটাকে একটা সান্ত্বনা বলে মনে হয়েছে। ভাল মজার স্বপ্ন ; কলঘরের মিস্তিরী পলুস হালদারের একটা পা কাটা পড়েছে, হাসপাতালে গিয়েছে পলুস। ডাক্তার বলেছে, ঠিকমত সেরে উঠতে ছ'টা মাস সময় লাগবে।

রবিবার, তাই আজ আর কনভেন্টের স্কুলবাড়িতে যেতে হয় নি। শুধু সকালবেলাতে প্রেয়ার সাধবার জন্যে গির্জাবাড়িতে যেতে হয়েছিল। দেখতে পেয়েছে মুরলী, ডাক্তার রিচার্ড সরকারের সঙ্গে দু'টো জোয়ান বয়সের মেয়ে হাসাহাসি করে গির্জাবাড়িতে এল আর প্রেয়ার সেধে চলে গেল। কে ওরা? কোথা থেকে এল ওরা? কোথায় থাকে ওরা? ওদের সাথে এত হাসাহাসি করে কেন রিচার্ড সরকার?

বিকেলে একবার, আর সন্ধ্যা হলে একবার, দুবার স্নান করেছে মুরলী। কিন্তু মুরলীর বুকের দুরুদুরু ভাবনার কাঁপুনিটা তবু শান্ত হয় নি। কী সুন্দর কথা বলে ওই দুটো মেয়ে। ওদের কথার মধ্যে যেন রাঙা পলাশের রং আছে, ফোটা গোলাপের গন্ধ আছে, আর মিষ্টি পিয়ানোর সুর আছে। ঠিকই তো, ওদের সাথে হাসাহাসি করবে না কেন রিচার্ড সরকারের মত মানুষ, যে মানুষ ফুলবাড়িতে থাকে?

—কে বটে তুমি? কে দাঁড়িয়ে ওখানে? চমকে ওঠে, উঠে দাঁড়ায়, আর ঘরের খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে মুরলী। দরজার কাছে একটা রঙীন শাড়ির আঁচল ফুরফুর করে উড়ছে, আর, সোনালী জরি দিয়ে বাঁধা মস্তবড় খোঁপা নিয়ে একটা মাথা কাত হয়ে রয়েছে। হাসছে একটা মুখ, জরদা দিয়ে পানখাওয়া একটা লালচে হাসির মুখ।

জরি দিয়ে বাঁধা খোপাটা দুলে ওঠে, আর, যেন হেসেও ফেলে—আমি গো ; আমি বিজু বাঈ।

—তুমি এখানে এলে কেন? দুই চোখ শক্ত করে আর রুক্ষ স্বরে ধমক দিয়ে কথা বলে মুরলী।

বিজু বাঈ এগিয়ে এসে ঘরের ভিতরে ঢোকে আর খুবই আশ্চর্য হয়ে যায়।—এরকমটি মেজাজ করে কথা বলছো কেন?

—তুমি যাও। চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী।

—যাবই তো, কিন্তু আমার কথাটা একবার শুনবে, তবে তো...।

—না, কিছু শুনবো না। জান না তুমি, এটা যে খিরিস্তানের ঘর? এখানে আসতে ডর লাগে না তোমার?

চেঁচিয়ে ওঠে বিজু বাঈ—থাম গো লাটের বোট। আমাকে মিছা ডরাতে চেষ্টা করবে না।

নীরব হয়ে, বিজু বাঈয়ের লালচে মুখের ধমকের কাছে যেন একটা স্তব্ধ ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মুরলী। বিজু বাঈ এইবার যেন করুণ অভিমানের সুরে কথা বলে—তুমিই বলেছিলে যে, সুখের ঘরে থাকতে চাও। তুমিই বলেছিলে তাই মিস্তিরীকে দূরে সরিয়ে দিলাম। তুমি খুশি হয়ে আমাকে একটা পানও দিলে না, উল্টা আমাকেই ধমক দিয়ে...।

হাসতে চেষ্টা করে মুরলী—বল তুমি ; তাড়াতাড়ি বল ; কী বলতে চাও?

বিজু বাঈ—তেজবাবুর নাম শুনেছ কি? জিতগড়ের তেজবাবু?

মুরলী—না, শুনি নাই। শুনে কাজ নাই।

বিজু বাঈ—বিশ্বাস কর ; টাকার খাদ আছে তেজবাবুর। টাকা দিয়ে দেয়াল গেঁথে তোমার সুখের ঘর করে দিতে পারে তেজবাবু। এক রাতের হরিণ শিকার খেলতে এক হাজার টাকা খরচ করে তেজবাবু! তাই বলতে এসেছি...।

মুরলী—কি?

বিজু বাঈ—তেজবাবুর একটা লোক, আমার নাগর সেই ঠিকাদার বেটা কাল রাতে তোমার এখানে আসবে।

—কেন আসবে? চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী।

বিজু বাঈ হাসে—পাঁচ শত টাকা, এক হাঁড়ি বালুসাই—ঝরিয়ার মতিচাঁদের বালুসাই গো—এক থান সিলিক কাপড় আর এক বোতল বিলাতী সরাব নিয়ে দাদন করে যাবে ঠিকাদার তুমি ওকে বলে দিও, ঠিক কবে আবার এসে তোমাকে নিয়ে যাবে।

কলকল করে হেসে ওঠে মুরলী—একটুক দেরি করতে বল দিদি ; কাল যেন না আসে।

বিজু—তবে কবে?

মুরলীর গলার স্বর হঠাৎ একেবারে নিবিড় হয়ে করুণ মিনতির মত ছলছল করে।—মিস্তিরীকে আরও একটা বছর দূরে সরিয়ে রাখ না কেন, দিদি? আমি যে এখনও মন ঠিক

করি নাই দিদি। কিন্তু মিস্তিরী এসে পড়লে আমার সুখের সব আশা মরা ঘাসের পোকাটির মত মরে যাবে। তুমি আমার কথাটি রাখ দিদি।

বিজু বাঈ হাসে—বেশ তো ; তাই হবে। তুমি ভেব না।

মুরলী—দেখো দিদি, মিস্তিরীটা যেন দুটা দিনেরও ছুটি না পায়।

—পাবে না, পাবে না। আমি সব ঠিক করে দিব। হেসে হেসে ছটফট করে একটা হাত এগিয়ে দেয় বিজু বাঈ—দাও দেখি, এক বাটি ভাল জল দাও, পিয়ে নিয়ে চলে যাই। ঠিকাদার বেটা সড়কের আঁধারে একা দাঁড়িয়ে আছে।

কাচের গেলাসে জল ভরে নিয়ে বিজু বাঈয়ের হাতের কাছে এগিয়ে দেয় মুরলী। জল খেয়ে নিয়ে আবার হেসে ওঠে বিজু বাঈ—এই জল চাই নাই গো, সুন্দরী।...আচ্ছা চলি।

চলে গেল বিজু বাঈ। মুরলীর চোখ জ্বলজ্বল করে। যেন আরও একটা বছরের সময় হাতে পেয়ে নির্ভর হয়েছে মুরলীর আশা। এই ফাগুন থেকে আর-এক ফাগুন, এর মধ্যে কোনদিনও মিস্তিরী পলুস হালদার আর এই ঘরে ফিরে আসতে পারবে না। হে গড, তাই যেন হয়।

মেরিয়ার নালিশ—দেখছো তো লুসিয়াদিদি, জোহানা আজও এল না।

যে জোহানা ঝড়-বাদলের দিনেও কনভেন্টে এসেছে, স্কুলবাড়ির বারান্দার এক কোণে বসে নতুন বই পড়েছে আর নতুন লেখা লিখেছে, লেস বুনে বুনে মেরিয়ার সঙ্গে গল্প করেছে, আর পিয়ানোতে লুসিয়াদিদির হাতের সুরেলা খেলা দেখেছে, সে জোহানা একটা নতুন ব্যস্ততার কাজের কাছে হাজিরা দিতে গিয়ে এই ছ'টা মাসের মধ্যে অন্তত ত্রিশটা দিন কনভেন্টে আসতে পারে নি।

হরগঞ্জের দক্ষিণের ডাঙা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে একটা তালবন আছে। সেই তালবনের পাশে একটা বাড়ি আছে ; কলকাতার স্যামুয়েল বাবুর বাড়ি। স্যামুয়েল শশিনাথ রায় তাঁর দুই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এই ছ'টা মাস ওই বাড়িতে ছিলেন। জানে মেরিয়া, কাল বিকালেই আবার কলকাতায় চলে গিয়েছেন স্যামুয়েল বাবু। তাঁর সঙ্গে তাঁর দুই মেয়ে, লিলি আর মলিও চলে গিয়েছে। তাই মেরিয়ার নালিশ, আজ তো ওরা আর নাই, তবে জোহানা কেন আজ এখানে এসে একবারটি দেখা দিয়ে যাবারও সময় পেল না?

হারানগঞ্জের আকাশের ভাদুয়া মেঘ তালবনের মাথা ছুঁয়ে আরও কালো হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বৃষ্টি ঝরবে না মনে হয়। যদি ঝরে, তবে এই দুপুরের মধ্যেই সে ঝরানি শেষ হয়ে যাবে। তাই, যদি আসতে ইচ্ছে থাকে জোহানার, তবে বিকাল হবার আগেই একবার আসতে পারে।

জানে মেরিয়া, লিলি আর মলির সাথে খুব ভাব হয়েছে জোহানার। জোহানা নিজেই বলেছে, কী সুন্দর কথাটি বলে ওরা, তুমি শুনেছ কি মেরিয়া?

মেরিয়া—শুনেছি।

মুরলী—দেখেছো কি?

মেরিয়া—কি?

মুরলী—রিচার্ডবাবু ওদের কথা শুনে কত খুশি হয়?

মেরিয়া—দেখেছি।

কিন্তু বুঝতে পারে না মেরিয়া, কলকাতার মেয়েদের কাছে বারবার ছুটে যাবার মত কী কাজ থাকতে পারে জোহানার? ওদের সঙ্গে জোহানার ভাব করবার দরকারই বা কি? মাঝে মাঝে বেশ রাগ করে ফেলে মেরিয়ার মনটা, স্যামুয়েল বাবুর বাড়ির আয়া হবার সাধ হয়েছে নাকি জোহানার? তবে আর এত খেটে লিখাপড়া শিখে কেন জোহানা?

জোহানা গল্প করেছে ; তাই জানতে পেরেছে মেরিয়া, একদিন তালবনের ভিতরে পিকনিক করেছে লিলি মলি আর জোহানা। ডিমের কারি রেঁধেছে জোহানা, আর লিলি মলি দুই বোনে হাত মিলিয়ে পোলাউ রেঁধেছে।

কিন্তু আজ তো পিকনিক হবে না। জোহানার দুই নতুন মিতালী এখন কলকাতার বাড়িতে বসে চা খেয়ে খেয়ে হাসছে। আর, বোকা জোহানা এখানে ওর ঘরের ভিতরে একলাটি চুপ করে বসে ভাবছে।

মেরিয়ার মনটা হঠাৎ চমকে ওঠে। কাঁদছে নাকি জোহানা? তা না হলে আজ এখানে একবার এল না কেন জোহানা?

দেরি করে না মেরিয়া। সড়ক না ধরে, সোজাসুজি ডাঙা পার হয়ে আরও কিছুদূর এগিয়ে যায়।

তালবনের মাথার মেঘ পালিয়ে গিয়েছে। বিকেলের রোদ লালচে হয়েছে। মুরলীর ঘরের দরজার ভেজানো কপাট আস্তে ঠেলে দিয়ে উঁকি দিতেই মেরিয়ার দুই চোখ হেসে ওঠে। আয়নার দিকে তাকিয়ে জোহানা বহিন মুখ টিপে হাসছে।

দরজার কপাটে টোকা দেয় মেরিয়া। চমকে ওঠে মুরলী। তাড়াতাড়ি শাড়ির আঁচলটাকে তুলে নিয়ে আদুড় বুকটাকে ঢাকা দেয়।

—কী বটে জোহানা? কি দেখছিলে জোহানা? ছুটে এসে মুরলীর শাড়ির আঁচলটাকে টেনে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করে মেরিয়া।

চোখ পাকিয়ে মেরিয়ার মুখের দিকে তাকায় মুরলী, সঙ্গে সঙ্গে হেসে ফেলে, আর নিজের হাতেরই একটা টানে বুকঢাকা আঁচলটাকে সরিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।—এই দেখ।

মেরিয়া হাসে—তিল বটে।

মুরলী—হ্যাঁ, কিন্তু এটা তো ছিল না। এক মাস আগেও না।

মেরিয়া—তবে আর ভাব কেন? আর দেরি নাই, জোহানা।

মুরলী—কিসের দেরি নাই?

মেরিয়া—বুকের খবর নিবার মানুষ আসতে আর দেরি নাই।

মুরলী আবার চোখ পাকিয়ে তাকায়—মিছা কথা।

মেরিয়া হাসে—মিছা কথা নয়, জোহানা, শুন নাই, স্কুলের ছোট দিদি মিস মুরমু'র কথা?

মুরলী—কি কথা?

মেরিয়া—এক মাসও হয় নাই, মিস মুরমু'র গালে একটা নতুন তিল হলো ; আর দুমকা থেকে চিঠিও এসে গেল, বিয়া হবে।

শাড়ির আঁচলটাকে গায়ে জড়িয়ে, মেরিয়ার একটা হাত নরম করে ধরে নিয়ে, মুখ টিপে হাসে আর কথা বলে মুরলী—তুমি বলছো, এটা তিল। আমি বলবো এটা আমার আশার তিলক। আমার মন যাকে সব সময় কাছে পেতে চায়, সে এখনও দূরে সরে রয়েছে। জানি না কতদূরে। কিন্তু বিশ্বাস করি মেরিয়া, আমার স্বপ্ন একদিন তাকে...।

—হেই জোহানা, থাম জোহানা। ছটফটিয়ে হেসে ওঠে মেরিয়া। সত্যিই যে একটা অদ্ভুত বিস্ময়, শান্ত ভাবে সহ্য করতে পারবে কেন মেরিয়া? মুরলীর হাতটাকে টেনে গলায় জড়িয়ে নিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে মেরিয়া—বুঝেছি জোহানা, তুমি এইরকমটি মিঠা কথা শিখে নিবে বলে তোমার নতুন মিতানীদের সাথে এত ভাব সেধেছিলে। তাই বটে কিনা?

মুরলী হাসে—হ্যাঁ, কিন্তু তাতে কোন দোষ হয়েছে কি?

মেরিয়া—না, দোষ নয়। কিন্তু কত তাড়াতাড়ি শিখে নিলে, জোহানা? ভাল হরবোলা তুমি।

আর, মাত্র কয়েকটা মাস পরে, যখন পলুস হালদারের ঘরের নিভৃতে সাইকেলটার গায়ে

মরচের দাগ ঘন হয়ে উঠেছে, আর শীতের হাওয়া লেগে ঘরের চালার টালি থেকে শুকনো শেওলা ধুলো হয়ে ঝরে যেতে শুরু করেছে, তখন কনভেন্টের একটি ঘরের নিভৃতে মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে একটা বিপুল আনন্দের বিস্ময় সহ্য করতে গিয়ে মুরলীরই গালে একটা আহ্লাদের মৃদু চড় মেরে ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে যায় মেরিয়া। তাজ্জব করলে জোহানা! সিস্টার দিদির পিয়ানোটার কাছে বসে দু হাত চালিয়ে আর মনপ্রাণ যেন বিভোর করে নিয়ে মঙ্গল কোরাস বাজিয়ে চলেছে মেরিয়ার প্রাণের সখী জোহানা।

সিস্টার দিদি এসেছেন। কনভেন্টের কিতাবঘরে বসে এখন বই পড়ছেন। এই খবর জানে মেরিয়া।

সিস্টার দিদির কাছে গিয়ে একটা প্রবল খুশির চিৎকার ছেড়ে ছটফট করতে থাকে মেরিয়া।—একবারটি তুমি আসবে কি দিদি?

সিস্টার দিদি চমকে ওঠেন—কি খবর, মেরিয়া? কিসের জন্য ডাকছ?

মেরিয়া—জোহানা বহিনকে একবারটি দেখবে চল, দিদি।

সিস্টার দিদির হাত ধরে টান দেয় মেরিয়া। সিস্টার দিদিও তাঁর নীল চোখের একটা বিরক্তিকর বিস্ময় ধরে নিয়ে মেরিয়ার সঙ্গে হেঁটে এসে কনভেন্টের সেই ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ান, যে-ঘরের ভিতরে জোহানার হাতের ছোঁয়ার চমক খেয়ে খেয়ে পিয়ানোর বুকের ভিতর থেকে মঙ্গল কোরাসের মিষ্টি শব্দের উৎস উথলে উঠছে।

দরজার কাছে একটু আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকেন সিস্টার দিদি, আর বিপুল কৃতার্থতায় প্রসন্ন হয়ে সিস্টার দিদির চোখে একটা স্নেহাক্ত গৌরবের হাসি জ্বলজ্বল করতে থাকে।

মুরলীর চোখ দুটো যেন একটা সুস্বপ্নের ছবির দিকে অপলক হয়ে তাকিয়ে আছে। তাই দেখতে পায় না যে, সিস্টার দিদির খুশি চোখ দুটো সুন্দর আশীর্বাদী দৃষ্টি নিয়ে দরজার কাছে একটু আড়াল হয়ে মুরলীর দিকে তাকিয়ে আছে।

ঘরের ভিতরে ঢুকে মুরলীর কাছে এসে দাঁড়ায় মেরিয়া ; আস্তে আস্তে মুরলীর গায়ে হাত দেয়। রেশমী সুতো দিয়ে বোনা যে নেট গায়ে জড়িয়ে রয়েছে মুরলী, সেই নেটের ঝালর হয়ে ছোট ছোট লেসের ফুল দুলছে। নেটটাকে আস্তে আস্তে মুরলীর গা থেকে তুলে নিয়ে আবার ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে যায় মেরিয়া। সিস্টার দিদির চোখের কাছে নেটটাকে তুলে ধরে আর হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে ফিসফিস করে মেরিয়া ঃ দেখ দিদি, এই ওড়না নিজের হাতে বানালে জোহানা।

আস্তে আস্তে হেঁটে ঘরের ভিতরে ঢুকে মুরলীর কাছে এসে দাঁড়ান সিস্টার দিদি। বাজনা থামিয়ে উঠে দাঁড়ায় মুরলী।

—জোহানা বহিন! ডাকতে গিয়ে সিস্টার দিদির গলার স্বরও মায়াময় হয়ে গলে যায়।

—কি বটে দিদি? প্রশ্ন করে সিস্টার দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে মুরলী।

সিস্টার দিদি হাসেন—আজ আমি তোমার আর একটা পরীক্ষা নিতে চাই জোহানা।

মুরলী—নেন না কেন দিদি।

সিস্টার দিদি—পবিত্র বাইবেল পড়তে শিখেছ?

মুরলীর চোখে যেন একটা তৃপ্ত অহংকারের বিদ্যুৎ চমক দিয়ে ঝলসে ওঠে—শুধু পড়তে শিখি নাই ; লিখতেও শিখেছি। আর, যদি শুধাও তবে মুখে মুখে অনেক পাঠ বলে দিব।

সিস্টার দিদি—পর্বতের উপর যীশুর উপদেশ?

মুরলী—জানি দিদি।

সিস্টার দিদি—বল, শুনি।

মুরলী—যীশু বসিলেন, শিষ্যেরা তাঁহার চারিধারে উপস্থিত হইলেন। যীশু উপদেশ

বলিলেন—হৃদয়ে যাহারা বিনত, তাহারা সুখী, কারণ ধর্মরাজ্য তাহাদিগের হইবেক। যাহাদিগের মধ্যে শত্রুতা নাই, তাহারাই ঠিক সুখী, কারণ তাহারা পৃথিবীর প্রাপক হইবেক। যাহারা কান্দে তাহারা ঠিক সুখী, কারণ তাহারা স্বস্তি পাইবেক। পবিত্রতা পাইতে যাহারা ক্ষুধিত ও পিপাসিত, তাহারা ঠিক সুখী, কারণ তাহারা তুষ্ট হইবেক। যাহারা অপরকে দয়া করে, তাহারা ঠিক সুখী, কারণ তাহাদিগকেও দয়া করা হইবেক। যাহারা মনে পবিত্র, তাহারা ঠিক সুখী, কারণ তাহারা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাইবেক।

—জোহানা! ডাক দিতে গিয়ে সিস্টার দিদির নীল চোখের কোণে দুটো বড় বড় জলের ফোঁটা টলমল করে ওঠে। মুরলীকে কিছুক্ষণ বুকে জড়িয়ে ধরে সিস্টার দিদিও যেন তাঁর মনের উতলা খুশির আবেগ শান্ত করতে থাকেন। তারপর বলেন—স্কুলের ছোটদিদি মিস মুরম'র বিবাহ হবে, দুমকাতে চলে যাবে। সে আর স্কুলে পড়াতে পারবে না। আমার ইচ্ছা, তুমি ছোটদিদি হয়ে স্কুলের বাচ্চাদিগকে পড়াও।

মুরলী—আজ্ঞা করেন দিদি।

সিস্টার দিদি—হ্যাঁ, আজ্ঞা করলাম। তুমি চল্লিশ টাকা মাসোহারা পাবে ; তাতে তুমি খুশি হবে কি জোহানা?

মুরলী—খুব খুশি হব দিদি। কিন্তু...।

সিস্টার দিদি—কি?

মুরলী—কিন্তু আমাকে কনভেন্টের ঘরে ঠাঁই দিতে হবে দিদি ; একা ঘরে থাকতে আর মন করে না।

সিস্টার দিদি হাসেন—বেশ তো, যতদিন না পলুস ফিরে আসে, তুমি ততদিন কনভেন্টের ঘরে থাক।

এতদিনে মুরলীর আশার স্বপ্নটা নিজের জোরে ছুটে চলবার সৌভাগ্য পেয়ে ধন্য হয়ে গেল। প্রায় ছুটতে ছুটতে, সন্ধ্যার হারানগঞ্জের ডাঙার বাতাস গায়ে মেখে ঘরে ফিরে আসে মুরলী। হ্যাঁ, কত তাড়াতাড়ি দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল আরও বারটা মাস। পলুসের সেই চকচকে সাইকেলটার সব লোহা কত তাড়াতাড়ি মরচেতে ছেয়ে গিয়েছে।

পলুস হালদারের এই ঘরের শেষ রাতটাকে একটা একটানা ঘুমের ঘোরে পার করে দিয়ে পরদিন সকালেই কনভেন্টে যাবার জন্য প্রস্তুত হয় মুরলী। আর্থারবাবু একটা গো-গাড়ি ডেকে দিয়েছে। নিজের জিনিসপত্র গাড়িতে তুলে দিয়ে দরজার কপাটে শিকলও তুলে দেয় মুরলী, আর, তালাবন্ধ করেই হাঁপ ছাড়ে।

ঠিক সেই সময় ডাকপিওনও এসে হাঁক দেয়—আপনার টাকা এসেছে।

মুরলীর নরম ঠোঁট দুটো শিউরে শিউরে হাসতে থাকে—টাকা নিব না।

ডাকপিওন—ফিরত যাবে কি?

মুরলী—হ্যাঁ।

আমি যীশুর ছোট মেষ! প্রতিদিন মোর সুখ অশেষ!!

শিশুদের প্রার্থনা। কনভেন্টের স্কুলের বাচ্চাদের ক্লাসে রোজকার পড়াবার পালা শেষ করবার পর এই প্রার্থনাকে গাওয়াবারও একটা পালা আছে। গাওয়াবার ভঙ্গীটা নামতা পড়বার মত। প্রার্থনার একটা লাইন প্রথমে একা গলায় গেয়ে ওঠে মুরলী ; তার পরেই বাচ্চার দল একসঙ্গে গলা মিলিয়ে গায়। গলাটাকে যেন গানের কলের মত একদমে পনের মিনিট ধরে কোনমতে খাটিয়ে নিয়ে স্কুলঘর ছেড়ে নিজের ঘরের দিকে চলে যায় মুরলী। চল্লিশ টাকা মাইনের চাকরিটার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবার এই জীবনটাকেও কোনমতে সহ্য করতে হবে, যতদিন না মনটা নিজেই নতুন সাহসের সুখে বলে ফেলে, আর দেরি কর কেন

জোহানা?

সেদিন বড় খুশী হলেন সিস্টার দিদি, যেদিন কনভেন্টের লাইব্রেরিতে ঢুকে আলমারির বই ঘেঁটে ঘেঁটে একটি বই হাতে তুলে নিল মুরলী।

সিস্টার দিদি—কি বই নিলে জোহানা?

মুরলী—জেরুসালেম কাহিনী।

সিস্টার দিদি—বই ঘরে নিয়ে যেতে চাও?

মুরলী—হ্যাঁ দিদি।

সিস্টার দিদি—কেন?

চমকে ওঠে মুরলী, যেন একটা আনমনা প্রাণ চমকে উঠেছে। মুরলীর নরম ঠোঁটের চটুল ও সুন্দর বুদ্ধির হাসিটা হঠাৎ অপ্রতিভ হয়ে বিড়বিড়িয়ে কেঁপে ওঠে।—একটা বড় বই যে...বড় যে দরকার বটে, দিদি।

সিস্টার দিদি—বড় বই? না, ভাল বই?

মুরলী—হ্যাঁ দিদি। একটা ভাল বই।

সিস্টার দিদি—ভাল করে পড়বার ইচ্ছা, তাই ঘরে নিয়ে যেতে চাও?

—হ্যাঁ দিদি। আবার ঝিকমিকিয়ে হেসে ওঠে মুরলীর মুখ আর চোখ।

—বেশ, আমি একটা ভাল বই দিচ্ছি, সেটা আগে ভাল করে পড়। এই নাও, পিলগ্রিমের পরমগতি।

বইটাকে হাতে তুলে নেয় মুরলী। সিস্টার দিদি বলেন—তুমিও একজন পিলগ্রিম। মনে রেখ, অটুট বিশ্বাস রেখে আর হতাশ না হয়ে জীবনের পথে সন্ধানীর মত একের পর এক বাধা জয় করে এগিয়ে যেতে হয়।

সেই দিনই হারানগঞ্জের ডাঙার উপর যখন বিকালবেলার শেষ রোদ লাল হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, তখন সিস্টার দিদির লেখা এক গাদা চিঠি হাতে নিয়ে সড়কের পাশের ডাকবাক্সের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে ভয় পেয়ে চমকে ওঠে মেরিয়া, আর, যেন একটা হোঁচট খেয়ে সড়কের উপর থমকে দাঁড়ায়। ও কে বটে হোথা শিরীষের ছায়ার কাছে হাতে একটা কিতাব নিয়ে কালা পাথরটার উপর কে বসে আছে গো? হে গড, ওকে যে রিচার্ডবাবুর ঘরণী স্টিফানা বলে মনে হয়!

মেরিয়ার ভীত বিস্ময়টা তখনই লজ্জা পেয়ে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে শিরীষের ছায়ার দিকে ছুটে গিয়ে, আর কালো পাথরটার কাছে এসেই চেঁচিয়ে ওঠে মেরিয়া—এটা কি করেছো জোহানা?

মুরলী—কি করেছি? '

মেরিয়া—এমনটি সাজলে কেন?

মুরলী—কেমনটি?

মেরিয়া—ঠিক স্টিফানার রকমটি? রিচার্ডবাবু এখন তোমাকে দেখলে যে তোমাকে ওর ঘরণী বলে মনে করে ফেলবে।

মুরলী হাসে ঃ মনে করুক না কেন!

মেরিয়া—হাতও ধরে ফেলবে যে।

মুরলী—ধরে ফেলুক না কেন!

মেরিয়ার ঠাট্টার হাসিটা যেন একটা ভয়ানক সন্দেহের ধাক্কা লেগে এলোমেলা হয়ে যায়। ভয়ে ভয়ে ফিসফিস করে মেরিয়া—কেমনটি কথা বলছো?

মুরলী—যেমনটি তুমি শুনলে।

মেরিয়ার মুখরতার আবেগ এইবার স্তব্ধ হয়ে যায়। ঠিকই বটে, জোহানা যে একেবারে

স্টিফানাটি হয়ে গিয়েছে। সাদা শাড়িতে সেজেছে জোহানা ; গায়ে সাদা জামা। জামার হাতের কিনারায় নীল সুতোর জাল। খোঁপাতে সাদা ফুল। গলায় একটা সোনার হার, তার সঙ্গে এক টুকরো ঝকঝকে সাদা পাথরও দুলছে। চকচকে জুতো পায়ে দিয়েছে জোহানা। পাথরটা যেন রিচার্ডবাবুর ঘরের একটা সোফা। বইটাকে কোলের উপর রেখে আর পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে পাথরটার উপর বসে আছে। জোহানার শাড়িটাও ঠিক সেই স্টিফানার শাড়িটারই মত ভাঁজে ভাঁজে ফুলে আর ফেঁপে জোহানার পায়ের পাতা পর্যন্ত লুটিয়ে রয়েছে। সত্যিই যে ভুল করবে রিচার্ডবাবু! কিন্তু...।

মেরিয়ার চোখ-মুখের ভাবের মধ্যে যেন একটা বিষণ্ণ কিন্তুর ছায়া ছটফট করছে। কি-যেন একটা কথা বলতে চায় মেরিয়া। ভীরু আপত্তির মত একটা কথা, কিংবা উদ্বিগ্ন প্রশ্নের মত একটা কথা।

কিন্তু কোন কথা বলবারই আর সুযোগ পায় না মেরিয়া। রিচার্ড সরকার আসছে। প্রায় এসে পড়েছে।

রিচার্ড সরকারের সাইকেল চড়া মূর্তিটা সড়ক ধরে এগিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ মন্থর হয়ে গেল। একটা বিস্ময়বিবশ মন্থরতা। সাইকেল থেকে নেমে আর পথের উপর হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে মুরলীর দিকে অপলক চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে রিচার্ড। হারানগঞ্জের বিকালের হাওয়া লেগে রিচার্ডের গলার রঙিন টাই যেন স্বপ্নালু বিস্ময়ের নিশানের মত ফুরফুর করে উড়তে থাকে।

আস্তে আস্তে হেঁটে, দু চোখের চাহনিতে একটা উদ্বেল কৌতূহল কোনমতে চেপে রেখে শিরীষের ছায়ার কাছে এগিয়ে আসে আর হেসে ওঠে রিচার্ড—কেমন আছেন জোহানা হালদার?

—ভাল আছি। বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় মুরলী।

—আমি চলি জোহানা বহিন। এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলে দিয়েই সড়কের পাশের সেই ডাকবাক্সের দিকে তাকায় মেরিয়া ; প্রায় একটা দৌড় দিয়ে চলে যায়।

রিচার্ডও যেন একটা স্বস্তির হাঁপ ছেড়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে। চশমাটাকে চোখের উপর থেকে নামিয়ে নিয়ে রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে বলে—আপনাকে তো আর কোনদিন এখানে এভাবে বসে থাকতে দেখি নি।

মুরলী হাসে—দেখবেন কেমন করে? আজই যে প্রথম এলাম।

রিচার্ড—তাই বলুন।

মুরলী—আপনি ভাল আছেন?

রিচার্ড—হ্যাঁ, ভাল আছি। কিন্তু—

—কি?

—কই, আর একদিনও তো আমাকে একটা খবর পর্যন্ত দিলেন না যে, আপনি ভাল আছেন কি না-আছেন।

—আপনিও তো কোন খবর নিলেন না, আপনার রুগীটা বেঁচে আছে কি না-আছে।

—নেওয়া উচিত ছিল।

—আমারও উচিত ছিল, কিন্তু—

—কি?

—সারাদিনের কাজের মধ্যে এমন একটু সময়ও পাই না যে...

—কাজ? কি কাজ করেন আপনি?

—সে আর বলবেন না। সকালে উঠেই স্কুলের মাস্টারনীগিরি ; দুপুর বেলা সিস্টার দিদির সঙ্গে লাইব্রেরীতে যত পড়াশুনা আর লেখালেখি ; বিকালবেলা মেরিয়ার ঘরে বসে যত

সেলাই আর কাঁটা-কুরুশের কারিগরী। বিকেল শেষ না হতেই সিস্টার দিদির টেবিলের জন্য ফুলের তোড়া বাঁধা ; সন্ধ্যে হতেই লুসিয়া দিদির বাড়িতে গিয়ে পিয়ানো বাজাও আর গান গাও। হাঁপ ছাড়বারও সময় পাই না রিচার্ডবাবু।

অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকে ডাক্তার রিচার্ড সরকার, যেন হঠাৎ ঘুমভাঙা চোখ। যেন এক জাদুকরীর মুখ থেকে তার জীবনের রূপকথা শুনছে রিচার্ড।

হেসে ওঠে মুরলী—আপনি কি-যেন ভাবছেন ; আমার বাজে কথাগুলি একটুও শুনতে পাচ্ছেন না।

—শুনেছি, সবই শুনেছি জোহানা হালদার। কিন্তু...কী আশ্চর্য...আমি...আমি আপনাকে খুবই ভুল বুঝেছিলাম।

কিছুক্ষণ আনমনার মত শিরীষের ছায়াটার দিকে তাকিয়ে কি-যেন ভাবে রিচার্ড সরকার। তারপরই প্রশ্ন করে—আপনি নিশ্চয়ই বেড়াতে বের হয়েছেন?

মুরলী—হ্যাঁ।

রিচার্ড—তবে চলুন, আপনার আপত্তি না থাকে তো আমিও আপনার সঙ্গে গল্প করতে করতে একটু এগিয়ে যাই।

মুরলী হাসে—চলুন, আপনার সঙ্গে আমার একটু বাড়িতে যেতে হবে।

রিচার্ডের গলার স্বর যেন নিবিড় আবেদনের মত হঠাৎ মৃদু হয়ে যায় ঃ তাই বলছি জোহানা হালদার। চলুন।

মুরলীর বুকের ভিতরে সব নিশ্বাস উতলা হয়ে ওঠে। সেই নিশ্বাসের একটা রক্তাভ ঝলক দিয়ে মুখের উপর ছড়িয়ে পড়ে। সত্যিই যে আরও ভাল নতুন জীবনের, আরও বড় সুখের বড় সড়কে এগিয়ে যাবার ডাক শুনতে পেয়েছে মুরলীর ভাগ্য।

সড়কের দু পাশের অনেক গাছের অনেক ছায়া পার হয়ে যাবার পর, যখন রিচার্ডের বাড়ির ফটকের সবুজ লতার বিতানটা দেখতে পাওয়া যায়, তখন মুরলী হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় —এইবার আমি ফিরে যাই রিচার্ডবাবু। আর আমাকে এগিয়ে যেতে বলবেন না।

যেন আরও একবার পরীক্ষা করে দেখতে চায় মুরলী, সত্যিই এই পথে এগিয়ে যেতে আর কোন বাধা নেই, এতদূর এগিয়ে আসাও মিথ্যে আশার ছলনা নয়।

রিচার্ডের মুখটা হঠাৎ করুণ হয়ে যায়, যেন রিচার্ডের মনের একটা আশার ব্যাকুলতা হঠাৎ বাধা পেয়ে ব্যথিত হয়েছে।—একটা কথা বলবো, কিছু মনে করবেন না।

—বলুন, আমি কিছুই মনে করবো না।

—সেই সেদিনের পর থেকে আপনি আর একদিনও আমার বাড়িতে এলেন না কেন?

—যাওয়া কি উচিত হতো?

—কেন উচিত হতো না?

—আপনি তাহলে আমাকে সন্দেহ করতেন।

—কেন কিসের সন্দেহ করতাম?

—ভেবে দেখুন।

—আমি কিছু ভেবে পাচ্ছি না।

—আমি বলতে পারি।

—রিচার্ড হাসে—তবে বলুন।

মুরলীও হাসে—আপনি তাহলে সন্দেহ করতেন যে, জোহানা হালদারের মনে কোন মতলব আছে।

—ছি, ছি, কখনো না, আমি আপনার মত মানুষকে এরকম সন্দেহ করতেই পারতাম না।

—সন্দেহ না করলেই ভুল করা হতো রিচার্ডবাবু।

রিচার্ডের চশমার কাচ যেন আশ্চর্য হয়ে চমকে ওঠে আর ঝিকঝিক করে—কি বললেন?

মাথা হেঁট করে মুরলী ; চোখের পাতাও হঠাৎ ভিজে যায়—জোহানা আপনাকে ভালবাসে, আপনি কোনদিন স্বপ্নেও এমন সন্দেহ করতে পারেন নি, আজও পারবেন না। কিন্তু...।

—জোহানা! রিচার্ডের গলার স্বর কেঁপে ওঠে।

মুরলী—আমাকে আর কোন কথা বলবেন না ; এইবার আমাকে যেতে দিন।

—কোথায় যাবে তুমি?

—কনভেন্টে।

—কনভেন্টে কেন?

—থাকবার ঠাঁই আর কোথাও নেই, তাই।

—পলুস হালদার কোথায়?

—সে আছে ডালটনগঞ্জে ; মৌপুর সিমেন্টের কারখানায়। কিন্তু...

—কি?

—তার কোন কথা আমাকে আর জিজ্ঞেস করবেন না।

—কেন জোহানা?

—আমার জীবনের শাস্তির কথা তুলে আমাকে কষ্ট দেবেন না রিচার্ডবাবু। বলতে বলতে ফুঁপিয়ে ওঠে আর হাতের বইটা দিয়ে মুখ ঢাকা দেয় মুরলী।

—জোহানা! রিচার্ডের গলার স্বরও সমবেদনার আর্তনাদের মত ফুঁপিয়ে ওঠে।

মুরলী—এ দুর্ভাগ্য আর কতদিন সহ্য করতে পারবো জানি না। পৃথিবীতে এমন কাউকে দেখছি না যে, আমাকে ওই অভিশাপের হাত থেকে বাঁচাতে পারে।

রিচার্ড—আমি বাঁচাতে পারি। রিচার্ড সরকারের গলার স্বরে যেন একটা প্রতিজ্ঞাময় সৎসাহস গুমরে ওঠে।

মুরলী—আপনি ভেবে দেখুন।

রিচার্ড—ভেবে দেখেছি।

হেসে ফেলে মুরলী—এরই মধ্যে কখন্ ভেবে দেখলেন?

গলা দুলিয়ে কামিজের কলারের চাপ একটু আলগা করে দিয়ে রিচার্ড এইবার জোর গলায় চেঁচিয়ে ওঠে—হ্যাঁ, এরই মধ্যে ভেবে দেখেছি।

মুরলী—কি?

রিচার্ড—তোমাকে সত্যিই প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে আর ঘরে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে, জোহানা।

—কেন রিচার্ড?

—স্টিফানা মারা যাবার পর থেকে আজ পর্যন্ত, এই তিন বছরের মধ্যে কোন মেয়ের মুখের দিকে তাকাতে এত ভাল লাগে নি।

—স্টিফানাকে তুমি নিশ্চয় খুব ভালবেসেছিলে?

—খুবই ভালবেসেছিলাম।

—আজও ভালোবাসো নিশ্চয়।

—নিশ্চয়।

—তবে?

—কি?

—জোহানাকে পেয়ে কি স্টিফানার অভাব ভুলতে পারবে?

—পারবো।

—কেন?

—তোমাকে যে আমার সেই স্টিফানা বলেই মনে হয়। শুধু মুখটা আরও সুন্দর।

—স্টিফানার উপর যে মায়া করতে পারতে, আমার মত মানুষের উপর কি সে মায়া করতে পারবে?

—আরও বেশি মায়া করতে পারবো!

—কেমন করে বুঝলে?

—আমার মন বলছে।

রিচার্ডের মুগ্ধ মুখটার দিকে তাকিয়ে মুরলীর কালো চোখের বিদ্যুৎ এইবার ঝিকঝিক করে হেসে-হেসে যেন জ্বলতে থাকে। রিচার্ডের বাড়ির ফটকটাও যে একেবারে কাছে এসে পড়েছে। ফটকের লতা থেকে রঙিন ফড়িংগুলো মুরলীর খোঁপার উপর বসবার লোভে আকুল হয়ে ছুটে আসছে। মুরলীর আশার হিসাব চরম জয়ের আশ্বাস পেয়ে গিয়েছে।

রিচার্ড বলে—একটা অনুরোধ।

মুরলী—বল।

মুরলীর হাত ধরে রিচার্ড—এস।

মুরলী—কোথায়?

রিচার্ড—আমার ঘরে।

মুরলী যেন এখনই মাথাটাকে রিচার্ডের কাঁধের উপর হেলিয়ে দিতে চায়—আজ মাপ কর রিচার্ড। এত তাড়াতাড়ি করতে যে বড় ভয় করছে।

রিচার্ড—ছিঃ, কোন ভয় নেই। যে-ঘরে চিরকাল থাকবে, সে-ঘরে যেতে ভয় আবার কিসের?...এস।

—কে বটে গো? কে বটে গো? মুরলীকে চিনতে না পেরে দাইটা যেন একটা ভীরু বিস্ময়ের আবেশে কেঁপে কেঁপে চেঁচিয়ে ওঠে।

হেসে ওঠে রিচার্ড—কাছে এসে মুখ দেখে চিনে নাও, দাই। আর তাড়াতাড়ি চায়ের জল গরম কর।

রিচার্ডের ঘর, যে ঘরের দেয়ালে ছবির স্টিফানার চোখে এখনও সেই অদ্ভুত হাসি শিউরে রয়েছে। সেই ছবি, যার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে সেদিন মুরলীর চোখ দুটো ভয় পেয়ে শিউরে উঠেছিল। সে-কথা মনে পড়তেই মুরলীর চোখে যেন ছোট্ট একটা ঠাট্টার মিষ্টির শিহর হেসে ওঠে ; স্টিফানার ছবির দিকে করুণাময়ী বিজয়িনীর মত একটা অদ্ভুত রকমের শান্ত প্রসন্ন দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে মুরলী।

রিচার্ড বলে—বসো জোহ্না।

সেই সোফাটার উপরেই নিশ্চয় বসে পড়তো মুরলী ; কিন্তু বসতে পারল না ; কারণ, রিচার্ডই বাধা দিয়ে বলে—না, ওখানে নয়।

মুরলীকে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যেয়ে পিয়ানোর কাছে ছোট টুলের উপর বসিয়ে দেয় রিচার্ড ঃ তোমার হাতের বাজনা আর তোমার গলার গান।

রুমাল তুলে মুখের ঢলঢলে লাজুক হাসিটাকে আড়াল করতে চেষ্টা করে মুরলী—এখনই?

রিচার্ড—হ্যাঁ, এখনই। দাইটা এখনই বুঝে ফেলুক যে, তুমি আমার ঘরের মানুষ হয়ে গিয়েছ।

—প্রিয় জেসু যদি আসিবে! পিয়ানোর ঝংকারের সঙ্গে মুরলীর গলার স্বরও ঝংকার দিয়ে বেজে ওঠে।

রিচার্ডের চোখের চাহনিও যেন নীরবে ঝংকার দিয়ে চমকে ওঠে। কী আশ্চর্য, স্টিফানাও

যে এই গানটাকেই রোজ একবার।

—মরুতে মরুতে সুধানদী যদি বহিবে! তুমি পিপাসিত কেন রহিবে? হ্যাঁ, সেই গানটাই গাইছে জোহানা। কিন্তু, জোহানার গলার মধুতে কত মিষ্টি হয়ে গিয়েছে গানটা! গাইতে গাইতে জোহানার কালো চোখ দুটোও যেন গানের রসে ভিজে গিয়ে চিকচিক করছে। গান গাইবার সময় স্টিফানাকে এত সুন্দর দেখাত না।

ট্রের উপর চায়ের পট আর পেয়ালা সাজিয়ে নিয়ে ঘরের ভিতরে ঢোকে দাই, আর টেবিলের উপর রেখে দিয়েই চলে যায়।

গান থামিয়ে মুরলী বলে—এইবার আমাকে আমার ইচ্ছামত একটা কাজ করতে দাও।

—কি কাজ?

—আমি চা তৈরী করি।

—জোহানা! মুরলীর একটা হাত বুকের উপর তুলে নিয়ে কথা বলতে গিয়ে রিচার্ডের গলার স্বর নিবিড় হয়ে ওঠে।—চিরকাল এমনি করে তুমি আমার সব সাধ...।

চায়ের পটে হাত দিয়ে মুরলী বলে—সে কথা কি তোমাকে বার বার বলতে হবে? আমাকে চিনেও কি চিনতে পারছো না?

—চিনেছি, তাই বলছি। আমার সব সম্মান তোমার হাতে ছেড়ে দিলাম। তুমি কথা দাও...।

—কি কথা?

—আমার সব মান তুমি বাঁচিয়ে রাখবে।

—নিশ্চয় রিচার্ড। তুমি যে আমারও মান।

চা খাওয়া শেষ হতেই উঠে দাঁড়ায় রিচার্ড—কাছে এস জোহানা।

আবার আহ্বান। মুরলীর জীবনের পথিক স্বপ্নটা যেন রিচার্ডের এক-একটা আশ্বাস সান্ত্বনা আর প্রতিশ্রুতির পুণ্যে এইবার পরম বিশ্রামের ঠাঁই পেয়ে গিয়েছে। আর বলবার কিছু নেই ; আর জানবার কিছু নেই। রিচার্ড সরকারের এই সুখের ঘর মুরলীর জীবনের ঘর। কিন্তু এখনই কাছে ডাকছে কেন রিচার্ড?

টেবিলের ফুলদানির উপর থেকে ফুলের তোড়াটা তুলে নিয়ে মুরলীর হাতের কাছে এগিয়ে দেয় রিচার্ড। ফুলের তোড়াটাকে অদৃষ্টের চরম উপহারের মত বুকের উপর রেখে দু হাত দিয়ে সাপটে ধরে মুরলী। মুরলীর নরম ঠোঁট কাঁপে, কালো চোখ দুটো চিকচিক করে ; এই মুহূর্তে একেবারে কুণ্ঠাহীন হয়ে মুরলী যেন রিচার্ডের ঠোঁট দুটোকে প্রতিদানে তপ্ত করে দিতে চায়।

রিচার্ড হাসে—চল, এবার তোমাকে তোমার সিস্টার দিদির কাছে নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে আসি।

ফটক পার হয়ে সড়কের উপর উঠবার পর আর চলতে চলতে সড়কের পাশে সেই শিরীষের কাছে ফিরে এসে যখন দেখতে পাওয়া যায়, শিরীষের ছায়ার আশে-পাশে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে, তখন আর একবার মুরলীর হাতটাকে বুকের উপর রেখে কনভেন্টের ফটকের দিকে তাকায় রিচার্ড ঃ আজ আর বেশি এগিয়ে যাব না, জোহানা।

মুরলী হাসে—কেন, কিসের লজ্জা?

রিচার্ড হাসে—হ্যাঁ, লজ্জা পেতে হচ্ছে। কনভেন্টের ফটকের কাছে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

—কে দাঁড়িয়ে আছে? ফটকের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠতে গিয়েই গম্ভীর হয়ে যায় মুরলী। কি-যেন সন্দেহ করে মুরলীর চোখ দুটো দপ্ করে জ্বলে ওঠে।

সিস্টার দিদি নয়, মেরিয়াও নয়। মনে হচ্ছে, অন্য কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে। ফটকের

কাছে জ্যোৎস্নামাখা লাল কাঁকরের উপর একটা কালো ছায়াদেহ। মুরলীর চোখের তারা দুটো যেন স্ফুলিঙ্গ ছুটিয়ে সেই কালো ছায়াদেহের দুরাশা আর দুঃসাহসের আহ্লাদ এখনি পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চায়।

রিচার্ড বলে—আজ তবে আসি জোহানা। মুরলীর হাতটাকে বুকের কাছ থেকে আস্তে আস্তে নামিয়ে দেয় রিচার্ড।

—এস। রিচার্ডকে বিদায় দিয়ে হনহন করে হেঁটে কনভেন্টের ফটকের কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় মুরলী।

হারানগঞ্জের আকাশের চাঁদ। কনভেন্টের পাঁচিলের পাশে ঝাউয়ের পাতা মৃদু ঝড়ের সঙ্গে শ্বাস মিশিয়ে দিয়ে সির-সির করে আর শব্দ ক'রে কাঁপে। দূরে হাসপাতালের কাছে আমের বাগিচাতে কোকিল ডাকে। ধবধবে সাদা সাজের মুরলী ফটকের লাল কাঁকরের উপর ধবধবে পাথুরে কঠোরতার মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ডাক দেয়—কে?

পলুস বলে—আমি এসেছি।

মুরলী—কেন?

উত্তর না দিয়ে শুধু মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে পলুস। পলুসের অপলক চোখ দুটো যেন নির্মম বিস্ময়ের নির্জীব পিণ্ড। ভীরু চোখ, ক্লান্ত চাহনি। যেন অনেক দূরের আকাশের একটা ধবধবে সাদা আগুনের চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে কলঘরের মিস্ত্রিরীর হতভম্ব ভাগ্যটা।

এই কালো ছায়াদেহের হাড়মাংসের সবই যেন প্রাণ হারিয়ে ধুলো হয়ে গিয়েছে। চেঁচিয়ে ওঠে না পলুস। পলুসের সেই শক্ত চোয়াল কড়কড় করে বেজে ওঠে না। ছেলেমানুষের বিলাপের মত নাকি-সুরে একটা শব্দ করে কেঁপে ওঠে পলুসের মুখটা—আমার ঘরের চাবিটা?

হ্যাঁ, ঠিকই, পলুসের ঘরের চাবিটা মুরলীর কাছেই ছিল। কিন্তু একটুও মনে পড়ে না মুরলীর, কোথায় আছে চাবিটা? খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। মুরলী বলে—চাবিটা নেই।

—ভাল। মুখ ফিরিয়ে নেয় পলুস, আর, একবার পিছুপানে না তাকিয়ে হনহন করে হেঁটে চলে যায়।

বাবুরবাজারের সেই চক, যেখানে সড়কের এক পাশে নিতাই মুদীর একটা দোকান ছিল, যে দোকানে, মুড়ি, মুড়কি, চিঁড়া, ছাতু, গুড় আর মকাইয়ের খইয়ের মোয়া ঝুড়িভর্তি হয়ে সাজানো ছিল ; আর, বাঁশের বাঁখারি দিয়ে তৈরী একটা ঝাঁপও ছিল।

সেই দোকান আজ আর নেই, যদিও সেই জায়গাটি আজও আছে ; আর, ঠিক সেই জায়গাতে নতুন একটা চায়ের দোকান পিপাসী খরিদ্দারের ভিড়ে যেমন জমাট তেমনই মুখর হয়ে রয়েছে। নিতাই মুদির এই চায়ের দোকানের নাম প্রাণতোষ রেস্টুরেন্ট। তিন সারি বেঞ্চ, আর তিন সারি টেবিল। একটা কাচের আলমারিতে পাঁচটা বয়মের ভিতরে কেক বিস্কুট আর ডিম। আলমারির একটা তাকে ছোটবড় পাঁউরুটি থরে থরে সাজানো।

এই নিতাই মুদীর চেহারাটাও ঠিক সেই নিতাই মুদীর মত নয়। চিঁড়া-গুড়ের দোকানটা যেমন মরে গিয়ে আর প্রাণতোষ রেস্টুরেন্ট হয়ে নতুন জন্মলাভ করেছে, নিতাই মুদীর পুরনো চেহারাটাও যেন তেমনই মরে গিয়ে আবার নতুন হয়ে জন্ম নিয়েছে। নিতাই মুদির পরনে পায়জামা, গায়ে হাফ-হাতা কামিজ আর গলায় নকল রেশমের একটা চকচকে মাফলার। নিতাই মুদীর এক হাতের কনুয়ের কাছে পাঁচ ভরি সোনার একটা তাগা ঝকঝক করে ; আর এক হাতের কব্জিতে ছোট একটা ঘড়িও ঝিকঝিক করে।

বাবুরবাজার চকের সেই চেহারাও মরে গিয়ে নতুন হয়ে জন্ম নিয়েছে। চকের চার রাস্তার মাথা নানারকমের দোকানবাড়ির ভিড়ে ভারি হয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে একটা ব্যাঙ্কের শাখা

অফিসের সাইনবোর্ডও দেখা যায়। তা ছাড়া, সরকারী গ্রামোন্নতির একটা ব্লক অফিস। চকের সড়কেব বুকটা পেট্রল গ্রীজ গীয়ার-অয়েল আর নানানরকম লুব্রিকেন্ট তেলের ছোপ আর ছাপে ভরে আছে। প্রাণতোষ রেস্টুরেন্টের মেঝে-ধোওয়া জল যখন চকের সড়কের উপর গড়িয়ে পড়ে, তখন চকের সড়কের বুকটা রামধনু রঙের শত শত আলপনায় ভরে যায়।

প্রতি আধ ঘন্টা অন্তর একটা না একটা সার্ভিস বাস, হয় এদিক থেকে, নয় ওদিক থেকে, যাত্রীর ভিড়ে ভরতি হয়ে চকের উপর এসে থামে আর চলে যায়। প্রাণতোষ রেস্টুরেন্টের বেঞ্চ পিপাসী খরিদ্দারের ভিড়ে ভরে উঠতেই মস্ত বড় ক্যানেস্তারা জলে ভরতি করে উনানের উপর চাপিয়ে দেয় রেস্টুরেন্টের বয়। আর, নিতাই মুদীও ব্যস্ত হয়ে এক-একটা পাঁউরুটিকে আদর করে আঁকড়ে ধরে ছুরি চালাতে থাকে।

প্রায় এক মাস হল, নিতাই মুদীর প্রাণতোষ রেস্টুরেন্টের চা-পাঁউরুটি আর ডিম-ভাজার বিক্রি প্রায় দশ গুণ বেড়ে গিয়েছে, কারণ, বাবুরবাজারের চকে এই এক মাস ধরে সত্যিই বাবুদের ভিড় থই থই করছে। কখনও বড় বড় মোটর ট্রাক ভরতি হয়ে, কখনও বা পায়ে হেঁটে মিছিল করে বাবুদের এক-একটা দল যখন-তখন ছুটে এসে চকের উপর থমকে দাঁড়ায়। ভোট দাও, ভোট দাও। বাবুদের ছোট ছোট ভিড় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হাঁক ছাড়ে। কত রকমের আর কত রঙের ঝাণ্ডা! চকের সড়কের চারদিকের দোকানের দেয়াল পা থেকে মাথা পর্যন্ত বড় বড় ছাপা হরপের কত রকমের আশা দাবী আর প্রতিজ্ঞার কথায় ছেয়ে গিয়েছে। চকের কাছে যত আম বট নিম আর তেঁতুলের গাছ ছবিতে ছবিতে ভরে গিয়েছে।

বাবুরবাজার চকের উপর দাঁড়িয়ে আজও দক্ষিণের দিকে তাকালে কপালবাবার ঘন-সবুজ জঙ্গলটাকে আর মধুকুপির ছোটকালু ও বড়কালুর নধর-নিটোল কালো-কালো ধড় দুটোকে দেখা যায়। কিন্তু সেদিন এসে পড়তে বোধ হয় আর বেশি বাকি নেই, যেদিন সারি সারি কারখানার ইমারত, উঁচু উঁচু চিমনি আর কালো ধোঁয়ার গাঢ় আবরণে বাবুরবাজারের দক্ষিণের আকাশটাকে আর স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া যাবে না। বাবুরবাজার থেকে শুরু হয়েছে নতুন নতুন কারখানার পত্তন। এই নতুন পত্তনের উল্লাস একেবারে ডরানির খাত পর্যন্ত না গড়িয়ে গিয়ে বোধ হয় থামবে না। সেন অ্যাণ্ড ওয়ান্টারের একটা নতুন উদ্যম এরই মধ্যে ডরানির বালুভরা বুকের এক পাশে বিরাট একটা পাম্প বসিয়ে দিনরাত ধকধক শব্দ করে জল টানতে শুরু করে দিয়েছে। কারণ, সেন অ্যাণ্ড ওয়ান্টারের রেয়ার-আর্থ লেবরেটরি চালু হয়ে গিয়েছে। তারই কাছে একটা পাইপ ঢালাইয়ের কারখানাও প্রায় তৈরি হয়ে এসেছে।

প্রাণতোষ রেস্টুরেন্টের বেঞ্চিতে পিপাসী খরিদ্দারের ভিড় যখন হালকা হয়, তখন হাফ-হাতা কামিজের বুকপকেট থেকে একটা রুমাল বের করে পাঁচ ভরি সোনার তাগাটাকে মুছতে মুছতে কথা বলে নিতাই মুদী—শুনছিস বেজা।

রেস্টুরেন্টের বয় ব্রজবিহারী উত্তর দেয়—হুঁ আজ্ঞা।

নিতাই—ভোটের গরম তো আর তিন মাস পরেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

—হুঁ আজও।

—কিন্তু আমার তো কিছু হল না রে বেজা। দেখছিস তো, এক মাস হল দোকানের বিক্রির অবস্থা কিরকম দাঁড়িয়েছে।

—কিরকমটি আজ্ঞা?

—একেবারে যা-দশা। শুধু লোকসান আর লোকসান।

—লোকসান কেনে হবেক?

—আরে হ্যাঁরে আজ্ঞা। প্রতিদিন পাঁচ-দশ টাকা করে লোকসান সহ্য করতে হচ্ছে।

—কিন্তুক, আমার মাসোহারা এইবার দু টাকা বেশি না করে দিলে চলবেক না।

—কেন?

—আমার খাটুনি যে ডবলেরও বেশি হয়ে গেছে।

—তা তো হবেই ; ওরকম হয়েই থাকে ; বিশ্বাস না হয়, বড় বড় কোম্পানিতে গিয়ে, ওই সেন অ্যাণ্ড ওয়ান্টারের মজুরদের জিজ্ঞেসা কর গিয়ে।

—কি জিগেস করতে বলছেন?

—চাকর মজুরের মেহনত ডবল হয়, কিন্তু সেজন্যেই মাইনে বাড়ে না। মালিকের মুনাফা না হলে মজুরের মাইনে বাড়বার নিয়ম নেই।

—কিন্তু মুনাফা হয় না কেন, আজ্ঞা?

হেসে ওঠে নিতাই মুদী—সেটা হলো কপাল। আমার কপাল আর তোর কপাল। নইলে, দেখ না কেন, ভোটের বাজারে কত বেটা কত হাজার মেরে নিচ্ছে, আর আমার দিন গেলে মাত্র দশটা টাকা...দশটা টাকা স্রেফ লোকসা'ন হয়ে যাচ্ছে বেজা।...আরে, ওটা কে রে বেজা? সেই বাঘমারা খৃস্টানটা না?

উনানের উপর ক্যানেস্তারার জল টগবগ করে ফোটে ; সেই ফুটন্ত জলের বাষ্পের উপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে সড়কের এক দিকে একটা নিমগাছের গোড়ার দিকে তাকিয়ে বেজা বলে—হঁ আজ্ঞা। পলুস হালদার বটে।

নিতাই—কিন্তু, বেটা এই সকালবেলাতে ওখানে বন্দুক হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেন?...দেখ কাণ্ড, বেটা এদিকেই যে আসছে...বেটা মাতাল হয়েছে বলে মনে হচ্ছে যে...ওর পা দুটো যে টলছে রে বেজা, দেখছিস না?

—হঁ আজ্ঞা।

ভুল বোঝে নি নিতাই মুদী। সেই ভয়ানক বাঘিনীটার খোঁজে এই দিকে কতবার যাওয়া-আসা করেছে পলুস হালদার। কিন্তু সে তো তিন-চার সাল আগের ব্যাপার। বাঘিনীটাকে দুই গুলিতে শেষ করে দিয়ে এই লোকটা থানা রেলকোম্পানি আর জমিদারবাবুদের কাছ থেকে অনেক ইনাম পেয়েছে। তবে আবার ঠিক সেইরকম একটা বাঘিন-মারা আক্রোশ কেন শিকারীটার চোখে ছটফট করছে? কি খুঁজছে পলুস হালদার?

হঠাৎ একটা লাফ দিয়ে সাইকেলে উঠে আর চক পার হয়ে উধাও হয়ে গেল পলুস হালদার। আবার পাঁচ মিনিট পরেই ফিরে এসে চকের উপর একটা গাছের ছায়ার কাছে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আবার, চকের পুবের সড়কটা ধরে বনবন করে সাইকেল চালিয়ে কোথায় যেন চলে গেল। কিন্তু আবার, পাঁচ মিনিট পার না হতেই ফিরে এসে চকের বাস-স্টপের কাছ থেকে একটু দূরে, প্রাণতোষ রেস্টুরেন্টের ঠিক সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকে পলুস হালদার।

নিতাই মুদী বিড়বিড় করে—আমার যে কেমন সন্দেহ হচ্ছে, বেজা।

—কেনে আজ্ঞা?

—শিকারীটা ছুটোছুটি করছে কেন? কি মনে করেছে বেটা? এই চকের উপর দিয়ে এই সকালবেলাতে নতুন একটা বাঘিন পাস করবে?

বেজাও সন্দিগ্ধভাবে পলুসের সেই রুক্ষ্ম চেহারা আর মাতাল চোখের ছটফটে চাহনির দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে—দুশমনের খোঁজ লিবে মনে হয়।

—দুশমন? ওর দুশমন আবার কে? এই বেটাই তো মধুকুপির দাশু কিষাণের দুশমন? তুই সে খবর জানিস তো বেজা?

—হঁ আজ্ঞা ; দাশুর ঘরণীকে ঘরের বার করে বিহা করেছে পলুস।

—তবে...তবে আবার...।

হঠাৎ কথা থামিয়ে দিয়ে, আস্তে আস্তে এগিয়ে যেয়ে পলুসের কাছে দাঁড়িয়ে একগাল হাসি হাসে নিতাই মুদী ঃ এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন হালদার?

চমকে ওঠে পলুস ; নিতাই মুদীর দিকে কটমট করে তাকায়। নিতাই বলে—দোকানে এসে বসো। চা-পাঁউরুটি খাও। চাও তো ডিমভাজা, কলিজার ঘুঘনি আর...।

পলুস বলে—একটা খোঁজ দিতে পারেন?

—কিসের খোঁজ?

—হারানগঞ্জের সিস্টার দিদি এই পথে গেছেন কি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো ঘন্টা দুই আগে ওই দোকানের দাওয়ার উপর দাঁড়িয়ে লেকচার দিলেন, তারপর ওইদিকে চলে গেলেন...।

পলুস—জামুনগড়ার দিকে বটে কি?

নিতাই—তাই তো মনে হয়।

পলুস জোরে একটা শ্বাস ছেড়ে যেন আরও শক্ত হয়ে দাঁড়ায় ঃ তবে ঠিক আছে। এই পথেই নিশ্চয় ফিরবেন সিস্টার দিদি।

নিতাই মুদীর সন্দিগ্ধ চোখ দুটো এইবার একটা অবুঝ ভয়ের আবেশে ফ্যালফ্যাল করতে থাকে। তারপর চমকে ওঠে। হারানগঞ্জের সিস্টার দিদি আসছে। প্রায় কাছে এসে পড়েছে। সেই নীল রঙের সাইকেলের ঘন্টি মিষ্টি শব্দ করে বাজছে। সেই নীল চোখ জ্বলজ্বল করে হাসছে।

একটা লাফ দিয়ে সড়কের ঠিক মাঝখানে এসে, আর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে সিস্টার দিদির পথ আটক করে পলুস হালদার। সিস্টার দিদির নীল চোখে ছোট ছোট একটা ভ্রূকুটি শিউরে ওঠে। কিন্তু সাইকেল থেকে নেমেই মিষ্টি করে হেসে ওঠেন সিস্টার দিদি—তুমি কবে ঘরে ফিরলে পলুস?

পলুস—অনেক দিন।

সিস্টার দিদি আশ্চর্য হন—অনেক দিন? তবে...তবে জোহানা কেন...।

পলুস হাসে—তবে জোহানা কেন আজও তোমার কনভেন্ট বাড়িতে থাকে দিদি? ঘরে যায় না কেন?

সিস্টার দিদি—আমি তো সেই কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি।

পলুসের চোখের তারা জ্বলে ওঠে—আমিই তোমাকে সেই কথা শুধাচ্ছি, তুমি জবাব দাও দিদি।

সিস্টার দিদি ভ্রূকুটি করেন—তুমি সরাব পান করেছ পলুস?

পলুস—মাপ কর দিদি, তুমি আমার চেয়েও কত ভাল সরাবীকে মাপ করে থাক, সে আমি জানি।

—তুমি জঙ্গলের মানুষের মত কথা বলবে না পলুস।

—কিছু বলতে চাই না দিদি ; শুধু বিচার চাই।

—কিসের বিচার?

পকেটের ভিতর থেকে একটা কাগজ বের করে সিস্টার দিদির হাতের কাছে এগিয়ে দেয় পলুস—এটা কি বলে?

—কি?

—আদালতের নোটিশটা কি বলে, একবার পড় না কেন দিদি।

সিস্টার দিদি কাগজটাকে পড়তে গিয়েই চমকে ওঠেন। পড়া শেষ করে একেবারে নীরব হয়ে পলুসের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

পলুস—এইবার বল, দিদি। আমাকে ছাড়তে চায়, বিয়া রদ করাতে চায়, আদালতে দরখাস্ত করেছে জোহানা। এমনটি কেন হয়, দিদি?

উত্তর না দিয়ে আর আদালতের নোটিশটাকে পলুসের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে আনমনার মত

অন্যদিকে তাকিয়ে থাকেন সিস্টার দিদি।

পলুস--তুমি বিচার কর দিদি।

সিস্টার দিদি--জোহানা শিশু নহে ; উহার এইসব ইচ্ছার বিচার আমার কাজ নহে।

--কিন্তু ঘরণীতে বড় ঘরের সাধ যাচে কেন? সাধ বাড়ে কেন? এমনটি হলে মানুষের ঘর বাঁচবে কিসে? চেঁচিয়ে ওঠে পলুস।

এরই মধ্যে ছোট একটা ভিড় এসে বাবুরবাজার চকের এই অদ্ভুত ঘটনাকে ঘিরে ফেলেছে। হারানগঞ্জের সিস্টার দিদিকে এরকম অপ্রতিভ ও অপ্রস্তুত হয়ে পথের উপর থমকে দাঁড়িয়ে থাকতে কোনদিনও দেখা যায় নি। সিস্টার দিদির নীল চোখের জ্বলজ্বলে হাসি কোনদিন এরকম নিভু-নিভু হয়ে যায় নি। এভাবে আনমনার মত আর ভয়-পাওয়া চাহনি নিয়ে সিস্টার দিদিকে তাকিয়ে থাকতেও কোনদিন কেউ দেখেনি।

—এমনটি কেন হয়? জবাব দাও দিদি।

সিস্টার দিদির গলার স্বর বিকল ঘন্টির আওয়াজের মত ঘড়ঘড় করে ঃ জবাব জানি না।

—তাই বল দিদি! চেঁচিয়ে হেসে ওঠে পলুস। সাইকেল আর বন্দুকের সঙ্গে টলমলে রুক্ষ চেহারাটাকে সেই মুহূর্তে সড়কের একপাশে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে সিস্টার দিদির পথ অবাধ করে দেয়। ছোট ভিড়টাও ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে। একটা অবুঝ বিস্ময়ের প্রশ্ন ভিড়ের মুখে মুখে বাজতে থাকে।—কি বটে হে?...পলুস হালদার সিস্টার দিদিকে ডাঁটে কেন হে?...এ কেমন তামাসা বটে গো?...খাদের কলঘরের মিস্তিরীটা মস্করা করে হাসে কেন? আর সিস্টার দিদি এত ডরে ডরে তাকায় কেন?

সিস্টার দিদির সাইকেল-চড়া মূর্তিটা ততক্ষণে হারানগঞ্জের সড়ক ধরে অনেক দূরে চলে গিয়েছে। সিস্টার দিদির মাথায় সাদা চুলের খোঁপা রুপোর সুতোর স্তবকের মত কাঁপতে কাঁপতে আর সকালবেলার আলোতে চিকচিক করতে করতে চলে যাচ্ছে। সেই দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই সাইকেলের উপর লাফ দিয়ে উঠে বসে পলুস হালদার।

সিস্টার দিদির পিছু ধাওয়া করবে বুঝি মিস্তিরীটা!

না ; সোজা ভুবনপুর রোডের গাছের ছায়ার ভিতর দিয়ে যেন খাঁচাছাড়া চিতাবাঘের মত একটা ছুটন্ত আহ্লাদের আবেগে সাইকেল চালিয়ে ছুটে চলে যাচ্ছে পলুস হালদার। নিতাই মুদী ঠোঁট পাকিয়ে হাসে ঃ বড় জব্দ হয়েছে বেটা!

পর মুহূর্তেই চেঁচিয়ে ওঠে নিতাই—জল চাপা, শিগগির, এক ক্যানেস্তারা জল উনানে চাপিয়ে দে বেজা। গোবিন্দপুরের মেল বাস এসে পড়েছে।

একটা ভোটের মিছিলও এসে পড়েছে। গোবিন্দপুর স্কুলের ছেলেরা আছে, অনেকগুলি ছোকরা বাবুও আছে ; বিশ-পঁচিশটা ঝাণ্ডাও দুলছে।

ভোট দাও! ভোট দাও! পাঁচ মিনিট ধরে চড়া গলার হাঁক ছাড়বার পর মিছিলের বুকের ভিতর থেকে একটা হারমনিয়মের পাতলা ও মিঠা স্বরের আওয়াজ উথলে ওঠে। একসঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গাইতে থাকে মিছিলের ছেলেরা আর বাবুরা।

দেশের মুক্তি হয়ে গেল যদি, মাটির মুক্তি চাই। শুন হে কিষাণভাই। তোমার সুখেতে সকলের সুখ, এ কথাটি জানা চাই। মাটির মানুষ কেউ হয় যদি, সে মানুষ তুমি ভাই। এ মাটি তোমার মাটি, জেনে নাও খাঁটি, মোরা তোমাদের সুখ চাই।

প্রাণতোষ রেস্টুরেন্টের মালিক নিতাই মুদী চুপ করে দাঁড়িয়ে আজকের বিক্রির আশা আর আনন্দটাকে কল্পনায় হিসাব করতে থাকে। মিছিলের হাঁক লেকচার আর গান কোনমতে একবার শেষ হলেই হয়। ওই মিছিলটাই তখন ব্যাকুল হয়ে প্রাণতোষ রেস্টুরেন্টের ভিতরে হুড়মুড় করে ঢুকবে। কাঁচের আলমারির ভিতরে সাজানো পাঁউরুটির স্তূপ আর ডিমভরা বয়ম দুটোর দিকে তাকিয়ে হিসেব করে নিতাই, সব ফুরিয়ে যাবে নিশ্চয়। এত বড় মিছিল অনেক

দিন পরে এসেছে।

মেল বাস থেকে যে পাঁচজন যাত্রী নেমেছে, তাদের মধ্যে চারজন এদিকেই আসছে ; কিন্তু একটা যাত্রী...আরে, ওটা কে রে বেজা? ওটাকে যে মধুকুপির সেই দাগী দাশু বলে মনে হয়।

হ্যাঁ, সেই দাশু ঘরামি। গাড়ি থেকে নেমে এমন সুন্দর প্রাণতোষ রেস্টুরেন্টর দিকে না তাকিয়ে মিছিলটার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে দাশু।

মিছিলটার কাছাকাছি এসে পথের একপাশে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে দাশু। হাতে ছোট একটা কম্বলের পোঁটলা ; গায়ে নতুন গেঞ্জি আর পরনে একটা নতুন কোরা ধুতি। গোবিন্দপুর জেল থেকে ছাড়া-পাওয়া দাশু কিষাণের আত্মাটা যেন বাবুরবাজারের চকে নেমেই একটা সুন্দর কুহকের শোভা আর শব্দের স্বাদে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে। গান গাইছে মিছিলটা ; আর শুনতে শুনতে দাশু কিষাণের চোখ দুটো চিকচিক করে উঠছে।

গান থামল। মিছিলের জমাট ভিড়টাও ভেঙে এলোমেলো হয়ে প্রাণতোষ রেস্টুরেন্টের দিকে ছুটে এল। যা ভেবেছিল নিতাই মুদী, তাই হল। রেস্টুরেন্টের সব রুটি, সব বিস্কুট, আর সব ডিম শেষ হয়ে গেল। মিছিলের ছেলেরা আর বাবুরা আবার ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে সড়কের উপরে গিয়ে দাঁড়ায় ; হাঁক ছেড়ে রঘুনাথপুরের দিকে চলে যায়।

টাকা-পয়সা গেঁজের ভিতরে ভরে নিয়ে আর কোমরে গুঁজে আবার যখন রুমাল দিয়ে সোনার তাগা মুছতে থাকে নিতাই, তখন আবার চোখে পড়ে, কী আশ্চর্য, মধুকুপির সেই দাগী দাশু যে চকের সড়কের একপাশে ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে।

—ওহে দাশু! চেঁচিয়ে ডাক দেয় নিতাই।

চমকে ওঠে দাশু ; নিতাই মুদীকে চিনতে না পেরে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকে।

নিতাই—তুই তো মধুকুপির দাশু ; আমাকে চিনতে তোর এত দেরি হয় কেন রে?

এইবার চিনতে পারে দাশু ; আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে এসে বিড়বিড় করে—এ সব কি বটে নিতাই দাদা?

—এটা আমার দোকান।

—বড় ভাল দোকান : কিন্তু সে-কথা শুধাচ্ছি না।

—কি শুধাচ্ছিস?

—ওরা যে গীত গেয়ে গেল, সেটা কি বটে?

—ভোটের গীত।

—সে তো জানি ; কিন্তু...।

—কিন্তু আবার কি?

—কিষাণদিগের জমি হবে আর সুখ হবে, মাটির মালিক হবে কিযাণ। এমন কথা বলে কেন ওরা? হবে কি, নিতাই দাদা?

—হবে বইকি। তোমাদেরই তো রাজত্ব হবে দাশু। সরকার আইন করেছে, জমিদারের জমি কেড়ে নিয়ে তোমাদের দেবে। আর আমরা শুধু চায়ের জল গরম করে করে...।

দাশু—তুমি মজা করছো না তো, নিতাই দাদা?

নিতাই—তুমি কি আমার ইয়ে যে, তোমার সঙ্গে রস করবো আমি?

দাশুর চোখ দুটো জলে ভরে গিয়ে ছলছল করে ওঠে। নিতাই মুদীও চমকে ওঠে—এ কি, তোকে আমি কি এমন খারাপ কথা বললাম যে, কেঁদে ফেললি দাশু?

—খারাপ কথা নয়। এমন ভাল কথা কভি শুনি নাই।

নিতাই মুদী গম্ভীর হয়ে বিড়বিড় করে—হ্যাঁ, আমিও আমার এই পঞ্চাশ বছর বয়সে এমন অদ্ভুত কথা শুনি নি। সদরে গিয়ে এম-এল-এ বাবুকে জিজ্ঞাসা করেছি ; সেটেলমেন্টের

কাছারিতে গিয়ে খবর নিয়েছি। সকলেই তো ওই একই কথা বলছে। যারা জমি চষবে, তাদেরই জমি হবে ; আইনও নাকি প্রায় হয়েই গিয়েছে।

হেসে ওঠে দাশুর ছলছল চোখ দুটা--ভাল সুখের খবর বটে।

ডিবে থেকে সিগারেট বের করে হেসে ওঠে নিতাই ঃ কিন্তু সত্যি একটা মজার খবর আছে দাশু। শুনলে খুশী হবি।

--বলেন।

--শিকারীটা জব্দ হয়েছে।

--কে? পলুস হালদার?

—হ্যাঁ রে, সেই পলুস হালদার, তোর সেই দুশমনটা।

--কি হয়েছে?

—যাকে তোর কাছ থেকে ভাগিয়ে নিয়ে বিয়ে করেছিল, সে আবার ওকেই ছেড়েছে।

—ঠিক কথা বল, নিতাই দাদা। চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

—ঠিক বলেছি, দাশু। এসব কথা মিথ্যে করে বলবো কেন? কিন্তু তুই কি...। তোর তিন বছরের মেয়াদ পুরো হয়েছে কি? না, জেল থেকে ভেগে এলি?

দাশু হাসে—না ; কপালবাবার দয়াতে কিছু আগেই ছাড়া পেয়েছি।

—কেন?

—জেলের কম্বলের গুদামে আগুন লেগেছিল। আমিই সে আগুন ঠাণ্ডা করেছিলাম। তাই এক মাসের মেয়াদ মাপ হয়ে গেল।

—ইনাম পাস নি?

—পাঁচ টাকা পেয়েছি।

—তবে তো এখন পেট ভরে রুটি আর ডিম-ভাজা খেতে পারিস।

—ছিয়া ছিয়া!

ভ্রূকুটি করে নিতাই—তার মানে?

দাশু হাসে—ওসব চিজ মুখে নিতে বড় লাজ লাগে। হ্যাঁ..চার আনার চিঁড়া-গুড় দিবেন কি?

নিতাই—না। এসব চিজ আমি রাখি না।

দাশুর দিকে আর ভ্রূক্ষেপ না করে চকের দিকে তাকায় নিতাই মুদী। তখনই চেঁচিয়ে ওঠে—জল চাপা, জল চাপিয়ে দে বেজা ; ঝালদার বাস এসে পড়েছে।

আর, দাশু ঘরামির পাথুরে ছাঁদের চেহারাটাও যেন নেচে ওঠে। একটা লাফ দিয়ে উঠে যায় দাশু। চক পার হয়ে চলতে চলতে দূরের আকাশের দিকে তাকায়। হ্যাঁ, ওই তো কপালবাবার জঙ্গল ; ওই তো মধুকুপির ছোটকালু আর বড়কালু। বুকের ভিতরেও যে সত্যিই মাদলের বোল বাজছে—মুরলী, মুরলী!

জমি আসবে, মুরলীও আসবে! হে কপালবাবা, কত ভাল বিচার তোমার। কলঘরের মিস্তিরীর ঘর থেকে কে জানে কেমন কান্না নিয়ে আবার ছুটে আসছে মুরলী। মুরলীর কোলেতে ছেইলাটা আছে তো কপালবাবা?

কিন্তু তার আগে যে জমি পাওয়া চাই। পাঁচ বিঘা দো-আঁশ কানালীর জমি। সরগুজা বুনে দিলে দুই মাসের মধ্যে হলদে ফুলে ছেলে যাবে ক্ষেত। গুলঞ্চের বেড়াতেও ফুল ধরে যাবে নাকি?

মধুকুপির দিকে অনেক দূরে এগিয়ে আসার পর যখন ডরানির জল দেখা যায়, তখন দাশুর শুকনো গলার পিপাসাটা যেন আপনিই ভিজে যায়। আট আনা খরচ করে বাবুরবাজারের ভাঁটিতে বসে হাঁড়িয়া খাওয়ার সাধ ছিল ; কিন্তু জমি আর মুরলীর মুক্তির

খবর শুনে বুকের ভিতরটা আশায় মাতাল হয়ে হাঁড়িয়ার নেশা নেবার ইচ্ছাটাকেও ভুলিয়ে দিয়েছে।

লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটতে থাকে দাশু। গাঁয়ে পৌঁছে গিয়ে জাম কাঠের সেই জীর্ণ দরজার কপাটের গায়ে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে, বড় বুড়া রতনের কাছে গিয়ে একটা বিপুল খুশির হাঁক ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠবে দাশু—তোমরা কি শুন নাই বড় বুড়া, জমি আসবে, মুরলীও আসবে? কপালবাবার কাছে সাদা ছাগ বলি দাও।

আর কতদূর?

আর বেশি দূর নয়। বাবুরবাজারের পুলিস ফাঁড়িটা ছাড়িয়ে মধুকুপির অনেক কাছে চলে এসেছে দাশু। ফুরফুরে বাতাসের ছোঁয়া এইবার দাশুর চোখে-মুখে আর মাথার উপর যেন একটা ফুরফুরে মিষ্টি গন্ধের ছোঁয়া ছড়িয়ে দিতে থাকে। মহুয়াতে ফুল ধরেছে বুঝি।

কিন্তু দল বেঁধে ওরা কারা হনহন করে গাঁয়ের দিক থেকে এই দিকে হেঁটে আসছে? হাতে ছোট ছোট ঝুলি আর লাঠি ; মাথার উপর ছোট ছোট বোঝা, দলটা যেন কারও উপর রাগ করে ছুটে আসছে।

দলটা কাছে এগিয়ে আসতেই দলের সবার আগের মানুষের মুখটাকে চিনতে পারে দাশু, সুরেন মান্‌ঝির মুখ। কিন্তু সুরেনের গম্ভীর মুখে যেন একটা গম্ভীর আক্রোশ থমথম করছে।

—কি বটে সুরেন? চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

—গাঁয়ে ফিরেছিলাম, কিন্তু আবার গাঁ ছেড়ে চললাম দাশুদাদা। চেঁচিয়ে ওঠে সুরেন।

দাশু আশ্চর্য হয় ঃ কেন গাঁয়ে ফিরে এলে, আবার কেনই বা চলে যাও?

—কয়লা-খাদে ছাঁটাই হল। কত মালকাটা গাঁয়ে ফিরে গেল। আমরাও এলাম। কিন্তু...।

দাশুর প্রাণের ভিতরটা যেন হো-হো করে খুশির উচ্ছ্বাসে হেসে ওঠে। কয়লা-খাদ কত সুখের ঠাঁই, কত বড় গলা করে এই সুরেনই না কথাটা বলেছিল। খাদের কয়লা আজ ওদের সুখের আশাকে কালো করে দিয়েছে। কাজ নাই। ভুখা পেট নিয়ে আবার মধুকুপির মাটিতে ফিরে আসতে হয়েছে।

দাশু হাসে ঃ কিন্তু, কি বটে সুরেন? আবার কোথায় চললে?

—সদরে যাব।

—কেন?

—দিনমজুরী করবো।

—ছিয়া সুরেন!

সুরেনের চোখ দপ করে জ্বলে ওঠে ঃ ছিয়া তোমার গাঁ।

—কেন? দাশুর গলার স্বর গরগর করে।

সুরেন বলে—তোমার সাথে আমার ঝগড়া নাই দাশুদাদা ; ওসব কথা ছেড়ে দাও, আর পার তো আমার একটা উপকার কর।

দাশুর গলার স্বর যেন লজ্জিত হয়ে আর হঠাৎ-মায়ার আবেশে নিবিড় হয়ে যায় ঃ বল না কেন সুরেন?

—আমি দুই দিন খাই নাই।

—কেন? কেন? দাশুর গলার স্বর ফুঁপিয়ে ওঠে।

সুরেন—সে-কথা আর শুধাও কেন? এখন পার যদি তবে আমাকে পাঁচটা টাকা ধার দাও।

—পাঁচ টাকা! চমকে ওঠে দাশু। কি ভয়ানক হিসেব করে টাকা চেয়েছে সুরেন! সুরেনের দাবীটা যে দাশুর অদৃষ্টের শেষ সম্বল লুঠ করে নিতে চায়।

সুরেন বলে—একদিন আমিও তোমাকে দশ টাকা ধার করে দিয়েছিলাম দাশু দাদা, সে কথা ভুলে যাও কেন?

না, ভুলতে পারে না দাশু ; এই সুরেন মান্‌ঝি সেদিন দশ টাকা ধার দিয়েছিল বলে দাশুর মুরলী সেদিন ভাত খেতে পেয়ে বেঁচে গিয়েছিল, আর মুরলীর পেটের ছেইলাটা, দাশুর জীবনের মায়াময় সাধটা ও হঠাৎ-মরণ থেকে বেঁচে গিয়েছিল।

—এই নাও। কোমরের ধুতির গোঁজের ভিতর পাঁচটা টাকা বের করে সুরেনের হাতের কাছে এগিয়ে দেয় দাশু। আশ্চর্য হয়ে দাশুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে সুরেন। তারপর চলতে থাকে।

মান্‌ঝিদের দলটা হনহন করে হেঁটে গাঁ-ছাড়া আক্রোশের মত দূরে চলে যায়। দাশুও একটা করুণ তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে মধুকুপির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

ডরানির বালুভরা বুকের উপর বড় দেহটা এইবার বেশ স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাজ্জব বটে! দহের কিনারায় বক বসে নেই কেন? দহের জল চিকচিক করে না কেন? ওই তো ডরানির সেই দহ, যার জলে মৌরলা আর কুরচিবাটা মাছের ঝাঁক ছটফট ক'রে খেলা করত। ক্ষেতের কাজ সেরে ঘরে ফিরে যাবার সময় ওই দহের জল গামছা-ছাঁকা করে কতবার মৌরলা আর তিতপুঁটি তুলেছে দাশু। সেই দহের জল দেখা যায় না। অন্ধের চোখের কোটরের মত শুকনো হয়ে পড়ে আছে ডরানির বড় দহ। তবে কি গত শাওনেও আকাশটা শুধু মরা মেঘে ছেয়েছে আর খরাতে পুড়েছে? ডরানির বুকে ভাদুয়া ঢল নামে নাই কি?

ডরানির ছুটকো স্রোতের উপর লোহা-বাঁধানো সেই পুলটা। কত রোগা হয়ে গিয়েছে স্রোতটা। এ কি? কপালবাবার জঙ্গলটার এমন দশা কেন? জঙ্গলের চেহারা থেকে সব সবুজ যেন মর-মর হয়ে ঝরে পড়েছে ; জঙ্গলের ছায়াও আর ঠিক সেই রকমটি কালো-কালো নয়। মনে হয়, আরও আধ ক্রোশ দূরে সরে গিয়েছে কপালবাবার জঙ্গল।

আর, ওই তো মধুকুপি। মানঝিপাড়ার ঘরগুলি দেখা যায়। জাহিরথানের কাছে রিঠাগাছের যে ভিড়টা ছিল, সেটাও দেখা যায়। কিন্তু কেমন যেন মর-মর চেহারা। জাহিরথানের কাছে গাঁয়ের মুখিয়া রতনের গরু-ঘরের যে একচালাটি ছিল, সেটা নেই কেন? সেখানে তিনটে খুঁটো দাঁড়িয়ে আছে কেন? রতনের গরু দুটো কি মরে গিয়েছে?

বাবু দুখন সিংহের বাড়ির চালার টিন রোদ লেগে ঝকমক করে ; আর ঈশান মোক্তারের কুঠি ও ভাণ্ডারের গা টাটকা চুনকামের আনন্দে ধবধব করে। ওরা ভাল আছে, বেশ সুখে আছে মনে হয়। কিন্তু কিষাণ মনিষদের ঘরগুলি শুকনো জঞ্জালের মত দেখায় কেন? ঘরে কি মানুষ থাকে না? চালার খড় যেন খাবলা দিয়ে কেউ তুলে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। মাটির দেয়ালে ঘা হয়ে ধুলো ঝরছে। কিষাণের ঘরের মাগ আর বেটিগুলা কি সব পালিয়ে গিয়ে খাদের ময়লাকামিন হয়ে গিয়েছে? মাটির দেয়ালে কাদা গোবর নিকায় না কেন ওরা?

মধুকুপির ধানক্ষেত। চোখ পড়তেই ভয় পেয়ে চমকে ওঠে দাশুর চোখ। ধানক্ষেতের শুকনো খটখটে মাটির উপর যে আগাছা হলদে হয়ে মরে পড়ে আছে, সে আগাছা সত্যিই আগাছা নয়। রোপাই-করা ধানের দেড় হাত ফুরতি যেন একটা সর্বনাশের বিষের জ্বালায় মরে গিয়ে আর একেবারে খড় হয়ে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে। মরাধানের এই খড়ে কোন স্বাদ নেই বুঝি, তা না হলে গরুতে এখনো এগুলোকে সাবাড় করে নি কেন?

চলতে চলতে পুবের ডাঙার ঢালুটা শেষ দিকে মাটির উপর একটা সবুজ শোভার দিকে চোখ পড়তেই দাশু কিষাণের চোখের চাহনি স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। ওই ভিজা জমিটা যে বড় ভাল দো-আঁশ কানালি বটে। ঈশান মোক্তারের কুঠি ওই জমিতে প্রতি বছর পঞ্চাশ মনিষের মেহনত লাগিয়ে যে আউশ আর আমন তোলে, তাতেই যে ভাণ্ডারের প্রায় অর্ধেক ধানে

ধানে ভরে যায়।

না, মরে নি মধুকুপির মাটি। মধুকুপির মাটির প্রাণের জোর নিজের চোখে একবার দেখে নিয়ে মনের দুঃসহ সন্দেহটাকে মিথ্যে করে দেবার জন্য পুবের ভাঙ্গার ঢালুর দিকে ছুটে যায় দাশু। কিন্তু ক্ষেতের কাছে এসে একটা আলোর উপর দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে। এইবার চোখে পড়েছে দাশুর ; এই সবুজ ধানক্ষেতও একটা জঞ্জালের শ্মশান। ধানের কাঁচা শিষ তুঁষ হয়ে গিয়েছে। মাজরা লেদা আর শুঁয়া--পোকা পোকা পোকা--ধানের দুশমনের ক্ষুধা মধুকুপির ক্ষেতের আনন্দ লুটপাট করে খেয়েছে। ধানের পাতায় ঘা ; শিরকাঠি এরই মধ্যে কুটো হয়ে গিয়েছে। হে কপালবাবা, গাঁয়ের মাটিকে এমন সাজা দাও কেন? কিষাণেরা বাঁচবে কেমন করে? ছেইলা কোলে নিয়ে মুরলী যদি গাঁয়ে ফিরে এসে গাঁয়ের মাটির এমন দশাটি দেখে, তবে সে যে আবার ডরাবে আর চলে যাবে গো কপালবাবা!

ফিরে গিয়ে আবার সড়ক ধরে চলতে থাকে দাশু। দাশুর ভয়-পাওয়া চোখ দুটো এইবার আস্তে আস্তে করুণ হয়ে ছলছল করতে থাকে। বুকের ভিতরে একটা অভিমান গুনগুন করে কাঁদছে, যেন মধুকুপির মরামাটির কান্না শুনতে পেয়েছে দাশু। মধুকুপির মাটির জন্য এই দুনিয়ার কারও মনে কোন মায়া নেই। আকাশের হাতিয়া তারাও বোধহয় মধুকুপির মাটিকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে। তা না হলে, এত ভাল মাটি একটু জল পায় না কেন? আর...মনে করতে পারে দাশু, এই তো কিছুক্ষণ আগে বাবুরবাজারের ফাঁড়ি পার হয়ে এইদিকে আসতে আসতে মাঝপথের একজায়গায় দাঁড়িয়ে মাটি-চালানী কোম্পানিটার যে কাণ্ডকারখানা নিজের চোখে দেখতে পেয়েছে। ডরানির বালুভরা বুকের উপর বিঁধ দিয়ে কোম্পানির কলটা কত জল তুলে একটা নালার ভিতরে গড়িয়ে দিচ্ছে। কারখানাটার দিকে কলকল করে কী সুন্দর জলের ঢল নাচতে নাচতে চলে যাচ্ছে! কে জানে, এত জল নিয়ে কার কপালে ঢালবে ওরা? শুধু মধুকুপির মাটি জল বিনা পিয়াসে জ্বালায় জ্বলে আর মরে।

বাঁশঝাড়ের কটকট শব্দময় দোলানির ছায়া পার হয়ে একটা ঘরের কাছে জীর্ণ জামকাঠের দরজার সামনে থমকে দাঁড়ায় দাশু। বুকের ভিতরে অভিমানের গুঞ্জনটা এইবার তীব্র একটা আর্তনাদ হয়ে বেজে ওঠে।—আঃ, এ তোমার কেমন দয়া বটে কপালবাবা!

দরজার একটা কপাট কাত হয়ে ঝুলে রয়েছে। দরজার দু পাশের দেয়ালে শিয়ালের উৎপাতের চিহ্ন। দাশুর জীবনের একটা স্বপ্নালু আদরের ছবিকে একলা পেয়ে কেউ যেন আঁচড়ে কামড়ে আর তছনছ করে চলে গিয়েছে। দেয়ালের দু জায়গায় দুটো বড় গর্ত। হায় রে কিষাণের ঘর! ঘরের এমন দশা দেখলে যে আবার ঘিন্না করে চলে যাবে মুরলী।

আস্তে আস্তে হাত তুলে দরজার একটা কপাট ঠেলে দিয়ে ঘরের ভিতরের শূন্যতার দিকে কিছুক্ষণ নিথর হয়ে তাকিয়ে থাকে দাশু। তারপর ফুঁপিয়ে ওঠে। না, তুই আয় মুরলী। ছেইলাটাকে কোলে নিয়ে এখনই চলে আয় না কেন? এ ঘরের এমন দশা আর ঢের দিন থাকবে না। জমি যদি হবে, তবে সবই যে হবে। ঘরটাকে নতুন মাটি দিয়ে ভাল করে নিতে কতদিন লাগে?

ঘরের ভিতরে ঢুকে চোখ মোছে দাশু। এইবার দেখতে পায়, মেঝের উপর মাটি কামড়ে পড়ে আছে মরচে-পড়া টাঙ্গিটা। দাশুর সারা জীবনের মেহনতের সঙ্গী সেই চকচকে টাঙ্গিটাও যেন এই তিন বছরের অবহেলার দুঃখে মর-মর হয়ে গিয়েছে।

টাঙ্গিটাকে তুলে নিয়ে ঘরের বাইরে দাওয়ার উপর বসে দাশু। একটা নুড়ি তুলে নিয়ে এসে টাঙ্গিটাকে ঘষে ঘষে মরচে ছাড়াতে থাকে। দাশুর কপালের রগ ফুলে ফুলে নাচতে থাকে। যেন হঠাৎ আবার এক দুরন্ত আশার প্রেরণা পেয়ে দাশু কিষাণের প্রাণ আবার একটা জেদ ধরতে শুরু করে দিয়েছে। জমি যখন পাওয়া যাবে, তখন আর এত ডর কিসের? নুড়ি দিয়ে ঘষে ঘষে যেন কঠোর একটা অদৃষ্টের মরচে ছাড়াতে থাকে দাশু।

এখন শুধু একটা কাজ চাই। টাঙ্গিটাকে কোলের উপর শুইয়ে রেখে সড়কের নিমের ছায়াটার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে দাশু। ঈশান মোক্তারের মনিষ হয়ে খাটতে ইচ্ছা করে না ; বড় গুমস্তা, সেই জল্লাদটা, দুখনবাবু যার নাম, সে কি দাশু কিষাণকে মধুকুপির কোন ক্ষেতের মাটি আর ছুঁতে দিবে? কভি না। সুরেন মান্‌ঝির মত রাগ করে গাঁ ছেড়ে সদরপানে দিনমজুরী খাটতে যাওয়াও চলে না। চলে যেয়ে লাভ নেই। না, কিষাণ মানুষ কুলি হবে কেন? খাদের কাজেও ঠোকর আছে। ছাঁটাইয়ের মার খেয়ে আবার ভুখা কুকুরের মত গাঁয়ের পানে ফিরে আসতে হয়।

কিন্তু কাজ কই? দাশু কিষাণের পাথুরের বুকের সব আশা আর দুঃসাহস আবার ভীরু হয়ে দুরদুর করে কাঁপতে থাকে। এত ভাল মধুকুপির মাটিতে কাজ নেই কেন গো কপালবাবা? গোবিন্দপুর জেলখানার এতটুকু ক্ষেত আর বাগিচা যদি এত দিতে পারে, তবে...।

কি ভেবে ছটফট করে উঠে দাঁড়ায় দাশু। কাজ আছে নিশ্চয়। তা না হলে বড় বুড়া রতন আর সনাতন লাইয়া বেঁচে আছে ও গাঁয়েতেই আছে কেমন করে?

কিন্তু ওরা আছে কি? গাঁয়ের মুখিয়া রতনও কি সুরেন মান্‌ঝির মত গাঁয়ের মাটিকে ঘিন্না করে চলে গিয়েছে?

গাঁয়ের কিষাণগুলো সত্যিই আছে কি নাই? ভয়ানক সন্দেহের ধুলো যেন দাশুর ফ্যালফ্যালে চোখের উপর ছিটকে পড়ছে। সত্যিই তো, এখন পর্যন্ত এই পথ দিয়ে গাঁয়ে একটা মানুষকেও যেতে দেখা গেল না। মহুয়াতে নতুন ফুল ধরেছে, এখন তো আখড়াতে মাদলের বোল আর ঝুমুরের গান বেজে ওঠবার সময়। কিন্তু কই, মাদলের শব্দ দূরে থাকুক, গাঁয়ের কোন দিক থেকে মানুষের হাঁকডাকের একটা ছোট শব্দও শোনা যায় না।

এ কেমন রহস্য! এ আবার তোমার কোন্ রাগের খেলা গো কপালবাবা? জাতপঞ্চ কি আর নাই? গরুচরানী জগমোতি কালিমণি আর বুধনিও কি নাই? গত করমে কি ওরা খোঁপাতে ফুল ঠাসে নাই, হলুদে ছোপানো শাড়ি পরে নাই, আর মহুয়ার নেশাতে মাতোয়ালা হয়ে সারা রাত নাচে নাই?

দাওয়া থেকে নেমে দৌড়ে দৌড়ে চলতে থাকে দাশু। আর, রতনের ঘরের কাছে এসে চেঁচিয়ে ওঠে—কোথায় গেলে গো কাকা?

কোন সাড়া নেই। রতনের ঘরের দরজায় হুড়কো টানা রয়েছে। সেই দিকে তাকিয়ে দাশুর চোখের আতঙ্ক ছলছল করতে থাকে। বুড়ার যে ছোট ছোট দুটো নাতিও ছিল ; ওরা ঘরে নাই কেন?

একটু দূরে ভেরেণ্ডার বেড়া দিয়ে ঘেরা যে ঘরের দরজার কাছে একটা ছাগল বাঁধা রয়েছে, সেটা হল সনাতন লাইয়ার ঘর। চেঁচিয়ে ডাক দেয় দাশু—সনাতন হে!

ছাগলটার পিঠের কাছে সাদা চুলের জঞ্জালে ছাওয়া একটা মাথা ঠকঠক করে নড়ে ওঠে। সনাতনের মা বটে কি?

হ্যাঁ, তাই ; দাশু কাছে এসে দাঁড়াতেই সনাতনের মা বলে—ওরা ঘরে নাই গো।

—কেন?

—উয়ারা খাটতে গেছে।

—কোথায় গেল?

—হোই জামুনগড়ার ডাঙা পানে।

—গাঁয়ের সব মানুষ গেছে কি?

—হ্যাঁ গো ; সে-কথা আর শুধাও কেনে? আমার দাদুয়াটাও গেল।

—সে কি গো দাদী! সনাতনের ছেইলাটাও যায় কেন? ওটা তো একটা বাচ্চা বটে গো।

—হ্যাঁ গো, সাত বছর বয়স হলো উয়ার।

সনাতনের সাত বছর বয়সের বাচ্চা ছেলেটাও জামুনগড়ার ডাঙাতে খাটতে চলে গিয়েছে। এ কি অদ্ভুত কথা বলছে দাদী বুড়ী? গাঁয়ের সব বুড়ো জোয়ান আর বাচ্চা গিয়ে কাজের উৎসবে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে, তবে বুড়ীর গলার স্বরে ক্ষীণ হাহাকারের মত একটা আওয়াজ মিছা ঠক্‌ঠক্ করে কেন?

দাশু বলে—গাঁয়ের বেটিগুলাও গেছে কি?

—হ্যাঁ গো। সনাতনের মা'র মাথাটা কেঁপে কেঁপে আবার সাদা চুলের জঞ্জাল কাঁপাতে থাকে—সব সব ; বউ বিটি বহিন, সব গেছে।

এক মুঠা ভেজা ছোলা মুখের ভিতর ফেলে দিয়ে সনাতনের মা বলে—সাঁঝের পর উয়ারা গাঁয়ে ফিরবেক।

এ কেমন কাজ? দাশুর বুকের ভিতর থেকে একটা খুশির চিৎকার ঠিকরে বের হতে চায়। সারা গাঁয়ের মানুষ খাটবার কাজ পেয়ে গেল ; তুমি কত দয়া জান, তোমার পাও লাগি কপালবাবা!

আর এক মুহূর্তও দেরি করে না দাশু। মধুকুপির পিপুলের ছায়ার কাছে এসে পৌঁছতেও দেরি হয় না। তারপর ডরানির স্রোতের লোহা বাঁধানো পুল ; তার একটু দূরে এগিয়ে যেতেই জামুনগড়ার সড়ক। সেই সড়ক ধরে ছুটে ছুটে চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় দাশু ; আর, আবার একটা ভীরু বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে, ফ্যালফ্যালে চাহনি তুলে সামনের ডাঙাটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

কাছেই ডাঙার উপরে টিনের একটা চালার নীচে ছোট একটা টেবিল ; সেই টেবিলের উপর একটা বাক্স। টেবিলের কাছে একটা চেয়ারের উপর উবু হয়ে বসে হাসছে যে লোকটা, তাকে দেখা মাত্র চিনতে পারে দাশু। বাবু দুখন সিং। মস্ত বড় একটা খাতা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে বাবুটা, তারই সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে মধুকুপির দুখনবাবু।

আর, একটু দূরে ডাঙার বুকের উপর ধুলো উড়ছে। মাটি কাটছে সবাই ; বুড়ো, আধবুড়ো, জোয়ান আর আধজোয়ান। ঝুড়ি ভর্তি মাটি মাথায় তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটছে আর এগিয়ে যাচ্ছে যারা, তাদের ধুলোমাখা চেহারাগুলিকেও চিনতে পারে দাশু। মধুকুপির কিষাণের ঘরের যত বউ বেটি আর বহিন। বাচ্চা ছেলেগুলিও ছোট ছোট ঝুড়ি মাথায় নিয়ে কিলবিল করছে। ডাঙার উপর দিয়ে এক সারি খুঁটির সঙ্গে বাঁধা দড়ির লাইন এঁকেবেঁকে অনেকদূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে ; মাটি-বহা মেয়েরা আর বাচ্চারা ঝুপঝাপ করে লাইনের পাশে মাটি ফেলছে।

আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় দাশু ; টিনের একচালার কাছে এসে দাঁড়ায়। বাবু দুখন সিং ভুরু পাকিয়ে হেসে ওঠে—কবে ছাড়া পেলে হে, দাশু? কোদাল নিবে নাকি হে? না, নগদ টাকায় জমি কিনে নিয়ে জোত করবে?

দাশু বিড় বিড় করে—এটা কিসের কাজ বটে?

দুখনবাবু—টেস রিলিফ বটে?

দাশুর চোখ দুটো আরও বেশি ফ্যালফ্যাল করে—সেটা কি বটে?

দুখন সিং—সরকার খয়রাতী করছে ; তুমি ভিখমজুর হয়ে খাটবে, এই কাজ।

বাবু ভদ্রলোক খাতাটাকে বুকের উপর চেপে ধরে আর দাশুর মুখের দিকে তাকিয়ে একটা মায়াময় আক্ষেপের হাসি হাসেন—বাস্তবিক, এদিকের জংলী গাঁয়ের মানুষগুলো কী সরল!

মধুকুপি ও আশেপাশের আরও দশটা গাঁয়ের সব আউশ আর আমন অজন্মাতে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাই দুখনবাবু বার বার সদরের দৌড়াদৌড়ি করে, ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করে,

আরও অনেক রকমের চেষ্টা করে এই টেস্ট রিলিফ মঞ্জুর করাতে পেরেছে। হাতে কাজ নেই, ঘরে এক দানা চাল নেই, এহেন দুখীদের কাজ দিয়ে বাঁচাবার জন্য সরকার জামুনগড়ার ডাঙার বুকের উপর দিয়ে এই সড়ক টানবার অর্ডার দিয়েছেন। সড়কটা জামুনগড়ার পুবের দিকে এক ক্রোশ এগিয়ে যেয়ে সীতাপুর রোডের সঙ্গে মিশে যাবে। বাবু দুখন সিং এই টেস্ট রিলিফের ঠিকা নিয়ে পে-মাস্টার হয়েছে। বাবু ভদ্রলোকটি হলেন রিলিফের ইনস্পেক্টর। বুড়ো আর জোয়ান মাটিকাটার রোজানা মজুরি আট আনা। মাটি-বহা মেয়ের মজুরি ছয় আনা। বাচ্চারা পায় চার আনা।

টেস্ট রিলিফের অফিসে এই একচালার কাছে একটা দোকানও বসে গিয়েছে। চাল, মাষকলাই, মকাই, নুন আর শুকনো মরিচ। এই দোকানের মালিক বাবু দুখন সিং। দুখনবাবুর চাকর দাঁড়ি-পাল্লা আর বাটখারা সামনে রেখে সারাদিন ঝিমোয় আর বিড়ি টানে। সন্ধ্যা হবার কিছু আগে মাটি-কাটা আর মাটি-বহা মানুষের দল যখন এসে ভিড় করে দুখনবাবুর কাছ থেকে মজুরি নিতে থাকে, তখন ব্যস্ত হয়ে ওঠে দুখনবাবুর দোকানের চাকর। নগদ নগদ পয়সা দিয়ে চাল মকাই আর নুন মরিচ কিনে, আর পুঁটলি করে বেঁধে নিয়ে যখন সবাই চলে যায়, তখন চাকরটার মত দোকানটাও আবার ঝিমিয়ে পড়ে।

তারপর হিসেব হয়। পে-মাস্টার দুখন সিং হিসেব করে রিলিফের ইনস্পেক্টরের বখরা মিটিয়ে দেয়। হাজিরাখাতার একগাদা ভুয়া নামের তালিকায় সই দেবার আগে অন্তত বিশটা টাকা হাতে না নিয়ে ছাড়েন না ইনস্পেক্টর। আবার, হাজির মজুরদের রোজানা রেট মাথাপ্রতি দু আনা বাড়িয়ে খাতায় লিখে নিয়ে যখন আবার হিসেব করে ফেলে দুখনবাবু তখন সই দেবার আগে আবার বিশটা টাকা পে-মাস্টার দুখনবাবুর হাত থেকে নিজের হাতে তুলে নেন ইনস্পেক্টর। এই ইনস্পেক্টর সাধাসিধা সরল গেঁয়ো মানুষদের খুব পছন্দ করেন। কয়লা-খাদে কাজ করে বড় চালাক হয়ে গিয়েছে ; সেই সুরেন মান্‌ঝির মত সন্দেহের মানুষ যেন এখানে আর না আসে। কী ভয়ানক হাঙ্গামা করে আর মজুরির হিসাব নিয়ে উৎপাত করে শেষে ভালয় ভালয় বিদায় নিয়েছে লোকটা। আট আনা হাতে নিয়ে দশ আনার প্রাপ্তি স্বীকার করে না, টিপ সই দিতে গিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, এই কিষাণ বেচারা বোধহয় সে-রকম ধূর্ত মানুষ নয়।

দাশুর দিকে তাকিয়ে ইনস্পেক্টর বলেন—কোদাল চাও তো বল।

উত্তর না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে দাশু। বাবু দুখন সিংয়ের কথাগুলি, আর এই বাবু ভদ্রলোকের মুখের হাসি যেন একটা নির্দয় ঠাট্টার মাতলামি। মধুকুপির কিষাণকে ভিখমজুর হয়ে আট আনা রোজানায় মাটি কাটতে বলছে কি-ভয়ানক একটা বাচাল অপমান।

—কি হে সরদার? কাজ নিতে এত ভাবনা কিসের? আবার হাঁক পাড়েন ইনস্পেক্টর।

তবু বোবার মত শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে দাশু। ভিখমজুরের কাজ ; কাজটা যেন কয়লার ধুলোর চেয়েও কালো ময়লার ধুলোতে ঢাকা আরও ভয়ানক একটা কাজ। কিন্তু... দাশুর বধির আত্মা যেন হঠাৎ চমকে ওঠে ; কোমরের কাছে ধুতির শূন্য গোঁজায় হাত দিয়ে কাঁপতে থাকে ; সেই পাঁচটা টাকাও নেই। সারাদিনের না-খাওয়া পেটটাও কেঁপে কেঁপে জ্বলছে। এক বেলার মজুর যদি চার আনা হয়, তবে তো এক সের মকাইয়ের দানা হয়। হায় কপালবাবা!

—দেন তবে একটা কোদাল! চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

বাবু দুখন সিংয়ের ভুরু দুটো কুঁকড়ে যায় ; চেঁচিয়ে হেসে ওঠে দুখনবাবু। আর, কোদালটা হাতে নিয়ে মাটি-কাটা লাইনের দিকে দৌড়তে থাকে দাশু।

কাকে যেন খুঁজতে থাকে দাশু। দাশুর চোখে-মুখে ভয়ানক একটা অভিমানের জ্বালা। ছোট ছোট এক-একটা ধুলোমাখা ভিড়ের কাছে এসে একবার থমকে দাঁড়ায়, তারপরেই দৌড়তে থাকে দাশু। সব ভিখমজুর! দুখনবাবুর জাতপঞ্চ যে এত যত্ন করে জাত ভাগ

করেছিল, কোথায় সেই ভাগ? জাতিয়া খাদিয়া আর কুঁকড়াশি, সবই যে এক ধুলোয় ঢাকা পড়ে একাকার হয়ে গিয়েছে।

লাইনের একেবারে শেষ মুখে, যেখানে রোদের জ্বালায় পিঠ পুড়িয়ে একটা মাটির টিলার গায়ে ঝুপঝাপ কোদালের কোপ মারছে একটা জীর্ণশীর্ণ বুড়ো শরীর, তারই কাছে এসে চেঁচিয়ে ওঠে দাশু—গাঁয়ের মুখিয়া হয়ে তুমি এমন পাপ কর কেন গো, কাকা?

চমকে ওঠে বড় বুড়া রতন। কোদাল থামিয়ে আর হাঁপাতে হাঁপাতে দাশুর মুখের দিকে করুণভাবে তাকায়।

দাশু বলে--তুমি ভিখমজুর হও কেন? তোমার কি একটুকও মানে লাগে না কাকা?

বড় বুড়া রতন ধুঁকতে ধুঁকতে বলে—মানে লাগে হে, কিন্তু পেট মানে না।

দাশুর মাথাটা কেঁপে ওঠে ; তার পরেই একেবারে হেঁট হয়ে ঝুলে পড়ে। বড় বুড়ার কথাগুলি যেন একটা ভয়ানক কঠোর কোদালের কোপের মত দাশুর গাঁওয়ার অহংকারের উপর আছড়ে পড়েছে। সেই অহংকার একটা ভয়াল যন্ত্রণায় কেঁপেও উঠছে। পেট মানে না ; ঠিক কথা। তাই না কিষাণের প্রাণ বুড়া খরগোশটার মত মরা ঘাসের শিকড় খুঁড়ে খাওয়ার জন্য গর্ত ছেড়ে আর মরণ-বিঁধেরও তাড়া সহ্য করে ছুটোছুটি করে বেড়ায়। তা না হলে দাশু কিষাণ আজ দুখনবাবুর মত মানুষের মুখের ওই ঠাট্টার ভাষা আর হাসি সহ্য করে কোদাল হাতে তুলে নেয় কেন, আর ভিখমজুর হয়ে মাটি কাটতে রাজী হয়ে যায় কেন? হায় কপালবাবা, কিষাণের গতরে হাত-পা ও মাথার সাথে একটা পেট আবার দিলে কেন? পেট যদি দিলে তবে আবার ভুক দিলে কেন?

দাশুর হেঁট মাথাটা রোদের তাপে তপ্ত হয়ে যখন আবার কেঁপে ওঠে, তখন চোখে পড়ে দাশুর, মাটির টিলার ওদিক থেকে এক জোড়া ধুলোমাখা ভুরুর নিচে এক জোড়া শুকনো চোখের দৃষ্টি দাশুরই মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

—সনাতন! চেঁচিয়ে ওঠে দাশু। কত রোগা হয়ে গিয়েছে সনাতন! সনাতনের গলাটা যেন শুকনো মাংসের দড়ি দিয়ে জড়ানো একটা হাড়। ছোট্ট এক ফালি কাপড়কে লেংটির মত প'রে আর কোদাল হাতে নিয়ে দাশুর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছে সনাতন ; সনাতনের হাসিটা যেন ধুঁকছে। হায় কপালবাবা জাতের লাইয়াও লেংটি পরে আর ভিখমজুরদের হয়? করমের দিনে সনাতনের ওই শরীরটা যে মাদল বুকে নিয়ে বনময়ূরের মত দুলে দুলে আখড়ার মাতাল ঝুমুরের আনন্দকে আরও মাতাল করে দুলিয়ে দিত।

সনাতন হাসে—হ্যাঁ দাশু, পেট মানে না, তা না হলে তুমিই বা এখানে আস কেন?

ঝুপ ঝুপ ঝুপ! জামুনগড়ার ডাঙায় বুকের উপর দড়ির লাইনের পাশে ভিখমজুরের কোদাল আছড়ে পড়ছে আর উঠছে। উড়ন্ত ধুলোরও একটা লাইন এঁকেবেঁকে অনেকদূর পর্যন্ত গড়িয়ে গড়িয়ে বাতাসে ভাসছে। কোদাল চালিয়ে মাটি কাটছে রতন আর সনাতন ; রতনের বুড়ো পিঠের চাম রোদের তাপে পুড়ছে, জোয়ান সনাতনের গলার শুকনো মাংসের দড়িতে মাটির ধুলো ঘামে ভিজে গিয়ে কাদা হয়ে যাচ্ছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে দাশু। দাশুর চোখ দুটো যেন ভয় পেয়ে একেবারে সাড়াহীন আর বোধহীন মূর্খতার দুটো ঢেলা হয়ে গিয়েছে।

—ও কে বটে? দাশুর চোখ দুটো যেন হঠাৎ একটু বোধ ফিরে পেয়ে চমকে ওঠে। মাটির টিলার আর-এক পাশ থেকে উঁকি দিয়ে দাশুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে কার চোখ? এই চোখ দুটোকেও দুটো নির্বোধ বেদনার চোখ বলে মনে হয়।

—জটা রাখাল বটে কি হে? চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

জটা জবাব দেয়—জটা রাখালের প্রেত বটে!

তাই তো মনে হয়। বাবু দুখন সিংয়ের দয়ার জল খেয়ে খেয়ে কত মোটা হয়ে গিয়েছিল

জটা রাখালের চেহারা! সেই চেহারা মরা-শালের মত শুকনো খটখটে হয়ে গিয়েছে। দুখনবাবুর মতলবের সাথী হয়ে নতুন জাতপঞ্চ করেছিল, জাতিয়া হয়েছিল ; আর বনচণ্ডীর ভক্ত হয়ে বামন মেনেছিল যে জটা রাখাল, তার আবার এমন দশাটি হয় কেন? এই জটা রাখালই তো সেই নতুন পঞ্চের মানুষ, যে পঞ্চ একটা বড়াইয়ের নিয়ম করেছিল, ভাত-ভাইয়ারীতে খাদিয়া আর কুঁকড়াশিদের সাথে এক ঠাঁই বসবে না জাতিয়ারা। ঈশান মোক্তারের জমিতে মনিষ খেটে বড় সুখে থাকবে ওরা, সে আশা আজ ভিখমজুর হয়ে যায় কেন? দাশুর ঠোঁট দুটো কঠোর ঠাট্টার হাসি হাসতে গিয়ে কুঁকড়ে যায়।

—কথা বল না কেন জটা? চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

জটা বলে—কোন কথা নাই দাশু।

দাশু হাসে—তুমিও সিংহ হয়েছিলে কি?

জটা—হ্যাঁ।

দাশু—পৈতা নিয়েছিলে কি?

জটা—হ্যাঁ।

দাশু—বনচণ্ডীকে তুষেছিলে কি?

জটা—হ্যাঁ।

দাশু—তবে?

জটা—তবে আর কি বটে?

দাশু—শুধাই, তোমার কি হলো?

জটা—সবই হলো। আত্মার গতি হলো, অনেক পুণ্য হলো জনম নিতে আর হবে না।

যেন একটা দুঃসহ আক্রোশের গর্জন চেপে বিড় বিড় করে আর ঝুপ ঝাপ করে কোদাল চালিয়ে মাটি কাটতে থাকে জটা রাখাল। দাশুর ঠোঁটের উপর কুঁকড়ে-ওঠা ঠাট্টার হাসিটা ব্যথা পেয়ে ছিঁড়ে যায়। চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে। চোখে পড়েছে দাশুর, জটা রাখালের সেই মোটাসোটা পেটের চেহারাটা কি-ভয়ানক চুপসে গিয়ে কতটুকু হয়ে গিয়েছে!

দাশু বলে—আমার কথা শুনে কি দুখ পেলে জটা?

জটা—না।

দাশু—ঈশান মোক্তারের জমিতে মনিষ না খেটে তুমি এখানে খাট কেন?

জটা—ওরা এখন আর জমিতে মনিষ খাটাবে না।

দাশু—কেন?

জটা—খরার ভয়ে। ছিটাই করলেও বীজ কলাবে না ; ওদের লোকসান হবে। ভাদুয়া জল যদি বর্ষায় তবে আমাদিগে আবার কাজ দিবে ; তার আগে দিবে না।

চোখ তুলে জ্বলন্ত আকাশটার দিকে তাকাতে গিয়ে দাশুর চোখও যেন জ্বলতে থাকে। ডরানির বুকটাকেও শুকনো খটখটে করে দিয়েছে এই দয়াহীন আকাশটা।

হেসে ওঠে জটা রাখাল। হাসির শব্দটা আর্তনাদের মত।

দাশু বলে—কি বটে জটা? হাস কেন?

জটা বলে—ওরা এখন কি বলে জান?

দাশু—কি বলে?

জটা—ওরা এখন বলে, নাও না, কত জমি নিতে চাও। নিজের বীজ আর নিজের হাল নিয়ে ভাগজোত কর।

বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে দাশু। জটা বলে—কিছু বুঝলে কি দাশু?

দাশু—না।

জটা—ওরা বড় ভাল হিসাব জানে। খরাতে যখন মাটি মরে, তখন ভাগজোত নিতে

সাধে ; আর যখন শাওনের জলে মাটিতে রস লাগে, তখন বলে এক সের চাল রোজানা নিয়ে মনিষ খাট। ওরা...ওরা ঠগ বটে, প্রেত বটে, কিষাণের সুখের দুশমন বটে।

বলতে বলতে একটা দুরন্ত আক্রোশের স্বর দাঁতে দাঁতে পিষে দিতে দিতে চেঁচিয়ে ওঠে জটা ঃ এমন গাঁয়ের মাটিতে থুক ফেলে আমিও সুরেন মান্‌ঝির মত চলে যাব। জটার চোপসানো পেটটা থরথর করে কাঁপতে থাকে।

বড় বুড়া রতনের গলার স্বর শোনা যায়।—থাম জটা। চুপচাপ কাজ কর।...তুমিও কাজ কর না কেন দাশু? এখনও শুধু কুদালি হাতে নিয়ে খাড়া আছ কেন? আধা মজুরি নিবারও কি ইচ্ছা নাই?

তাই তো! এখনও শুধু কোদাল ছুঁয়ে মধুকুপির গাঁওয়ার অভিমানের যত জ্বালা আর জ্বালাতনের কথা বলে বলে আর শুনে শুনে ছটফট করছে দাশু। কিন্তু এগিয়ে আসছে একটা বাবু ; ওর হাতে আলকাতরার দাগ আঁকা ছোট একটা বাঁশ। মাপের বাঁশ বটে কি? হ্যাঁ, কাটা মাটির মাপ নিতে আসছে মাপবাবু। দশ হাত চৌকা হবে আর এক হাত গভীর হবে কাটা মাটির গড়্‌হা, তবে তো আধা মজুরি মিলবে।

চেঁচিয়ে ওঠে মাপবাবু—কী রে, কোন্ রসের কথা বটে রে! কাজ করিস না কেন?

ঝুপ ঝুপ ঝুপ! দাশুর কোদালও মাটির উপর আছড়ে পড়ে শব্দ করতে থাকে।

জীর্ণ জামকাঠের দরজার ঝুলে-পড়া কপাটটা আবার সোজা করে তুলে চৌকাঠের খুঁটোর সঙ্গে চোপের দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে বসিয়ে দিয়েছে দাশু। দরজার দু পাশের দেয়ালে যেখানে শিয়ালের আঁচড়ের উৎপাতে মাটি ঝরে পড়ে গিয়ে বড় বড় দুটো ফুটো হয়ে গিয়েছিল, সেখানে আবার নতুন কাদা ভরে দিয়েছে!

একটা একটা দিন পার হতে হতে দুটো মাস পার হয়ে গেল। জামুনগড়ার ডাঙাতে দুই বেলার মাটিকাটা মেহনতের জীবন, যেন শুধু পুড়ে পুড়ে বেঁচে থাকার জীবন। সন্ধ্যা হলে মধুকুপির দিকে ফিরে যাবার সময় যখন কপালবাবার জঙ্গলের দিক থেকে পচা পাতার গন্ধ নিয়ে এক-একটা হাওয়া শনশন করে ছুটে আসে, শুধু তখন যেন শরীরের, সেই সঙ্গে মনের ভিতরেও সারাদিনের প্রদাহটা একটু জুড়িয়ে যায়।

টেস্ট রিলিফের অফিসে একচালার পাশে দুখনবাবুর সেই দোকান থেকে যেদিন শুধু এক সের বা দেড় সের ভেজা ছোলা কিনে আর গামছায় বেঁধে নিয়ে ঘরে ফেরে দাশু, সেদিন ঘরের ভিতরে আর উনান জ্বালতে হয় না। কিন্তু যেদিন সাধ করে চাল কিনে নিয়ে আসে, সেদিন উনান জ্বালতে হয়।

কিন্তু এই সাধ, এই ভাত রাঁধাই যে একটা জ্বালা। হাঁড়ি হাতে নিয়ে সোজা হেঁটে একেবারে ডরানির বুকের উপর অন্ধকারে ঢাকা বালিয়াড়ির কাছে এগিয়ে যেতে হয়। ভেজা বালু খুঁজতে গিয়ে আরও অনেকক্ষণ ধরে এদিক-ওদিক হাঁটতে হয়। তারপর ব্যাঙের লাফালাফির শব্দ শুনে ছোট একটা দহের কাছে এগিয়ে যেয়ে হাঁড়িতে জল ভরতে হয়। তারপর আবার ঘরে ফিরে এসে, উনানে শুকনো পাতার আগুন জ্বেলে...হায় কপালবাবা! উনানে শুকনো পাতার আগুন দাউ দাউ করে কাঁপে। দাশুর ঘরের ভিতরে যেন ভয়ানক একটা শূন্যতা দাউ দাউ করে কাঁপছে। দাশুর পাথুরে ছাঁদের কঠিন শরীর সব মেহনত সহ্য করতে পারে ; কিন্তু সহ্য করতে পারে না শুধু এই উনান-জ্বালা আর ভাত-রাঁধা মেহনত। হাঁড়িতে চাল ছাড়তে গিয়ে দাশুর হাতটাই যেন ফুঁপিয়ে কেঁপে ওঠে। এমন ভাতে পেট ভরে কিন্তু মন ভরে না। এমন ভাতে কোন স্বাদ নেই। মুরলীর হাতে এই হাঁড়িতে চাল ছাড়া হত, তাই না সে ভাতে এত স্বাদ হত।

কাঁসার একটা থালি। থালিটাকে ধুতে হয়। কিন্তু হাত দুটো যে আবার ফুঁপিয়ে কেঁপে

ওঠে। এটা যে সেই থালিটা বটে গো কপালবাবা, যে থালিতে কত ভাত ঢেলেছে মুরলী আর দাশু কিষাণের মুখের দিকে তাকিয়ে কত হাসি হেসেছে। মুরলী, তুই আয়! এসে আবার একটুক দুখ কর না কেন? তারপর জমি যখন হবে, তখন...

খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর যখন দাশু কিষাণের ভিখমজুরি-খাটা শরীরটা ঘুমের ভারে অলস হয়ে পড়ে থাকে, তখনও দাশুর বুকের ভিতরটা যেন বিড়বিড় করে—মুরলী, তুই আয়।

যেদিন চার আনার ভাজা ছোলার সঙ্গে চার আনার হাঁড়িয়ার নেশা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে দাশু সেদিন মাঝরাতের প্রহর শেষ না হতেই দাশুর নিঝুম বুকের একটা স্বপ্ন যেন চিৎকার করে ওঠে—ছেইলাটাকে একবার নিয়ে আয় না কেন মুরলী!

রাতশেষের ঘুম যেন একটা সান্ত্বনায় স্নিগ্ধ হয়ে যায়। নতুন মাটির ঘর হল, পাঁচ বিঘা জমি হল। ক্ষেত ঘিরে গুলঞ্চের বেড়াতে ফুল ধরল। ক্ষেতের ধানের শিসের উপর তিতলি ফড়িং উড়ে বেড়ায়। চল মুরলী, একবারটি আখড়াতে যাই।

জিত হয়েছে দাশুর। কিষাণের প্রতিজ্ঞা জয়ী হয়েছে। জমির সুখে মজবুত হয়ে কিষাণের হাত এইবার একটা লুঠেরা ডাকাতের হাত কড়কড় করে ভেঙে দিয়েছে আর মুরলীকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসে বুকে চেপে ধরেছে। তারপর বুকের কাছে মাদলটা, কাঁধের উপর ছেইলাটা, পাশে পাশে মুরলী।

না, ধিতাং ধিতাং নয়, ঘড়াং ঘড়াং ; দাশুর স্বপ্নের ঘোর পিষে দিয়ে ভয়ানক কর্কশ একটা শব্দ বেজে বেজে চলে গেল। জীর্ণ জামকাঠের দরজাটা কাঁপছে। চালার বাতা থেকে ঝুরঝুর করে ঘুণের ধুলো ঝরে পড়ছে।

ঘুম-ভাঙা চোখ দু হাতে চেপে আর ধড়ফড় করে খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর উঠে বসে দাশু। শুনতে পায় দাশু ; সড়কের উপর দিয়ে ঘড়াং ঘড়াং শব্দ করে যেন একটা অতিকায় লোহার জানোয়ার প্রচণ্ড হাড়গোড় বাজাতে বাজাতে চলে যাচ্ছে।

ঠিকই সন্দেহ করেছে দাশু। ঘরের বাইরে এসে আর ব্যস্তভাবে হেঁটে একেবারে সড়কের কাছে এসে দেখতে থাকে দাশু ; কিন্তু দেখে কিছু বুঝতে পারে না। শুধু মনে হয়, ঘড়াং ঘড়াং করে কলকব্জা দিয়ে গড়া একটা রহস্য হামা দিয়ে কোথায় যেন চলে যাচ্ছে।

—এটা কি বটে গো? চেঁচিয়ে হাঁক দেয় দাশু।

—এটা ট্রাকটর বটে গো। লাঙ্গলগাড়ি বটে।

যে লোকটা উত্তর দেয়, তার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে দাশুর বুকটা ভয়ানক এক বিস্ময়ের বেদনায় জ্বলে ওঠে। উত্তর দিয়েছে যে, সে হল সনাতন। গাঁয়ের লাইয়া সনাতন। মধুকুপির বেটি-বহিনের বিয়াতে আর পূজা-পরবে ও উৎসবের আরম্ভে মাটির উপর জল ছিটিয়ে মাঙ্গলিক কাজ করবে যে, জীবনের এতটা কাল এই কাজ করে এসেছে যে, সেই সনাতন।

ট্রাকটরের উপর চাকা ধরে বসে আছে যে গম্ভীর একটা লোক, তারই পিছনে চাকরের মত ভঙ্গী নিয়ে উবু হয়ে বসে আছে সনাতন। খাকি কামিজ আর খাকি প্যান্ট পরেছে সনাতন। সনাতনের মাথায় কালিঝুলি মাখা এক টুকরো কাপড় ফেটির মত জড়ানো। এখন বুঝতে পারে দাশু, কেন এই দশ দিনের মধ্যে জামুনগড়ার ডাঙায় সনাতনকে মাটি কাটতে দেখতে পাওয়া যায় নি। কিন্তু...।

—কিন্তু তুমি এটার সাথে কেন সনাতন? দাশুর গলার স্বর গরগর করে।

সনাতন হাসে—আমি খালাসী বটি দাশু। ত্রিশ টাকা মাসোহারা, তা ছাড়া খোরাকিও দিবে।

—তুমি চললে কোন্ নরকে? আবার চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

সনাতন বলে—রামগড়ে চললাম। এটা রামগড়ের সরকারী খামারের লাঙ্গলগাড়ি বটে।

ঘড়াং ঘড়াং, ঘড়াং ঘড়াং, মধুকুপির সড়কের বুকে কর্কশ উল্লাসে ঠোকর দিতে দিতে লাঙ্গল-গাড়ির দাঁতাল চাকা গড়িয়ে যেতে থাকে। সে শব্দ শুনতে শুনতে দাশুর কানে তালা ধরে যায়। দাশুর প্রাণটাও যেন বধির হয়ে আর নিঝুম হয়ে যায়। সড়কের ধারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দাশু।

টিপ টিপ শব্দ করে বেজে চলেছে দাশুর হৃৎপিণ্ডটা। চুপ করে দাঁড়িয়ে আর এই টিপ টিপ শব্দ শুনতে শুনতে দাশুর প্রাণের জোরও যেন ক্লান্ত হয়ে নেতিয়ে পড়ছে। চোখ দুটো ভিজে আঠা-আঠা হয়ে গিয়েছে। মধুকুপীর ভোরের আকাশটাকে ভাল করে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। শরীরের যত হাতের গাঁটে অদ্ভুত একটা ব্যথা সুড় সুড় করছে। জ্বর হয়েছে বোধ হয়। তা না হলে মাথার ভিতরে এত তাত কেন? ঘাড়টা কাঁপে কেন? জিভে জল নেই মনে হয় কেন? গলার ভিতরে একগাদা তেতো কফ আটকে আছে কেন? তোমার পাও লাগি কপালবাবা, দাশু কিষাণের এই পাথরখানা শক্ত গতরে রোগ-বালাই দিও না। হাঁপাতে থাকে দাশু।

হ্যাঁ, জ্বর হয়েছে। নিঃশ্বাসের বাতাস গরম হয়ে জ্বলছে। জ্বলুক, সেজন্য কোন চিন্তা নেই। এক হাঁড়ি জলে দশটা বহেড়া সিদ্ধ করে নিয়ে সেই জল ঢক ঢক করে খেয়ে একটা ঘুম দিলেই জ্বর ছেড়ে যাবে। কিন্তু, এখনই যে জামুনগড়ার ডাঙায় মাটি কাটতে যেতে হবে।

—চললাম দাশু। কর্কশ স্বরের একটা আচম্কা আওয়াজ ; যেন পটকার শব্দের মত একটা আছাড় খাওয়া আক্ষেপের শব্দ। আনমনা দাশুর কান দুটো আবার চমকে ওঠে। আর, একটা কাক নিমগাছের ডালে বসে গলা ফোলানো স্বরে ক ক করে ডাকে।

দাশুর একেবারে কাছে এসে ডাক দিয়েছে জটা রাখাল। জটা রাখালের এক হাতে একটা পুঁটলি, আর, এক হাতে লাঠি। জটা রাখালের চোপসানো পেটটা শক্ত করে একটা ছেঁড়া গামছা দিয়ে বাঁধা।

—কি বটে জটা? তুমি আবার কোথায় চললে? আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে দাশু।

জটা বলে—জানি না দাশু।

দাশু—জান না, তবে গাঁ ছেড়ে যাও কেন?

জটা—গাঁয়ে থাকলে মরণ হবে গো দাদা।

চেঁচিয়ে ওঠে দাশু—কেন মরণ হবে? তুমি কি শুন নাই যে কিষাণদিগে জমি দিবে সরকার?

হেসে ওঠে জটা—শুনেছি, আমাদিগের মরণ হবার পর দিবে।...আচ্ছা...কপালবাবা তোমাকে সুখে রাখেন, আমি এখন চলি।

হন হন করে হেঁটে চলে গেল জটা রাখাল। আর, দাশুর বুকের ভিতরে একটা হাহাকার যেন দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে। কী ভয়ানক অবিশ্বাসের হাসি হেসে দাশুর আশার লোভটাকে নিষ্ঠুর ঠাট্টায় আহত করে চলে গেল জটা। যে আশায় আশ্বস্ত হয়ে এই দু মাস ধরে ভিখমজুরির দুঃখ আর অপমান সহ্য করেছে দাশু, সে আশা কি একটা মিছা লোভের মিছা পিয়াস? ওটা কি শুধু ভোটের বাবুদের একটা গীতের কথা বটে? কিষাণে তবে জমি পাবে না?

দাশুর বুকের ভিতরে আহত আশার জ্বালা ছটফট করতে থাকে। তবে কি মুরলী আসবে না? তবে কি মুরলী ফিরে এসেও আবার কেঁদে চলে যাবে? হাত বাড়িয়ে মুরলীর কোল থেকে ছেইলাকে নিতে গেলে মুরলী কি তবে দাশুর সেই লোলুপ হাতটাকে একটা ঘৃণার ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দেবে? না গো মধুকুপির কিষাণ, যে ছেইলাকে বাঁচাবার জোর নাই তোমার, সেই ছেইলাকে কোলে নিবার হক নাই তোমার।

আহত আশার জ্বালার সঙ্গে যেন দাশু কিষাণের টাঙ্গি আর মাদলও জ্বলছে। গুলঞ্চের

ফুলগুলি জ্বলছে। জ্বলছে ধানের শিস। জ্বলছে ঝুমুরের গীত আর নাচ। হাঁড়ির মহুয়াজলের মাতাল রসের স্বাদও জ্বলছে। আপন মাগ, আপন ছেইলা, আপন ঘর, আপন গাঁ—সব জ্বলছে।

শুকনো ও নেড়া যত ফাটা-মাটির ক্ষেত মাড়িয়ে আহত জানোয়ারের মত ছটফটিয়ে দৌড়তে থাকে দাশু ; বড় বুড়া রতনের ঘরের দরজার কাছে এসে বুক-ফাটা চিৎকার ছাড়ে। —তুমিও কি বিশ্বাস কর না কাকা? কিষাণে কি জমি পাবে না?

গাঁয়ের মুখিয়া রতনের জিরজিরে চেহারার মত রতনের যে মাটির ঘরটা বুড়িয়ে জিরজিরে হয়ে গিয়েছে, তারই সামনের আঙিনার একদিকে রিঠাগাছের ভিড়ের কাছে অনেক মানুষের ভিড়। উবু হয়ে বসে আছে অনেকগুলি শুকনো, ক্লান্ত ও উদাস আশা। তার মধ্যে রতনের জিরজিরে চেহারাটাও কুঁকড়ে পাকিয়ে আর ছোট্ট একটা ভীরু শিশুর মত বোবা হয়ে বসে আছে।

জাতপঞ্চের সভা নয় ; জরীপের একটা বাবু এসেছে। তাই ছুটে এসেছে মধুকুপির যত বুড়ো আধবুড়ো আর জোয়ান ভিখমজুর। কি বলে জরীপের বাবুটা?

ভিড়টা যেন আস্তে আস্তে হাঁপাচ্ছে। সবচেয়ে বেশি হাঁপাচ্ছে তারাই, যারা টেস্ট রিলিফের মাটি-কাটা মেহনতের কোদাল ফেলে রেখে দিয়ে দু দিনের জন্য রামগড়ের দিকে চলে গিয়েছিল। ত্রিশ টাকা মাসোহারা পাওয়া যাবে, আর উর্দি প'রে ও কপালে তোয়ালের ফেট্টি বেঁধে লাঙলগাড়িতে খালাসী কাটবার কাজ মিলবে ; চল হে চল। মস্ত বড় একটা আশার আহ্লাদে যেন মাতাল হয়ে ওরা গাঁ ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু সরকারী অফিসের হাসি ঠাট্টা ও তাড়া খেয়ে ফিরে এসেছে। কাজ নাই, একটার বেশি খালাসীর দরকার নাই। বড় ভাল কপাল করেছিল সনাতন, শুধু ওরই কাজ হল।

কিন্তু ওরা যে বললে, সবুর কর না কেন, কিষাণদিগের জমি দিবে সরকার। তাই কি জরীপের বাবুটা এসে গেল হে? চল হে চল ; খবর পাওয়া মাত্র সবাই ছুটে এসেছে।

নতুন করে জমির শুমারী শুরু হয়েছে। চারদিকের দশটার মৌজার যত জমির দাগ আর খতিয়ানের মাপ নম্বর ও চৌহদ্দির হিসাবে ভরা নথিপত্রের একটা বোঝা গামছা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে আর দু হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে বসে আছে জরীপের বাবু।

বাবুটার চেহারাও কেমনতর একটা উদাস চেহারা। বাবুটা বোধ হয় মধুকুপির মনিষ-জীবনের এই শুকনো ক্লান্ত ও উদাস চেহারা দেখে খুব হতাশ হয়ে গিয়েছে।

হতাশ হবারই কথা। বাবুটা বলেছে, দাও, দুটা শসা আর এক ঢেলা গুড়, আর পোয়াটাক সরু চিঁড়া দাও ; জলখাবার পর্ব তোমাদেরই গাঁয়ে সেরে নিই ; বেলাও যে অনেক হলো! কিন্তু বাবুটার এই সামান্য তুষ্টির রসদও যোগাতে পারে নি গাঁয়ের মুখিয়া রতন।

রোদের তাতে রিঠাগাছের ছায়াও গরম গয়ে গিয়েছে। জরীপের বাবুটার গলা ঘামে ভিজে গিয়েছে। গায়ের জামাটা খুলে নিয়ে আর ভাঁজ করে কোলের উপর রেখে দিয়ে সামনের ভিড়ের মুখগুলির দিকে শুধু চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে জরীপের বাবু।

মনিষগুলির চোখের চাহনি অদ্ভুত। একটা চোখ জ্বলে, একটা চোখ মিটমিট করে। যেন এক চোখে আশা আর এক চোখে হতাশা। ধুকপুকে নিঃশ্বাসের শব্দেও যেন দু রকমের সুর। বিশ্বাস আর অবিশ্বাস একসঙ্গে কাঁপে হাঁফায় আর হাঁসফাঁস করে।

চেঁচিয়ে ওঠে জরীপের বাবু—আর আমি এখানে সময় নষ্ট করতে চাই না। যদি থাকে তো তাড়াতাড়ি দেখাও।

বড় বুড়া রতন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় ঃ কি দেখতে চাও বাবু?

—পরচা, কবুলিয়ত, পাট্টা, চিঠা কিংবা হুকুমনামা।

রতন—না গো বাবু। ওসব কিছু নাই।

—কারও কি কিছু নাই? একটু-আধটু মোকরবী, লাখরাজ, ঘাটোয়ারী, নয়াবাদী,

দিগোয়ারী, কিংবা মেয়াদী জমা?

রতন—না, কিছু নাই।

—সবাই কি লেংটা? কোন হতচ্ছাড়ার কি দুই বিঘা চাকরাণও নাই?

হঠাৎ রিঠাগাছের ছায়ার আড়াল থেকে যেন একটা গম্ভীর আক্রোশের ভাষা গর গর করতে করতে ছুটে আসে—ছিল গো বাবু।

উবু হয়ে বসে থাকা ভিড়ের ছায়া ডিঙিয়ে দাশুর রুক্ষ মূর্তিটা তিনটে লাফ দিয়ে জরীপের বাবুর চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়।

—কে তুমি? কে তুমি? ভয় পেয়ে চমকে ওঠে জরীপের বাবু। গামছা-বাঁধা নথিপত্রের বোঝাটা বুকের উপর সাপটে ধরে কাঁপতে থাকে।

—তুমি কে বট? জরীপের বাবুটার সেই আতঙ্কিত চেহারার দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে দাশু। বাবুটার ঘামে ভেজা মুখটা দুখী মানুষের মুখ বলে মনে হয় ; মাথার চুল বেশ সাদা হয়ে গিয়েছে। গলার চামও শুকিয়ে ঢিলে হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এটা তো সেই...ইটখোলার ঠিকাদার সেই রায়বাবুর সরকারবাবুটাও বটে কি?

দাশুর চোখ দুটোও অপলক হয়ে থরথর করতে থাকে। চিনতে পেরেছে দাশু। লোকটার ঘাড়ের কাছে যেখানে দাশু কিষাণের সেই ভয়ানক রাগী টাঙ্গির কোপ পড়ে রক্ত ঝরিয়েছিল, সেখানে শুকনো মাংসের একটা ঢেলা উঁচু হয়ে রয়েছে। পুরনো ক্ষতের দাগটা বাবুটার ঘাড়ের সব চামড়াকে যেন টেনে নিয়ে কুঁচকে দিয়েছে। বোধ হয় আর ঘাড় টান করে তাকাতে পারে না বাবুটা ; তাই মাথাটাকে কেমনতর একটু হেলিয়ে দিয়ে আর টেরা মানুষের মত তেরছা চাহনি তুলে দাশুর মুখের দিকে তাকাতে চেষ্টা করছে।

দাশু বলে—তুমি তো সেই সরকারবাবু।

—আমি চললাম ; আমি চললাম ; এখানে আমার আর কাজ নাই। জরীপের বাবুর সন্ত্রস্ত চেহারা ছটফট করে, আর রতনের মুখের দিকে বার বার করুণভাবে তাকায়।

—আমার কথাটা শুন, বাবু। দাশুর গলার স্বর কোমল অনুরোধের স্বরের মত মৃদু হয়ে যায়।

সরকারবাবু তবু আতঙ্কিতের মত চেঁচিয়ে ওঠে—না হে, আর কিছু শোনবার দরকার নাই। আমি জানতাম না যে, তুমি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছ; জানলে আমি এখানে আসতাম না।

দাশু হাসে—আমাকে এত ডর কেন বাবু?

দাশুর মুখের সেই অদ্ভুত হাসির দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে নিয়েই একটা লাফ দিয়ে সরে যায় জরীপের বাবু। দাশুও একটা লাফ দিয়ে এগিয়ে যেযে জরীপের বাবুর পথরোধ করে।

—দাশু দাশু দাশু! ও কি কর দাশু! চেঁচিয়ে ওঠে রতন ; ভয় পেয়ে হল্লা করে ওঠে এতক্ষণের শান্ত ও নীরব ভিড়টা। আর জরীপের বাবুও তার সাদা মাথা ও ঘামে ভেজা রোগা গলাটা দুলিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—আমাকে মেরে তোমার কোন লাভ নেই ; বুড়ো বয়সে একটা চাকরি পেয়েছি...আমি শুধু চাকরি করতে এসেছি।

দশটা মৌজার যত আবাদী অনাবাদী আর পতিত মাটির দাগ ও খতিয়ানের গামছা-বাঁধা হিসাবের বোঝা বুকের উপর আঁকড়ে ধরে কাঁপতে থাকে জরীপের বাবু—আমি কারও জমি ছিনতে আসি নি...ওরে, আমারও জমি নেই।

চমকে ওঠে দাশু। আর, সরকারবাবুও ঘাড় টান করে, মাথা তুলে আর সোজা তাকিয়ে দাশুর মুখটাকে দেখতে থাকে। মধুকুপির সেই ভয়ানক টাঙ্গিবাজ কিষাণটা কাঁদছে। চোখের উপর বাঘের থাবার মত শক্ত দুটো মুঠো চেপে চেপে অদ্ভুত একটা কান্নার জলের ফোয়ারা চাপতে চেষ্টা করছে দাশু।

দাশু বলে—তুমি আমাকে মাপ কর বাবু!

—অ্যাঁ? কি বললে? মাপ করবো আমি? আচ্ছা...মাপ করলাম।

দাশু—তুমি একটু খুশী হয়ে বস বাবু।

হেসে ফেলে জরীপের বাবু—হ্যাঁ, তুমি যখন খুশী হতে বলছো, তখন আর খুশী না হয়ে...।

বলতে বলতে আবার চারপায়ার উপর বসে পড়ে জরীপের বাবু নথিপত্রের গামছা-বাঁধা বোঝাটাকে ঝুপ করে মাটির উপর ফেলে দিয়ে একটা হাঁপও ছাড়ে। তার পরেই রিঠা গাছের ছায়ার দিকে তাকিয়ে জরীপের বাবুর চোখ দুটো যেন বুড়ো ভিক্ষুকের চোখের মত উদাস হয়ে যায়।—সারাটা জীবন শুধু জমির নথি ঘাঁটলাম ; কত ফৌজদারী করে কত রায়বাবুকে জমি পাইয়ে দিলাম ; কিন্তু কই, আমার তো কিছু হলো না হে ; আমার এ-জীবনে আর কিছু হবে না হে।

দাশু—কিন্তু আমাদিগের কিছু হবে কি?

—কি?

দাশু—জমি।

—অ্যাঁ?

চেঁচিয়ে ওঠে দাশু—কিষাণে জমি পাবে কি?

—বল বাবু, বল। চেঁচিয়ে ওঠে মধুকুপির শুকনো ক্লান্ত ও উদাস মনিষের ভিড়—রামগড়ের সরকারী চাষ অফিসের বাবুরা বলছে, ভোটের বাবুরা গীত গেয়ে গেয়ে বলছে, কিষাণে জমি পাবে। সরকার কিষাণদিগে জমি দিবে। ঠিক কথা বটে কি, বাবু?

জরীপের বাবুর চোখ দুটো ভয় পেয়ে কেঁপে ওঠে।

—বল বাবু, বল। আবার বেজে ওঠে একগাদা ক্লান্ত আশার আর্তনাদ।

জরীপের বাবু কপালের ঘাম মুছে নিয়ে আস্তে আস্তে বলে—যারা টাকা দিয়ে জমি কিনবে...।

—না না না ; যাদিগের টাকা নাই ; আমাদিগের মত মনিষদিগে জমি দিবে কি সরকার?

জরীপের বাবু বিব্রত হয়ে বিড় বিড় করে—দিতে পারে। কিন্তু...।

দাশুর চোখের তারা দুটো চিকচিকিয়ে ছটফট করে—আবার কিন্তু কেন গো বাবু? দিতে যদি পারে, তবে দিয়ে দিবে বল। বল বাবু, বল।

জরীপের বাবু—হ্যাঁ দিতে পারে ; কিন্তু দিলে কিভাবে দেবে জান?

দাশু—জানি না, তুমি বল।

—কারও নামে জমির দাগ হবে না। পরচা পাট্টা হবে না। আল বেঁধে দিয়ে আর হাল কাঁধে নিয়ে তুমি যে ডেঁটে ডেঁটে বলবে, এটা আমার জমি, সেটি হবে না।

দাশুর চিকচিকিয়ে চোখ হঠাৎ শুকিয়ে যায়—কেমনটি হবে তবে?

—মিলতি জোত হবে।

দাশুর বুকের ভিতরটা যেন গরগর করে বেজে ওঠে—মিলতি জোত?

—হ্যাঁ।

দাশু—সেটা কেমন জোত বটে?

—মিলতি মেহনতের জোত। বিশ-পঁচিশ কিষাণে মিলে এক জমিতে হাল চালাবে ; ছিটাই বুনাই আর রোপাই করবে। ফসলেরও বাঁটাই হবে। যার যেমন মেহনত, তার তেমন ভাগ।

দাশু—কিন্তু আমার জমি।

—আরে না ; তোমার জমি বলে কোন জমি থাকবে না। তোমার জমি সবার জমি ; সবার জমি তোমার জমি।

দাশু—জমিও কি কয়লা-খাদের মত মিলতি মেহনতের নরক হবে বাবু? বলতে বলতে দাশুর চোখ থেকে যেন একটা জ্বালা ঠিকরে বের হতে থাকে।

জরীপের বাবু আশ্চর্য হয়ে তাকায়—তুমি মিছিমিছি কার ওপর এত রাগ করছো হে?

নিজেরই কপালের উপর শক্ত হাতের মুঠো দিয়ে একটা চাপড় মেরে চেঁচিয়ে ওঠে দাশু—এটার উপর।

বড় বুড়া রতন বিড় বিড় করে—চুপ কর দাশু।

দাশু তবু চিৎকার করে—কেন চুপ করবো কাকা? জরীপের বাবু কি বলছে, তুমি কি শুনছো না?

রতন—শুনেছি, যা হবে, তাই বলছে বাবু ; তুমি মিছা রাগ কর কেন?

দাশু—তবে বল না কেন, মিলতি জোতের মত, মাগও মিলতি মাগ হবে ; ছেইলাও তাই হবে। কে কার মাগ, কে কার ছেইলা কার কোন্ ঘর, কিছুই ঠিক থাকবে না। সব মিলতি মজার নরক হয়ে যাবে।

রতন—হবে যদি, তবে হতে দাও না কেন। তুমি মিছা চেঁচাও কেন?

দাশু—না হবে না, হতে দিব না কাকা। দাশুর চোখের চাহনি পাগল মাতালের চাহনির মত লাল হয়ে ধকধক করে।

হেসে ওঠে জরীপের বাবু, হেসে ওঠে মনিষদের ভিড়। দাশুর কানের কাছে পৃথিবীর সব আলো-ছায়া যেন ভয়ঙ্কর ঠাট্টার হাসি ঝরিয়ে কাঁপতে থাকে। হায় হায় ; হাসে কেন এরা?

দাশুর হৃৎপিণ্ডের স্বপ্নটা একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছে। আপন জমি নেই, গুলঞ্চের বেড়াও নেই ; তবে আর রইল কি? হায় কপালবাবা, তবে আর থাকে কি? তা হলে যে ডরানির স্রোতের জল শুধু জল, বড়কালু শুধু একটা পাহাড়? হরতকীর জঙ্গলের ছায়া শুধু একটা ছায়া? তা হলে বেলতলার কপালবাবাও যে শুধু একটা পাথর হয়ে যায়।

—মিলতি জোতে বড় লাভ আছে হে! জরীপের বাবুটা একটা সান্ত্বনার হাসি হাসে।

—কোন্ লাভ বটে গো বাবু? বলতে গিয়ে দাশুর লাল চোখের জ্বালা আরও জ্বালাময় হয়ে কাঁপতে থাকে।

—অনেক সুবিধা আছে। চাষ করতে সুবিধা আছে ; ফলনও ভাল হয়। একা মেহনতে তুমি যত ফসল পাবে, মিলতি মেহনতে তার দুইগুণ ফসল তোমার ভাগে পড়বে।

—বড় ভাল, বড় ভাল হিসাব ! দাশুর গলার স্বরটা যেন ধিক্কার দিয়ে বেজে ওঠে।

শুধু হিসাব আর হিসাব। সুখের হিসাব আর সুবিধার হিসাব! মায়ার হিসাব নয়। শুধু মাথাতে ভাল লাগলেই হবে, বুকে ভাল লাগুক বা নাই লাগুক। হায় রে কিষাণের প্রাণ!

আস্তে আস্তে অলস হয়ে মাটির উপর বসে পড়ে দাশু ; আর দুই হাঁটুর উপর মাথাটাকে পেতে দিয়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়।

জরীপের বাবু বলে—একটা ভাল কথা বললাম বটে ; কিন্তু কবে যে এই মিলতি জোতের সুখ তোমাদের ভাগ্যে...।

বড় বুড়া রতন হাসে—আমার কোন চিন্তা নাই বাবু। সে সুখ দেখবার লেগে আমি বেঁচে থাকবো না। কিন্তু এরা...আমার জাতের এই বেচারারা তো সুখ পাবে। বলতে বলতে মনিষদের মুখগুলির দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলে মধুকুপির মুখিয়া, জাতপঞ্চের বড় বুড়া রতন।

মনিষরা বলে—আঃ, তুমি কাঁদ কেন বড় বুড়া?

রতনের জিরজিরে পাঁজরগুলি যেন উতলা হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁপতে থাকে।—আমার পঞ্চ নাই, মান নাই, ভাত নাই, জোর নাই ; আমার মত মুখিয়া তোমাদিগের কোন সাধে কাজ দিলে নাই।

পুরনো মধুকুপির মর-মর প্রাণটা এইবার যেন শেষ অভিমান ডুকরে দিয়ে মরে যাবে। বড় বুড়া রতনের পাঁজরগুলি কি-ভয়ানক নেচে নেচে কাঁপছে!

একটা লাফ দিয়ে উঠে এসে বড় বুড়া রতনের জিরজিরে শরীরটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে দাশু—কাকা গো!

রতনের শুকনো ঠোঁটে একটা করুণ হাসির ছায়া সিরসির করে ঃ এখনই আমি মরবো না দাশু। কিন্তু...।

দাশু—কি বটে কাকা?

রতন—তুমি একটুক হাস।

দাশু—কেন কাকা?

রতন—যা হলো, তা হলো, যা হবার তা হবে। মিছা মন দুখিয়ে লাভ নাই।

জোরে একটা শ্বাস ছেড়ে হেসে ফেলে দাশু ঃ হ্যাঁ গো কাকা। আর মিছা মন দুখাবার দরকার নাই।

জরীপের বাবু বলে—আমি চলি।

মনিষদের ভিড়টাও কলরব করে ওঠে—চল হে, চল।

আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মনিষদের ভিড়টা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এখনও পুরা একটা বেলা আছে। জামুনগড়ার ডাঙাতে টেস রিলিফের কাজে ভিখমজুর খাটলে আধা রোজের মজুরী হবে। চল হে, চল।

দাশু বলে—আমিও চলি, কাকা।

রিঠাগাছের ছায়ার ভিড়ও এতক্ষণে হাঁপ ছেড়ে আস্তে আস্তে দুলতে থাকে। এক ঝাঁক লটকন পায়রা উড়ে এসে রিঠাগাছের মাথার উপর পাখা ফরফরিয়ে হুটোপুটি করতে থাকে। পায়রার ডানা-খসা ছোট ছোট পালকগুলি দমকা হাওয়ার ঝাপটা লেগে বাতাসে ছুটতে থাকে। আর, পাথরের পাটার মত মজবুত যার বুকের পাটা, মধুকুপির সেই দাশু কিষাণ যেন এতদিনে ওই বুকের সব নিঃশ্বাসের জোর হারিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে চলতে থাকে।

ওরা বলছে, আপন জমি না হোক, তবু মিলতি জোতে ওদের খুব সুখ হবে। হোক, হোক, তাই যেন হয় কপালবাবা। যেন মধুকুপির বাতাসের সঙ্গে কথা বলে বলে পথ চলতে থাকে দাশু।

বাঁশঝাড়ের ধড় হাওয়ার ঝাপটা লেগে ছটফট করছে, আর যেন একটা হায় হায় শব্দ বাতাসের বুকে আছড়ে পড়ছে। পুরনো জামকাঠের দরজার কপাটে হাত রেখে চেঁচিয়ে ওঠে দাশু—তবে আর মুরলী আসবে কেন? এসে কাজ কি?

ঘরের ভিতরে খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর একটা হুমড়ি খেয়ে বসে পড়ে দাশু। আর মাথাটা নামিয়ে হাঁটুর উপর চোখ দুটোকে চেপে রেখে মিথ্যা আশার স্বপ্নটাকে ঘষে ঘষে মুছে ফেলতে চেষ্টা করে।

আপন জমি হবে না। গুলঞ্চের বেড়া দিয়ে আপন জমির অহংকার ঘিরে দেওয়া যাবে না। হাত ধরে মুরলীকে বুকের কাছে টেনে এনে চেঁচিয়ে উঠতে পারা যাবে না, হেই দেখ মুরলী, আমার মাটির জাদু দেখ ; কেমন সুন্দর জিরার ফলন হয়েছে! সোনার দানার মত জিরা।

হাঁটুটা চোখের জলে ভিজে গিয়ে চবচব করে। ফিসফিস করে যেন ঘরের শূন্যতার কাছে আবেদন করে দাশু—না, তুই আসিস না মুরলী।

ঝুপ ঝুপ ঝুপ! বাঘের থাবার মত দুটো শক্ত হাতের মুঠো দিয়ে কোদালের হাতল আঁকড়ে ধরে জামুনগড়ার ডাঙায় টেস্ট রিলিফের কাজে নতুন সড়কের জন্য মাটি কাটে

দাশু। আধা সকাল আর পুরো দুপুর ও বিকাল, ভিখমজুর দাশুর জীবনটা যেন ধুলামাখা হয়ে খাটতে থাকে, যতক্ষণ না ছোটকালুর মাথার আড়ালে সূর্য ডুবে যায়।

কিন্তু কি আশ্চর্য, দাশু কিষাণের এমন পাথুরে ছাঁদের বুকটাও হাঁপায় ; বাঘের থাবার মত শক্ত হাতের মুঠো দুটোও ক্লান্ত হয়ে মাঝে মাঝে আলগা হয়ে যায় ; আর কোদালটাও হঠাৎ উদাস হয়ে গিয়ে কোপ পাড়তে ভুল করে ফেলে।

সন্ধ্যা হলে দুখনবাবুর খাতায় টিপ সই দিয়ে মজুরী নিয়ে, আর আধ সের মকাইয়ের দানা গামছায় বেঁধে নিয়ে, ঘরে ফেরার সময় ডরানির একটা ছোট দহের জলে স্নান ক'রে ধুলোর আবরণ ধুয়ে ফেলতে গিয়ে ছ্যাঁক্ করে চমকে ওঠে শরীরটা ; আঃ, ডরানির জল কত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে গো!

—মুরলী তুই আসিস না! তিন হাত উঁচু মাটির দেয়াল দিয়ে ঘেরা একটা শূন্যতার মধ্যে খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর যতক্ষণ জেগে বসে থাকে দাশু, ততক্ষণ দাশুর বুকের ভিতর থেকে একটা ভাবনার ভয় বার বার উথলে ওঠে আর বিড়বিড় ক'রে বাজে।

কিন্তু মুরলী যেন দাশুর স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে ঝগড়া করে। কেন গো সরদার? এত উদাস কেন তুমি? মুরলীকে ঘরে নিতে মন করে না, এ তোমার কেমনতর মন?

—না, আর আমার সাধ নাই মুরলী।

—কেন?

—আমার জমি নাই। আমার জমি হবে না ; কেউ আমাকে জমি দিবে না।

—কিন্তু ওরা যে বলছে...।

—কি?

—একটুক সবুর কর না কেন, জমি দিবে সরকার।

—না না না ; দিবে না। আবার আমাকে ওসব গীতের কথা বিশ্বাস করতে বলিস না মুরলী।

—বিশ্বাস কর না কেন সরদার?

—না মুরলী ; আর বিশ্বাস করতে মন করে না।

—মিলতি জোতের জমি তো পাবে।

—দূর দূর দূর! মধুকুপির দাশু কভি মিলতি জোতের চাষী হবে না।

—মিলতি জোতে কত ভাল ফলান হবে সরদার? ধান বল, সরগুজা বল আর সব্জি বল, কত ভাল হিস্যা হবে তোমার। মাগ-ছেইলা নিয়ে ভরপেট খাওয়ার সুখ যে হবে সরদার। একটুক ভেবে দেখ সরদার।

—না না না। এমনতর নতুন সুখে আমার সাধ নাই। আমার বড় ডর লাগে আর ঘিন্না করে মুরলী। মিলতি জোতের চাষী হলে আমার ঘর ধাওড়া হয়ে যাবে ; আমার সব সাধের উপর মিলতির মার পড়বে। আমার মাগ আর আমার ছেইলাও মিলতির হিস্যা হয়ে যাবে।

—হয়ে যাক না কেন? নতুন সুখে মিছা এত ডর কেন তোমার?

কটমট করে জ্বলতে থাকে দাশুর স্বপ্নের চোখ। কি-ভয়ানক বেলাজ হয়ে মুরলীর কালো চোখ দুটো নতুন সুখের পিপাসায় ধন্য হয়ে তাকিয়ে রয়েছে। চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।—না, কভি না ; তোর ওই চোখ দুটাকে দেখতেও আমার ডর লাগে। তুই আসিস না ; যদি আসিস, তবে শুনে নে মুরলী, মধুকুপির গাঁওয়ার কিষাণ তোর মতন অমন নতুন সুখের ক্ষেপীকে ঘরে নিবে না।

ধড়মড় করে বুকটা, চমকে ওঠে দাশু। দু হাত দিয়ে ঘুম-ভাঙা চোখ দুটোকে ঘষতে থাকে। চোখ দুটো হঠাৎ ভিজেও যায়।

সত্যিই দাশুর বুকের ভিতরে যেন একটা ভয়ের ছায়া ছমছম করে, আর হাহাকার

বিড়বিড় করে। এ কেমন নতুন সুখের ঠেলা এলো গো কপালবাবা!

জরু গরু ধান, সত্যিই কি সব মিলতি আদরের সওদা হয়ে যাবে? আপন ঘর আর আপন গাঁ বলতে কি কিছু থাকবে না? মধুকুপির মাটিতে জলেতে আর ছায়াতে কি একটুকু বেশি মিঠা স্বাদ আর পাওয়া যাবে না? মরেই যাবে গাঁওয়ার মধুকুপির পুরনো প্রাণটা? মায়াতে কেউ কারও আপন হবে না, শুধু সুখেতে আপন হবে? না, তোর আর এসে কাজ নাই মুরলী। এলে তোর আবার বড় দুখ হবে। দাশু কিষাণের বুকে আর আশা নাই, জোর নাই, সাধ নাই।

মাথাটা পুড়ছে। মুখের উপরেও যেন কতগুলি ফোস্কা জ্বলছে। কেন গো, কেন গো কপালবাবা? বিড়বিড় করতে করতে আবার ঘুম ভেঙে যেতেই বুঝতে পারে দাশু, ঘরের কপাট বন্ধ না করে একেবারে দরজার কাছে মাটির উপর শুয়ে পড়েছিল। সেইভাবে সারাটা রাত পার হয়ে গিয়েছে।

হ্যাঁ, বেশ বেলা হয়েছে। আধা সকাল পার হয়ে গিয়েছে। মধুকুপির শুকনো আকাশের সূর্য এরই মধ্যে গরম রোদ ঢেলে দিয়ে মধুকুপির মাটিকে তাতাতে শুরু ক'রে দিয়েছে। সেই রোদ দরজা পার হয়ে ভিতরে ঢুকে দাশুর মাথা ও মুখের উপরেও পড়েছে।

পিপাসী কাকের দল ডরানির জল খোঁজবার জন্য অদ্ভুত লোভের ডাক ডেকে উড়ে চলেছে। উঠে দাঁড়ায় দাশু। জামুনগড়ার ডাঙাতে মাটি কেটে আধা রোজের মজুরী পাওয়ার সময় এখনও আছে। হ্যাঁ, যেতেই হবে আর খাটতেই হবে। একটা একলা রক্তমাংসের অস্তিত্ব এখনও ক্ষুধার্ত হয়, খোরাক চায়।

ঠিক আছে ; ঠিক আছে ; তুমি যেমনটি চাও তেমনটি হবে কপালবাবা! দাওয়া থেকে নেমে হন হন ক'রে হাঁটতে থাকে দাশু।—কিন্তু তোমার পায়ে পড়ি কপালবাবা, মুরলী যেন আর না আসে। আর, বুকের ভিতরের এই শব্দটাকেও মেরে দাও। মুরলী মুরলী! ভিখমজুরের মনে মিছা আর ওই শব্দটা বাজে কেন?

টেস্ট রিলিফের অফিসের একচালার কাছে এসে কোদাল হাতে তুলে নিতেই একচালাটা যেন অদ্ভুত শব্দ ক'রে হেসে ওঠে। চমকে ওঠে আর দেখে আশ্চর্য হয় দাশু ; হেসে উঠেছে বাবু দুখন সিং।

দাশু গম্ভীর হয়ে আর ছোট একটা ভ্রূকুটি করে তাকায়—হাস কেন দুখনবাবু?

দুখনবাবু—হারানগঞ্জের কোন খবর রাখ কি দাশু?

দাশু—হারানগঞ্জের খবরে আমার কোন্ দরকারটি বটে?

দুখনবাবু—না, দরকার নাই বটে ; কিন্তু...তবু...একটুক জানতে শুনতে ইচ্ছা হয় না কি?

দাশু—কি জানতে আর শুনতে ইচ্ছা হবে বল?

দুখনবাবু—তোমার ঘরণী যে ছিল, সিঁদুর মাটি করে দিয়ে তোমার ঘর ছাড়লে মহেশ রাখালের যে বেটি...।

কোদালের হাতল শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আর দু চোখের চাহনিতে একটা ভয়াতুর বিস্ময় কাঁপিয়ে দুখনবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে দাশু। দুখনবাবু বলে—মহেশ রাখালের খিরিস্তানী বেটির সাথে কার বিয়া হবে জান?

দাশু—বিয়া হয়েছিল, সে বিয়া রদ হয়েছে ; শিকারীটার ঘর ছেড়েছে মহেশ রাখালের বেটি।

দুখনবাবু—কিন্তু আবার বিয়া হবে। আজই হবে।

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে দাশু। দুখনবাবু আবার হেসে ফেলে—বড় তাজ্জব বটে দাশু। হারানগঞ্জের ডাক্তার রিচার্ডবাবুর সাথে আজ মহেশ রাখালের খিরিস্তানী বেটির বিয়া হবে।

--রিচার্ডবাবু! চেঁচিয়ে ওঠে দাশু। যেন দাশু কিষাণের প্রাণটা অতল বিস্ময়ের একটা দহের জলের মধ্যে পড়ে আর একটা চুবানি খেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে। রিচার্ডবাবু, সেই সাহেবপানা মানুষটি ; কত মান, কত টাকা, কত সুন্দর একটি ফুলবাড়িতে থাকে, সেই মানুষ! নতুন সাধের আর নতুন সুখের মানুষ ; তারই বুকের উপর মাথা রেখে আজ মুরলী সুখী হয়ে যাবে, দাশু কিষাণের সেই মুরলী?

দাশুর ফ্যালফ্যালে চোখের চাহনি শিউরে ওঠে, বুকের ভিতরে কলিজাটা নাই বোধ হয়। তা না হলে বুকটা এত ফাঁকা আর ফাঁপা লাগে কেন?

আস্তে আস্তে অদ্ভুত একটা হাসি দাশুর ঠোঁট দুটোকে কুঁকড়ে দিয়ে কাঁপতে থাকে। জোরে একটা শ্বাস ছাড়ে দাশু ; তারপরেই চেঁচিয়ে হেসে ওঠে।--বড় ভাল হলো দুখনবাবু ; বড় ভাল খবর শুনালে তুমি।

আর বলতে হবে না, মুরলী তুই আসিস না! দাশুর বুকটা এতদিনের একটা মিথ্যা জল্পনার ভার থেকে ছাড়া পেয়ে একেবারে খালি হয়ে গেল। কত ভাল হিসাব জানে মুরলী ; কত বড় সুখের ঘরে চলে গেল মুরলী। বাঃ মুরলী, তুই জাদু জানিস।

আরও কিছুক্ষণ চুপ করে আর হেঁটমাথা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দাশু। তারপর কোদালের হাতলটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আর কাঁধে তুলে নেয়।

রিচার্ড সরকার আর জোহানা সরকার! দুজনে একটা একটা মস্ত বড় ফুলের তোড়া বুকের উপর জড়িয়ে ধরে, আর প্রায় কাঁধে কাঁধে ছোঁয়াছুঁয়ি করে যখন গির্জাঘরের ভিড়ের একপাশে দাঁড়িয়ে আলোকিত পুলপিটের দিকে পুলকিত হাসির ছটা ছড়িয়ে দিয়ে তাকিয়ে থাকে, তখন বিয়ের শেষ অনুষ্ঠানও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। গির্জার ঘরভরা ভিড়ের গলায় একটা গম্ভীর প্রার্থনার কোরাস গম গম করতে থাকে। সিস্টারদিদি তার আগেই তাঁর গম্ভীর ব্লেসিং গম্ভীর গলায় পাঠ করেছেন।

গির্জাবাড়ির ফটকের সামনে চারটে মোটরগাড়ি। এর মধ্যে দুটি গাড়িতে রিচার্ডের রাঁচির বন্ধুর দল এসেছে। ডাক্তার বন্ধু, উকীল বন্ধু আর ইঞ্জিনীয়ার বন্ধু। আর দুটি গাড়ি হলো রিচার্ডের দুই বউদির গাড়ি। মিসেস বিশ্বাস এসেছেন দুমকা থেকে ; আর মিসেস রাজা এসেছেন আদ্রা থেকে।

গির্জাঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে রিচার্ড সরকার আর জোহানা সরকার যখন হাত ধরাধরি করে দুটি সুখী জীবনের উৎফুল্ল মিলনের ছবির মত ফটকের কাছে এসে দাঁড়ায়, তখন চার মোটরগাড়ির চার জোড়া হেডলাইটও উল্লাসের ঝলক তুলে জ্বলে ওঠে।

চলতে শুরু করে চারটে গাড়ি। হারানগঞ্জের শুভ সন্ধ্যায় উৎসব যেন অজস্র হাসি আর কলরবের সম্ভার নিয়ে গির্জাবাড়ির ফটক থেকে প্রায় একসঙ্গে একটা ছুটন্ত আমোদের মত উধাও হয়ে যায়। প্রথম গাড়িতে রিচার্ড ও মুরলী। দ্বিতীয় গাড়িতে রিচার্ডের দুই বউদি ও আরো দুজন, যে দুজনকে মাথার দিব্যি দিয়ে নিমন্ত্রণ করেছে মুরলী ; লুসিয়াদিদি আর মেরিয়া। আজ রাতে মুরলীকে নতুন জীবনের বাড়িতে হাজার লজ্জার মধ্যে ফেলে রেখে দিয়ে চলে আসতে পারবে না লুসিয়াদিদি আর মেরিয়া। আজ রাতটা ওখানে থাকতেই হবে।

দুই বউদিও হেসে হেসে বলেছেন, চল মেরিয়া, চল লুসিয়া, শুভরাত্রির মজা যদি তোমরা না দেখবে তো দেখবে কে? আমরা তো গুরুজন।

চার মোটরগাড়ি এসে রিচার্ড সরকারের বাড়ির ফটকের কাছে থামে। বুড়ি দাইটা বাড়ির ভিতর থেকে ছুটে এসে রিচার্ড আর মুরলীর মুখের দিকে তাকায় ও চেঁচিয়ে গান গেয়ে ওঠে। রিচার্ড সরকারের বাড়ির বাগানে গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে, আর লতার তোরণের ভিতরেও রঙিন আলো জ্বলে ; লাল-নীল আর বেগুনি রঙের আলো।

রাঁচির বন্ধুর দল হঠাৎ একটা খুশির আবেগে হাততালি দিয়ে আর হুল্লোড় করে হাসতে থাকে। কারণ, গাড়ি থেকে নামবার সময় মুরলীর কোমরটা এক হাতে জড়িয়ে ধরেছে রিচার্ড ; আর মুরলীও মাথাটাকে একেবারে রিচার্ডের বুকের উপর এলিয়ে দিয়েছে।

দুই বউদি, মিসেস বিশ্বাস ও মিসেস রাজা যেন একটা বিস্ময়ের হাসি চাপতে গিয়ে চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকেন। আর লুসিয়াদিদি ও মেরিয়া একটু লজ্জা পেয়ে হাসি লুকোতে চেষ্টা করে।

রাঁচির বন্ধুর দল আজ রাতেই চলে যাবে। রিচার্ডের বাড়ির সামনে ছোট লনের উপর চেয়ার-টেবিল পেতে যে ভোজের আসর করা হয়েছিল, সেই ভোজের সুস্বাদু আমোদও কাঁটা-চামচের আর টেঁকুরের শব্দে ও কাঁচের গেলাসের ঝনঝনানিতে মেতে ওঠে।

শুভরাত্রি জানিয়ে বন্ধুরা যখন বিদায় নেয়, তখন মুরলীর কালো চোখ থেকে অদ্ভুত এক জ্বলজ্বলে হাসি ঝলক দিয়ে উথলে উঠতে থাকে। যেন একটা বিস্ময়বিবশ সৌভাগ্যের দিকে তাকিয়ে থাকে মুরলী। বন্ধুরা উপহার দিয়ে চলে গিয়েছে ; টেবিলটা ভরে গিয়ে উপহারের সম্ভার উপচে পড়ছে।

রিচার্ড সরকারের বাড়ির যে-ঘরের ভিতরে চিনেমাটির প্রকাণ্ড দুটো ফুলদানিতে হলদে গোলাপের দুটো তোড়া থেকে মিষ্টি গন্ধ ভুর ভুর করে উড়ছে, সেই ঘরে মেহগনির একটা পালঙ্কের উপর এক হাত পুরু গদি ; সেই গদির উপর পাতা যে নরম বিছানা, তার উপর আবার ফিনফিনে সিল্কের একটি রঙিন চাদর। মৃদু বাতাসের ছোঁয়া লেগে জলচুড়ির মত কুঁচকে গিয়ে সিল্কের চাদরটা কাঁপছে।

হারানগঞ্জের রাত নীরব হয়ে গেলেও আর রিচার্ডের বাড়ির ফটক বন্ধ হয়ে গেলেও এই ঘরের ভিতর মিষ্টি মিষ্টি কথার কলরব বাজতে থাকে। মিসেস বিশ্বাস ও মিসেস রাজা, রিচার্ড সরকারের যে দুই বউদি সকাল হলেই চলে যাবেন, তাঁরা হঠাৎ দেওয়ালের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে প্রায় একসঙ্গে হেসে ওঠেন—রাত যে একটা হতে চললো।

ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায় দুই বউদি। লুসিয়াদিদি আর মেরিয়াও ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায়। মিসেস বিশ্বাস বলেন—চল মেরিয়া, আমরা আর এখানে থেকে বেচারাদের শত্রুতা করি কেন?

মিসেস রাজা বলেন—চল লুসিয়া, রাত একটা বাজতে চললো, এখন শুভরাত্রি না হলে আর কখন হবে?

রিচার্ডের উৎফুল্ল মুখের সিগারেটও ফুরফুরে ধোঁয়া ছড়াতে থাকে। মুরলী কিন্তু মাথা হেঁট করে নরম ঠোঁটের একটা লাজুক উত্তাপের শিহর লুকিয়ে ফেলতে চেষ্টা করে।

দেয়ালের ঘড়িটা যখন টুং করে রাত একটার সঙ্কেত শিউরে দিয়ে বেজে ওঠে, তখন মুরলীর বুকের ভিতরে একটা বিপুল আশার পিপাসাও শিউরে ওঠে। দেখতে পায় মুরলী, ঘরের দরজা বন্ধ করছে রিচার্ড। মুরলীর বুকের ভিতরে যেন একটা ঝর্ণার শব্দ কলকল করে বাজে ; খোঁপাটা কেঁপে ওঠে, মুখটা লালচে হয়ে থমথম করে আর গায়ের জামা সায়া ও শাড়ির আঁটসাট বাঁধনগুলিও যেন হাঁসফাঁস করে।

গলার টাই খুলে আয়নার হুকের উপর রেখে দিয়ে আবার সিগারেট ধরাচ্ছে যে মানুষটা, তারই মুখের দিকে তাকিয়ে মুরলীর চোখ দুটো মুগ্ধ হয়ে কাঁপতে থাকে। মুরলীর স্বামী রিচার্ড সরকার। রাঁচির বন্ধুরাও কতবার চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মুরলীকে মিসেস সরকার বলে ডেকেছে।

রিচার্ড সরকারের এই ঘর মুরলীর জীবনের ঘর। মুরলীর ভাগ্যটা এতদিনে যত দীনতা হীনতার ছোঁয়া আর বাঘডাকা রাত্রির ভয় থেকে মুক্ত হয়ে এক ফুলবাড়ির শুভরাত্রির কোলে পৌঁছে গিয়েছে।

মুরলীর কাছে এগিয়ে আসে রিচার্ড। আস্তে আস্তে ডাকে—জোহানা।

মুরলী—কি?

কোন কথা না বলে মুরলীর সাজানো রাঙানো সুন্দর চেহারাটাকে দুহাত শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে টেনে নেয় রিচার্ড। কী প্রচণ্ড আগ্রহের স্পর্শ। মুরলীর বুকটাও অদ্ভুত এক অনুভবের সুখে টিপ টিপ করতে থাকে। রিচার্ডের প্রাণের সব লোভ যে এখনই উছলে উঠে মুরলীর শরীরের সব লজ্জা ভিজিয়ে ভাসিয়ে একটা দুরন্ত উৎসব শুরু করে দেবে।

মুরলীর কপালের উপর রিচার্ডের নিঃশ্বাসের বাতাস ঝরে পড়ছে। এই বাতাসে যেন হলদে গোলাপের চেয়েও নিবিড় গন্ধের পরাগ আছে। চোখ বন্ধ করে, সারা শরীর আর প্রাণটাকেও চরম ইচ্ছার নেশায় বিভোর করে দিয়ে, রিচার্ডের বুকের ছোঁয়ার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মুরলী। মনের ভিতর গুণ গুণ করে একটা আশার গান। হে গড, কত দয়া তোমার! আমার স্বামী আমার এই রিচার্ডকে যে মরদানির দেবতা বলে মনে হয়।

রিচার্ড আস্তে আস্তে ফিস ফিস করে ডাকে—জোহানা।

মুরলী—কি?

রিচার্ড—তুমি কি জান যে...।

মুরলী—কি?

রিচার্ডের গলার স্বর হঠাৎ একটু বিচলিত হয়ে কাঁপতে থাকে—আমার দুই বউদি আর তোমার ওই লুসিয়াদিদি ও মেরিয়া, ওরা এখন কি করছে জান?

মুরলী—না।

রিচার্ড—এই ঘরের ভিতরে উঁকি দেবার জন্য জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

চমকে ওঠে মুরলী। আর সত্যিই দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হয়ে যায়, দুটো জানালা একেবারে খোলা হয়ে রিচার্ড ও মুরলীর জীবনের এই শুভরাত্রির ছবিটাকে বাইরের চোখে ধরা পড়িয়ে দেবার জন্য ধূর্ত মতলবের মত চুপ করে রয়েছে।

মুরলী বলে—জানালা দুটো বন্ধ করে দাও।

রিচার্ড বলে—না জোহানা।

মুরলী—তবে আলো নিভিয়ে দাও।

রিচার্ড—না জোহানা।

রিচার্ডের গলা দুহাতে জড়িয়ে ধরে ছটফট করে ওঠে মুরলীর লজ্জিত শরীরটা।—তবে?

রিচার্ড—ওরা জানতে চায় জোহানা, একেবারে চোখে দেখে নিয়ে বুঝতে চায় যে, আমি সত্যিই তোমার স্বামী হতে পেরেছি।

আশ্চর্য হয় মুরলী—কি বলছো, ঠিক বুঝতে পারছি না।

রিচার্ড—আমার দুই বউদির মনে একটা সন্দেহ আছে! তাছাড়া, আমার মনে হয়, তোমার লুসিয়াদিদি আর মেরিয়ার মনেও একটা সন্দেহ আছে যে...।

মুরলী—কি সন্দেহ?

রিচার্ড—ওদের ধারণা, কোন মেয়ের স্বামী হবার মত শরীর আমার নেই।

মুরলী ভ্রূকুটি করে—ছিঃ, ওদের সন্দেহ নরকে যাক ; তুমি ওদের সন্দেহের পরোয়া করবে কেন?

রিচার্ড—ওদের সন্দেহ ভেঙে দিতে চাই জোহানা, সেজন্যে তোমাকে যদি একটু...।

মুরলীর চোখ দুটো যেন রিচার্ডের সুন্দর পৌরুষের এই ভয়ানক অপবাদের উপর একটা আক্রোশ নিয়ে জ্বলতে থাকে। মুরলীর রঙিন নরম ঠোঁট যেন রাগ করে আর ফুলে ফুলে কাঁপতে থাকে। ধবধবে সাদা দাঁতের কামড় বসিয়ে দিয়ে ঠোঁটটাকে শক্ত করে চেপে ধরে মুরলী। আর রিচার্ডের একটা হাত টেনে নিয়ে নিজেরই কোমরে জড়িয়ে দিয়ে ফিস ফিস

করে মুরলী--। হ্যাঁ রিচার্ড ; একটু কেন, আমি একেবারে বেহায়া হয়ে যেতেও রাজি আছি।...এস।

রিচার্ড--জোহানা।

মুরলী--যারা দেখবে, তারাই যদি লজ্জা না পায়, তবে আমাদের কোন্ লজ্জা?

রিচার্ড আবার ডাকে—একটা কথা শোন জোহানা।

মুরলী--কি বল?

রিচার্ড--ওদের সন্দেহ মিথ্যে নয়।

--কি? চেঁচিয়ে উঠেই মুখটাকে রিচার্ডের বুকের উপর আছড়ে দিয়ে যেন বোবা হয়ে যায় মুরলী। রিচার্ডের বুকের হাড়ে যেন জটিল একটা গিঁট আছে। সেই গিঁটে ঠোকর লেগে মুরলীর কপালটা জ্বলতে থাকে।

মুরলীর মাথায় হাত বুলিয়ে নিবিড় আদরের সুরে আর অবাধ হাসি হেসে আবার ডাক দেয় রিচার্ড—জোহানা।

মুখ তোলে মুরলী ; মুরলীর চোখ থেকে যেন মরা আগুনের ছাই ঠিকরে পড়ছে।--রিচার্ড!

--কি?

--তুমি কি-ভয়ানক ফাঁকির পিশাচ।

—আস্তে কথা বল।

—কেন?

—ওরা শুনে ফেলবে ; ওরা জানালার আড়ালে কান পেতে আছে।

—ওরা কেন সন্দেহ করে যে, তোমার শরীরে দোষ আছে?

—মারা যাবার আগে এই সন্দেহ রটিয়ে দিয়ে গিয়েছে স্টিফানা।

—কি বললে?

—তোমার লুসিয়াদিদির কাছে, তোমার মেরিয়ার কাছে, আর আমার দুই বউদির কাছে বোকা স্টিফানা রাগ করে যেসব কথা বলত...।

--কিসব কথা?

—বোকা স্টিফানা কত বার বেফাঁস বলে ফেলেছে, আমার স্বামী থেকেও স্বামী নেই, আমার ছেলে হবে না, তবে আর আমার বেঁচে থেকে লাভ কি? স্টিফানা শেষ পর্যন্ত...।

—কি?

--বউদিরা আর তোমার লুসিয়াদিদি ও মেরিয়া, ওরা সন্দেহ করে যে, স্টিফানা ইচ্ছে করে মরেছে।

—তার মানে?

—আত্মহত্যা করেছে।

--ওদের সন্দেহ কি মিথ্যা? স্পষ্ট করে বল রিচার্ড।

—মিথ্যে নয় জোহানা। বোকা স্টিফানা শেষে রাগ করে একেবারে পাগল হয়ে গিয়ে বিষ খেয়েছিল।

মুরলীর নিঃশ্বাসের শব্দ এইবার যেন সাপের রাগের শব্দের মত হিস হিস করে ওঠে।--জোহানাও আত্মহত্যা করবে। তোমাকে ক্ষমা করতে পারবে না জোহানা।

রিচার্ড হাসে—ছিঃ জোহানা ; তুমি তো স্টিফানার মত বোকা নও, পাগল নও।

জোহানা—কিন্তু আমি কি মেয়েমানুষ নই?

রিচার্ড হাসে--তুমি চমৎকার বুদ্ধিমতী মেয়েমানুষ। তা না হলে মধুকুপি নামে একটা জংলি গাঁয়ের ঘর থেকে বের হয়ে...।

—চুপ কর। ফুঁপিয়ে ওঠে মুরলী।

রিচার্ড হাসে—আমি জানি, তুমি খুব খুশি হবে, যদি এই বাড়িটা আমি তোমার নামে লিখে দিই।

চমকে ওঠে মুরলী। রিচার্ড বলে—তাছাড়া কিছু নগদ টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিয়ে তোমারই হাতে দিয়ে দিতে চাই।

মুরলী—কত টাকা?

রিচার্ড হাসে—ধর, অন্তত দশ হাজার টাকা।

মুরলী হাসে—তাতে তোমার লাভ?

রিচার্ড—আমার লাভ এই যে, তাহলে তুমি স্টিফানার মত কাণ্ড করবে না। তুমি আমার মান রাখবে।

মুরলী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়—তোমার মান যদি তুমিই রাখতে না জান, তবে আমি কি করে রাখব বল?

রিচার্ড হাসে—সে কথাই তোমার কানে কানে বলতে চাই। শুধু আমার মানের কথা নয়, তোমারও মানের কথা।

জোহানা—বল।

জোহানার কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে কথা বলে রিচার্ড। শুনতে শুনতে চোখ বন্ধ করে কাঁপতে থাকে মুরলী। রিচার্ডের নিঃশ্বাসের বাতাস যেন একটা শিশু সরীসৃপের স্পর্শের মত মুরলীর প্রাণের উপর সিরসির করছে।

রিচার্ডের কাছ থেকে সরে গিয়ে আর বিছানার উপর বসে অনেকক্ষণ ধরে চোখের উপর রুমাল চেপে রাখে মুরলী। কী অদ্ভুত অভিনয় করতে বলছে রিচার্ড! মুরলীকে কী চমৎকার ফাঁকির জাদুকরী বলে মনে করেছে রিচার্ড। একটা ঘোর মিথ্যার কালো ছবিকে খাঁটি সত্যের রঙিন ছবির মত ফুটিয়ে তুলে রিচার্ড সরকারের মান রাখতে হবে। দুই বউদি, আর লুসিয়াদিদি ও মেরিয়ার সন্দেহ আজ মিথ্যে হয়ে যাবে। আজ নিজের চোখে দেখতে পেয়ে ওরা বুঝতে পারবে যে, রিচার্ড সরকার সত্যিই পুরুষের মত পুরুষ, পাগল স্টিফানা মিছিমিছি একটা অপবাদ রটিয়ে শেষে নিজেরই আক্ষেপের জ্বালায় আত্মহত্যা করেছিল।

মুরলীর কাছে এগিয়ে এসে ডাক দেয় রিচার্ড—কি জোহানা?

রিচার্ডের এই ডাক অনুরোধের ডাক নয় ; রিচার্ডের গলার স্বর অনুতাপের স্বর নয়। রিচার্ডের চোখের চাহনি অপরাধীর চাহনিও নয়। একটা মূর্তিমান শান্তকঠোর বুদ্ধির ডাক দাবি আর চাহনি।

শ্রান্ত ক্লান্ত ও অবসন্নের মত হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে আর ধরা গলায় বিড় বিড় করে মুরলী।—লোকে না হয় জানল যে, তুমি বড় ভাল স্বামী ; আর আমি বড় সুখী স্ত্রী, কিন্তু তাতে আমাদের কোন্ সুখ হবে?

—চুপ্, বাজে কথা বলো না ; নয়তো খুব আস্তে কথা বল। আস্তে আস্তে অদ্ভুতভাবে হেসে, যেন একটা রুষ্ট ধমকের স্বর চেপে দিয়ে কথা বলে রিচার্ড।

—কিন্তু...। আস্তে কথা বলতে গিয়ে মুরলীর কালো চোখের চাহনি ভীরু হয়ে নেতিয়ে পড়ে।

রিচার্ড—আর কোন কিন্তু নেই। লোকে যা জানল, তাই তো আসল কথা। ভিতরে আমরা যা-ই হই না কেন, তাতে কি আসে যায়? লোককে জানানো চাই যে, আমরা খাঁটি সুখের স্বামী-স্ত্রী। ব্যস্, তাহলেই হয়ে গেল।

রিচার্ড সরকারের স্ত্রী জোহানা সরকার ; এই নাম আর এই পরিচয়ের গৌরব থেকে পালিয়ে যাবার আর উপায় নেই। কিন্তু উপায় থাকলেও পালিয়ে গিয়ে লাভ কি? না, এই

ভাল, খুব ভাল।

খোঁপা খুলে বিনুনিটা দুলিয়ে দিয়ে মুরলীও দুলে ওঠে। রিচার্ডও কাছে এগিয়ে এসে মুরলীর হাত ধরতেই মুরলীর ঠোঁট দুটো কুঁকড়ে গিয়ে হেসে ওঠে।

রিচার্ড—হাসবে না জোহানা ; এ সময় হাসতে নেই। ওরা তাহলে ভুল বুঝবে !

হ্যাঁ, রিচার্ড সরকারের পৌরুষের অপবাদ মিথ্যে করে দেবার জন্য মুরলীকে এখন চোখের চাহনিতে নিবিড় অনুভবের আবেশ ফুটিয়ে তুলতে হবে। মুরলীর নরম ঠোঁট ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁপবে। রিচার্ডের গলাটাকে দুহাতে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে দুরন্ত তৃপ্তির নিশ্বাস ছাড়তে হবে।

একটুও ভুল হয় না মুরলীর। রিচার্ড সরকারের বৃথা পৌরুষের সেই আলিঙ্গন আর মিথ্যা উদ্দামতা বরণ করে মুরলীর রক্তমাংসের সব পিপাসা যেন ধন্য হয়ে যেতে থাকে। রিচার্ডের কপালের উপর যখন এই কপট উৎসবের শ্রান্তি বড় বড় ঘামের ফোঁটা হয়ে হীরার কুচির মত জ্বলতে থাকে, তখন মুরলীও হাঁপ ছেড়ে, রিচার্ডের মাথা আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে, আর গলার স্বর কলকলিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে।—আঃ, তুমি পুরুষ বটে রিচার্ড। তুমি আমার ভাগ্য বটে রিচার্ড।

সেই মুহূর্তে জানালার কাছ থেকে বাইরের বারান্দার অন্ধকারে যেন কতগুলি খুশির হাসি পলাতক নূপুরের শব্দের মত ছুটোছুটি করে পালিয়ে যায়। তার মধ্যে একটা শব্দকে চিনে ফেলতেও পারে মুরলী, ওটা নিশ্চয় মেরিয়ার হাসির শব্দ।

হারানগঞ্জের ডাঙার অন্ধকারে সাঁতার দিয়ে একটা পশ্চিমা হাওয়া হু-হু করে ছুটে এসে খোলা জানালা দিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে চীনেমাটির ফুলদানির ফুল কাঁপাতে থাকে। হে গড! আবার পৈঁছা হাওয়া ছুটে আসে কেন? হাওয়ার সাথে ডরানির স্রোতের শব্দটাও ভাসে কেন?

জানালার কাছে এগিয়ে এসে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে চেষ্টা করে মুরলী। কিন্তু চমকে ওঠে ; আবার মেরিয়ার সেই খুশির হাসির শব্দ চকিত ঝংকারের মত বারান্দার কিনারা দিয়ে যেন ছুটে চলে গেল।

ঘরের দরজা খুলে বাইরে এসেই মেরিয়ার হাত ধরে ফেলে মুরলী।—কি বটে মেরিয়া?

মেরিয়া হাসে—খুব বটে! আর, কথা বল কেন?

কথা শেষ করেই মুরলীর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মুরলীর কোমরে জোরে একটা চিমটি কাটে মেরিয়া।

—উঃ, চমকে ওঠে, আর হেসে ফেলে মুরলী।

মেরিয়া—উঃ কর কেন?

মুরলী—কলকল করে হেসে ওঠে—কোমরে ব্যথা ; সত্যিই খুব ব্যথা। কিন্তু বেশ মজার ব্যথা বটে, মেরিয়া।

দাশুর মুখটাকে ওভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে চেষ্টা করে কেন দুখনবাবু?

কোদাল নেবার জন্য টেস্ট রিলিফের অফিস ঘরের একচালার কাছে দাশু এসে দাঁড়াতেই দুখনবাবুর চোখ দুটো কুঁচকে যায়। দাশুও যেন ভীরুর মত চমকে ওঠে আর মুখ ঘুরিয়ে নেয়। কোদাল হাতে তুলে নিয়েই একটা দৌড় দিয়ে মাটিকাটা লাইনের দিকে চলে যায়।

মাটিকাটা ভিখমজুরদের দলের সঙ্গে নয় ; একেবারে একলা হয়ে একটা টিলার পাশে কিংবা গড়্হার ভিতরে নেমে মাটি কাটে দাশু। মাটি কাটতে কাটতে হঠাৎ আনমনা হয়ে যায়। দম টেনে নিয়ে নিজেরই বুকটার দিকে তাকায়। কোদাল ছেড়ে দিয়ে হাতের মুঠো দুটোকে চোখের সামনে তুলে নিয়ে দেখতে থাকে। হাতের মুঠোর উপর ফুঁ দেয়।

হাঁটু দুটোও অদ্ভুতভাবে কাঁপছে। ভয়ানক একটা রহস্য যেন দাশু কিষাণের রক্তমাংসের ভিতরে কিলবিল করছে। বিড় বিড় করে দাশুর ধুলোমাখা ঠোঁট দুটো।--দাশু কিষাণের লেগে তোমার মনে আবার কোন্ দয়া ডাক দিলে গো কপালবাবা?

ধুলোর উপর শরীরটাকে লুটিয়ে দিয়ে বসে পড়ে দাশু। সত্যিই, যেন জঙ্গলের পাপিয়ার মত বিকট খুশির আবেগে ধূলিস্নান করে শরীর জুড়োতে চায় দাশু। মুঠো মুঠো ধুলো তুলে নিয়ে হাতে পায়ে ও হাঁটুর উপর, এমন কি মুখের উপরেও ছড়িয়ে দিতে থাকে।

সন্ধ্যা না হওয়া পর্যন্ত শরীরটাকে এই রকম ধুলোমাখা করে যেন একটা প্রচণ্ড ছদ্মবেশ ধরে, নিজেরই চোখের সন্দেহময় চাহনির কাছ থেকে নিজের চেহারাটাকে লুকিয়ে রেখে রোজই কাজ করে যায় দাশু।

জামুনগড়ার শুকনো খট্‌খটে আকাশে যেদিন ভাঙা-ভাঙা কালো মেঘের টুকরো ভেসে চলে গেল, সেদিন সন্ধ্যা হবার আগেই কোদাল থামিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দাশু। আজ তো রোদের তেমন তেজ নেই, মেঘের ছায়াও ডাঙার উপর দিয়ে বার বার গড়িয়ে গিয়েছে, তবে পিঠের আর বুকের উপর অদ্ভুত একটা জ্বালা চনচন করে কেন?

কী আশ্চর্য, এই জ্বালার সঙ্গে গা-ঢাকা দিয়ে দুঃসহ একটা পিপাসাও ছটফট করছে। দাশুর গতরের হাড়মাস যেন আর একলা হয়ে থাকা এই শূন্যতা সহ্য করতে চায় না। বুকটা মত্ত হয়ে একটা কোমলতার স্বাদ জড়িয়ে ধরতে চায়। মাটিকাটা লাইন থেকে হঠাৎ ছুটে চলে এসে, কোদাল জমা দিয়ে, শুধু আধা রোজের মজুরী নিয়ে ঘরে ফিরে যায় দাশু।

দাশুর ঘর ; তিন হাত উঁচু মাটির দেয়াল দিয়ে ঘেরা একটা অন্ধকার। দাশুর পাথুরে গতরটা যেন জ্বালাহরণ ছোঁয়ার লোভে লোভী হয়ে মেজের মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গড়াগড়ি দিতে থাকে।

আঃ, কত ঠাণ্ডা এই ঘরের মাটি! দাশুর পিঠের আর বুকের জ্বালাটাকে একটা কনকনে ঠাণ্ডা আদরের ছোঁয়া বার বার জড়িয়ে ধরেছে। এই ঘরের মাটি এত ঠাণ্ডা হয়ে গেল কবে?

মাটিকাটা মেহনতের শরীরটার ক্লান্তিও ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকলেও দাশুর বুকের ভিতরে একটা ভীরু ভাবনা দুরদুর করে। দাশুর হাতের শক্ত মুঠো ভেঙে দিয়ে কে যেন কোদাল কেড়ে নিতে চাইছে। থাম দাশু থাম, আর তোমার মেহনতে কাজ নাই।—না না ; এমন কথা বলো না, আমার হাতের কোদাল ছিনে নিও না, হে। আমি যে...।

ঘরের দরজার কাছে কে যেন খকখক করে কাশছে। চমকে ওঠে, চোখ মেলে দরজার দিকে তাকায় দাশু।

—কে বটে হে! চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

—তুমি কি কবরের ভূত বটে হে? মাটিতে মুখ থুয়ে একা-একা কথা বল কেন? আগন্তুক লোকটা কড়া মেজাজের আওয়াজ তুলে ঘরের ভিতরে উঁকি দেয়।

উঠে বসে দাশু। লোকটার দিকে ভাল করে তাকাতে গিয়ে আরও আশ্চর্য হয়ে যায়। লোকটার গায়ে কালো রঙের মোটা কাপড়ের জামা। জামার পকেট দুটো কাগজপত্রের ভারে ভারি হয়ে ঝুলছে। লোকটার কানে একটা পেনসিল গোঁজা।

পকেটের ভিতর থেকে একটা রসিদ-বই বের ক'রে লোকটা বলে—তোমার তিন বছরের চৌকিদারী খাজনা বাকি পড়েছে সরদার।

দাশুর স্তব্ধ চেহারার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে আর দু'বার কেশে নিয়ে লোকটা চেঁচিয়ে ওঠে।—দাও হে, তাড়াতাড়ি কর।

দাশু—কি দিব?

—খাজনার টাকা।

—টাকা নাই।

—তবে যে লুটিস হবে হে সরদার?

—হবে তো হবে।

—তোমার ঘরের চিজ-মাল যে তবে নীলামে চড়বে।

হেসে ফেলে দাশু—তাতে ডর নাই।

ভ্রূকুটি করে লোকটা।—ডর নাই কেন? ঘরে চিজ-মাল নাই বুঝি?

দাশু—একটা টাঙ্গি আছে।

লোকটা চেঁচিয়ে ওঠে।—তাতে বোর্ডের কাছারি ভরবে না। তোমার ঘর ভেঙে, ছাপরের বাঁশ খাপরা আর খুঁটা টেনে নিয়ে...আর তোমার এ শালার পচা কাঠের দরজার চৌকাঠ আর কপাট খুলে নিয়ে...।

কাশতে থাকে লোকটা। কাশছে একটা প্রচণ্ড বিদ্রূপ। দাশুর চোখের ফ্যালফেলে চাহনি থরথর ক'রে কাঁপতে শুরু করে।

লোকটা বলে—সব নীলাম হয়ে যাবে হে সরদার। ঘরের মজা আর নিতে হবে না।

—বড় ভাল কথা বলেছ গো বাবু। বলতে গিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে দাশু। চোয়াল দুটো চড়চড় করে বেজে ওঠে। দাশুর মুখটাও অদ্ভুত রকমের কুৎসিত হয়ে হেসে ফেলে।

লোকটা আশ্চর্য হয়।—তুমি রাগ করে হাসছ মনে হয়?

দাশু—না, একটুকও রাগি নাই।

—নিশ্চয় রেগেছ।...সে ত হল...কিন্তু...আমি বলি।

—বল।

—জল খেতে আমাকে একটা টাকা দিয়ে দাও ব্যস্, তবে আর তোমার কোন ভাবনা নাই। আমি বন্দোবস্ত করে দিব, লুটিস হবে না। আরও এক সাল খাজনা না শুধে...।

—না। এক পয়সা দিব না। লোকটার দিকে ভ্রূকুটি করে তাকায় দাশু।

লোকটা দু'পা পিছনে সরে গিয়ে পাল্টা ভ্রূকুটি করে।—আমাকে ডাঁটলে তুমি?

—দাশু—তুমি যাও।

রসিদ বই পকেটে পুরে নিয়ে লোকটা চেঁচিয়ে ওঠে—আমাকে যাওয়ালে তুমিও যে যাবে।

দাশু—যাব।

—ঘরছাড়া বেইদা হতে হবে যে!

বেইদা হতে হবে? বাঃ, টিহা টিহা টিহা! কিন্তু না, সত্যিই মধুকুপির বিকালের আলোতে গাছের পাতার আড়ালে লুকিয়ে কোন পাপিয়া ডেকে ওঠে নি। দাশু কিষাণের বুকের ভিতরে একটা অদ্ভুত অনুভবের শব্দ বেজে উঠেছে।

দেখতে পায় না দাশু, লোকটা কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, আর, কখন্ চলে গেল। দাশুর চোখ দুটো অপলক হয়ে সামনের সড়কের দিকে তাকিয়ে থাকে। বিকালের হাওয়া লেগে নিমগাছের পাতা দুলছে। দুলছে বাঁশঝাড়ের ছায়াটা।

দাশুর বুকের ভিতরেও একটা মিষ্টি বাতাস দুলছে। সেই বাতাসে ফিসফিস করে কথা বলছে একটা মুক্তির সুখ। সব গেল, সব গেল। আর কোন বাধা নেই। মুরলী আর আসবে না, জমিও হবে না! এইবার ঘরও গেল। এইবার একটা অঘরা বেদে হয়ে যেতে হবে। তবে তুই এখন আয় না কেন সকালী!

সকালী সকালী! দাশুর বুকের ভিতরে যেন সকালীর উপোষী ইচ্ছার একটা ছবি হেসে-কেঁদে ছটফট করছে—তুমি কি আমাকে ভুলেই গেছ গো সরদার? নয়তো এতদিনের মধ্যে আমার কথা একবারও মনে পড়ে নাই কেন? জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এসে আমার মোয়া

মুখে নিবে, সে সাধও কি নাশ হয়ে গিয়েছে?

না ভুলি নাই, ভুলবো কেন? কিন্তু আসবে কি সকালী? বড়কালুর মাথা ঘেঁষে সূর্য ডুবতে শুরু করছে। ঘরের দাওয়ার উপর চুপ করে বসে, যেন একটা আশার পাপিয়ার মিষ্টি ডাকের শব্দ শুনতে থাকে দাশু। বুকের ভিতরে একটা পুরনো অনুভবের স্বাদ মত্ত হয়ে উথলে উঠছে। শরীরের সব হাড়মাস কী ভয়ানক ক্ষুধাতুর হয়ে ছটফট করছে।

সন্ধ্যা পার হয়ে যায়। ঘরের ভিতরে ঢুকে, একবার উনানটার দিকে, আর, একবার মাটির সরার ভিতরে রাখা পাঁচ মুঠো মকাইয়ের দানার দিকে তাকায় দাশু। তারপর চুপ করে বসে থাকে।

কিন্তু দরজার কপাটের উপর ঠকঠক করে দুটো কঠোর শব্দের ঠোকর যেন আছড়ে পড়লো। চমকে ওঠে দাশু। একটা শব্দ যেন প্রচণ্ড এক আহ্লাদের বন্দুকের কুঁদোর আঘাতের শব্দ। আর একটা হলো, ছোট লাঠির আঘাতের শব্দ। দুটো ভিন্ন ভিন্ন গলার দু'রকম স্বরের হাঁকও শোনা যায়।

—দাশু দাগী ঘরে আছ? ঘড়ঘড়ে গলার স্বর।

—বাইরে এসো হে দাশু। মিনমিনে গলার স্বর।

জামকাঠের নড়বড়ে দরজার কপাট খুলে দিয়ে চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে দাশু। রাতের পাখি ডাকছে, আকাশে অনেক তারাও ফুটেছে। গাঁয়ের আঁধার কুয়াশার সঙ্গে জড়াজড়ি শুরু করেছে। তবু বেশ ভাল করে দেখতে পায় দাশু, ছায়াময় একটা টাট্টু ঘোড়ার চেহারা দাওয়ার সামনে দাঁড়িয়ে দাশুর ঘরের একটা খুঁটিকে কামড় দিয়ে ধরে লেজ নাড়ছে। আর, দাঁড়িয়ে আছে পুলিশ মুন্সী চৌধুরীজী ও রামাই দিগোয়ার।

চৌধুরীর পা টলছে। তবু রামাই-এর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ঘড়ঘড়ে গলার স্বর যেন একটা তরল গর্জন ধ্বনি করে চৌধুরী—কই, কই রে গাধার নাতি, বোতলটা কই রে?

—এই যে হুজুর! রামাই দিগোয়ারও ব্যস্ত ভাবে টলতে টলতে চৌধুরীর হাতের কাছে একটা বোতল এগিয়ে দেয়।

চৌধুরী—এঃ, তুই শালা নেশার কুম্ভীর বটে রে রামাই। কিছু আর রাখিস নাই মনে হয়।

রামাই—না হুজুর, বাপ কসম হুজুর, আমি শুধু বোতলের গলাটুকু নিয়েছি।

চৌধুরী ঘড়ঘড় করে হেসে আকুল হয়ে ওঠে।—মিছা বাপ বেচারার নামে কসম করিস কেন রামাই? কসম যদি করিস তবে...।

রামাই—বলেন হুজুর।

—চৌধুরী—তোর ঘরওয়ালীর যৈবনের নামে কসম কর না কেন?

মিনমিনে গলার স্বর কাঁপিয়ে হাসতে থাকে রামাই—ঘরওয়ালীর যৈবনের কসম হুজুর, আমি বোতলের শুধু গলাটুকু নিয়েছি।

চৌধুরী খুশী হয়ে হাসে—বেশ ; তোকে আর তবে গাধাকে নাতি বলবো না রামাই, তুই হলি রয়াল টাইগারের নাতি।

রামাই হাসে—এইবার দাশুকে কথাটা বলে দিয়ে...।

চৌধুরী—হ্যাঁ, এই দাশু দাগী, তুই আমাকে আজও এক পয়সা পরবী দিস নাই ; থানাতে হাজিরাও দিস নাই। কিন্তু...সে জন্য ভাবিস না, কোন ডর নাই।

বোতলের সরাব হাঁ-করা মুখের ভিতরে ঢালতে থাকে চৌধুরী। বগবগ শব্দ করে সরাবের ধারা ঝড়ে পড়ে। একটা ঢেঁকুর তুলে নিয়ে চৌধুরী বলে—হ্যাঁ...তোকে আর টেস রিলিফে খাটতে হবে না দাশু। আমি তোর ভাল রোজগারের কাজ বন্দোবস্ত করে দিব। বল, রাজি আছিস?

দাশু—ভাল রোজগারের কাজ?

চৌধুরী--হ্যাঁ, গোবিন্দপুরের পাঁচু দাগীকে বলেছি। ওর পার্টিতে তোকে ভর্তি করে নিবে পাঁচু।

চমকে ওঠে দাশু।--সেটা কেমন কাজ বটে?

চৌধুরী হাসে--বাবুরবাজারের চকে রাতের বেলা যে মালের গাড়িগুলা থাকে, সেগুলার উপর একটুক এথি-ওথি করতে হবে। একটা বস্তা চিনি সরাতে পারলেই তো দশটা টাকার হিস্যা হয়ে গেল। ভাবিস কেন?

হঠাৎ যেন বোবাও হয়ে যায় আর মরা গাছের ধড়ের মত নিথর হয়ে যায় দাশু। চৌধুরী বলে--হ্যাঁ...কিন্তু..মাগিটাকে আমার চাই।

--কা'কে চাই? চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

চৌধুরী--খবরদার, অমন করে চেঁচাবে না। আস্তে কথা বল।...হ্যাঁ, বেদেনী মাগিটাকে তুমি যখন রাখতে চাও, তখন রাখ। কিন্তু, আমি এসে ওকে মাঝে মাঝে গোবিন্দপুরে নিয়ে যাব। না হয় তো, মাঝে মাঝে একটা-দুটো রাত তোমার এখানেই থেকে...।

রামাই বলে--এ কথা আবার দাশুকে শুধান কেন হুজুর? এতে দাশুর কি কোন অসাধ আছে? হ্যাঁ কিনা দাশু?

একটা পাপিয়ার আর্তনাদ যেন দাশুর বুকের ভিতরে মাথা খুঁড়ে ছটফট করছে। কাঁদতে থাকে দাশু। জবাব দেয় না দাশু।

রামাইয়ের গলার স্বরে আবার মিনমিনে হাসির শব্দ উছলে ওঠে--আমরা সব খবর রাখি দাশু। বেদেনী সকালী তোমাকে বড় পিয়ার করে। অর্জুন সিং বলে, গোকুল সামন্ত বলে, তোমাকে মোয়া খাওয়াবার আশা নিয়ে মাগিটা গোবিন্দপুরের জেল ফটকের কাছে গিয়ে বসে থাকে।

চৌধুরী হাসে--এখন আর জেল ফটকের কাছে যায় না মাগি। সে খবর জেনেছে মাগি, দাশু ছাড়া পেয়েছে।

রামাই--কিন্তু ভাল চালাক বটে মাগিটা। পাঁচ গাঁ ঢুঁড়েও ওর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।

চৌধুরী--কিন্তু, কতদিন ছিপে থাকবে মাগি? নাগরের কাছে না এসে পারবে কেন?

রামাই--হ্যাঁ, সেই কথা দাশুকে বুঝিয়ে দেন হুজুর। যখনই মাগি আসবে, তখনই যেন ফাঁড়িতে আমার কাছে খবর দিতে ভুলে না যায় দাশু।

চৌধুরীর হাতের বন্দুকটা দুলে ওঠে। ইস্, আর ভুল করলে শালা যে মরবে। তা হলে আমিও আবার ওকে তিন বছরের মেয়াদে জেলের ভাত খেতে রওনা করিয়ে দিব!

টাট্টু ঘোড়াটা মাড়ির মাংস' উঁচিয়ে আর বড় বড় দাঁত দিয়ে চালার খুঁটো শক্ত করে কামড়ে ধরে বিচিত্র এক খুশির আবেগে চাট্ ছুঁড়তে থাকে। চৌধুরী বলে--হ্যাঁ, তবে এই কথা, একেবারে পাকা কথা হয়ে গেল দাশু।

টলতে টলতে এগিয়ে যেয়ে টাট্টুর কাছে এসে, টাট্টুর পিঠের জিনের উপর একটা চাপড় মেরে রেকাবে পা দেয় চৌধুরী। একটা লাফ দিয়ে টলমলে চেহারাটাকে টাট্টুর পিঠের উপর চড়িয়ে দিয়ে হাঁক দেয়--চল রামাই।

টাট্টুর গলার লাগাম-দড়ি হাতে তুলে নিয়ে রামাই দিগোয়ার দু পা এগিয়ে যায়।--চলেন হুজুর।

দাশুর কানের দু পাশ দিয়ে ঠাণ্ডা ঘামের ধারা ঝরে পড়তে থাকে। কিন্তু মুখ টিপে যেন একটা চাপা উল্লাসের হাসি হাসতে থাকে দাশু। কোন ডর নাই সকালী ; তোর বেদে হয়ে তোর সাথে যদি চলে যাব, গোবিন্দপুর থানার পিশাচটা তবে আর আমাদের পাত্তা পাবে কেন? সকালী তুই আয়।

—ও কি? ও কি? তোমার মুখে এসব কেমন দাগের চক্কর বটে দাশু? বলতে বলতে একটা লাফ দিয়ে উঠে এসে দাশুর সামনে আর দাশুর মুখের দিকে তীব্র একটা সন্দেহের আঙুল তুলে তাকিয়ে থাকে দুখনবাবু।

—কি বটে দুখনবাবু? ভয়ানক শূন্য ও উদাস এক জোড়া চোখের চাহনি তুলে দুখনবাবুর সন্দিগ্ধ চোখের চাহনির সামনে ভীরু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দাশু।

চেঁচিয়ে ওঠে দুখনবাবু—গরলের দাগ বটে কি?

—না না, দুখনবাবু। এত মিছা কথা বল কেন দুখনবাবু? তোমার চোখে গরল আছে বুঝি। বলতে বলতে একটা লাফ দিয়ে সরে যায় দাশু, আর কোদাল কাঁধে নিয়ে ছুটতে ছুটতে মাটি-কাটা একটা গড়হার ভিতরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। মধুকুপির সবচেয়ে বড় দেমাকী তেজী আর মজবুত কিষাণের পাথুরে গতরটা যেন প্রচণ্ড এক অপরাধের লজ্জায় মাটি-কাটা গড়হার মধ্যে লাফিয়ে পড়ে আর ধুলোমাখা হয়ে লুকিয়ে থাকতে চায়।

দুখনবাবু চিৎকার করে ছুটে আসে—খবরদার দাশু, তুমি আর এখানে মজুর খাটতে আসবে না ; খবরদার, খবরদার, এখনই কোদাল জমা দিয়ে চলে যাও।

দুখনবাবুর মুখের দিকে এক জোড়া হতভম্ব চোখের চাহনি তুলে তাকিয়ে থাকে দাশু। যেন এক পরম ভবিতব্যের বাণী শুনছে দাশু কিষাণের আত্মাটা। দুখনবাবু বলে—এবার ছুটি নাও দাশু।

দাশু ফ্যালফ্যাল করে তাকায়—হ্যাঁ, ছুটি নিব।

দুখনবাবু—ঘরে যাও দাশু।

দাশু—হ্যাঁ ঘরে যাব।

দুখনবাবু—তোমার আর কোন কাজে দরকার নাই।

দাশু—দরকার নাই, ঠিক কথা।

কোদালটাকে দুখনবাবুর শক্ত ছায়াটার কাছে ফেলে দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যায় দাশু।

ওই যে কপালবাবার সেই জঙ্গল, আর ওই সেই বেলগাছ। হনহন করে হাঁটতে থাকে দাশু।

হাতের সেই কোদালটাকে যেমন রাগ করে দুখনবাবুর চোখের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল দাশু, তেমনই রাগ করে শরীরটাকে কপালবাবার আসনের সামনে শুকনো পাতার উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আর মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে পড়ে থাকে। কপালের রগ দগ দগ করে। পাঁজরের হাড়গুলি ফুলে ফুলে কাঁপে। বেলপাতা চিবানো সবুজ লালারসের ধারা দু কষ বেয়ে ঝরে পড়ে। বল কপালবাবা, দাশু কিষাণের গতরে কোন্ গরলের কীট ঠাঁই নিলে? সেই গরল বটে কি? কোন কাজে দাশু কিষাণের কি আর দরকার নাই? ছুটি নিতে হবে কি?

মাটিতে কপাল ঘষে ছটফট করে দাশু।—না না না। মিছা কথা বলেছে দুখনবাবু। দেখ না কেন গো কপালবাবা, এগুলা কি গরলের দাগ? ভেরেণ্ডার পাতা দিয়ে সেঁক দিলে কি দাগগুলা মুছে যাবে না?

কপালবাবার আসনের কাছ থেকে মাটি ছেড়ে যখন উঠে দাঁড়ায় দাশু, তখন জঙ্গলের হাওয়া উতলা হয়ে উঠেছে, আর বিকালের রোদও পাখির ডাকের সঙ্গে হুটোপুটি করে গাছের ফাঁকে ফাঁকে লুকোচুরি খেলছে।

ধুলোয় ভরা হাত-পা আর বুকটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে চলতে শুরু করে দাশু। ছলছলে চোখ দুটোও যেন আঠায় ভরে গিয়েছে। জোরে জোরে চোখ দুটোকে ঘষে নিতেই দেখতে পায় দাশু, হ্যাঁ, এখনও বেলা বেশ আছে। সড়ক ধরে এখনও অনেক লোক জামুনগড়ার ডাঙার দিকে যাচ্ছে। কিন্তু ওপথের দিকে আর এগিয়ে যেতে চায় না দাশু।

লোকের চোখের সন্দেহ থেকে আড়াল হয়ে এই চেহাবাটাকে যদি ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয়, তবে সামনের মরা ক্ষেতের মাটি পার হয়ে ওই পলাশবনের ভিতর দিয়ে ডরানির খাতের পাশে পাশে হেঁটে একেবারে লোহার পুলের কাছে পৌঁছে যাওয়া যায়। তারপর সড়কটাকে কিছুক্ষণের জন্য ফাঁকা পাওয়া যাবে আব একটা ছুট দিয়ে ঘরে পৌঁছে যেতেই বা কতক্ষণ লাগবে?

পলাশবনের মাথার উপর তিতিরের ঝাঁক উড়ছে। মরাক্ষেতের শেষ আল পার হয়ে পলাশবনের ভিতরে ঢুকতেই ভেরেণ্ডার একটা ঝোপ দেখতে পায় দাশু। পটপট করে ভেরেণ্ডার পাতা ছিঁড়ে আর গামছায় বেঁধে নিয়ে আবার চলতে থাকে।

টিহা টিহা টিহা! সত্যিই একটা পাপিয়া ডেকে উঠেছে। দাশুও যেন একটা হোঁচট খেয়ে থমকে দাঁড়ায়। এই তো এখানে! এখনও আছে! এটা যে সেই পাথরটা। পাথরের পাশে ওটা যে সেই এক-হাঁটু জলের দহটা!

হাঁড়িয়ার পান্‌সে গন্ধে বিবশ হয়ে একটা মাতাল পিপাসার বাতাসও বুঝি থমকে রয়েছে! দাশুর বুকের উপর একটা আদুড় কোমলতার পিছল স্পর্শ লুটিয়ে পড়ছে। সকালীর লাল চোখ দুটো যেন দুটো লাল ফুলের রক্তের অভিমান, আর ঠোঁট দুটো মাতোয়ালা পিপাসার দুটো কুঁড়ি। দাশু কিষাণের বুকের কাছে সাধের মরণ খুঁজছে সকালী।

নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও দাশুর প্রাণের ভিতরটা যেন মাতাল হয়ে দুলতে থাকে। ঠিক আছে ; সব ঠিক আছে। দুখনবাবুর সন্দেহ মিথ্যা, দাশু কিষাণের ভয়গুলি মিথ্যা। দাশু কিষাণের গতরে গরল ঢুকে নাই। তা না হলে সকালীর ছোঁয়া নেবার জন্য প্রাণের ভিতর এত বড় পিয়াসের জোর উথলে ওঠে কেন? তুই আয় সকালী। তুই কবে আসবি সকালী?

দহের জলে সকালীর গায়ের গন্ধ আজও লুকিয়ে আছে বুঝি! দাশুর চোখ দুটো বিহ্বল হয়ে জলের দিকে তাকায়। কিন্তু চমকে ওঠে, চোখ বন্ধ করে, মাথার ঝাঁকড়া চুলের ঝুঁটি দুই হাতে মুঠো করে ধরে কাঁপতে থাকে দাশু। জলের ভিতর থেকে যেন একটা লাসের ছবি ভেসে উঠেছে। ভুরু দুটো শীর্ণ হয়ে ঝুলে পড়েছে ; নাকের ডগাটা ফাটা। কানের দোলকের মাংস ফুলে উঠেছে। মুখের উপর চাকা চাকা লালচে দাগ। আর চোখের পাতাগুলি ঝরে পড়ে গিয়েছে।

চোখ মেলে তাকায় দাশু। হাতের মুঠা দুটোকে চোখের সামনে এনে দেখতে থাকে। হ্যাঁ, ভাঙা চুলের গুঁড়োতে হাতের মুঠো ছেয়ে গিয়েছে ; আঙুলের নখগুলিও কেঁচো মাটির ছোট ছোট টুকরোর মত কুঁকড়ে পাকিয়ে আর শুকিয়ে রয়েছে। আর, সারা গা জুড়ে যেন আঁশ ধরেছে ; ফাটা ফাটা চামের চাকা চকচক করছে।

জলের উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ে দাশু। সারা শরীর জলে ডুবিয়ে দিয়ে আর চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ বসে থাকে। তারপর করুণ আর্তনাদের মত স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে—বাঃ, কপালবাবা। খুব দয়া, খুব দয়া ; দাশু কিষাণের উপর তোমার দয়ার শেষ নাই।

এত ঠাণ্ডা যে ডরানির জল, সে ডরানির জল দাশু কিষাণের শরীরে আর ঠাণ্ডা ছোঁয়ার স্নেহ ছুঁইয়ে দিতে পারছে না। একটুও ঠাণ্ডা লাগে না এত ঠাণ্ডা জলে! দাশু কিষাণের এই জ্যান্ত শরীরের হাড়মাস নির্বোধ হয়ে গিয়েছে।

জল থেকে উঠে একটা গাছের ছায়ায় ঘাসের উপর চুপ করে বসে থাকে দাশু। হ্যাঁ, পাপিয়াটা ডাকে ; কিন্তু দাশুর কানে মিঠা শব্দের স্বাদ নেবার সেই জোর আর নেই। মনে হয় পাপিয়া নয় ; একটা রাগী পাখির চিৎকার পলাশবনের বাতাসে ছুটোছুটি করছে। পলাশবনের বাতাসই বা কেমন? এত সুন্দর ফুরফুরে বাতাসের ছোঁয়া দাশুর আদুড় শরীরের উপব এসে লুটিয়ে পড়ছে ; কিন্তু দাশুর শরীরে কোন স্নিগ্ধ অনুভবের সুখ ফুরফুর করে না।

একটা কাঠবিড়ালী ; কখন এসে দাশু কিষাণের ছড়ানো পায়ের উপর এসে বসেছে,

দেখতে পায় নি দাশু। কিন্তু দেখতে পেয়েই হো হো করে চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে না। না, আর ভাবতে হবে না। কাঠবিড়ালীটা এত বড় একটা লেজের রোঁয়া বুলিয়ে দাশুর পায়ের উপর যে সুখের ছোঁয়া ঢেলে দিচ্ছে, সে সুখের স্বাদ পায় না দাশুর শক্ত শক্ত পা দুটো ; পায়ের পাতা দুটোও বেঁকতে শুরু করেছে ; আর হাঁটুতে কেমনতর একটা ব্যথা।

তবে আর কেন? ভেরেণ্ডার পাতাগুলি গামছার পুঁটলি থেকে খুলে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে দিয়ে একবার ডুকরে ওঠে দাশু। না, তুই আসিস না সকালী।

বিকালের আলো যখন একেবারে মরে যায়, আর পলাশবনে ছায়াগুলি অন্ধকারে কালো হয়ে উঠতে থাকে, তখন উঠে দাঁড়ায় দাশু। ফিসফিস করে হেসে যেন এক পরম অন্তিমের সঙ্গে কথা বলে।—আর মিছা কেন উঠা-বসা করাও কপালবাবা? আর যে উঠবার কোন দরকারই নাই ; আর যে কোথাও বসবারও দরকার নাই।

কানারানীও যে আজ আর নাই। থাকলে, আজ এই পলাশবনের জঙ্গলের আঁধারে কানারানীর চোখের সেই আগুন দেখতে পেলে কত খুশি হয়ে যেত দাশু। কানারানীর চোখের সামনে এই রোগের ধড়টাকে ফেলে দিয়ে হেসে উঠতো দাশু—নে কানারানী, আমাকে ছুটি করে দে। দাশু কিষাণের এই ঘেয়ো গতরটাকে খেয়ে নিয়ে তুই সুখ কর।

আকাশে তারা দেখা যায় না কেন? তবে কি কালা বাদলে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে? ঝড়ো হাওয়ার গোঁ গোঁ শব্দ শুনে তাই মনে হয়। কে জানে ঝড়টা কোন্ দিকে চলে যাচ্ছে?

পলাশবনের ভিতর থেকে, ডরানির খাতের পাশে পাশে হেঁটে যখন খোলা ডাঙার বুকের উপর পৌঁছে যায় দাশু, তখন আকাশের রূপ দেখে আর আশ্চর্য হয়ে আরও একবার থমকে দাঁড়ায়। বিজলি হানছে আকাশটা, আর বড়কালুর পাথর যেন চমকে দিয়ে ঝলসে উঠছে। শিলা ঝরবে কি? মেঘ গলবে কি? আর, পুরা তিন ঘন্টা ধরে জল বর্ষাবে কি মধুকুপির আকাশ?

—কানারানী নাই, কিন্তু ডরানি তো আছে। আবার বিড়বিড় করে দাশু।

ঝড়ের শব্দের সঙ্গে অনেক দূরে ডরানির বুকের একটা শব্দও গোঁ গোঁ করে উঠলো। দাশুর দুই পাটি সাদা দাঁতের হাসি যেন চমকে দিয়ে ধবধব করে।—ছুটি নিব, ছুটি নিব দাশু।

ডরানির পুলের কাছে এসে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে দাশু। কিন্তু আকাশ-ছাওয়া কালা বাদল ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে আসতে থাকে ; আর তারার ঝাঁকও চিকচিকিয়ে ফুটে ওঠে। ঝড়ো হাওয়াটাও আর গোঁ গোঁ করে না, বিজলীর চমকানিও নেই। মধুকুপির শুকনো মাটির উপর এক ফোঁটাও জল ঝরে পড়লো না।

—ডরানি তুই পাগল হবি কবে? আবার যেন পিপাসিতের মত ছট্‌ফট করে আর ফিসফিস করে একটা পরম লোভের সঙ্গে কথা বলে দাশু। তারপর চলতে থাকে।

পুরনো জামকাঠের দরজার একটা নড়বড়ে কপাট ঝড়ের চোট লেগে একেবারে কাত হয়ে ঝুলে পড়েছে। চালার বাতা একদিকে নেমে গিয়েছে। একটা খুঁটোর মাথা ফেটে গিয়েছে।

ঘরের তিতরে ঢুকেই উনানের মুখে শুকনো পাতা গুঁজে দিয়ে আগুন ধরায় দাশু। সরা থেকে চারমুঠো মকাই-এর দানা আর গোটা দশেক ডুমুর হাঁড়িতে ফেলে দিয়ে তারপর জল ঢালতে গিয়ে প্রচণ্ড একটা লজ্জার আঘাতে স্তব্ধ হয়ে যায় দাশু কিষাণের হাত দুটো। হেসে ফেলে দাশু। আর মিছা কেন রাঁধা করাও কপালবাবা? এই চার মুঠো মকাই-ডুমুরের জাউ খাবে কে? তোমার দয়ার গরল গলিয়ে দিল যে গতর, সে গতরে খোরাক ঢেলে আর লাভ কি?

হাঁড়িটাকে হাতের এক ঠেলা দিয়ে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে চুপ করে বসে থাকে দাশু ;—না, আর নয়, এইবার তুমি ছুটি নাও দাশু।

উনানের আগুনটা যেন একটা ধুনির আগুন, আর দাশু কিষাণ একটা ছাইমাখা ও মাথায় উদাসী সাধু। উনানের শুকনো পাতার আগুন থেকে গরম ছাই উড়ে এসে দাশুর চোখে-মুখে ছিটকে পড়ে। তবুও নড়ে না দাশু।

হঠাৎ একটা কাক ডেকে উঠতেই চমকে ওঠে দাশু। ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকায়। না, ভোর হয় নি ; নিমগাছের কাক বোধহয় বাসার কাছে একটা হিংসুটে পেঁচার মুখ দেখতে পেয়ে সেই মাঝরাতে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ডেকে উঠেছে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আবার মধুকুপির সেই তারাছড়ানো আকাশের চারদিকে তৃষ্ণার্তের মত চোখ ঘুরিয়ে তাকাতে থাকে দাশু। ভোর তো হবে, কিন্তু কালা বাদল আবার দেখা দিবে কি? ভাদুয়া মেঘ গলবে কি? আর, ডরানির জল পাগল হয়ে হুড়পা বান বহাবে কি?

দাশুর মনের আশাটা হিসাব করে করে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়। হবে হবে ; আজ না হয় কাল, কাল না হয় এক হপ্তা পরে, একদিন না একদিন পাগল হবে ডরানির জল। হুড়পা বানের ঢল আছাড় দিয়ে দিয়ে বড় বড় পাথরের চাঙড় গুঁড়া করে দেবে। বড় বড় শালের খড় কুটোর মত ভেসে উধাও হয়ে যাবে। তার সাথে তুমিও ভেসে যাবে, তুমি বড় ভাল ছুটি নিতে পারবে দাশু। চিন্তা কর কেন?

কখন্ ভোর হয়েছে বুঝতে পারে নি দাশু। উনানের কাছে খেজুর পাতার চাটাই-এর উপর সেই ছাইছড়ানো উদাসী সাধুর মত চোখ-মুখ আর মাথা নিয়ে নিঝুম হয়ে তখনো বসে থাকে দাশু, যখন ভোরের কাক ডাক দিয়ে উড়তে শুরু করে দিয়েছে, আর বড়কালুর মাথায় রোদ ছড়িয়ে পড়েছে।

বেশ চনচনে হয়ে সকালবেলার রোদ যখন মধুকুপির সব ডাঙায় ছড়িয়ে পড়ে, তখন একটা জিপ গাড়ি ছুটে এসে ঠিক দাশু ঘরামির ঘরের সামনে সড়কের উপর নিমগাছের ছায়ার কাছে দাঁড়ায় আর জোরে হর্ন বাজাতে থাকে। কিন্তু জিপ গাড়ির এই হর্নের শব্দও বোধহয় শুনতে পায় নি, পৃথিবীর সব শব্দের সঙ্গে যেন আড়ি করে আর বধির হয়ে ঘরের ভিতরে বসে আছে দাশু।

—ঘরে আছ কি হে দাশু? একেবারে দাওয়ার উপরে উঠে আর নড়বড়ে কপাটের কাছে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতর উঁকি দিয়ে যখন চেঁচিয়ে ওঠে নিতাই মুদী, তখন চমকে ওঠে দাশু।—কে বটে?

—আমি নিতাই।

—তুমি আবার এখানে আস কেন নিতাইদাদা?

—দরকার আছে রে ভাই।

—কার কাছে?

—তোমার কাছে।

—বল।

—তোমার ভোট চাই।

ঘরের ভিতরের আবছায়ার মধ্যে সুস্থির হয়ে বসে আর নিতাই মুদীর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে দাশু।

নিতাই মুদী বিরক্ত হয়ে বলে—হাস কেন দাশু? ভোট দিবে, তাতে আবার হাসি কিসের?

দাশু—কাকে ভোট দিব নিতাইদাদা? তোমাকে কি?

—আরে না। যাকে ভোট দেবে, সে মানুষ যে-সে মানুষ নয়। কিষাণদের দুঃখের কথা ভেবে দিন-রাত কাঁদে যে, এমন একটি খাঁটি মানুষ।

—সে কে বটে?

—হারানগঞ্জের ডাক্তার রিচার্ড সরকার।...ব্যস্, তুমি আর বোকার মত হাসাহাসি করবে

না। এই নাও, একটা টাকা রাখ : ভোটের দিন সকালবেলা পেটভরে চিঁড়া-গুড় খেয়ে নিয়ে বাবুরবাজারে গিয়ে রিচাডবাবুর বাক্সে ভোটটা দিয়ে এস।

--না। টাকা নিব না।

—কেন?

—আমি ভোট দিব না।

—তবে মর। রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠে নিতাই মুদী।

--ঠিক কথা ; বড় ভাল কথা বলে দিলে নিতাইদাদা।

বলতে বলতে হেসে ফেলে দাশু। দাশুর সেই অদ্ভুত হাসির শব্দ শুনে ও ঘরের আবছায়ার ভিতরে লুকানো দাশুর মুখের হাসির সেই অদ্ভুত চেহারাটাকেও দেখতে পেয়ে হঠাৎ যেন ভয় পায় আর চমকে ওঠে নিতাই মুদী। তারপরেই দাওয়া থেকে নেমে হনহন করে হেঁটে জিপ গাড়িটার দিকে চলে যায়।

আবার কিছুক্ষণের নিঝুম ভাবনার আবেশ। তবু দাশুর সেই উদাসী মুখের উপর একটা কৌতুকের হাসি থমথম করতে থাকে। আর মিছা কেন দাশু কিষাণের ঘরের কাছে দরকারের হাঁক হাঁকে ওরা? ওরা বোঝে না কেন, দাশু কিষাণ আর নাই।

—দাশু একবার ঘরের বাইরে এসো হে। আবার একটা ডাক। দুখনবাবুর গলার স্বর চিনতে পারে দাশু। দুখনবাবু বেশ জোরে চেঁচিয়ে আর সড়কের উপরে দাঁড়িয়ে হাঁক দিচ্ছে।

ঘরের দরজার কাছে এগিয়ে যেয়ে উত্তর দেয় দাশু।—কি বটে দুখনবাবু?

দুখনবাবু—তোমার ভোট চাই দাশু।

দাশু হেসে হেসে হাত নেড়ে ইসারায় জানায়—না।

দুখনবাবু ভ্রূকুটি করে তাকায়।—লালবাবুর লেগে ভোট চাই ; না কর কেন?

দাশু—না।

দুখনবাবু—তোমার যে দুই টাকা দশ আনা চৌকিদারী খাজনা বাকি পড়েছে, সে খবর জান কি?

দাশু--জানি!

দুখনবাবু—চৌকিদারীর লোক যে আদায় হাসিল করতে তোমার ঘরের কপাট খুলতে আসবে, সেটা জান কি?

দাশু—আসুক না কেন।

দুখনবাবু—আমি বলি ; দুই টাকা দশ আনা নাও, চৌকিদারী খাজনা শোধ করে দাও, আর খুশি হয়ে ভোটটি লালবাবুকে দিয়ে দাও।

দাশু—না দুখনবাবু।

দুখনবাবু—কেন? লালবাবুর মত মানুষকে ভোট দিবে না কেন?

দাশু—না।

দুখনবাবু—রাজা রামচন্দ্রের মত মানুষটাকে তুমি ভোট দিবে না?

দাশু চেঁচিয়ে ওঠে—না।

দুখনবাবু—তুমি মর।

দাশু—আঃ, তুমি আজ বড় ভাল দয়ার কথাটি বলে ফেলেছ দুখনকাকা।

চমকে ওঠে দুখনবাবু ; সড়কের উপরে দাঁড়িয়ে দুই চোখ কটমট করে দাশুর সেই কুৎসিত ফাটা ফাটা মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই যেন ভয়ে শিউরে উঠে আর জোরে জোরে হেঁটে চলে যায়।

দুখনবাবু চলে যেতেই ঘরের ভিতরে ঢুকে খেজুর পাতার চাটাই-এর উপর শান্তভাবে বসে, আর, যেন বুকের ভিতরের একটা অদ্ভুত হাসির সঙ্গে মনে মনে খেলা করতে থাকে

দাশু। কিন্তু আবার কে যেন আসছে মনে হয়। সড়কের আর-এক দিক থেকে হন্তদন্ত খুশির ছায়ার মত লাফিয়ে লাফিয়ে দাশুরই ঘরের দাওয়ার দিকে এগিয়ে আসছে একটা লোক। গায়ে চাদর জড়িয়ে আর রোগা রোগা ধুলোমাখা পা ফেলে ফেলে লোকটা আসছে। অনেক দূর থেকে আসছে বলে মনে হয়।

--সরদার। দাওয়ার উপর উঠে আর ঘরের ভিতরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে ডাক দেয় লোকটা।

--কে বটে? উত্তর দেয় দাশু।

--আমি কালু।

--কে?

--ভাল করে দেখে নাও সরদার। দেখ, চিনতে পার কিনা?

আশ্চর্য হয় দাশু। তোমাকে গোবিন্দপুর থানার হাজতে দেখেছি কি?

কালু--হাঁ, সরদার।

দাশু--কিন্তু তুমি মিছা আমার কাছে এসে...।

কালু হাসে--মিছা আসি নাই সরদার।

দাশু--তবে বল।

কালু--উস্তাদ বেচারার ফাঁসি হয়েছে।

--কে? কে? কার ফাঁসি হয়েছে? চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

কালু--হাজারিবাগ জেলে উস্তাদ গুপী লোহারের ফাঁসি হয়ে গিয়েছে।

--ভঁইসাল ভাই! ডুকরে ওঠে দাশুর বুকের পাঁজর। কালু দাগীও করুণ ভাবে হাসে--হ্যাঁ সরদার, তোমার ভঁইসাল ভাই আর নাই। কিন্তু...।

--কি?

চাদরের আড়াল থেকে ছোট একটি থলি বের করে কালু দাগী বলে--এতে পাঁচশত টাকা আছে সরদার।

--কিসের টাকা?

--তোমার হিস্যা। উস্তাদ বেচারা তোমার কথা ভুলে নাই। কয়েদ হবার আগে ওর একটা ভক্তের হাতে টাকাটা দিয়ে বলে গেল, যেন তোমার হিস্যার টাকাটা তোমাকে পৌঁছাই দেয়।

--ভক্তটা কে বটে?

--আমি বটি গো। তিন সাল কয়েদ খেটে ছাড়া পেলাম, তবে না তোমার ঠাঁই আসবার মওকা হলো।...হাঁ...এখন...।

--কি?

কালু দাগীর চোখ দুটো চিকচিক করে।--এখন মনের সাধে জমি কর, নতুন ঘর কর আর মাগ ছেইলা নিয়ে সুখ কর সরদার। তোমার ভঁইসাল ভাই যেমনটি বলে গেছে, তেমনটি কর।...ও কি? তুমি কাঁদ কেন সরদার?

দাশু--আমি টাকা নিব না কালু।

কালু--কেন সরদার?

দাশু--আর দরকার নাই।

--তুমি কি তবে...। বলতে বলতে আর কি-যেন সন্দেহ করতে করতে দাশুর মুখটাকে ভাল করে দেখতে চেষ্টা করে কালু। সত্যিই কি ঘর ছেড়ে সাধু হয়ে চলে যাবে বেচারা সরদার? ধুনির ছাই গায়ে মেখে জপতপ করে নাকি সরদারটা? তা না হলে ওর মুখটা এমন উদাসপারা দেখায় কেন?

কালু দাগীর বিস্ময়ের প্রশ্নটাকে থামিয়ে দিয়ে হেসে ওঠে দাশু।--আমি ছুটি নিব কালু।

—অ্যাঁ? দাশুর মুখটাকে আরও ভাল করে দেখবার চেষ্টা করতে গিয়েই আর্তনাদ করে ওঠে কালু—তোমার এ কেমন দশা হলো সরদার!

দাশু—কপালবাবার দয়া বটে।

কালু—তবে বল সরদার, আমি কি করি?

দাশু—তুমি চলে যাও। কপালবাবা তোমাকে সুখে রাখবেন।

কালু—টাকাটা?

দাশু—যাকে দিবার মন করে তাকে দিয়ে দাও।

কালু—এ টাকা ফিরে নিয়ে যেতে বড় ডর লাগছে সরদার।

দাশু হাসে—না, কোন ডর নাই কালু।

টাকার থলিটা কোমরে গুঁজে আর চাদরটাকে গায়ে জড়িয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে কালু দাগী, তারপর যেন ভয় পেয়ে উসখুস করতে থাকে।

কালু দাগীর মূর্তিটা দাওয়া থেকে নেমে আবার সড়ক ধরে উধাও হয়ে যাবার পর দাশুর চোখের চাহনিটা চিকচিক করে হাসতে থাকে। আর দুখ করবার কিছু নাই। আর রাগ করবার কিছু নাই। ছুটি নেবার আগে যেন বুক ভরে হাসবার আর খুশি হবার একটা পরব দেখা দিয়েছে।

কিন্তু আর কত দেরি হবে? ডরানি তুই পাগল হবি কবে? দাশুর মনের ভিতরে শেষ লোভের আশাটা আবার গুনগুন করে উঠতেই দাশুর ঘরের দাওয়ার উপর অদ্ভুত একটা মিষ্টি হাসির শব্দ খিলখিল করে বেজে ওঠে।—সরদার!

খেজুর পাতার চাটাই-এর উপর বসে দরজার দিকে একটা করুণ চাহনি তুলে থাকে দাশু।

সকালী এসেছে। কী সুন্দর ঢলঢল করছে সকালীর মুখটা।

কে জানে কোন্ নদীর ঠাণ্ডা জলে চোখ ধুয়েছে সকালী? লাল চোখ নয়, কটকটে ছটফটে দুরন্ত চাহনিও নয়। সকালীর চোখের সাদা দুটো বড় বেশি সাদা হয়ে ধবধব করে; আর চোখের তারা দুটো কুচকুচে কালো হয়ে চিকচিক করে। যেন শেষ রাতের ঘুমের ঘোরে নতুন আশার স্বপ্ন দেখে হঠাৎ জেগে উঠেছে সকালী। আর, স্নান করে একেবারে স্নিগ্ধ হয়ে নিয়ে ভোরের হাওয়ার সঙ্গে তর্‌তর্ করে হেঁটে মধুকুপির দাশু কিষাণের এই ঘরের দরজার কাছে পৌঁছে গিয়েছে।

সকালীর খোঁপাটাও আর সেই রুক্ষ চুলের কুণ্ডলী নয়। তেলমাখানো চুলের খোঁপাটাও স্নিগ্ধ হয়ে চিকচিক করে। খোঁপাতে দুটো আধফোটা সাদা ফুলের কুঁড়ি। পরিষ্কার ধবধবে সাদা একটা কালোপেড়ে শাড়ি পরেছে সকালী। এই স্নিগ্ধ চেহারার একটা লাজুক আবেশ সকালীর কোমরটাকে যেন অলস করে দিয়েছে, তাই শাড়ির আঁচলটাকে কোমরের চারদিকে শক্ত করে জড়িয়ে নিয়েছে। নতুন গামছা দিয়ে পোঁটলা করে বাঁধা ছোট্ট একটা উপহারের ভার আদর করে হাতে ধরে রেখেছে। দেখেই বুঝতে পারে দাশু, মকাই-এর খই-এর মোয়য় হাতে নিয়ে সকালীর জীবনের আশা আজ দাশুর জীবনের এক দুরন্ত অঙ্গীকারের কাছে জবাব চাইতে এসেছে। দাশুর চোখ দুটো আরও করুণ হয়ে থরথর করে কাঁপে।

দরজার কাছে এগিয়ে এসে, দরজার পাশের দেয়ালে ঠেস দিয়ে, যেন স্নিগ্ধ শরীরের সব অনুভবের আবেশ হেলিয়ে দিয়ে, ঘরের ভিতরে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকা দাশুর আবছায়াময় মূর্তির দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে সকালী—রাগ কর নাই তো সরদার?

দাশু—কার উপর রাগ করবো সকালী?

সকালী মাথা হেঁট করে।—আমার উপর।

দাশু—কেন?

সকালী—আসতে দেরি হলো বলে?

দাশু—না সকালী, একটুকও রাগ করি নাই।

সকালী—থানার মুন্সীটার জুলুমের ডরে আসতে পারি নাই সরদার।

দাশু—আজও না এলে ভাল হতো।

চমকে ওঠে সকালী—কেন?

দাশু—তুমি এই তল্লাটে আর থেকো না সকালী ; দূরে চলে যাও।

সকালী—কেন?

দাশু—থানার মুন্সীটা তোমাব দুশমন বটে।

সকালী আবার মাথা হেঁট করে হাসে।—সে কথা আর বল কেন সরদার? বাবা বড়পাহাড়ী জানে, দানোটার মতলব এই দুটা বছর আমার পিছু নিয়ে আমাকে কী মরণজ্বালা দিলে! এই তল্লাট ছেড়ে রামগড়ে চলে যেতে হয়েছিল সরদার।

দাশু—ভাল করেছিলে, আবার চলে যাও।

সকালীর স্নিগ্ধ চোখের কালো তারা দুটো হঠাৎ সন্দিগ্ধ হয়ে ছটফট করে ওঠে।—আমাকে যাও যাও কর কেন সরদার?

দাশু—আমাকে মাপ কর, আমি বেদে হতে পারব না।

সকালীর স্নিগ্ধ চোখ জলে ভরে গিয়ে ছলছল করে। জোরে একটা হাঁপ ছাড়ে সকালী। তারপর সেই ছলছলে চোখ দুটোকেই অদ্ভুতভাবে হাসিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে কথা বলে—না সরদার, তোমার বেদে হয়ে কাজ নাই। আমিও তোমাকে ঘরছাড়া বেদে করে নিয়ে যেতে আসি নাই।

—কি বললে? চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

সকালী—কিষাণ মানুষ কিষাণ হয়ে থাকবে, কিষাণ হয়ে বাঁচবে, বেদে হবে কেন?

—সকালী! দাশুর গলার স্বর একটা বিস্ময়ের বেদনা সহ্য কবতে না পেরে ডুকরে ওঠে।

—সকালী—ঘর কর সরদার। ঘরণী কর।

দাশু চেঁচিয়ে ওঠে।—বেদেনী সকালী আবার এমন কথা বলে কেন?

আঁচল তুলে চোখ মুছে নিয়ে যেন অতৃপ্ত জীবনের একটা দুরন্ত ক্লান্তি মুছে ফেলতে চেষ্টা করে আর ফিসফিস করে সকালী—না সরদার, বেদেনী হতে আর সাধ নাই।

দাশু—মরদের ঘর করবার সাধ হয়েছে কি?

সকালী—হ্যাঁ সরদার। তোমারই ঘর করবে সকালী।

—চুপ সকালী, চুপ। চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

সকালী—মিছা চুপ করতে বলো না সরদার। সকালীকে তোমার ঘরে রাখ সরদার।

বলতে বলতে সকালীর এতক্ষণের শান্ত চেহারাটা দুর্বার এক আশার আবেগে টলমল করে ওঠে। ঘরের দরজার উপর যেন এখনি হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে সকালীর শরীরটা।

খেজুর পাতার চাটাই-এর উপর থেকে এক লাফ দিয়ে উঠে একেবারে দরজার কাছে এসে, শক্ত করে একটা কপাট আঁকড়ে ধরে, আর একেবারে সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দাশু। দাশুর চোখ-মুখ আর হাত-পায়ের উপর সকালবেলার আলোর আভাও যেন একটা দুরন্ত কৌতুকের ঝলকের মত ছড়িয়ে পড়ে।

দাশুর মুখের দিকে তাকায় সকালী। সেই মুহূর্তে দু পা পিছিয়ে যায় আর চেঁচিয়ে ওঠে—এ কি! তোমার যে কুট হয়েছে সরদার।

তীব্র, তীক্ষ্ণ ও করুণ একটা হাহাকার ; সকালীর আর্তরব শিউরে শিউরে বাজতে থাকে। ডরানির জলের কাছে ভোরবেলার সারসী মান্‌ঝি ছোঁড়াদের তীরের আঘাতে বিদ্ধ হয়ে যে-রকমের যন্ত্রণার রব ছাড়ে, ঠিক সেইরকমের একটা যন্ত্রণার রব। চোখের উপর আঁচল চাপা

দেয়, আবার আঁচল সরিয়ে নিয়ে দাশুর মুখের দিকে তাকায় সকালী। চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে সকালী।—তুমি আবার আমাকে ঠকালে সরদার! ছিয়া ছিয়া ছিয়া!

দাশু—আমাকে মাপ কর।

সকালী—না, কভি না।

চোখের উপর আবার আঁচল চাপা দেয় সকালী। দরজার পাশে মাটির দেয়ালের উপর কপাল ঠেকিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

বোবার মত শুধু চুপ করে একঠায় দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে দাশু। সকালীর অভিমানের আক্রোশও আস্তে আস্তে ক্লান্ত হতে থাকে। সকালীর বুকের ভিতর থেকে একটা অসহায় বিলাপের গুঞ্জন বের হয়ে গুন্‌গুন্ করে।—ছিয়া ছিয়া! আমি কার লেগে এত সাধ করে নতুন গামছায় বাঁধা করে মোয়া নিয়ে এলাম?

আরও কিছুক্ষণ তেমনই মাটির দেয়ালে কপাল ঠেকিয়ে আর গুন্‌গুন্ করে কাঁদবার পর জোরে একটা হাঁপ ছাড়ে সকালী। আঁচল দিয়ে চোখ মুখ মোছে আর একেবারে শান্ত হয়ে যায়। দরজার কাছে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে মোয়ার পোঁটলাটা রেখে দিয়েই মুখ ফিরিয়ে নেয় সকালী। সড়কের দিকে তাকায়।

দাশু বলে—তোমার সাধের চিজ এখানে আর রাখ কেন? নিয়ে যাও।

দাশুর মুখের দিকে না তাকিয়ে, আর গলার স্বর একটু রূঢ় করে নিয়ে যেন ধিক্‌কার দেয় সকালী—ফিরিয়ে নিয়ে যেয়ে কোন্ লাভ?

দাশু—রেখে গেলেই বা তোমার কোন্ লাভ?

সকালী—তুমি দয়া করে খাবে, এই লাভ।

দাশু—না।

মুখ ফিরিয়ে দাশুর মুখের দিকে কটমট করে তাকায় সকালী।—সকালীর ছোঁয়া মিঠাই খেতে আজও ঘিন্না লাগে বুঝি?

দাশু—একটুকও ঘিন্না করে না সকালী। কিন্তু, তুমি এই চিজ নিয়ে যাও।

ঝামটা দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে সকালী—নিয়ে গিয়ে কি হবে? কাউয়াতে খাবে কি?

দাশু হাসে—না ডরানির জলে ফেলে দিলে কাউয়াতে খাবে কেন?

ডরানির জলে? ভ্রূকুটি করে কুটে কিষাণের এই বিচিত্র হাসির রহস্য বুঝতে চেষ্টা করে সকালী। দাশুর হাসিটা যেন একটা ভয়ানক কৌতুকের সঙ্কেত। তা না হলে হাসে কেন দাশু?

—ডরানির জলে ফেলে দিব কেন? দাশুর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে গিয়ে সকালীর চোখ দুটো যেন একটা নতুন সন্দেহের বেদনায় কাঁপতে থাকে।

দাশু হাসে—ডরানির জল বড় ঠাণ্ডা বটে, আর দাশু কিষাণের গতরে বড় জ্বালা বটে।

—সরদার। ফুঁপিয়ে ওঠে সকালী।

—তুমি মিছা কাঁদ কেন? ফিসফিস করে দাশু।

মিছা কান্না? দাশুর মুখের দিকে তাকিয়ে আর শান্ত হয়ে কি-যেন ভাবতে থাকে সকালী। মধুকুপির যে কিষাণের বুকের ছোঁয়া এত ভাল লেগেছিল, সেই কিষাণের জীবনটাকেও কুষ্ঠরোগের একটা লাস মনে করে পালিয়ে যাচ্ছে সকালী?

—আমি যাব না সরদার! অদ্ভুত এক জেদের মূর্তি ধরে চেঁচিয়ে ওঠে সকালী।

দাশু ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে—কি? কেন যাবে না?

সকালী—আমি তোমার ঘরে ঠাঁই নিব।

দাশু—ক্ষেপীর মত কথা বল কেন সকালী? কুটিয়া মানুষের ঘরে থাকতে তোমার যে...।

সকালী—আমার একটুকও দুখ হবে না সরদার।

দাশু—কিন্তু আমার এই ঘর যে ঘর নয়। এই ঘর নিলাম হয়ে যাবে।

সকালী—যাক না কেন? ভিন গাঁয়ের ভিন ঘরে থাকবো।

দাশু—আমার এই গতরে যে খাটাখাটিও আর চলবে না।

সকালী—আমার গতর কি নাই? আমি খাটবো। আমি তোমার ভাত দিব। চাও তো, আমি তোমাকে...।

দাশু—কি?

সকালীর চোখে অদ্ভুত এক ইচ্ছার জেদ জ্বলজ্বল করতে থাকে।—চাও তো আমি তোমাকে ছেইলা দিব। তোমার কুটিয়া গতরকে একটুক ঘিন্না করবেনা সকালী।

চমকে ওঠে দাশু ; দাশুর শরীরের জ্বালার উপর যেন হঠাৎ ঠাণ্ডা বৃষ্টির ধারা ঝরে পড়েছে। নিঃশ্বাসের বাতাসে সান্ত্বনা, আর রক্তের ভিতরে শান্তি। হিসাব জানে না, একটুকও হিসাব জানে না সকালী ; শুধু মায়া করতে চায়, আর কিছু চায় না, এমন মানুষও দুনিয়াতে আছে। হে কপালবাবা, ছুটি নিতে যে ইচ্ছা করে না।

—সকালী! আস্তে আস্তে ডাকে দাশু।

—চিন্তা কর কেন সরদার? যেন বুকের সব নিঃশ্বাসের আবেগ ঢেলে দিয়ে নিবিড় স্বরে দাশুর জীবনটাকে আশ্বাস দেয় সকালী।—বাবা বড়পাহাড়ী দয়া করেন, তোমার রোগ সেরে যাবে সরদার।

হ্যাঁ, বিশ্বাস হয়, কোন চিন্তা করতে আর ইচ্ছা হয় না। সকালী জল ঢেলে দিয়ে ধুয়ে মুছে দিলে গরল চলে যাবে। আবার টাঙি কুদালি হাতে নিতে পারা যাবে। আবার ক্ষেতজোত হবে, নিশ্চয় হবে। ক্ষেতের মাটির ঢেলা ভাঙবে দাশু, ছিটাই বুনাই করবে সকালী। পাঁচ বিঘা মাটির ক্ষেত আর গুলঞ্চের বেড়া, হে কপালবাবা! আকাশে ভাদুয়া মেঘ গলছে, ঝিরঝির ঝরানি শুরু হয়ে গিয়েছে। চল সকালী চল। কাঁধের উপর ছেইলাটা, বুকের উপর মাদলটা, পাশে পাশে সকালী।

—খাও সরদার। ডাক শুনে চমকে ওঠে দাশু। হ্যাঁ দাশুর জীবনের দরজার কাছে এসেই গিয়েছে আর বসে পড়েছে সকালী। নতুন গামছার পোঁটলা খুলে মকাই-এর খই-এর মোয়া বের করেছে।

দরজার চৌকাঠের কাছে মেজের মাটির উপর বসে পড়ে দাশু, আর মকাই-এর খই-এর মোয়ার দিকে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে দেয়।

কেঁপে ওঠে হাতটা। তার পরেই কেঁপে ওঠে দাশু কিষাণের সেই অদ্ভুত চোখ, যে চোখ থেকে পাতা ঝরে গিয়েছে আর ময়ূরের চোখের মত সাদা দাগের চক্কর চোখের কোলে ফুটে উঠেছে। কি-যেন দেখতে পেয়েছে দাশু।

দাওয়ার সামনে যে ছোট নিমগাছটা, তারই ধড়ের আড়াল থেকে একটা বন্দুকের নল আস্তে আস্তে উঁকি দিয়ে কাঁপছে। দুরন্ত শিকারলোভীর মত সকালীর পিঠটার দিকে তাক করে নিয়ে একেবারে সুস্থির হয়ে গেল বন্দুকের নলটা।

—খবরদার, পলুস হালদার! হুংকার দিয়ে লাফিয়ে ওঠে দাশু। দরজার বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সকালীকে আড়াল ক'রে, বুক চেতিয়ে আর দুই হাত তুলে দাঁড়ায় দাশু। চমকে ওঠে সকালী, উঠে দাঁড়ায়, আর দাশুর পিঠের পিছনে নরম ছায়ার মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

—তুমি সরে যাও সরদার। নিমগাছের আড়াল থেকে যেন হোঁচট-খাওয়া মানুষের মত একটা যন্ত্রণাক্ত চেহারা নিয়ে, চিৎকার করে আর লাফ দিয়ে সামনে এগিয়ে আসে পলুস হালদার।

—কভি না। গর্জন করে ওঠে দাশু।

—শুধু একটা টোটা আছে সরদার। আমার কথা শুন ; তুমি সরে যাও।

—বেশ তো ; আমারও একটা বুক আছে। যদি সাধ হয়, তবে আমার বুকের উপর টোটা খালাস করে নাও।

—তুমি সরে যাও সরদার। দাশুর পিঠের পিছনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে গিয়ে ছটফট করে ওঠে সকালী, আর চোখ দুটো ধিকিধিকি করে জ্বলতেও থাকে।—খিরিস্তানের বন্দুকের জোর কত, আমাকে বুঝে নিতে দাও সরদার।

—না, কভি না। দু হাত ছড়িয়ে দিয়ে সকালীকে আড়াল করে রাখে দাশু।—মারতে হলে আমাকে মেরে চলে যাক্ শিকারীটা।

দাঁতে দাঁত ঘষে চেঁচিয়ে ওঠে সকালী—তোমাকে মারবে এই শিকারীটা? ইঃ, আমি যে তবে ওর টুঁটি ছিঁড়ে লেহু পিয়ে নিব।

পলুস হালদারের গায়ে শুধু একটা ময়লা গেঞ্জি, পরনে একটা কালিঝুলি মাখা নীল রঙের পেন্টালুন। মাথাটা উসকো-খুসকো ; যেন অনেকক্ষণ ধরে দু হাতে মাথার চুলের ঝুঁটি টানাটানি করেছে পলুস।

বন্দুকটাকে এক হাতে আঁকড়ে ধরে, আর এক হাতে কপালের ঘাম মুছে নিয়ে জোরে একটা শ্বাস ছাড়ে পলুস। তারপর একেবারে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে দাশুর আর সকালীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

হেসে ফেলে পলুস। কিছুক্ষণ আনমনার মত মাটির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার পরেই বন্দুকের নলটাকে আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে, নলের মুখটাকে নিজের বুকের উপর শক্ত করে চেপে ধরে।

এক লাফ দিয়ে নিমগাছের দিকে এগিয়ে যেয়ে পলুসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দাশু ; বন্দুকটাকে যেন থাবা মেরে আঁকড়ে ধরে আর একটা ঝাঁকুনি দিয়ে পলুসের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়।

পলুসের গম্ভীর করুণ হতাশ আর ব্যথিত মুখটা আবার অদ্ভুতভাবে হাসতে থাকে।—তুমি বাধা দাও কেন সরদার? একটা টোটা আছে, খালাস করতে দাও।

—না, কভি না। তুমি কার উপর রাগ করে নিজেকে নাশ করতে চাও হালদার?

পলুস—একটু আগে শুধালে বলতাম, ওর উপর রাগ করে। শুকনো চোখের ভুরু টান করে সকালীকে দেখিয়ে দেয় পলুস।

দাশুর মুখটা হঠাৎ করুণ হয়ে যায়।

পলুস—কিন্তু না, সকালীর উপর আর রাগ নাই। যার উপর রাগ হয়, তাকেই নাশ করতে চাই সরদার ; তুমি বাধা দিও না।

দাশুর হাত থেকে বন্দুকটা কাড়তে চেষ্টা করে পলুস। হাঁপাতে হাঁপাতে চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।—না, কভি না। ছিনাছিনি করো না ; আমার কুটিয়া হাতে জোর নাই হালদার। তুমি থাম হালদার।

ছিনাছিনি থামিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে পলুস ; তারপর দাশুর মুখের দিকে তাকিয়ে যেন ভয়ানক এক অভিমানের হাসি হাসতে থাকে।—তোমার কুটিয়া হাতে বড় জবর জোর আছে সরদার। তুমি কী ভয়ানক ছিনে নিতে পার!

দাশু—কি বললে?

কোন উত্তর না দিয়ে আবার মাটির দিকে আনমনার মত কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে পলুস। টপ্ টপ্ করে দুটো বড় বড় জলের ফোঁটা পলুসের চোখ থেকে ঝরে পড়ে।

দাশু আশ্চর্য হয়—এ কি হালদার?

চাপা গলায় ফুঁপিয়ে ওঠে পলুস হালদার।—সকালী!

চমকে ওঠে দাশু। পলুসের সজল চোখের চাহনিটা যেন দাশু কিষাণের এই কুষ্ঠগ্রস্ত

জীবনের এক নতুন অহংকারের কাছে নিঃসহায় এক প্রার্থীর আবেদন। কি-যেন বলতে চায় পলুস, কিন্তু স্পষ্ট করে বলতে পারছে না, আর মাথাটা বার বার হেঁট হয়ে যাচ্ছে।

মুখ ফিরিয়ে সকালীর দিকে একবার তাকায় দাশু। দাশুর ঘরের দাওয়ার উপর দরজার কাছে চুপ করে বসে আছে সকালী। ঢলঢল করছে সকালীর সুন্দর মুখটা। তেলচিকণ খোঁপাতে সাদা ফুলের আধফোটা কুঁড়ি দুটোও সুস্থির হয়ে রয়েছে। সকালীর নাম করে পলুস হালদারের বুকের ভিতর থেকে যে অভিমান উথলে উঠেছে, তার শব্দ শুনতে পায় নি সকালী। দাশু কিষাণের ঘরের দরজার মাটি আঁকড়ে একেবারে শান্ত কঠোর ও নির্বিকার একটা মূর্তি ধরে বসে আছে।

পুলস হালদারের মুখের দিকে তাকিয়ে কি-যেন ভাবে দাশু। বুকটা একবার ধড়ফড় করে ওঠে। তার পরেই দাশু কিষাণের সেই রোগের দেহটা যেন লোহার মূর্তির মত কঠিন হয়ে যায়। ফিসফিস করে দাশু।—সকালীকে ঘরে নিয়ে যেতে চাও, হালদার?

পলুস—হ্যাঁ সরদার। কিন্তু যাবে কি সকালী?

হেসে ফেলে দাশু।—নিশ্চয় যাবে।

আস্তে আস্তে হেঁটে, ঘরের দাওয়ার উপর উঠে, দরজার কাছে এসে, আর, চুপ করে সকালীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে দাশু।

সকালী বলে—কি বটে সরদার? খিরিস্তানটা যায় না কেন?

দাশু হাসে—যাবে, যাবে, কিন্তু একা যাবে না।

সকালী ভ্রূকুটি করে।—কি?

দাশু—তোমাকে নিয়ে যাবে।

সকালী—মিছা কথা।

দাশু—মিছা কথা নয়।

সকালী—কিন্তু আমি যাব কেন?

দাশু—যাওয়া ভাল।

সকালীর চোখ দপ্ করে জ্বলে ওঠে।—এমন কথা বলতে তোমার লাজ লাগে না? তুমি কোন্ সাধে এমন কথা বল?

দাশু—তোমার ভাল হবে, সেই সাধে বলি।

—তুমি ঠগ বট সরদার। তুমি পাথর বট সরদার। তোমার মনেও এত গরল ছিল! হায় বাবা বড়পাহাড়ী! মাথা হেঁট করে মুখ লুকিয়ে ফোঁপাতে থাকে সকালী।

দাশু বলে—পলুস হালদার কাঁদছে।

চমকে ওঠে সকালী।—অ্যাঁ? কেন কাঁদলে? কার লেগে কাঁদলে?

দাশু—তোমার লেগে।

আবার মুখ লুকিয়ে ফোঁপাতে থাকে সকালী।

দাশু—যাও সকালী।

সকালী—তুমি যেতে বল?

দাশু—হ্যাঁ।

সকালী—একটুক ভেবে নিয়ে বল।

দাশু—খুব ভেবে নিয়ে, খুশি হয়ে বলছি।

দাশুর মুখের দিকে অপলক চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ফিসফিস করে সকালী—তুমি কেন খুশি হও সরদার?

দাশু—তোমাকে ভাবতে যে আমার বড় মায়া লাগে। তুমি যে...।

সকালী—ব্যস্, আর বলতে হবে না সরদার। বুঝলাম!

তেলচিকণ চুলের খোঁপাটাকে খুলে নিয়ে শক্ত করে আবার জড়িয়ে বাঁধে সকালী। শাড়ির আঁচলটাকে টানাটানি করে গুছিয়ে নিয়ে মাথার উপর টেনে দিয়ে, চুপ করে দুই হাঁটুর উপর মুখ গুজে বসে থাকে।

দাশু হেসে হেসে আর চেঁচিয়ে ডাক দেয়—হালদার!

মুখ তুলে তাকায় পলুস—কি বটে?

দাশু—ওখানে দিককানা ভূতের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? এখানে এসো, হালদারিনকে হাত ধরে ডেকে নিয়ে যাও। তা না হলে যাবে কেন বেচারা?

এগিয়ে আসে পুলস। সকালীর হাত ধরে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায় সকালী।

দূরের আকাশের এক কোণে কালা বাদল ঘনিয়েছে মনে হয়। ডাঙার উপর দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাসের একটা আঁধিও দৌড়ে চলে গেল। দাশুর চোখ দুটো পিপাসীর চোখের মত দূরের আকাশের সেই মেঘে ভরাট চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপরেই ব্যস্ত হয়ে হাঁক দিতে থাকে দাশু।—না, আর দেরি করবে না, হালদার। সিধা ভুবনপুরের সড়ক ধরে চলে যাও। যদি জিরাতে হয় তবে নিরসাচটিতে একটা ঘণ্টা জিরিয়ে নিয়ে খাওয়াদাওয়া করে নিও। তারপর মোটর বাস ধরে...হ্যাঁ, এখন কোথায় যাবে হালদার?

পলুস বলে—কাতরাসগড় যাব সরদার। রেল কোম্পানীর কারখানায় কাজ পেয়েছি।

দাশু—ভাল ভাল, খুব ভাল বটে হালদার। কপালবাবা তোমাদিগে সুখে রাখেন।

পলুসের পাশে পাশে হেঁটে সড়কের উপরে গিয়ে একবার থমকে দাঁড়ায় সকালী। তারপর চলতে থাকে। ঘরের দাওয়ার উপর দাঁড়িয়ে আর নিথর হয়ে তাকিয়ে থাকে দাশু।

দূরের আকাশে বিদ্যুৎ ঝিলিক দেয় ; আর দাশুর চোখে সেই ঝিলিকের ছবি ঝিলিক দিয়ে হেসে ওঠে। বুক ভরে বাতাস টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে বিপুল এক স্বস্তিময় আরামের শ্বাস ছাড়ে দাশু। আঃ, কপালবাবার দয়াতেও কত মজা! কোথা থেকে চলে এল বেচারা পলুস হালদার ; সকালীকে হাত ধরে আর মায়া করে নিয়ে চলে গেল। ভাল হলো, বড় ভাল হলো।

ছুটি নেবার জন্য তৈরি হয়েও ভুল করে এখটু জিরিয়ে নেবার জন্য লোভ করেছিল দাশু। বেচারী সকালীর বোকা মনটাকে মিছা অভিমানে ভুলিয়ে দিয়ে সকালীর বুকের একটা ভয়ানক মায়ার জেদ ক্ষেপিয়ে দিয়েছিল। সকালীর অসহায় ভাগ্যটাকে চুরি করতে চেয়েছিল দাশু। এই কুটিয়া গতরের ছায়া আর ছোঁয়া দিয়ে সকালীর খোঁপার সাদা ফুলের কুঁড়ির সব সাধ কালো করে দিতে চেয়েছিল। ছিয়া ছিয়া। মধুকুপির দাশু কিষাণেরও মনে এমন ভুল হয়?

—মন ভুল করেছিল বটে, কিন্তু কপালটা ভুল করে নাই দাশু! দাওয়ার উপর নিজেরই ছায়াটার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কথা বলে দাশু আর চোখের চাহনিও প্রসন্ন হয়ে ওঠে। বেঁচে গিয়েছে সকালী ; সুখের ঘরে চলে গিয়েছে। দাশুর মুক্তির পথে আর কোন বাধা নেই। কোন লোভের কাঁটা নেই ; কোন মায়ার বেড়া নেই।

ক্যা ক্যা ক্যার্‌র্—একটা রাম শালিকের আতঙ্কের কর্কশ স্বর। হিংসুটে বিড়ালের চেহারা চোখে পড়লে ঠিক এইরকম আতঙ্কের কর্কশ রব ছাড়ে শালিকগুলি। দেখতে পায় দাশু, নিমের ডালে বসে শালিকটা দাশুরই দিকে তাকিয়ে এই অদ্ভুত আতঙ্কের কর্কশ বিলাপ ছাড়ছে আর কাঁপছে।

—আমাকে এত ডর কেন রে? হেসে ফেলে দাশু। শালিকটার আতঙ্কের রব আরও কর্কশ হয়ে বেজে ওঠে। সত্যিই ভয় পেয়েছে শালিকটা। শালিকটা যেন দাশুর এই স্তব্ধ অস্তিত্বটাকে সহ্য করতে পারছে না। দাশুকে মধুকুপির সেই দুরন্ত মাটিকাটা অহংকারের কিষাণ বলে চিনতেও পারছে না।

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে আর তেমনি নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে থাকে দাশু। চোখে পড়ে, একটু দূরে দেড় বিঘা চাকরানের বুকটা যেখানে প্রকাণ্ড গর্ত হয়ে, পুরনো ইঁটখোলার যত ঝামা আর ঝুনোর হাড়গোড় নিয়ে হাঁ করে পড়ে আছে, সেখানে শিয়ালকাঁটার ঝোপের ভিতর থেকে সত্যিই একটা শিয়ালের মুখ উঁকি দিয়ে দাশুর দিকে তাকিয়ে আছে।

—তুই আবার কি ভাবছিস রে? বিড়বিড় করে দাশু।

শিয়ালটার মুখটা যেন একটা অভিযোগের মুখ। যে মানুষের জীবনে আর কোন কাজ নেই, সাধ নেই, আশা নেই, সে মানুষ এখনও এমন করে এখানে দাঁড়িয়ে থাকে কেন? কিংবা, দাশু কিষাণের এই ঘেয়ো চেহারাটাকে জীবন্ত মানুষের চেহারা নয় বলে সন্দেহ করছে শিয়ালটা?

একটা ভীমরুল। ভীমরুলটা যেন একটা রাগের গুঞ্জন তুলে দাশুর বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে। উড়ে উড়ে ঘুরছে আর বার বার তেড়ে আসছে ভীমরুলটা।

—তুই আবার রাগিস কেন? কি শুধাতে চাস? বিড়বিড় করতে করতে দু পা এগিয়ে যেয়ে দাওয়ার একটা খুঁটো ধরে দাঁড়িয়ে থাকে দাশু।

—যাও যাও, মিছা আর হেথা দাঁড়িয়ে থাক কেন দাশু?

—হ্যাঁ, যেতে তো হবে ; কিন্তু দাশুকে তোমাদিগের এত ঘিন্না কেন? কি পাপ করেছে দাশু কিষাণ?

—বুঝে দেখ।

—কি আর বুঝতে বল হে? শুধু নতুন হতে পারি নাই, এই পাপ করেছি। আর কোন পাপ করি নাই।

চালার বাতার একটা কাঠের গায়ে হঠাৎ ঠোকর লেগে ভীমরুলের ধড়টা ঝুপ করে মাটির উপর পড়ে, ছটফট করে, তারপরেই উড়ে উধাও হয়ে যায়।

ঘরের ভিতরে ঢুকে গামছাটাকে হাতে নিয়ে আবার বাইরে এসে দাঁড়ায় দাশু। কালা বাদলের ঘোর তখনও দূরের আকাশের এক কোণে কালো হয়ে আছে। গামছাটাকে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে নড়বড়ে জামকাঠের একটা কপাটকে যেন খিমছে ধরে দাশু। না, আর তোকে ঠেলা দিব না ; এই ঘর আর বন্ধ করতে হবে না। তোকে খোলা রেখে দিয়ে চলে যাব। চৌকিদারীর পিয়াদা আর আদালতের বাবু এসে যদি নিলাম হেঁকে তোকে ছোঁয় তো ছুঁবে। তুলে নিয়ে যায় তো নিয়ে যাবে। আমি আর তোকে ছুঁতে আসবো না।

ছটফট করে দাওয়া থেকে একটা লাফ দিয়ে নেমে নীচের ঘেসো মাটির উপর দাঁড়ায় দাশু। কিন্তু বুকের ভিতরে ভয়ানক একটা শূন্যতা ছটফটিয়ে ওঠে। বড় বিস্বাদ হয়ে গেল মুক্তির আনন্দ!

—হায় রে ঘর! হায়রে মধুকুপির মাটি!

—ছিয়া দাশু, মিছা আবার মনটাকে দুখাও কেন?

—কেন দুখাবে না বল? আমি কারও সুখ নাশ করি নাই ; আমি কোন কসুর করি নাই ; তবে আমার গতরে গরল ঢুকে কেন? আমার কুট হয় কেন?

—আঃ, আবার কেন ভুল কথা বল দাশু?

—না, আমি আজ জবাব নিয়ে যেতে চাই।

—জবাব কেউ দিবে না হে। কপালবাবাও দিবে না।

—তবে বল না কেন, কপালবাবার দয়াতে বিচার নাই।

—ছিয়া ছিয়া, এমন কথা বলতে নাই। কপালবাবার দয়াতে বড় ভাল বিচার আছে দাশু।

—আমার সব সুখ নাশ হলো, এটাকে ভাল বিচার বল?

—তবে তুমি বল, কেমন বিচার?

—বড় মজার বিচার বটে।

—তবে তাই বটে।

—তাই বল না কেন? যেসো মাটির দিকে তাকিয়ে একটা অবুঝ বিস্ময়ের জ্বালা চোখে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে দাশু। ছুটি নেবার উল্লাসটা মনমরা হয়ে বুকের ভিতর কাতরাতে শুরু করেছে। এক মুঠো অবহেলার ধূলির মত ঝড়ের বাতাসে উড়ে গিয়ে ডরানির জলে পড়ে যাওয়া, বাস্, তারপর দাশু কিষাণের কোন চিহ্ন থাকবে না। বাঃ, কী মজাদার সাজা!

না, ভাল লাগে না। চোখের সামনের এইসব আলো-ছায়া দেখতে একটুও ভাল লাগে না। দাশুর জন্য মায়া করে একটা পাখিও ডাকে না, একটা পাতাও কাঁপে না। দাশুর কথা ভেবে কোথাও কারও চোখ ভিজে না। বাঃ, কী সাজাদার মজা!

বুকের ভিতরে কলিজাটা যেন ফোঁপাতে শুরু করেছে। নিজেরই এই কুটিয়া শরীরটাকে আদর করে কোলে তুলে নিতে ইচ্ছে করে। ত্রিশ বছর বয়সের কঠোর ধড়টা যেন এইটুকু একটা শিশুর নরম শরীর হয়ে যেতে চায়।

বিয়ুয়া পরবের সময় গোবিন্দপুর থেকে মেলা দেখে গাঁয়ে ফিরতে গিয়ে পথ চলতে চলতে বাপের কাছছাড়া হয়ে পিছিয়ে পড়েছে দাশু। বাপকে দেখতে না পেয়ে চেঁচিয়ে কেঁদেও উঠেছে। পথের ভিড়ের মানুষগুলি শুধাচ্ছে, তোমার কোন্ গাঁয়ে ঘর, কার ছেইলা তুমি?

—কুথাকে গেলি রে বাপ। চেঁচিয়ে ডাক দিতে দিতে ছুটে আসছে দাশুর বাপ।—এই তো আমি, কাঁদিস কেনে বাপ, কোন ডর নাই বাপ। বলতে বলতে ছোট্ট ছাগলের বাচ্চার মত দাশুর সেই ছোট্ট নরম শরীরটা কাঁধের উপর তুলে নিয়ে পথ হাঁটতে থাকে দাশুর বাপ। দাশুর ধুলোমাখা পা দুটো বাপের কাঁধের দু পাশ থেকে ঝুলে বাপের বুকের উপর দুলতে থাকে। দাশুর সেই ধুলোমাখা পায়ে কত আদর করে হাত বোলাতে থাকে দাশুর বাপ।

দাশুর বুকের ভিতর থেকে যেন একটা মায়ার স্বর ডুকরে ওঠে।—তুই কোথায় আছিস রে বাপ?

কী আশ্চর্য, আজ দাশুর বুকটা যে ঠিক ওর বাপের গলার স্বর নিয়ে নিজের ছেলেটাকে ডেকে ফেলেছে। হ্যাঁ, বড় মিঠা ডাক, বড় মিঠা বাতাস। বড়কালুর বহেড়ার জঙ্গলের মাথা নড়ছে, ঝড়ের শব্দ শোনা যায়। কী মিঠা আওয়াজ! হাঁ, ওটা যে আমারই ছেইলা বটে। ডাগরটি হবে, জোয়ান হবে, বিয়া করবে, আমার পুতবহুর যেন চাঁদপারা মুখটি হয় কপালবাবা।

কি যেন ভাবে আর হঠাৎ থর থর করে কেঁপে ওঠে দাশু।—ছেলাটা আছে তো?

আছে, নিশ্চয় আছে। মুরলীর কোলের আদরের কাছে আছে। ছেইলার লেগে মুরলীর মনে বড় মায়া ছিল। ছেইলাকে বাঁচিয়ে রাখবে বলেই না কিষাণের ঘরের দুখকে ঘিন্না করে পালিয়ে গেল মুরলী?

ছেইলাটাকে একবার দেখতে হবে। চল দাশু চল ; আর দেরি কর কেন? হোই দেখ, আকাশে কালা বাদল জোর করেছে! জোর বৃষ্টি হবে। ডরানিতে হুড়পা বান ডাকবে।

ঢের দূর নয় হারানগঞ্জ। দৌড়ে দৌড়ে চললো চার ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যায়।

দৌড় দিয়ে সড়কের উপরে উঠতে গিয়েই থমকে দাঁড়ায় দাশু।—হেই দাশু ; থাম হে। হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসছে রামাই দিগোয়ার।

কাছ এগিয়ে এসেই চমকে ওঠে রামাই—হেই দেখ, দাগীটার কুট হলো কবে?

সড়কের সেই দূরে বাঁকের দিকে তাকিয়ে থাকে দাশু, যেখানে ডরানির লোহার পুলটা দেখা যায়, যেখান থেকে সড়কটা সোজা একটানা বাবুরবাজার চলে গিয়েছে। বাবুরবাজার

থেকে সড়র ধরে সোজা হাঁটা দিলে হারানগঞ্জ পৌঁছে যেতেই বা কত সময় লাগবে? বড় জোর দেড় ঘণ্টা।

রামাই হঠাৎ সন্দিগ্ধ হয়ে দাশুর ঘরের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে।—সকালীর খবর বল দাশু। ঘরে আছে কি নাই?

দাশু—নাই।

রামাই—ঢের চালাকি চলবে না দাশু। আমি দেখেছি, চৌধুরীজী দেখেছে, সকালী আজ সোহাগের খান্‌কিটির মত সেজে নিয়ে ইদিক পানে এসেছে। তোমার কাছে আসে নাই কি?

—হ্যাঁ, এসেছিল।

—তবে, গেল কোথায়?

—ওর মরদের ঘরে চলে গেল।

—বেইদানী মাগির মরদটা আবার কে বটে?

—পলুস হালদার।

—অ্যাঁ? খিরিস্তান শিকারীটা?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু, তুমি মাগিকে যেতে দিলে কেন? কি কথা ছিল মনে নাই?

—মনে ছিল।

—তবে?

দাশু হাসে—মনে ছিল, তাই না ওকে মরদের ঘরে যাওয়া করিয়ে দিলাম।

রামাই-এর চোয়াল দুটো রাগ করে চড়চড় করে বেজে ওঠে।—তুই কি আমার মাগের বড় ভাই বটিস রে দাগী? আমার সাথে রস করে কথা বলছিস।...তুই শালা সকালীকে কেন যেতে দিলি, বল্?

দাশু—তোমার সাথে কথা বলতে আমার আর সাধ নাই রামাই, তুমি যাও।

—চৌধুরীজীর মত মানুষের সাধে দাগা দিয়ে তুই কি পার পাবি রে দাগী? চেঁচিয়ে ওঠে রামাই।

উত্তর দেয় না দাশু।

রামাই আবার চেঁচিয়ে ওঠে—তোকে এখনি বুঝিয়ে দিব রে ঠগ। চল এখনই আমার সাথে চল।

দাশু মাথা নাড়ে।—না।

রামাই—চৌধুরীজীর কাছে গিয়ে জবাব দিবে চল, কেন তুমি সকালীকে চলে যেতে দিলে?

দাশু বলে—জবাব তো তোমাকে বলেই দিয়েছি। তুমি যাও।

রামাই—আবার পাঁচ বছর কয়েদ খাটতে সাধ হয়েছে কি?

দাশু হাসে—না।

রামাই—কিন্তু খাটতে হবে। চৌধুরীজীকে এখনই খবর দিব। ফাঁড়িতে আমারই ঘরে বসে আছে চৌধুরীজী। এখনই ঘোড়া ছুট করিয়ে যমের পারা এসে তোকে গেরেপ্তার করবে। ভেবে দেখ দাশু, ভাল কথা বলি, আমার সাথে চল।

দাশু—না।

রামাই—পালাবি ভেবেছিস?

উত্তর দেয় না দাশু।

—কোন্ শালার বাপ তোকে পালাতে দিবে? বলতে বলতে দৌড় দেয় রামাই দিগোয়ার।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে দাশু। নীল রঙের উর্দিপরা একটা ক্ষেপা জানোয়ারের

মত রামাই দিগোয়ার সড়ক ধরে প্রায় দৌড়ে দৌড়ে ছুটে চলেছে। এখনই খবর পাবে চৌধুরী ; এখনই টাট্টুঘোড়ার সওয়ার হয়ে তড়বড় করে ছুটে আসবে একটা প্রতিহিংসার অপদেবতা। চৌধুরীর হাতের পিতল-বাঁধানো লাঠি, পিঠে ঝোলানো বন্দুক, ঝোলার ভিতরের হাতকড়া আর দড়ি ; দাশুর মুক্তি পাওয়া ভাগ্যটাকে আবার মাঝপথ থেকে বাঁধাছাঁদা করে হাজত-ঘরের দিকে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাবার জন্য একটা বিভীষিকার দূত ছুটে আসবে। ছেইলার মুখ দেখবার যে সাধ, আর ডরানির জলের ঢলে কুটিয়া গতর উৎসর্গ করে দেবার যে সাধ দাশুর বুকের ভিতরে উতলা হয়ে উঠেছে, সে সাধ বিফল করে দেবার জন্য একটা অভিশাপ হন্তদন্ত হয়ে তেড়ে আসবে।

—না, আর ধরা দিব না। দাশুর বুকের ভিতরেও একটা প্রতিজ্ঞা যেন চিৎকার করে ওঠে।

কিন্তু বাবুরবাজার হয়ে, গোবিন্দপুর সড়ক ধরে হারানগঞ্জের দিকে ছুটে চলে যেতে পারা যাবে না। ওই পথে চৌধুরীর ক্ষেপা আক্রোশ টাট্টুঘোড়া ছুটিয়ে এসে পলাতক দাশুকে আটক ক'রে ধরতে পারে।

খানাপিনার সেই জঙ্গল, যে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে কোন ডহর নেই। মুলি বাঁশ, খেঁজুর, শাল আর কাঁটাকরঞ্জা ; সেই সঙ্গে ফণীমনসা ও আলকুশীর ঝোপে ভরাট হয়ে আছে খানাপিনার যে জঙ্গল, সে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে কেউটের ছোবল আর গো-বাঘা হুঁড়ারের কামড় এড়িয়ে যদি এগিয়ে যেতে পারা যায়, তবে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে একেবারে গোবিন্দপুর সড়কে পৌঁছে যাওয়া যাবে। তারপর হারানগঞ্জ, যে হারানগঞ্জের ডাক্তার রিচার্ডবাবুর বাড়ির বাগানে দাশুর ছেইলার হাত ধরে হেসে হেসে ঘুরে বেড়ায় মুরলী।

দূরের সড়কের পাশে বাবলার সারির মাথার উপরে ধুলো উড়ছে। মনে হয় দাশুর, একটা ছুটন্ত টাট্টুঘোড়ার তড়বড়ে খুরের শব্দ ডরানির লোহার পুলের গায়ের উপর আছড়ে পড়ছে। পুলিশের চৌধুরীই ছুটে আসছে বুঝি!

লাফ দিয়ে সরে যায় দাশু। সড়ক থেকে নেমে, পাকুড়তলায় ছায়া ধরে ছুটতে ছুটতে, নেড়া কাঁকুড়ে ডাঙাটাও এক দৌড়ে পার হয়ে গিয়ে খানাপিনার জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে পড়ে দাশু। আলকুশির ঝোপ ঠেলে, উই-এর ঢিবি মাড়িয়ে, আর মুলি বাঁশের ধড় ঠেলে ঠেলে এগিয়ে যেতে থাকে।

এগিয়ে যায়, আর মাথার উপরে আকাশটার দিকে মাঝে মাঝে তাকায়। হ্যাঁ, ঝিলিক হানছে পুবের আকাশকোণের মেঘ ; দিক ভুল হবার ভয় নেই।

হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাসের একটা ঝড় যখন দাশুর হাঁপধরা বুকের উপর এসে লুটিয়ে পড়ে, তখন বুঝতে পারে, সোজা তাকিয়ে দেখতেও পায় দাশু, খানাপিনার জঙ্গলের শেষ খেজুরের ভিড় পার হয়ে একটা খোলা ডাঙার কাছে চলে এসেছে। গোবিন্দপুরের সড়ক দেখা যায়। সড়ক ধরে ছুটে চলেছে ঝালদা যাবার মোটর-বাস।

গামছা দিয়ে মাথা আর মুখের খানিকটা ঢেকে নিয়ে, সড়কের দিকে একজোড়া সন্দেহের চোখ আর সতর্ক চাহনি তুলে তাকিয়ে থাকে দাশু। টাট্টুঘোড়ার সওয়ার হয়ে ছুটোছুটি করছে না তো কোন অভিশাপ?

না, কোন ছুটন্ত টাট্টুঘোড়ার শব্দ তড়বড় করে বাজে না। এখন এই সড়কে উঠে সোজা পুব দিকে হাঁটা দিলে হারানগঞ্জের পথ পাওয়া যাবে, গির্জাবাড়ির চূড়াটাও দেখা যাবে।

ডাঙাটাও এক দৌড়ে পার হয়ে সড়কে উঠেই হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় দাশু। অনেক মানুষের একটা ভিড় একেবারে কাছে এসে পড়েছে। ভিড়ের সঙ্গে পুলিসের লালপাগড়িও দেখা যায়।

লাঠি কাঁধে নিয়ে তিনজন পুলিশ ভিড়ের আগে আগে আসছে। দুটো গো-গাড়ির চাকার কঁকানির পিছু পিছু ভিড়ের সোরগোলও ছটফট করতে করতে এগিয়ে আসছে। সড়কের

কিনারায় একটা গাছের গা ঘেঁষে প্রায় গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দাশু। বুকটা থর থর করে। এত পুলিশ! যখন, তখন চৌধুরীও কি নাই?

ও কি? কার নাম করে চেঁচিয়ে উঠছে আর কথা বলছে ভিড়ের মানুষগুলি?

চমকে ওঠে দাশু। ভিড়টা যেন একটা বিস্ময়ের মিছিলের মত ছটফট করে দাশুর ভীরু চোখের চাহনির একেবারে কাছে এসে পড়ে।

—চৌধুরী মরলে। চৌধুরীকে কাটলে। টাঙ্গি দিয়ে দুটা কোপ দিল রামাই-এর মাগ মঙ্গলী ; বাস্! চৌধুরীর ধড় আর মুড়া দুই ঠাঁই হয়ে গেল।

এ কি কথা বলে ওরা? গামছাটাকে কোমরে জড়িয়ে নিয়ে সড়কের কিনারা থেকে সরে এসে ভিড়ের কাছে দাঁড়ায় দাশু। ভিড়ের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। ভিড়ের সোরগোলের ভাষা শুনতে থাকে।

—হঁ হে, মঙ্গলীর ইজ্জত নাশ করতে চেয়েছিল মাতোয়াল চৌধুরীটা। এমন পিশাচকে কাটবে নাই কেনে মঙ্গলী?

—চুপ কর, চুপ কর! হাঁক ছাড়ে একটা পুলিশ।

—ঢের দিনের পাপের বিচার এক দিনেই হয় হে। সাদা চুলে ভরা মাথা দুলিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো যে বুড়োটা, তার কাছে এগিয়ে এসে ফিস ফিস করে দাশু—কি ব্যাপার বটে, কাকা?

বুড়ো বলে—রামাই দিগোয়ার চৌধুরীটাকে ঘরে বসা করাই ভিন গাঁয়ে দাগীর খবর করতে গিয়েছিল। চৌধুরীটা রামাই-এর মাগের হাত চেপে ধরলেক ; তখন রামাই-এর মাগ টাঙ্গি লিয়ে এইসে...। হোই দেখ না কেনে, কেমন ডাঁট করে বসে আছে মঙ্গলী।

আগে আগে চলেছে যে গো-গাড়িটা, তারই ভিতরে গদির উপর চুপ করে শক্ত হয়ে বসে আছে রামাই-এর মাগ মঙ্গলী। মঙ্গলীর কোমরে দড়ি। একটা পুলিশ সেই দড়ি টানা হাতে ধরে নিয়ে গো-গাড়ির পিছু পিছু হেঁটে চলেছে। মঙ্গলীর মাথার চুল ক্ষেপীর মাথার চুলের মত ছন্নছাড়া ও এলোমেলো হয়ে মুখের চারদিকে লুটিয়ে রয়েছে। তারই মধ্যে দেখা যায়, নিথর হয়ে রয়েছে মঙ্গলীর এক জোড়া শান্ত চোখ।

—রামাই দিগোয়ার ঘরে ফিরে এইসে চৌধুরীর মুড়াটার দিকে একবার লজর করে লিয়ে সেই যে ভাগলেক আর উয়ার পাত্তা নাই। হোই দেখ না কেনে...। বুড়া মাহাতো হাত তুলে পরের গো-গাড়িটা দেখিয়ে দিতে গিয়ে মুখ টিপে হেসে ফেলে।

গো-গাড়ির ভিতরে চৌধুরীর লাস খড় দিয়ে ঢাকা। শুধু পায়ের পাতা দুটো বের হয়ে আছে। চৌধুরীর লাসের ঠিক বুকটার উপর রক্তাক্ত কম্বলে জড়ানো একটা বস্তু পড়ে আছে। কম্বলের পোঁটলাটা বেশ খানিকটা ফাঁক হয়েও আছে। সেই ফাঁক দিয়ে চৌধুরীর নাকটা আর কর্কশ গোঁপের একটা গোছা উঁকি দিয়ে রয়েছে।

মুখ ফিরিয়ে নেয় দাশু। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ভিড়টা তেমনই বিস্ময়ের মিছিলের মত বিচিত্র হাঁকডাক আর চিৎকারে মুখর হয়ে গোবিন্দপুর থানার দিকে যাবার জন্য সোজা সড়ক ধরে এগিয়ে যেতে থাকে।

আর কতদূর? আর বেশিদূর নয়। এখান থেকে আস্তে আস্তে হাঁটা দিলে হারানগঞ্জে পৌঁছে যেতে এক ঘণ্টার বেশি সময় লাগবে না। একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে এগিয়ে যেতে পারা যাবে। হ্যাঁ, পাঁচ বছরের জন্য আবার কয়েদ হবার বিভীষিকা দাশুর ভাগ্যের পিছনে আর ধাওয়া করে ছুটে আসছে না। আস্তে আস্তে হাঁটা দিলেও চলবে।

ভিড়ের সোরগোল আর শোনা যায় না। জোরে একটা হাঁপ ছাড়ে দাশু। মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাতে গিয়েই দেখতে পায়, হারানগঞ্জের গির্জাবাড়ির চূড়ার উপর দিয়ে বড় সুন্দর বিজলীর চমক ছটফটিয়ে উঠলো।

চলতে থাকে দাশু।

নীরব সড়কের এক কিনারা ধরে ধীরে ধীরে হেঁটে এগিয়ে যেতে থাকে দাশু। হারানগঞ্জের গির্জার সেই শান্ত ও সুন্দর চেহারাটাও দাশুর ব্যাকুল চোখের ঘেয়ো চাহনির দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে থাকে। আর ঢের দূর নয় হারানগঞ্জ।

জেলা বোর্ডের রাস্তাটা এসে গোবিন্দপুর রোডের গা ছুঁয়েছে যেখানে, সেখানে এসে পৌঁছতেই একবার থমকে দাঁড়ায় দাশু। একটা বুড়ো বট ছিল এখানে সেটা আর নেই। নতুন একটা ইমারত দেখা যায়। ইমারতের গায়ে নানা রঙের ছবির বাহার, মাথার উপরে একটা চোঙা ; চোঙার মুখ থেকে কলের গানের ঝমঝমে আওয়াজ উথলে পড়ছে।

যেন ঝমঝমে হল্লার একটা নতুন জগৎ। কত মানুষ এসে ভিড় করেছে। হাসছে, কথা বলছে, হাঁকডাক করছে, ছটফটিয়ে ছুটোছুটি করছে। পয়সা দিয়ে মজা কিনবার বাজার বটে কি? তাই তো মনে হয়। কলের ছবির হাসা-কাঁদা দেখবার আর শুনবার জন্য কত মানুষ ভিড় করেছে।

পথ চলতে থাকে দাশু। কিন্তু পথটা আর নির্জন হয় না, নীরবও হয় না। দেখতে পায় দাশু, ছোট ছোট হল্লার উৎসব দাশুর আগুপিছু হেঁটে হেঁটে চলেছে। ছোট ছোট ভিড় কথা বলছে, হাসছে, হাঁকডাক করছে আর চলছে। এরা যায় কোথায়? কালীথানের মেলা কি শুরু হয়ে গেল?

দাশুর পিছন থেকে একটা লোক রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠে--তুমি আমাদিগে এমন দয়াটি না করলেই ভাল করতে হে সরদার?

মুখ ফিরিয়ে তাকায় দাশু। লোকটা বলে—এই রোগের শরীর নিয়ে তুমি আবার সভার ভিড়ে যাও কেন?

—কিসের সভা?

--ভোটের সভা।

--কোথায়?

—পাহাড়তলীতে।

দাশু হাসে--রাগ করবে না বাপ, আমি তোমাদিগের সভার ভিড়ে যাব না।

নতুন রেল লাইনের পাশে পাশে গড়িয়ে এসে একটা নতুন সড়ক যেখানে গোবিন্দপুর রোড ছুঁয়েছে, সেখানে এসে আবার থমকে দাঁড়ায় দাশু। সড়কটা ঝালদার দিক থেকে এসেছে বলে মনে হয়। কিন্তু এত শব্দ করে কেন, আর এত ধুলো উড়ায় কেন নতুন সড়কটা? কত রকমের শব্দ হু হু করে, গোঁ-গোঁ করে, হা-হা করে ছুটে আসছে।

ছুটে এল আর চলে গেল বড়-বড় মোটরগাড়ির মিছিল। মিলিটারির কামানগাড়ি, একটা দুটো নয়, দশটা বিশটা নয়, অনেক অনেক। মেঘলা আকাশের দিকে তাকিয়ে আর তাক করে গলা উঁচিয়ে রয়েছে কামানগুলি।

ধুলোর ঝাপটা সহ্য করবার জন্য চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে দাশু, আর শুনতেও পায়, পথের লোকগুলি হাততালি দিয়ে হল্লা করে উঠেছে,—এরা কাশ্মীরে গিয়েছিল হে। এক সাল হলো এরা লাইনে ছিল ; এইবার জিরাবার ছুটি মিলেছে, তাই রাঁচির পল্টনবারিকে ফিরে চলেছে।

হাঁটতে থাকে দাশু। কিন্তু সড়কের শব্দের উৎসব যেন ফুরাতে চায় না। বড় বড় মোটর লরিতে বোঝাই হয়ে লোহা-লক্কড়ের এক একটা ছোট ছোট পাহাড় ছুটে চলে গেল। পথের লোক বলে—ভুবনপুরের নতুন সীসাগালাই কারখানার মাল গেল হে।

চলতে থাকে দাশু। সড়কেরই পাশের মাঠে এক জায়গায় অনেক তাঁবু পড়েছে। তাঁবুর বাইরে ছোট ছোট বাক্সের উপর বসে বাবুরা পেয়ালা হাতে নিয়ে চা খাচ্ছে আর হাসাহাসি করছে। পথের ভিড় বলাবলি করে—এরা ধানবাদের খাদের ইস্কুল থেকে এসেছে হে। তামার

পাথরের খোঁজ নিতে এসেছে ভুবনপুর হতে শুরু করে মধুকুপি, সব মাটি এরা জরিপ করবে।

এগিয়ে যায় দাশু।

না, আর এই সড়ক ধরে এগিয়ে যেতে হবে না। এইবার সামনের মোড়ের কাছে পৌঁছে ডাইনের সড়ক ধরতে হবে। হারানগঞ্জ এসে গিয়েছে। গির্জাটা কত কাছে এসে পড়েছে।

এই তো হারানগঞ্জের কবরথান। আর ঢের দূর নয় রিচার্ড ডাক্তারের ফুলবাড়ি। পথের পাশের ঐ লাল রঙের বাড়িটার ফটকের কাছে যে ছোট রাস্তাটা বাঁয়ে চলে গিয়েছে, সেই রাস্তায় আরও কিছু দূর এগিয়ে গেলেই...।

কিন্তু ফটকের কাছে এসেই হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় দাশু। বাঁয়ের সেই ছোট রাস্তা ধরে আবার একটা মিছিল হাঁক দিতে দিতে ঝাণ্ডা দুলিয়ে এগিয়ে আসছে।

কিন্তু মিছিলটার জন্য নয়। মিছিলটাই কোন বাধা নয়, বিস্ময়ও নয়। মিছিলটার দিকে আর তাকায়ও না দাশু। ফটকের কাছে পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটা বিস্ময়ের দিকে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে দাশু।

রোদ নেই, মেঘে ছাওয়া আকাশ। তবু, ছোট্ট একটা রঙিন ছাতা মাথার উপর মেলে দিয়ে যেন ঝলমলে হাসির এক শ্যামলী রূপসী দাঁড়িয়ে আছে। মেঘলা দিনের ময়লা আভা ছাতার রঙিন কাপড় চুঁয়ে আর রঙিন আভাটি হয়ে রূপসীর মুখের উপর ছড়িয়ে পড়েছে।

মিছিলটার দিকে তাকিয়ে আছে আর হাসছে রূপসী। নরম-নরম ঠোঁট দুটোকে যেন গরব করে ফুলিয়ে ফুলিয়ে অদ্ভুতভাবে হাসছে। শাড়ির আঁচল ফুরফুর করে উড়ছে। গলার সোনার হার দুলছে। সোনার হারের পাথরে আর কালো চোখের তারা দুটোতে একই রকমের হাসি ঝিকমিক করে জ্বলছে।

শ্যামলী রূপসীর পাশে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দরতার এক শুভ্রা মূর্তি। তার ধবধবে সাদা চুলের খোঁপা এই মেঘলা দিনের ময়লা আভাতেও চিকচিক করে। লাল মুখে কী সুন্দর হাসি! নীল চোখে কী সুন্দর আলো! বাঁশ আর শালপাতা দিয়ে তৈরি একটা দেহাতী ছপি-ছাতা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন বুড়ো বয়সের এক মেম।

ওরা দুজনে হেসে হেসে মিছিল দেখছে। আর, দাশু ওদেরই দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মিছিলটা ডাক্তার রিচার্ড সরকারকে ভোট দেবার জন্য হাঁক দিয়ে আবেদন করছে। আর, ওরা দুজনে যেন প্রাণের খুশীতে বিভোর হয়ে মিছিলের হাঁকের শব্দ শুনছে।

চলে গেল মিছিলটা। চলন্ত মিছিলের দিকে এক হাত তুলে রুমাল দোলাতে দোলাতে হেসে ওঠে মুরলী, আর-এক হাতে রঙিন ছাতা কাত করে মুখের উপর রঙিন আভা ধরে রাখে। তার পরেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে।—চল দিদি।

—চল জোহানা। বলতে বলতে এক পা এগিয়ে যেয়েই চমকে ওঠেন সিস্টারদিদি।—মার্সি! মার্সি!

—কি বটে দিদি? চমকে ওঠে মুরলী।

—লেপার বটে। মানুষটার কুষ্ঠ হয়েছে। সিস্টারদিদির চোখ দুটো মায়াময় বেদনায় করুণ হয়ে দাশুর কুটিয়ার গতরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মুরলীও তাকায়। সেই মুহূর্তে রঙিন ছাতা দিয়ে মুখটা আড়াল করে দু পা পিছিয়ে সরে যায় মুরলী। রঙিন ছাতা থরথর করে কাঁপতে থাকে।

দাশুর কাছে এগিয়ে আসেন সিস্টারদিদি।—কোন চিন্তা নাই। কোন ডর নাই। তোমার রোগ আরাম হয়ে যেতে পারে।

—তুমি কি সিস্টারদিদি? সিস্টারদিদির মুখের দিকে তাকিয়ে দাশুর চোখের ঘেয়ো চাহনি যেন মুগ্ধ হয়ে ছলছল করতে থাকে।

সিস্টারদিদির নীল চোখ দুটো একটু আশ্চর্য হয়ে কেঁপে ওঠে।—কেন, তুমি কি আমাকে আগে কখনো দেখ নাই?

—না।

—আশ্চর্যের কথা! যা-ই হোক, তুমি বিশ্বাস কর, তোমার রোগ সেরে যাবে।

যেন সান্ত্বনার দেবী কথা বলছেন। কী মিঠা কথা, কী মিঠা চাহনি! দাশুর কুটিয়া শরীরের উপর যেন আরামের ওষুধ ঝরে পড়ছে। সিস্টারদিদির হাত দুটো যেন মায়া করবার জন্য ছটফট করছে ; দাশুর গায়ে এখনই বুঝি হাত বুলিয়ে দেবে সিস্টারদিদি।

সিস্টারদিদি--আমার আসাইলামে তোমাকে ভর্তি করে নিব। তুমি খাওয়া পাবে, কাপড় পাবে, বিছানা পাবে, ওষুধ পাবে, আর আমার সেবা পাবে।

হাত তুলে চোখ দুটো মুছতে চেষ্টা করে দাশু।—এত দয়া কেন দিদি?

সিস্টারদিদি—ভুল কথা বল কেন ম্যান? আমার দয়া নয়। তোমার আমার পরম পিতা যিনি, তাঁর দয়া।

—বড় ভাল কথা বটে, দিদি। মাথা হেঁট করে সিস্টারদিদির পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে দাশু।

এখন দেখলে তো দাশু? বুঝে দেখ, সিস্টারদিদিকে কত ভুল বুঝেছিলে। সিস্টারদিদির দয়ার রকমটি দেখ। সিস্টারদিদির মনে কোন হিসাব নাই। শুধু মায়ার লেগে মায়া করে সিস্টারদিদি।

এমন শান্তির ঠাঁই পেলে কে না জিরাবে বল? ছিয়া ছিয়া, মিছা রাগ করে মরণ চাও কেন, বল? হ্যাঁ দাশু, এত ভাল জিরাবার ঠাঁই আর কোথাও পাবে না। রাজি হয়ে যাও দাশু।

মুখ তুলে সিস্টারদিদির মুখের দিকে আবার তাকায় দাশু।

সিস্টারদিদি—বিশ্বাস করে একবার প্রেয়ার সাধলেই তোমার সব দুখের অবসান হয়ে যাবে। প্রেয়ারের চেয়ে মহৎ ওষুধ নাই।

চমকে ওঠে দাশু।—কিসের প্রেয়ার দিদি?

সিস্টারদিদি।—প্রেয়ার, প্রার্থনা। আসাইলামে রোজ দুইবার প্রার্থনা হয়। যারা ঈশাই মানে আর প্রার্থনা করে, তাদের উপর পরমপিতা বিশেষ দয়া করেন।

দাশু—আমাকে কি তুমি ঈশাই মানতে বলছো, দিদি।

সিস্টারদিদি—হ্যাঁ, তোমার মঙ্গলের জন্য বলছি।

দাশুর চোখের তারা দুটো জ্বলে জ্বলে হাসতে থাকে—না দিদি।

—কি বললে? দুই চোখের চাহনি টান করে কথা বলেন সিস্টারদিদি।

—আমাকে খিরিস্তান হতে বলো না।

—কিন্তু খিরিস্তান না হলে আমি তোমাকে আসাইলামে ঠাঁই দিব কেমন করে?

—দিবে না তো দিও না।

—বহুৎ আচ্ছা! কিন্তু আমি তোমার সেবা ছেড়ে দিতে চাই না। সপ্তাহে একটিবার যদি আসাইলামের হাসপাতালের বাহির দরজায় এসে দাঁড়াও, তবে ওষুধ পাবে। তাতে যদি বাঁচ তো বাঁচবে।

—না।

—কি? ভ্রূকুটি করেন সিস্টারদিদি।

—তোমার ওষুধ নিতে আমার সাধ নাই।

সিস্টারদিদির নীল চোখের চাহনি কাঁপতে থাকে।—তা হলে এই রোগের গরলে তোমার দেহ যে গলে যাবে।

—যাক না কেন?

—রোগে ডর নাই?

—না।

—কেন?

—এই রোগ রোগ নয়।

—তবে কি?

—কপালবাবার খেলা।

—কার খেলা? সিস্টারদিদির চোখ দপ করে জ্বলে ওঠে।

দাশু শান্তভাবে হাসে—কপালবাবার খেলা বটে গো, দিদি।

সিস্টারদিদি—কে সে?

কপালের মাঝখানে হাতের একটা ভোঁতা আঙুল চেপে ধরে হাসতে থাকে দাশু—এই!

—যাও! চেঁচিয়ে ওঠেন আর মুখ ফিরিয়ে নেন সিস্টারদিদি।

দাশু—যাব দিদি, যাব। তোমার হারানগঞ্জে ঠাঁই নিতে আমি আসি নাই।

সিস্টারদিদি—ভিখ মাগতে এসেছ বোধহয়?

দাশু—না।

সিস্টারদিদি—তবে কেন এসেছ?

দাশু—আমার ছেইলাকে দেখতে এসেছি।

—তোমার ছেলে? ওয়েল্...তোমাকে পাগল বলে মনে হয়।

—পাগল মনে কর যদি, তবে কর। কিন্তু আমার ছেইলা এখানে আছে।

—কোথায় আছে?

—ওই যে, ওর কাছে আছে।

—কার কাছে? দাশুর হাতের ইঙ্গিতটার দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠেন সিস্টারদিদি। পাগলটা হাত তুলে জোহানাকে দেখিয়ে দিয়ে মুখ টিপে হাসছে। কিন্তু, কী আশ্চর্য জোহানার রঙিন ছাতাটা থরথর করে কাঁপছে। ছাতার আড়ালে মুখ লুকিয়ে আছে কেন জোহানা?

—জোহানা? লোকটা এমন মিথ্যা কথা বলে কেন? চেঁচিয়ে ডাকতে গিয়ে সিস্টারদিদির গলার স্বর ভীরু হয়ে ফিসফিস করে।

ছাতার আড়ালে তেমনি মুখ লুকিয়ে রেখে যেন রঙিন রাগের নাগিনীর মত হিসহিস করে ওঠে মুরলী—মিথ্যা কথা নয় ; ভুলে যাও কেন, দিদি?

সিস্টারদিদি—এই কি তোমার সেই...।

মুরলী—হ্যাঁ।

দাশুর গলার স্বর একেবারে নরম হয়ে গিয়ে যেন আবেদন করে—ওকে বল দিদি, এখনি আমার ছেইলাকে নিয়ে এসে আমার নজরের কাছে একবার রাখুক।

রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে সিস্টারদিদি শান্ত স্বরে বলেন—তোমার ছেলে এখন ঈশ্বরের ছেলে হয়ে গিয়েছে, তাকে দেখে তোমার লাভ কি?

—কি বললে দিদি? আমার ছেইলা কি তবে আর নাই?

—আছে আছে ; অনাথবাড়ির দয়াতে মায়াতে আর আদরে সে ছেলে খুব ভাল আছে।

—অনাথবাড়িতে? চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

—হ্যাঁ। মৃদু স্বরে উত্তর দেন সিস্টারদিদি।

হেসে ফেলে দাশু।—তোমার বহিনকে তুমি এটা কেমন সুখ দিলে দিদি?

—কি বললে?

—পেটের ছেইলাকে কোলে নিতে পারলে না যে, সে মানুষ কেমন সুখের মানুষ বটে?

সিস্টারদিদি—বাস্, তুমি এখন যাও।

—আমার ছেইলাকে দেখাও, তবে যাব।

সিস্টারদিদি—ওই দেখ।

লাল রঙের যে বাড়িটার ফটকের কাছে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে কথা বলছেন সিস্টারদিদি, সেই বাড়িটার বারান্দার দিকে হাত তুলে দাশুকে কি যেন দেখতে বলেন!

—কি দেখতে বলছো দিদি? আশ্চর্য হয়ে বাড়ির বারান্দার দিকে তাকায় দাশু। দেখতে থাকে দাশু, ভাল করে হাঁটতে পারে না আর হামা দেয়, এমন বয়সেরও ছেলেমেয়ে বারান্দার সেই লিখা-পড়ার ঠাঁই-এর কাছে কিলবিল করছে। একটা বুড়ি মানুষ বারান্দার এক কোণে বসে, মাথার সাদা চুলের ঝুঁটি মেলে দিয়ে আর চোখ বন্ধ করে ঢুলছে।

বারান্দার উপর একদল ছোট ছোট ছেলে আর মেয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে। একটি ডাগর মেয়ে খড়ি হাতে নিয়ে একটা কালো তক্তার উপর কি-যেন দাগছে আর বলছে, সঙ্গে সঙ্গে গলা মিলিয়ে সুর করে চেঁচিয়ে উঠছে ছোট-ছোট ছেলেমেয়ের দল।

কালো তক্তার উপর খড়ি দিয়ে আঁক দেগে হাঁক দিল ডাগর মেয়েটি।—নয়ের পিঠে নয় এল এল।

ছোট-ছোট ছেলেমেয়ের দল সুর করে চেঁচিয়ে ওঠে—নিরানব্বই বল বল।

ডাগর মেয়েটি বেণী দুলিয়ে কালো তক্তার উপর আবার খড়ির দাগ দেগে দুলতে থাকে ঃ দশের পিঠে শূন্য এল।

ছেলেমেয়ের দল ছটফট করে চেঁচিয়ে ওঠে—এক শত বল বল।

—শতকিয়া খতম বল। খড়ি ফেলে দিয়ে হাত তুলে হাঁক দেয় ডাগর মেয়েটি।

শতকিয়া খতম! শতকিয়া খতম! কলকল করে আর লাফিয়ে বারান্দা থেকে নেমে বাগিচার চারদিকে ছুটোছুটি করতে থাকে ছেলেমেয়ের দল। গায়ে সাদা কাপড়ের হাতকাটা জামা, আর পরনে কালো কাপড়ের জাঙ্গিয়া, অনাথবাড়ির আদরে পোষা এক দল খুশির খরগোশ ছুটোছুটি করছে।

—এইবার যাও। দাশুর হতভম্ব চোখের দিকে তাকিয়ে আবার হাঁক দেন সিস্টারদিদি।

দাশু—কেন যাব? আমার ছেইলা কই?

সিস্টারদিদি—ওদেরই মধ্যে আছে। যাকে খুশি তাকে তোমার ছেলে বলে ভেবে নাও, আর খুশি হয়ে চলে যাও।

—না, সে হয় না।

—কেন? ওদের দেখতে কি ভাল লাগে না?

—খুব ভাল লাগে। বেঁচে থাকুক ওরা। কিন্তু...।

—আবার কিন্তু কিসের? তোমাকে বড় জেদী মানুষ বলে মনে হয়। বিরক্ত হয়ে ধমক দেন সিস্টারদিদি।

দাশু—ধমক দিও না দিদি। আমার হাড়মাসে জন্ম নিলে যে, তাকে আমি একবার দেখে নিয়ে চলে যেতে চাই। তুমি মানা করবার কে?

সিস্টারদিদির কানের কাছে ফিসফিস করে কি-যেন বলে মুরলী। আর সিস্টারদিদিও অনাথবাড়ির বারান্দার দিকে তাকিয়ে ডাক দেন—আনিয়া বহিন।

বারান্দার কোণ থেকে জনের মা আনিয়া বুড়ির ঢুলে পড়া মাথাটা হঠাৎ চমকে ওঠে। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে জনের মা আনিয়া বুড়ি।—কি বটে? কি আজ্ঞা হয় দিদি?

সিস্টারদিদি—জোহানার যে ছেলে অনাথবাড়িতে আছে, সেই ছেলেকে...

আনিয়া বুড়ি মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত এক উল্লাসের জ্বালায় যেন নাচতে থাকে—হঁ হঁ দিদি, বড়টি হয়েছে সেই ছেইলা। জোহানা বহিন কি ছেইলার মুখ দেখবে,

দিদি?

মুখ ফিরিয়ে নেয় মুরলী। সিস্টারদিদি গম্ভীর হয়ে বলেন—সেই ছেলেকে একবার নিয়ে এস।

নাচতে নাচতে চলে যায় জনের মা আনিয়া বুড়ি। অনাথবাড়ির বাগিচায় খরগোশের পালের মত হুটোপুটি করছে যারা, তাদেরই ভিতর থেকে একটা ছোট্ট মানুষকে খপ্ করে ধরে আর কোলে তুলে নিয়ে আবার নাচের ভঙ্গিতে লাফাতে লাফাতে ফটকের কাছে ছুটে এসে বিড় বিড় করে—গড বাবা দয়া করেন।

কিন্তু হঠাৎ ভয় পেয়ে আর রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠে আনিয়া বুড়ি।—হায় গড, কুটিয়াটা এখানে দাঁড়িয়ে আছে কেন গো?

গায়ের কাপড়ের আঁচল দিয়ে ছেলেটাকে ঢেকে এক লাফ দিয়ে সরে গিয়ে পথের পাশের একটা কচি কদম গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে আনিয়া বুড়ি।

এক-পা দু-পা করে কচি কদমের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে দাশু। সিস্টারদিদি চেঁচিয়ে ওঠেন—সাবধান, তোমার এই রোগের দেহ নিয়ে তুমি লিট্‌ল বাবার কাছে যাবে না।

দাশু—না, খুব কাছে যাব না দিদি। আমি একটুক দূরে দাঁড়িয়ে দেখবো। কিন্তু, ছেইলার মুখ ঢাকা দেয় কেন বুড়িটা?

সিস্টারদিদির ইসারা পেয়ে আনিয়া বুড়ি ছেলেটার মাথা থেকে আঁচলের ঢাকা সরিয়ে দেয়। বছর আড়াই বয়স, মোটা-সোটা ফোলা-ফোলা গাল, মাথাটা কোঁকড়া চুলে ঠাসা, ছেলেটা আনিয়ার কোল থেকে নেমে যাবার জন্য ছটফট করে হাত-পা ছুঁড়তে থাকে।

—বাপার কেমন সুন্দর দাঁত হয়েছে গো! মাথা ঝেঁকে হিহি করে হাসতে থাকে দাশু।—কিন্তু বাপাকে সুখে রাখবে কি কপালবাবা? দুই চোখ চিকচিকিয়ে আর ঠোঁট কাঁপিয়ে বিড়বিড় করে দাশু।

সিস্টারদিদি—ব্যস্, নো মোর, তুমি সর, তুমি যাও।

দাশু হাসে।—বাপা বড় ভাল চুমা দিতে জানে মনে হয়।

আনিয়া বুড়ি ভয় পেয়ে ভ্রূকুটি করে।—জানে তো, কিন্তু তাতে তোমার কি? তুমি সর না কেন?

দাশু—বাপা একবার চুমা দিক না কেন?

—হেই! গর্জন করে ওঠে আনিয়া বুড়ি।

দাশু হাসে।—আমাকে নয় গো। এই গাছটাকে চুমা দিক বাপা।

আনিয়া বুড়ি ভ্রূকুটি করে।—তামাসা বটে কি? কি ভেবেছ তুমি?

দাশু—তামাসা নয় বুড়ি মা। দেখতে সাধ হয়, বাপা কেমনটি চুমা দিতে শিখলে।

আনিয়া বুড়ির কাঁকাল কাঁপিয়ে দিয়ে ছেলেটা আবার ছটফটিয়ে ওঠে। যেন একটা দুরন্ত আহ্লাদের খেলার ইঙ্গিত বুঝতে পেরেছে ছেলেটা। মাথা হেলিয়ে কচি কদমের গায়ে মুখ ঠেকিয়ে দিয়ে হাসতে থাকে।

নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে দাশু। কচি কদমের গায়ে ছেলেটার মুখের লালা লেগে ছোট্ট একটা ভেজা-ভেজা ছাপ ফুটে উঠেছে। সেই ছাপের দিকে তাকিয়ে পিপাসিতের মত ছটফট করে চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।—তুমি এখন সর বুড়ি মা, জলদি সরে যাও।

আনিয়া বুড়ি সরে যায়। ছেলেটাকে কোলের উপর শক্ত করে চেপে ধরে একটা দৌড় দেয়। অনাথবাড়ির একটা ঘরের কাছে এসে ছেলেটাকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে হাঁপ ছাড়ে আর হাঁপাতে থাকে আনিয়া বুড়ি।

আর, কচি কদমটার গায়ের উপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে দাশু। দু হাতে গাছটাকে জড়িয়ে ধরে, ছেলেটার লালায় ভেজা ছাপের উপর মুখটাকে চেপে ধরে আর চোখ বন্ধ করে কাঁপতে

থাকে।

সিস্টারদিদির চোখ দুটোও চমকে চমকে কাঁপে। লোকটা কেঁপে কেঁপে কাঁদছে? না, হাসছে? ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

কী ভয়ানক কালো হয়ে গিয়েছে হারানগঞ্জ! আকাশ জুড়ে কালো মেঘ নিরেট হয়ে গিয়েছে। জোর হাওয়া ছুটতে শুরু করেছে। আকাশের সব দিকে লিকলিকে বিদ্যুতের সাপ ঝিলিক দিয়ে খেলছে। ডাঙার ওপারে অনেক দূরে, শালবনের উতলা চেহারার পিছনে ডরানির স্রোতটাও গোমরাতে শুরু করে দিয়েছে।

--চল জোহানা, চল। দিশেহারা পলাতক মানুষের মত হঠাৎ ভয় পেয়ে আর ব্যস্ত হয়ে ডাক দেন সিস্টারদিদি।

—চল দিদি, চল। মুরলীর গম্ভীর মুখটা যেন একটা আতঙ্কের রব ছেড়ে কাঁপতে থাকে।

আকাশ-জোড়া কালা বাদলের দিকে তাকিয়ে আর একেবারে নীরব হয়ে ওঠে দাশু। ঝুরঝুর করে বৃষ্টি ঝরে পড়ে।

অনাথবাড়ির ছেলেমেয়ের দল বাগিচা থেকে ছুটে গিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে। ফটক পার হয়ে অনাথবাড়ির বারান্দার দিকে ছুটে চলে যান সিস্টারদিদি। শন্ শন্ করে একটা ক্ষেপা হাওয়ার ঝাপ্টা এসে মুরলীর রঙিন ছাতার উপর আছড়ে পড়ে। কিন্তু এগিয়ে যেতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় মুরলী।

যার মুখটা না দেখবার জন্য এতক্ষণ ধরে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়েছিল মুরলী, সেই লোকটা মুরলীরই পাশ কাটিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে চলে গেল।

একটা কথাও বলল না, মুরলীর চোখের এত কাছে এসেও একবার থমকে দাঁড়াল না। কিন্তু মুরলীর মুখটার দিকেও কি একবার তাকায় নি? তাকায় নি বোধহয়। তা না হলে এত সহজে একেবারে উদাসী সাধুর মত চুপ করে চলে যায় কেমন করে?

কতদূর গিয়েছে? মুখ ফিরিয়ে হঠাৎ পিছন দিকে তাকায় মুরলী। আর, তাকাতে গিয়েই ডাক দিয়ে ফেলে—শুনছো।

মুখ ফিরিয়ে তাকায় দাশু। ঝুরু ঝুরু বৃষ্টির ধারা যেন একটা-ঝাপসা পর্দা। মুরলীর মুখটাকে স্পষ্ট দেখা যায় না। কিন্তু আবার শুনতে পায় দাশু, যেন ঝালদার মহেশ রাখালের বেটির গলার স্বর ব্যাকুল হয়ে ডাকছে—শুনছো!

হ্যাঁ, মুরলীই ডাকছে। ওই তো দাঁড়িয়ে আছে মুরলী। ঝড়ের হাওয়ার মধ্যে কেমন শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে, সেই পুরনো গলার স্বর উতলা করে দিয়ে ডাকছে। কিন্তু ডাকে কেন মুরলী? এটা আবার তোমার দয়ার কোন্ মজা বটে কপালবাবা? মুরলী কি দাশু কিষাণকে ওর রংদার ছাতার তলে ঠাঁই নিতে ডাকছে?

—একটা কথা বলতে চাই ; শুনে যাও। ঝুরু ঝুরু বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে যেন গলার স্বরের একটা মিঠা মায়া মিশিয়ে দিয়ে, যেন দাশুর অভিমান ভাঙবার জন্য আবার ডাক দিয়েছে মুরলী।

—কি কথা? বলতে গিয়ে দাশুর পা দুটো টলমল করে ওঠে।

মুরলী—ভাল কথা বলতে চাই, কাছে এসে শুন।

ভাল কথা! দাশু কিষাণের প্রাণের অন্তিমটাকে কাছে ডেকে নিয়ে ভাল কথা বলতে চায় নতুন সুখের রূপসী মুরলী? কিন্তু মুরলীর মুখে ভালকথা শুনতে পেলে দাশুর জীবনে আবার যে জিরোবার সাধ হেসে উঠবে।

তা খারাপ কিসের দাশু? মুরলী যদি মায়া করে বলে, তুমি যেও না, তবে যেয়ে কাজ কি? মুরলীর কাছে আর ঠাঁই হবে না। নাই হোক, মুরলীর ভাল কথার মায়ার কাছে এসে ঠাঁই নাও না কেন, বেঁচে থাক না কেন? বুঝতে পার না কেন, মুরলী তোমাকে আজও ভুলে

নাই?

আস্তে আস্তে হেঁটে মুবলীর কাছে এসে দাঁড়ায় দাশু।—কি ভাল কথা বলতে চাও?

মুরলী—তোমার ভালর লেগে বলছি।

দাশু—বল।

রঙিন ছাতার হাতলটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে ফিসফিস করে মুরলী—তোমার মরণ ভাল।

—হ্যাঁ, বড় ভাল কথা বটে। হেসে ফেলে দাশু।

যেমন বড় বড় শিলা, তেমনই জলের মোটা মোটা ধারা ; আর, তেমনি শনশনে ঝড়ের বাতাস। হারানগঞ্জের ডাঙার উপর যেন আকাশভাঙা একটা ভয়ানক আক্রোশ লুটিয়ে পড়তে শুরু করেছে। ডাঙার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।—ও কিসের আওয়াজ? ডরানির জলের আওয়াজ বটে কি?

মুরলী বলে—হ্যাঁ।

সড়ক ছেড়ে দিয়ে একটা দৌড় দিয়ে ডাঙার উপর নেমে পড়ে দাশু। তার পরেই না, আর স্পষ্ট ক'রে কিছু দেখা যায় না। একটা ছুটন্ত তৃষ্ণা যেন খর-বৃষ্টির ধারার ভিতর দিয়ে গলে গলে ক্ষয় হতে হতে ডরানির ক্ষেপা জলের দিকে ছুটে চলে গেল।

আস্তে আস্তে হেঁটে এগিয়ে যেয়ে অনাথবাড়ির বারান্দার উপর উঠে সিস্টারদিদির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে মুরলী।

ঝাপসা হয়ে গিয়েছে হারানগঞ্জ। গির্জার চূড়া আর দেখতে পাওয়া যায় না। অনাথবাড়ির বারান্দার উপরে দাঁড়িয়ে জলবাতাসে ক্ষেপা শব্দ আর বাজের শব্দ শুনতে শুনতে বধির হয়ে গিয়েছে কান, তা না হলে শুনতে পেতেন সিস্টারদিদি, মুরলীও শুনতে পেত, তিন ঘণ্টার মধ্যে তিনবার কাতর-স্বরে চেঁচিয়ে হাঁক দিয়েছে জনের মা আনিয়া বুড়ি—তোমরা ঘরের ভিতরে গিয়ে বস না কেন জোহানা বহিন।

এই বধিরতা ভাঙে তখন, যখন জনের মা আনিয়া বুড়ির গলার স্বর দুজনের একেবারে কাছে এসে হেসে ওঠে।—গড বাবা দয়া করেন। ভাবি নাই, এত জলদি এমন পাগলা বাদল ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

ঝড় থেমেছে, বৃষ্টিও নেই। কী আশ্চর্য, হারানগঞ্জের ভেজা ডাঙার উপর মরা বিকালের শেষ রোদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। আর, আকাশের উত্তর-দক্ষিণ জুড়ে ঝলমলে একটা রামধনু ফুটে উঠেছে।

ডাঙার শেষে শালবনের আড়ালে ডরানির ক্ষেপা জলের গুঁড়ো উপরে ভেসে উঠে শালবনের মাথার উপরে সাদা ধোঁয়ার মত থমকে রয়েছে। সেই দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে কথা বলেন সিস্টারদিদি—লোকটা তোমাকে কি কোন কথা বলে গেল, জোহানা?

ঝলমলে রামধনুটার দিকে অপলক গম্ভীর চোখের চাহনি তুলে ধরে মুরলীও আস্তে আস্তে বলে—না দিদি, আমি ওকে একটা ভাল কথা বলে দিলাম।

সিস্টারদিদি—ভাল কথা?

মুরলী—হ্যাঁ।

সিস্টারদিদি—কি কথা?

মুরলী—বলে দিলাম, তোমার মরণ ভাল।

চমকে ওঠেন সিস্টারদিদি—তাই কি লোকটা ক্ষেপার মত ছুটে চলে গেল?

মুরলী—হ্যাঁ।

সিস্টারদিদি—কোথায় গেল?

মুখ ফিরিয়ে, সিস্টারদিদির মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে আর নরম ঠোঁট দুটোকে কুঁকড়ে

দিয়ে কথা বলে মুরলী—সে কথা মিছা আর শুধাও কেন দিদি?

—জোহানা! সিস্টারদিদির গলার স্বর শিউরে ওঠে।

মুরলী—হ্যাঁ দিদি, লোকটা মরণ নিতে ডরানির ক্ষেপা জলের কাছে ছুটে চলে গেল। ও আর এখন তোমার দুনিয়াতে নাই।

ওঃ, ওঃ, ওঃ! ভয়ানক ভীরু একটা আর্তনাদের শিহর চাপতে গিয়ে কেঁপে কেঁপে কথা বলেন সিস্টারদিদি।—তুমি ভয়ানক ভুল কথা বলেছ জোহানা।

—সিস্টারদিদি! চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী। মুরলীর কালো চোখ দুটো হঠাৎ সাদা হয়ে যায়।

সিস্টারদিদির চোখে ছোট একটা ভ্রূকুটি শিউরে ওঠে।—আমাকে আবার কি বলতে চাও?

মুরলী—বলতে চাই, তুমি তো ওকে আগেই মেরে রেখেছিলে, আমি শুধু ওর লাস গুম করে দিলাম।

—কি বললে, জোহানা? সিস্টারদিদির সাদা চুলের খোঁপা কাঁপতে থাকে।

চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী—তুমি ওকে তোমার সাধের আসাইলামে ঠাঁই দিতে পারলে না কেন?

সিস্টারদিদি—জানি না।

মুরলী—খুব জান, জবাব দাও দিদি।

সিস্টারদিদি—না।

মুরলী—না বললে চলবে না, দিদি। আমি আজ তোমার জবাব না নিয়ে...

ডিং ডাং! ডিং ডাং! গির্জার ঘণ্টা বাজতে শুরু করে দিয়েছে! হঠাৎ চুপ হয়ে যায় মুরলী। সিস্টারদিদির কাছ থেকে জবাব নেবার আর উপায় নেই। সিস্টারদিদির মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে, বুকের ওপর দুহাত ভাঁজ করে ক্রশ ধরেছেন, আর মনে মনে প্রেয়ার সাধতে শুরু করেছেন।

আজ আর তবে গির্জা যাবেন না সিস্টারদিদি। রঙিন ছাতাটা হাতে নিয়ে, বারান্দা থেকে নেমে আর দুলে দুলে হাঁটতে হাঁটতে সড়কের উপরে উঠেই থমকে দাঁড়ায় মুরলী। মুরলীর দুই চোখ যেন কাচের তৈরী দুটো চমৎকার চোখ, চিকচিক করে হাসতে থাকে। বোধহয় দেখতে পেয়েছে মুরলী, রিচার্ড সরকারের জন্য ভোট হাঁকতে হাঁকতে সেই মিছিলটা আবার এদিকেই ফিরে আসছে।

গল্প

গানের চেয়ে বেশি

বেহালার নতুন রাস্তার ধারে পাশাপাশি তিনটি নতুন বাড়ি। এদিকের বাড়িটা হল মুক্তাকণা মিত্রের বাবা সঞ্জয় মিত্রের বাড়ি। আর ওদিকের বাড়িটা হল বিদুলা সেনের কাকা পার্থ সেনের বাড়ি। মাঝের বাড়িটা ভাড়া খাটে ; বাড়ির মালিক দাশগুপ্ত মশাই থাকেন নিউ শ্যামবাজারে।

মাঝের বাড়িটা বেশ কিছুদিন খালি থাকার পর, সেই বাড়িতে ভাড়াটিয়া হয়ে যারা এসেছে, তারা হল এক পরিবার। এসেছেন এক অপ্রবীণ বয়সের ভদ্রলোক, তার মা আর তার দুটি ভাই-বোন। দেখে বোঝাই যায়, এখনও বিয়ে করেননি ভদ্রলোক। আরও বোঝা যায় বছর দশেক আগে বিয়ে করলেই ভাল করতেন ভদ্রলোক। চেহারাটা তেমন কিছু কাঁচা-বয়সের চেহারা নয়।

সঞ্জয় মিত্র আর পার্থ সেন কিন্তু ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রথম দিনেই নিজেদের মধ্যেই বলাবলি করলেন—বেশ ছেলেটি!

তিন বাড়ির এই মাঝের বাড়িতে যে রায়-পরিবার ভাড়াটিয়া হয়ে থাকতে এসেছে তারা নিশ্চয়ই চিরটা কাল এখানে থাকতে আসেনি। কিন্তু কতদিন থাকবে? কি বলে ছেলেটি? সঞ্জয় মিত্র খোঁজ নিয়েছেন, পার্থ সেনও খোঁজ নিয়েছেন। জানতে পেরেছেন দু'জনেই, মাত্র এক বছর এরা এই বাড়িতে থাকবার জন্য এসেছে। ছেলেটি অর্থাৎ পরমেশ রায় ভারত সরকারের হিসাব বিভাগে বেশ ভালো মাইনের একটা সার্ভিসে আছে। কলকাতার অফিসে মাত্র এক বছরের জন্য কাজ করবে পরমেশ, তার পরেই আবার বদলি। বোধহয় ডিব্রুগড়েই চলে যেতে হবে।

—উঃ, এত দূরে? সঞ্জয় মিত্র আর পার্থ সেন, দু'জনেই যেন একটু চিন্তিত হয়ে পড়েন।

পরমেশ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ ও পরিচয় হবার পর আরও বেশি চিন্তিত হয়ে পড়লেন সঞ্জয় মিত্র আর পার্থ সেন। প্রায়ই চা-খাওয়ার নিমন্ত্রণ পায় পরমেশ। কোনদিন সকালে সঞ্জয় মিত্রের বাড়িতে, কোনদিন সন্ধ্যায় পার্থ সেনের বাড়িতে।

মাত্র এই তো ব্যাপার। কিন্তু এরই মধ্যে পাড়ার নিন্দুকেরা আড়ালে ফিসফাস করতে শুরু করে দিয়েছে, জামাই বাগাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন পার্থ সেন আর সঞ্জয় মিত্তির।

নিন্দুকেরা ভুল ধারণা হয়তো করেনি, কিন্তু নিন্দুকদের ধারণা সত্য হবে বলে মনে হয় না। পাড়ার মেয়েরা সবার আগে বুঝতে পেরেছেন, সঞ্জয় মিত্তির আর পার্থ সেন যে আশায় একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, সে আশা নিতান্তই ভুল আশা। পরমেশের মা নিজেই কথায় কথায় বলে ফেলেছেন—ছেলে বিয়ে করতে চায় না। আমি দশ বছর ধরে বলে বলে হার মেনেছি, কিন্তু সব বৃথা। ছেলে যেন ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ধরেছে।

সঞ্জয় মিত্র আর পার্থ সেনের বাড়িতেও এই সমস্যা। দুই বাড়িতে যেন দুটি মেয়ে ভীষ্ম রয়েছে। মুক্তা মিত্র বিয়ে করতে চায় না ; বিদুলা সেনও বিয়ে করতে চায় না।

বি-এ পাশ করার পর আজ প্রায় পাঁচ বছর হল, মুক্তা মিত্র যেন ইচ্ছে করেই এই বাড়ির একটি ঘরের এক কোণে পড়ে আছে। একটি তানপুরা, আর এক গাদা স্বরলিপির বই, এই নিয়ে মুক্তা মিত্র তার নিজের মনের জগতে লুকিয়ে আছে। গানকেই প্রাণ দিয়ে ভালবাসে মুক্তা। শুধু গান আর গান। মুক্তার জীবন যেন এই সংসারের সব মায়া থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এক সুরলোকের নীড়ে, মীর মূর্ছনা গমক আর ঝংকারের মায়ার মধ্যে মুগ্ধ হয়ে বসে আছে।

পিসিমা খুবই বিরক্ত হয়ে মাঝে মাঝে সঞ্জয়বাবুর সঙ্গে ঝগড়াও করেন।—গান-উলীর বয়স কত হল ভেবে দেখ সঞ্জু। কোন্ মুখে আর মেয়েটি মেয়েটি করছিস? মেয়ের বিয়ে

দিবি কবে? আমার মতো যখন চুল পেকে শনের নুড়ি হবে, তখন?

পার্থ সেনের ভাইঝি ঐ মেয়েটি, ঐ বিদুলা সেনও বিয়ে করবে না। কখনও না। আই-এ ফেল করার পর থেকে সেই যে ছুঁচ কাঁটা কুরুশ নিয়ে সেলাই-এর বাতিক ধরেছে, তো ধরেইছে। সে-ও তো প্রায় আট বছর হল। দিবারাত্রি শুধু রঙীন সুতো নিয়ে এক বাতিকের খেলা। শুধু ফুল তোলা আর নক্সা আঁকা। বড়দাও রাগ করে বলেন—এতই যদি পারিস, তবে একটা দরজীর দোকান দিয়ে ফেল না বিদুলা!

বিদুলা বলে—শুধু দরজীর দোকান কেন, আমি একটা রান্নার দোকানও দিতে পারি। এখুনি যে আমারই হাতের তৈরি পাঁচটা মাছের-চপ টপাটপ খেয়ে ফেললে, সেগুলি খেতে খারাপ লাগল?

বড়দা—তবে তাই কর। একটা রান্নার দোকান দিয়ে ফেল।

বিদুলা—তা হলে তো একটা মাথা-টেপার দোকানও দিতে হয়।

বড়দা—কি বললি?

বিদুলা—তুমিই তো বলেছ, আমি তোমার মাথা না টিপে দিলে ফিজিক্সের কোন ফর্মূলাই তোমার মনে পড়ে না। পড়াতে গিয়ে ছেলেদের কাছে নাকাল হও।

অধ্যাপক বড়দা সত্যিই একটু নাকাল হয়ে তারপর একটু হেসে ফেলেন।

বেহালার নতুন সড়কের পাশে নতুন তিনটি বাড়ির উপর দিবারাত্রি নিমেষের ছায়া দোলে, কিন্তু তিন বাড়ির জীবনের ভিতরের সমস্যা একটু দোলে না। সমস্যাটা তেমনি নিরেট হয়ে রয়েছে।

কিন্তু এমন সমস্যার কারণটাই বা কি? কেন বিয়ে করতে চায় না মাঝের বাড়ির পরমেশ? বিয়ের নামে এত ভীত হয়ে পড়ে কেন এই বাড়ির মুক্তা, আর ওই বাড়ির বিদুলা?

পরমেশের মা'র সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করার পর পিসিমার মুখে যে সব কথা ফুটতে থাকে সে-সব কথা শুনলে মনে হয়, হ্যাঁ, তাই হবে বোধহয়। সমস্যার কারণটা প্রায় আন্দাজ করতে পেরেছেন পিসিমা।

পরমেশের মা'র কাছে পিসিমা বলেন—আমার কি মনে হয় জান? বয়স একটু বেশি হয়ে গেলে বিয়ে করবার মনই হারিয়ে ফেলে।

পরমেশের মা হাসেন।—আমার ছেলে কিন্তু দশ বছর আগে থেকে, যখন বলতে গেলে ছেলেমানুষই ছিল, তখন থেকেই বিয়ের নামে শুধু না-না করেছে, আজও তাই করছে।

পিসিমা বলেন—তা'হলে বলতে হয়, এরা মনের মতো জন খুঁজে পাচ্ছে না বলেই বিয়ে করছে না।

পরমেশের মা বলেন—কিন্তু মনের মতো হয় না কেন বলুন? আমার ছেলের কথাই ধরুন না, কত ভাল মেয়ে দেখিয়েছি, কিন্তু মনে তো ধরল না।

পিসিমা—তা হলে বুঝতে হয় যে, এরা ছাই বুঝতেও পারে না, মনের মতো জন কে হতে পারে। যেমন আপনার বাড়ির ছেলে, তেমনি আমার বাড়ির মেয়ে আর তেমনি হল পার্থ সেনের ভাইঝিটা।

গড়িয়ে চলে দিন, সমস্যাটাও তেমনি থিতিয়ে থাকে, দেখতে দেখতে একটা মাসও পার হয়ে যায়। শুধু পরমেশকে দেখা যায়, কখনও সঞ্জয়বাবুর বাড়িতে, কখনও বা পার্থবাবুর বাড়িতে, চা-এর নিমন্ত্রণে যায়। মুক্তার সঙ্গে চা-এর আসরে যেমন আলাপ-পরিচয় হয়েছে পরমেশের, তেমনি বিদুলার সঙ্গেও হয়েছে। দু'দিকে দুই বাড়িতে দুই মেয়ের সঙ্গে শুধু নমস্কার বিনিময় করে চলে এসেছে মাঝের বাড়ির ছেলে পরমেশ।

ঘটনার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে সন্দেহ করার মতো কিছু দেখতে পাওয়া যায় না। যারা নিন্দে করতে চায় তারাও ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, কোন বাড়ির চা বেশি মিষ্টি মনে

হয়েছে পরমেশের!

সঞ্জয় মিত্র ভাবেন, মাঝের বাড়ির পরমেশ এখানে দশ বছর থাকলেই বা কি হবে? পার্থ সেন ভাবেন, ওরা ডিব্রুগড় চলে গেলেই বা কি আসে যায়?

এক মাসের মধ্যে শুধু কয়েকটি দিন, তারপর আর চা-এর নিমন্ত্রণে কোনদিন দু'দিকের কোন বাড়িতেই পরমেশকে যেতে দেখা যায়নি। পরমেশের সঙ্গে পথে যদি দেখা হয়, তবে শুধু ভারত সরকারের ইকনমিক পলিসি সম্পর্কে পরমেশের সঙ্গে আলোচনা করেন সঞ্জয়বাবু। পার্থ সেনের সঙ্গেও পরমেশের মাঝে মাঝে দেখা হয়। পার্থ সেন বলেন—তা ডিব্রুগড়ই বা কি এমন খারাপ জায়গা? শুনেছি ব্রহ্মপুত্রের ভিউ বড় চমৎকার।

নিন্দুকেরা হতাশ হয়ে পড়ে। ঘটনার গায়ে একটুও রং ধরল না। মেলামেশার পালিশও চটেছে। চা-এর নেমন্তন্নের আর সেই হাঁকডাকও নেই। বোধ হয় কোনো বাড়ির চা মিষ্টি মনে হয়নি পরমেশের।

দু'মাস কেন? তারও বেশি হবে। সঞ্জয় মিত্র আর পার্থ সেন গল্প করতে করতে নতুন সড়কের উপর পায়চারি করেন এবং মাঝের বাড়ির গেটের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ফেরিওয়ালার সঙ্গে জিনিসের দামের দরাদরি করেন, এবং চোখেও পড়ে যে, মাঝের বাড়িটা নিঝুম হয়ে রয়েছে। কিন্তু মনেও পড়ে না দু'জনেরই কারও, এই বাড়িতে মানুষ আছে, এবং পরমেশ নামে এক অল্প বয়সের ভদ্রলোক এখানে থাকেন। পরমেশের সঙ্গে যে এক মাসেরও বেশি হল তাঁদের একবার দেখাও হয়নি, তাও মনে পড়ে না।

কিন্তু মনে পড়ল হঠাৎ এবং দুই জনেই একটু লজ্জিত হয়ে চমকে উঠলেন। দেখতে পেলেন, ডাক্তারের গাড়ি এসে থামল মাঝের বাড়ির গেটের কাছে।

ডাক্তার বাড়ির ভিতরে চলে যেতে সঞ্জয় মিত্র বলেন—পরমেশই অসুখে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে।

পার্থ সেন বলেন—তাই তো অনেক দিন তার দেখা পাই না।

মাঝের বাড়ির ভিতরে স্বচক্ষে সব দেখার পর চিন্তিত হয়ে পড়লেন সঞ্জয়বাবু ও পার্থবাবু। টাইফয়েড হয়েছে পরমেশের। পরমেশের বিছানার দু'দিকে দুটি টুলের উপর বসে আছে পরমেশের ভাই আর বোন; মাথার কাছে বসে আছেন পরমেশের মা। উদ্বিগ্ন এক একটি মূর্তির চোখের দিকে তাকালে মনে হয়, দিন-রাতের কোন মুহূর্তেও এরা ঘুমোয় না। খাওয়াদাওয়ার পাটও বন্ধ হয়ে গিয়েছে বোধহয়।

সঞ্জয়বাবু আক্ষেপ করেন—আমাদের একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল।

পার্থ সেন বলেন—আপনাদের এখানে তো আর কারও সাড়া শব্দ পাচ্ছি না, রান্নাবান্না করে কে?

পরমেশের মা বলেন—লোক আছে।

ডাক্তার বলেন—ক্রাইসিস পার হয়ে গিয়েছে, এখন আর চিকিৎসা বলে কিছু নেই, দরকার হল শুশ্রূষা।

পরমেশের দুই ভাই-বোনের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার বলেন—এই দুটি বাচ্চা মানুষ যে কী এক্সপার্ট নার্স, তা আর কী বলব মশাই। ওদের দেখতে পেয়ে আমিও নিশ্চিন্ত হয়েছি। খুব ভালো শুশ্রূষা চলছে।

নিশ্চিন্ত হলেন সঞ্জয়বাবু এবং পার্থবাবু। এবং খুশী মনেই চলে গেলেন। চলে গেলেন ডাক্তার। আবার নিঝুম হয়ে যায় মাঝের বাড়ি।

কিন্তু বোধহয় পনর মিনিটও পার হয়নি মাঝের বাড়ির গেটের দরজা হঠাৎ শব্দ করে ওঠে। তারপরেই একেবারে রোগীর ঘরের ভিতরে ঢুকে থমকে দাঁড়ায় এক আগন্তুক।

পরমেশের মা বলেন—বসো বিদুলা।

চেয়ারে বসে না বিদুলা। একবার পরমেশের মুখের দিকে তাকায়। ঘুমোচ্ছে পরমেশ। ঘরের ভিতরেই আস্তে আস্তে ঘোরাফেরা করে বিদুলা। হঠাৎ থামে, রোগীর টেম্পারেচারের চার্ট টেবিল থেকে তুলে নিয়ে পড়তে থাকে। ওষুধের শিশিগুলির দিকে একবার তাকায়। রোগীর দিকে তাকিয়ে কি-যেন ভাবে। তারপর পরমেশের ভাই-এর কানের কাছে আস্তে আস্তে বলে—বিছানার চাদরটা বদলে দিলে ভালো হয় ভাই।

পরমেশের মা মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলেন—তুই এখন পাখা ছেড়ে দে মিনি। বিদুলাকে নিয়ে বাইরের ঘরে বসে গল্প কর। আমি আসছি এখনি।

চোখ মেলে তাকায় পরমেশ। পরমেশের শুকনো চোখ দুটোই যেন হঠাৎ বিস্ময়ে একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে—আপনি কখন এলেন?

বিদুলা বলে—এখুনি। এখুনি কাকার কাছে শুনলাম যে আপনি অসুখে পড়েছেন।

পরমেশ হাসে—পড়েছিলাম, কিন্তু এখন উঠেছি।

মিনি ডাকে—আসুন বিদুলাদি।

মিনির সঙ্গে বাইরের ঘরে ঢুকেই বিদুলা চমকে ওঠে—একি?

মিনি বুঝতে পারে না—কি বলছেন বিদুলাদি?

বিদুলা—এত সব তানপুরা এস্রাজ বেহালা এখানে কিসের জন্য?

মিনি—দাদার জিনিস। দাদা খুব ভাল গাইতে বাজাতে পারেন। দাদা গানকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন।

বিদুলা—কিন্তু কই, পরমেশবাবুকে তো কোনদিন গাইতে শুনিনি?

মিনি—না, এখানে এসে গান আরম্ভ করতে পারেননি। এই তো ক'দিন আগে যন্ত্রগুলি এসে পৌঁছলো, রেলের বুকিং-এর ভুলে পাটনা চলে গিয়েছিল। তারপর হঠাৎ অসুখে পড়লেন দাদা, কাজেই...।

পরমেশের মা এসে ঘরে প্রবেশ করেন—আমি যে তোমার নিন্দে শুনেছিলাম বিদুলা। তুমি নাকি অহংকারী, কখনও কারও বাড়ি যাও না।

বিদুলা হাসে—অহংকারী নই, তবে কারও বাড়ি যাই না ঠিকই।

মিনি হাততালি দিয়ে বলে—তাহলে আমরাই ফার্স্ট, বিদুলাদি আমাদের বাড়িতে ফার্স্ট এসেছেন।

হঠাৎ গম্ভীর হয় বিদুলা। সত্যিই তো। এবাড়িতে এমন করে ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসবার কি দরকার ছিল? মিনি আর মিনির মা আশ্চর্য হয়েছে। আরও অনেকেই হয়তো এক রকম আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করবে। বাড়ি ফেরা মাত্রই তো কাকিমা প্রশ্ন করবেন—কেমন দেখলি পরমেশকে? ভুল করে হঠাৎ অনেকগুলি প্রশ্নের ভয় জীবনে ডেকে এনে ফেলেছে বিদুলা।

বড় অস্বস্তি বোধ করে, উঠে দাঁড়ায় বিদুলা। ব্যস্তভাবে বলে—আমি যাই।

মিনির মা বলেন—এসো আবার।

মিনি প্রশ্ন করে—কবে আসবেন?

—দেখি, কবে আসতে পারি। বিড়-বিড় করে বলতে বলতে চলে যায় বিদুলা।

মনে হচ্ছে বিদুলা সেনই বিদুলা রায় হয়ে যাবেন। আড়ালের নিন্দুকেরা যেদিন ফিসফিস করে, ঠিক সেইদিন সন্ধ্যায় মাঝের বাড়ির ভিতর থেকে গানের সুর আর এস্রাজের আওয়াজ উতলে ওঠে। আর, ও দিকের সঞ্জয় মিত্রের বাড়ির জানালায় একটি ছায়া হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে। রঙীন শাড়ীর আঁচলের খুঁট আঙ্গুলে জড়িয়ে মাঝের বাড়ির একটি ঘরের জানালার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে থাকে মুক্তাকণা। আবার মন দিয়ে, আর সব আগ্রহ নিয়ে

উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকে। কে সাধছে এমন সুন্দর আশাবরী? পরমেশবাবু! ভদ্রলোক কি সত্যই গানের মানুষ? অল্প কথা বলেন, আস্তে কথা বলেন, কিন্তু গানের বেলায় একি দরাজ গলা! এই মানুষ যে সেই মানুষই নয়, একেবারে ভিন্ন এক জগতের মানুষ।

আর দেরী করে না মুক্তাকণা মিত্র। মাঝের বাড়ির গেটের দরজা আবার ঝন করে বেজে ওঠে। গেট খুলে বাড়ির ভিতর চলে যায় মুক্তা। মুক্তা মিত্রের মনের সব কল্পনা যেন এতদিনের নির্বাসন থেকে বেড়া ভেঙ্গে ছুটে এসেছে ; এক গমকে ভেসে এসেছে মুক্তা মিত্রের মনটাই।

যারা ক'দিন আগে দেখেছিল, মাঝের বাড়ির গেট খুলে বিদুলা সেন ঢুকছে বাড়ির ভিতরে, তারাই আজ মুক্তা মিত্রকেও সেই বাড়িতে যেতে দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। জমলো নাকি খেলা? তবে কি মুক্তা মিত্রই মুক্তা রায় হয়ে যাবেন?

পরমেশের ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ায় মুক্তা মিত্র। গান থামিয়ে পরমেশ বলে—বসুন।

মুক্তা বলে—কোন খবর না দিয়ে একেবারে অভদ্রের মতোই এসে পড়লাম পরমেশবাবু। আমি গানকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসি।

চমকে ওঠে পরমেশ। মুক্তা মিত্রের মুখের দিকে বিস্ময়ের চক্ষু তুলে তাকায়। পৃথিবীতে তাহ'লে সত্যিই আরও একজন মানুষ আছে, যে তারই মতো প্রাণের চেয়েও গানকে বেশি ভালবাসে।

মুক্তা বলে—থামবেন না পরমেশবাবু। গেয়ে যান।

পরমেশ—আপনিও গাইবেন তো!

মুক্তা—নিশ্চয় গাইব।

মাঝের বাড়ির একটি ঘরে সেই সন্ধ্যার মুহূর্তগুলি যেন ঝংকার দিয়ে ঝরে পড়তে থাকে। পরমেশ গান গায়, তারপর মুক্তা, তারপর আবার পরমেশ। সুরলোকের কুহকের মধ্যে ডুবে গিয়ে যেন আত্মহারা হয়ে যায় দুটি মানুষের সুরপিপাসী প্রাণ।

কে না শুনতে পায়, মাঝের বাড়ির এই সন্ধ্যার সুরময় উৎসবের ধ্বনি? পথ দিয়ে যারা মাথা হেঁট করে চলে যায় তারা শোনে, যারা উঁকিঝুঁকি দিয়ে চলে যায় তারা শোনে। সঞ্জয়বাবুও কি শুনতে পাননি? নিশ্চয়ই শুনেছেন। তা না হলে এরই মধ্যে ব্যস্তভাবে মুক্তার মাকে কাছে ডেকে এই কথা বলতেন না—এখন তো আর কোন বাধা নেই।

মুক্তার মা আশ্চর্য হন—কি?

সঞ্জয়বাবু—এবার পরমেশের মা'র কাছে তুমি কথাটা তুলতে পার।

মুক্তার মা বলেন—তুলবো।

সঞ্জয়বাবু ভাবেন, পরমেশকে এইবার মাঝে মাঝে চা খেতে ডাকলে ভালো হয়।

পিসিমা তাঁর জপের মালা থামিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করেন—তোমার মেয়েটি কি সত্যিই বিয়ে করতে রাজী হয়েছে?

সঞ্জয়বাবু বলেন—রাজী হবে বলে মনে হচ্ছে।

সবাই যখন শুনেছে, তখন বিদুলাও কি না শুনে আছে?

সারাদিন কাঁটা কুরুশ আর ছুঁচ নিয়ে ফুল তোলা আর নক্সা আঁকার খেলা নিয়ে মনটা যেন ভালোই মেতে থাকে। শুধু সন্ধ্যা বেলাটায় কেমন যেন হয়ে যায়। ভিতরের বারান্দায় চেয়ারের উপর বসে থাকেন অধ্যাপক বড়দা। ফিজিক্সের ফরমুলা আবার ভুলে যেতে পারেন, তাই চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে বড়দার মাথা টেপে বিদুলা। মাঝের বাড়ির একটি ঘরের সুরময় উল্লাসের ঝংকার শোনা যায়। বড়দা হঠাৎ বিরক্ত হয়ে বলেন—প্যারালিসিস হল নাকি তোর। হাত থামিয়ে ভাবছিস কি?

যে-কথা ভাবছিল বিদুলা, সেই কথাই এত তাড়াতাড়ি সত্য হয়ে উঠবে, সেটা এই সন্ধ্যাতেও কল্পনা করতে পারেনি স্বয়ং পরমেশ, এবং মুক্তাও।

সন্ধ্যা শেষ হবার পরেও, এবং গান শেষ হবার পরেও অনেকক্ষণ চুপ হয়ে থাকে মাঝের বাড়ির একটি ঘর। চলে আসছিল মুক্তা, পরমেশই বাধা দিয়ে বলে—একটু বসো না মুক্তা!

চুপ করে বসে রঙীন শাড়ীর আঁচলের খুঁট আঙ্গুলে জড়ায় মুক্তা।

পরমেশ বলে—একটি কথা বলবো?

মুক্তা—বলুন।

পরমেশ— আমিও গানকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসি, তোমারই মত।

মুক্তা—তা তো বাসবেনই, দেখতেই পাচ্ছি। তা না হলে...।

পরমেশ—কি?

মুক্তা হাসে—তা না হলে আমিই বা এখানে আসব কেন?

পরমেশ—কিন্তু গানের মানুষকেও কি ভালবাস?

মুখের উপর আঁচল চাপা দিয়ে ছটফট করে ওঠে মুক্তা—কেন বাসব না পরমেশবাবু? আপনি মিছিমিছি জিজ্ঞাসা করছেন।

পরমেশের দু'চোখের হাসি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—আজ তাহলে এস মুক্তা। কাল আবার...।

মুক্তা বলে—কাল আবার টোড়ি আর ছায়ানট!

পরমেশ—অ্যাঁ? আচ্ছা।

পরমেশ আজ বিশ্বাস করে, তার এতদিনের প্রতীক্ষা আজ সার্থক হয়েছে। কল্পনা একেবারে মূর্তি ধরে চোখের সামনে এসে ধরা দিয়েছে। তার নাম মুক্তা, গানের সুরে বাঁধা একটা সুন্দর জীবন। এই তো পরমেশের জীবনের প্রয়োজন, মনের মতো জন।

পরমেশের মা'ও আজ বুঝতে পারেন, কেন এতদিন বিয়ে করতে রাজি হয়নি তাঁর ছেলে। যেমনটি চেয়েছিল পরমেশের মন, ঠিক তেমনটি আজ ভগবান ওকে পাইয়ে দিয়েছেন। ভালোই হয়েছে। সঞ্জয় মিত্রের মেয়ে মুক্তা মিত্র দেখতেও বেশ সুন্দর।

মুক্তার পিসিমা কথায় কথায় কত কথাই বলেছেন।—আমাদের বাড়ির মেয়েটি সংসারের কুটোটিও নাড়তে শেখেনি। মেয়ে শুধু ছবির মতো সাজতে জানে! ও মেয়ে একটা চিৎকার শুনলে মূর্ছা যায়।

—তাতে কি হয়েছে? পিসিমার সব কথা মনে পড়লেও মনে কোন আপত্তি বোধ করবে না পরমেশের মা। এই সংসারে এসেও মুক্তাকে কোন ঝঞ্ঝাটের কুটো নাড়তে হবে না। থাকুক না ছবির মতো সেজে। পরমেশ যদি সুখী হয়, তা হলেই হল।

এইবার আর সন্দেহ করবার দরকার হয় না। যারা কিছুই জানতো না, তারাও সব জেনে ফেলেছে। মুক্তা মিত্রই মুক্তা রায় হয়ে যাবেন। ভালো জামাই প্রায় বাগিয়ে এনেছেন সঞ্জয়বাবু। কিন্তু কবে? বিয়ে হবে কবে?

বিয়ের দিন ঠিক করতে পরমেশের মা'র সঙ্গে আলোচনা করবার জন্য এসেছিলেন সঞ্জয়বাবু। কিন্তু আলোচনা হল না। পরমেশের মা বললেন—পরমেশের শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। আর ক'টা দিন যাক্, তারপর ওর কাছে জিজ্ঞাসা করে নিয়েই আপনাকে জানাব।

—তাই ভালো—চলে গেলেন সঞ্জয় মিত্র । তারপরেই এলেন ডাক্তার। পরমেশ জিজ্ঞাসা করে—রেস্ট নিতে অ্যাডভাইস করেছেন, কিন্তু কি রকম রেস্ট?

ডাক্তার—অফিসে যাবেন না, আর গান-টান একেবারে কমিয়ে দিন।

পরমেশ—আমিও তাই ভাবছিলাম। ক'দিন থেকে দেখছি, গান বেশি হলেই হার্টের ব্যথাটা বাড়ে।

ডাক্তার—তাহলে কিছুদিন গান একেবারেই বন্ধ করে দিন।

পরমেশ বলে—বেশ।

গান কিছুদিন একেবারে বন্ধ রাখতে হবে, এর জন্য দুঃখ হলেও সে দুঃখ তেমন কিছু নয়। কারণ, তার গানের আশা তো সার্থক হয়েই গিয়েছে। গানের মানুষকেও ভালবাসে মুক্তা।

অসুস্থ শরীরটা বিছানার উপর এলিয়ে দিয়ে পড়ে থাকে পরমেশ! শরীরটা রেস্ট পায় ঠিকই, মনটা রেস্ট পায় না। কখন আসবে সন্ধ্যা? কখন আসবে মুক্তা? আজ সন্ধ্যায় সুরে সুরে মুখর হয়ে উঠবে না এই ঘর, কিন্তু তার জন্য কোন দুঃখ করবার দরকার হয় না। কল্পনা করতে পারে পরমেশ, গভীর নীরবতার মধ্যে, এই ঘরের ভিতরে একটা বুকজোড়া শান্ত অচঞ্চলতার মধ্যে মুক্তার মুখের দিকে তাকিয়ে আর কোন কথা না বলে যদি সন্ধ্যাটা পার হয়ে যায়, তাই বা কি কম লাভ? সে-ও এক নীরব সুরের আনন্দ।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে, ঘড়ির দিকে তাকায় পরমেশ।

ঘরের ভিতরে ঢুকে চমকে ওঠে মুক্তা—একি! গানের মেয়ে যেন ঘরের এই নীরবতায় ভয় পেয়ে চমকে উঠেছে।

পরমেশ হাসে—কিছুই না মুক্তা। শরীরটা একটু অসুস্থ, এই মাত্র।

মুক্তা বলে—তাহলে আজ শুধু দুটো আশাবরী। বেশিক্ষণ থাকব না।

পরমেশ—ডাক্তার আমাকে রেস্ট নিতে বলেছেন। গান কিছুদিন বন্ধ রাখলেই ভালো হয়।

মুক্তা আশ্চর্য হয়—গান বন্ধ রাখবেন আপনি? তা হলে...তা হলে আমি এখন কি করি?

পরমেশ—তুমি সত্যি গান শুনতে চাও?

মুক্তা হাসে—নিশ্চয় শুনতে চাই।

আস্তে আস্তে উঠে বসে পরমেশ। তানপুরা হাতে তুলে নেয়। আস্তে আস্তে বলে—কি বলছিলে মুক্তা? আশাবরী?

মুক্তা—হ্যাঁ।

সুরলোকের আশাবরী এই ঘরের বাতাসে মূর্ছনা ছড়ায়। মুগ্ধ দুটি চক্ষু নিয়ে বসে থাকে মুক্তা। যেন সত্যিই দেখতে পাচ্ছে মুক্তা, পরমেশের গানের ভাষা সুরের ছোঁয়ায় রঙীন হয়ে ফুলঝুরির মতো ঝরে পড়ছে।

গান শেষ হয়। মুক্তা মিত্রের কালো চোখের চাহনি আর সুন্দর ভুরু যেন ব্যথিত হয়েছে। মুক্তা বলে—আপনার আজকের আশাবরীটা কেমন যেন হয়ে গেল।

পরমেশ বলে—কিন্তু গান গেয়ে বোধহয় ভুল করলাম। হার্টের ব্যথাটা সত্যিই বাড়ছে।

আস্তে আস্তে হাঁপাতে থাকে পরমেশ। মুক্তা মিত্র বলে—আমি এখন যাই। কাল আবার...।

পরমেশের দু'চোখে যেন একটা যন্ত্রণার বিস্ময় দপ্ করে ফুটে ওঠে।

—কাল আবার গান গাইতে পারব না। গান কিছুদিন বন্ধ রাখতেই হবে।

মুক্তা হাসে—বেশ তো, গান বন্ধ রাখুন কিছুদিন। তারপর, যেদিন আবার গাইবেন, সেদিন আসব। চলে যায় মুক্তাকণা মিত্র।

সন্ধ্যা হয়েছে, তবু কেন মাঝের বাড়ির একটি ঘরে সুর আর স্বরের ঝংকার বাজে না? পার্থ সেনের বাড়ির বারান্দায় একটি ছায়া নিজের মনের চঞ্চলতায় এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়ায়। বিদুলা শুধু কল্পনা করতে পারে—আজ বোধহয় একসঙ্গে বেড়াতে বের হয়েছে দুটি মানুষ, যারা প্রাণের চেয়ে গান বেশি ভালবাসে। ওরা দুজন একই মালায় দুটি ফুল। বেশ হল, ভালোই হয়েছে।

ভালো লাগে না শুধু একটি কথা ভাবতে। কেন সেদিন অমন করে বেহায়ার মতো ছুটে

গিয়েছিল বিদুলা, একটা রোগী মানুষকে দেখবার জন্য? শুধু নিজের মনের কাছে নয়, কাকিমার চোখের কাছেও যে নিজেকে ধরা পড়িয়ে দিয়েছে বিদুলা।

কাকা আর কাকিমার চাপা গলার কথাবার্তাও শুনতে পেয়েছে বিদুলা। কাকীমা রাগ করেছেন, কাকার মনটাও কেমন একটু ব্যথিত হয়েছে। সঞ্জয় মিত্রের সঙ্গে আর তেমন করে জোর গলায় গল্প করতে পারেন না কাকা। আক্ষেপ করেছেন কাকিমা।—এতদিন গম্ভীর হয়ে থেকে, হঠাৎ সেদিন এক দৌড়ে ছুটে চলে গেল কেন বিদুলা? গেলই যদি, তবে হঠাৎ আবার এক দৌড়ে পালিয়ে এল কেন? এসব মেয়ের মনের রকম বোঝা ভার!

কাকা বলেন—না গেলেই ভালো করতো। তা হলে কানাইবাবু আমাকে ওরকম একটা প্রশ্ন করতে পারতেন না।

কাকিমা বলেন—আমি মনে করেছিলাম, পরমেশই বুঝি ওকে ডেকেছে।

কাকা—না, কেউ ওকে ডাকেনি। আমিই ওকে খবরটা দিয়েছিলাম। আসল কথা হল, মেয়েটার মনটাই একটু অন্য রকমের কি না। দেখলে না, সে নিজের হাতে বার্লি তৈরি করে নিজেই মতিরামের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এল।

কাকিমা—কি হয়েছে মতিরামের?

কাকা—বসন্ত হয়েছে।

কাকা ও কাকিমার চাপা স্বরের বার্তালাপ শুনতে ভালো লাগে, খারাপও লাগে। বিদুলার মনটাই অন্য রকমের। সে মন নিয়ে চাকর মতিরামের বাড়িতে ছুটে যাওয়া যায়, কিন্তু সে মন নিয়ে এই রকম গানের মানুষের কাছে ছুটে যাওয়া নিতান্তই ভুল সাহস।

হঠাৎ শোনা যায়, ওদিকের বাড়ির একটি ঘরের জানালা দিয়ে গানের সুর ছড়িয়ে পড়ছে সন্ধ্যার বুকে।

গান গাইছে মুক্তা। এরপর নিশ্চয় গান গাইবেন মুক্তার মনের মতো জন, সেই ভদ্রলোক। পার্থ সেনের বাড়ির বারান্দায় শান্তভাবেই ঘুরে বেড়ায় একটি উৎকর্ণ কৌতূহলের ছায়া। এক গানের পর অন্য গান গাইছে মুক্তা; কিন্তু পরমেশ রায়ের গান শোনা যায় না কেন?

—একি? নিজের মনেই চমকে ওঠে বিদুলা। গান বন্ধ করেছে মুক্তা, আজ সন্ধ্যার মতো মুক্তার গানের পালা শেষ হল। তবে পরমেশ রায় এখন কোথায়? মুক্তা কি একাই গাইছিল গান? তার গানের আনন্দের কাছে আর একজন কেউ কি এতক্ষণ বসে ছিল না?

কেমন করে কল্পনা করবে বিদুলা? বিদুলা যে এখনও কিছুই শুনতে পায়নি। সেই ভদ্রলোক যে এখন তাঁর নিজের ঘরের বিছানার উপরে একা পড়ে আছেন, আর ছোট্ট মিনি শুধু তাঁর মাথার কাছে বসে পাখার বাতাস করছে!

আর, মুক্তার পিসিমাও যে ঐ মাঝের বাড়ির এক ঘরের ভিতরে বসে পরমেশ রায়ের মা-এর সঙ্গে এখন কথা বলছেন।

পিসিমা বলেন—আমাদের মেয়েটির ঠিক উল্টোটি হলেন ও বাড়ির মেয়েটি। সংসারের যত কাজের কুটো কুড়িয়ে সারাদিন খাটবে। পাঁচ-রকমের পথ্যি আর দশ-রকমের রান্না রাঁধবে। এর মাথা টেপ, ওর গা ধোয়াও, তার মুখে ওষুধ ঢেলে দাও, এই নিয়েই দিন কাটিয়ে দিচ্ছে পার্থ সেনের ভাইঝিটা। আমি বলি সংসারের পাঁচ কাজের জন্য যখন এতই শখ তবে বিয়ে করতে চাস না রে কেন ছুঁড়ি!

পরমেশের মা বলেন—আহা, বড় সুন্দর মেয়ে তো!

পিসিমা—না গো, তেমন কিছু সুন্দর নয়, আমাদের মুক্তোর তুলনায় কিছুই নয়।

পরমেশের মা হাসেন—আমি দেখেছি বিদুলাকে, এখানেও এসেছিল এক দিন।

চলে গেলেন পিসিমা। তার পরেই পরমেশের ডাক শুনতে পান পরমেশের মা—শরীরটা খুবই খারাপ বোধ করছি মা। ডাক্তার ডাকতে লোক পাঠাও।

আবার নিঝুম হয়ে যায় মাঝের বাড়ি। দিনে তিনবার ডাক্তার আসেন আর চলে যান। দশদিনের বেশি হয়ে গেল, জ্বর আর বুক ব্যথা নিয়ে বিছানার উপর ছটফট করে পরমেশ। সঞ্জয়বাবু আর পার্থবাবু, দু'জনেই এসেছিলেন। দেখে একটু চিন্তিত হয়ে চলে গিয়েছেন দু'জনেই।

মাঝে মাঝে আবছা ঘুমের মধ্যে যেন দরজার কাছে পায়ের শব্দ শুনতে পায় পরমেশ। মুখ ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকায়। মা বলেন—মুক্তা তো একবারও এল না।

পরমেশ—মুক্তার তো আসবার কথা নয়।

পরমেশের মা আশ্চর্য হন—তার মানে?

পরমেশ—এখন তো আমি গান গাইতে পারব না, মুক্তা এসে করবে কি?

পরমেশের মা আরও আশ্চর্য হন—এর মানে কিছু বুঝলাম না।

পরমেশ—মুক্তা এখন আসবে না, আসতে পারে না, তার এসেও কাজ নেই।

ছোট্ট মিনি চেঁচিয়ে ওঠে। তবে বিদুলাদি আসুক না কেন? সেদিন তোমার অসুখের সময় বিদুলাদিই তো এসেছিলেন!

চুপ করে থাকে পরমেশ! চুপ করে ভাবতে থাকেন পরমেশের মা। বিদুলা কি আসবে? আসবেই বা কেন? মুক্তার সঙ্গে যে মানুষের বিয়ের কথা পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে এবং রটেও গিয়েছে, তার কাছে সে বেচারী আসবে কেন?

কল্পনা করতে পারছেন না, জানেনও না পরমেশের মা, ঠিক এই সময়েই ওদিকের বাড়ির বাইরের ঘরের দরজার কাছে একটা অভিমানী বাধার মতো পথ আটক করে দাঁড়িয়ে আছেন বিদুলার কাকিমা—যেও না, যেতে পারবে না বেহায়া মেয়ে।

বিদুলা বলে—বেহায়া বৈকি! কিন্তু যেতে দাও কাকিমা।

কাকিমা—কেন যাবে?

বিদুলা হাসে—যেতে ইচ্ছে করছে, তাই।

কাকিমা—অপমানের ভয় নেই?

বিদুলা—না, অপমান যা হবার হয়েই গিয়েছে, আর নতুন করে অপমানের ভয় কোথায়?

কাকিমা—অপমানের ভয় না হয় নেই, কিন্তু ওখানে গিয়ে তোর লাভটা কি? ওর তো মুক্তার সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েই গিয়েছে।

বিদুলা—জানি।

কাকিমা—তবে?

বিদুলা—একটা রোগী মানুষকে দেখতে যাব আর চলে আসব, এর মধ্যে ক্ষতিটাই বা কি?

হঠাৎ ছলছল করে চোখ, ছটফট করে চেঁচিয়ে ওঠে বিদুলা—আমি একবার না গিয়ে, নিজের চক্ষে একবার না দেখে থাকতে পারছি না কাকিমা। জীবনে এই প্রথম বেহায়া হয়েছি, আর একটু বেহায়া হতে দাও।

আর বাধা দেন না কাকিমা।

পরমেশের অসুখ সারতে সময় নিল অনেক। প্রায় আরও একমাস। বেহালার নতুন সড়কের নিম আবার নতুন ফুলে ছেয়ে গিয়েছে।

শুধু সেদিন নয়, প্রতিদিনই মাঝের বাড়িতে এক রোগীর বিছানার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে ওদিকের বাড়ির ঐ পার্থ সেনের ভাইঝি বিদুলা। কাকিমাও আর রাগ করেননি। বরং রোজই একই প্রশ্ন করেছেন—পরমেশ আজ কেমন আছে বিদুলা?

পরমেশের মা'ও নিজের চক্ষেই দেখেছেন, এই মেয়ে একেবারে অন্য রকম মনের মেয়ে।

মুক্তার ঠিক উল্টোটি। ঠিকই বলেছিলেন মুক্তার পিসিমা। সংসারের যত জ্বর-জ্বালার গায়ে হাতে বুলোবার জন্য পার্থ সেনের এই ভাইঝির হাত দুটো যে নিশপিশ করে, সাগু জ্বাল দেবার জন্য আর বার্লি তৈরি করবার জন্য তৈরি দুটো পাকা-পোক্ত হাত।

বিদুলা সেনকে শুধু একটা বিপদে পড়তে হল শেষ সন্ধ্যায়। সেই সন্ধ্যায় ডাক্তার এসে পরমেশকে বলে গেলেন—কাল থেকে অফিসে যেতে পারেন।

চলে গেলেন ডাক্তার, কিন্তু চলে আসতে পারল না বিদুলা। পরমেশই অনুরোধ করে। আর কিছুক্ষণ থেকে যাও বিদুলা।

ঘড় বড় নীরব। বড় বেশি সুরময় সেই নীরবতা। পরমেশ বলে—এ রকম সুন্দর মন তুমি কোথায় পেলে বিদুলা?

বিদুলা যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে হাঁপাতে থাকে—আমাকে এসব কথা আপনার বলা উচিত নয় পরমেশবাবু।

পরমেশ—তোমাকেই তো বলব।

বিদুলা আশ্চর্য হয়—কেন? আপনি তো প্রাণের চেয়ে গান বেশি ভালবাসেন।

পরমেশও হাসে—ঠিকই সন্দেহ করেছ বিদুলা। গান আমার প্রাণের চেয়েও বেশি।

বিদুলা হেসে ফেলে—তবে আর কি!

পরমেশ—কিন্তু তুমি যে আমার গানের চেয়েও বেশি।

চলে গেল বিদুলা। এবং যারা আড়াল থেকে আর উঁকিঝুঁকি দিয়ে অনেক কিছু বুঝে ফেলে, তারাই এক মাস পরে বলাবলি করে—আরে কি আশ্চর্যের কথা, শেষে বিদুলা সেনই বিদুলা রায় হয়ে গেল!

সম্পত্তি

নরেশ দত্তের বাড়ির সামনে একটা ভীড়। কাগজপত্রের একটা ফাইল হাতে নিয়ে এক ভদ্রলোক এই ভীড়ের মধ্যেই ছটফট করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ইনিই হলেন হাটখোলার মহাজন কৈলাসবাবু। ক্রোকী পরোয়ানা নিয়ে আদালতের লোকের সঙ্গে নরেশ দত্তের বাড়ি দখল করতে এসেছেন।

তবু এক বিন্দু আনন্দ নেই মহাজন কৈলাসবাবুর মনে। পুরো পাঁচটি হাজার টাকা হাতড়ে নিয়েছে নরেশ দত্ত। অথচ ঐ বাড়ি নিলাম করলে বাজার দর অনুযায়ী বাড়ির দাম চড়বে বড় জোর আট হাজার টাকা, তার বেশি কখনই নয়! কিন্তু বৃথা, কোন লাভই হবে না। জোচ্চোর লোকটা আরও তিন মহাজনের কাছে টাকা ধার নিয়েছে। চন্দননগরের এক মহাজনের কাছ থেকে তিন হাজার, বারাসাতের এক মুদীর কাছ থেকে তিন হাজার আর বড়বাজারের এক মাড়োয়ারীর কাছ থেকে তিন হাজার। সব পাওনাদারই এক একটি মামলা এনে নরেশ দত্তের কাছে টাকা দাবী করেছে। শেষ পর্যন্ত ফল এই হল যে, কোন মহাজনই তাঁর প্রাপ্য পুরো টাকা উদ্ধার করতে পারবেন না। নিলামে যে দাম উঠবে ঐ বিশ্রী চেহারার একটা বাড়ির, তাই সকলকে ভাগ করে নিতে হবে। পাঁচ হাজার টাকা পাওনার বদলে কৈলাসবাবুর কপালে দু' হাজারও জুটবে কিনা সন্দেহ। কি ধূর্ত এই নরেশ দত্ত! ওর ট্যারা চোখের দিকে তাকিয়ে কখনো কল্পনাও করা যায়নি যে, এত কৌশল আছে ওর মাথার ঘিলুর ভিতরে। চার-চার জন পাকা কারবারী মানুষকে ঐ একটুখানি এক বিশ্রী বাড়ির লাভ দেখিয়ে বন্ধকী হাওলাত করে কতগুলি টাকা হাতড়ে নিল।

শুধু কৈলাসবাবুই নয়, আরও তিন পাওনাদারের উকীল আর এটর্নির লোকও ছিল। ছিল আদালতের কেরানী আর চারজন পুলিশ কনস্টেবল। ফটফট করছে সকলেই। কারও চক্ষে এক বিন্দু সমবেদনার ছায়া নেই। থাকবার কথাও নয়। বরং, একটা প্রতিশোধ নেবার আগ্রহই যেন ছটফট করছে সকলের চোখে।

প্রতিশোধ নেওয়া শুরুও হয়ে গিয়েছে। চারজন কুলি নরেশ দত্তের ঘরের ভিতর থেকে এক এক করে যত অস্থাবর সম্পদ ঘাড়ে করে তুলে নিয়ে এসে পথের উপর আছাড় দিয়ে ফেলেছে। কিন্তু সেই সব অস্থাবর সম্পদের দিকে তাকিয়ে মহাজন কৈলাসবাবুর দু'চোখের আক্রোশ আরও হতাশ হয়ে জ্বলতে থাকে। সব সরিয়ে ফেলেছে জোচ্চোর লোকটা! কুলিরা হাঁপাতে হাঁপাতে ঘাড়ের উপর যেন এক একটা বিদ্রূপের আবর্জনা তুলে নিয়ে আসছে। কয়েকটা কাঠের আলনা, নড়বড়ে তক্তপোষ, দুটো টিনের ড্রাম—তা'ও আবার ফুটো, দশ বারটা পুরনো ল্যাম্পের কঙ্কাল, ছেঁড়া জুতো দু'বস্তা আর পাঁচটা পায়া-ভাঙা চেয়ার। ছি-ছি-ছি, এই আবর্জনা কি দশ টাকা দিয়েও কেউ কিনবে? হাতের ফাইলটা তুলে নিজের কপালের উপরেই আস্তে একটা আঘাত করেন কৈলাসবাবু।

বাড়ির ভিতরে ঢুকে কৈলাসবাবু আর আদালতের কেরানী স্বচক্ষে দেখে এসেছেন, বিছানার উপর বসে তখনো সেই ধূর্ত লোকটা ট্যারা চোখ তুলে বসে বসে হাসছে। তাই আরও ক্রুদ্ধ হয়ে ছটফট করেন কৈলাসবাবু। লোকটা যে আর একটু পরেই দুনিয়াকে কলা দেখিয়ে হাসতে হাসতে চলে যাবে! একেবারে চোখের উপর দিয়েই সরে পড়বে। একটুও দুঃখিত নয়, একটুও বিমর্ষ নয় লোকটা। বের হয়ে যাবার জন্য যে লোকটা মনের আনন্দে তৈরি হয়েই রয়েছে, তাকে বের করে দিয়ে কোন প্রতিশোধের আনন্দও নেই। লোকটা এমনই একটা চতুর ভাঁওতা যে, ওকে জব্দ করার সুযোগ নেই আর শক্তিও নেই এই পৃথিবীর।

নরেশ দত্তের বাড়ি, মাত্র চারখানা ছোট ছোট ঘর, একটুখানি একটা উঠান, সরু সরু বারান্দা, দরজা ও জানলার কাঠ কুঁকড়ে গিয়েছে। দেয়ালের এখানে ওখানে পালেস্তারার তলায় উই। বাড়িটার বয়স চল্লিশ বছরের কম নয়, নরেশ দত্তের চেয়ে মাত্র দশ বছরের ছোট। নরেশ দত্তের বাপ এই বাড়ি তৈরী করার পর দশটি বছর মাত্র বেঁচে ছিলেন। নরেশ দত্তের বিয়ে হবার বছরেই মারা গেলেন নরেশ দত্তের বাপ। তারপরেও চারটি বছর এই বাড়িটার মধ্যে কলরব ছিল, কিন্তু তারপর আর নয়। তারপর থেকেই বাড়িটা যেন কেমন হয়ে গেল। ধীরে ধীরে ঘুন ধরলো কড়িকাঠে, আর দেয়ালে উই।

কিন্তু যেদিন, আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগে এই বাড়িটা শেষবারের মতো শব্দ করে কেঁদেছিল, সেদিন সান্ত্বনা দেবার জন্য এই বাড়ির ভিতরে এসেছিলেন প্রতিবেশী বিনোদবাবু। ঐ যে, উই-খাওয়া বাড়িটার সামনে প্রকাণ্ড লালরঙের দালান বাড়িটা হলো বিনোদবাবুর বাড়ি। বিনোদবাবুও এখন তাঁর দালান বাড়ির বারান্দায় কয়েকজন প্রতিবেশী ভদ্রলোকের সঙ্গে বসে গল্প করছেন, আর দেখছেন নরেশ দত্তের বাড়ি ক্রোক করার হল্লা, ছটফটানি উল্লাস আর আক্রোশের দৃশ্যটাকে। কোন সমবেদনা নেই বিনোদবাবুর চোখে, কোন প্রতিবেশী ভদ্রলোকের চোখে। কারণ, সকলেই জানেন যে, বোগাস নরেশ দত্তই এতগুলি মহাজনকে কলা দেখিয়ে সরে পড়ছে। ইচ্ছে করেই আর রীতিমত প্ল্যান করে লোকটা ভাঁওতা হাসিল করেছে। যা চেয়েছিল নরেশ দত্ত, তাই হয়েছে।

নরেশ দত্তের ঐ বাড়ি, তিরিশ বছর আগে ঐ বাড়ির দেয়ালে উই লাগেনি। নরেশ দত্তের বউভাতের নিমন্ত্রণ খেয়েছিলেন বিনোদবাবু ঐ বাড়িরই ছাদের উপর বসে। তারপর একদিন নরেশ দত্তের ছেলের অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণও খেয়েছিলেন বিনোদবাবু ঐ বাড়ির উঠানে ছোট এক রঙীন সামিয়ানার নীচে বসে। কি যেন নাম ছিল ছেলেটার? বিশু, হ্যাঁ বিশু। বিশুর মা

বিশুকে কোলে নিয়ে ঐ বাড়িরই ছাদের উপর দাঁড়িয়ে প্রায় রোজই সন্ধ্যাবেলা কথা চলতো পাশের বাড়ির শ্যামবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে।

কিন্তু ব্যস, তারপর আর নয়। নরেশ দত্তের ঐ বাড়ি আর কোনদিন হেসে হেসে নিমন্ত্রণ করতে পারেনি প্রতিবেশী বিনোদবাবুকে।

দুটি বছর যেতে না যেতেই বার বার তিনবার কেঁদে উঠল নরেশ দত্তের বাড়ি। প্রত্যেকবার ছুটে এলেন বিনোদবাবু। প্রথমবার, নরেশ দত্তের বাবা মারা গেল যেদিন। দ্বিতীয়বার, নরেশ দত্তের স্ত্রী মারা গেল যেদিন। আর তৃতীয়বার, নরেশ দত্তের ঐ বাড়ির কান্না শুনে ছুটে সেদিন এসেছিলেন বিনোদবাবু আর প্রতিবেশীরা, একমাসের জ্বরে মারা গেল যেদিন তিন বছর বয়সের শিশু।

হ্যাঁ, আর একবার এসেছিলেন বিনোদবাবু। সেই রাত্রেই। সেই শেষ আসা। শোকার্ত আর সারাদিন উপোসী নরেশ দত্তকে সান্ত্বনা দিয়ে কিছু খেতে রাজী করাবার জন্য এসেছিলেন বিনোদবাবু। এসেই দেখতে পেয়েছিলেন, ঘরের ভিতর দেয়ালের গায়ে ছোট একটা কালো ছাপের দিকে ট্যারা চোখের অপলক দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে আছে নরেশ দত্ত। শিশুর কালিমাখা ছোট্ট হাতের একটা ছোট্ট ছাপ।

ছলছল করে উঠেছিল নরেশ দত্তের ট্যারা চোখের দৃষ্টি। বলেছিল নরেশ দত্ত, বিশ্বাস করুন বিনোদদা, এই বাড়িটাই অপয়া, ভয়ঙ্কর অপয়া।

সেদিন নরেশ দত্তের ট্যারা চোখের ছলছল দৃষ্টিকে বিশ্বাসই করেছিলেন বিনোদবাবু। কিন্তু তারপর? তারপর নরেশ দত্ত নিজেই বুঝিয়ে দিয়েছে যে, ঐ ট্যারা চোখ শুধু ধূর্ত হাসি লুকিয়ে লোক ঠকাবার ফিকিরে ঘুরে বেড়ায়। অপয়া বাড়িটাকেই পয়া করে তুলেছে নরেশ। আট হাজারও দাম হবে না যে বাড়ি, সেই বাড়িকে ভাঙিয়ে পনর হাজার টাকা বাগিয়েছে।

এই সেদিনও, যেদিন নরেশ দত্তের বিরুদ্ধে মহাজনের মামলা শুরু হলো, সেইদিন বিনোদবাবুর কাছেই এসে বেপরোয়া বেহায়ার মতো হেসে হেসে নরেশ দত্ত বলেছিল, বৃথাই ওরা মামলা করছে বিনোদদা।

—কেন? আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন বিনোদবাবু।

নরেশ দত্ত বলেছিল, আমার কোনই লস হবে না বিনোদদা। কাঁচা ইটের বাড়ি, বাজে শাল কাঠের কড়ি বরগা আর চৌকাঠ। তাতে আবার ঘুন ধরেছে। এ বাড়ি ছেড়ে দেবার চেষ্টাই করে আসছি পঁচিশ বছর ধরে।

বিনোদবাবু—কিন্তু কোথাও মাথা গুঁজে থাকতে হবে তো।

ঝক্ করে হেসে ওঠে নরেশ দত্তের ট্যারা চোখ—তা চেষ্টা করলে কি একটা জায়গা হবে না বিনোদদা!

বিনোদবাবু—নতুন বাড়ি করবার মতলব করেছেন না কি?

মুখের কথার উত্তর না দিয়ে শুধু হাসতে থাকে নরেশ দত্ত। তারপর বলে—টাকা হাতে থাকলে কি না হয়?

পঁচিশ বছর আগে এই নরেশ দত্তকে পাড়ার লোকেরা ঠিক চিনতে পারেনি, চিনেছে অনেক পরে, এবং আজ সবচেয়ে ভাল করে চেনা গেল। ঠিকই বলে পাড়ার ছেলেরা, বোগাস নরেশ দত্ত। শুধু কথার চালাকিতে মানুষকে বোকা করে দিয়ে লোকটা অনেক ক্লাব সমিতি আর সেবাকার্যের টাকা মেরেছে। ভুয়ো কোম্পানী করার অভিযোগে দু'বার মামলায় পড়েছিল। ওর মুখের কথা আর হাতের সইকে আজ অন্তত এই পাড়ার কোন মানুষ বিশ্বাস করে না।

নরেশ দত্তের বাড়ির সামনে ভীড়ের হল্লা বাড়ে। দৌড়োদৌড়ি করে পুলিশ কনস্টেবল। সেই দিকে তাকিয়ে বিনোদবাবু বলেন—প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স হলো লোকটার, তবু কি

আশ্চর্য, মানুষকে ধাপ্পা দেবার ব্যবসা করে দিব্যি দিন কাটিয়ে দিচ্ছে আর টাকা জমাচ্ছে। মাত্র একটা প্রাণ, টাকার জন্য এত লোভের দরকারই বা কি?

কিন্তু চিন্ময়বাবু বলেন--ভালই হলো, লোকটাকে পাড়া থেকে সরাবার অনেক চেষ্টা করেছিলাম, পুলিশকেও অনেকবার বলেছিলাম। কিন্তু কোনই ফল হয়নি। আজ যাই হোক...।

আজ দেখা যাচ্ছে লোকটা সত্যিই চলে যাচ্ছে। পাড়ার মধ্যে এরকম একটা সাংঘাতিক বোগাস লোক থাকলে পাড়ার পক্ষেই আশঙ্কার কথা।

আক্ষেপ শুধু এই যে, লোকটা একটুও জব্দ হলো না। বেশ মোটারকম বাগিয়ে নিয়ে, আর খুশি মনে একটা উই-খাওয়া আর ঘুনধরা অপয়া বাড়িকে পাড়ার বুকের উপর ফেলে রেখে সরে পড়বে বোগাস নরেশ দত্ত। শুধু হাটখোলার মহাজন কৈলাসবাবু নয়, বিনোদবাবু চিন্ময়বাবু, আর প্রতিবেশীদের ভীড়টাও একটা চাপা আক্রোশ নিয়ে নরেশ দত্তের বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু লোকটা এখনো বাড়ির ভিতর বসে করছে কি? বোধহয় ট্যারা চোখ নিয়ে হাসছে আর সিগারেট খাচ্ছে।

হঠাৎ একটা শোরগোল জাগে বাড়ির সামনে পথের ভীড়ের মধ্যে। কি হয়েছে? কি হয়েছে? প্রশ্ন করে সকলেই।

পুলিশ কনস্টেবল বলে--বাড়ির বের হতে চাইছে না লোকটা।

গর্জন করেন হাটখোলার মহাজন, আর সেই গর্জনে এতক্ষণের একটা হতাশ আক্রোশ উল্লাস হয়ে ফেটে পড়ে।--গলা টিপে, কান ছিঁড়ে, ঘাড়ে ধরে, লাথি মেরে বের করে দিন বেটাকে। হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে আসুন ঠগটাকে।

আদালতের কেরানী পুলিশ কনস্টেবলকে লক্ষ্য করে বলেন--দেখবেন মশাই, একটু সামলে কাজ করবেন। মনে হচ্ছে, লোকটার কোন অসুখ-বিসুখ করেছে।

কনস্টেবল বলে--আমার মনে হয় লোকটার মাথা খারাপ হয়েছে। বিছানাটা গুটিয়ে বগলদাবা করে নিয়ে চুপ কবে মেজের ওপর বসে রয়েছে। কিন্তু উঠতে চাইছে না।

আদালতের কেরানী বলেন--তাহলে বোঝা যাচ্ছে, অসুখও হয়েছে, মাথাও খারাপ হয়েছে। কাজেই, এ অবস্থায় লোকটার গায়ে হাত দেওয়া ঠিক আইন মতো কাজ হবে কি?

হাটখোলার মহাজন কৈলাসবাবু দুটো দশ টাকার নোট বের করে আদালতের কেরানী আর পুলিশ কনস্টেবলের হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে চাপা স্বরে ফিসফিস করে বলেন--আর জ্বালা বাড়াবেন না মশাই। এইবার খুশি হয়ে কাজটা সেরে দিন। লোকটাকে ঘাড়ে ধরে...।

বাড়ির ভিতরের দিকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেল কনস্টেবলের মারমূর্তি' চেঁচাতে থাকেন কৈলাসবাবু--কান ধরে হিড়হিড় করে, একেবারে হেঁচড়ে ঘেঁষড়ে টেনে...।

কিন্তু বৃথাই প্রতীক্ষায় ছটফট করেন মহাজন কৈলাসবাবুর পথের ভীড়। কনস্টেবল ভিতরে গিয়েছে তো গিয়েছেই, ফিরে আসে না।

গর্জন করেন আদালতের কেরানীবাবু--এঃ, এত সমীহ করার কী আছে? হাত ধরে টেনে আনলেই তো...।

বলতে বলতে কেরানীবাবু তাঁর হাতের ক্রোকী পরোয়ানা বুকে চেপে নিয়ে বোগাস নরেশ দত্তের উই-খাওয়া বাড়ির ভিতর লক্ষ্য করে ছুটে যান।

কিন্তু বৃথা, কেরানীবাবু ফিরে আসেন না। পুরো দশটা মিনিট সময় পার হয়ে যায়। অস্থির হয়ে আতঙ্কিত ভাবে ডাক ছাড়েন কৈলাসবাবু--কি হলো মশাই?

পথের ভীড় কৌতূহল সহ্য করতে না পেরে মুখর ও চঞ্চল হয়ে ওঠে--কি হলো? কি হলো? আবার কি কাণ্ড হলো?

সামনের বাড়ির বারান্দায় বিনোদবাবু আর চিন্ময়বাবু চেঁচিয়ে ওঠেন--কি হলো?

কৈলাসবাবু বলেন--লোকটা আবার ভোগা দিচ্ছে মশাই, বের হতে চাইছে না।

বিনোদবাবু বলেন--আর দেরি করবেন না। নইলে আবার একটা ফ্যাসাদ বাঁধিয়ে তুলবে।

ভীড়ের মধ্যে কে একজন চেঁচিয়ে ওঠে—বাঁধিয়ে তুলেছে বোধহয়।

কৈলাসবাবু দাঁতে দাঁত চেপে হুঙ্কার ছাড়েন--তাহলে?

বলতে বলতে স্বয়ং কৈলাসবাবু আর পথের সমস্ত ভীড় হুড়মুড় করে বোগাস নরেশ দত্তের ঘুনধরা বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ে।

এতক্ষণে সব চাঞ্চল্য আর মুখরতাকে যেন হঠাৎ গিলে ফেলেছে অপয়া বাড়িটা। একেবারে স্তব্ধ, কোন শব্দ হয় না! বাড়ির ভিতরে ঢুকে এত বড় একটা কলরবও কি মরে গেল?

বিনোদবাবু উঠে দাঁড়ান। ব্যাপার কি? লোকটা বের হয় না কেন?

চিন্ময়বাবু এক দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকেন--লোকটাকে বের করে দেওয়া হচ্ছে না কেন? এত দেরী কিসের জন্য?

বিনোদবাবু--বোধহয় আবার একটা ব্লাফ দিয়ে সকলকে বোকা বানাচ্ছে বোগাসটা।

চিন্ময়বাবুর দুই চোখ কটমট করে ওঠে—তাহলে আমাদের কর্তব্য হলো...।

যেন পাড়ার মধ্যে এক ঝোপের ভিতর ক্ষেপা শেয়াল লুকিয়ে রয়েছে। বের হতে চায় না, কিন্তু বের করে দিতে হবে। ধমক না শুনলে ঘাড়ে হাত দিতেই হবে। দিতে দেরী হচ্ছে কেন? কি এমন সমস্যা?

চিন্ময়বাবু বলেন—আপনি একটি ধমক দিলে কাজ হবে বিনোদবাবু।

আর দেরি করলেন না বিনোদবাবু আর চিন্ময়বাবু! ব্যস্তভাবে হেঁটে এসে ঘুনধরা বাড়িটার ভিতরে ঢুকলেন।

সত্যিই কি ভয়ানক ব্লাফ জমিয়েছে বোগাস নরেশ দত্ত।

এতগুলি লোকের ভিড় যেন হতভম্ব হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছে নরেশ দত্তের ট্যারা চোখ দুটোকে, আর মাঝে মাঝে আর একটি জিনিসকে।

পুলিশ কনস্টেবলের হাত দুটো যেন অকর্মণ্য পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে রয়েছে, একটুও নড়ে না। বোগাস নরেশ দত্তের ঘাড় স্পর্শ করবার সাহস নেই কনস্টেবলের ঐ দুই হাতে। আদালতের কেরানী ক্রোকী পরোয়ানা মিছামিছি পড়েন আর এদিক ওদিক তাকান।

হাটখোলার মহাজন কৈলাসবাবু আস্তে আস্তে মাথা চুলকান, আর এক পাশে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার চেষ্টা করেন।

আর, ভীড়ের লোক অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে, যেন বোগাস নরেশ দত্তকে নতুন করে চেনবার চেষ্টা করছেন বিশ জোড়া চক্ষু।

ময়লা উইধরা দেয়ালের গায়ে ছোট একটি শিশুর হাতের একটি কালিমাখা ছাপ। গোটানো বিছানা বগলদাবা করে বসে আছে বোগাস নরেশ দত্ত, আর তার ট্যারা চোখের দৃষ্টি নিষ্পলক হয়ে রয়েছে সেই কালিমাখা ছাপের দিকে তাকিয়ে। যেন হঠাৎ কোমর ভেঙ্গে বসে পড়েছে নরেশ দত্ত, আর উঠতেই পারছে না। অচল অনড় স্তব্ধ করে দিয়েছে নরেশ দত্তকে, ঐ কোন এক শিশুর হাতের ছোট্ট একটি কালিমাখা ছাপ।

বিনোদবাবু চমকে ওঠেন। চিন্ময়বাবু ভয় পেয়ে বিনোদবাবুর কানের কাছে ফিসফিস করেন।—ঐ যে সেই, সেই যে আপনি গল্পটা বলেছিলেন, মনে পড়েছে বোধহয়, ঐ ছাপটা বোধহয় ওরই...।

বিনোদবাবু--হ্যাঁ, ওরই ছেলের হাতের ছাপ।

বোগাস নরেশ দত্তের ভয়ঙ্কর ব্লাফ সত্যিই একেবারে অকর্মণ্য করে দিয়েছে আদালতের ক্রোকী পরোয়ানা আর এতগুলি আক্রোশ আক্ষেপ আর প্রতিশোধের দাবীগুলিকে।

ঠিকই, উঠতে পারছে না বোগাস নরেশ দত্ত। যেন আজ পঁচিশ বছর পরে নিজেকেই হঠাৎ চিনতে পেরে ভয় পেয়েছে নরেশ দত্ত, আর ধপ করে বসে পড়েছে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এতগুলি সুবিচার আর প্রতিশোধের মূর্তিগুলিকেও যেন বসিয়ে দিয়েছে নরেশ দত্ত। মহাজন কৈলাসবাবু অসহায়ের মতো ভাঙ্গাগলায় আস্তে আস্তে বলেন—এখন আপনিই একটা পরামর্শ দিন বিনোদবাবু।

কথা বলেন বিনোদবাবু—তুমি যদি ইচ্ছে করো তবে এখনো এখানেই থাকতে পার নরেশ, কিন্তু মহাজনদের টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে।

কোন উত্তর দেয় না নরেশ দত্ত।

বিনোদবাবু—এই বাড়ির জন্য যদি এতই মায়া ছিল, তবে কেন মিছিমিছি...।

উত্তর দেয় না নরেশ দত্ত।

বিনোদবাবু—যদি কথা দাও যে, একমাসের মধ্যে সকলের পাওনা মিটিয়ে দেবে, তাহলে...।

চিন্ময়বাবু বলেন—তাহলে এঁরাও ক্রোক স্থগিত রাখবেন, আর তুমিও আপাতত এখানে থাকতে পারবে নরেশ।

গোটানো বিছানাটা আস্তে আস্তে খুলে ঘরের দেয়াল ঘেঁষে পেতে ফেলে নরেশ দত্ত। বিছানার উপর বসে, আর দেয়ালের কালিমাখা ছোট্ট হাতের ছাপের দিকে ট্যারা চোখে অদ্ভুত এক স্নেহান্ধ দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে। যেন দু'চোখের সাধ ঢেলে দিয়ে জীবনের একটা খাঁটি সম্পত্তির রূপ দেখছে নরেশ দত্ত।

বিনোদবাবু বলেন—তাহলে কি বলছ নরেশ?

আনমনার মতো বিড় বিড় করে নরেশ দত্ত বলে—পরের কথা পরে। এখন আমি এক পা'ও নড়তে পারবো না বিনোদদা।

আর্তস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন মহাজন কৈলাসবাবু—তাহলে আমার কি হবে? একটা পরামর্শ দিন আপনারা।

ঘরের ভিতরে ভিড় কোন উত্তর না দিয়ে চুপচাপ আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে বের হয়ে যায়।

বোধহয় আধ মিনিটও পার হয়নি, মহাজন কৈলাসবাবুও যেন প্রচণ্ড একটা ভয়ের তাড়া খেয়ে ঘরের ভিতর থেকে ছুটে বের হয়ে এসে বাইরের ভিড়ের কাছে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকেন।

আদালতের কেরানী প্রশ্ন করেন—কি হলো?

কৈলাসবাবু বলেন—উঃ, কি ভয়ানক জিনিস!

কেরানীবাবু হাসেন—কার কথা বলছেন? বোগাস নরেশ দত্ত!

কৈলাসবাবু—আরে না মশাই ; দেওয়ালের গায়ে ঐ যে একটা...। যাক্‌গে, এইবার একটা পরামর্শ দিন।

কেরানীবাবু চিন্তিতভাবে বলেন—আপাতত...।

ফল্গু ও ফাল্গুন

আর দেরী না করে, আগন্তুক ভদ্রলোককে স্পষ্ট করে বলে দিতে হবে যে, আপনি এখন চলে যান। কারণ, আপনি যাঁর নামে চিঠি নিয়ে এসেছেন, তিনি এখন বাড়িতে নেই..., তিনি আজও নয় কালও নয়, একেবারে পরশু দিন সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে ফিরবেন। তাছাড়া বাড়িতে এখন দ্বিতীয় কোন পুরুষ মানুষও নেই যে আপনার সঙ্গে কোন কথা নিয়ে আলোচনা করতে পারে।

স্টেশনমাস্টার সুধাকরবাবুর কাছ থেকে এই বাড়ির হেমবাবুর নামে যে চিঠি নিয়ে এই ভদ্রলোক এসেছেন, তাতে শুধু লেখা আছে যে, এই ছেলেটি হলো আমার এক বন্ধুর ছেলে জয়ন্ত। জয়ন্ত ওর দরকারের কথাটা নিজেই আপনাকে বলবে। আমি আজ দুপুরে চক্রধরপুর যাচ্ছি, ভোরের ট্রেনে ফিরবো। হ্যাঁ, খুব সুন্দর একটা ময়ূর যোগাড় করেছি। আপনি যদি নিতে চান, তবে পাঠিয়ে দেব।

কিন্তু আগন্তুক এই ভদ্রলোক, যার নাম জয়ন্ত, যার চেহারা দেখে মনে হয় বয়স তিরিশের বেশি হবে না, আর ওই সামান্য যে পরিচয় স্টেশনমাস্টার সুধাকরবাবুর চিঠিটাতে লেখা আছে, সেটা তো প্রায় একটা অপরিচয়। বলতে গেলে, নিতান্ত অজানা একটা মানুষ।

রেল-স্টেশন এখান থেকে প্রায় এক মাইল দূরে, এই কদমপুরা এখনও একটা শহর হয়ে উঠতে পারেনি। বাজার আছে, বস্তি আছে ; তাই একটা থানা আছে, আর আছে, রোড ওভারসিয়ারের এই সরকারী কোয়ার্টার, বাংলো-ধাঁচের ছোটখাটো একটি বাড়ি, যার টালির চালা লতানে গোলাপের ফুলে ও পাতায় একেবারে ছেয়ে গিয়েছে। বারোমেসে হলদে গোলাপ, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত থোকা থোকা গোলাপের উপর রঙীন ফড়িং আর প্রজাপতি ফুরফুর করে উড়ে বেড়ায় ; শড়কের পাশে একটা মাঠ, তার এদিকে গোটা চারেক পলাশ, ওদিকে কদমের ফুল। সবচেয়ে সুখের হলো, কদমপুরার শালবনের শোভা আর দূরের ওই জোড়া-পাহাড়। ভোরের আলো, পুবের মেঘ, আর চাঁদের আলো-মাখানো শীতের কুয়াশা, সবই অদ্ভুত এক মায়ার খেলা বলে মনে হয় এই জোড়া-পাহাড় আর শালবন আছে বলে।

এই শালবনেরই ভিতরে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পাথর কাটার কাজ চলে। ঠিকেদারের মোটর লরি সারাদিন ছুটোছুটি করে আর টন টন কুচো পাথর নিয়ে কদমপুরা রেল-স্টেশনের সাইডিং-এ জমা করে। কদমপুরা বাজারে ঠিকেদারদের অনেক আস্তানা আছে ; ডিপো আছে ; মোটর লরির গ্যারেজও আছে। কদমপুরার শান্ত শালবনের মধ্যে ডিনামাইটের চাপা-চাপা শব্দ সারাদিনই বাজে।

আজ প্রায় এক বছর হলো কদমপুরার এই বাড়িতে আছেন রোডি ওবারসিয়ার হেম সরকার। তাঁর আগে যিনি রোড ওভারসিয়ার হয়ে এই বাড়িতে ছিলেন, সেই অতুল রায় এখন সাসারামে আছেন। একটানা প্রায় চার বছর ধরে এই বাড়িতে ছিলেন সেই অতুল রায়। দু'বছর আগে, তার মানে বদলি হবার একবছর আগে এই বাড়িতেই অতুল রায়ের মেয়ে প্রভার বিয়ে হয়েছিল। স্টেশনমাস্টার সুধাকরবাবু এখনও ঠিকাদারদের সঙ্গে গল্প করেন--আঃ বেচারা অতুল কী ভয়ই না পেয়েছিল ; এরকম একটা জংলী কদমপুরাতে মেয়ের বিয়ের সব ব্যবস্থা কী করে হবে? আমি গ্যারান্টি দিয়েছিলাম, কোন চিন্তা নেই অতুল। আমি থাকতে কোন ব্যবস্থার অভাব হবে না। চক্রধরপুর থেকে আমিই তো বাঙালী পুরোহিত নিয়ে এলাম ; আমিই রাজবাড়ির পুকুর থেকে মাছ ধরিয়ে নিয়ে এলাম, প্রায় মণ দুই পাকা পাকা রুই। আমারই চেষ্টাতে বাবুলাল শেঠের ধর্মশালাতে বরযাত্রীদের থাকবার চমৎকার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু...।

—বাড়িতে কে আছেন! জয়ন্তর ডাক শুনে ঘরের দরজার পর্দা সরিয়ে বাইরের বারান্দাতে যাঁরা দুজন উঁকি দিয়েছে, আর জয়ন্তর হাত থেকে চিঠি নিয়ে ঘরের ভিতরে হেমবাবুর স্ত্রী বিজয়ার হাতে দিয়েছে, তারা হলো রমা আর ইমা, হেমবাবুর দুটো মেয়ে। একজনের বয়স দশ, আর একজনের বয়স সাত। আর বিজয়া সেই চিঠি পড়ে যাকে জানিয়েছে, সে হলো বিজয়ারই সমান বয়সের এক মহিলা...হেমবাবুর বড় ভাই ধীরেশ সরকারের মেয়ে রীতা সরকার।

ঠিকাদারদের সঙ্গে মাঝে মাঝে গল্প করেন স্টেশনমাস্টার সুধাকরবাবু—কে বিশ্বাস করবে যে, আমাদের এই রোড ওভারসিয়ার হেমবাবুর বড়দা হলেন দিল্লীওয়ালা একজন সেক্রেটারী, একটা সরকারী দপ্তরের বড়কর্তা। সাহেব মানুষ সেই ডি. সরকার, যিনি এগার বছর লণ্ডনে ছিলেন, যিনি আজকাল ভাল করে বাংলা বলতেও পারেন না, তাঁরই আপন ভাই এই হেমবাবু কিন্তু কুমড়োর কচি ডাঁটা খুঁজে বেড়ান আর চেঁচিয়ে রামপ্রসাদী গান করেন। কী আশ্চর্য, এক বৃন্তে এরকম একেবারে দুটি ভিন্ন ফুলও হয়!

ডি. সরকারের মেয়ে রীতা সরকারও কদমপুরার রোড ওভারসিয়ারের এই বাড়ির ভিতরে এখন একটা অভাবনীয় বিস্ময়েরই শোভা। বয়সে প্রায় সমান হলেও বিজয়া কাকিমার সঙ্গে এই রীতা সরকারের রূপে, গুণে, সাজে ও প্রসাধনে, শিক্ষাতে ও রুচিতে, চোখের চাহনিতে ও হাসির ভঙ্গীতে কোন মিল নেই। যে বিছানার উপর শুয়ে বিজয়া কাকিমার হাতের ওই চিঠির কথাগুলি শুনেছে, রীতা, সেই বিছানার উপর, কে-জানে কোন বিলিতি পাখির পালক দিয়ে তৈরি একটা ঢাকা, বিছানার উপর, একগাদা বই ছড়িয়ে পড়ে আছে। সবই ফরাসী নভেল। ইংরেজীর এম-এ রীতা সরকার ফরাসী ভাষাও জানে। বিছানার পাশে ছোট একটি টেবিলের উপরে ছোট একটি আয়না, লিপস্টিক আর পাউডারের ডিবে পড়ে আছে। আর আছে, একজোড়া আইল্যাশ। জিনিসগুলি রীতা সরকারের যখন-তখন দবকার হয় ; তাই হাতের কাছেই থাকে। সন্ধ্যা হবার পর গরম জলের ভাপ আর স্কিন-লোশন দিয়ে মুখটাকে ধোয়ামোছা করে নিয়ে তারপর ওই আইল্যাশ যখন চোখে লাগায় রীতা, তখন রমা ইমা খুশি হয়ে হাততালি দেয় ও নেচে ওঠে—রীতাদির কী সুন্দর চোখ! বিজয়াও আশ্চর্য হয় আর অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকে। ঠিকই, রীতার দুই চোখের পাতা যেন স্বপ্নমাখানো দুটি মায়ার ঝালর। রীতা হাসে, চোখ বড় করে তাকায়। রীতার ওই সুন্দর মুখের শোভাও যেন টলমল করে দুলতে থাকে।

ওভারসিয়ার কাকার বাড়িতে কুমড়োর কচি ডাঁটার ঝাল খেতে খুব আপত্তি নেই রীতার। কিন্তু সেজন্য রীতার বিজয়াকাকিমার দুশ্চিন্তার কোন ঝঞ্ঝাট নেই। রীতা নিজেই তার দরকারের অনেক উপচার সঙ্গে নিয়েই এসেছে—মাখন বিস্কুট মাংস ও মাছের সস্, জ্যাম ও জেলির গুঁড়ো, ডিম আর গুঁড়ো দুধ, পীচ আর আঙুরের যত ডিবে শিশি আর বোতল। নিজের রুচি আর অভ্যাসের জন্য যা-কিছু দরকার, তার অনেক কিছুই নিয়ে এসেছে রীতা। ভাসুরের সঙ্গে পুরো দুটি বছর জাপানের টোকিওতে ছিল যে ভাসুরঝি, তার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার নিয়ে কদমপুরার এই কাকিমা মানুষটিকে তেমন কোন সমস্যায় পড়তে হয়নি।

একটি মাস, বড় জোর দুটি মাস এই কদমপুরাতে কাকার বাড়িতে থাকবে, তারপর আবার দিল্লিতে ফিরে যাবে রীতা সরকার। কোন কুণ্ঠা না রেখে, সমবয়সী কাকিমাদের কাছে মনের কথাটা বলেই দিয়েছে রীতা—আমি ইচ্ছে করেই ফেরারী আসামীর মতো গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকবার জন্যে তোমাদের এখানে এসেছি কাকী। কেউ জানে না, শুধু বাবা জানেন যে, আমি এখন তোমাদের এই কদমপুরাতে আছি।

বিজয়া হেসেছেন—কার নজরের ভয়ে গা-ঢাকা দিলে?

—ভয়ে নয়, ভয়ে নয়। চেঁচিয়ে হেসে ওঠে রীতা।

—তবে?

—ভালবেসে।

—ভালবাসলেই যদি, তবে আবার লুকিয়ে থাকা কেন?

—কাকী, তুমি কিছুই বুঝতে পারছ না,—এটা হলো ভালবাসায় ট্রায়াল। জানতে চাই, বুঝতে চাই, বেচারা সোমেন আমাকে দেখতে না পেয়ে আর খুঁজে না পেয়ে পাগল হয়ে গেল কি না।

—তাতে তোমার লাভ?

—আমার লাভ এই যে, সোমেন এইবার মর্মে মর্মে বুঝতে পারবে যে, আমিই ওর জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সুখ। আমি ছাড়া সোমেনের জীবনটা জীবনই নয়।

বিজয়া আবার হাসেন—সোমেনকে পাগল করতে গিয়ে শেষে তুমি নিজেই পাগল হয়ে যাবে না তো?

—আমি? আমি পাগল হব? রীতা সরকার পাগলী হবে? তুমি আমার প্রাণটাকে একটুও চিনতে পারনি, কাকী।

রুমাল দিয়ে সুন্দর মুখের চাপা হাসিটাকে একটু আড়াল করে নিয়ে রীতা সরকার বলে—তোমার কাছে মুখ খুলে মনের কথা বলতে আমার কোন লজ্জা নেই, তাই বলছি কাকী, সোমেনকে ভালবেসেছি বটে, তবু এখনও ভাবতে হচ্ছে, সোমেনকে একেবারে স্পষ্ট করে একটা হ্যাঁ বলে দিয়ে নিশ্চিন্ত করে দেওয়া উচিত হবে কি না।

—এ কী কথা! খুব অদ্ভুত কথা!

—আমি আজ পর্যন্ত কাউকেই একেবারে স্পষ্ট করে হ্যাঁ বলতে পারিনি। মৃগাঙ্গ মনে করে, আমি ওকে বিয়ে করবো। শিবরামন মনে করে, ওরই সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। আমার দোষ নয়, কাকী। আমি কখনও কাউকে কোন কথা দিইনি। ওরা নিজের নিজের ইচ্ছায় বিশ্বাস করে বসে আছে।

—কিন্তু...।

—আমার মনের ভিতরে কোন 'কিন্তু' নেই কাকী। আমি এত তাড়াতাড়ি কাউকেই কোন কথা দিয়ে ফেলতে পারবো না, এমনকি সোমেনকেও না।

—এ যে আরও অদ্ভুত কথা হয়ে গেল, রীতা।

—হতে পারে, কিন্তু আমার উপায় নেই, কাকী। আমি এত সহজে...।

বিজয়াকাকিমা এইবার রীতার হাতে আস্তে একটা চিমটি কাটেন ও হাসেন—তার মানে, ঢলে পড়তে পার, কিন্তু গলে পড়তে পার না। তাই না?

—জানি না, জানি না। বলতে বলতে মাথা দুলিয়ে হেসে ওঠে রীতা। দুই চোখে দুই মায়ার ঝালর। সেই চমৎকার আইল্যাশও যেন কেঁপে কেঁপে হাসতে থাকে। বিজয়া-কাকিমার গাল টিপে ধরে রীতা সরকার। কাকী, তুমি ভয়ানক দুষ্ট, তোমার ভাষা আরও দুষ্টু।

অতি আধুনিকা ও অতি শিক্ষিতা ভাসুরঝির সঙ্গে কথা বলতে আর এ রকম অদ্ভুত কথা শুনতে ভালই লাগে কদমপুরার বিজায়কাকিমার! একটা ভিন্ জগতের রূপকথা শুনতে কার না ভাল লাগে?

কিন্তু আজ এই মুহূর্তে, ভিন্ জগতের রূপকথার ওই মেয়েকে আগন্তুক ভদ্রলোকের চিঠির কথাগুলি শুনিয়ে দিয়ে কোন লাভ হল না। চিঠির কথাগুলি শুনলো আর হাত বাড়িয়ে একটা নভেল তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করে দিল রীতা সরকার। কোন কথা বলে না রীতা। বিজয়া তাই নিজের মনে গুনগুন করে বলেন—ভদ্রলোককে কী যে বলা যায়, বুঝতে পারছি না।

এইবার কথা বলে রীতা। চলে যেতে বলে দাও, এর মধ্যে ভেবে দেখবার কী আছে?

—বলে দিতে পারা যায়, কিন্তু...

—কিসের কিন্তু?

—কে জানে, হয়তো একজন অতিথি মানুষ। ভদ্রলোক কেন এসেছেন, সে কথাটা না জেনে নিয়ে চলে যেতে বলা উচিত হবে কি?

রীতা হাসে—তাহলে আমার আর বলবার কিছু নেই, যা ইচ্ছে হয় করো।

ফরাসী নভেলটাকে বুকের উপর রেখে এইবার বিছানার উপর এলিয়ে শুয়ে পড়ে রীতা।

কদমপুরার রোড ওভারসিয়ার হেম সরকারের স্ত্রী বিজয়া সরকারের পক্ষে একটু চিন্তিত হবারই কথা। চিঠি দিয়েছেন, আর কেউ নয়, ওই স্টেশনমাস্টার সুধাকরবাবু ; যিনি কদমপুরার এই বাড়ির সব দরকারে তাঁর সাধ্যমত উপকার করেন। এই সেদিন, তিন সের সোনামুগের ডাল যোগাড় করে পাঠিয়েছেন। ইমার অসুখের সময়ে দিনে তিনবার এসে খোঁজখবর নিয়েছেন, রাঁচি থেকে ওষুধ আনিয়ে দিয়েছেন। তাঁর বন্ধুর ছেলে জয়ন্তকে এখনি একেবারে চলে যেতে বলা উচিত হবে? কিন্তু চাকর কালুরামও তো এখন বাড়িতে নেই ; দুধ আনতে দেড় মাইল দূরের সেই মাহাতোর বাড়িতে গিয়েছে। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলবে কে?

বিজয়া অগত্যা দরজার আড়ালে দাঁড়াল। দশ বছর বয়সের রমাকে ডাক দিয়ে বলেন—যা রমা, ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা কর, উনি কেন এসেছেন।

রমা সেই মুহূর্তে দরজার পর্দা সরিয়ে বাইরে আসে আর জিজ্ঞাসা করে—কেন এসেছেন?

জয়ন্ত—হেমবাবুর সঙ্গে দেখা করা আর কয়েকটা কথা বলবার দরকার ছিল।

রমা—বাবা বাড়িতে নেই।

জয়ন্ত—কখন আসবেন?

রমা—আজ আসবেন না।

জয়ন্ত—কিন্তু আমার যে আজই দরকার ছিল।

দরজার আড়াল থেকে রমার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করেন বিজয়া—কী দরকার?

সাত বছর বয়সের ইমা সঙ্গে সঙ্গে একটা দৌড় দিয়ে বাইরে চলে যায় আর জিজ্ঞাসা করে—কী দরকার?

জয়ন্ত হাসে—আমার দরকারের কথা শুনলে তোমরা হেসে ফেলবে না তো?

রমা বলে—আমি হাসবো না।

জয়ন্ত—আজ, সন্ধ্যাবেলা তোমাদের ঘরে যখন আলো জ্বলবে, তখন আমি তোমাদের একটি ঘরের ভিতরে, এই যে বারান্দার এদিকে এই ছোট ঘরটার ভিতরে গিয়ে একটু দাঁড়াবো আর দেখবো।

সন্ধ্যা হতে তো আর বেশি দেরি নেই। পলাশের মাথার উপরে বিকালের শেষ রোদের শেষ আভাটুকুও এখন আর নেই। এরই মধ্যে কদমকুঞ্জের পাশে বুড়োটার বটের মাথার উপরে বাদুর উড়তে শুরু করেছে। ফাল্গুন মাসের পাহাড়ী কদমপুরার শেষ বিকালের বাতাস বেশ ঠাণ্ডা হয়ে বইতে শুরু করেছে, সিরসির করে কাঁপছে শালবনের মাথা।

দরজার আড়ালে বিজয়ার দিকে একবার তাকায় রমা, তারপর জয়ন্তর দিকে তাকিয়ে আরও চেঁচিয়ে প্রশ্ন করে—কেন?

জয়ন্ত হাসে—আজ একুশে ফাল্গুন, আমার বিয়ের দিন। তিন বছর আগে সেদিন এ বাড়িতে যিনি ছিলেন, সেই অতুল রায়ের মেয়ে প্রভার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল। আর, ওই ছোট ঘরটাই হয়েছিল বাসরঘর।

রমা—তোমার বউ কোথায়?

জয়ন্ত অদ্ভুতভাবে হাসে—আমার বউ মরে গিয়েছে।

ইমা—তুমি খুব কেঁদেছিলে?

জয়ন্ত—হ্যাঁ।

ইমা—আবার কাঁদবে?

জয়ন্ত—হ্যাঁ। সব সময়ই তো কাঁদছি, কেউ কিন্তু বুঝতে পারে না।

দরজার আড়ালে চুড়ির শব্দ বাজে, একটা চাপা গলার স্বরও ফিস্‌ফিস্ করে—বসতে বল, রমা।

রমা—তুমি বসো। বারান্দার একটা চেয়ারের উপরে বসে পড়ে জয়ন্ত। বিজয়ার হাতের ইশারা দেখতে পেয়ে রমা ঘরের ভিতরে ছুটে আসে, তারপর বাইরে গিয়ে জয়ন্তর চেয়ারের হাতল ধরে দাঁড়ায়—তুমি এখন চা আর পরোটা খাবে, তারপর সন্ধ্যা হলে...।

ইমা ছুটে এসে জয়ন্তর হাঁটুর উপর হাত রেখে ছট্‌ফট্ করতে থাকে—আলু ভাজাও খাবে।

জয়ন্ত চেঁচিয়ে হেসে ওঠে—না না, আমি কিছু খাব না। আজকের দিনে আমি কিছুই খাই না।

ইমা—তোমার বউ মরে গেল কেন?

—কে জানে কেন। নিজেই আমাকে চিঠিতে লিখলে জ্বর কমেছে, এইবার শিগগিরই আমি তোমার কাছে যাব। তুমিই এসে নিয়ে যেও।

রমা—তুমি আসনি?

—হ্যাঁ। চিঠি পেয়ে সাতদিনের মধ্যেই চলে এলাম। কিন্তু এলে কি হবে, এসেই জানতে পেলাম, প্রভা তিন দিন আগেই চলে গিয়েছে।

ইমা—কোথায় গেল?

—ওই ওই যে জোড়া পাহাড়ের মাথার উপরে একটা তারা ফুটে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ?

ইমা—হ্যাঁ।

—ওইখানে চলে গিয়েছে প্রভা।

ইমা—কবে আসবে?

—আর আসবে না, কোনদিনও না। আমি চিরকাল একলা হয়ে এই পৃথিবীতে পড়ে থাকবো।

রমা—তুমি কোথায় থাক?

—আমি থাকি অনেক দূরে, আসামে। সে জায়গাটার নাম হাফলং। সকাল থেকে মাঝ রাত পর্যন্ত রেলগাড়ীতে থাকি। তার পর ঘরে ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু ঘুম হয় না।

ইমা—তোমার সাইকেল নেই?

—আছে।

ইমা—তবে রোজ রেলগাড়ীতে চড়ো কেন?

—আমি ট্রেনের গার্ড।

রমা—তুমি হুইসিল বাজাও? নিশান দেখাও?

—হ্যাঁ। ওই তো আমার কাজ।

রমা—কাজ করে টাকা পাও?

—হ্যাঁ।

রমা—অনেক টাকা?

—হ্যাঁ, একশো আশি টাকা।

রমা—বাবা পায় দু'শো দশ টাকা।

রমা আর ইমা হঠাৎ এক সঙ্গে দৌড় দিয়ে ঘরের দরজার দিকে ছুটে যায়। দরজার পর্দার

আড়াল থেকে একটা ইশারার হাত ডাক দিয়েছে। গলার স্বর চেপে কথা বলে বিজয়া— তোমরা এখন ঘরের ভেতরে থাক। কালুরাম আসুক। ঘরে আলো জ্বলুক, তারপর না হয়...।

বুকের উপর থেকে ফরাসী নভেল নামিয়ে রেখে এইবার বেশ একটু বিরক্ত স্বরে কথা বলে রীতা—তুমি বড় বেশি ইয়ে মানুষ, কাকী। আজেবাজে একটা লোককে এতটা প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হলো না।

বিজয়া চোখ বড় করে তাকায়—আজেবাজে লোক নয়, রীতা। সুধাকরবাবুর বন্ধুর ছেলে। আমাদেরই চেনা অতুল রায়ের জামাই। অতুল রায়ের মেয়ে প্রভাকেও আমি দেখেছি।

রীতা—যাই হোক না কেন, এরকম একটা মানসিক রোগে ভুগছে যে লোক, তাকে আপ্যায়িত করবার কোন মানে হয় না।

বিজয়া—মানসিক রোগ?

রীতা সরকারের চোখের ভ্রূকুটি যেন আরও রাগ করে আর ঘেন্না করে আরও কুঁচকে যায়। —তা ছাড়া আর কী? ট্রেনের গার্ড তো দূরের কথা, কোন সোমেন মজুমদার যদি আজ এখানে এসে এরকম প্রেমের একটি আষাঢ়ে গল্প বলতো, তবে আমি তাকেও মানসিক রোগের মানুষ বলে মনে করতাম। যদিও সোমেন হলো...।

বিজয়া—কী?

রীতা—দিল্লীর নাম-করা সার্জন, সোমেনের শুধু একটি ক্লিনিকের মাসিক আয় দশ হাজার টাকার মতো। তা ছাড়া আলমোড়াতে সোমেনের দুটি বাড়ি আছে। দেখতে শুনতে সোমেনের মতো ব্রাইট আর স্মার্ট মানুষ তুমি সারা কলকাতাতেও খুঁজে পাবে কি না সন্দেহ।

বিজয়া হাসেন—ভগবান করুন, আসছে বৈশাখেই যেন সোমেনের সঙ্গে তোমার...

রীতা—আঃ, চুপ করো, কাকী। ওসব কথা এখন থাক। তুমি এখন লোকটাকে চলে যেতে বলে দাও।

বিজয়া—বলতে পারা যাবে না, রীতা।

রীতা—তুমি যদি বলতে না পার, তবে আমিই বলে দিই।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় রীতা। জানালার পর্দাটাকে টেনে একপাশে সরিয়ে দেয়। বাইরের বারান্দার দিকে তাকায়। সত্যিই বুঝি এখন ভদ্রলোককে হাঁকিয়ে দেবে রীতা।

—থাম রীতা, লক্ষ্মীটি, তুমি কোন কথা বলো না। রীতার হাত চেপে ধরে মিনতি করেন বিজয়া।

জানালার কাছ থেকে সরে এসে রীতা হাসতে থাকে—এই লোকটা! ওই কালো কষ্টিপাথর আর আধ-মাথা টাক উনিই নাকি আস্ত একটি রোমান্সের মস্ত একজন হিরো। আমার যে হাসতেও ইচ্ছে করে না কাকী!

কিন্তু হেসে হেসেই আবার ফরাসী নভেল হাতে তুলে নেয় রীতা সরকার। ঘরে এখনও আলো জ্বলে নি, বই পড়া সম্ভব নয়। তবু বোধহয় বিদ্‌ঘুটে একটা অস্বস্তির ছোঁয়া থেকে মনটাকে মুক্ত করবার জন্যে বই পড়তে চেষ্টা করে রীতা।

বিজয়া বলেন—প্রভাও দেখতে বেশ কালো ছিল। তার উপর বেশ রোগা। কিন্তু মুখের হাসিটা বেশ মিষ্টি। লেখাপড়া কিছুই শেখেনি, কিন্তু কী অদ্ভুত খাটতে পারতো মেয়েটা। স্বভাবটাও কত নরম। চার বছর আগে, রামগড়ে বদলি হবার সময় আমরা সবাই এই বাড়িতে এসে একদিন ছিলাম। আমাদের কী যত্নই না করেছিলেন অতুলবাবু। সবচেয়ে আশ্চর্য করে দিয়েছিল ওই প্রভা। আমার কোন আপত্তি শুনলো না, নিজের হাতে গরম জল দিয়ে আমার পা ধুয়ে দিয়ে আলতা পরিয়ে দিল। প্রভার কথা মনে পড়লে সত্যিই মনটা বেশ খারাপ হয়ে যায়।

দুধ নিয়ে ফিরে এসেছে চাকর কালুরাম। বিজয়া বলেন—ওই ঘরে একটা আলো জ্বেলে

দাও কালু ; আর ওই বাবুকে বল, ঘরে আলো জ্বালা হয়েছে, এখন ঘরের ভিতরে গিয়ে যা দেখবার দেখে নিন।

পাশের ছোট ঘরে আলো জ্বালে কালুরাম। ঘরের দরজাও খুলে দেয়। রমা আর ইমা সেই মুহূর্তে দৌড় দিয়ে আবার বারান্দায় গিয়ে জয়ন্তর হাত ধরে টানাটানি করে--চল, তোমার বাসরঘর দেখবে চল।

ঘরের ভিতরে ঢুকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে জয়ন্ত। ঘরের আলোর আভা যেন চিকচিক করে জয়ন্তর দুই চোখের তারার উপরে জ্বলতে থাকে।

রমা—কী দেখছো?

জয়ন্ত—ঠিক ওইখানে মেঝের উপর সুন্দর একটা আলপনা ছিল, হলদে রঙের ধানের মঞ্জরী আর সবুজ রঙের অর্জুন পাতা আঁকা হয়েছিল।

রমা—কে এঁকেছিল? তোমার বউ?

—হ্যাঁ। আর ওই যে, যেখানে ছোট একটা টেবিল রয়েছে, সেখানে ছিল চক্‌চকে পেতলের একটা পিলসুজ! সেই পিলসুজের বাতি সারারাত জ্বলেছিল!

ইমা—তোমার বউ খুব সেজেছিল?

—খুব, খুব ; চমৎকার সেজেছিল। ফিকে গোলাপী একটি বেনারসী শাড়ি পরেছিল ; কপালে আর গালে চন্দনের সব ছাপ ছিল। কপালের মাঝখানে কুমকুমের টিপও ছিল। কী চমৎকার সুগন্ধ, ধূপ পুড়ছিল ওই ওখানে। ঘরের ভিতরে আস্তে আস্তে ঘুরে বেড়ায় জয়ন্ত। একটা জানালার গরাদে হাত দিয়ে কী যেন ভাবতে থাকে।

রমা—তুমি কাঁদছো কেন?

হেসে ফেলে জয়ন্ত—কই, কঁদছি না তো। খুব ভাল লাগছে, তাই আমার চোখ খুশি হয়ে চকচক করছে।...হ্যাঁ, মনে পড়েছে। এই জানালার গরাদগুলো ঝাউপাতা দিয়ে মোড়া হয়েছিল, তার মধ্যে লালচে রঙের নানারকম ফুলও গোঁজা ছিল। আর, ওই দরজার দু'দিকে চাঁদমালার ঝালর ঝুলছিল। আর..

রমা—কী?

—আর, ঠিক এইখানে ছিল একটি খাট, তার উপর বিছানা পাতা। সেই বিছানাতে জুঁইয়ের কুঁড়ি জড়ানো ছিল।

ইমা—বউ গান করেছিল?

—না, গান তো দূরের কথা, আমার সঙ্গে একটি কথাও বলেনি।

রমা—তুমি রাগ করনি?

—খুব রাগ করেছিলাম। যখন দেখলাম, অনেক রাত হয়েছে, তবু প্রভা চুপ করে বিছানার একপাশে বসে আছে আর 'কোনও কথাও বলছে না, তখন আমি রাগ করে ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দার ঠিক ওইখানে একটা চেয়ারের উপর চুপ করে বসে রইলাম।

রমা—বউ তখন ঘুমিয়ে পড়লো?

—না, হঠাৎ দেখি বউ উঠে এসে এই দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে।

ইমা—বউ খুব ভাল মেয়ে।

—হ্যাঁ ; বার বার আমাকে ডাকলো বউ, ঘরের ভিতরে এসে বসুন। আমি কিন্তু রাগ করে বারান্দায় চেয়ারের উপরেই বসে রইলাম। তারপর...।

রমা—কী? কী? বলো, বলো!

—চেয়ারের উপর আমি গুটিসুটি হয়ে বসে ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। হঠাৎ চোখ মেলে দেখি, ওই জোড়াপাহাড়ের মাথার উপর চাঁদ ভেসে উঠেছে। শালবনের মাথার উপর সাদা কুয়াশা থমথম করছে, আর তোমাদের সেই প্রভাদি আমার একটা হাত ধরে টানছে—ঘরে

চলো।

রমা—তারপর কী হলো?

—আমি বললাম, না এখন আর ঘরের ভিতরে যাব না, তার চেয়ে ভাল, দু'জনে মিলে জোড়াপাহাড়ের মাথার ওই চাঁদ আর শালবনের মাথার ওই সাদা কুয়াশা দেখি। ভোর হোক, পাখী ডাকুক, তারপর ঘরের ভিতরে যাব।

ইমা—ভোর হলো কখন?

—ঠিক ভোরের বেলাতে। তোমাদের প্রভাদি বললে, জীবনে আমার উপরে কখনও রাগ করবে না বলো? আমি বললাম কখ্‌খনো না...

আবার বাইরের বারান্দায় এসে চেয়ারটার কাঁধ ছুঁয়ে দাঁড়ায় জয়ন্ত। রমা বলে—তুমি এখন চলে যাবে?

—হ্যাঁ, যদিও এখনই চলে যেতে ইচ্ছে করছে না।

ইমা—তবে এখানেই বসে থাকো।

—যদি তোমরা বলো, আপত্তি না করো, তবে থাকবো।

রমা—থাকতেই হবে। এখন স্টেশনে যাবে কি করে? পথে জঙ্গল আছে ; মহুয়াতলায় ভালুক বসে আছে।

—তাই তো শুনেছি।

রমা—কিন্তু সারা রাত এখানে বসে থাকতে তোমার ভয় করবে না?

—না।

রমা—প্রভাদি যদি ভূত হয়ে এসে তোমাকে ধরে?

হেসে ওঠে জয়ন্ত—না না, তোমাদের প্রভাদি কখনও ভূত হতে পারে না। কিন্তু স্বপ্নের ছবির মতো আমার চোখের কাছে দেখা দিতে নিশ্চয়ই পারে। সেটাও তো চমৎকার ব্যাপার। আমিও তাই চাই।

ভিতরের ঘরে হঠাৎ একটা শব্দ বেজে ওঠে। রীতা সরকার বোধহয় ভুল করে, কিংবা খুব বিরক্ত হয়ে হাতে-ধরা ফরাসী নভেলটাকে রেখে দিতে গিয়ে মেজের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

রমা আর ইমা দৌড় দিয়ে ঘরের ভিতরে চলে আসে। আর বিজয়া ফিস্‌ফাস্‌ করে কালুরামের সঙ্গে কথা বলেন।—বাবুকে বুঝিয়ে বল, সারা রাত এখানে কষ্ট করে বসে না থেকে ঠিকেদার রতন সাহুর আস্তানাতে গিয়ে থাকুন। সেখানে থাকবার জায়গা আছে। পয়সা দিলে খাটিয়া আর কম্বল পাওয়া যায়। নয়তো যদি নেহাতই থাকতে ইচ্ছে করেন, তবে ওই ছোট ঘরের ভিতরেই থাকতে পারেন। কিন্তু তাহলে, কালুরাম তুমিও এখানে থাকবে, তুমি আর আজ বাড়ি যাবে না।

কালুরামের কাছ থেকে সব কথা শুনে জয়ন্ত যা বলে, সে-কথার সবই এই ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে শুনতে পাওয়া যায়। বিজয়া শোনে, রীতা সরকার শোনে, আর রমা ও ইমাও শোনে।

জয়ন্ত বলছে—আপনাদের শত ধন্যবাদ, কিন্তু আমি শুধু এই বারান্দাতে বসেই রাতটা কাটিয়ে দিয়ে যেতে চাই ; ঘরের ভিতরে থাকবার দরকার নেই। এই মাঠ, ওই পলাশ আর কদমকুঞ্জ, এসবই তো আমার চেনা। কিন্তু আপনারা যদি কোন অস্বস্তি বোধ করেন, তবে অবশ্য আমি চলেই যাব।

দরজার পর্দার দিকে তাকিয়ে আর বিজয়ার ইশারা বুঝে নিয়ে চাকর কালুরামও একটা হাঁপ ছাড়ে আর কথা বলে—তবে আপনি থেকেই যান, বাবু। আমাদের কোন অসুবিধে নেই।

টকটকে টাট্‌কা লালের প্রলেপ দিয়ে রীতা সরকারের নরম দুই ঠোঁটের শোভা রাতুল

করে তোলে যে নন-স্মী য়ার লিপস্টিক, সেই লিপস্টিক টেবিলের উপর থেকে তুলতে গিয়ে রীতা সরকারের হাতটাই যেন খট্ করে একটা শব্দ করে বেজে ওঠে। খুবই বিরক্ত একটা অস্বস্তির শব্দ। কী আশ্চর্য, কাকী কি একটুও বুঝতে পারে না যে, এরকম অদ্ভুত স্বভাবের একটা লোককে, একটা আষাঢ়ে গল্পকে এভাবে সারা রাত ধরে বাড়ির বারান্দায় বসিয়ে রাখা কোন ভদ্রতা নয়, সুরুচিও নয়। এখনই আবার একটা অচেনা লোক এসে যদি বলে যে মন্তরের জোরে সে এই বাড়ির সব সোনার গয়না ডবল করে দেবে, তবে কাকী বোধহয় তখনি খুশি হয়ে লোকটাকে ঘরের ভিতরে শোবার ঠাঁই করে দেবে। ছিঃ, এ কেমন দুর্বলতা।

বিজয়া বোধহয় বুঝতে পেরেছেন যে, রীতা খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছে। রীতা খুবই অস্বস্তি বোধ করছে। তাই খুব করুণ করে একটা অনুরোধের কথা বলেন বিজয়া—তুমি কিছু মনে করো না রীতা। কিংবা মনে করো যে কোন মানুষ-টানুষ নয়, শুধু একটা ছায়া বাইরে বারান্দায় বসে আছে।

রীতা হাসে—আমি তাই মনে করি, কাকী।

কদমপুরার বাতাসে শব্দের সাড়া জাগিয়ে ডাউন মাল গাড়ীটা চলে গেল। তার মানে, এখন রাত আটটা। তারপর আরও দুটো ঘণ্টা। ফাল্গুন মাসের পাহাড়ী কদমপুরার রাত নিঝুম হয়ে যায়। মাঝে মাঝে শালবনের ঝুরুঝুরু বাতাস হঠাৎ উতলা হয় আর এলোমেলো হয়ে উড়ে বেড়ায়। বুড়ো বটের মাথার উপর ঝুপঝাপ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে খুশি বাদুড়ের ঝাঁক। রোড ওভারসিয়ার হেম সরকারের কোয়ার্টারের বাইরের বারান্দায় সত্যি অদ্ভুত ছায়া চুপ করে চেয়ারের উপর বসে থাকে। কে জানে কিসের আশায়, কাকে দেখতে পাবে বলে এই বারান্দায় বসে রাত জাগছে জয়ন্ত? সত্যিই কি বিশ্বাস করে জয়ন্ত, বাসরঘরে আবার বাতি জ্বলবে, প্রভা এসে আবার তার হাত ধরবে, আর জোড়াপাহাড়ের মাথায় গিয়ে ভেসে ওঠা চাঁদ দেখে দেখে ভোর হয়ে যাবে?

জানালার পর্দা দুলিয়ে দিয়ে ফাল্গুনের কদমপুরার মাঝরাতের একটা দম্‌কা বাতাস ঘুমন্ত রীতা সরকারের ক্রীমমাখা চুলে ভাঙা স্তবক হঠাৎ শিউরে দিয়েছে, তাই বোধহয় চমকে ওঠে রীতা। রীতার ঘুম ভেঙ্গে যায়। বিছানার উপরে উঠে বসে আর জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখতে পায় রীতা, ঠিকই একটা ছায়া রাতের অন্ধকারের মধ্যে কী ভয়ানক কালো হয়ে বারান্দার একটা চেয়ারের উপর বসে আছে। সত্যি, কী বিদ্‌ঘুটে ও বিশ্রী একটা ছায়া। ছায়াটাকে এখনই বলে দিচ্ছে ইচ্ছে করে—চলে যাও।

কিন্তু কী দরকার? যার বাড়ি, সেই বিজয়া কাকী যখন কিছুই বললেন না, তখন দিল্লী থেকে ক'দিনের জন্যে বেড়াতে আসা রীতা সরকারই বা কেন সেকথা বলতে যাবে?

ও-ঘরে ঘুমন্ত মানুষের নিঃশ্বাসের শব্দ। ঘুমোচ্ছেন কাকী, আর রমা ও ইমা। ভিতরে বারান্দাতে ঘুমন্ত কালুরামের নাক-ডাকার শব্দ ; একটা কম্বলের উপরে পড়ে আছে আর ঘুমোচ্ছে চাকর কালুরাম। কিন্তু রীতা সরকারের ঘুমভাঙা চোখে আবার নতুন করে ঘুমের আবেশ লাগে না। বিদ্‌ঘুটে একটা ছায়া বসে আছে বাইরে, ঘুম আসবে কেমন করে? দুঃসহ একটা অস্বস্তি রীতা সরকারের নিঃশ্বাসের বাতাসে বার বার ছট্‌ফট্ করে। লোকটা চলে না গেলে স্বস্তি পাবে না রীতা, ঘুমও আর হবে না।

কিন্তু জোরে চেঁচিয়ে ধমক না দিয়ে, খুব আস্তে গলার স্বর চেপে দিয়ে এখনই তো লোকটাকে বলে দিতে পারা যায়—চলে যাও। ঘরের ঘুমন্ত মানুষগুলির কেউই শুনতে পাবে না, জেগেও উঠবে না। একটি কথায় সব সমস্যা মিটে যাবে। কিন্তু কী দরকার?

জানে না রীতা, কখন আবার ঘুমিয়ে পড়তে হয়েছে। বুঝতেও পারে না, এমন সুন্দর সমুদ্র-স্নানের স্বপ্নটাও হঠাৎ কেন ভেঙ্গে গেল। জায়গাটা হলো জুহুর সমুদ্রতট। সাঁতারের মিনি সাজ পরে সমুদ্রের জলের ছোট ঢেউয়ের উপর এলিয়ে পড়েছে রীতা। ওদিক থেকে

কাদের হাতের দুটো ক্যামেরা তাক্ করে রয়েছে। বয়ে গিয়েছে। ক্যামেরার দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না রীতা।

কিন্তু কোথায় সেই জুহু, আর কোথায় এই কদমপুরা। রাতের অন্ধকার গায়ে মেখে আরও কালো হয়ে গিয়েছে ওই জায়গাটা। চুপ করে চেয়ারের উপর বসে আছে। না, সত্যিই দুঃসহ। এবার বলে দেওয়াই উচিত, এখনই চলে যাও।

বিছানা থেকে নেমে পাশের ছোট ঘরের ভিতরে ঢোকে রীতা। তারপর যেন রুক্ষ ও বিরক্ত একটা অস্বস্তির আঘাত হয়ে রীতা সরকারের হাতটা একটান দিয়ে দরজায় কপাটের খিল নামিয়ে দেয়। কপাট খুলে বাইরের পাশের সেই ছায়ার দিকে তাকায় রীতা, যে ছায়ার নাম জয়ন্ত—ট্রেনের গার্ড, কালো টেকো একটা সামান্য মানুষ।

চমকে ওঠে রীতা সরকারের মনের সব অস্বস্তি আর চোখের সব বিরক্তি। জোড়াপাহাড়ের মাথার উপরে চাঁদ ভেসে উঠেছে, সাদা কুয়াশায় ভরে গিয়েছে শালবনের মাথার আকাশ, আর পলাশের গাছে একটা পাখির মিষ্টি শিসের শব্দ যেন গলে ঝরে পড়ছে।

জোড়াপাহাড়ের মাথার চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে জয়ন্ত। চিকচিক করছে জয়ন্তর দুই অপলক চোখ। লোকটা কি জাগা চোখেই স্বপ্ন দেখছে? তা না হলে এত ধীর আর শান্ত হয়ে বসে আছে কেন?

জানে না রীতা। বুঝতেও পারে না রীতা, কতক্ষণ ধরে সে ওই জয়ন্তের মুখের দিকে দুই চোখ অপলক করে তাকিয়ে আছে। কদমপুরার ফাল্গুন মাসের শেষ রাতের জ্যোৎস্নাতে যে এত অদ্ভুত একটা মায়া থাকতে পারে, তাও নিশ্চয় কল্পনা করতে পারেনি রীতা। কী আশ্চর্য, জয়ন্ত নামে ওই লোকটাকে যে একেবারে ভিন্ জগতের একটা মানুষ বলে মনে হয়। কিংবা সেই বনময় কুয়াশার যুগের একটি মানুষ, বুক ফুলিয়ে গুহার মুখের সামনে বসে আছে। এখনই ছুটে আসবে ওর রাতের সঙ্গিনী, আর ওই চওড়া বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। জয়ন্তও নিশ্চয় সেই মুহূর্তে তার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া নিশাসঙ্গিনীর বুকটাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে পিষে দিতে থাকবে।

রীতা ডাকে—ঘরের ভিতরে আসুন।

চমকে ওঠে জয়ন্ত। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। মুখ ফিরিয়ে বিস্ময়ে বিবশ দুই চোখের অপলক দৃষ্টি তুলে ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। জয়ন্ত যেন সত্যিই তার সফল স্বপ্নের একটা ছবির দিকে তাকিয়ে আছে।

না, প্রভা নয় ঠিকই, কিন্তু প্রভা যে ঠিক ওইভাবে ওখানেই দাঁড়িয়ে এই কথাই বলেছিল। জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে জয়ন্ত, আর আবার শালবনের মাথার সাদা কুয়াশার দিকে তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু ফাল্গুনের কদমপুরার শেষ রাতের বাতাস যেন রীতা সরকারের বুকের ভেতরে ঢুকে রীতার নিঃশ্বাস উতলা করে দিয়েছে। নন-স্মী য়ার লিপস্টিকের রঙীন প্রলেপ দুই ঠোঁটের পিপাসার বাষ্পে ভিজে গিয়েছে। আর সরস উচ্ছলতার এক একটা ঝলক সহ্য করতে গিয়ে সারা শরীরটাই যেন ভিজে ভিজে পিচ্ছল হয়ে যাচ্ছে।

আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে না রীতা সরকার। এগিয়ে আসে, জয়ন্তর হাত ধরে, জয়ন্তর গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। তপ্ত নিঃশ্বাসের বাষ্প ছড়িয়ে জয়ন্তর কানের কাছে মুখ নিয়ে কথা বলে রীতা—ঘরে চলো।

চমকে ওঠে। সরে দাঁড়ায় জয়ন্ত—ছি, এ কী কথা বলছেন? কে আপনি?

—তাকিয়ে দেখ, ভাল করে দেখ, আমি কে? জয়ন্তর চোখের কাছে মুখটাকে যেন ভাসিয়ে দিয়ে কথা বলে রীতা। হ্যাঁ, এই শেষ রাতেও মায়ার ঝালর সেই আইল্যাশ চোখে পরতে ভুলে যায়নি রীতা। মায়ার ঝালর কাঁপে, শেষ রাতের চাঁদের আলোও যে কাঁপতে

থাকে।

জয়ন্ত—চিনলাম না, বুঝলাম না, কে আপনি?

রীতা—ঘরে এস, কেউ জেগে নেই, সবাই ঘুমিয়ে আছে।

জয়ন্ত—অসম্ভব, ক্ষমা করবেন আমাকে। দোহাই আপনার, আমার স্বপ্ন নষ্ট করবেন না। আর কিছুক্ষণ আমাকে এখানে থাকতে দিন। কাক ডাকলেই আমি চলে যাব।

রীতা—তুমি কি সত্যিই একটা পাগল, না একটা অ্যানিমিয়া?

জয়ন্ত হাসে—আমাকে মিথ্যে গালমন্দ করে আপনার কোন লাভ নেই। প্লীজ, হাত ছেড়ে দিন, সরে যান,...না না, অসম্ভব, মুখ সরিয়ে নিন, বলতে বলতে রীতা সরকারের সেই ঝাঁপিয়ে পড়া মত্ত শরীরটাকে একটা ঠেলা দিয়ে বুকের কাছ থেকে সরিয়ে দেয় জয়ন্ত, আর নিজেও বারান্দার সিঁড়ির দিকে সরে যায়।

হ্যাঁ, কাক ডেকে উঠেছে। সিঁড়ি থেকে মাঠের পলাশের পাশ কাটিয়ে একেবারে সড়কের উপরে গিয়ে দাঁড়ায় জয়ন্ত। হেডলাইট জ্বালিয়ে ঠিকেদারের একটা লরি স্টেশনের দিকে ছুটে চলে গেল। জয়ন্তও স্টেশন যাবার সড়ক ধরে চলতে শুরু করে দেয়। সড়কের ধারে মহুয়াতলায় এখন বোধহয় আর কোন ভালুক বসে নেই।

ভোরের আলোর আভা জেগেছে। তবু বারান্দার চেয়ারের কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে রীতা সরকার। ঘরের ভিতর থেকে আশ্চর্য হয়ে বাইরে বের হয়ে এসে আরও আশ্চর্য হয়ে যান বিজয়া—এ কী রীতা! কী হলো?

রীতা—কী আবার হলো?

বিজয়া—এ কী রকমের মূর্তি?

রীতা—কি রকমের?

বিজয়া—এলোমেলো চুল, জামার বোতাম খোলা, গায়ের শাড়ি খসে পড়ে ঝুলে রয়েছে, এ যে একটা পাগল মূর্তি।

—তাই তো, তাই তো! হেসে ফেলে রীতা। ব্যস্তভাবে হাত চালিয়ে ঝুলে পড়া শাড়িটাকে ভাল করে গায়ে জড়াতে থাকে।

হঠাৎ গোধূলি

ওদের দু'জনকে পাশাপাশি একসঙ্গে দেখলে কিছুক্ষণের জন্য তাকিয়ে থাকতে হয়। অলকা আর প্রশান্ত যেন একই ছন্দে একই কবিতার দুটি চরণের মতো মিলে গেছে। দু'জনে পাশাপাশি থাকলে তবেই ওদের দু'জনকে এত সুন্দর দেখায়। বর্ষাকালের জলভরা পুকুরের পাশে একটি পুষ্পিত ঝুমকো জবার গাছের মতো, ওরা নিজের গুণেই যেন পরস্পরকে রূপ ধার দিয়ে এতটা সুন্দর করে নিজেদের মিলিয়ে নিয়েছে। নইলে, শুধু একটা জলভরা পুকুর কিই-বা এমন সুন্দর! একটা ঝুমকো জবার গাছের একলা রূপের মধ্যে তাকিয়ে দেখবার মতো এমন কিই-বা আছে?

বিয়ের পরেই আগ্রাতে বেড়াতে গিয়েছিল দু'জনে। তাজমহলের সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় একজন আমেরিকান টুরিস্ট আচমকা সামনে এসে দাঁড়ালো। ইশারায় অনুরোধ জানালো—এক মিনিটের জন্য একটু থেমে থাকতে। ক্লিক্ ক্লিক্! উৎফুল্ল পাখির মতো টুরিস্টের ক্যামেরা যুগল-রূপের দিকে তাকিয়ে একবার ডেকে উঠলো।

চৌরঙ্গীতে বাসের প্রতীক্ষায় ওরা দুজনে একটা স্টপে দাঁড়িয়ে থাকে। দু'একটা বেহায়া টমি একরোখা কেউটের মতো শিষ দিতে দিতে এগিয়ে আসে। একেবারে সামনে এসে পড়তেই, অলকা ও প্রশান্ত একসঙ্গে তাকায়। কেউটে টমি চকিতে পাশ কাটিয়ে সরে যায়। দূরে এগিয়ে আর একবার ঘাড় ফিরিয়ে ভীরু চোখ তুলে দেখে—কালা আদমির দেশে কোন শিল্পী যাদুকরের তৈরি একজোড়া মোহ যেন পথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

শুধু চেহারার জন্য নয়, শুধু গুণ মান শিক্ষা ও বিত্তের জন্য নয়, ওরা সবচেয়ে সুখী ওদের ভালবাসার জন্যই। এই ভালবাসাকে ক্ষণিকের জন্য বিচলিত করতে পারে, পৃথিবীতে এমন কোন ছলনা আছে বলে ওরা বিশ্বাস করে না।

সুতরাং, নিজের সম্বন্ধে প্রশান্তের ধারণা যদি তার মনের ভেতর একটি সুশোভন স্পর্ধায় ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠতে থাকে, তবুও তাকে দোষ দেওয়া যায় না। অলকা যদি আত্মবিশ্বাসে একটু বেশি সাহসী হয়ে উঠতে থাকে, তবে তাতে নিন্দে করার মতো বিশেষ কিছু থাকতে পারে না।

প্রশান্ত এক এক সময়ে বলে—অলকা, তুমি কল্পনা করতে পার, আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়নি। আর একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে, তার হাতটা এভাবে তোমার গলা জড়িয়ে আছে!

অলকা প্রশান্তের হাতটা সজোরে টেনে নামিয়ে দেয়—এরকম বিশ্রী কথা বলবে তো আমায় ছুঁতে পাবে না।

প্রশান্ত হাসতে থাকে। তার সুপুরুষতার মূল্য আর মর্যাদা অলকার কাছে মাঝে মাঝে এইভাবে নেহাত রসিকতার ছলেই সে যাচাই করে নেয়। অলকা রাগ করে কিন্তু প্রশান্তের বেশ লাগে।

প্রশান্তের একবার জ্বর হয়েছিল। একটি নার্স রাত জেগে প্রশান্তকে শুশ্রূষা করতো। নার্সটি দেখতে সুন্দর, তার ওপর বেশ ভদ্র আর লাজুক। ওষুধ খাওয়াবার সময় নার্স প্রশান্তের মাথাটা হাত দিয়ে প্রায় জড়িয়ে ধরতো। নার্সের আগ্রহ ভরা দু'চোখের দৃষ্টি প্রশান্তের মুখের উপর ঝুঁকে থাকতো। অলকা সবই দেখতো, তবু তার মনের কোণে কোন মেয়েলি অভিমানে একটুও অস্বস্তির খোঁচা লাগাতো না। অলকার কাছে এসব অতি তুচ্ছ ব্যাপার। অলকা জানে, প্রশান্তের মনে একতিল জায়গাও আর খালি পড়ে নেই। সব ঠাঁই জুড়ে বসে আছে স্বয়ং অলকা। প্রশান্তের সঙ্গে বের হয়ে, পথে ট্রামে বাসে কতবার কত সত্যিকারের রূপসী চোখে পড়েছে অলকার, কিন্তু অলকা দেখেছে, প্রশান্ত তাদের দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না।

দেশ বিদেশের নাম-করা অ্যাথলেটদের ছবির একটা অ্যালবাম এনে একদিন প্রশান্ত অলকাকে দেয়।—নাও বসে বসে দেখ। এক একটি চেহারা দেখে চোখ জুড়িয়ে যাবে তোমার।

অলকা অ্যালবামটা উল্টিয়ে দেখেই টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেয়—ভারী সব ছিরি! এসব দেখার কোন গরজ নেই আমার, তোমার সাধ থাকে তুমি দেখ।

প্রশান্তের চোখে অদ্ভুত এক তৃপ্তি, এবং সেই সঙ্গে গর্বও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এই রসিকতাগুলি নেহাত তুচ্ছ, কিন্তু তার মধ্যে যেন এক পরম বিশ্বাস বার বার পরীক্ষায় মাজাঘষা হয়ে খাঁটি সোনার মতো আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাই প্রশান্ত এত খুশী! প্রশান্তের আত্মশ্রদ্ধা অলকার সমাদরের জলবাতাসে সতেজ চারাগাছের মত উর্ধ্বে মাথা ঠেলে উঠেছে। সুন্দরী অলকার কাছে পৃথিবীর সব পুরুষ মিথ্যে, রূপেগুণে, ব্যক্তিত্বে ও প্রেমিকতায় সত্য হয়ে মাত্র একটি পুরুষ অলকার কাছে নিশ্বাসবায়ুর মতো মণপ্রাণ ছেয়ে আছে। সে হলো অলকার স্বামী প্রশান্ত। এই উপলব্ধি প্রশান্তের কথাবার্তায় ঠাট্টায় রসিকতায় এক সবিনয় ঔদ্ধত্যের নেশা এনে দিয়েছে। প্রশান্ত সেটা বুঝতে পারে না বোধহয়। কিংবা বুঝতে পারলেও

ভাল লাগে।

প্রশান্তকে যদি পুরুষোত্তম বলা যায়, তবে প্রশান্তের বন্ধু শঙ্করকে অপৌরুষেয় না বলে উপায় নেই। রোগা কালো টাকপড়া মাথা, কপালের ওপর চার পাঁচটা বসন্তের দাগ। জীবন বীমার দালালি করে শঙ্কর। সামান্য রোজগার। লেখাপড়া হয়তো সামান্য কিছু জানে।

শঙ্কর প্রায়ই সন্ধ্যার সময় প্রশান্তের বাড়ি একবার ঘুরে যায়। প্রশান্তের সঙ্গে অনেক পদস্থ ও সম্পন্ন লোকের জানাশোনা আছে! তাদের একটু বলে-কয়ে দিলেই শঙ্কর দু'একটা জীবন বীমার মক্কেল পেয়ে যায়।

শঙ্কর করুণার পাত্র সন্দেহ নেই। প্রশান্ত তাই এই গরীব বন্ধুকে সাহায্য করতে কুণ্ঠা করে না। অলকাও তার যথাসাধ্য করে। চা-জলখাবার না খাইয়ে সে কখনো শঙ্করকে উঠতে দেয় না।

অলকা ও প্রশান্ত এক একদিন বেড়িয়ে ফিরে দেখে, শঙ্কর বৈঠকখানার ঘরে একা একা বসে আছে, রাত নটা বেজে গেছে যদিও। ওরা আসা মাত্র শঙ্কর গাত্রোত্থান করে। প্রশান্ত বলে—আরে, এতক্ষণ যখন ধৈর্য ধরে বসেই আছ, তখন আর পাঁচ মিনিট বাস যেতে দোষ কি? বসো বসো।

অলকা প্রশান্তের একটা ইশারা বুঝতে পারে। একটা ডিসে কিছু খাবার সাজিয়ে এনে শঙ্করের সামনে রাখে।

এ ছাড়া শঙ্করকে নিয়ে আর একটা ব্যাপার প্রায়ই হয়ে থাকে। হাসাহাসি আমোদের চর্চা।

শঙ্করকে নিয়ে প্রশান্ত প্রায়ই রগড় করে। বিয়ের পর থেকে প্রশান্তের এই খেয়ালটা আরও বেশি প্রবল হয়ে উঠেছে।

এক-একদিন প্রশান্তের মাথায় যেন রগড়ের একটা ভূত এসে ভর করে। শঙ্কর ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। তবু অদ্ভুত এক পুলকে মাতাল হয়ে প্রশান্ত বলতেই থাকে—যদি নেহাত বিয়ে করতে হয় শঙ্কর, তবে প্রেম করে বিয়ে করবে। নইলে আমার মতো পস্তাতে হবে!

পস্তাতে হবে—নিছক রঙ্গ করেই এত বড় একটা মিথ্যা না বলে নিলে প্রশান্ত যেন তার পরিণয়ে কৃতার্থ জীবনের সত্যটিকে চরম করে অনুভব করতে পারে না।

অলকা এসে ঘরে ঢোকে। প্রশান্তের রসিকতা আরও উদ্বেল হয়ে ওঠে—তুমি জান না অলকা, শঙ্কর এযাবৎ তিনবার প্রেমে পড়েছে। ওর দোষ নেই। নায়িকারাই মরিয়া হয়ে ওর পেছনে লেগেছিল। শঙ্করের উপেক্ষায় একটি ভগ্নহৃদয় তরুণী তো আজ পর্যন্ত বিয়েই করলেন না।

সবই নিছক মিথ্যা, তৈরি কথা কাহিনী মাত্র। নগণ্য শঙ্করের জীবনে নিতান্তই অলীক উপকথার কতগুলি বিদ্রূপ। তবু এসব কথা বলে প্রশান্ত কি যে আনন্দ পায় তা সে-ই জানে।

অপ্রস্তুত শঙ্কর সত্যিই লজ্জায় আরও কুৎসিত হয়ে ওঠে। অলকা সামনে বসেই সব শুনছে, হয়তো সব বিশ্বাস করে ফেলেছে! শঙ্কর প্রশান্তকে ধমকের সুরে আপত্তি জানায়—কি সব বাজে কথা বলছো প্রশান্ত? তোমার আর মাত্রাজ্ঞান নেই।

অলকার দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে শঙ্কর চোখ নামিয়ে নেয়। অলকা শান্তভাবে শঙ্করের দিকে তাকিয়ে থাকে। কৌতুকে অলকারও চোখ দুটি হাসতে থাকে। একটা অধঃপতিত অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দূর নক্ষত্রের দরদের মতো অলকার চোখের হাসিটা যেন মিটিমিটি জ্বলে।

চা খাওয়া শেষ করে শঙ্কর। জীবন বীমার নতুন একজন মক্কেলের ঠিকানা প্রশান্তের কাছ থেকে জেনে নিয়ে উঠে পড়ে শঙ্কর, চলে যায়।

প্রশান্ত একদিন বললো—তোমার সৌভাগ্যের চন্দ্রকলা এতদিনে পূর্ণ হলো অলকা।

অলকা—কি হলো?

—তুমি মনে করেছ, শঙ্কর এখানে শুধু খাবার খেতে আর জীবন বীমার মক্কেলের খোঁজ নিতে আসে?

—তা মনে করবো কেন? তোমার বন্ধু মানুষ, তুমি ওকে ভালবাস তাই আসে।

—না গো বিশ্বমনোরমা, তোমাকেই দেখতে আসে।

—কি যে বলো! এরকম বিদ্‌ঘুটে কথা আর বলো না, আর যা-ই বলো।

প্রশান্ত যেন এতদিনে তার কল্পনার মধ্যে আর একটি প্রচণ্ড প্রহসন তৈরি করেছে। হাসি থামাতে পারে না প্রশান্ত।

প্রশান্ত প্রস্তাব করে—একটা মজা করতে হবে অলকা। তোমাকে রাজি হতেই হবে।

অলকা একটু ভয় পায়। ঠিক ভয় নয়, লজ্জাই বোধ হয়। ভয় পাবার মতো মন তো তার নয়—আমাকে আবার কি করতে হবে?

—তুমি শঙ্করকে একদিন প্রেম নিবেদন কর। আমি পাশের ঘরে থাকবো। আমি শুধু বোকাটার মুখের ভাবটুকু স্টাডি করবো ; দেখি ও কি বলে, আর কি করে!

অলকা বিরক্তির সঙ্গে প্রবলভাবে আপত্তি জানায়—এসব কি কথা! তোমার বন্ধুকে নিয়ে তুমি ঠাট্টা-রগড় কর, সেটা খারাপ কিছু নয়, কিন্তু আমি ওসব করতে যাব কেন? ছিঃ!

—আরে, শুধু একটু থিয়েটরী ঢঙে অভিনয় করবে।

—কি করতে হবে?

—বলবে, শঙ্করবাবু, আপনাকে আমি কত ভালবাসি তা আজও বুঝতে পারলেন না। আপনি হৃদয়হীন...।

অলকা ঘৃণায় ও লজ্জায় শিউরে ওঠে—রামো রামো! অভিনয় করেও কি এসব কথা বলা যায়! তার চেয়ে গুডফ্রাইডের ছুটিতে রাণু যখন এখানে আসবে, তোমরা শালী-ভগ্নীপতিতে ষড়যন্ত্র করে শঙ্করকে নিয়ে যত খুশী মস্করা কর, আমি বাধা দেব না। রাণু চোখেমুখে কথা বলতে পারে, এসব ও-ই ভাল পারবে।

—রাণুকে দিয়ে এসব করালে আমার কি লাভ হলো? আমি যেটা এক্সপেরিমেণ্ট করে দেখতে চাই, আসলে সেটাই হবে না।

অলকা বোকার মতো তাকিয়ে থাকে। আবার এক কোন খেয়াল নিয়ে মশগুল হয়েছে প্রশান্ত? না, প্রশান্তের প্রেমিকতার শ্লাঘা মনের ভেতর থাকলেই সুন্দর ছিল। যেটা নিঃশংসয় সত্য, তাকে বার বার নানা তুচ্ছ প্রসঙ্গে খুঁটে খুঁটে যাচাই করবার কোন অর্থ হয় না। অবশ্য এসব রগড় মাত্র। সেটা প্রশান্ত জানে, অলকাও বোঝে। তবু...তবু অলকা একটু বিরক্তই হয়।

অলকা—বড় বেশি ছেলেমানুষী করছো তুমি। লোকটাকে নিয়ে ছিঁনিমিনি করে কি সুখ পাও বুঝি না।

কিন্তু প্রশান্তের অনুরোধের জেদে শেষ পর্যন্ত রাজী হল অলকা—যাই হোক, আমি কিন্তু কথাগুলি বলেই পালিয়ে যাব। কি বলতে হবে লিখে দাও, মুখস্থ করে নিই।

একটা কাগজ টেনে নিয়ে লেখা শেষ করে প্রশান্ত বললো—এই কথা ক'টি বলবে, শঙ্কর, প্রাণেশ আমার। আমার বাইশ বছর বয়সের সকল কামনা শুধু তোমাকেই যে লতার মতো জড়িয়ে ধরতে চাইছে। ওগো চিতচোরা...।

অলকা লেখাটা পড়ে নিয়ে বলে—ভারি রগড় করছো। এসব ভাষা শুনলে কে না বুঝবে যে ভান করা হচ্ছে।

—তা হলে কি ভান করে একেবারে খাঁটি প্রেমের কথা...তা কি করে হয়...তা কি বলতে পারবে?—অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে প্রশ্ন করে প্রশান্ত।

অলকা বিরক্ত হয়ে বলে—কি যে বলো!

প্রশান্ত একটু সমস্যায় পড়ে আমতা আমতা করে উত্তর দেয়—যাই হোক, একটু উদ্‌ভ্রান্তের মতো কথাগুলি বলবে, তা হলেই শুনতে বেশ লাগবে। ভান-ফান বুঝতে না পেরে ঘাবড়ে যাবে!

বৈঠকখানা সেদিন সন্ধ্যায় এত ভাল করে সাজানো হলো কেন? ফুলদানির ওপর এত বড় দুটো গন্ধরাজের তোড়া রাখবার কিই-বা প্রয়োজন ছিল? একগুচ্ছ ধূপকাঠি পুড়িয়ে ঘরের বাতাস এত সুরভিত করাই বা কেন? প্রশান্ত অলকার দিকে তাকিয়ে উৎসাহে হাসতে থাকে—বাপ্‌রে, ঘরে যেন সত্যিই রোমান্স থমথম করছে।

শঙ্করের পায়ের শব্দ শুনে প্রশান্ত পাশের ঘরে পর্দার আড়ালে গিয়ে বসে থাকে।

বৈঠকখানার দরজা পর্যন্ত এসেই শঙ্কর থেমে গিয়ে প্রশ্ন করে—প্রশান্ত নেই?

অলকা—না, এই কিছুক্ষণ আগেই বেরিয়ে গেলেন।

—কখন ফিরবে?

—আজ ফিরতে রাত হবে অনেক।

—আচ্ছা, আমি আজ তাহলে যাই।

—সে কি কথা? নতুন করে আপনাকে অনুরোধ করতে হবে নাকি? চা খেয়ে তারপর যাবেন।

চা আনে অলকা। চা খাওয়া শেষ করে শঙ্কর একটা বই তুলে নিয়ে এক মনে পড়তে থাকে। অলকা উসখুস করে, ঘরের ভেতর পায়চারি করে। চেয়ারের ওপর বসে কিছুক্ষণ, তারপরই ছটফট করে উঠে পড়ে। ঘরের বাইরে গিয়ে বারান্দায় আলোর সামনে দাঁড়িয়ে হাতের মুঠো থেকে কাগজটা খুলে লেখাগুলি একবার পড়ে নেয় অলকা। সবই মুখস্থ করা ছিল, তবু আর একবার যেন মনস্থ করে নেয়, যেন আবৃত্তি করতে কোন ভুল না হয়, কোন কথা ফস্‌কে না যায়।

ঘরে ঢুকেই অলকা বলল—শঙ্করবাবু!

শঙ্কর—বলুন।

দুটি মিনিট বৃথাই স্তব্ধ হয়ে রইল। অলকা মনে মনে কথাগুলি গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করতে থাকে।

অলকা—শঙ্করবাবু, আপনি রোজই এখানে আসেন কেন?

শঙ্কর বই পড়া বন্ধ করে বিস্মিত হয়েই অপ্রস্তুতের মতো বলে—আমার আসাটা কি আপনারা পছন্দ করেন না?

—শুধু জিজ্ঞাসা করছি, কেন আসেন?

—কাজের দায়েই আসতে হয়। প্রশান্ত দু'একটা পার্টির খোঁজ দেয়, তাই। তা না হলে এত ঘন ঘন আপনাদের বিরক্ত করতে...।

—সেই সামান্য খোঁজ নিতে কতক্ষণ সময় লাগে? কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকেন কেন? কি দরকার?

—দরকার কিছুই নয়। আপনারা কিছু মনে করেন না বলেই বসে থাকি।

—তাই বলে কি রোজ আসতে হয়? রোজ এখানে আসতে এত ভাল লাগে আপনার?

—তা, ভাল লাগে বৈকি! এত সজ্জন আপনারা।

পাশের ঘরের চাঞ্চল্য প্রকট হয়ে না পড়লেও, বোঝা যায়, সেখানে অস্ফুট একটা প্রতিবাদ যেন ইঙ্গিতে শব্দ করে বেজে উঠছে। মেঝেতে প্রশান্তের জুতোটা দুবার ঘষা লেগে আর বেশ জোরে একটা শব্দ করছে। নেপথ্য থেকে যেন কতকগুলি সঙ্কেত অলকার ভুল ধরিয়ে দিচ্ছে—অভিনয় ঠিক হচ্ছে না।

অলকা বলে—আপনার বন্ধু সজ্জন হতে পারেন, কিন্তু আমাকে প্রশংসা করছেন কেন? আমি তো আপনার কোন উপকার করিনি!

শঙ্কর—বন্ধু তো সজ্জন হবেনই, তার জন্য প্রশংসা করার কি আছে? বরং আপনি কেউ না হয়েও যতখানি...।

অলকা—কি?

শঙ্কর—যতখানি খাতির করেন, আপন জনের মতো ব্যবহার করেন...।

অলকা—আমি খাতির করি? আমি আপন জনের মতো ব্যবহার করি? সত্যি বলছেন?

শঙ্কর আস্তে আস্তে চোখ তুলে অলকার দিকে তাকায়।

তিন চার মিনিট ধরে ঘরের ভেতর একটা মূর্ছাহত নীরবতার মধ্যে দেয়াল ঘড়িটা শুধু টিক্‌টিক্‌ করে বাজতে থাকে। কৌতূহলের আবেগে অস্থির প্রশান্তের চোখ দুটো পর্দার আড়াল থেকে সহসা চোরা টেলিস্কোপের মতো উঁকি দেয়।

এক হঠাৎ-গোধূলির ছোঁয়া লেগে বৈঠকখানার ঘরটা যেন অবাস্তব হয়ে আকাশপটের মতো অনেক দূরে সরে গেছে। শঙ্করের মুখটা যেন ছেঁড়া মেঘের মতো তার মধ্যে ভাসছে। বসন্তের দাগগুলি তবু স্পষ্ট চিনতে পারা যায়! শঙ্করের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অলকা। একটা রাত্রি-শেষের চাঁদ যেন একটা জঙ্গলের মাথার উপর সান্ত্বনার জ্যোৎস্না ছড়াচ্ছে।

শুনতে পায় প্রশান্ত, যদিও অলকার স্বরটা কানে-কানে বলা কথার মতোই অস্পষ্ট।—এখানে আসতে ভাল লাগে?

শঙ্করের ছোট ছোট চোখ দুটো আরও ছোট হয়ে পিলসুজের পোড়া তেলের মতো চিক্‌চিক্‌ করতে থাকে—হ্যাঁ, ভাল লাগে।

অলকা বলে—রোজ আসবেন, কেমন?

শঙ্কর চলে যাবার অনেকক্ষণ পরে অলকা বুঝতে পারে, পাশের ঘরে আলো জ্বলছে, পুঞ্জ পুঞ্জ সিগারেটের ধোঁয়া ভেসে আসছে।

একটা আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে প্রশান্ত বই পড়ছিল। অলকা ব্যস্ত ভাবে ঘরে ঢুকতেই প্রশান্ত হাসে—রগড়টা জমিয়ে তুলেছিলে বেশ।

আবার শান্তভাবে এবং সুস্থির হয়ে একমনে বই পড়তে থাকে প্রশান্ত।

অধীশ্বরী

সে নাটকের শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে কোন মুখরতা ছিল না। নাটকের মেয়েটি, যার নাম জয়া, সে তখন একেবারে নীরব হয়ে গিয়েছে। কিন্তু হাসছে। কি অদ্ভুত শান্ত হাসি। হাসছে জয়ার চোখ দুটো, দুই অপলক কালো চোখের বড় বড় পাতার ছায়ার মধ্যে হাসিটা যেন নিবিড় হয়ে টলমল করছে।

অভিনয় দেখছেন যাঁরা তাঁদের সবারই চোখে নাটকের জয়ার এই শান্ত হাসি খুবই করুণ একটি দৃশ্য বলে বোধ হয়েছে। জয়ার স্বামী মানুষটা, যার নাম জয়ন্তকুমার, সে এইমাত্র জয়ার ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে, উঁকি দিয়ে একবার দেখে নিয়ে, তারপর বেশ হাস্যময় ও প্রসন্ন একটি মুখ নিয়ে চলে গিয়েছে। জয়া জানে, তার স্বামী এই যে সন্ধ্যা হতেই বেলফুলের মালা হাতে জড়িয়ে আর ব্যস্ত হয়ে চলে গেল, আজ সারা রাতের মধ্যে

সে মানুষের পায়ের শব্দের কোন সাড়া আর শুনতে পাওয়া যাবে না।

দর্শকদের কারও বুঝতে অসুবিধে নেই, জয়ার স্বামী জয়ন্তকুমার এখন কোথায় কার কাছে গেল। ভয়ানক এক রাতজাগা ফুর্তির ঘরে, যেখানে এক হাতে গেলাস আর এক হাতে চাঁপা ফুলের তোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক রঙ্গিলা নারী, তারই ঘুঙুরের শব্দের কাছে মন-প্রাণ লুটিয়ে দেবার জন্য চলে গেল জয়ন্তকুমার। কিন্তু জয়া কি এটা বোঝে না? খুব বোঝে। তবু কী আশ্চর্য, জয়া হাসছে। হাসছে জয়ার দুটি অপলক কালো চোখ। দর্শকেরা দেখে বিস্মিত হয়েছেন, জয়ার শান্ত মুখের ও শান্ত চোখের ওই হাসির মধ্যে ওর জীবনের দুঃসহ করুণতার ছবিটা কত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

স্বামী চলে গিয়েছে। একা ঘরের ভিতরে তখন নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জয়া। শান্ত হাসির সেই চোখ আর সেই মুখ নিয়ে জয়া তাকিয়ে আছে টেবিলের উপর রাখা ছোট একটি ফটোর দিকে। স্বামীর ফটো। ফটোর কাছে টাটকা ফুলের একটি তোড়া রেখে দিল জয়া।

হঠাৎ আরও ব্যস্ত হয়ে উঠলো জয়া। হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে দিল। দপ্ করে জ্বলে উঠলো সবচেয়ে কড়া আলোর বাতিটা। টেবিলের দেরাজ টেনে ভিতর থেকে বের করে নিল উলের একটা গোছা আর কাঁটা। দর্শকেরা এবার আরও বিস্মিত হয়ে দেখলেন, স্বামীর জন্য যে সোয়েটারের অনেকখানি বুনে রেখেছিল জয়া, তারই বাকিটা বুনতে শুরু করেছে। বাঃ।

সামনের সারিতে একটি চেয়ারে বসে অভিনয় দেখছেন যে মহিলা, যাঁর নাম ইন্দুলেখা, তাঁর চোখের তারা ঝিক করে হেসে ওঠে। তিনিও বলে উঠলেন—বাঃ!

এটাও বিস্ময়ের ধ্বনি, কিন্তু কী যে সেই বিস্ময়, সেটা ইন্দুলেখাই জানেন।

ইন্দুলেখার পাশের চেয়ারে বসে আছে যে ধীরাজ, সে কিন্তু শুধু ওই প্রশস্তির ধ্বনি শুনে বিস্মিত হয়। ইন্দুলেখার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে ধীরাজ—কী হলো?

ইন্দুলেখা—এই তো, এইরকমটিই হলেই হয়।

ধীরাজ—কী হয়?

ইন্দুলেখা—ঠিক এইরকম শান্ত ও সরল একটি মেয়ে পাওয়া গেলে বড় ভাল হয়।

হেসে ফেলে ধীরাজ—বুঝলাম। ও মেয়ে কিন্তু নাটকের জয়া। সত্যি করে কোন জয়া নয়।

ইন্দুলেখা—সেটা কি আর বুঝি না? তবু ভাবছি, নাটকের এই জয়ার মতো সত্যি কি কোন মেয়ে থাকতে পারে না?

মঞ্চে এখন অন্ধকার। অভিনয় শেষ হয়েছে। শুধু ড্রপসীনের নদীর নীলজলের ঢেউ অবলোকিত হয়ে কাঁপছে। দর্শকেরা হলঘর ছেড়ে চলে যেতে শুরু করেছেন। ইন্দুলেখা আর ধীরাজও এখনি চলে যাবে।

কিন্তু দুই ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বিনীতভাবে ইন্দুলেখা আর ধীরাজের চোখের সামনে দাঁড়ালেন। জিতেনবাবু, যিনি এই অভিনয়ের সব আয়োজন ও ব্যবস্থাপনার কর্তা, তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে সঙ্গী ভদ্রলোকের পরিচয় জানিয়ে দিলেন।—আমি এই নাটকের সব ব্যবস্থার কাজ করেছি। আর, এই নির্মল, এই নাটকটি লিখেছে।

ইন্দুলেখা—খুব ভাল হয়েছে আপনাদের এই...কী যেন নাম নাটকটার?

জিতেনবাবু—'তবু দীপ জ্বলে'।

ইন্দুলেখা—সুন্দর হয়েছে। খুব ভাল অভিনয় হয়েছে এই মেয়েটির, যার নাম জয়া।

জিতেনবাবু—আজ্ঞে হ্যাঁ, সবাই এই কথা বলছে।

ইন্দুলেখা—কে এই মেয়েটি?

জিতেনবাবু—আমাদের অফিস-স্টাফের একজন। টাইপিস্ট ; এই তো, পুরো এক বছরও হয়নি, আমাদের এই কোম্পানীতে কাজ পেয়েছে শোভা।

ইন্দুলেখা—শোভা?

জিতেনবাবু—আজ্ঞে হ্যাঁ। শোভা হলো আমাদের বন্ধু এই নির্মলের বোন।

নির্মল হাসে—হ্যাঁ, শোভা কিন্তু আগে কোনদিন অভিনয় করেনি। এই প্রথম।

ইন্দুলেখাও হাসেন—তাই নাকি? আশ্চর্য! আমার মনে হচ্ছে, শোভা বোধহয় নাটকের জয়ার মতোই শান্ত ও সরল স্বভাবের মেয়ে।

জিতেনবাবু—আপনি ঠিক ধারণা করেছেন। শোভা নিজে অদ্ভুত শান্ত ও সরল স্বভাবের মেয়ে বলে জয়ার ভূমিকাতে ওর অভিনয় এত নিখুঁত হয়েছে।

ইন্দুলেখা ও ধীরাজকে দর্শকদের মধ্যে বিশেষ মাননীয় মনে করেন বলেই নাটকের প্রযোজক আর স্বয়ং নাট্যকার দুজনেই একটু উৎসুক হয়ে, এবং নিশ্চয় দু'চারটে প্রশস্তির কথাও আশা করে এইরকম বিনীতভাবে এসে দাঁড়িয়েছেন ও কথা বলছেন।

চা-বাগানের আর কয়লাখনির মেশিনারী তৈরি করে খুব বিখ্যাত হয়েছে ব্যারাকপুরের যে গ্রেগ অ্যাণ্ড রতনলাল, তাঁদের অফিসেরই স্টাফ 'তবু দীপ জ্বলে' নাটকের অভিনয় করেছেন। অফিসের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নন্দী সাহেবের কাছ থেকে বিশেষ অনুরোধের চিঠি নিয়ে ধীরাজের কাছে গিয়ে বিশেষ অনুরোধ করেছিলেন স্টোরের শঙ্করবাবু—আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাকে আসতেই হবে। তাই অনিচ্ছা থাকলেও নন্দীসাহেবের বিশেষ অনুরোধের মুখরক্ষা করবার জন্য ধীরাজ এই নাটক দেখবার অনুষ্ঠানে এসেছে। নাটক দেখবার কোন রুচি কিংবা আগ্রহ ধীরাজ ঘোষের ত্রিশ বছর বয়েসের জীবনে কোনদিনও ছিল না, আজও নেই।

ধীরাজের সঙ্গে এসেছেন যে মহিলা, তাঁকে এই অফিসার কেউই চেনেন না। নন্দীসাহেব চেনেন না, শঙ্করবাবুও জানেন না। কিন্তু বুঝে নিতে কোন অসুবিধে হয়নি জিতেনবাবুর আর নির্মলের, এই মহিলা নিশ্চয় ধীরাজ ঘোষের কোন আপনজন হবেন। মহিলা বোধহয় বিধবা ; কারণ সিঁথিতে সিঁদুর নেই। ধীরাজের চেয়ে বয়সে বেশ বড়ই হবেন মহিলা। ধীরাজ ঘোষের বয়স তিরিশ বছরের বেশি হতেই পারে না। কিন্তু এই মহিলাকে দেখে তাঁর বয়স খুব কম করেও চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বলে মনে হয়। মহিলার সিঁদুরবিহীন সিঁথির সামনের দিকে দু'পাশের চুলের খানিকটা সাদা-কালোতে মেশানো। সুতরাং বয়স হয়েছে বৈকি। কালো পাড়ের সাদা সিল্কের শাড়ি, সাদা চিকনের ব্লাউজ, আর পায়ে সাদা চামড়ার জুতো, মহিলার সাজের এই সাদাটে সহজ-সরলতা খুবই চমৎকার একটা স্টাইল বলে মনে হয়।

নন্দীসাহেবও এলেন। নন্দীসাহেব বেশ উৎফুল্ল স্বরে হাসেন—কী ধীরাজ, নাটকটা তোমার বোধহয় ভালই লেগেছে?

জবাব দিলেন ইন্দুলেখা—খুব ভাল লেগেছে। বিশেষ করে জয়া মেয়েটিকে আমার খুব ভাল লেগেছে।

নন্দীসাহেব—জয়া? তার মানে আমাদের টাইপিস্ট শোভা? তাই নয় কি জিতেনবাবু?

জিতেনবাবু—আজ্ঞে হ্যাঁ।

নন্দীসাহেব—শোভা সত্যি খুব ভাল মেয়ে।

জিতেনবাবু—খুব মৃদু স্বভাবের মেয়ে। শোভাকে কোনদিন আমরা একটু জোরে কথা বলতেও শুনিনি। ক্যাশিয়ার একবার ভুল করে শোভার মাইনের হিসাবে একশো কুড়ি টাকার মাত্র একশো টাকা দিয়ে বসে রইলেন। মেয়েটি এতই শান্ত যে, মুখ খুলে একবার বলতেও পারলো না, কুড়িটা টাকা কম হয়েছে।

ইন্দুলেখার চোখের তারা ঝিক করে হেসে ওঠে—তাই নাকি?

জিতেনবাবু—আজ্ঞে হ্যাঁ। ক্যাশিয়ারই হিসাব মেলাতে গিয়ে ভুলটা নিজেই ধরলেন। তারপর শোভাকে ডেকে কুড়ি টাকা দিলেন।

নির্মল হাসে—আমাদের তিন ভাইবোনের মধ্যে শোভা একটু অন্যরকমের। আমরা দুই ভাই কতবার ভুল করে ওর ভাগের ভাত ডাল তরকারি চেটেপুটে খেয়ে ফেলি। কিন্তু শোভা কোনদিন ঠাট্টা করেও বলে না যে, আমরা কী ভুল করে ফেলেছি। শোভা না খেয়েই অফিসে এসেছে আর ফিরে গিয়ে রাত দশটায় ভাত খেয়েছে।

ইন্দুলেখা—আপনি কী করেন?

নির্মল—আমি একটা প্রাইমারী স্কুলের টিচার।

জিতেনবাবু—নাটক লেখা হলো নির্মলের একটা শখের ব্যামো।

ইন্দুলেখা—না না, ব্যামো কেন হবে? খুব ভাল নাটক লিখেছেন নির্মলবাবু।

জিতেনবাবু হেসে ওঠেন—আমার সন্দেহ হয়, শোভার স্বভাবের সঙ্গে মিল রেখে জয়া চরিত্রটি তৈরি করেছে নির্মল, যাতে শোভার পক্ষে জয়ার ভূমিকায় অভিনয় করা সহজ হয়।

নির্মল হাসে—জিতেনদার সন্দেহটা খুব মিথ্যে নয়।

ইন্দুলেখা—তাহলে তো বলতে হয়, শোভা একটি অসাধারণ শান্ত স্বভাবের মেয়ে।

জিতেনবাবু—কোন সন্দেহ নেই।

ইন্দুলেখা—নির্মলবাবুরা কোথা থাকেন?

জিতেনবাবু—সোদপুরে পঞ্চাননতলার কাছে।

নির্মল—পঞ্চাননতলাতেই আমাদের বাসা।

ইন্দুলেখা—আর কে কে সেখানে থাকেন?

নির্মল—বাবা আর মা আছেন।

জিতেনবাবু—দুঃখের বিষয়, নির্মলের বাবা আর মা দু'জনেই রোগী মানুষ। প্রায় শয্যাশায়ী বললেই চলে।

ইন্দুলেখা—তাহলে তো বুঝতে হয়, বাড়ির সব কাজ শোভাকেই করতে হয়।

জিতেনবাবু—সব সব। রান্নাবান্না থেকে শুরু করে কুমড়ো গাছের পরিচর্যা পর্যন্ত সব কাজ শোভাই করে। শোভার কাজও কত নিখুঁত। সব সময় কাজ করছে, কিন্তু মুখে হাসি লেগেই আছে। আপনি শোভার কাজেরও কোন শব্দ শুনতে পাবেন না।

ইন্দুলেখা—শোভার বয়স খুব অল্প বলে মনে হয়েছে।

জিতেনবাবু—এই তো, দু'বছর আগে স্কুল ফাইনাল পাশ করেছে।

নির্মল—শোভার বয়স কুড়ি কিংবা একুশ হবে, তার বেশি নয়।

ইন্দুলেখা—বাঃ, চমৎকার।

জিতেনবাবু—পঞ্চাননতলার প্রত্যেকেই বলেন, চমৎকার। কেশববাবু বলেন, তাঁর মেয়ে অরুন্ধতীকে বিয়ের দিনে এমনই সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছিল শোভা যে, অরুন্ধতীকে একটি অসাধারণ রূপসী মেয়ে বলে মনে হয়েছিল। অথচ অরুন্ধতী হলো নিতান্ত সাধারণ রকম চেহারার মেয়ে।

ইন্দুলেখা খুশি হয়ে হাসেন—শোভাকে তাহলে ভাল আর্টিস্ট বলতে হয়।

জিতেনবাবু—হ্যাঁ, বলতেই হয়।

ইন্দুলেখা—ভাল সাজাতে জানে যখন, তখন ভাল সাজতেও জানে নিশ্চয়?

জিতেনবাবু—নিশ্চয়। তা ছাড়া দেখতেই তো পেলেন, সামান্য একটা লালপেড়ে তাঁতের শাড়িতে জয়াকে কী অদ্ভুত অপরূপ দেখাচ্ছিল। নয় কি?

ইন্দুলেখা—হ্যাঁ। আচ্ছা, আমরা এখন চলি। কিন্তু আপনি, কালই সকালবেলা আমাদের ওখানে একবার অবশ্যই আসবেন, জিতেনবাবু।

জিতেনবাবু—আজ্ঞে?

ইন্দুলেখা—আপনি একবার আসবেন। কথা আছে।

ব্যারাকপুরের এ বাড়ির দোতলার জানালার কাছে দাঁড়ালে গঙ্গার ঢেউ দেখতে পাওয়া যায়। বেশ বড় বাড়ি, তিনতলা বাড়ি। এ বাড়ির ষোল আনা মালিকানা স্বত্ব যাঁর, তিনি এ বাড়িতে থাকেন না। তিনি হলেন ধীরাজের ছোট কাকা বিনোদ ঘোষ, যিনি এককালে রেলওয়ের কন্ট্রাক্টর ছিলেন। সত্তর বছর বয়সের ছোট কাকা বিনোদ ঘোষ এখন তাঁর উত্তরপাড়ার ছোট বাড়িতে একাই থাকেন আর গীতা পাঠ করে দিনযাপন করেন। স্ত্রী নেই, তিনি বিগত হয়েছেন কুড়ি বছর আগে। নিঃসন্তান বিনোদ ঘোষ এখন তাঁর এই একা-জীবনের ছোট বাড়িটার মধ্যেই শান্তির নীড় পেয়ে গিয়েছেন। বিনোদ ঘোষের মজাদার ছেলেরা সকলেই ভাল রোজগারে মানুষ, সবারই বাড়ি আছে। তাই তিনি বলে রেখেছেন, তাঁর ব্যারাকপুরের ওই তিনতলা বাড়িটাকে তিনি বড়দার ছেলে ধীরাজকেই গিফ্‌ট্‌ করে দেবেন। বড়দা আর বড় বউঠান এই বাড়িতেই থেকে জীবন কাটিয়েছেন। সুতরাং তাঁদের এই এক ছেলে ধীরাজও ওই বাড়িতে থাকুক আর জীবন কাটিয়ে দিক।

হ্যাঁ, ধীরাজ যদি বিয়ে করে প্রকৃত সংসারী হয়, তবেই। তা না হলে একটা একা জীবনের জন্য এত বড় তিনতলা বাড়ি নিয়ে কী করবে ধীরাজ? না, তাহলে বাড়িটাকে কোন জনসেবার ট্রাস্টের কাছে সঁপে দিতে হবে।

এই বয়সে জয়ন্তী জুট মিলের ওয়ার্কস ম্যানেজার হওয়া ধীরাজের মতো ইঞ্জিনীয়ারের পক্ষে সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ, যদি বালিগঞ্জের পিসেমশাই, অনন্তবাবুর সুপারিশের ও চেষ্টার জোর না থাকতো। অনন্তবাবু কিন্তু এই একটি বছরে অন্তত পাঁচবার খুব গম্ভীর হয়ে মন্তব্য করেছেন—প্রায় দু'বছর হলো কাজ পেয়েছে ধীরাজ ; কিন্তু এখনও বিয়ে করবার কোন ইচ্ছের কথা বলে না কেন? কী ভেবেছে ধীরাজ? এইভাবে একটা ইয়ের মতো জীবনটা কাটিয়ে দেবে? তবে এই দেড় হাজার টাকা মাইনের চাকরিটা ওর কোন্ দরকারের কাজে লাগবে?

ভবানীপুরের কাকার বাড়িতে গিয়ে পিসিমা কয়েকবার বেশ একটু তপ্ত হয়ে তাঁর একটা আপত্তির কথা বলেছেন—ধীরাজ যদি বিয়ে করতে না চায়, তবে নাই বা করলো। কিন্তু ওই উড়ে এসে জুড়ে বসা বিধবাটি ওবাড়িতে থাকবে কেন? আছেই বা কেন?

করুণা-বউদি বলেন—কী করে বলি!

পিসিমা—কিন্তু ব্যাপারটা কি?

করুণা-বউদি—দুমকার নিশিবাবুর কথা আপনার মনে আছে?

—হ্যাঁ।

—নিশিবাবুর বাড়ির বাগানটাকে মনে পড়ে?

—হ্যাঁ।

—একদিন একটা হরিণ বাগানের ভিতরে ঢুকে পড়েছিল, মনে পড়ছে?

—হ্যাঁ, হরিণটা সারা বাগান ঘুরে ঘাস আর কচি গাছের পাতা খেতো, আমগাছের ছায়াতে ঘুমিয়ে পড়ে থাকতো।

—কিন্তু হরিণটা বাগানের ভিতরে ঢুকতে পেরেছিল কেন, জানেন কি?

—জানি বৈকি। মালীটা রাত্রিবেলা বাগানের ফটক বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল। কাজেই খোলা রাস্তা পেয়ে হরিণটা...।

হেসে ফেললেন করুণা-বউদি—এই ব্যাপারটাও ঠিক ওই রকমের ব্যাপার।

পিসিমা ভ্রূকুটি করেন—কিন্তু ব্যাপারটা যে একটুও ভাল দেখায় না। ইন্দুলেখা চলে যাবে কবে?

করুণা-বউদি—সত্যিই যাবে কি?

পিসিমা—ইন্দুলেখা ওখানে থাকলে ধীরাজের বিয়ে কোনদিনই হবে কি?

করুণা-বউদি—বুঝতে পারছি না।

পিসিমা—ছি ছি।

দেয়ালের যেমন কান আছে, বাতাসেরও তেমনই মুখ আছে বোধহয়। এইসব আলোচনা ও মন্তব্যের অনেক কথা যেন হাওয়াই বার্তা হয়ে ইন্দুলেখার কানে পৌঁছে গিয়েছে। শুনে গম্ভীর হয়েছেন ইন্দুলেখা। কিন্তু পর মুহূর্তে হেসে উঠেছে তাঁর চোখের তারা।

ইন্দুলেখার চোখের তারার ভিতরে বোধহয় একটা হীরের কুচি লুকিয়ে আছে। নইলে হঠাৎ ওরকম ঝিলিক দিয়ে হেসে উঠবে কেন বেয়াল্লিশ বছর বয়সের দুটো মেয়েলী চোখের তারা?

ঠিক কথা। মনে যখন বিষাদ, আশাটা হঠাৎ যখন অন্ধকার দেখে ভীরু হয়ে যায়, তখন বড় বেশি গম্ভীর হয়ে যায় ইন্দুলেখার চোখ দুটো। আর নতুন আলো দেখতে পেয়ে আশাটা যখন সাহস পায় আর খুশি হয়, তখনই হেসে ওঠে তাঁর চোখের তারার ভিতরে লুকানো হীরের কুচি।

কিন্তু ইন্দুলেখার সম্পর্কে এইসব অভিযোগের মেঘ আর বেশি ঘনিয়ে উঠবার সুযোগ পেল না। ধীরাজের আপনজন এইসব কাকা পিসিমা আর বউদিরা শুনতে পেলেন ও জানতেও পারলেন যে, ধীরাজের বিয়ের জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন ইন্দুলেখা। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। এদিক ওদিক অনেক মেয়েও দেখেছেন। ইন্দুলেখার কাছ থেকে এঁরা সবাই উল্টো অভিযোগের চিঠি পেয়েছেন ঃ আপনারা সবাই যদি চেষ্টা না করেন, তবে আমি একা কী করতে পারি? ধীরাজের বিয়ের জন্য মেয়ে খুঁজে খুঁজে আমি তো হয়রান হয়ে গেলাম। আপনারা একটু সচেষ্ট হলে এতদিন কি একটি ভাল মেয়ে পাওয়া যেত না? নিশ্চয় পাওয়া যেত।

চিঠি পেয়ে এঁরা সবাই বেশ লজ্জাও পেয়েছেন। ইন্দুলেখাকে এতদিন ধরে খুবই ভুল বুঝেছেন তাঁরা। করুণা-বউদি লজ্জিত হয়ে বলেন—যাক, ভাগ্যি ভাল, আমি তেমন কিছু নিন্দের কথা বলিনি।

পিসিমা বলেন—একটু ভেবেচিন্তে নিন্দে করা উচিত ছিল।

করুণা-বউদি—সবচেয়ে ভয়ানক নিন্দের কথা বলেছেন সুহাসদি।

—কী বলেছে সুহাস?

করুণা-বউদি—সুহাস বলেছিলেন, ইন্দুলেখা হলেন একটি রাজসাপ, আর ধীরাজ একটা চড়ুই পাখি। রাজসাপের চোখের দৃষ্টির সামনে চড়ুই যেমন মুষড়ে পড়ে আর রাজসাপেরই মুখের কাছে এগিয়ে আসে তেমনই...।

পিসিমা—থাম থাম। তুমি বলেছ হরিণ আর সুহাস বলেছে রাজসাপ। দুইই খুব অন্যায় কথা, খুব ভুল কথা।

ইন্দুলেখা জানেন যে, তিনি যদি ইচ্ছে না করেন তবে ধীরাজ কখনও কোনদিনও বিয়ে করতে ইচ্ছে করবে না। সত্যি কথা, বিয়ে করতে ধীরাজের কোন ইচ্ছে তো নেইই, বরং ঘোর আপত্তি আছে। কিন্তু ইন্দুলেখা বুঝেছেন, ধীরাজের এইসব আপনজনের ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করলে ধীরাজের খুবই ক্ষতি হবে। পিসেমশাই বেশি রাগ করলে ধরীজের দেড় হাজার টাকা মাইনের চাকরিটাকেও তিনি মিথ্যে করে দিতে পারেন। সে জোর তাঁর আছে। ধীরাজ বিয়ে না করলে ছোট কাকা রাগ করে তাঁর এই তেতলা বাড়িটাকে খয়রাতি করে দিতে পারেন।

ধীরাজের মা মারা যাবার আগে তাঁর সব অলঙ্কার করুণা-বউদির কাছে রেখে দিয়ে রেজিস্টারী করা একটা ইচ্ছাপত্র রেখে দিয়ে গিয়েছেন। ধীরাজ যদি বিয়ে করে, তবে তাঁর সব অলঙ্কার ধীরাজের বউ পাবে। যদি বিয়ে না করে ধীরাজ, তবে সব অলঙ্কার ভবানীপুরের বাড়ির তিন বউ করুণা বিমলা আর অর্চনা পাবে। শুনেছেন ইন্দুলেখা, সে সব অলঙ্কারের

সোনার ওজন দেড়শো ভরিরও বেশি। তা ছাড়া হীরের আংটি আর দু'জোড়া দুলও আছে। জড়োয়া হার আছে পাঁচটা। সুতরাং ধীরাজের বিয়ে না করার কোন মানে হয় না। আর ইন্দুলেখাই বা ধীরাজের বিয়ে না দিয়ে পারবেন কেন? সব হারিয়ে ধীরাজ যদি একটা গাছতলার ধীরাজ হয়ে যায়, তবে তার পাশে বসে কতটুকু ছায়া পাবেন ইন্দুলেখা? তার চেয়ে পুনার স্কুলবাড়ির ভাঙ্গা থামের ছায়াটাও অনেক ভাল।

যে ইন্দুলেখা আজ ধীরাজের সুখ শান্তি আর কল্যাণের জন্য এত ভাবছেন, দু'বছর আগেও সে ধীরাজের সঙ্গে তাঁর সামান্য চোখে দেখা একটা পরিচয়ের সম্পর্কও ছিল না। ধীরাজ শুধু শুনেছিল যে, বড় মামার বড়ছেলে মধুদার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে যাঁর তাঁরই নাম ইন্দুলেখা। প্রায় দশ বছর আগের কথা, মেজমাসীর একটি চিঠি পেয়ে জানতে পেরেছিল ধীরাজ, মধুদা আর নেই। হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গিয়েছেন।

দশ বছর আগের একটি চিঠি থেকে পাওয়া খবরের সেই ঘটনা কবেই স্মৃতি-বিস্মৃতির একটা ঝাপসা ঘটনা হয়ে গিয়েছিল কিন্তু এই দু'বছর হলো, মিলের কাজে পুনাতে গিয়ে মিস্টার মজুমদারের কাছে শুনতে পেল ধীরাজ, মধুদার বিধবা স্ত্রী, ইন্দুলেখা পুনাতেই একটা মেয়ে-স্কুলের বাংলা টিচার হয়ে কাজ করেন, মাইনে আশি টাকা। ইন্দুলেখার সঙ্গে দেখা করে মাত্র একটি ঘণ্টার আলাপের পর বুঝতে পেরেছিল ধীরাজ, ইন্দু-বউদির আর এখানে পড়ে থাকা উচিত নয়। ইন্দুলেখা বলেছিলেন—আমার নিজের জন্য একটুও ভাবছি না ; ভাবছি, তুমি কেন একেবারে একলাটি হয়ে পড়ে থাকবে? কোনদিনও তোমাকে দেখিনি, সে একরকমের ভাল ছিল। কিন্তু এর পর...।

ইন্দুলেখার চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে উঠেছিল। তার কারণ ইন্দুলেখার জীবনে এইবার একটা নতুন ভাবনার কষ্ট দেখা দিল। এই সুদূর পুনাতে বসে ইন্দুলেখাকে রোজই ভাবতে হবে, ধীরাজ কেমন আছে? কাজের খাটুনির পরে বাড়িতে ফিরে এসে ধীরাজ এক পেয়ালা গরম চা খেতে পাচ্ছে কি পাচ্ছে না কে জানে! ঠাকুর আর চাকরের যত্ন কি সত্যিই একটা যত্ন?

ইন্দুলেখার ঘরে বসে, গরম চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে আর ইন্দুলেখারই মুখের অদ্ভুত রকমের দুটি নরম ঠোঁটের দুঃখিত হাসিটার দিকে তাকিয়ে ধীরাজ হঠাৎ বলে ওঠে—না, আমি তোমার কোন আপত্তির কথা শুনবো না ইন্দুবউদি। তুমি চল।

সেই যে পুনা ছেড়ে চলে এসেছেন ইন্দুলেখা, তারপর ব্যারাকপুরের এই বাড়িটাই তাঁর মন-প্রাণের ও হাতের সব যত্নের আশ্রম হয়ে উঠেছে। ধীরাজের বিছানার উপর আর পুরনো খবরের কাগজ ছড়িয়ে পড়ে থাকে না। আয়নার টেবিলের উপর চায়ের পেয়ালা আর থাকে না। পুরনো ময়লা ফার্নিচারের কিছুই আজ আর নেই। সব সরিয়ে আর বেচে দিয়ে নতুন সেগুনের ফার্নিচারে ঘরগুলিকে সাজানো হয়েছে। মেজেতে নতুন কার্পেট, সিঁড়ির দু'পাশে ফুলের নতুন টব। ঠাকুর আর সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকবার সুযোগ পায় না। চাকরকে দু'বেলা প্রত্যেকটি ঘরের ধুলো মুছতে হয়। দিনে আর রাতে ধীরাজ কী খাবে কিংবা খাবে না, সেটা বিচার করে বুঝে দেখবার দায়িত্ব ইন্দুলেখারই। ধীরাজের কিছুই বলবার নেই, কিছু বলবার দরকারও হয় না। মাসের মাইনের দেড় হাজার টাকা ইন্দুলেখার হাতে ফেলে দিয়ে দায়মুক্ত হয়ে যায় ধীরাজ।

নিজের পছন্দ মতো সুখ শান্তি ও প্রীতির একটি স্বর্গ তৈরি করে নিয়েছেন ইন্দুলেখা। তার মধ্যে নিজের ইচ্ছার মন্দার কাননও তৈরি করে ফেলেছেন। তার মধ্যে পারিজাতও ফুটে উঠেছে। ইন্দুলেখার চেষ্টা ও যত্নের কোন ভুল হয়নি। তার সব ইচ্ছাই জয়ী হয়েছে।

ধীরাজও কম যত্নশীল নয়। ইন্দুবউদির সুখ-সুবিধার জন্য সর্বদাই ব্যস্ত হয়ে আছে ধীরাজ। ইন্দুলেখা মুখ খুলে তাঁর মাথার কষ্টের কথা বলেন না, শুধু মাথাটাকে এক হাত দিয়ে ছুঁয়ে আর নীরব হয়ে শুয়ে পড়ে থাকেন। কিন্তু এটুকুই যথেষ্ট। ধীরাজ ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

পাখা নিয়ে ইন্দুলেখার মাথায় বাতাস দিয়ে দিয়ে তিনটি ঘণ্টা পার করে দিলেও ক্লান্ত হয় না ধীরাজ। ইন্দুলেখার কপালে ওডিকোলনের পটি লাগাতে গিয়ে ধীরাজের হাতটা খুব সাবধানে কাজ করে। হাতটা যেন তড়বড় না করে, ইন্দুবউদির ঘুম যেন ভেঙ্গে না যায়।

ইন্দুলেখা চান, ধীরাজও চায়, এ বাড়ির জীবনের এই সাজানো রূপের কিছুরই যেন নড়চড় না হয়। যেমনটি চলছে, ঠিক যেন তেমনটি চিরকাল চলতে থাকে। তাই ধীরাজের বিয়ে দিয়ে এমন একটি মেয়েকে এ বাড়িতে আনতে চান ইন্দুলেখা, যে মেয়ে তাঁর এই সাজানো বাগানের মধ্যে ফুল হয়ে ফুটে থাকবে। যেন একটা ঝড় হয়ে সব ওলট-পালট না করে দেয়।

বুঝতে পারেননি বালিগঞ্জের পিসিমা. উত্তরপাড়ার ছোটকাকা আর ভবানীপুরের করুণা, কেন ধীরাজের বিয়ে হতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। তাই তাঁরা আবোলতাবোল অনেক বাজে চিন্তার কথা বলেছিলেন। কিন্তু এইবার তাঁরা শুনতে পেয়ে নিশ্চয় চমকে উঠবেন, এ বাড়ির রূপের বাগানে চমৎকার একটি শান্ত শোভার ফুল হয়ে ফুটে থাকতে পারবে, এমনই একটি মেয়ের খোঁজ পেয়ে গিয়েছেন ইন্দুলেখা। কী আশ্চর্য, মেয়েটির নামও শোভা।

জিতেনবাবুর সঙ্গে কাজের কথা নিয়ে যেদিন আলোচনা করলেন ইন্দুলেখা, তার পরের দিনই সোদপুরে গিয়ে শোভাকে তিনি দেখে এলেন। সোদপুরের সেই পঞ্চাননতলার একজন মনুবউদি এসে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে ইন্দুলেখারই প্রশংসা করেছেন—সত্যিই আপনার চোখের প্রশংসা করতে হয় দিদি। আপনি খাঁটি জিনিস চিনতে জানেন। গরীব ঘরের মেয়ে বটে শোভা কিন্তু গুণে স্বভাবে ও রূপে এ মেয়েকে আপনাদেরই মতো মানুষের বাড়িতে ভাল মানায়।

আর সাতটি দিন পরেই শোভার সেই ভাগ্যের উৎসবটাকে দেখে সোদপুরের পঞ্চাননতলার সন্ধ্যাবেলার চাঁদটাও যেন খুশি হয়ে জ্যোৎস্না ছড়ালো আর হাসলো। প্রতিবেশী সনাতনবাবু বললেন—একেই বলে ভাগ্য।

৩

ব্যারাকপুরের বাড়িতে ফুলশয্যার রাত্রিটাও আলোতে ভরে গিয়ে ঝলমল করে হেসে উঠলো। ধীরাজের আপনজন বলতে যাঁরা কলকাতাতে আছেন তাঁরা সবাই এলেন। এমন কি বড়কাকার মেয়ে সুহাসিনীও তার তিন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আর খুশি হয়ে শোভার সুন্দর মুখটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। ইন্দুলেখা এগিয়ে এসে কাছে দাঁড়ালেন আর হাসলেন—কী দেখেছেন সুহাসদি? স্বীকার করুন এবার আপনার ঋষ্যশৃঙ্গ ভাইটির মনপ্রাণ উতলা করে দেবার মতো জিনিসটি আমি এনেছি।

সুহাসিনী বলেন—স্বীকার করছি ভাই। আগন্তুক অভ্যাগতদের হাসি-হল্লা আর মেয়েদের কলকণ্ঠের কাকলি নীরব হতে হতে রাত দশটা পার হয়ে গেল। খাওয়াদাওয়ার পালা শেষ হতে আর সবাই বিদায় নিয়ে চলে যেতে রাত এগারটা। তারপর নীরব তিনতলা বাড়িতে শুধু ফুলশয্যার ঘরে একটি বিহুল হাসির শব্দ বাজতে থাকে। গল্প করেন আর হাসতে থাকেন ইন্দুলেখা।

বিছানার উপরে একদিকে বসে আছে শোভা, আর-একদিকে ধীরাজ। ইন্দুলেখা একটা চেয়ার বিছানার কাছে টেনে নিয়ে আর বিছানারই উপর দুই কনুই রেখে গল্প বলতে থাকেন। সাতারার শিবাজীর দুর্গের গল্প, মোগলসরাইয়ের ওয়েটিং রুমের গল্প, আর বোম্বাইয়ের মারাঠী মেয়ে সৌদামিনীর বিয়ের গল্প। ধীরস্থির হয়ে আর চুপ করে বসে গল্প শোনে ধীরাজ, কিংবা গল্পের কথাগুলি শুনতে পাচ্ছে না বলেই ধীরস্থির হয়ে আর চুপ করে বসে আছে। কিন্তু হেসে উঠছে শোভা। দুই কালো চোখ একেবারে অপলক হয়ে আর নিবিড় হয়ে হাসতে থাকে।

সৌদামিনীর বিয়ের গল্পটি বলতে অনেক সময় নিলেন ইন্দুলেখা। গল্পটা যেন ফুরোতেই চায় না।...বিয়ের বাজনা বেজে উঠলো অনেক রাতে, এতক্ষণে বর এসেছে। বরের মাথার পাগড়ীর ঝালরের সঙ্গে ফুলের মালা দুলছে। এদিকে...ও কী, কাক ডাকছে বোধহয়। ভোর হয়ে গেল নাকি।

ঠিকই ভোর হয়ে গিয়েছে। ইন্দুলেখা বলেন—কী আশ্চর্য, কত শিগগির ভোর হয়ে গেল।

বিছানা থেকে নেমে পড়ে ধীরাজ। ইন্দুলেখা বলেন—তোমার বোধহয় এখুনি এক পেয়ালা চা চাই।

ধীরাজ—হ্যাঁ।

ইন্দুলেখা—তবে যাও, হাত মুখ ধুয়ে নাও।

ধীরাজ চলে যেতেই শোভার মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন, তারপর কথা বলেন ইন্দুলেখা—ঘুমোতে পারলে না বলে কষ্ট হলো না তো, শোভা?

শোভা—না।

ইন্দুলেখা—কষ্ট হয়েছে নিশ্চয়?

শোভা—না, একটুও না।

হাসছে শোভার দুই কালো চোখ। ঠিক সেই হাসি, যে হাসি সেদিন নাটকের জয়ার চোখে দেখতে পেয়েছিলেন ইন্দুলেখা।

ফুলশয্যার এই রাত্রির পর আরও অনেক রাত্রি পার হয়ে যাবার পর আরও খুশি হলেন ইন্দুলেখা। শোভা সত্যিই শোভা। যেখানে যেমনটি করে এই শোভাকে সাজিয়ে আর বসিয়ে রাখছেন ইন্দুলেখা, শোভা ঠিক তেমনটি করে সেজে বসে থাকতে পারে। সকালবেলা, ঠিক আটটার সময় যখন ইন্দুলেখা আর ধীরাজ নিজের নিজের ঘর থেকে বের হয়ে এসে ড্রইংরুমের সোফার উপর বসে, তখন শোভাও তার ঘর থেকে বের হয়, আর ড্রইংরুমে এসে কোচের উপর বসে। সন্ধ্যাবেলাতেও এই নিয়ম। তিনজনের মেলামেশার আর গল্প করবার যা-কিছু অনুষ্ঠান সবই এই ড্রইংরুমের সকাল ও সন্ধ্যার দুটি আসর হয়ে দেখা দেয়। ধীরাজ কখন আবার টেবিলের কাছে গিয়ে বসলো, কিংবা বাইরে বের হয়ে গেল, সে-সব ঘটনার কোন খবর রাখবার দরকার নেই শোভার। সে সব ঘটনার দেখাশোনা করবার জন্য ইন্দুলেখাই আছেন।

শোভা যেন মনে-প্রাণেও একেবারে সেই নাটকেরই জয়া। সেই অচঞ্চল শান্ত মুখ, চোখে সেই নিবিড় হাসি। সত্যি, এই শোভা একটি প্রশ্নহীন অস্তিত্ব। যেমন করে শোভাকে মানাতে চাইছেন ইন্দুলেখা, শোভা ঠিক তেমনই করে মানিয়ে চলেছে। যেদিন যে-শাড়ি পরতে বলেন ইন্দুলেখা, সেদিন সেই শাড়িই পরে শোভা। সোদপুরের পঞ্চাননতলার মেয়ে, একুশ বছর বয়স, সে যেন ব্যারাকপুরের এই তিনতলার বাড়িতে শোভার ভূমিকা নিয়ে একটি সুন্দর স্টেজের উপর দাঁড়িয়ে আছে ; হাসছে বসছে আর ঘুরছে। বুঝতে পেরেছেন ইন্দুলেখা, যা আশা করেছিলেন তিনি, তার চেয়ে কিছু বেশিই পেয়ে গিয়েছেন।

বাতাসের মুখ আছে, বাতাসও কথা বলে। তাই আবার শুনতে পেয়েছেন ইন্দুলেখা, ছোটকাকা এইবার বাড়িটাকে ধীরাজের নামে গিফ্ট করে দেবার দলিল লেখাবার জন্য উকিলকে ডেকেছেন। ভবানীপুরের করুণা বলেছে, ধীরাজের মায়ের সব অলঙ্কার নিয়ে সে নিজেই শিগগির একদিন এ বাড়িতে আসবে। ইন্দুলেখার ইচ্ছা ও আশার সব স্বপ্নই সফল হতে চলেছে।

বুঝতে পেরেছেন ইন্দুলেখা, অনেক রাতে করিডরের দুই প্রান্তের বিদ্যুতের বাড়ি দুটো যখন মৃদু হয়ে জ্বলে তখন শোভা তার ঘরের বাইরে পায়ের শব্দের অনেক আনাগোনার কোন সাড়া শুনতে পায় না। শুনতে পেত যদি তবে বোধহয়, অন্তত কোনদিনও একবার

দরজা খুলে ঘরের বাইরে উঁকি দিয়ে দেখতো। কিংবা কিছুই ধারণা করতে পারে না। নিজের ঘুম আর নিজের স্বপ্ন নিয়ে ঘরের ভিতরে একা শুয়ে থাকতে ভালবাসে শোভা।

ইন্দুলেখা বলেন—সোদপুরের বাড়িতে যে চিঠি লিখবে, সে চিঠিটা একবার আমাকে দেখতে দিও, শোভা।

শোভা—আচ্ছা।

ইন্দুলেখা বলেন—সুহাসদি যদি কোনদিন এসে জিজ্ঞাসা করেন, কেমন আছ শোভা, তবে তুমি তাঁকে কী বলবে, একবার বল তো, শুনি।

শোভা হাসে—আপনি বলে দিন, কী বলবো।

ইন্দুলেখার চোখের হীরার কুচি হেসে ওঠে—এই তো, ঠিক কথা বলেছ। এ বাড়িতে আমরা তোমার কাছে থেকে এইরকম কথাই আশা করি...। যাক, তুমি শুধু বলবে, খুব ভাল আছি, ইন্দুদি থাকতে আমার ভাল না-থাকবার সাধ্যি কী?

হেসে ওঠে শোভার শান্ত নিবিড় কালো চোখ। শোভা বলে—তাই বলবো।

ড্রইংরুমে বসে গল্প করতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন ইন্দুলেখা—তুমি কি আগেও কখনও অভিনয় করেছিলে, শোভা?

শোভা—না।

ধীরাজ হাসে—লায়লা রিজিয়া মৃণালিনী কিংবা শৈব্যা হওনি কোনদিন?

শোভা—না।

ধীরাজ—শুধু ওই এক জয়া?

শোভা—হ্যাঁ।

ধীরাজ—তাহলে আর কী করে বলি যে, তুমি খুব ভাল অভিনয় করতে পার!

ইন্দুলেখা—আর অভিনয় করবার দরকার তো নেই। তবে হ্যাঁ, যদি লায়লা-টায়লা সেজে এই ঘরে মাঝে মাঝে বসে থাকে শোভা, তবে আমোদটা মন্দ হয় না।

ধীরাজ—তা ওরকম করে সাজতে-টাজতে পারে নিশ্চয়ই শোভা। কী যেন তার নাম যাকে বিয়ের দিনে তুমি নিজের হাতে সাজিয়ে খুব রূপসী করে দিয়েছিলে?

শোভা—অরুন্ধতী।

ধীরাজ—তবে তুমি নিজে একটা লায়লা কিংবা মৃণালিনীর মতো সাজতে পারবে না কেন? খুব পারবে।

শোভা—যাকে কখনো দেখিনি, তার মতো সাজবো কেমন করে?

ইন্দুলেখা—তবে তাদেরই মতো সাজ করে দেখাও, যাদের দেখেছো। এই ধর সুহাসদির মেয়ে বরুণা সেদিন যেমন সেজেছিল, তুমি একদিন ঠিক ওইরকম খোঁপার মুকুট করে, তার সঙ্গে জুঁইয়ের মালা জড়িয়ে একেবারে বরুণাটি হয়ে আমাদের আশ্চর্য করে দাও তো, দেখি।

শোভা—আমি বরুণাকে ভাল করে দেখিনি।

ইন্দুলেখা চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন—ও হরি, আগে ভাল করে দেখতে হবে?

শোভা—তা না হলে...।

ইন্দুলেখা—তবে আর কী বলা যায়! তুমি ভাল আর্টিস্ট নও, শোভা।

শোভা—আমি কিন্তু ঠিক আপনার মতো সাজতে পারি।

—অ্যাঁ? কী বললে, ঠিক আমার মতো?

শোভা—হ্যাঁ।

—কালো পাড়ের সাদা সিল্কের শাড়ি পড়লেই কি ইন্দুদি হওয়া যায়? অসম্ভব।

শোভা—কেন সম্ভব নয়, ইন্দুদি?

চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন ইন্দুলেখা—শোন বোকা মেয়ের কথা! কালো পাড়ের সাদা সিল্কের

শাড়ি না হয় পেলে। কিন্তু কোথায় পাবে ইন্দুদির এই দুই ঠোঁট, এই চকচকে চোখ আর এইরকম দুটি নিটোল হাত? আমি বলবো, তুমি চেষ্টা করলে লায়লা হতে পারবে, রিজিয়া বা শৈব্যাও হতে পারবে। কিন্তু শত চেষ্টার তপস্যা করলেও ইন্দুদি হতে পারবে না।

ধীরাজ রুমাল তুলে মুখের উচ্ছ্বসিত হাসিটাকে চাপা দেয়। ধীরাজের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে শোভা। একুশ বছর বয়েসের দৃষ্টিটাই হঠাৎ যেন একটা নিথর নিরেট জিজ্ঞাসা হয়ে ধীরাজকে দেখছে।

৪

অনেক রাত, ঘুম আসেনি তাই বেশ স্পষ্ট করে শুনতে পায় শোভা, ঘরের বাইরের পায়ের শব্দটা ওদিক থেকে এসে করিডরের শেষদিকে ইন্দুদির ঘরের দিকে চলে গেল। তারপর শুধু গঙ্গার জলের শব্দ শুনতে থাকে শোভা। বোধহয় গঙ্গাতে বান এসেছে।

সকালবেলা ড্রইংরুমে এসে ঢুকতেই ইন্দুলেখা বললেন—আজ বিকেলে শকসেনা সাহেবের বাড়ির মেয়েরা আসবেন, শোভা। আজ কেমনটি সাজবে, বলো?

শোভা—বলে দিন।

ইন্দুলেখা—সালোয়ার পায়জামা আর ওড়না পরবে?

শোভা—হ্যাঁ।

ইন্দুলেখা—বেণী রাখবে, না খোঁপা রাখবে?

শোভা—বলে দিন।

ইন্দুলেখা—আমার মনে হয়, বেণীই ভাল। তোমার মতো বয়সের মেয়েকে বেণীতেই ভাল মানায়।

শোভা—আচ্ছা।

বিকেলের রোদের আভা লেগে ড্রইংরুমের জানালার কাঁচ যখন সোনালী হয়ে জ্বলছে, ঠিক তখন উপস্থিত হলেন মিসেস শকসেনা ও তাঁর দুই বোন। শোভাকে দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন মিসেস শকসেনা।—বাঃ, সুন্দর। আমি তো দেখে বুঝতেই পারিনি যে, এই কচি মেয়েটি হলো ঘোষসাহেবের ওয়াইফ।

ইন্দুলেখা হাসেন—বয়স কিন্তু একুশ বছর।

মিসেস শকসেনা—কিন্তু দেখে তো ষোল বছর মনে হয়।

ইন্দুলেখা—হ্যাঁ, তাই মনে হয়। বয়স একুশ বছর হলেও এই মেয়ের প্রাণটা সত্যিই একেবারে ষোল বছর বয়সের মেয়েটির মতো।

মিসেস শকসেনা—খুব ছটফটে?

ইন্দুলেখা—না না, একটুও ছটফটে নয়। বরং ঠিক তার উল্টো। খুব শান্ত, খুব সরল স্বভাবের মেয়ে।

মিসেস শকসেনা বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর ইন্দুলেখা হাসতে থাকেন—মিসেস শকসেনাকে ভাল করে দেখেছো তো, শোভা?

শোভা—হ্যাঁ।

ইন্দুলেখা—তবে একদিন ওইরকমটি ভারী জর্জেট পরে আর মুখে পাঁচ খিলি পান পুরে গালটি ফুলিয়ে নিয়ে মিসেস শকসেনা হয়ে যাও।

শোভা—কিন্তু...।

ইন্দুলেখা হাসেন—বুঝেছি, সম্ভব নয়। মিসেস শকসেনার মতো অমন একটি ভুঁড়ি পাবে কেমন করে?

হেসে ফেলে শোভা—না, সেকথা বলছি না। বলছি মিসেস শকসেনার মুখের হাসিটি বেশ সুন্দর।

বাইরে গাড়ির হর্নের শব্দ শুনেই সোফা থেকে ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ালেন ইন্দুলেখা—এ কি? ধীরাজ এল নাকি?

হ্যাঁ, ধীরাজই এসেছে। ঘরে ঢুকেই হেসে ফেলে ধীরাজ—এ কী, এ আবার কোন সঙ? সালোয়ার পায়জামা আর ওড়না?

ইন্দুলেখা—আমি বলেছি, তাই শোভা এইরকমটি সেজেছে। মিসেস শকসেনা এই কিছুক্ষণ হলো চলে গেলেন।

ধীরাজের হাতে একটা চিঠি। চিঠিটাকে শোভার হাতের উপর ফেলে দিয়ে ইন্দুলেখারই পাশে সোফার উপর বসে পড়ে ধীরাজ—গ্রেগ অ্যাণ্ড রতনলালের অফিসের স্টাফ আবার 'তবু দীপ জ্বলে' প্লে করবার ব্যবস্থা করেছে। নন্দী সাহেব আবার বিশেষ অনুরোধ করে নাটক দেখবার নেমন্তন্ন করেছেন। এ ছাড়া তাঁর আরও একটা অতিবিশেষ ইচ্ছের অনুরোধ হলো, শোভা যেন আবার নাটকের জয়া হয়ে অভিনয় করে যায়। স্টাফেরও সবারই তাই ইচ্ছে।

ইন্দুলেখা—কবে হবে অভিনয়?

ধীরাজ—আজই। নন্দীসাহেব লিখেছেন, জিতেনবাবুও টেলিফোনে অনেক মিনতি করে বলেছেন ; শোভা যেন একটু আগেভাগে বিকেল থাকতেই চলে আসে। অভিনয়ের পার্ট একটু রিহিয়ার্স করে নেবার দরকার হবে।

ইন্দুলেখা—বেশ তো, শোভা তাহলে আর দেরি না করে এখনই চলে যাক। আমরা ঠিক সন্ধ্যা হলেই যাব...কী বল শোভা, তোমার কী ইচ্ছে?

শোভা—আপনি যা বলবেন।

ইন্দুলেখা—হ্যাঁ, গাড়ি তৈরি হয়েই দাঁড়িয়ে আছে। চারটে বাজতে আর বেশি দেরিও নেই। তোমাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে গাড়িটা ফিরে আসুক। তারপর আমরা দুজন...।

শোভা—আমি কি এইরকম সালোয়ার পায়জামা পরেই...।

ইন্দুলেখা—হ্যাঁ হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে? অভিনয় শেষ হলে তুমি তো আমাদেরই সঙ্গে ফিরে আসবে।

শোভাকে নিয়ে গাড়িটা যখন চলে গেল তখন বিকেল চারটা। আর ফিরে এসে ইন্দুলেখা আর ধীরাজকে নিয়ে গাড়িটা যখন অভিনয়ের হলঘরের সামনে এসে দাঁড়াল, তখন ঠিক ছ'টা। অভিনয় শুরু হলো যখন, তখন ঠিক সাতটা আর নাটকের শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যটা যখন দেখা দিল, তখন রাত দশটা।

কিন্তু এ কী ব্যাপার? এ কেমন শেষ দৃশ্য? নাটকের জয়ার কালো চোখে তো কোন শান্ত-নিবিড় হাসি টলমল করে না। কালো চোখ থেকে যেন বিদ্যুৎ ঠিকরে পড়ছে।

জয়ার স্বামী জয়ন্তকুমার হেসে হেসে চলে যেতেই একেবারে স্তব্ধ হয়ে ঘরের দরজাটার দিকে তাকিয়ে রইল জয়া। তারপর টেবিলের উপর থেকে স্বামীর ফটোটা তুলে নিয়ে ঘরের মেজের উপর একটা আছাড় দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ঝন ঝন করে বেজে উঠলো ভাঙা ফটোর কাঁচ।

আস্তে আস্তে হাঁফাচ্ছে জয়া। এক মিনিট, দু'মিনিট, তিন মিনিট। অদৃশ্য এক আগন্তুকের পায়ের শব্দ শোনা যায়। ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে আসছে সেই শব্দ। ঘরের দরজার পাটের উপর অদৃশ্য আগন্তুকের ছায়াটা একেবারে সুস্থির হয়ে লেগে রইল। জয়া বলে—কে? অদৃশ্য আগন্তুকের ছায়াটা বলে—আমি বিকাশ। তোমার মা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। আমি তোমাকে নিতে এসেছি, জয়া।

চেঁচিয়ে ওঠে জয়া—আপনি? আপনি এসেছেন? আপনি কোথায় ছিলেন এতদিন?

ভেবেছিলেন, জয়া বুঝি মরেই গিয়েছে!

—না, তা ভাবিনি। তুমি চলো।

—চলুন।

নাটক শেষ। মঞ্চে অন্ধকার। ড্রপ সীনের নদীতে নীল জলের ঢেউ কাঁপছে। দেখতে পায় ধীরাজ, শোভার দাদা নির্মল দূরে দাঁড়িয়ে জিতেনবাবুর সঙ্গে কথা বলছে।

ইন্দুলেখা খুব বিরক্ত, আর ধীরাজ বেশ উত্তেজিত। দু'জনের দুই অপ্রসন্ন মূর্তি বেশ ব্যস্ত হয়ে হেঁটে আর এগিয়ে জিতেনবাবু ও নির্মলের কাছে এসে দাঁড়ায়।

ইন্দুলেখা ভ্রূকুটি করেন—এটা আবার কী রকমের তবু দীপ জ্বলে?

নির্মল—শেষ দৃশ্যটা বদলাতে হয়েছে।

ইন্দুলেখা—দৃশ্যটা খুবই খারাপ হয়েছে।

নির্মল—কিন্তু সবাই বলছেন, ভাল হয়েছে।

ধীরাজ—যাচ্ছেতাই হয়েছে, যাকগে, শোভাকে ডেকে দিন, আমরা এখনই বাড়ি চলে যাব।

নির্মল—শোভা বাড়ি চলে গিয়েছে।

চমকে ওঠেন ইন্দুলেখা—বাড়ি চলে গিয়েছে? কোন্ বাড়িতে গিয়েছে?

নির্মল—সোদপুর পঞ্চাননতলার বাড়িতে।

ইন্দুলেখা—কেন? এরকম না বলে-কয়ে শোভার সোদপুরে চলে যাবার কোন কথা তো ছিল না।

নির্মল—চলে যখন গিয়েছে, তখন আর কী করবেন। আপনারা দু'জনে বাড়ি চলে যান।

ইন্দুলেখা—সে কী? এ কী রকমের অদ্ভুত কথা। ধীরাজ একা বাড়ি ফিরবে?

নির্মল—একা ফিরবে কেন? আপনিই তো সঙ্গে আছেন।

ইন্দুলেখা—কিন্তু ব্যারাকপুরের বাড়িতে কবে ফিরে যাবে শোভা?

নির্মল—কোনওদিন না।

ধীরাজ চেঁচিয়ে ওঠে—আমি জানতে চাই, কে ওই বিকাশ?

নির্মল—বিকাশ হলো বিকাশ। নাটকের বিকাশ।

ধীরাজ—কিন্তু আমি জানতে চাই, লোকটা কে?

নির্মল—একদিন জানতেই পারবেন।

দুই চোখ অপলক করে ধীরাজের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন আর হাঁপাতে থাকেন ইন্দুলেখা। যেন গাছতলায় দাঁড়িয়ে একটা নিরেট অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছেন। কুঁচকে গিয়েছে তাঁর নরম ঠোঁট, আর চোখের তারার ভিতরে লুকানো সেই হীরের কুঁচিটা বোধহয় মাটির কুঁচি হয়ে গিয়েছে।

খদ্যোত

পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স হলেও পঁয়ত্রিশের চেয়ে কম বয়সের মানুষ বলে মনে হয় এবং গৌরকান্তি বললে যা বোঝায় তার চেয়ে অনেক বেশি ফরসা গায়ের রং, পুষ্কর রায়চৌধুরীর চেহারাটা সত্যিই সব সময় যেন ধবধব করে। ঠোঁট দুটোও সব সময় যেন দুরন্ত রক্তের আভায় লালচে হয়ে টুকটুক করে। দেখে মনে হয়, একজন খাঁটি বিলিতী সাহেবমানুষ আলখাল্লার মতো প্রকাণ্ড ঢিলে একটা পাঞ্জাবি আর জরি পাড়ের ধুতি পরে রয়েছে।

যার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়, তাকেই প্রথম আলাপে মুগ্ধ করে দিতে পারে পুষ্কর রায়চৌধুরী। বড় সুন্দর করে কথা বলতে পারে পুষ্কর রায়চৌধুরী এবং গলার স্বরেও যেন সুরেলা মধুরতার ধ্বনি রিমঝিম করে। কিন্তু শুধু কথার ভঙ্গী নয়, এবং সুন্দর চেহারার আবেদনও শুধু নয়, যে-সব কথা বলে পুষ্কর রায়চৌধুরী, সে-সব কথাও যেন বিস্ময়ের ইন্দ্রজাল। যে শোনে তারই মনে পুষ্কর রায়চৌধুরীর জন্য একটা শ্রদ্ধাময় সমবেদনার আবেশ নিবিড় হয়ে ওঠে।

এই শহরের শেষ প্রান্তে শেষ ল্যাম্পপোস্টের ছায়া থেকে একটু দূরে, শুধু পাখির কাকলিতে মুখর হয়ে থাকা একটা নিরালাতে যে বাগান-বাড়িটা প্রায় বিশ বছর ধরে ছাড়াবাড়ির মতো সাড়াহীন অস্তিত্ব নিয়ে পড়েছিল, সেই বাগান-বাড়িকে শহরের মানুষ কলকাতার সেই বিখ্যাত বি বি রায়চৌধুরীর একটা সম্পত্তি বলে জানতো। আরও জানতো, বিখ্যাত বি বি রায়চৌধুরীর এই রকমের আরও কত সম্পত্তি দেশের আরও কত শহরের কত নিরালাতে পড়ে আছে। আজকাল যে পুষ্কর রায়চৌধুরী সস্ত্রীক এই বাড়িতে থাকে, সে হলো সেই বিখ্যাত বি বি রায়চৌধুরীর একমাত্র ছেলে।

বিখ্যাত বি বি রায়চৌধুরী আজ আর বেঁচে নেই। এবং শহরের অনেকেই জানে, তাঁর সেই সব সম্পত্তিও আর বেঁচে নেই। সব গিয়েছে। বি বি রায়চৌধুরী মারা যাবার আগেই তিনি তাঁর সেই বিপুল সম্পত্তির অন্তর্ধানের দুঃখ সহ্য করে গিয়েছেন। এবং বোধহয় এই শহরের এই বাগান-বাড়িটাই তাঁর ঐশ্বর্যের বিপুল ধ্বংসের মার থেকে কোনমতে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে। এবং একমাত্র ছেলে পুষ্কর সস্ত্রীক এসে সেই বাড়িতে ঠাঁই নিয়েছে।

একটা যে-সে মানুষের ছেলে নয় পুষ্কর রায়চৌধুরী ; এবং একদিন যে অবস্থা ছিল সে অবস্থার গৌরবও যে-সে ধরনের ছিল না। আজও গল্প করে পুষ্কর রায়চৌধুরী এবং প্রথম আলাপে বিমুগ্ধ শ্রোতা সে গল্প শুনে আরও মুগ্ধ হয়ে যায়। আজই সকালে ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোতে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে আলাপ করে এসেছে পুষ্কর রায়চৌধুরী। তিনদিন হলো দুমকা থেকে বদলি হয়ে এই শহরে এসে সবেমাত্র চার্জ নিয়েছেন যে ম্যাজিস্ট্রেট, বয়সে ভারিক্কি নয়, মেজাজও ভারিক্কি নয়, হাসিখুশি ও স্পোর্টপ্রিয় মানুষ যে মিস্টার দত্তগুপ্ত, তিনিও পুষ্কর রায়চৌধুরীর সঙ্গে প্রথম আলাপের বিস্ময় সহ্য করতে গিয়ে পুষ্কর রায়চৌধুরীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ শ্রদ্ধাবিচলিত দৃষ্টি তুলে তাকিয়েছিলেন।

পুষ্কর বলে—বাবার নিউমোনিয়ার সংবাদ যেদিন কাগজে বের হলো, সেদিন স্টক এক্সচেঞ্জের সেই বিচলিত অবস্থা আজও আমার মনে পড়ে মিস্টার দত্তগুপ্ত। ইণ্ডিয়ান আয়রণ পঁচিশ টাকা পনর আনা থেকে চট করে পঁচিশ টাকা আট আনায় ডিক্লাইন করে গেল। সিলভারেও বেশ প্যানিক দেখা দিয়েছিল। একশো ছেষট্টি টাকা আট আনা থেকে স্টার্ট করে একশো চৌষট্টি টাকা পনর আনাতে ফিনিশ হয়ে গেল।

—আশ্চর্য!

—হ্যাঁ, একটু আশ্চর্যেরই ব্যাপার হয়েছিল মিস্টার দত্তগুপ্ত। কোন স্টেটের প্রেসিডেণ্টের হঠাৎ মৃত্যু হলেও মার্কেটের উপর এ রকম রিয়্যাকশন হয় না, কিন্তু আমার বাবা...।

বলতে বলতে পুষ্কর রায়চৌধুরীর লালচে ঠোঁট দুটো যেন একটা অভিমানের ব্যথায় শিউরে ওঠে। যেন বলতে চায় পুষ্কর রায়চৌধুরী, আমি তো সেই বিপুল প্রভাব ক্ষমতা ঐশ্বর্য আর গৌরবেরই সন্তান। অথচ...।

অথচ, সেই বি বি রায়চৌধুরীর ছেলে পুষ্কর আজ টাকার অভাবে ছোট একটা আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করতে পারছে না।

এই শহরটা কালচারের দিক দিয়ে বড় দরিদ্র। দুটো লাইব্রেরি ছাড়া বলতে গেলে আর কোন আয়োজনই নেই যার সাহায্যে এই শহরের মানুষের মন আর রুচির রিফাইন্‌মেন্ট সম্ভব

হতে পারে। তাই পাঁচ বছর ধরে একটা কাজের পরিকল্পনা যেন পুষ্কর রায়চৌধুরীর জীবনের স্বপ্ন হয়ে রয়েছে। একটা আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা।

দেশের আর বিদেশের বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা বিখ্যাত ছবিগুলির রেপ্লিকা আনাতে হবে। আর চাই, প্যারিস প্লাস্টার দিয়ে তৈরি যত ঐতিহাসিক কীর্তির—তাজমহলের, হুমায়ুনের কবরের, বুদ্ধগয়া, কোনারক আর মাদুরার মন্দিরের মিনিয়েচার। সারনাথের ও মথুরার ধ্যানী বুদ্ধের, আর জৈন গোমতেশ্বরের এক-একটা মডেল মূর্তি। এই সব শিল্পকীর্তির নমুনা দিয়ে গ্যালারি সাজাতে হলে যে টাকা দরকার, সে টাকাটা মোটামুটি যোগাড় হয়েই আছে।

—তা ছাড়া ক্র্যাফটেরও একটা ওয়্যাণ্ডারহাউস হবে এই ইনস্টিটিউট। এর জন্য আমি সারা ভারত তোলপাড় করবো মিস্টার দত্তগুপ্ত। মহীশূরের চন্দনকাঠের কাজ, জয়পুরের মীনা, উড়িষ্যার ফিলিগ্রি, মুর্শিদাবাদের আইভরি। তা ছাড়া বার্মার ল্যাকার, পাঞ্জাবের কামানগিরি, কাশ্মীরের ল্যাটিস ওয়ার্ক। নেপাল আর তিব্বত থেকে কিছু গ্রেটেস্কও আনাবো।

দত্তগুপ্ত বলেন—বড় চমৎকার আপনার পরিকল্পনা। আমি মনে-প্রাণে আপনার সাফল্য কামনা করি।

মুখে যা বলে পুষ্কর রায়চৌধুরী তার চেয়ে অনেক বেশি বৈচিত্র্যের বর্ণনায় ভরে আছে মোটা একটা ফাইল, যেটা এই ধরনের আলাপের সময় পুষ্কর রায়চৌধুরীর হাতেই থাকে। ইনস্টিটিউটের জন্য প্রথমেই একটা ভবন চাই। সেই ভবনের একটা প্ল্যানও ফাইলের ভিতরে আছে। এবং সেই প্ল্যান ফাইলের ভিতর থেকে বের করে নিয়ে নিজেরই চোখের সামনে রেখে গম্ভীর হয়ে যায় পুষ্কর রায়চৌধুরী।

—ওটা কি? প্রশ্ন করেন দত্তগুপ্ত।

পুষ্কর হাসে—আমার দুশ্চিন্তা। আর্ট আর ক্র্যাফ্‌টের নমুনাগুলি যোগাড় করে ফেলতে যে টাকা দরকার হবে, সে টাকা অবশ্য আমিই দেব। কিন্তু...।

—আজ্ঞে! চোখ বড় করে প্রশ্ন করেন দত্তগুপ্ত।

পুষ্কর হাসে—নেই নেই করেও বি বি রায়চৌধুরীর ছেলের এখনও যা আছে, তাতে ওসব বস্তু কেনবার মতো লাখ খানেক টাকা হয়েই যাবে। কিন্তু...

আবার গম্ভীর হয় পুষ্কর।—কিন্তু এই বিল্ডিংটা তৈরীর খরচের জন্য একটু ভাবনায় পড়তে হচ্ছে। বিল্ডিংটা না হওয়া পর্যন্ত অন্য কাজ এগুতেই পারছে না। আশা করি...আপনি আমার এই দুশ্চিন্তার ভার লঘু করতে কিছুটা সাহায্য করবেন।

—আমি কি করতে পারি, বলুন? আমি আমার সাধ্যমত সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি।

—তবে আজই সন্ধ্যায় একবার গরীবের আশ্রমে দয়া করে পদার্পণ করুন না কেন? একটু চা খাবেন এবং আমার কাছ থেকে আরও ডিটেল্‌স্‌ জানবার পর নিজেই বুঝতে পারবেন যে...।

দত্তগুপ্ত—আজ নয়, কাল সন্ধ্যায় অবশ্যই যাব।

২

এই বাড়িটা যেন একটু গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকতে ভালবাসে। বাগানটা প্রায় একটা জঙ্গল হয়ে বাড়িটার গায়ের উপর ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছে। দিনমানে নানারকম ছায়া আর আবছায়ার আড়ালে লুকিয়ে থাকা এই বাড়ির চেহারাটা তবু কিছু কিছু দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু সন্ধ্যা হলে বাড়িটা যেন অন্ধকারের সঙ্গে একেবারে মিশে যায়।

বাড়িটা অন্ধকার ভালবাসে বোধ হয়। তা না হলে সন্ধ্যা হলে এবং বেশ একটু রাত হয়ে গেলেও বাড়ির ভিতরে বা বাইরে আলো জ্বলতে দেখা যায় না কেন?

কিন্তু বাড়িটার ভিতরে ও বাইরে যে ভালরকমের আলোর ব্যবস্থা আছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ, এক মাস দু'মাস বা কয়েক মাস ধরে অন্ধকারের সঙ্গে যেন একটানা মাখামাখি করবার পর হঠাৎ কয়েকটা দিন অন্ধকারের সঙ্গে আড়ি করে দিয়ে আর আলো ছড়িয়ে এই বাড়ির রাতের জীবনটা হেসে ওঠে। বাড়ির জানালা দিয়ে আলো ঠিকরে পড়ে, বাড়ির বারান্দায় আলোর ডুম জ্বলজ্বল করে।

যে সন্ধ্যায় এই বাড়িতে কোন ব্যক্তির চা-এর নিমন্ত্রণ থাকে, শুধু সেই সন্ধ্যায় এবং সন্ধ্যার পর থেকে আরও দু'তিন ঘণ্টা পর্যন্ত বাড়িটা আভাময় হয়ে জংলা বাগানটাকেও হাসিয়ে দেয়।

তা না হলে রোজই অন্ধকার। আকাশে চাঁদ থাকলেও বাড়িটার চেহারা জংলা বাগানের যত গাছের ছায়ার আবরণে আড়াল হয়ে লুকিয়ে থাকতে পারে। দেখে কিছুই বুঝতে পারা যায় না, বাইরের বারান্দার উপর কোন মানুষ বসে আছে কি নেই।

সন্ধ্যার পর বাড়ির ভিতর থেকে বের হয়ে এসে বারান্দার অন্ধকারে দুটি চেয়ারের উপর বসে গল্প করে দুটি মানুষ, স্বামী আর স্ত্রী ; পুষ্কর রায়চৌধুরী এবং নীরজা রায়চৌধুরী। নিবিড় প্রীতির ডোরে বাঁধা দুটি জীবনের তৃপ্তি গল্প করে। টুকরো টুকরো মিষ্টি ঝংকারের মতো মিষ্টি হাসির শব্দ উথলে ওঠে।

যতক্ষণ না বুড়ো খানসামা এসে ডাক দেয়, মেজ লাগায়া হুজুর, ততক্ষণ এইভাবে সংসারের এক টুকরো নিরেট অন্ধকারের নীড়ে একেবারে বুকে-বুকে কাছাকাছি আর লাগালাগি হয়ে বসে থাকে পুষ্কর ও নীরজা।

মাঝে একবার বুড়ো খানসামাকে ডাক দিয়ে জেনে নেয় নীরজা, আজ কি রান্না করছে খানসামা? পুষ্কর যা খেতে ভালবাসে, ঠিক তাই তো? চিকেন গ্রিল আর দেরাদুন চালের ভাত? একমুঠো মনক্কা আর বাদাম ছেঁচে রাখতে বুড়ো খানসামাকে বলা হয়েছিল। ভুলে যায়নি তো খানসামা?

হ্যাঁ. পুষ্করের আর একটা শখের অভ্যাস আছে। যতক্ষণ না বুড়ো খানসামা ডাকতে আসে, ততক্ষণের মধ্যে পাঁচ আউন্স হুইস্কির স্বাদ পেতে চায় পুষ্কর রায়চৌধুরীর সান্ধ্যকালীন তৃষ্ণাটা। নীরজা নিজের হাতে একটা ট্রের উপর হুইস্কি-ঢালা ছোট একটা জার আর ক্রিস্ট্যালের একটা গেলাস সাজিয়ে নিয়ে বারান্দার ছোট টেবিলের উপর রেখে দেয়। মাঝে মাঝে চেয়ার থেকে উঠে, ক্রিস্ট্যালের গেলাসে চুমুক দিয়ে দিয়ে, আর পায়চারি করে ঘুরে ঘুরে নীরজার সঙ্গে গল্প করতে থাকে পুষ্কর রায়চৌধুরী।

জংলা চেহারার বাগানের গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে হাজার হাজার জোনাকি যেন গুচ্ছ ধরে মিটমিট করে জ্বলছে। দেখলে হাসি পায়। গুচ্ছ গুচ্ছ কতগুলি দুর্বল লোভের পোকা মিছিমিছি আলোর ঝলক ছাড়বার চেষ্টা করছে। পুষ্কর রায়চৌধুরী হেসে ফেলে—জান তো নীরজা, বাংলা কবিতায় জোনাকিকে বলে খদ্যোত।

হাসতে হাসতে কেশে ফেলে পুষ্কর রায়চৌধুরী।—খদ্যোত, কি ভয়ানক ভাষা রে বাবা! আমি ঐ খদ্যোত দেখে ঘেন্না করে বাংলা কবিতা পড়াই ছেড়ে দিয়েছি।

কথাটা ঠিকই, বাংলা কবিতা পড়া ছেড়েই দিয়েছে পুষ্কর। কিন্তু কবে ছেড়েছে সেটা নীরজার জানা নেই।

কিন্তু ঘেন্না করে বাংলা কবিতা পড়া ছেড়েই দিয়েছে বলে ভালবেসে ইংরেজী কবিতা পড়ে থাকে পুষ্কর, এটাও সত্যি নয়। শুধু বাংলা কবিতাকে কেন, সারা সংসারের সব আলো-ছায়াকে বোধহয় ঘৃণা করে পুষ্কর রায়চৌধুরী। এই জংলা বাগানের ইউকালিপটাসের ঠিক মাথার উপরের আকাশে যে চাঁদ ভাসতে থাকে, সে চাঁদের দিকেও তাকিয়ে থাকতে পুষ্করের ইচ্ছে করে না, ভালই লাগে না, এবং ঘৃণাই করে বোধহয়। সরকারী চাকরি নিতে ইচ্ছে করে

না, নেয়ওনি পুষ্কর ; কারণ দেশের সরকারকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে পুষ্কর। দেশী ক্যাপিটালিস্টগুলোকে দেখলেই গা ঘিনঘিন করে ; কাজেই কোন দেশী কনসার্নে সার্ভিস নেওয়া সম্ভব নয়। বিদেশী মার্চেন্টগুলিকে ইতর বলে মনে হয়, ওদের কাছে চাকরি করা পুষ্কর রায়চৌধুরীর সম্মানে পোষায় না। এই সবই জানে নীরজা। পুষ্কর রায়চৌধুরী যা বলেছে, মনে-প্রাণে তাই বিশ্বাস করেছে এবং নীরজা নিজের চোখেই দেখেছে, মানুষের ছায়া আর ছোঁয়াও পুষ্করের সহ্য হয় না। তাই ট্রেনে চড়তে ঘৃণা বোধ করে এবং গত পাঁচ বছরের মধ্যে যে এই শহর ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারেনি পুষ্কর, তার একমাত্র কারণ হলো, জানে নীরজা, মানুষের ভিড়ের ছোঁয়াচ বড় ঘেন্না করে পুষ্কর, সহ্য করতেই পারে না।

—এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি? বলতে বলতে হেসে ফেলে পুষ্কর। নীরজার সঙ্গে গল্প করতে করতে কথাগুলি পুষ্করের গলার একটা অদ্ভুত স্বরের বিদ্রূপে মাঝে মাঝে নাকিসুরের ধিক্কারের মতো বেজে ওঠে।

—আমি সত্যিই সবকিছু ঘৃণা করি নীরজা। ভগবান-টগবান সমাজ-টমাজ সব কিছুকে...আমার অদৃষ্টকেও আমি ভয়ানক ঘৃণা করি নীরজা! ভালবাসি শুধু...।

নীরজাকে বুকে জড়িয়ে ধরে নীরজার মুখটাকে চুমোয় চুমোয় ভরে দেয় পুষ্কর।

পুষ্করের কথাগুলিকে হুইস্কির প্রলাপ বলে মনে করে না নীরজা। নীরজা জানে, মানুষটা শুধু একজনকে ভালবেসে এবং শুধু সেই জনেরই ভালবাসার জোরে সারা সংসারের সব আলো-ছায়াকে ঘৃণা করেও খুশি হয়ে আছে। নীরজা পুষ্করকে ভালবাসে, এটাই যেন পুষ্করের জীবনের একমাত্র অহংকার।

এবং নীরজার জীবনটাও যেন একটা জেদ। পৃথিবীর কত গবেট কুৎসিত আর ইতর মানুষ বছরে লক্ষ টাকার সুখ ভোগ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু শুধু পুষ্কর, নীরজার জীবনের পনর বছরের সঙ্গী, শোবার আগে নীরজার কপালটা যার ভালবাসার চুমো না পেলে ঘুমই আসে না নীরজার, সেই মানুষটা টাকার অভাবের জন্য সামান্য চিকেন গ্রিল আর পাঁচ আউন্স হুইস্কির স্বাদ থেকেও মাঝে মাঝে বঞ্চিত হয়। টাকার কথা চিন্তা করতে হয়। নীরজার বুকের ভিতরেও যেন একটা প্রচণ্ড অভিযোগের আগুন ধিকধিক করে জ্বলে। এই পৃথিবী আর এই সংসারের সবকিছুর উপর একটা নির্মম ঘৃণায় কঠোর হয়ে গিয়েছে নীরজারও বুকটা। এত মানুষ সুখে আছে, শুধু কষ্ট পাবে কি তারই স্বামী? নীরজার জীবনের বিরুদ্ধে অদৃষ্টের এই চক্রান্তের আহ্লাদ কি ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া যায় না!

পুষ্কর বলে—আমি কোন ভয়কে ভয় বলেই মনে করি না। কারও পরোয়া করি না, তুমি থাকতে আমার অদৃষ্টের কোন বদমাইশী আমাকে জব্দ করতে পারবে না, এবং...। বলতে বলতে প্রায় চেঁচিয়ে হেসে ফেলে পুষ্কর—এবং আজ পর্যন্ত যে জব্দ করতে পারলেও না, সেটা তোমারই ভালবাসার জন্য।

নীরজার খোঁপার উপর হাত দিয়ে কি যেন খুঁজতে থাকে পুষ্কর। নীরজা বলে—কি করছো?

পুষ্কর হাসে—একটা খদ্যোত!

টোকা মেরে জোনাকিটাকে নীরজার খোঁপা থেকে ফেলে দিয়ে হঠাৎ একটু আশ্চর্য হয়ে ফটকের দিকে তাকায় পুষ্কর।

—কে আসছে? আজ তো কারও আসবার কথা নয়।

ফটকের কাছ থেকে ছায়াটা আস্তে আস্তে হেঁটে বারান্দার কাছে পৌঁছতেই গম্ভীর স্বরে হাঁক দেয় পুষ্কর—কে?

—আমি হেমন্ত।

—হেমন্ত? কোন হেমন্ত?

—পুষ্করদা কথা বলছেন বোধহয়!

—হ্যাঁ, কিন্তু আমি তো তোমাকে ঠিক চিনে উঠতে...।

—আমি আপনার শ্যামলী বউদির ভাই।

—শ্যামলী বউদির ভাই, হেমন্ত...ও ইয়েস, মনে পড়েছে।

পুষ্কর রায়চৌধুরীর জেঠতুতো দাদার স্ত্রী সেই শ্যামলী বউদি যে আজ আর বেঁচে নেই, সেকথা জানে পুষ্কর। এবং মনেও আছে, বিয়ের পর নীরজাকে দার্জিলিং-এর বাড়িতে রেখে দিয়ে কার্সিয়ং-এ শ্যামলী বউদির বাড়িতে যখন গিয়েছিল পুষ্কর, তখন এই হেমন্তরই সঙ্গে সকাল-সন্ধ্যা টেনিস খেলে বেশ ক'টা দিন আনন্দ করা গিয়েছিল। সেই হেমন্ত আজ এতদিন পরে, এখানে, এই সন্ধ্যাতে, কেমন করে আর কিসের জন্য আসে?

হেমন্ত বলে—আমি একটা চাকরি নিয়ে হঠাৎ এখানে এসে পড়েছি পুষ্করদা। আজই জানতে পেরেছি, আজকাল আপনি এখানে এই বাড়িতে থাকেন। তাই ইচ্ছা হলো একবার দেখা করে আসি। তাছাড়া বউদির সঙ্গেও দেখা হবে। ওঁকে তো আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি।

বারান্দার থামের গায়ে হাত রেখে সুইচ টেপে পুষ্কর। দপ্ করে আলো জ্বলে ওঠে। পুষ্করও যেন দপ্ করে হেসে ওঠে। —এই যে তোমার বউদি।

আলোটা আর পুষ্কর রায়চৌধুরীর হাসিটা দপ্ করে জ্বলে উঠেছে, কিন্তু বোধহয় সেজন্য হেমন্তর চোখ দুটো ওভাবে ধাঁধিয়ে যায়নি। পুষ্করদার স্ত্রী নীরজা বউদির রূপ কি অদ্ভুত রূপ! মনে হয়, নীরজা বউদির মুখে ওরকম সুন্দর একটা হাসি শিউরে উঠেছে বলেই আলোটা জ্বলে উঠেছে।

—নমস্কার বউদি! নীরজার দিকে হাত তুলে অভিবাদনের ভঙ্গি করে বারান্দার উপরে উঠে দাঁড়ায় হেমন্ত। নীরজাও মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কারের ভঙ্গি করে—বসুন।

পুষ্কর এবং নীরজা, দুজনের চোখেচোখে একটা পরামর্শের বিনিময়ও হয়ে যায়। দুজনের মনে একই প্রশ্ন। কেমন ধরনের মানুষ হেমন্ত? বাড়ির ভিতরে নিয়ে গিয়ে চা-এর টেবিলের কাছে বসতে অনুরোধ করা উচিত, এমন মানুষ কি?

পুষ্কর—এখানে কিসের কাজে এসেছ হেমন্ত? কেমন চাকরি?

হেমন্ত—আমি সেটেলমেন্টের কাজে এসেছি, সার্ভেয়ারের চাকরি। মাত্র দেড়শো টাকার মাইনেতে স্টার্ট পেয়েছি। বাবা মারা যাবার পর থেকে বাড়ির যা অবস্থা হয়েছে, তাতে এই দেড়শো টাকাই একটা সৌভাগ্য।

পুষ্কর আর নীরজা, দুজনেরই চোখের উজ্জ্বল কৌতূহল যেন হঠাৎ একটা হতাশার আঘাত পেয়ে অপ্রসন্ন হয়ে যায়। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বাগানের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে নীরজা। পুষ্করও হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।—আচ্ছা, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হলো। এখন...তাহলে...।

বলতে বলতে ভিতরের ঘরের দিকে চলে যাবার জন্য এক পা এগিয়ে গিয়ে পুষ্কর বলে—তুমি এখন তাহলে এস হেমন্ত।

হেমন্তর বিহ্বল চাহনিটা যেন হঠাৎ চমকে ওঠে, একটা সুস্বপ্নের শোভা হঠাৎ ছিঁড়ে গেলে যেমন করে চমকে ওঠে ঘুমন্ত চোখ।

চেয়ার ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় হেমন্ত।—হ্যাঁ, হঠাৎ এসে আপনাদের একটু বিরক্ত করে ফেললাম বোধহয়...আচ্ছা, আসি তবে পুষ্করদা?

পুস্কর—এখানে তোমাদের কাজ কতদিন চলবে?

হেমন্ত—বোধহয় মাস কয়েকের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে।

পুষ্কর—কাজটা বোধহয় নিতান্ত মীন ম্যানুয়াল কাজ?

হেমন্ত—কি বললেন?

পুষ্কর—দৌড়দৌড়ির কাজ বোধহয়।

হেমন্ত—তা তো বটেই। প্রায় রোজই গাঁয়ে গাঁয়ে আর মাঠেমাঠে ঘুরতে হয়! আজই তো সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত সেলিমপুরের সব আবাদী জমির জরিপ শেষ করে তবে...।

পুষ্কর—সেলিমপুর?

হেমন্ত—হ্যাঁ।

পুষ্কর—সেলিমপুরের মুর্গীর খুব সুনাম শুনেছি।

হেমন্ত হাসে—কথাটা ঠিকই, দামও বেশ সস্তা।

পুষ্কর—কিন্তু তোমার পক্ষে কি সম্ভব হবে?

হেমন্ত—কি?

পুষ্কর—ডজন দুই মুর্গী একটা ঝাঁকায় ভরে আমার এখানে যদি পাঠিয়ে দিতে পার, তবে...।

হেমন্ত হাসে—খুব পারা যাবে।

চলে গেল হেমন্ত। এবং সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিয়ে হেসে ওঠে পুষ্কর—একটা খদ্যোত।

হেসে ফেলে নীরজা। বুড়ো খানসামা এসে ডাক দেয়—মেজ লাগায়া হুজুর।

৩

যেমন নতুন ম্যাজিস্ট্রেট দত্তগুপ্ত তেমনই আরও অনেকে পুষ্কর রায়চৌধুরীর এই আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবার আগ্রহ নিয়ে এই বাড়িতে এসেছেন। চা খেয়েছেন আর চলে গিয়েছেন। এবং প্রত্যেকেই কিছু না কিছু টাকা সাহায্য করতে বাধ্য হয়েছেন। কেউ পাঁচশত, কেউ এক হাজার, কেউ আরও কিছু বেশি।

যিনি পাঁচ টাকা সাহায্য করবেন বলে মনে করে পুষ্কর রায়চৌধুরীর এই বাড়িতে চা-এর টেবিলে এসে বসেছেন, তিনি শেষ পর্যন্ত পাঁচশত টাকা সাহায্য করেছেন, এমন ব্যাপারও হয়েছে। যিনি একবার চাঁদা দিয়েই মনে করেছিলেন যে, যা দেবার ছিল তা দিয়ে দেওয়া হলো, তিনিও শেষ পর্যন্ত আশ্চর্য হয়েছেন। কারণ তাঁকে আরও তিনবার এসে এই বাড়ির চা-এর টেবিলে বসতে এবং আরও তিনবার চাঁদা দিয়ে চলে যেতে হয়েছে।

দত্তগুপ্তও ভেবেছিলেন যে, শ' তিনেক টাকা দিয়ে তিনি পুষ্কর রায়চৌধুরীর জীবন ও সাধনার প্রতি তাঁর মমতা ও শ্রদ্ধার কর্তব্যটা সেরে দেবেন। কিন্তু পুষ্কর রায়চৌধুরীর এই বাড়ির চা-এর পেয়ালা হাতে তুলে নেবার পর দত্তগুপ্তের ভাবনা যেন এলোমেলো হয়ে গেল।

পুষ্কর রায়চৌধুরী বলে—আপনি তিনশ টাকা দেবেন, ভাল কথা, আমি খুশি হয়ে এই সামান্য টাকাকে আপনার অসামান্য সহৃদয়তার উপহার বলে গ্রহণ করবো। কিন্তু...এ ছাড়া, আপনি যদি শুধু চীফ ইক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মুখার্জিবাবুকে একবার বাংলোতে ডাকিয়ে নিয়ে এসে শুধু একটু বলে দেন যে...।

—কি বলবো? দত্তগুপ্তের গলার স্বর হঠাৎ যেন একটু বিরক্ত হয়ে চমকে ওঠে।

পুষ্কর—মুখার্জিবাবু যেন সরকারী কন্ট্রাক্টর পার্থসারথিবাবুকে একটু বলে দেয় যে...।

—কি?

—পার্থসারথিবাবু যেন অন্তত পাঁচটা হাজার টাকা আমার এই আর্ট ইনস্টিটিউটের জন্য দান করেন। জানেনই তো, পার্থসারথিবাবু হলেন টাকার কুবের।

পুষ্কর রায়চৌধুরীর ইচ্ছা আর উদ্দেশ্যের সব ডিটেল্স্ যেন এইবার স্পষ্ট হয়ে একেবারে

খোলাখুলি ভাষায় কি ভয়ানক গুঞ্জনের মতো বাজতে শুরু করে দিয়েছে! দত্তগুপ্তের চোখের দৃষ্টিটা হঠাৎ ভয় পেয়ে চমকে ওঠে। পুষ্কর রায়চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে দত্তগুপ্ত। তারপরেই দত্তগুপ্তের চোখের চাহনি শক্ত হয়ে ওঠে।

—না। পুষ্কর রায়চৌধুরীর পরামর্শের এই গুঞ্জনকে যেন ঘৃণা করে চেঁচিয়ে ওঠেন দত্তগুপ্ত।

—আপনি ভেবে দেখুন মিস্টার দত্তগুপ্ত। পুষ্কর রায়চৌধুরীর দুই ঠোঁটে একটা লালচে হাসি জ্বলতে থাকে।

—না, ভেবে দেখবার কিছু নেই।

পাশের ঘর থেকে দরজার পরদা সরিয়ে এই ঘরের চা-এর টেবিলের কাছে আস্তে আস্তে হেঁটে এগিয়ে আসে একটি রঙীন মূর্তি ; বিরক্ত দত্তগুপ্তের দিকে দু' হাত তুলে ছোট্ট একটি কোমল অভিবাদনের ভঙ্গী নিবেদন করে হেসে ওঠে পুষ্কর রায়চৌধুরীর স্ত্রী নীরজা।—নমস্কার।

—নমস্কার! পাল্টা অভিবাদন জানাতে গিয়ে দত্তগুপ্তের হাত দুটো যেন আর-এক বিস্ময়ের হঠাৎ-আবেশ সহ্য করতে চেষ্টা করে এবং চোখের শক্ত চাহনিটা টলমল করে ওঠে।

পুষ্কর রায়চৌধুরী বলে—দেখে সুখী হও নীরজা, ইনিই মিস্টার দত্তগুপ্ত, আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কিন্তু ওঁর সামনেই বলে দিতে আমার একটুও বাধবে না, ওঁর মতো রিফাইণ্ড মনের মানুষ আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি। অফিসারদের কথা ছেড়েই দাও, বড় বড় আর্টিস্টদের কথাই ধর, তাঁরাও অনেকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে শেখেননি।

নীরজা হাসে—দেখে সুখী হয়েছি এবং জেনেও সুখী হলাম। আমার সৌভাগ্য।

রূপ তো অনেক নারীরই আছে, কিন্তু পুষ্কর রায়চৌধুরীর স্ত্রী নীরজার মতো এমন মনোহরা রূপ খুব কম দেখতে পাওয়া যায় বললেও কম বলা হয়। এবং পুষ্কর রায়চৌধুরীর স্ত্রী যে এত বড় রূপসী, এই সত্য শহরের খুব কম মানুষেরই চোখে দেখে উপলব্ধি করবার সৌভাগ্য হয়েছে ; কারণ এই বাড়ির বাইরে কখনও বের হয় না নীরজা। পথ দিয়ে যেতে এই বাড়ির বারান্দা ও জানালার কাছে, কিংবা বাগানের গাছের ছায়ার কাছে নীরজাকে দাঁড়িয়ে থাকতে যারা দেখেছে, তারা শুধু দূর হতে দেখা ফুলের স্তবকের মতো একটা শোভাকেও দেখেছে। কেউ কল্পনাও করতে পারবে না, নীরজার চোখের তারাতে কি সুন্দর একটা দ্যুতিময় তীব্রতা চিকচিক করে জ্বলে। নীরজার ঠোঁট দুটো কি অদ্ভুত এক রঙীন হাসির রং-ঝারি। নীরজার বুটিদার জামদানির আঁচলটা যখন কাঁধের কাছ থেকে একটু আলগা হয়ে সরে যায়, তখন নীরজার ঘাড় আর গলার গড়নও যেন একটা ছন্দের বিস্ময়ের মতো উথলে ওঠে। সেই সঙ্গে গলার সোনার হারটাও দুলে ওঠে, আর ঝিক করে হেসে ওঠে হারের লকেটের হীরাটা। লাল পাউডারে মাজা এবং প্রায় অর্ধেক খোলা বুকের রংও যেন শিউরে হেসে ওঠে।

দত্তগুপ্তের হাতের কাপের শূন্যতার দিকে তাকিয়ে নীরজা রায়চৌধুরীর চোখে ছোট্ট একটা মিষ্টি ভ্রূকুটি ফুটে ওঠে—এ কি!

বলতে বলতে দত্তগুপ্তের চেয়ারের কাছে এসে দাঁড়ায় নীরজা।—আর এক কাপ চা নিন মিস্টার দত্তগুপ্ত।

দত্তগুপ্ত বিব্রতভাবে বলেন—না, আর নয়। ডাক্তারের নির্দেশ আছে যে...।

নীরজা রায়চৌধুরীর গলার স্বর হঠাৎ মৃদু হয়ে যায়। টেবিলের উপর হাত রেখে আর মাথা ঝুঁকিয়ে এবং দত্তগুপ্তের একেবারে চোখের কাছে মুখটা এগিয়ে দিয়ে যেন একটা নিবিড় অনুরোধের নিঃশ্বাস ছাড়ে নীরজা। যেন এই পৃথিবীর কেউ শুনতে না পায়, আস্তে আস্তে ফিস ফিস করে কথা বলে নীরজা—আমার অনুরোধ, প্লীজ।

নীরজার খোঁপার সৌরভ, নীরজার পাউডারে মাজা বুকের সৌরভ এবং সেই সঙ্গে নীরজার সেই অদ্ভুত চোখের দ্যুতিময় তীব্রতা যেন সিক্ত হয়ে গিয়ে আবেদন করছে, আর এক কাপ চা খান মিস্টার দত্তগুপ্ত।

দত্তগুপ্ত ব্যস্তভাবে বলেন—বেশ তো, আর এক কাপ চা খাব, তাতে আর...।

পট হাতে তুলে নিয়ে দত্তগুপ্তের পেয়ালায় চা ঢালতে থাকে নীরজা। নীরজার মুখের দিকে তাকিয়ে পুষ্কর বলে—আমার আর্ট ইনস্টিটিউটের জন্য বিল্ডিং তৈরির টাকা তোলবার একটা উপায় হিসাবে আমি মিস্টার দত্তগুপ্তকে একটা চেষ্টা করবার জন্য অনুরোধ করেছি নীরজা, কিন্তু উনি বোধহয় একটু বিরক্ত হয়েছেন।

দত্তগুপ্ত বলেন—না না, সে কি কথা...বিরক্ত হব কেন?

দত্তগুপ্তের মুখের দিকে দু'চোখের চাহনি একেবারে অপলক করে দিয়ে তাকিয়ে থাকে নীরজা। দত্তগুপ্তের চোখের কত কাছে নীরজার মুখটা। নীরজার চোখের তারার মধ্যে দত্তগুপ্তের গলার লাল টাই-এর লাল ছায়াটা কাঁপছে। ফিসফিস করে যেন নিঃশ্বাসের শব্দ দিয়ে দত্তগুপ্তের কানের কাছে কথা বলে নীরজা।—যদি বিরক্ত হয়ে থাকেন, তবে ক্ষমা করবেন। কিন্তু এখানে আসতে ভুলবেন না, আমার অনুরোধ।

দত্তগুপ্ত—আসবো বৈকি, নিশ্চয় আসবো।

সিগারেট ধরিয়ে আর মুখভরা ধোঁয়া ফুরফুর করে ছেড়ে দিয়ে পুষ্কর বলে—আমার প্রস্তাবটা যখন আপনার কাছে এতই কঠিন বোধ হচ্ছে, তখন...।

দত্তগুপ্ত লজ্জিতভাবে বলেন—কঠিন ঠিকই...কিন্তু...যাক্‌গে...এমন কিছু কঠিন নয় যে...।

পুষ্কর—তাহলে মুখার্জিবাবুকে বলে পার্থসারথিবাবুর কাছ থেকে অন্তত হাজার পাঁচেক টাকা আপনি পাইয়ে দেবেন বলে আশা করতে পারি।

দত্তগুপ্ত—হ্যাঁ, আশা করতে পারেন বৈকি।

৪

হেমন্ত তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে। সেলিমপুর থেকে এক ঝাঁকা মুর্গী মুটের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে এবং নিজেও মুটের সঙ্গে এসে এই বাড়ির বারান্দার কাছে দাঁড়িয়েছে। হেসে উঠেছে পুষ্কর, হেসে উঠেছে পুষ্করদার স্ত্রী নীরজা বউদি।

হেমন্ত হাসে।—আপনার জন্যে আরও কতকগুলি অদ্ভুত জিনিস এনেছি বউদি।

—সর্বনাশ। একটা লাজুক অস্বস্তির শিহর সামলাতে গিয়ে রুমাল দিয়ে মুখ ঢাকে নীরজা।

হেমন্ত—অভয়নগরের মেলা দেখতে গিয়েছিলাম। জিনিসগুলি সেখানেই কিনেছি।

জিনিসগুলি হলো, লাল টুসটুসে এক হাজার লিচুর একটা গুচ্ছ, একটা সাঁওতালি চিরুনি, গালার তৈরি একটা ঝাঁপি আর পিতলের একটা পিলসুজ। পিলসুজের গায়ে সামান্য একটু মীনার কাজ আছে, ঘড়টা মন্দিরের মতো।

—বাঃ, চমৎকার জিনিস। মুখ থেকে সিগারেটের ধোঁয়া ফুরফুরিয়ে ছড়িয়ে দিয়ে হেসে ওঠে পুষ্কর।

—আপনি খুশি হলেন তো বউদি? নীরজার মুখের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত রকমের একটা আশাবিহ্বল চাহনি তুলে তাকিয়ে থাকে হেমন্ত। যেন নীরজা বউদি খুশি হলে হেমন্তর বুকের সব নিঃশ্বাস আর ধমনীর সব রক্তকণা খুশি হয়ে যাবে।

নীরজা বলে—যখন এত সব দামী দামী জিনিস এনেছেন, তখন খুশি হতেই হচ্ছে।

হেমন্ত চেঁচিয়ে ওঠে—এমন কিছু দামের জিনিস নয় বৌদি। সবসুদ্ধ ন' টাকা দাম পড়েছে। তা, কি আর এমন দাম? পুষ্করদার বিয়েতে আমি উপস্থিত হতে পারিনি, আপনাকে

সামান্য একটা উপহার দেবার চান্স পাইনি। আজ যখন চান্স পেয়েছি, তখন...।

—ওয়েল ডান হেমন্ত। হেসে হেসে কাশতে থাকে পুষ্কর। তোমার উপহার পেয়ে নীরজা নিশ্চয় ধন্য হয়ে গিয়েছে।

যে কাজের জন্য এসেছিল হেমন্ত সে কাজ শেষ হয়েই গিয়েছে। এবং কথাও ফুরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনই যে চলে যেতে হবে, চলে যাওয়া উচিত, সে কথা যেন ভুলেই গিয়েছে হেমন্ত। নীরজা বউদির চোখের সামনে বসে থাকা একটা মুহূর্তের অনুভব যেন একটা বিপুল তৃপ্তির স্বর্গ। নীরজার মুখের দিকে যে-রকম মুগ্ধতার আবেশ নিয়ে তাকিয়ে থাকে হেমন্ত, তাতে এই ধারণাই করতে হয় যে, ভয়ানক ভুল করেছে খদ্যোতটা। অন্ধকার ছেড়ে প্রচণ্ড একটা আলোর দিকে লুব্ধ হয়ে তাকাতে গিয়ে ঝলসে গিয়েছে চোখ ; তাই বসে থাকতে পারছে না, চলে যেতেও পারছে না, শুধু ছটফট করছে।

—এখন তবে এস হেমন্ত। পুষ্করের কথায় হেমন্তর আত্মাটা যেন হঠাৎ সাবধান হয়ে চমকে ওঠে এবং আর দেরি না করে চলে যায় হেমন্ত।

মুখের উপর রুমাল চাপা দিয়ে হাসতে থাকে নীরজা।

দত্তগুপ্তও তাঁর প্রতিশ্রুতির সম্মান রক্ষা করেছেন। কন্ট্রাক্টর পার্থসারথিবাবু খুশি হয়ে এসে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে গিয়েছেন। কারণ এই সামান্য ত্যাগের বিনিময়ে মিস্টার দত্তগুপ্ত আর মুখার্জিবাবুর কাছ থেকে তিনি যে উপকার পেয়েছেন তার দাম পাঁচ হাজারের দশ গুণেরও বেশি। তিন মাইল রোড আর তিনটে ব্রিজ তৈরির কন্ট্রাক্ট পেয়েছেন পার্থসারথিবাবু।

কিন্তু মিস্টার দত্তগুপ্ত আরও দুবার এই বাড়িতে এসে চা খেয়ে যাবার পর তৃতীয়বার হঠাৎ কেন যেন সাবধান হয়ে গেলেন। হঠাৎ সন্দেহ করেন দত্তগুপ্ত, পুষ্কর রায়চৌধুরীর বাড়ির এই চায়ের টেবিলও যেন একটা ভয়াল ইন্দ্রজাল।

দত্তগুপ্ত—না, আর আমার কাছে টাকার দাবি করবেন না।

পুষ্কর হাসে—ভাল কথা।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন দত্তগুপ্ত। টেবিলে চা-এর পট নেই, এবং নীরজাও আসছে না। দত্তগুপ্ত বলেন—মিসেস রায়চৌধুরী কোথায়?

পুষ্কর হাসে—বলতে পারছি না।

ভয় পেয়ে চমকে ওঠে দত্তগুপ্তের চোখ দুটো। তারপর যেন তাড়া-খাওয়া একটা ভীরু ছায়ার মতো ধড়ফড় করতে করতে ঘর ছেড়ে চলে যান।

পাশের ঘরে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে খিলখিল করে হেসে ওঠে নীরজা রায়চৌধুরী।

মিঃ দত্তগুপ্তের জানতে ও বুঝতে একটু সময় লেগেছিল যে, পুষ্কর রায়চৌধুরীর আর্ট ইনস্টিটিউটও কাগজপত্রে আঁকা আর লেখাজোখা করা একটা ইন্দ্রজাল। ওটা স্বর্গত বি বি রায়চৌধুরীর ছেলের জীবিকা। অনেকের কাছ থেকে অনেক টাকা আদায় করেছে পুষ্কর রায়চৌধুরী, কিন্তু সে টাকা দিয়ে কোন ভবন নির্মাণের জন্য এক ডজন ইটও কেনেনি।

ভয়ানক এক ভুলের লজ্জা থেকে পালিয়ে যাবার জন্য শেষ পর্যন্ত ইচ্ছে করে আর অনেক চেষ্টা করে মুঙ্গেরে বদলি নিয়ে চলে গেলেন দত্তগুপ্ত।

দত্তগুপ্তের মতো আরও অনেকে বুঝতে দেরি করেছে, কিন্তু বুঝে ফেলবার পর তারা আর এই বাড়ির ছায়ার কাছেও আসেনি। লজ্জা পেয়ে কিংবা রাগ করে অথবা হতাশ হয়ে তারা সরে গিয়েছে। সন্ধ্যা আর রাত্রির অন্ধকারে বাড়িটার আশেপাশে গাছের গা ও মাথা ছেয়ে জোনাকির আলো কি ভয়ানক দপ্‌দপ্ করে! বাড়িটাকে একটা অভিসন্ধির দুর্গ বলে মনে হয়। যে একবার ভিতরে ঢুকেছে, সে অন্তত একটা মোটা অঙ্কের চেক উৎসর্গ না করে ফিরে আসতে পারেনি। যে টাকা একবার এই বাড়ির চা-এর টেবিলের কাছে এসেছে সে টাকা আর এখান থেকে ফিরে যেতে পারেনি। কিন্তু কি আশ্চর্য, সেই সব মানী আর ধনীদের

কারও মনে এমন সাহসের সঞ্চার দেখা দিল না যে, একদিন এসে পুষ্কর রায়চৌধুরীকে একটা ঘৃণার ধিক্কার শুনিয়ে দিয়ে চলে যায়।

স্টেভেডর মিস্টার কাঞ্জিলাল কলকাতা থেকে হাওয়া বদল করতে এই শহরে এসে কিছুদিন হলো আছেন। এবং পুষ্কর রায়চৌধুরীর সঙ্গে প্রথম আলাপেই মুগ্ধ হয়ে পুষ্কর রায়চৌধুরীর আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাকে দুশো টাকা দিয়ে সাহায্য করবার জন্য এই বাড়িতে এসে চা খেয়ে গিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে নগদ আরও দু' হাজার টাকা ছিল। সেই দু' হাজার টাকাও চা-এর টেবিলের উপর, অর্থাৎ নীরজা রায়চৌধুরীর সেই সুন্দর চোখের দ্যুতিময় চাহনির সামনে সঁপে দিয়ে তারপর বিদায় নিয়েছেন মিস্টার কাঞ্জিলাল।

—দেখছো নীরজা, মিস্টার কাঞ্জিলালের কাছে ঠিক দু' হাজার টাকা রয়েছে। কি আশ্চর্যের ব্যাপার!

কাঞ্জিলাল আশ্চর্য হয়েছিলেন।—অ্যাঁ, কিসের আশ্চর্য পুষ্করবাবু?

নীরজার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে পুষ্কর।—তুমি ওরকম লজ্জায় মরে গিয়ে একেবারে নীরব হয়ে আছ কেন নীরজা?

চা-এর পট হাতে নিয়ে মিস্টার কাঞ্জিলালের কাপে চা ঢালতে ঢালতে আরও লজ্জিতভাবে লাজুক হাসির মুখটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেয় নীরজা।

পুষ্কর বলে—কাল রাতে নীরজা অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছে মিস্টার কাঞ্জিলাল।

—অ্যাঁ, স্বপ্ন?

—হ্যাঁ, কে যেন একজন নীরজার কানের কাছে বলছে, তোমার একখানা অয়েল আঁকবার জন্য কলকাতার আর্টিস্ট যে দু' হাজার টাকা চেয়েছে, সে টাকা আমি দেবো। তুমি আপত্তি করতে পারবে না। আমি তোমার গত জন্মের বন্ধু।

পুষ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করে হাসতে থাকে নীরজা।—তুমি একটু চুপ কর তো।

মিস্টার কাঞ্জিলাল নীরজার মুখের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করেন—অদ্ভুত, খুব অদ্ভুত স্বপ্ন।

নীরজার চোখ ছলছল করে ওঠে ; নীরজার নিঃশ্বাসের বাষ্প মিস্টার কাঞ্জিলালের কানের উপর ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এবং সেই সঙ্গে নীরজার চাপা-গলার একটা কাতর অনুরোধের স্বরও কাঞ্জিলালের কানের কাছে ফিসফিস করে ওঠে।—আমার একটা স্বপ্নের ওপর আপনি কোন মায়াটায়া দেখাবেন না। আপনি আমার কেউ নন।

—না, তা হয় না। আপনার ধমক-ধামক আমি গ্রাহ্য করবো না মিসেস রায়চৌধুরী। এই দু' হাজার টাকা আমি এখানেই রেখে যাব।

—কাল আবার আসছেন তো? কাঞ্জিলালের মুখের দিকে অপলক চোখের ভেজা-ভেজা চাহনি তুলে ধরে এবং সেই চাহনিকে চোখ বুঁজে নিংড়ে দিয়ে প্রশ্ন করে নীরজা!

কাঞ্জিলাল বলেন—দেখি...আসতে তো ইচ্ছে করছেই...কিন্তু...।

নীরজার গলার স্বর যেন চারদিকের একটা উৎকর্ণ সংসারের ভয়ে ভীরু হয়ে ফিসফিস করে—আসবেন মিস্টার কাঞ্জিলাল। আমি আশায় থাকবো।

বার বার কয়েকবার এসেছিলেন কাঞ্জিলাল। কিন্তু শেষের সেইবার কি যেন সন্দেহ করে, ভ্রূকুটি করে, অর্থাৎ বেশ বিরক্ত হয়ে পুষ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।—না, মিস্টার রায়চৌধুরী, হাজার টাকা পারবো না। বড়জোর একশো টাকা দিতে পারি।

পুষ্কর হাসে—তাই দিন তাহলে।

একশো টাকার চেক পুষ্করের হাতে তুলে দিয়ে কাঞ্জিলাল বলেন—নীরজাদেবীকে এখনও দেখছি না কেন?

পুষ্কর—বেঁচে আছেন, কিন্তু...।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে পুষ্কর বলে—কিন্তু বেশ রাত হয়েছে মিস্টার কাঞ্জিলাল।

কাঞ্জিলালের চোখ দুটো জ্বলে ওঠে, এবং সেই মুহূর্তে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন কাঞ্জিলাল।

পাশের ঘরে মুখের উপর রুমাল চেপে খিলখিল করে হেসে হেসে ছটফট করে নীরজা।

৫

আজ আর কারও এই বাড়িতে চা খেতে আসবার কথা নেই। আজ না, কালও না। এবং দেখতে দেখতে প্রায় একটা মাস পার হয়ে যাবার পরেও এই বাড়িতে চা-এর জন্য লোলুপ হয়ে ছুটে আসবে, এমন কোন উদ্‌ভ্রান্তের সন্ধান পায়নি পুষ্কর রায়চৌধুরী। মিসেস জোন্সের হোটেলে গিয়ে একবার খোঁজ নিয়ে এসেছে পুষ্কর। শুধু জানতে পারা গিয়েছে যে, মল্লিক ব্রাদার্স নামে একটা কোল কোম্পানীর কনিষ্ঠ-ভ্রাতা, একজন পি মল্লিক কিছুদিন পরে আসবেন। একটা মাস থাকবেন এবং শিকারের শখ মিটিয়ে নিয়ে চলে যাবেন।

বুড়ো খানসামা আজকাল রাত্রিবেলায় মেজ লাগিয়ে যখন ডাক দেয়, তখন খাবার টেবিলে গিয়ে শুধু আটার পরোটা আর তরকারি আর সামান্য এক বাটি পায়েস দেখে নীরজার চোখ দুটো ছলছল করে। এ খাবার খেতে পুষ্করের যে একটুও ভাল লাগে না, ভাল করে জানা আছে নীরজার। ছলছল চোখ দুটোও যেন হঠাৎ দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে। অদৃষ্টের এই চক্রান্ত ভেঙে গুঁড়ো করে দেবার জন্য বুকের ভিতরে একটা দুরন্ত জেদ ছটফট করতে থাকে। চেঁচিয়ে ওঠে নীরজা—পি মল্লিকের খবর কি?

পুষ্কর—এখনও কোন খবর নেই। খুব সম্ভব আরও এক মাস পরে আসবে।

একটা মাসের এক একটা দিন যেন আস্তে আস্তে গড়িয়ে গড়িয়ে পার হতে থাকে। এরই মধ্যে মাঝে মাঝে যে আসে, আর চলে যায়, সে হলো হেমন্ত।

দু' আউন্স হুইস্কি শেষ হয়ে যাবার পর পুষ্করও একদিন বারান্দার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—খদ্যোতটা, যেটাকে দিয়ে কোন কাজই হবে না, সেটা কিন্তু ঠিক নিয়ম করে নিয়ে মাঝে মাঝে আসছে।

ডেভিলের কথা মনে পড়তেই ডেভিল এসে হাজির হয়। কী অদ্ভুত সত্য কথা! ফটকের দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে পুষ্কর—সত্যিই যে খদ্যোতটা আসছে নীরজা।

বারান্দার আলো জ্বলে ওঠে আর হেমন্ত এসে বারান্দার উপরে উঠেই হাসতে থাকে—বউদির জন্য একটা নতুন জিনিস এনেছি।

নতুন জিনিসই বটে। এক সের চিনির পাখি, অর্থাৎ গোলাপী রং-এর কতগুলি নিরেট মিষ্টি শরীরের চিল হাঁস আর কবুতর।

হেমন্ত বলে—হীরাগঞ্জে গিয়েছিলাম, সেখানে একটা দোকানে এগুলিকে দেখতে পেয়েই ইচ্ছে হলো, বউদির জন্য কিনে নিয়ে যাই।

পুষ্কর—কিন্তু তোমার হাতে এত বড় একটা ব্যাগ কেন হেমন্ত?

হেমন্ত—হীরাগঞ্জে এখন ক্যাম্প পড়েছে কিনা ; স্টাফের প্রায় সকলেই সেখানে আছে। কাল হলো মাইনের তারিখ। ট্রেজারি থেকে টাকাটা নিয়ে যাবার জন্য সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আমাকে পাঠিয়েছিলেন।

পুষ্কর—কত টাকা?

হেমন্ত—হাজার দুই হবে।

পুষ্কর—তুমি বেশ ক্লান্ত হয়েছ বলে মনে হচ্ছে হেমন্ত।

হেমন্ত—আমাদের মতো মানুষের আবার ক্লান্তি কিসের পুষ্করদা? এসব খাটুনি গ্রাহ্যই করি

না।

পুষ্কর—হেমন্তকে আজ চা না খেয়ে চলে যেতে দেবে না নীরজা।

নীরজা ডাকে—আসুন।

এবং তারপর আর কতক্ষণই বা সময় লাগে? সেই চা-এর টেবিল এবং পুষ্কর রায়চৌধুরীর চোখে সেই উজ্জ্বলতা, এবং নীরজা রায়চৌধুরীর চোখের তারায় সেই দ্যুতিময় তীব্রতা। চা-এর পট হাতে তুলে নিয়ে হেমন্তর পেয়ালায় চা ঢালতে থাকে নীরজা।

পুষ্কর বলে—তোমার নীরজা বউদি তোমাকে কি-যেন বলতে চায় হেমন্ত, কিন্তু লজ্জার জন্য বলতে পারছে না।

--বলুন বউদি।

নীরজা বউদির মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে হেমন্তর চোখ দুটো অপলক হয়ে যায়। যেন নীরজা বউদির মুখের একটা কথা শোনবার জন্য হেমন্তর অদৃষ্টটা পিপাসিতের মতো এতদিন ধরে নিদারুণ প্রতীক্ষার দুঃখ সহ্য করছিল।

পুষ্কর বলে—হাজার দুই টাকা নীরজার বড় দরকার ছিল। আজ ব্যাঙ্ক বন্ধ ছিল, কালও বন্ধ থাকবে, কাজেই টাকা তুলতে পরশু হয়ে যাবে। অথচ কাল সকালেই টাকাটা নীরজার ভয়ানক দরকার। না পেলে নীরজার ভয়ানক অপমানের ব্যাপার হবে।

—বউদির অপমান? হেমন্তর চোখ দুটো কুঁচকে যায়, যেন হেমন্তর বুকের হাড়ে একটা চোট লেগেছে।

পুষ্কর—হ্যাঁ হেমন্ত, নীরজার এক গরীব বান্ধবী তার মেয়ের বিয়ের খরচের জন্য নীরজার কাছে সাহায্য চেয়েছে। নীরজাও দু' হাজার টাকা দেবে বলে কথা দিয়েছে। কাল সকালেই টাকা নিতে আসবে নীরজার বান্ধবী।

হেমন্ত—আপনি যদি এখনই একটা চেক লিখে আমাকে দেন পুষ্করদা, তবে আমি এই রাতেই একটা চেষ্টা করে দেখতে পারি।

পুষ্কর—কি চেষ্টা করবে?

হেমন্ত—আগরওয়ালার গদিতে গিয়ে চেকটা ক্যাশ করে আনতে পারি। আগরওয়ালা আমাকে বেশ একটু খাতির করে।

পুষ্কর—তা হয় না হেমন্ত। সেটা আমার অপমান। পুষ্কর রায়চৌধুরীর টেবিলের দেরাজে নগদ দু' হাজার টাকা থাকে না, একথা বাইরের মানুষকে জানানোর অর্থ পুষ্কর রায়চৌধুরীর প্রেস্টিজ নষ্ট করা।

হেমন্ত উদ্বিগ্ন হয়—তাহলে কি উপায় হবে?

পুষ্কর—তুমি যদি একটু সাহস কর, তবেই উপায় হতে পারে।

হেমন্ত—আমি? আমি কি সাহস করতে পারি বলুন?

পুষ্কর—তুমি তোমার এই টাকা নীরজাকে দুদিনের জন্য লোন দাও।

হেমন্ত—সর্বনাশ। এ যে পরের টাকা, স্টাফের পেমেন্টের টাকা! এ টাকা আমি কেমন করে দিই, বলুন?

পুষ্কর—আমি আর কিছু বলতে চাই না হেমন্ত। যাকগে..হেমন্তকে আর এক কাপ চা দাও নীরজা। হেমন্তর কাপে চা ঢালে নীরজা। কিন্তু চা-এর কাপের দিকে নয়, হেমন্তর মুখের দিকে তাকিয়ে নীরজার সুন্দর চোখের বড় বড় পাতাগুলি কাঁপতে থাকে।

নীরজা বউদি কি দুঃখিত হলেন? অপরাধীর মতো ক্ষমাভিক্ষু চাহনি তুলে ছটফট করে ওঠে হেমন্ত—আমি বড় দুঃখিত বউদি, বিশ্বাস করুন, সম্ভব হলে আমি নিশ্চয়ই আপনাকে এই টাকাটা দিয়ে যেতে পারতাম।

নীরজার নিঃশ্বাস যেন সিরসির শব্দ করে কেঁপে কেঁপে বুকের উপর পড়ে থাকা

লকেটের হীরাটাকে কাঁপাতে থাকে।—সম্ভব নয় যখন, তখন দেবেন না।

হেমন্ত—কিন্তু আপনাকে যে কাল বড় অপ্রস্তুত হতে হবে।

নীরজা—হবে বৈকি, কিন্তু সেজন্য আপনি ভাবেন কেন?

হেমন্ত—সত্যি, না ভেবে থাকতে পারছি না বউদি।

নীরজা—আমি আপনার এমন কোন আপন-জন নই যে, আমার মান-অপমানের জন্য আপনার এত ভাবনা করবার দরকার হতে পারে।

হেমন্ত—এত শক্ত কথা বলবেন না বউদি। আপনাকে নিতান্ত আপন-জন বলে মনে করি বলেই...।

নীরজার গলার স্বর হঠাৎ মৃদু হয়ে ফিসফিস করে—বিশ্বাস করি না!

হেমন্তর নিঃশ্বাস যেন দুঃসহ একটা বেদনা সহ্য করতে গিয়ে মৃদু হয়ে এবং বিপুল অনুনয়ের বেদনায় ফিসফিস করে।—বিশ্বাস করুন বউদি।

—তবে? প্রশ্ন করে নীরজা। নীরজার চোখের তারার সেই ভয়ানক সুন্দর দ্যুতিময় তীব্রতা ঝিকঝিক করে জ্বলতে থাকে।

হেমন্ত যেন আনমনার মতো বিড় বিড় করতে থাকে—ওরা চোর বলে সন্দেহ করবে, সাসপেণ্ড করবে, চাকরিটাও যাবে, জেলও হয়ে যেতে পারে...।

কিন্তু নীরজা বউদির খোঁপার সৌরভ যেন হেমন্তর করুণ হৃৎপিণ্ডটার চারদিক ঘিরে ছুটোছুটি করছে। চেঁচিয়ে ওঠে হেমন্ত—ঠিক আছে, ঠিক আছে। টাকাটা আপনি নিন বউদি।

—দাও, আমার কাছেই দাও। হাত বাড়িয়ে দিয়ে টাকার ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়ে টেবিলের এক-পাশে হাতের কাছেই রেখে দেয় পুষ্কর।

নীরজার কপালের উপর ছোট ছোট ঘামের ফোঁটা চিক চিক করে হাসছে। রুমাল দিয়ে মুখের হাসি চাপা দিয়ে ভিতরের ঘরের দিকে চলে যায় নীরজা।

হেমন্ত বলে—আজ তবে আসি পুষ্করদা।

পুষ্কর—এস।

চলে যায় হেমন্ত ; এবং তখনি শুনতে পায় পুষ্কর, ভিতরের ঘরে রুমাল-চাপা একটা সুন্দর মুখের অদ্ভুত এক উল্লাসের চাপা-চাপা হাসির শব্দ যেন নেচে নেচে বাজছে। আস্তে আস্তে উঠে ভিতরের ঘরের ভিতর ঢুকে হেসে ওঠে পুষ্কর।—খদ্যোতটা শেষ পর্যন্ত একটা কাজ দিল তবে নীরজা।...একি? তুমি কি করছো নীরজা?

নীরজার মুখের দিকে তাকিয়ে বুকফাটা একটা বিস্ময়ের আর্তনাদ ছেড়ে তারপরেই একেবারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পুষ্কর। শুনতে বড় ভুল করেছে পুষ্কর। নীরজা রায়চৌধুরী আজ আর রুমাল দিয়ে মুখের হাসি চাপছে না। চাপছে একটা ফোঁপানো কান্নার স্বর।

—খদ্যোতটার জন্য? চেঁচিয়ে ওঠে পুষ্কর।

কথা বলে না নীরজা, মুখ তুলে তাকায়ও না।

—তুমি বড় বেশি হাঁপাচ্ছ, বড় বিশ্রী কান্না কাঁদছো নীরজা! দাঁতের উপর দাঁত চেপে কথা বলে পুষ্কর।

কিন্তু কোন উত্তর দেয় না নীরজা।

—মনে হচ্ছে খদ্যোতটা যেন তোমারই সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

উত্তর দেয় না নীরজা।

—ছিঃ, ট্রেচারি দাই নেম ইজ উওম্যান! আবার দাঁতে দাঁতে শব্দ করে যেন একটা ধিক্কারের জ্বালা আছড়ে দিয়েই নীরব হয়ে যায় পুষ্কর ; চোখের চাহনিও ফ্যালফ্যাল করতে থাকে। পুষ্কর রায়চৌধুরীর অদৃষ্টের সব গর্ব অসহায় হয়ে গিয়েছে।

পুষ্কর রায়চৌধুরীর জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা, একমাত্র অহংকার, একমাত্র শান্তি হঠাৎ

যেন একটা অভিশাপে বিষাক্ত হয়ে সর্বময় শাস্তির জ্বালা হয়ে উঠছে। ছটফট করে চেঁচিয়ে ওঠে পুষ্কর—তুমি বোধ হয় আর হাসতে পারবে না নীরজা?

উত্তর দেয় না নীরজা। রুমাল দিয়ে চোখ ঢাকে আর নিথর হয়ে বসে থাকে।

পুষ্কর—কিন্তু তুমি না হাসলে আমি বাঁচবো কি করে?

তবু উত্তর দেয় না নীরজা।

পুষ্কর—তা হলে এখনই টাউনে গিয়ে হেমন্তর খোঁজ করে ওকে ওর টাকাটা দিয়ে আসি, কেমন?

চোখের উপর চাপা রুমালটা সরিয়ে দিয়ে হেসে ওঠে নীরজা—এস।

হিরো এবং ভিলেন

এই স্টুডিও হলো দি ফিল্মস লিমিটেডের স্টুডিও। মস্ত বড় বাগান আছে। বড় বড় শেড আছে। ল্যাবরেটরি আছে। অফিসঘর আছে। যা যা থাকা দরকার সবই আছে। সাজঘরও আছে।

আর, স্টুডিওর মধ্যে সবচেয়ে বেশি হাসাহাসি গল্প ও আড্ডার ঘর হলো এই সাজঘর। আর্টিস্টদের কাজ শেষ হয়ে যাবার পরেও, মেক-আপ নামিয়ে ফেলে আবার যথাপূর্ব অকপট চেহারাটি ফিরে পাওয়ার পরেও চা-এর কাপ হাতে নিয়ে এই সাজঘরের ভিতরেই কিছুক্ষণ গল্প না করে কেউ চলে যায় না।

দি ফিল্মস লিমিটেডের যিনি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, তিনি হলেন ছোটবাবু। কোম্পানীর বার-আনা মালিক বলতে যাঁকে বোঝায়, সেই অনাথবন্ধুবাবুর ছেলে বলেই বোধহয় ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে ছোটবাবু বলা হয়। যাই হোক, ছোটবাবুও মাঝে মাঝে এদিকে আসেন, সাজঘরে আড্ডার মাঝখানে এসে দাঁড়ান এবং এই হাসাহাসির কিছুটা শেয়ার নিজেও উপভোগ করে চলে যান।

মাইনে-করা আর্টিস্ট সুরমাও এই তিন-মাসের মধ্যেই বুঝে ফেলেছে, এই সাজঘর কেন এত হাসাহাসির ঘর। যেদিন কাজ থাকে না, কিংবা ফ্লোরে যাবার তাড়া থাকে না, সেদিনও এই সাজঘরের ভিতরে একটা ঘণ্টা গল্প করে পার করে দেওয়াও একটা কাজের মতো কাজ মনে হয়। প্রদোষবাবু, কেদারবাবুর মতো পুরোনো আর্টিস্টও থাকেন। বিরজা, কাজললতা আর প্রভাও থাকে। কত রকমের গল্প হয়। চীন থেকে শুরু করে চীনেবাদাম পর্যন্ত, সব বিষয়েই তর্ক মন্তব্য আর গল্প চলে। কিন্তু সব গল্পই শেষ পর্যন্ত একটা হাসির হর্‌রা জাগিয়ে দিয়ে তবে শেষ হয়।

সাজঘরের মনটাকে এত হাসিয়ে মজিয়ে রাখেন যিনি, তিনি হলেন সাজঘরের প্রতুলদা। কখনও তুলি, কখনও পরচুলা আর কখনও বা পাফ হাতে নিয়ে সকলেরই সব গল্পের ওপর একটা না একটা মন্তব্য না ছেড়ে দিয়ে থাকতে পারেন না প্রতুলদা। সব সময় হাসিখুশি, কিন্তু সব সময় মুখর নন প্রতুলদা। এক এক সময় বেশ গম্ভীর হয়ে গল্প শোনেন এবং বেশ সাবধানে আর্টিস্টদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। মনে হয়, মুখের ভাব দেখেই অনেককিছু বুঝে ফেলছেন প্রতুলদা।

প্রতুলদা নিজেও গর্ব করে বলেন—আরে, আমি যে ভগবানের কর্ম করি।

—তার মানে?

--তার মানে প্রত্যেক দিন ডজন ডজন বীর মহাবীর সাধু ফকির বাদশাহ ডাকাত নিজের হাতে তৈরী করছি। আপনারাই তো বলেন, আমি হলাম মেক-আপ-ম্যান।

মেয়ে আর্টিস্টদের সঙ্গে মাঝে মাঝে বেশ মুখ খুলেই ঠাট্টা করেন প্রতুলদা--সধবা বিধবা করাও তো আমার হাত। কাল যাকে বিধবা করে দিই, আজ তাকে সধবা করি—একি যে-সে কাজ!

প্রতুলদার বয়স ত্রিশের বেশি হবে না। যারা বয়সে ছোট, শুধু তারা নয়, যাঁরা বয়সে বড় তাঁরাও সাঝঘরের প্রতুলকে প্রতুলদা বলে ডাকেন। মানুষটার সরল স্বভাবের জন্যই বোধহয়, সকলে প্রতুলদাকে একটু প্রীতির চোখে দেখে, এবং সেই প্রীতির মধ্যে একটু শ্রদ্ধাও যেন থাকে।

মাঝে মাঝে নিজেও একটা প্রচণ্ড হাসির কাণ্ড বাধিয়ে তোলেন প্রতুলদা। আর্টিস্টরা সাজঘরে ঢুকেই দেখতে পায় প্রতুলদা নেই। একজন কাবুলিওয়ালা মারমূর্তি হয়ে বসে গজগজ করছে।

—এ কি? কিসকো খোঁজতা হ্যায়? একটু রুষ্টভাবে প্রশ্ন করে আগন্তুক আর্টিস্ট। সেই মুহূর্তে মাথার চুল আর দাড়ি খুলে ফেলে হেসে ফেলেন প্রতুলদা।

এই রকম আরও অনেকবার, রূপসজ্জার অনেক কেরামতি দেখিয়ে সাজঘরের ভিড়কে হাসিয়েছেন প্রতুলদা। নিখুঁত মেক-আপ নিতেও পারেন প্রতুলদা। প্রতুলদা নিজেই বলেন, একদিন একটা মিনিস্টারের মেক-আপ নিয়ে বড়বাজারে গিয়ে...থাক্, বাকিটা আর নাই বা বললাম।

—বলতেই হবে। চেঁচিয়ে ওঠে সকলে।

—কিছু না, কিছু না। শুধু ইচ্ছে করে, ধারে কিছু মাল নিয়ে চলে আসি।

আর্টিস্টদের সঙ্গে মাঝে মাঝে ঘরোয়া সুখ-দুঃখের আলোচনা করেন প্রতুলদা। আর্টিস্টরা অনেক অভিযোগের কথা এই সাজঘরে বসে এই প্রতুলদার কাছে এমন ভাষায় বলে ফেলে, যেটা ছোটবাবুর অফিস ঘরের কানে পৌঁছলে আর্টিস্টের চাকরি আর থাকবে না। প্রতুলদাও অনেক সময় অনেকের কানের কাছে ফিসফিস করে এমন কথা বলে ফেলেন, যেটা তাঁর জানবার কথা নয়। কিন্তু, কি আশ্চর্য, প্রতুলদার চোখ আর কান যেন এই সাজঘরের বাইরেও ঘুরে বেড়ায়। সব খবর রাখেন প্রতুলদা। তা না হলে পরেশবাবুকে একদিন প্রশ্ন করে চমকে দিলেন কেমন করে—সত্যিই কি বিয়ে করছেন?

—অ্যাঁ? কোথায় শুনলেন?

—শুনবো কেন, বুঝতেই পারছি।

—কি বুঝেছেন?

—প্রভার সঙ্গে আপনার বিয়ে।

—হ্যাঁ। কিন্তু...কি আশ্চর্য...আপনি প্রতুলদা কি করে...।

কোন উত্তর না দিয়ে নিজের কৃতিত্বের গর্বে উৎফুল্ল হয়ে হাসতে থাকেন প্রতুলদা।

প্রতুলদা নামে এই মানুষটাকে এই তিন মাসের মধ্যে সুরমারও বেশ ভাল লেগে গিয়েছে। সুরমার সঙ্গেও মাঝে মাঝে ঘরোয়া কথা বলেন প্রতুলদা।—শুনে খুবই ভাল লাগলো, আপনার মাইনে বেড়েছে। মাত্র তিনমাস চাকরি করবার পর মাইনে বেড়েছে, এই প্রথম দেখলাম। তা আপনার মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া উচিতও ছিল। মাত্র একশো টাকা মাইনে...অথচ আপনার খাটুনি হলো তিনটে শকুন্তলার খাটুনির চেয়েও বেশি।

সুরমাও মাঝে মাঝে বেশ হেসে হেসে আর পাঁচজনের মতো বায়না ধরে।—অনেক দিন হলো আপনার কোন নতুন মেক-আপ দেখছি না কেন প্রতুলদা?

—কিসের মেক-আপ দেখতে চান?

প্রদোষবাবু মুখ টিপে হাসেন—খাঁটি হিরোর মেক-আপ।

—তার মানে?

—খাঁটি প্রেমিকের মেক-আপ।

—আচ্ছা, একটু অপেক্ষা করুন।

পাশের ছোট ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢোকেন প্রতুলদা। আর মাত্র পনর মিনিট পরেই বের হয়ে আসেন।

প্রথমে একসঙ্গে চমকে ওঠে সকলেই। তার পরে সকলেই একসঙ্গে চেঁচিয়ে হাসতে থাকে। শুধু মাথা হেঁট করে মুখ লুকোতে চেষ্টা করে সুরমা।

ল্যাবরেটরির নীরেনের চেহারার মেক-আপ নিয়েছেন প্রতুলদা। ঠিক সেই ধরনের ব্যাক-ব্রাশ চুল। সেই ধরনের নীল রং-এর ট্রাউজার। ট্রাউজারের পকেটের ভিতরে একটা লাল রুমাল উঁকি দিয়ে রয়েছে। নীরেনের হাসিটারও অবিকল-নকল করেছেন প্রতুলদা। ঠিক, সেই, সেইরকম হাসির সঙ্গে সেইরকম ভঙ্গী করে ঠোঁট কামড়াচ্ছেন। আর চশমাটাকে হাতে নিয়ে চরকির মতো দোলাচ্ছেন। নীরেনের নাক মুখ আর চোখের ধাঁচটাও কি চমৎকার ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন প্রতুলদা।

সুরমা মাথা হেঁট করে আছে কেন? আর বুঝে ফেলতে কারও অসুবিধা নেই। একটু আশ্চর্য হলেও সকলেই খুশি হয়। বেশ তো, ভালই তো, ল্যাবরেটরির নীরেন খুবই ভাল ছেলে। সুরমার জীবনের কাছে নীরেন যদি খাঁটি হিরো হয়ে এসে গিয়ে থাকে, তবে দোষের কি আছে? বরং বিয়েটা তাড়াতাড়ি হয়ে গেলেই ভাল।

—তাহলে আমাদের কপালে একটা নেমন্তন্নের সুযোগ পাকলো! কি বলো সুরমা?

কথাটা বলেই হেসে ওঠেন কেদারবাবু। সঙ্গে সঙ্গে সকলে হেসে ওঠে। সুরমার মাথাটা আরও লজ্জা পেয়ে হেঁট হয়ে যায়।

সাজঘরের আড্ডা সেদিনের মতো সমাপ্ত হয়। যাবার আগে প্রতুলদার দিকে রাগ করে তাকাতে গিয়ে হেসে ফেলে সুরমা।

রাগ করবার যে কিছুই নেই। তাই না হেসে থাকতে পারবে কেন সুরমা? নীরেনের সঙ্গে সুরমার ভালবাসার আনন্দটাকেই ধরা পড়িয়ে দিয়েছেন প্রতুলদা। কিন্তু ধন্যি প্রতুলদার চোখ! কেমন করে বুঝতে পারেন প্রতুলদা? সত্যিই কি প্রতুলদার কান আর চোখ বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়?

প্রতুলদাও কৃতার্থভাবে হেসে ফেলেন—আমার আপরাধ নেবেন না। মোট কথা, ব্যাপার দেখে খুবই খুশি হয়েছি বলে একটু আনন্দ করে নিলাম।

কিন্তু আরও তিন মাস পার হয়ে গেলেও সুরমার বিয়ের নেমন্তন্ন খাবার সুযোগ যখন কারও হলো না, তখন কেউ কেউ একটু আশ্চর্য হলেও সুরমাকে কোন প্রশ্ন করেনি। একদিন কিন্তু একটু আশ্চর্য হতে হলো, যেদিন শোনা গেল যে, ল্যাবরেটারির নীরেনের চাকরি গিয়েছে।

নীরেনের চাকরি যাবার খবরটা শুনে তেমন কিছু আশ্চর্য হয়নি কেউ। ছোটবাবুর রাজত্বে এরকম হঠাৎ বরখাস্তের ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। কিন্তু নীরেনের মতো একজন অতি দক্ষ কাজের মানুষকে হঠাৎ সরিয়ে দেবার কি কারণ থাকতে পারে? শোনা গেল, ছোটবাবু নীরেনের ওপর খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন। কিন্তু কেন? অসন্তুষ্ট হবার কোন একটা কারণই যে খুঁজে পাওয়া যায় না।

সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য করে দিল সুরমা। সাজঘরের আড্ডার সব মানুষ যে ঘটনার কথা

শুনে একটু বিমর্ষ হয়ে পড়েছে, সে ঘটনার কথা শুনে যে সুরমারই সবচেয়ে বেশি বিমর্ষ হবার কথা! কিন্তু সুরমা একটুও বিমর্ষ হয়নি। আজ এক সপ্তাহ হলো এই স্টুডিওতে আর আসেনি নীরেন। কিন্তু নীরেন কি আরও ভাল মাইনের চাকরি এরই মধ্যে কোথাও জুটিয়ে নিয়েছে?

না, পরেশবাবুর সঙ্গে নীরেনের আজই ট্রামে একবার দেখা হয়েছে। নীরেন বলেছে, চাকরির চেষ্টায় বোম্বাই চলে যাবো কিনা ভাবছি।

কিন্তু সুরমার মুখে খুশির উচ্ছ্বাস একটুও কাতর হয়ে উঠতে দেখা যায় না। বরং দেখা যায় যে, সুরমার চোখ দুটো যেন একটা নিবিড় অনুভবের আবেশে আরও খুশি হয়ে হাসছে। সুরমার হাসিতে নতুন রকমের ঝংকার। সুরমার কথাবার্তায় নতুন রকমের ব্যস্ততা। সুরমার চোখে নতুন অহংকারের চাহনি। সুরমার মুখে একটা নতুন বিশ্বাসের তৃপ্তি।

প্রতুলদার চোখের দিকে তাকালে সুরমার মনের ভিতরে যেন একটা নীরব ঠাট্টা হেসে ওঠে। কিচ্ছু না, প্রতুলদার চোখের সবজান্তা অহংকারটা কিচ্ছু না। সুরমার জীবনের এই নতুন উল্লাস আর বিশ্বাসের রহস্য ধরে ফেলবার সাধ্যি প্রতুলদার নেই।

প্রতুলদা মাঝে মাঝে খুব গম্ভীর হয়ে সুরমার মুখের দিকে তাকান। এই মাত্র। বুঝতে পারে সুরমা, প্রতুলদা আজও কিছু বুঝে উঠতে পারেননি বলেই এভাবে তাকাচ্ছেন। যদি সত্যিই বুঝে ফেলতে পারতেন, কার সঙ্গে বিয়ে হবে সুরমার, তবে সুরমার সৌভাগ্যের নামে জয়ধ্বনি করে হেসে উঠতেন। প্রতুলদাও নিশ্চয় নিমন্ত্রণ পাবেন। সেদিন চমকে উঠবেন, আর আশ্চর্য হয়ে যাবেন প্রতুলদা। তার আগে নয়। কিন্তু সেদিন আর ঠাট্টা করে সুরমাকে আর এই সাজঘরকে হাসিয়ে দেবার সুযোগ পাবেন না। কারণ সেদিন এই স্টুডিওর চাকরির জীবনের সীমা থেকে অনেক দূরে আর অনেক উপরে চলে যাবে সুরমার অদৃষ্ট।

আরও তিন মাস পার হয়ে গেল। কিন্তু সাজঘরের আড্ডার চোখেও একটা খটকা লাগে। সাজঘরের এত হাসাহাসির মধ্যে শুধু নীরব হয়ে বসে থাকে সুরমা। সুরমার মনের ভিতরে সেই নতুন উল্লাসের মুখর প্রাণটাই যেন মরে গিয়েছে।

ছোটবাবুর বিয়ের ব্যবস্থা সব ঠিক, এত বড় খবরটা পেয়ে সাজঘরের আড্ডা যেদিন কলরব করে ওঠে, সেদিনও চুপ করে যেন একটা মূক ও বধির মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে সুরমা। চোখ দুটো শুধু দপদপ করে জ্বলে, যেন প্রচণ্ড নির্মম একটা বিদ্রূপের দিকে তাকিয়ে অভিশাপ বর্ষণ করতে চাইছে সুরমার চোখ।

কিন্তু সাজঘরের আড্ডার মুখরতা হেসে হেসে বাজতেই থাকে। সেই সঙ্গে কত রকমের মন্তব্য! মনে হচ্ছে, এইবার একমাসের বোনাস ঘোষণা করবেন ছোটবাবু! জানেন তো খবর, ছোটবাবুর সঙ্গে কার বিয়ে হবে? জানি মশাই, ঐ তো সেই মহিলা, যার সঙ্গে আজ তিন বছর ধরে ছোটবাবুর একটা ইয়ে...অর্থাৎ বেশ অন্তরঙ্গতা চলছিল! তা জানি না মশাই, তবে এটুকু জানি যে, খুব বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে ছোটবাবুর বিয়ে হচ্ছে।...হ্যাঁ হ্যাঁ, নারায়ণ কটন মিলের মালিক পি চক্রবর্তীর মেয়ে।

প্রদোষবাবু হঠাৎ চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন—প্রতুলদা!

—বলুন স্যার!

—একটু মেক-আপের খেলা দেখান প্রতুলদা।

—বলুন, কিসের মেক-আপ নেব?

—যা ইচ্ছে হয়।

বিরজা খিল খিল করে হেসে ওঠে—ভিলেন হলে ভাল হয়।

কেদারবাবু বলেন—তাই হোক! একেবারে খাঁটি ভিলেন।

—বেশ। বলতে বলতে প্রতুলদা সেই ছোট সাজঘরের ভিতরে চলে যান।

বেশিক্ষণ নয়, মাত্র কুড়ি মিনিট পরে বের হয়ে এলেন প্রতুলদা।

সাজঘরের আড্ডার সব চোখ একসঙ্গে চমকে ওঠে। প্রাণ খুলে হাসবার জন্য তৈরী হয়েছিল যারা, তাদের প্রাণের হাসি যেন হঠাৎ আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। এ কি কাণ্ড করেছেন প্রতুলদা!

মিহি আদ্দির ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি। আস্তিন গিলে করা। লম্বা কোঁচাটাকে চিমটি দিয়ে ধরে কোমরের কাছে ধরে রেখেছেন প্রতুলদা। চুলের মাঝখানে সিঁথি। খুব সরু গোঁফের কালো রেখা। চিবুকের ওপর একটা বড় আঁচিল। সিগারেটের পাইপ মুখের এক কোণে কামড়ে ধরে রেখেছেন এবং মুখের আর এক কোণ দিয়ে হাসছেন। কী চমৎকার, কী নিখুঁত ছোটবাবুর মেক-আপ নিয়েছেন প্রতুলদা। প্রতুলদার চাপা চাপা গাল দুটোও যে ভরাট হয়ে অবিকল ছোটবাবুর গাল দুটোর মতো ফুলে রয়েছে।

আর একটা আশ্চর্যের ব্যাপার। মাথা হেঁট করে ফুঁপিয়ে ওঠে সুরমা।—ভুলের শাস্তি পেয়েছি প্রতুলদা। আর ঠাট্টা করবেন না। মাপ করুন।

আর একবার আরও বেশি আতঙ্কিত হয়ে চমকে ওঠে সাজঘরের আড্ডার এতগুলি মানুষের চোখ। সকলে চেয়ার ছেড়ে একসঙ্গে উঠে দাঁড়ায়! দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন ছোটবাবু।

প্রতুলদার সেই মূর্তির দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন ছোটবাবু—প্রতুল বুঝি আজ ছোটবাবুর মেক-আপ নিয়ে আপনাদের হাসাচ্ছে?

সাজঘরের ভেতরে ঢুকলেন ছোটবাবু। হেসে হেসে প্রতুলদার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার প্রশ্ন করেন—কি প্রতুল? কি সেজেছো বল শুনি? একটি খাঁটি ছোটবাবু?

—একটি খাঁটি ভিলেন। ছোটবাবুর হাসিভরা মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে একেবারে সোজা সরল ও স্পষ্ট ভাষায় যেন একটা জ্বলন্ত ধিক্কার বর্ষণ করে সুরমা।

চমকে ওঠেন ছোটবাবু, ভ্রূকুটি করেন। তারপর প্রতুলদাকেই প্রশ্ন করেন—তাই নাকি প্রতুল?

প্রতুলদা বললেন—হ্যাঁ।

হনহন করে হেঁটে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন ছোটবাবু।

সাজঘরের এতগুলি মানুষের চোখেমুখে একটা অদ্ভুত বিস্ময়ের বেদনা ছমছম করতে থাকে। এ কি হলো? কি ব্যাপার?

আজ আবার সুরমার জীবনের একটা প্রচণ্ড বঞ্চনা আর ক্ষতির রহস্য ধরে ফেলেছেন প্রতুলদা। সুরমার মুখের দিকেই সকলে আবার একসঙ্গে তাকায়। সুরমা হাসে—আমার চাকরি গেল প্রতুলদা।

প্রতুলদা বলেন—আমার চাকরিটাও কি থাকবে ভেবেছেন?

সুরমা—কিন্তু আপনি তো অনায়াসে একটা মিথ্যে কথা বলে দিতে পারতেন, তাহলে আপনার চাকরিটা যেত না।

যে প্রতুলদা কোন দিন রাগ করে আর চেঁচিয়ে কথা বলেন না, যে মানুষের প্রাণটা সব সময়ে হেসে আর হাসিয়ে সুখী হয়ে রয়েছে, সেই প্রতুলদাই আজ রাগ করে কাঁপতে কাঁপতে চেঁচিয়ে ওঠেন—এমন ভিলেনের কাছে চাকরি করবার ইচ্ছেও আর নেই।

কাব্যিক

কাব্যি করে আর স্বপ্ন দেখে জয়ন্ত। এইবার বোধহয় প্রেমেও পড়েছে। নইলে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাইরের ঘরের জানালার কাছে ওভাবে বসে থাকে কেন, ওরকম করে তাকায় কেন, আর ঠিক ঐ মেয়েটিই যখন এই পথ দিয়ে চলে যায়, তখন রঙীন হয়ে ওঠে কেন জয়ন্তের মুখ?

গ্রামের বাড়ি থেকে জয়ন্ত যেদিন প্রথম কলকাতায় তার মেজকাকার এই বাড়িতে এল, সেইদিন থেকেই জয়ন্তের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের শুরু। আমরা দু'জনে এক কলেজে এক ক্লাসেই পড়েছি। একই বছর ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছি। তারপর আরও বড় বড় কয়েকটা পরীক্ষা পার হতে গিয়ে আমিই ফেল করেছি, আর খুব ভাল নম্বর নিয়ে পাশ করে বেশ ভাল মাইনের সার্ভিস লাভের যোগ্য হয়ে উঠছে জয়ন্ত। অ্যাকাউন্টস্-এ এত ভাল প্রতিভা সাধারণত দেখাই যায় না। এখন ইচ্ছা করলে, আর একটু চেষ্টা করলে জয়ন্ত বেশ উঁচুদরের কোন সওদাগরী কোম্পানীর অডিটর হতে পারে।

কিন্তু কি আশ্চর্য, শুকনো ও কঠিন যত অঙ্কের স্তূপ ঘেঁটে ঘেঁটে এতদিন ধরে যে মানুষটা হিসাব-বিজ্ঞানের সাধনা করলো, সেই মানুষের মনটা হঠাৎ এমন বেহিসাবী হয়ে গেল কেমন করে?

মেজকাকা রাগ করেছেন, এবং তারপর ভয় পেয়ে সব আশাই ছেড়ে দিয়েছেন। সন্দেহ করেন তিনি, জয়ন্তের মাথার কিছু গোলমাল হয়েছে। নইলে চাকরি-বাকরির চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে সর্বক্ষণ এভাবে একটা ঘরের জানালার কাছে বসে পথের দিকে কেন তাকিয়ে থাকবে একটা সুস্থ-সবল ইয়ং ছেলে?

মেজকাকা জানেন না, আমরা জানি, কেন পথের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে জয়ন্ত। কাব্যি করে, অর্থাৎ কাব্য পড়ে আর লেখে, আর পথের দিকে তাকিয়ে স্বপ্ন দেখে, কারণ ঐ পথ দিয়ে দিনের মধ্যে অনেকবার যায় আর আসে সেই মেয়েটি, যার সাজ-পোশাক আর গলার গয়না থেকে শুরু করে চোখের চাহনিতে পর্যন্ত কেমন একটা অদ্ভুত তীব্র আর ঝকঝকে ফ্যাশান থমথম করে।

মেয়েটিকে আমরা চিনি না। জয়ন্তও ঐ মেয়ের কোন পরিচয় জানে না। ঐ ওদিকে মার্কেটের পিছনের দিকে নতুন বাড়িগুলির কোন একটা ফ্ল্যাটে বোধহয় থাকে এই মেয়ে, কারণ ঐদিক থেকে ওকে আসতে দেখা যায়। রাত্রিবেলা ট্রামলাইনের দিক থেকে ছোট রাস্তা ধরে এদিকে আসে। কিন্তু ঠিক কোথা থেকে আসে, সে-খবর আমরা জানি না।

জয়ন্তও জানে না। জয়ন্ত বলে, জানবার কোন প্রয়োজন নেই। এক নাম-না-জানা অপরিচিতা পথিক-তরুণী জয়ন্তের চোখের সম্মুখের পথ ধন্য করে দিয়ে চলে যায়। জয়ন্তও যেন এক আন-জগতের রূপময়ীর সেই ছন্দিত মূর্তির দিকে তাকিয়ে ধন্য হয়ে যায়।

আমাদের কাছে জয়ন্ত তার মনের ভাষা গোপন করে না। জয়ন্ত বলে—ওকে সত্যিই এক স্বপ্নলোকের মেয়ে বলে মনে হয়।

আমরা বলি—কিন্তু স্বপ্নলোকের এই ধরনের একটা বস্তুর জন্য সারাদিন পথের দিকে তাকিয়ে বসে থেকে লাভ কি?

জয়ন্ত বলে—প্রেমের রীতিই যে এই। এই প্রতীক্ষাই একদিন সকল কাঁটা ধন্য করে গোলাপ হয়ে ফুটবে।

আমরা প্রশ্ন করি—কবে?

জয়ন্ত সোজাভাষায় উত্তর না দিয়ে শুধু বলে—একদিন! দেখতে পাই, জয়ন্ত কথাটা বলেই জানালার নিকটে দুটো টবের দিকে তাকিয়ে আছে।

প্রশ্ন করি—ওখানে কি?

জয়ন্ত বলে—রজনীগন্ধার চারা।

বুঝতে পারি না, কি ভাবছে জয়ন্ত। জয়ন্তই বলে—এই রজনীগন্ধা হলো আমারই মনের তপস্যার মতো।

তারপরেই বলে—এই রজনীগন্ধা আমারই জীবনের কাব্য।

তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে বিহুল স্বরে বলে—মানুষের কাব্যকেই আমি একটা নতুন কল্পনা দিয়ে যাব, যার জন্য ভবিষ্যতের মানুষ আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি!

জয়ন্তের কাব্যিক প্রলাপ শুনে আমরা হতাশ হয়ে চলে যাই। কিন্তু কয়েকদিন পরে আবার ফিরে এসে বলি—মেয়েটিকে ভালোবেসে ফেলেছ, ভালই, কিন্তু সেজন্য এরকম ধ্যান-ট্যান আর কাব্যি করার দরকাব কি? তুমি যদি কিছু বলতে না পার, তবে বলো, আমরাই না হয় মেয়েটির বাপ-মার কাছে গিয়ে...!

জয়ন্ত ক্ষুব্ধভাবে তাকায়—কি করতে চাও?

আমরা বলি—তোমার সঙ্গে ঐ মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব।

হঠাৎ আহত মানুষের মতো বেদনার্তভাবে তাকায় জয়ন্ত—দোহাই তোমাদের, আমার স্বপ্নকে হত্যা করো না।

—এ কথার অর্থ?

জয়ন্ত একটু শান্ত হয়ে নিয়ে তারপর আমাদের একটু ভাল করে বুঝিয়ে দেবার জন্য বলে—ওভাবে তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে এনো না। তাকে আসতে দাও আমার জীবনে, ধীর মৃদুল চরণপাতে, মধু-মাধবী রাতে, কে তুমি পথিক বলি সুধাহাসি হেসে, মালা তুলে নিতে হাতে।

কিন্তু আমরা আরও হতাশ হই। জয়ন্তের কল্পনা শেষ পর্যন্ত জয়ন্তের মাথায় সত্যিই গোলমাল ঘটাবে, এই ভয়ে আমরা শুধু ভাবি, কি করা যায়?

জয়ন্তই একদিন আবার হেসে বলে—তোমরা শোননি, কাব্যে কি বলে?

—কি বলে?

জয়ন্ত—অশোকের মঞ্জরী ফুটে ওঠে কিসের স্পর্শে?

—জানি না।

জয়ন্ত—ঐ রকমই এক তরুণী নারীর চরণের মঞ্জীর ধ্বনির স্পর্শে।

—বেশ।

জয়ন্ত—জান কি, তিলক ফুলের কুঁড়ি ফোটে কিসের স্পর্শে?

—কে জানে কিসের স্পর্শে?

জয়ন্ত বলে—ঐ রকমই সুন্দরীর আঁখির কটাক্ষে।

—ভাল কথা।

উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে থাকে জয়ন্ত—বকুল পুষ্পিত হয় কামিনীর অধরমধুর ছোঁয়ায়, আর রক্তকুরুবক ফোটে রূপসীর কমনীয় তনুর আলিঙ্গনে। ধন্য কবি, ধন্য তাদের কল্পনা।

আমরা বলি—কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখ।

জয়ন্ত—কি?

—ঐ মেয়েকে নিয়ে কল্পনা-টল্পনার খেলা ছেড়ে দাও।

ক্ষুব্ধ হয় জয়ন্ত—কেন?

—মেয়েটাকে কেমন যেন মনে হয়।

জয়ন্ত—কি রকম?

স্বপ্নলোকের মেয়েটেয়ে বলে তো মনে হয় না। কখনো দেখি সন্ধ্যাবেলা মার্কেটে

বেড়াচ্ছে, কখনো দেখি সিনেমা হাউসের সামনে দাঁড়িয়ে চীনা বাদাম খাচ্ছে।

প্রভাত রূঢ়ভাবে বলে—একদিন দেখলাম চৌরঙ্গিতে, একজন অবাঙালী ভদ্রলোকের গাড়িতে গিয়ে উঠে বসলো।

জয়ন্ত বলে—অবাস্তব, অবাস্তব। ওসব মানুষের আসল পরিচয় নয়। ওভাবে মানুষকে চিনতে হয় না।

রাগ করেই বলি—তুমি একবার চিনে দেখ না, যেভাবে চিনতে হয়।

জয়ন্ত গম্ভীরভাবে বলে—চিনেছি।

আমরা অপ্রস্তুত হই।

জয়ন্ত বলে—সেও আমাকে চিনেছে। এই পথে তার যাওয়া-আসা আমারই প্রতীক্ষার প্রতি তার মুগ্ধ মনের অভিনন্দন। তোমরা ওকে চিনতে পারনি। তোমরা শুধু দেখেছো ওর ফ্যাশন, যেটা জীবনের বাইরের জিনিস। ওর পরিচয় পেয়েছি আমি ওর চোখের মধ্যে। বুঝতে পারি ওর চোখের ভাষা।

—কি বললে? চেঁচিয়ে ওঠে প্রভাত।

জয়ন্ত—সে জানিয়ে গেছে, তার চোখের নীরব ভাষার ইঙ্গিত, সে আসতে চায় আমার জীবনে।

তাহলে তো সমস্যা মিটেই গেল। আর আমাদের কিছু করবার নেই। দুজনে দুজনেরই আত্মার পরিচয় যখন জেনে ফেলেছে, তখন আমরা কেন আর রুক্ষ কথায় ঘটকালি করে ওদের স্বপ্নের আর কাব্যের মধুরতা নষ্ট করে দেব?

মিথ্যে বলেনি জয়ন্ত। আমরা বসেছিলাম নিকটেরই এক বাড়ির দাওয়ায়, যেখানে পাড়ার পূজা-কমিটির মিটিং শুরু হবে আর একটু পরে। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। সকলেই দেখে চমকে উঠলাম, আসছে সেই অপরিচিতা। গলায় সোনার হাঁসুলি, লঘু ভয়েলের শাড়ি আঁটসাট করে পরা, ভাঙা খোঁপায় দুটো সরু সরু সোনার চেন ঝুলছে।

অপরিচিতা ধীরে ধীরে আমাদের সম্মুখের পথ পার হয়ে জয়ন্তর ঘরের জানালার কাছে দাঁড়ালো। আমরা দেখতে থাকি, একটি মৃদু কটাক্ষ তুলে অপরিচিতা সেই নারীর মূর্তি জানালার দিকে তাকিয়ে আছে।

অন্যপথে ঘুরে এবং লুকিয়ে-লুকিয়ে আমরা আস্তে আস্তে জয়ন্তর ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। লজ্জা, ভয়, আবার কেমন একটা অজানা আনন্দ, সব মিলে আমাদের বুকে দুরু দুরু ধরিয়ে দিল। অভিসারিকার মতো, সত্যিই তাই, জয়ন্তের স্বপ্নলোকের মেয়ে যে সত্যিই ধীরে মৃদুল চরণপাতে ফটক পার হয়ে বারান্দার উপর এসে দাঁড়ালো।

বের হয়ে এল জয়ন্ত। জয়ন্ত তার কাব্যময় চক্ষু নিয়ে এতই মুগ্ধ হয়ে আছে যে, আমাদের ছায়াগুলিকে দেখেও কিছু বুঝতে পারলো না।

জয়ন্তের হাতে একরাশ রজনীগন্ধার ডাঁটা, ডাঁটার মাথায় ঘুমন্ত কুঁড়ি।

জয়ন্ত বলে—আমি জানতাম, তুমি নিজেই একদিন আসবে।

অপরিচিতা বলে—আমিও জানতাম, আপনি নিজেই একদিন ডাকবেন।

জয়ন্ত—যখন এসেছ, তখন নাও আমার এই উপহার।

রজনীগন্ধার রাশি দু' হাতে তুলে অপরিচিতার হাতের কাছে এগিয়ে দেয় জয়ন্ত।

অপরিচিতা কুণ্ঠিতভাবে বলে—এখনি কেন?

জয়ন্ত—হ্যাঁ এখনি, সবার আগে আমার তপস্যার এই উপহার তুমি নাও।

অপরিচিতা—সবার আগে এসব জিনিস কেন?

জয়ন্ত—আমার কল্পনা আজ ধন্য হবে। স্বপ্ন দেখেছি আমি, তোমারই মুখের হাসির স্পর্শে

আমার রজনীগন্ধার কুঁড়ি ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে।

অপরিচিতার কটাক্ষ একটু তীব্র হয়ে ওঠে।—বাঃ, বলা নেই, কওয়া নেই, আগেই হাসি চাই!

জয়ন্ত--কি বললে?

অপরিচিতা--আগেই হাসি-টাসি হয় না।

জয়ন্ত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়--তবে কি?

অপরিচিতা গম্ভীর ভ্রূভঙ্গী করে বলে--আগে টাকার কথা বলে নিতে হয়।

জয়ন্ত--টাকা? জয়ন্তের ফ্যাল ফ্যাল দুই চক্ষুকে কাঁপিয়ে দিয়ে একটা হাহাকার যেন আস্তে ধ্বনিত হয়। ধপ করে জয়ন্তের হাতের রজনীগন্ধা বারান্দার মেঝের উপর পড়ে যায়।

অপরিচিতা বলে--ধেৎ!

হনহন করে হেঁটে ফটক পার হয়ে চলে যায় অপরিচিতা। খোঁপার চেনগুলি ঝোলানো সাপের মতো লিকলিক করে।

আমরা আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে জয়ন্তের কাছে দাঁড়ালাম। গলার স্বর বেশ কঠিন করে নিয়ে প্রশ্ন করলাম—কি হে, তপস্যা শেষ হলো?

উত্তর দেয় না জয়ন্ত। আবার জিজ্ঞাসা করলাম--কি বলে তোমার কাব্য? রূপসীর হাসির ছোঁয়ায় রজনীগন্ধার কুঁড়ি ফোটে তো?

প্রভাত রূঢ়স্বরে হেসে ওঠে—ফোটে না, মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

যাক্, অনেকক্ষণ রইলাম জয়ন্তের ঘরে। সকলেই দু'কাপ করে চা খেলাম। চলে যাবার সময় জয়ন্তকে জিজ্ঞাসা করলাম--এইবার একটা ভাল সার্ভিসের জন্য চেষ্টা করা উচিত।

জয়ন্ত বলে—হ্যাঁ।

আবার প্রশ্ন করি—চেষ্টা করবে তো?

জয়ন্ত বিরক্ত হয়ে বলে—নিশ্চয়।

ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান

স্টেশনটার নাম বললে প্রায় সকলেই বুঝে ফেলতে পারেন, কলকাতা থেকে কতদূরের আর কোন্ জায়গার কথা বলা হচ্ছে।

রায়ের হাট স্টেশন। এই স্টেশন থেকে প্রায় মাইল খানেক ফাঁকা পথের দূরত্ব পার হয়ে যেতে পারলে একটা শহুরে ভিড়ের কাছে পৌঁছানো যায়। একটা বাজার। সেই বাজারের চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, নিকটে নিশ্চয়, খুব বড় না হোক, মাঝারি রকমের একটা শহর আছে এবং সে শহরে সবই আছে। আদালত কাছারি হাসপাতাল সিনেমা হাউস আর কলেজ। বাজারের কাছে এসে দাঁড়ালে আর এদিকে ওদিকে তাকালে রাস্তাগুলির চেহারার সঙ্গে সঙ্গে নামগুলিও চোখে পড়বে। কলেজ রোড, হাসপাতাল রোড ইত্যাদি। এতদূর থেকেও শোনা যায়, সিনেমা হাউসের লাউড স্পীকার গলা ফাটিয়ে বিজ্ঞাপনী গান গাইছে।

যখন কোন প্যাসেঞ্জার ট্রেন এসে থামে, শুধু তখনই স্টেশনটার প্রাণ যেন কলরব করে জেগে ওঠে, নইলে সব সময় শান্ত। সব সময় নীরব। দিন ও রাতের মধ্যে বেশির ভাগ সময় স্টেশনের জীবন যেন আধঘুমের আলস্যে নিঝুম হয়ে পড়ে থাকে। প্ল্যাটফর্মের উপর দুটো বড় বড় নাগকেশরের গাছ আছে। সেই গাছের তলায় চীনেবাদামের ফেরিওয়ালাও টান হয়ে

শুয়ে থাকে। ধড়ফড় করে জেগে ওঠে তখন, যখন একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেনের আগমনী সঙ্কেতের ঘন্টা ঝনঝন করে বেজে ওঠে।

স্টেশনের যে ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে যাত্রীর টিকেট চেক করেন চেকার, সেই ফটক পার হলেই কয়েক ধাপ সিঁড়ি এবং সিঁড়ির শেষ ধাপ পার হলেই বেশ চওড়া একটা কাঁকর ছড়ানো জায়গা, সেখানে একটা-দুটো ট্যাক্সি আর গোটা দশেক সাইকেল রিক্সা সব সময়েই উপস্থিত থাকে।

প্যাসেঞ্জার ট্রেন থেকে যাত্রীরা নেমে, কিলবিল করে সরু ফটক পার হয়ে যখন এই খোলা জায়গায় এসে ছড়িয়ে পড়ে, তখন শোরগোল জাগে সবচেয়ে বেশি। সব ট্যাক্সি আর সব সাইকেল রিক্সার হর্ণ একসঙ্গে বাজতে থাকে। সেই সঙ্গে হাঁক আর চিৎকারও চলতে থাকে।—এই যে আসুন স্যার—এইসো বুড়ো মা—এস গো বাবু। বাজারে যাবেন তিন আনা, টাউন যাবেন চার আনা।

ট্যাক্সি বলে, চলে আসুন, টাউন পর্যন্ত এক টাকা।

সব সাইকেল-রিক্সাই যাত্রী পেয়ে যায়। ট্যাক্সিও বাদ যায় না। কারণ, প্রায় প্রত্যেক প্যাসেঞ্জার-ট্রেন থেকে এমন দু'চার জন যাত্রী নামেন, যাঁরা ট্যাক্সি চড়তেই ভালবাসেন আর, এক মাইলের জন্য এক টাকা দিতে কিছুমাত্র আপত্তি করেন না।

সাইকেল-রিক্সাগুলি দুটি সারিতে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এই সারিতে ভাগ্যলক্ষ্মী, কত মজা, পক্ষিরাজ, জয় মা কালী আর মন রে আমার। ওই সারিতে চল রে চল, সুখশান্তি, উর্বশী, আশীর্বাদ আর প্রাণারাম।

তা ছাড়া, এই সারিতে ভাগ্যলক্ষ্মী আর ওই সারিতে আশীর্বাদ সব সময়েই মুখোমুখি, যেন পরস্পরের দিকে একটা আক্রোশের আবেগ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ভাগ্যলক্ষ্মীর নিতাই আশীর্বাদের রামচরণের দিকে চোখ রেখে আস্তে আস্তে বিড়ি টানে। আর, আশীর্বাদের রামচরণ ভাগ্যলক্ষ্মীর নিতাই-এর দিকে আড় চোখে তাকিয়ে ছোলা চিবোয়। আরও তো আটটা সাইকেল রিক্সা আছে কিন্তু তাদের মধ্যে এরকম কোন রেষারেষির ভাব নেই। করালী, ভানু, সিদ্দিক, গিরধারী এবং আরও সবাই আশ্চর্য হয়ে যায়, ভাগ্যলক্ষ্মী আর আশীর্বাদের মধ্যে এরকম টকরা-টকরি কেন? বোঝা যায় না, কেন নিতাই ওরকম কটমট করে রামচরণের দিকে তাকায়। আর, রামচরণই বা কেন ওভাবে ঠোঁট কামড়ে নিতাই-এর দিকে বিশ্রী একজোড়া আক্রোশের চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে। এটা একটা রহস্য।

রোজগারের দিক দিয়ে কেউ কারও চেয়ে কম নয়। একটা সপ্তাহ যদি কারো রোজগারে কিছু কমতি হয়, তবে আর-একটা সপ্তাহে সে কমতি পুষিয়ে যায়। গঙ্গাস্নান করবার জন্য যেদিন যাত্রী নামে বেশি, সেদিন হয়তো নিতাই একটু বেশি রোজগার করে। কিন্তু তারপরেই একটা মেলার দিনে রামচরণের রিক্সাই বার বার ভাড়া নিয়ে ছুটে-ছুটে যায় আর আসে। এবং সব রিক্সাওয়ালাই বুঝতে পারে, আজ রামচরণই টেক্কা দিয়েছে, নিতাই-এর চেয়ে অন্তত দেড় টাকা বেশি রোজগার করেছে রামচরণ।

নিতাই আর রামচরণ, দুজনেরই বেশ হট্টাকট্টা চেহারা। দুজনের মধ্যে সত্যিই একদিন যদি একটা হাতাহাতি বাধে, তবে কে জিতবে বলা যায় না। নিতাই পরে ছিটের কামিজ আর ধুতি। আর রামচরণ পরে গেঞ্জি ও হাফপ্যান্ট। বয়সের দিক দিয়ে কেউ কারও চেয়ে ছোট-বড় বলে মনে হয় না. কতই বা বয়স? ভানু আর সিদ্দিকের চেয়েও কম। বড়জোর কুড়ি-একুশ হবে নিতাই-এর বয়স, আর রামচরণ বড়জোর সাড়ে-বিশ বা সাড়ে-একুশ।

যতক্ষণ স্ট্যাণ্ডের ভিতরে এই দুই রিক্সা দুই ভিন্ন সারির মধ্যে দাঁড়িয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, ততক্ষণ যেন একটা নীরব উদ্বেগ সহ্য করে দুই রিক্সাই। ভাগ্যলক্ষ্মীর নিতাই বার বার স্টেশনের ফটকের দিকে তাকায়। আশীর্বাদের রামচরণও তাকায়। কিলবিল

করে যাত্রীর দল ফটকের মুখ থেকে বের হয়ে এদিকেই এসে ছড়িয়ে পড়ে। এমন কি সামনে এসেও দাঁড়ায়। কিন্তু না নিতাই, না রামচরণ, দুজনের কারও চোখের দৃষ্টিতে বা আচরণে ভাড়া নেবার আগ্রহ চঞ্চল হয়ে ওঠে না। ওরা দুজনেই যেন বিশেষ একজনেব শুভাগমনের ছবি দেখবার আশায় চোখ তুলে ফটকের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে আসছে বোধহয়, কাল তো এই দশটা-পাঁচের ট্রেনেই সে এসেছিল। আজ কি তাহলে আসবেই না?

ফটকের কাছ থেকে চেকারের মূর্তি যখন সরে যায়, যখন শেষ যাত্রীকেও ফটক পার হয়ে চলে আসতে দেখা যায়, তখন দুজনেই একসঙ্গে হাঁপ ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়। সে আসেনি। দুজনেরই উদ্বেগের প্রতিযোগিতা যেন শান্ত হয়ে যায় এবং সামনের যাত্রীদের উপর চোখ পড়ে।

এবং তখনি যাত্রী নিয়ে উল্লাসের সঙ্গে ছুটে চলে যায় ভাগ্যলক্ষ্মী, সোজা বাজার। আর আশীর্বাদ ও যাত্রী নিয়ে ছুটতে থাকে, বাজার ছাড়িয়ে একেবারে টাউন পর্যন্ত।

ভানু, সিদ্দিক আর গিরধারী আশ্চর্য হয়। নিতাই আর রামচরণ, দুজনের কেউ কারও অজানা নয়। বরং, এই দুজনের মধ্যে যে কত গলাগলি ভাব, হাসাহাসি আর মাখামাখি ছিল, তাও সকলেই একদিন দেখেছে। বেশি দিন নয়, এই বোধহয় মাস ছয়েক হবে, কে জানে কেন দুজনের মধ্যে এমন একটা নীরব রেষারেষির ভাব দেখা দিল! আজকাল দুজনের কেউ কারও সঙ্গে একটা সাধারণ কথাও যেন বলতে চায় না। অথচ ছ'মাস আগে এই ভাগ্যলক্ষ্মী আর আশীর্বাদ, দুজনেই এক সারিতে পাশাপাশি দাঁড়াতো। ভাগ্যলক্ষ্মীর পাশে উর্বশীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কতবার রামচরণ এসে একটা গোলমাল বাধিয়ে আর ঠেলেঠুলে আশীর্বাদকে ভাগ্যলক্ষ্মীর পাশে দাঁড় করিয়ে তবে খুশি হয়েছে। ভানুও রাগ করে কতবার বলেছে—আঃ, দুজন যেন রাম-লক্ষ্মণ দুটি ভাই। একটু ছাড়াছাড়ি হয়ে থাকতে পারে না।

রোজই নয়, তবে সপ্তাহের মধ্যে অন্তত তিনটে দিন, এই রায়ের হাট স্টেশনেই কোন না কোন প্যাসেঞ্জার ট্রেন থেকে নামে একটি মেয়ে। দেখেই বোঝা যায়, এই মেয়ে কেমন মেয়ে, আর কেন সপ্তাহে তিনটে দিন রাযের হাট স্টেশনে ওকে দেখা যায়, আর কোথায় যেতে চায়।

টাউনে যায় মেয়েটি। হাতে বই আছে। সব সাইকেল-রিক্সাই জানে, মেয়েটি টাউনের কলেজে পড়ে।

কিন্তু আসে কোথা থেকে? এ খবরও অনেকে জানে। ভানু বলে, উনি জয়গর থেকে আসেন। ত্রিবেণীর কাছে সেই জয়গড়, যেখানে নতুন একটা কলোনি গড়ে উঠেছে।

মেয়েটি একাই আসে আর একাই ফিরে যায়। টাউনের দিক থেকে যে-কোন একটা রিক্সায় চড়ে বিকেলের দিকে ফিরে এস পাঁচটা পঞ্চাশের ট্রেন ধরে মেয়েটি। কোনদিন উর্বশী, কোনদিন পক্ষীরাজ আর কোনদিন মন-রে-আমার ওকে টাউন থেকে নিয়ে আসে।

কিন্তু স্টেশন থেকে টাউনের কলেজ পর্যন্ত ওকে নিয়ে যাবার দায়িত্ব যেন এই স্ট্যাণ্ডের এতগুলি রিক্সার মধ্যে মাত্র এই দুই রিক্সার উপর, এই ভাগ্যলক্ষ্মী আর আশীর্বাদের উপর সঁপে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার রকম-সকম দেখলে তাই মনে হয়। স্টেশনের ফটকের কাছে মেয়েটির মূর্তি দেখা দিতেই যেন চমকে ওঠে ভাগ্যলক্ষ্মী আর আশীর্বাদ। সাইকেলের হ্যাণ্ডেল শক্ত করে আঁকড়ে ধরে নিতাই ; সাইকেলের একটা প্যাডেলের উপর একটা পা তুলে দিয়ে ছটফট করে ওঠে রামচরণ। দুজনেই যেন একটা প্রতিজ্ঞার আবেগে ব্যস্তভাবে হর্ণ বাজাতে থাকে।

স্ট্যাণ্ডের কাছে মেয়েটি এগিয়ে আসতেই পথের দু' পাশের রিক্সার সারি থেকে যেন লাফ দিয়ে এগিয়ে আসে দুই রিক্সা। দুই রিক্সার সামনের দুই চাকায় একটা ঠোকাঠুকিও হয়ে যায়। দুই রিক্সার এই আক্রোশের ঠেলাঠেলিতে রাস্তাটাই বন্ধ হয়ে যায়। মেয়েটি এগিয়ে যেতে

পারে না।

এগিয়ে যাবার দরকারও হয় না। হয় ভাগ্যলক্ষ্মী নয় আশীর্বাদ, দুই রিক্সার কোন একটি রিক্সায় মেয়েটি উঠে বসে। মেয়েটির কোন কথা বলতে হয় না। কারণ, জানা আছে সবারই, কোথায় যাবে মেয়েটি।

হয় ভাগ্যলক্ষ্মী, নয় আশীর্বাদ। হু-হু করে স্ট্যাণ্ড ছেড়ে, হর্ণ বাজিয়ে একটা উল্লাসের সঙ্গীতের মতো বাতাসের নীরবতা শিউরে দিয়ে শড়ক ধরে ছুটে চলে যায়। ফাঁকা পথ। দু' পাশে ছোট-ছোট বাঁশবাগান আর পুরনো দেউল। বাজার পর্যন্ত যেতে পথের উপর মানুষের ভীড় তেমন কিছু নয়। বড় বড় আমের ছায়া পার হয়ে, পাখী-ডাকা মুখরতার এক-একটা ছোট ছোট উল্লাসের জগৎ পার হয়ে ছুটতে থাকে রিক্সা। বাজার, তারপর কলেজ রোড, তারপর কলেজ। ক্ষান্ত হয় রিক্সায় অভিযান ; হয় ভাগ্যলক্ষ্মী, নয় আশীর্বাদ।

ভানু হাসে—যেমন নিতাইটা তেমনই রামচরণটা, দুটোই বেহায়া বটে।

সিদ্দিক খৈনি মুখে দিয়ে হাসে—দুটোরই মাথা খারাপ হয়েছে।

হ্যাঁ, সত্যিই হঠাৎ যেন মাথা খারাপ হয়েছে, তেমনই উদাস দুটো চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে নিতাই, যখন রামচরণের আশীর্বাদ মেয়েটিকে তুলে নিয়ে একটা বিপুল গর্বের কৃতার্থতায় যেন ধন্য হয়ে, আর হর্ণের শব্দে নিতাই-এর সারা আত্মাটাকেই বিদ্রূপ করে চলে যায়। অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে নিতাই। যেন ক্ষণিকের মতো সব খাটুনির জোর আর রোজগারের জেদ ভুলেই গিয়েছে নিতাই।

রামচরণেরও চোখে-মুখে এই রকম মাথা-খারাপ অবস্থা দেখা যায়। যখন ভাগ্যলক্ষ্মীর কোলের উপর চড়ে বসে মেয়েটি। বেশ বড় একটি বেণী দোলে, কোন কোন দিন চওড়া খোঁপা, পায়ে সবুজ রং-এর চটি, আর গায়ে রঙীন শাড়ি। কোনদিন ডুরে, কোনদিন বুটিদার, কোনদিন রঙিন-ছাপ শাড়ি। হু-হু করে ছুটে চলে ভাগ্যলক্ষ্মী, মেয়েটির কানের দুল থর থর করে কাঁপে।

আমের ছায়ার ভিতর ভাগ্যলক্ষ্মী অদৃশ্য হয়ে যেতেই আশীর্বাদের গদির উপর দুটো ঘুসি মেরে ধুলো ঝেড়ে নিয়ে আবার সামনের যাত্রীর সঙ্গে কথা বলে রামচরণ—কোথায় যাবেন? ক'জন আছেন? দু' জনের বেশি টানতে পারব না মশাই!

কে জানে কি হয়েছে? অনেক দিন, প্রায় একটা মাস পার হয়ে গিয়েছে। মাঘের শীত শেষ হয়ে ফাল্গুনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে কবেই। আমের গাছে মুকুল ধরেছে। কিন্তু সেই মেয়েটি কোথায়?

কলেজ বন্ধ হয়নি, ট্রেনের টাইমও বদলায়নি। দশটা পাঁচের ট্রেন আজও আসে আর চলে যায়। চেকারবাবু তেমনই ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে যাত্রীদের টিকিট চেক করেন। কিন্তু কই? একমাস পার হয়ে গেল, আজও সেই রঙীন শাড়ির আঁচলকে ফটকের কাছে দুলে উঠতে দেখা গেল না।

কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী আর আশীর্বাদ আজও নীরবে দুই সারির মধ্যে পরস্পরের দিকে একটা আক্রোশের আবেগ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নিতাই আস্তে আস্তে বিড়ি টানে ; একমনে ছোলা চিবোয় রামচরণ। দুজনের কেউ কারও দিকে ভুলেও একবার হাসিমুখ তুলে তাকায় না দুজনের মধ্যে কথার বিনিময় আজও ঘটেনি।

যাত্রী আসে ; কত রকমের যাত্রী। ভাগ্যলক্ষ্মী আর আশীর্বাদও ছুটে ছুটে ভাড়া খাটে স্টেশন থেকে বাজার, বাজার থেকে টাউন। কিন্তু এই খাটুনি যেন নিতান্তই খাটুনি ভাগ্যলক্ষ্মী আর আশীর্বাদের হর্ণ বাজে, নিতান্তই হর্ণের শব্দ। সে শব্দে কোন গর্বময় সঙ্গীতের উল্লাস শিউরে ওঠে না।

অন্যদিকের মতো সেদিনও, এসেছে দশটা পাঁচের ট্রেন। দশ মিনিট লেট করে এসেছে। ফটক ভেদ করে মানুষের ভিড় কিলবিল করে এগিয়ে আসছে। আর...চমকে ওঠে নিতাই-এর চোখ। কেঁপে ওঠে রামচরণের মুখ। ভাগলক্ষ্মী আর আশীর্বাদ, দুই রিক্সাই যেন শিউরে ওঠে। ফটকের কাছে চেকারবাবুর পাশ কাটিয়ে একটা রঙীন মূর্তি যেন চঞ্চল হয়ে বের হয়ে এসেছে এবং এইদিকেই আসছে।

ভিড়ের ফাঁকে ফাঁকে সেই রঙীন মুখটাকেও চিনতে পারা যায়। সেই মেয়েটি। সাইকেলের হ্যাণ্ডেল শক্ত করে আঁকড়ে ধরে নিতাই। সীটের গদির উপর ঘুসি মেরে ধুলো ঝেড়ে নিয়ে আর প্যাডেলের উপর একটা পা তুলে দিয়ে ছটফট করে রামচরণ। ভাগ্যলক্ষ্মী আর আশীর্বাদের হর্ণ মরিয়া হয়ে বাজতে থাকে।

কিন্তু ধীরে ধীরে, ভাগ্যলক্ষ্মী আর আশীর্বাদ, দুই রিক্সার এই আক্রোশের উৎসাহ যেন একটা হঠাৎ ধাঁধার আঘাতে আহত হয়ে নেতিয়ে পড়তে থাকে। ভাগ্যলক্ষ্মীর হর্ণ যেন ফোঁপাতে থাকে, আর আশীর্বাদের হর্ণ স্বরভঙ্গ গলার মতো কাঁপে।

মেয়েটির চেহারা বদলে গিয়েছে। মেয়েটির সিঁথিতে সিঁদুরের দাগ, মাথায় কাপড়। কানে আর সেই ছোট দুটি দুল নয়। মস্ত একজোড়া কানপাশা।

একলা নয় মেয়েটি। সঙ্গে একজন রয়েছে। অল্প বয়সের এক ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের গায়ে সিল্কের কামিজ আর ফরাসডাঙা ধুতি। পায়ে নতুন জুতো। হাতের আঙুলে তিনটি আংটি।

মেয়েটির হাত ধরে আছেন ভদ্রলোক। মেয়েটি হাসছে, ভদ্রলোকও হাসছেন।

এগিয়ে আসছে দু' জনে। কিন্তু হঠাৎ থেমে গেল। স্ট্যাণ্ডের এই দুই সারির রিক্সার দিকে যেন দুজনের চোখই পড়েনি। ভুলেও এদিকে একবার তাকায় না কেউ, মেয়েটি না, সঙ্গের ভদ্রলোকও না।

ট্যাক্সির কাছে এসে থেমে গিয়েছে দুজনেই। এবং তারপর বোধহয় এক মিনিটও পার হয়নি, সনাতনদার চকচকে নতুন ট্যাক্সি দুই সারি রিক্সার মাঝখানের পথের উপর দিয়ে যেন লাফাতে লাফাতে আর ধোঁয়া ছড়িয়ে ছুটে চলে গেল। চলে গেল সেই মেয়েটি, আর তার সঙ্গী সেই ভদ্রলোক।

সনাতনদার নতুন ট্যাক্সির ধোঁয়া আর পোড়া পেট্রোলের গন্ধ, তাও বেশিক্ষণ আর বাতাস ভার করে রাখেনি। দমকা একটা হাওয়া এসে ভাগ্যলক্ষ্মী আর আশীর্বাদের পর্দা দোলাতে শুরু করে দেয়।

সব রিক্সাই যাত্রী নিয়ে ছুটে চলে যায়। পক্ষিরাজ, মন রে আমার, উর্বশী, কত মজা, জয় মা কালী, প্রাণারাম, সুখশান্তি আর চল রে চল। শুধু ভাগ্যলক্ষ্মী আর আশীর্বাদ চুপ করে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

দুই রিক্সাই যেন হঠাৎ ক্লান্ত শ্রান্ত আর অলস হয়ে গিয়েছে। আক্রোশ নেই, ঠোকাঠুকি আর ঠেলাঠেলির সেই প্রতিজ্ঞার রেশমাত্রও নেই। কেউ ছটফট করে না।

রামচরণ ডাকে—একটা বিড়ি দিবি নিতাই?

নিতাই বলে—নে।

ক্ষণকালীন

ট্যাক্সি থেকে নেমে, বাড়ির গেট পার হয়ে ভিতরে ঢুকতেই দেখতে পায় তপেশ, লনের উপর সারি সারি চেয়ার আর টেবিল। একটা চা-এর আসর গল্পে আর হাসিতে মুখর হয়ে রয়েছে।

সিল্কের পায়জামা পরে আর তোয়ালের আকারের একটা রুমাল হাতে নিয়ে আসরের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন যে ভদ্রলোক, তাঁরই দিকে তাকিয়ে ডাক দেয় তপেশ।—চিনতে পারছেন রজনীদা?

চেঁচিয়ে ওঠেন রজনীদা—তপেশ! কি আশ্চর্য, তুমি কবে এলে?

তপেশ—তিন দিন হলো এসেছি।

রজনীদা—কোথায় ছিলে এই তিনদিন?

তপেশ—একটা হোটেলে।

রজনীদা যেন রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠেন—ছিঃ, আমাকে কি তুমি পর মনে করলে তপেশ, হোটেলে উঠলে? আমার এত বড় বাড়িতে কি জায়গা নেই?

তপেশ হাসে—এখন আপনার এখানেই এসেছি রজনীদা।

রজনীদা—জিনিসপত্র, বিছানা বাক্সটাক্স সঙ্গে আছে কি? না হোটেলেই রেখে এসেছ?

তপেশ—ট্যাক্সিতে আছে, এখনও নামাইনি।

রজনীদা বাড়ির বারান্দার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন—এই বয়, সাহেবকা সামান ভিতর লে যাও। ...হ্যাঁ, এস তপেশ, চা খাও।

রজনীদা আবার তেমনই উৎসাহের স্বরে, এবং সেই সঙ্গে একটা গর্বের আবেগও মিশিয়ে দিয়ে চা-এর আসরেরত হাসিখুশি চেহারার আর রঙীন জীবনের মানুষগুলিকে শুনিয়ে তপেশের পরিচয় আবৃত্তি করতে থাকেন।

—এই তপেশ হলো আমাব ধীরাজ কাকার একমাত্র ছেলে। ধীরাজকাকা আমার আপন কাকা নন কিন্তু আপন কাকার চেয়েও বেশি আপন জন। বাবার জ্ঞাতি ভাই হলেন ধীরাজকাকা, দুঃখের বিষয় তিনি এখন আর বেঁচে নেই। জীবনের বেশির ভাগ সময় বর্মাতেই ছিলেন। বর্মাতে থাকতে থাকতেই চোখ বুঁজলেন। বিপুল সম্পত্তি করেছিলেন ধীরাজকাকা। রাইস মিল তিনটে, টিম্বার রপ্তানি, আর একটা স্টীমার সার্ভিস। একজন মানুষ একজীবনে এত সম্পত্তি করতে পারে, এটা নিজের চোখে না দেখলে আমি বিশ্বাসই করতে পারতাম না।

...হ্যাঁ, আমি প্রায় এক বছর বর্মাতে ছিলাম। তপেশদের রেঙ্গুনের সেই বাড়ি, বলতে গেলে একটা প্যালেস। এই ব্রাবোর্ণ রোডের বাড়িগুলি ধীরাজকাকার সেই মার্বেলের ধীরার তুলনায় কুঁড়েঘর বললেই চলে।

—কি আদরেই না ছিলাম। একটা গাড়ি শুধু আমার ব্যবহারের জন্যেই ছেড়ে দিয়েছিলেন ধীরাজকাকা। এই তপেশ আর আমি সেই গাড়িতে দিনরাত যথা ইচ্ছা তথা ঘুরে বেড়িয়েছি। কত শিকার, কত পিকনিক। ঠিক সূর্যাস্ত হতে শুরু করেছে, অমনি শাম্পান নিয়ে ইরাবতীর জলে ভেসে পড়েছি, আমি আর তপেশ। তপেশটা তখন স্কুলে পড়ে, আমার চেয়ে কম করেও বার-তের বছর ছোট হবে তপেশ। আমি এখন চল্লিশ, তার মানে তপেশ এখন সাতাশ-আটাশ।

...এক মেম বুড়ি তপেশের গবর্ণেস ছিল। তপেশের মা তো বলতে গেলে তপেশের জন্মের এক বছর যেতে না যেতেই মারা গিয়েছিলেন। ওঃ, আমার ওপর গবর্ণেস বুড়ির সে কী রাগ। আমার সঙ্গে দিন রাত ঘোরাঘুরি করে তপেশের পড়া নষ্ট হচ্ছে, বুড়ি আমাকে ধমক দিয়ে বার বার কথা শোনাতো।

...কিন্তু সেই বছরেই পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছিল তপেশ। পড়াশোনায় তপেশের ঝোঁক বরাবরই ছিল। ইংলিশে অনার্স নিয়ে এম-এ'তে ফার্স্টক্লাস পেয়েছে, এ খবর বার্মা ট্রিবিউনে আমি দেখেছি। এই তো পাঁচ বছর আগের কথা।

...তা ছাড়া, কি চমৎকার ছবি আঁকতো সেই ছেলে বয়সেই। আমি বলতাম, তুমি ভবিষ্যতে দ্বিতীয় বতিচেলি হবে তপেশ। সত্যি, সুন্দর একটি ভেনাস এঁকেছিল তপেশ।

—ভেরি ব্লেসেড, অত্যন্ত ফরচুনেট, এবং ট্যালেন্টেড আমার এই তপেশ ভাইটি। ধীরাজকাকার এত বড় সম্পত্তি পেয়েছে যে ছেলে...ঐ দেখুন...সে ছেলে মুখ তুলে তাকাতেও লজ্জা পাচ্ছে।

সত্যি, হঠাৎ মাথা হেঁট করে ফেলেছিল তপেশ। এবং চোখ দুটোও যেন হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল।

চা-এর আসরের একটি চেয়ার থেকে উঠে এসে এক মহিলা তপেশের কাছে দাঁড়ান।

চেঁচিয়ে ওঠেন রজনীদা—ইনি তোমার আশা বউদি, তপেশ।

ব্যস্তভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে মাথা ঝুঁকিয়ে, আশা বউদির পা ছুঁয়ে প্রণাম করে ফেলে তপেশ।

আশা বউদি চমকে ওঠেন—একি কাণ্ড! একি কাণ্ড! আমাকে আবার পা ছুঁয়ে প্রণাম কেন?

দেখতে পায় তপেশ, আশা বউদির পিছনে একটি তরুণীও দাঁড়িয়ে আছে। খুবই সুশ্রী এবং খুবই সুসজ্জিতা এক তরুণী।

আশা বউদি বলেন—আমাদের মন্দাকিনী আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চায়।

মন্দাকিনী এগিয়ে এসে নমস্কার জানিয়ে হেসে ওঠে।—রজনীবাবু যে অদ্ভুত স্টোরি বললেন, তারপর আপনার সঙ্গে আলাপ না করে থাকতে পারলাম না, মাপ করবেন।

প্রতি-নমস্কার জানিয়ে হাসতে চেষ্টা করে তপেশ।—হ্যাঁ, শুনতে যতটা অদ্ভুত বলে মনে হয়েছে, আসলে কিন্তু...।

চেঁচিয়ে ওঠেন রজনীদা—কি? কি বলছে তপেশ? খুব বিনয় করছে বুঝি?

আশা বউদি উত্তর দেন—হ্যাঁ, তপেশ ঠাকুরপো মন্দাকিনীর সঙ্গে এরই মধ্যে ভণ্ডামি সুরু করে দিয়েছেন।

তপেশ বিব্রতভাবে বলে—না না, বিশ্বাস করুন বউদি, আমি সত্যিই ভণ্ডামি করছি না।

মন্দাকিনী—যাক্, আশাদির কথা যেতে দিন। আমি তো সত্যিই আপনাকে কিছু বলিনি। আমি এসেছি বর্মার গল্প শুনতে।

তপেশ—বর্মা খুবই সুন্দর জায়গা।

মন্দাকিনী খিলখিল করে হেসে ওঠে—বাস্ এতেই বর্মার গল্প হয়ে গেল?

তপেশ—আমার কাছে একখানা বই আছে, দি গ্লোরি দ্যাট ওয়াজ বার্মা। পড়লেই বুঝতে পারবেন।

মন্দাকিনী—বই পড়ে কিচ্ছু বুঝবো না।

তপেশ—কেন? আপনি কি ইংরেজী বই পড়তে...।

হেসে ওঠেন আশা বউদি—মন্দাকিনীকে দেখে কি মনে হয় তপেশ ঠাকুরপো? ইংরেজী জানে না? একটা মুখ্‌খু হাবা-গোবা মেয়ে?

চা-এর আসরের আর-এক চেয়ার থেকে এক প্রৌঢ়া মহিলা এদিকে মুখ ফিরিয়ে হেসে ওঠেন—আমার মন্দাকিনীও ইংলিশে অনার্স।

মন্দাকিনী বলে—ভয় পাবেন না তপেশবাবু, এখনি আপনার কাছে বর্মার গল্প শুনতে চাই না। কিন্তু একদিন শুনতে চাই।

তপেশ—কবে শুনবেন বলুন।

মন্দাকিনী—কাল। আমাদের বাড়িতে, সকালবেলা। চা খেয়ে আসবেন।

তপেশ—বেশ।

চা-এর আসর যখন ভাঙ্গে, মন্দাকিনী যখন আর একবার তপেশের মুখের দিকে তাকিয়ে চলে যায়, তখন তপেশের কাছে আবার এগিয়ে এসে রজনীদা বলেন। —তুমি কলকাতাতে নিশ্চয় কোন কাজে এসেছ, তপেশ?

তপেশ—হ্যাঁ রজনীদা, একটা কাজের জন্যেই এসেছি।

রজনীদা—কতদিন থাকতে হবে মনে করছো?

তপেশ—ঠিক বুঝতে পারছি না।

রজনীদা—বেশ তো। ততদিন তুমি আমার এখানেই থাকবে। খবরদার, হোটেল-ফোটেলের কথা মুখে আনবে না।

অ্যাডভোকেট রজনীদা, ব্র্যাবোর্ণ রোডে তাঁর এই চমৎকার বাড়ির একটি চমৎকার ঘরের ভিতরে চুপ করে একটা চেয়ারের উপরে বসে থাকে তপেশ, যদিও রাত বারটা পার হয়ে গিয়েছে।

ঘুম আসে না। চোখ দুটোর ক্লান্তি যেন ভয় পেয়ে আর্তনাদ করছে। কি ভয়ানক ভুল ধারণা করেছেন রজনীদা! আজকের এই তপেশের জীবনটা সেই তপেশের জীবনই নয়। রেঙ্গুনের বিখ্যাত মার্চেন্ট ধীরাজ বোসের সেই বিপুল সম্পত্তির একটা ছিটেফোঁটাও যে আজ আর নেই। যুদ্ধের সময় সবই লণ্ডভণ্ড হয়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। মার্বেলের সেই ধীরাজ বোমার বিস্ফোরণের উৎসব সহ্য করতে গিয়ে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। বিপুল সম্পত্তির বিনাশ নিজের চোখে দেখে নিয়ে হার্ট ফেল করে ইহজগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন মার্চেন্ট ধীরাজ বোস। জানেন না, কল্পনাও করতে পারছেন না রজনীদা, রেঙ্গুনের স্কুল মাস্টার তপেশ বোস আজ একটা ভাল চাকরির চেষ্টায় কলকাতায় এসেছে। রজনীদা নিশ্চয় এই চাকরি-সন্ধানী চেষ্টায় তপেশকে কিছু সাহায্য করতে পারবেন, শুধু এই একটি আশা নিয়ে এখানে এসেছে তপেশ।

কিন্তু রজনীদা যে ভুল করে চা-এর আসরের এতগুলি মানুষের কাছে আজকের তপেশের ধূলিময় জীবনটাকে একেবারে একটা রত্নময় জীবন বলে রটনা করে দিলেন। কি ভয়ানক চমকে উঠবেন রজনীদা আর আশা বউদি, এবং বোধহয় এই মন্দাকিনীও, যখন শুনবেন যে তপেশ বোস আজ একটা চাকরিলোভী চেষ্টার মানুষ মাত্র!

লজ্জা পায় তপেশ এবং লজ্জাটা একটা দুঃসহ গ্লানির মতো বোধহয়। রজনীদার ভুল ধারণাকে সেই মুহূর্তে ভেঙে দিয়ে, চা-এর আসর থেকে উঠে গিয়ে আবার একটা সস্তার হোটেল খোঁজবার জন্য বের হয়ে পড়লেই তো হতো। নিজেরই উপর রাগ হয়। যেন ইচ্ছে করে নিজেকে ভীরু করে রেখেছিল তপেশ। মন্দাকিনী নামে একটা সুন্দর মেয়ের মুখের হাসির অভিনন্দন চোরের মতো লুট করবার লোভে চুপ করে বসে নিজের একটা মিথ্যা গৌরবের রটনাকে মুখর হয়ে উঠবার সুযোগ দিয়েছিল।

নিজেকে শান্ত করতে চেষ্টা করে তপেশ। যাক্, যা হবার হয়ে গিয়েছে, এখন চুপচাপ সরে যেতে হবে। রজনীদা জানবেন, তপেশ বোস আবার তার বর্মার ঐশ্বর্যের কাছে চলে গেল। থেকে যাক এদের মনের ভুল।

কিন্তু চেষ্টা করলেই মনের ভয় ভাঙতে পারা যায় না ; মনটাকে শান্ত হতে অনুরোধ করলেই শান্ত হয় না মন এবং মনের ভিতরে একটা গ্লানি পুষে রেখে ঘুমোতে চেষ্টা করলেও ঘুম আসতে পারে না।

ভোর হয়ে আসছে, তবুও ঘুম যখন এল না, তখন বরং একটু খুশি হয়ে এবং হাঁপ ছেড়ে

প্রস্তুত হয় তপেশ। আর এখানে নয়। রজনীদার গলার স্বর শোনামাত্র রজনীদার কাছে গিয়ে ব্যস্তভাবে বলতে হবে, চললাম রজনীদা। মাপ করবেন আশা বউদি, আর এক ঘন্টাও থাকবার উপায় নেই।

রজনীদা হয়তো আশ্চর্য হয়ে বলবেন—সে কি? এবং আশা বউদি একটু দুঃখিত হয়ে বলবেন--একি কাণ্ড! কিন্তু মনটাকে বেশ একটু শক্ত করে নিয়ে একটা মিথ্যে কথা বলে দিতে পারা যাবে না কি?—উপায় নেই, খুব জরুরী একটা কাজের কথা মনে পড়ে গিয়েছে। আজই বাই-এয়ার রেঙ্গুন চলে যেতে হবে।

পার্কের গাছের উপর সকালবেলার রোদ লুটিয়ে পড়েছে দেখা যায়। এবং রজনীদার গলার স্বরও শোনা যায়। লনের উপর ছুটোছুটি করে হাউণ্ডটার সঙ্গে বকাবকি করছেন রজনীদা।

ঘর ছেড়ে ব্যস্তভাবে রজনীদার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় তপেশ। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠেন রজনীদা।—সঞ্জয়বাবুর আরদালি দু'বার এসে তোমার খোঁজ নিয়ে গিয়েছে।

--সঞ্জয়বাবু কে?

—মন্দাকিনীর বাবা। ঐ যে, গেটের কাছে এক জোড়া ঝাউ দেখছো, ওটাই হলো সঞ্জয়বাবুর বাড়ি। খুব সজ্জন মানুষ।...তা ছাড়া, মন্দাকিনীও। খুব স্টাইল করে, বেশি কথা বলে, কিন্তু তা বলে মনে করো না যে, মেয়েটা একটা হাল্কা স্বভাবের মানুষ। ওরে বাবা! আমিই তো জানি! এক ছোকরা উকীল মাসে হাজার টাকাও রোজগার করে না, সেটাও দুঃসাহস করে মন্দাকিনীর গা ঘেঁষতে চেষ্টা করেছিল। মন্দাকিনী ওকে শুধু মারতে বাকি রেখেছিল।

তপেশ--কিন্তু আরদালি আমার খোঁজ নিতে আসে কেন?

রজনীদা—কি আশ্চর্য, আজ সকালে মন্দাকিনীদের বাড়িতে তোমার যে চা-এর নেমন্তন্ন, সেটা এরই মধ্যে ভুলে গেলে?

তপেশ--কিন্তু আপনার কাছে আমার যে একটা জরুরী কথা বলবার ছিল।

রজনীদা—বেশ তো, আগে মন্দাকিনীদের বাড়ির চা-এর নেমন্তন্নটা সেরে এস। তারপর, দুপুরে দুজনে বসে বসে অনেক জরুরী কথা আলোচনা করা যাবে। আজ আমি আর কোর্টে যাব না।

বর্মার অনেক গল্প শোনে মন্দাকিনী। শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে যায়। তপেশ হাসে--কি আশ্চর্য, এই সব সাধারণ গল্প আপনার এত ভাল লাগে?

মন্দাকিনী—কেন এত ভাল লাগছে, বুঝতে পারছেন না?

তপেশ—না।

মন্দাকিনী—আপনি বলছেন বলে।

করুণ হয়ে ওঠে তপেশের মুখ। মন্দাকিনী বলে—আপনি যদি অকপট হন, তবে একথা স্বীকার করবেন।

তপেশ—কি বললেন?

মন্দাকিনী—আমিও জিজ্ঞাসা করছি। আমার কাছে গল্প বলতে কি আপনার একটুও ভাল লাগছে না?

তপেশ—ভাল লাগছে বৈকি।

মন্দাকিনী—জীবনে আর কোন মেয়ে আপনার কাছে আমার মতো এত আগ্রহ করে গল্প শুনে মুগ্ধ হয়েছে?

তপেশ—গল্পই কেউ শোনেনি, মুগ্ধ হওয়া তো দূরের কথা।

মন্দাকিনী—আর কেউ এসে আপনার গল্প শুনুক, এই কি আপনার ইচ্ছা?

তপেশ—মোটেই না। আপনি অকারণে আমাকে সন্দেহ করছেন।

মন্দাকিনী—আপনি কি মনে করেন, আর কারও কাছে গল্প বলতে আপনার ভাল লাগবে?

তপেশ—মনে হয় না।

মন্দাকিনী—তবে?

তপেশ—কি বলছেন?

মন্দাকিনী—বলছি না কিছু, দেখছি।

তপেশের বুক শিউরে ওঠে।—কি দেখছেন?

মন্দাকিনী—কি সুন্দর আপনার মুখটা!

তপেশ—আপনি এ কথা বলেন কেন?

মন্দাকিনী—কেন?

তপেশ—আপনি কি কিছু কম সুন্দর?

মন্দাকিনী—সত্যি করে বলুন?

তপেশ—কি?

মন্দাকিনী—আমাকে সুন্দর বলে মনে হচ্ছে আপনার?

তপেশ—নিশ্চয়।

তপেশের আরও কাছে এগিয়ে এসে তপেশের মুখের দিকে তাকায় মন্দাকিনী।—আমাকে খুব নির্লজ্জ বলে মনে হচ্ছে?

তপেশ—একটুও না।

মন্দাকিনী—তবে?

তপেশ—কি বললেন?

মন্দাকিনী—কিছু বলছি না, চাইছি।

দু'চোখ বন্ধ করে তপেশের মুখের কাছে কপালটাকে পেতে দেয় মন্দাকিনী।

—মন্দাকিনী! আর্তনাদ করে উঠে দাঁড়ায় তপেশ।

আশ্চর্য হয়ে, এবং ব্যথিতভাবে তাকিয়ে থাকে মন্দাকিনী—কি হলো তপেশবাবু? আমার বেহায়াপনা দেখে ভয় পেয়ে গেলেন?

তপেশ—আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

মন্দাকিনী—কিছু বুঝতে পারছেন না?

তপেশ—একদিনের আলাপে, এত তাড়াতাড়ি কেউ কাউকে ভালবেসে ফেলতে পারে?

মন্দাকিনী—আপনার মতো মানুষকে আমার মতো মেয়ে হলে পারে।

তপেশ—কিন্তু আমি যে কি মানুষ, সেটা যে তুমি এখনও জানতে পারনি।

মন্দাকিনী—তার মানে?

তপেশ—রজীনাদার গল্প শুনে যা মনে করেছ, আমি তা নই।

মন্দাকিনী হাসে—তার মানে, আপনি আরও বড়-মানুষ?

তপেশ—আমি কিছু না।

মন্দাকিনী—বিনয় করছেন?

তপেশ—একটুও না। আমি মিথ্যেবাদী নই, অন্তত তোমার কাছে মিথ্যেবাদী হতে পারবো না।

মন্দাকিনী আবার হাসে—কেন? আমাকে ভাল লেগেছে বলে?

তপেশ—হ্যাঁ।

মন্দাকিনী—তবে বলুন, শুনি আপনার সত্যি কথা।

তপেশ—আমি এখন রেঙ্গুনের স্কুলমাস্টার। বাবার বিপুল সম্পত্তির কিছুই আমি পাইনি। সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আমি চাকরির চেষ্টায় কলকাতায় এসেছি। রজনীদা এখনও সেটা কল্পনা করতে পারছেন না।

তপেশের মুখের দিকে তাকিয়ে মন্দাকিনীর সুন্দর চোখের তারা দুটো জ্বলতে থাকে। চোখের দৃষ্টিটাও যেন রুষ্ট আগুনের শিখার মতো তপেশের প্রাণের উপর জ্বালা ছুঁড়ে তপেশকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চায়। সঞ্জয়বাবুর মেয়ে মন্দাকিনীর দুই ঠোঁটের পিপাসার গৌরব একটা কপট গৌরবের ছোঁয়া চাইতে গিয়ে যেন দুঃসহ লজ্জায় শিউরে উঠেছে।

—আমাকে ক্ষমা করবেন। আতঙ্কিতের মতো তাকিয়ে আস্তে আস্তে বিড়বিড় করে তপেশ।

মন্দাকিনী—কেন ক্ষমা করবো বলুন?

তপেশ—যে-কথা আপনাকে প্রথমেই বলে দেওয়া উচিত ছিল, সে কথা পরে বলেছি।

মন্দাকিনী—পরেই বা বললেন কেন?

হঠাৎ মাথা হেঁট করে ফুঁপিয়ে ওঠে সঞ্জয়বাবুর মেয়ে মন্দাকিনী। রুমাল দিয়ে চোখ মুছে নিয়ে তপেশের মুখের দিকে তাকায়।—না বললেই ভাল করতেন।

তপেশ—আচ্ছা, আমি এবার চলি।

মন্দাকিনী—কোথায় যাবেন?

তপেশ—দেখি, কোথায় যাই। তবে রজনীদাকে আর ঠকাবো না।

মন্দাকিনী—তার মানে?

তপেশ—রজনীদার বাড়িতে থাকবো না। আজই, এখনই চলে যাব।

মন্দাকিনী—আর বোধহয় কখনো এদিকে আসবেন না?

তপেশ—না।

মন্দাকিনী—না আসাই ভাল। আমার, কাছে প্রতিজ্ঞা করুন, আর এদিকে আসবেন না?

তপেশ—প্রতিজ্ঞা করছি।

মন্দাকিনী—কিন্তু...।

তপেশ—বলুন।

মন্দাকিনী—আমাকে একটু সম্মান দিয়ে যান।

আবার চোখ বন্ধ করে তপেশের কাছে কপালটাকে পেতে দিয়ে মন্দাকিনী বলে—চিরকালের মতই চলে যাচ্ছেন যখন, তখন আর আপনাকে ভয় কিসের?

ব্র্যাবোর্ণ রোডের উপর দিয়ে একটা শোভাযাত্রার বাজনার শব্দ নাচতে নাচতে চলে যায়। কপাল আর ঠোঁট রুমাল দিয়ে মুছে নিয়েই মন্দাকিনী বলে—আচ্ছা।

ঘর থেকে বের হয়ে পথের শোভাযাত্রার সঙ্গে মিশে যায় তপেশ।

ক্যাকটাস

মিস্টার নাগের বাগান পাহারা দেবার জন্যে শুধু একজন দারোয়ান আছে। দিনের বেলায় পাহারা দেবার কোন দরকার হয় না। সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত স্বয়ং মিস্টার নাগই পাহারা দেন। মাঝে মাঝে অবশ্য বার কয়েক বাড়ির ভিতরে যাবার দরকার হয়, স্নান ও আহারের তাগিদ স্বীকার করতে হয়। সেই কয়েকবার বাগানের উপর চোখ রাখে ড্রাইভার

শীতল সিং। দুপুরে এক ঘন্টার জন্য আর সন্ধ্যার একঘন্টার জন্য। দিনের বাকী সময় বাড়ির বারান্দায় আরাম-চেয়ারে প্রৌঢ় দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে বাগানের উপর সতর্ক চক্ষুর দৃষ্টি ছড়িয়ে বসে থাকেন মিস্টার নাগ। মাঝে মাঝে অবশ্য হাতের বই-এর উপর চোখ বোলান। কিন্তু সেই দৃষ্টি যেন তাঁর বড়-বড় সতর্ক চক্ষুর ক্ষণিক বিরাম। বই-এর দিকে তাকান বটে, কিন্তু বই পড়তে পারেন বলে মনে হয় না।

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় রাত দশটার সময় উপস্থিত হয় দলবীর। মিস্টার নাগের বাগানের ফুল আর লতা-পাতা পাহারা দেয়, রাত দশটা থেকে শুরু করে সকাল সাতটা পর্যন্ত।

মিস্টার নাগের বাগান যেন উদ্ভিজ্জ বৈচিত্র্যের একটা সমারোহ। বিচিত্র ফুল, বিচিত্র ফল আর বিচিত্র লতা-পাতা। মিস্টার নাগের বাগানের এমন ফার্ণ কাশ্মীরের শালিমার বাগ ছাড়া আর কোথাও নেই। এই বাগানে এমন ফলের গাছ আছে, যে ফল দেখতে ফুলেরই মতো। এমন ফুল আছে, যেটা সত্যি ফুল নয়, ফল।

আলপাইন ফ্লোরা বড় ভালবাসেন মিস্টার নাগ। উদ্ভিদ-প্রেমিক মিস্টার নাগের বাগানের জুলিপারাস ক্যাসিওপি আর রডোডেনড্রন দেখবার জন্য মাঝে মাঝে বিদেশী টুরিস্টরাও এসে ভীড় করেন।

কলকাতার মাটিতে ভায়োলেট আর ডেজি ভাল ফুটতে পারে না কে বলে? মাঘ মাসের কোন সকাল বেলায় মিস্টার নাগের এই বাড়ির বারান্দায় দাঁড়ালেই বাগানের ভায়োলেট আর ডেজির শিশিরভেজা শোভা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যাবে।

হুইটম্যানের কবিতার বই হাতে নিয়ে বিড়বিড় করে যখন আবৃত্তি করেন মিস্টার নাগ— হোয়েন লাইল্যাক্স লাস্ট ইন দি ডোরইয়ার্ড ব্লুমড, তখন সঙ্গে সঙ্গে চোখ টান করে সোজা দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে বাগানের ফুটন্ত লাইল্যাকের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

কত টাকা খরচ করেছেন মিস্টার নাগ? অনেকেই জানেন, মিস্টার নাগ তাঁর জজিয়তী জীবনের উপার্জিত সব টাকা এই বাগানের ঐশ্বর্য আর বৈচিত্র্যের প্রতিষ্ঠায় খরচ করে দিয়েছেন। এখনও পেন্সন বলতে যা পান, তার অর্ধেকেরও বেশি এই বাগানের সেবা ও যত্নের কাজে খরচ করে থাকেন। দারা-সুত-পরিবার বলতে কেউ নেই মিস্টার নাগের ; এই বাগানটাই তাঁর ভালবাসার সংসার।

আফ্রিকান টিউলিপ ফুটেছে। ফুলের সেই রক্তিম রূপের স্তবকের দিকে তাকিয়ে মিস্টার নাগের চোখে অদ্ভুত স্নেহাক্ত দৃষ্টি উথলে ওঠে, যেন নবজাতক সন্তানের মুখ দেখছেন মিস্টার নাগ।

বাগানটাকে বড় ভালবাসেন মিস্টার নাগ, তাই বড় বেশি উদ্বেগও তাঁকে সহ্য করতে হয়। পাখির উপদ্রব আছে, কাঠবেড়ালীর নষ্টামি আছে, তা ছাড়া চোর মানুষের উঁকিঝুঁকিও আছে। কিন্তু দলবীরের মতো কঠোর দারোয়ানও আছে, যে-জন্য শত উদ্বেগের মধ্যেও কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারেন মিস্টার নাগ!

হাতের কাছে একটা এয়ার গান রাখেন মিস্টার নাগ! দামাস্কা গোলাপের কাছে এসে দুটো দোয়েল লাফালাফি করতেই এয়ারগান তুলে শব্দের ধমক ছাড়েন। উড়ে যায় দোয়েল দুটো। তারপর একটু প্রসন্ন ও প্রশান্ত চোখে হাতের বই-এর উপর চোখ বোলাতে থাকেন।

রাতের পাহারার জন্য মিস্টার নাগের মনে বিশেষ কোন উদ্বেগ নেই। দলবীরের চোখ দুটো যেন শিকারী বেড়ালের চোখ, রাতের অন্ধকারেও দেখতে পায়। তা ছাড়া দলবীরের হাতে প্রকাণ্ড একটা বিজলী টর্চও থাকে। বাগানের কোথাও খচমচ করে একটা শব্দ বেজে উঠলেই টর্চের আলো ছুঁড়ে এগিয়ে যায় দলবীর। রাতের পেঁচা ভয় পেয়ে আর চোখ বন্ধ করে গাছের ডালে বসে ছটফট করে। একটা ঢিল মেরে পেঁচাটাকে উড়িয়ে দেয় দলবীর।

প্রত্যেক বছর শীতের কালে মিস্টার নাগের মন একটু বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। হিমালয়ের

একটা নতুন জাতের অর্কিড কলকাতার মাটিতে শীতের কালেই কেন যেন নেতিয়ে শুকিয়ে মরে যেতে চায়। রহস্যটা ধরতে পারেন না মিস্টার নাগ। তা ছাড়া আরও সমস্যা দেখা দেয়। চেনার গাছের সবুজ পাতা শীতের ছোঁয়া পেলেই লাল আগুনের রং ধরে জ্বলজ্বল করবে, অনেক আশা করেছিলেন মিস্টার নাগ। কিন্তু চেনারের পাতার সবুজ যেন মরা বাঁশ পাতার মতো ফ্যাকাশে হয়ে যায়। অনেক রকম সারের পাউডার গাছের গোড়ায় ঢেলে দিয়েও কোন সুফল হয় না।

এইবারের শীতে আরও একটা উদ্বেগের ভার সহ্য করেছেন মিস্টার নাগ। অনেক চেষ্টা করে এবং অনেক টাকা খরচ করে আরিজোনার ক্যাকটাসের চারা এনে তাঁর বাগানের মাটিতে লাগিয়েছেন। কোথায় আরিজোনার মরুভূমি, আর কোথায় আলিপুর। সুদূর আরিজোনা মরুর দগ্ধ বালুকার বুকে বিচিত্র রহস্যের জাদুতে যে সরস ক্যাকটাস ঊর্ধ্ববাহু ঋষির মতো দাঁড়িয়ে থাকে, সেই ক্যাকটাসকে আলিপুরের স্যাঁতসেঁতে মাটিতে পুষে রাখতে চান মিস্টার নাগ। প্রথমে দুরাশা বলে মনে হলেও মিস্টার নাগ এখন মনে করেন, নিতান্ত দুরাশা নয়। এই মাসের শীতটা যদি সহ্য করে পার করে দিতে পারে আরিজোনার এই ক্যাকটাস, তবে ফাঁড়া কেটে যাবে। মিস্টার নাগের দুরাশা সত্য হয়ে উঠবে। বেঁচে যাবে গাছটা। মিস্টার নাগের বাগান একটা দুর্লভ ঐশ্বর্যের গৌরব লাভ করবে।

পাঁচ গজ ব্লেজার ফ্ল্যানেল কিনে আনতে হয়েছে। ফ্ল্যানেলের একটা ঘেরাটোপ দিয়ে ক্যাকটাসের শীতশিহরিত শরীরটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। মরুভূমির জ্বালাময় রোদের আদরে বড় হয়ে ওঠে আর বেঁচে থাকে যে ক্যাকটাস, সে এই মাঘী শীতের একটা রাতের ঠাণ্ডায় আদুড় হয়ে পড়ে থাকলে নির্ঘাৎ মরে যাবে।

সন্ধ্যা হলে নিজেই একবার ক্যাকটাসের কাছে এগিয়ে আসেন মিস্টার নাগ। রাত দশটা হলে আর একবার এসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন, ফ্ল্যানেলের জ্যাকেটে কোন ফাঁক আছে কিনা। ক্যাকটাসের গায়ে ঠাণ্ডা লাগছে না তো?

নিশ্চিন্ত হবার পর চলে যান মিস্টার নাগ। তার পরেই দারোয়ান দলবীরের পাহারা।

রাতের বাগান পাহারা দেয় দলবীর। দলবীরের গায়ে মোটা একটা তুলোর জামা হাঁটু পর্যন্ত ঝোলে। মাথায় কম্বলের টুপি। হাতে টর্চ আর লাঠি। খাকি জিনের পটি জড়ানো পায়ে বুট জুতো। খট-খট মচ-মচ শব্দ করে পা ঠুকে ঠুকে ঘুরে বেড়ায় দলবীর। মাঝে মাঝে মাটির উপর লাঠি ঠোকে।

চল্লিশ টাকা মাইনে পায় দলবীর। বেহালার এক বস্তিতে একটা ঘর ভাড়া নিয়েছে, যেখানে দিনের বেলার জীবন যাপন করে দলবীর। ঘরের ভাড়া দিতে হয় মাসে আট টাকা। বাড়িতে পাঠাতে হয় পনর টাকা।

দার্জিলিং জেলার এক পাহাড়ী গাঁয়ের মানুষ দলবীর আজ দু'বছর হলো মিস্টার নাগের এই বাগানের পাহারার কাজ নিয়েছে। বিশ-বাইশ বছরের বেশি বয়স হবে না। বেঁটেখাটো গাঁট্টা-সাট্টা মজবুত চেহারার ছোকরা, এই দলবীরের ছোট ছোট চোখের কুতকুতে হাসি দেখতে যেমন অদ্ভুত, তেমনি অদ্ভুত ওর ঐ ছোট চোখের ধকধকে রাগ। রাতের কাঠবিড়ালীর ছুটোছুটি দেখে কুতকুতে হাসি হাসে আর আস্তে আস্তে লাঠি ঠোকে। কিন্তু একটা খেঁকি কুকুরকে বাগানের ভিতরে দেখতে পেলেই দলবীরের ছোট ছোট চোখ হঠাৎ রেগে গিয়ে ধকধক করে। খেঁকি কুকুরটাকে লক্ষ্য করে প্রচণ্ড জোরে লাঠি ছোঁড়ে দলবীর। আবার লাঠি কুড়িয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে বাগান পাহারা দিয়ে ঘুরতে থাকে।

এ হেন দলবীরের মনেও একটা উদ্বেগ আছে। দূরে দার্জিলিং-এর এক পাহাড়ী গাঁয়ের ঘরে এখন এই শীতের রাতে ঠক্-ঠক্ করে কাঁপছে না তো দলবীরের মা বুড়ি? আগুন আছে

তো ঘরে? কয়লা কেনবার জন্য, আগুন পোহাবার কাঠ কেনবার জন্য মা বুড়ির নামে গত মাসে পাঁচটা টাকা বেশি পাঠিয়েছে দলবীর। কিন্তু মা-এর চিঠিতে দাবি ছিল, এ মাসে যেন দশটা টাকা বেশি পাঠানো হয়। একটা কম্বল দরকার হয়ে পড়েছে মা বুড়ির।

মাত্র পাঁচ টাকা বেশি পেয়ে নিশ্চয় রাগ করেছে মা বুড়ি। কম্বল কিনতে পারেনি নিশ্চয়। কাঠের আগুন পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ; তবে কি এখন ঘরের ভিতরে হিমেল রাতের ঠাণ্ডায় ঠক ঠক করে কাঁপছে আর ঘুমোতে পারছে না মা বুড়ি? ঠিকই তো, একটা কম্বল গায়ে জড়াতে না পারলে ঘুমই বা কি করে হয়? কিন্তু টাকা চাইলেই টাকা আসে না। এটুকু বোঝে না কেন বুড়ি?

রাগ করে জোরে জোরে হাঁটতে থাকে দলবীর। মাটির উপর জোরে জোরে লাঠি ঠোকে।—হেই, খবরদার! বাগানের পাঁচিলের দিকে তাকিয়ে একটা গর্জন ছাড়ে দলবীর।

এটাও দলবীরের এই বছরের শীতের রাতের জীবনের একটা নতুন উদ্বেগ। লোকের বাগানে ঢুকে লাউ-কুমড়োর লতা-পাতা পটপট করে ছিঁড়ে নিয়ে পালিয়ে যায়, না বলে-কয়ে লোকের পুকুরে নেমে শাপলা তোলে, আর জলার আশেপাশে ঘুরঘুর করে কচুর ডাঁটা ভাঙ্গে যে বুড়িটা, সেই বুড়িটা মিস্টার নাগের এই বাগানে উঁকি দিয়েছে।

গর্জন করেই শাক-বুড়ির মুখের উপর টর্চের আলো ছোঁড়ে দলবীর। বুড়িটা টুপ করে মাথা নামিয়ে নেয়, আর পাঁচিলের কাছ থেকে হনহন করে হেঁটে, প্রায় একটা দৌড় দিয়ে পালিয়ে যায়।

বাগানের ফটকের গেট বন্ধ থাকে। ফটক দিয়ে কোন চোরের পক্ষে ভেতরে ঢোকবার সাধ্যি নেই। শাক-বুড়িটাও ফটকের কাছে এসে উঁকি-ঝুঁকি দেয় না। চার-পাঁচটা থান ইঁট নিয়ে এসে পাঁচিলের গায়ের সঙ্গে থাক দিয়ে পর-পর উঁচু করে সাজায়। তার পরে সেই ইটের টিপির উপর উঠে পাঁচিল টপকাবার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না, দলবীরের সতর্ক চক্ষুর দৃষ্টি আর কঠোর পাহারার গর্জনের জন্যেই পারে না। রোজই সকালে পাঁচিলের বাইরে গায়ের সঙ্গে লাগানো ইঁটের টিপিটাকে ভেঙে ইঁটগুলিকে তুলে নিয়ে আসে দলবীর। শাক-বুড়ি বুড়ি হলে হবে কি? ভয়ানক চতুর চোর, আর বেশ মজবুত চোর।

বেশ জেদী চোরও বটে। দলবীরের গর্জন শুনে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলেও পরের রাতে আবার ঠিক এসে পাঁচিলের উপর দিয়ে মুখ তুলে বাগানের ভিতরে তাকায়।

রাতের বেলা চুপ করে পালিয়ে যায় বটে শাক-বুড়ি, কিন্তু দিনের বেলা একেবারে মুখর হয়ে প্রতিশোধ তোলে।

দুপুরবেলা, বেহালার বস্তির সেই ঘরের দরজার কাছে বসে যখন বিড়ি টানে দলবীর, ঠিক তখনই শাক-বুড়িটা কোথা থেকে এসে দলবীরের ঘরের দরজার কাছ দিয়েই গালি দিতে দিতে চলে যায়। মুখপোড়া, রেতের ছুঁচো, প্রেতের বেটা প্রেত, রাত জেগে তোর কোন্ বাপের মাথা পাহারা দিস রে হতভাগা!

তুমকো হাড্ডি তোড় দেগা, চোট্টা বুড্ঢি! রাগ করে চেঁচিয়ে আর লাঠি হাতে নিয়ে শাক-বুড়ির দিকে তেড়ে যায় দলবীর। বস্তির লোকেরা হাঁ হাঁ করে ওঠে।—কর কি দলবীর? ও বুড়ির কথার রাগ করে লাভ নেই। বড় ভয়নাক বুড়ি! ওকে মেরে ফেললেও গালি দিতে ছাড়বে না।

লোকের কথায় আর অনুরোধে রাগ সামলে নেয় দলবীর।

এই চোর শাক-বুড়ির উপদ্রবের জন্য রাতের পাহারার মধ্যে একটা মিনিটও নিশ্চন্ত হতে পারে না দলবীর। কে জানে কখন কোন্ ফাঁকে পাঁচিল টপকে বাগানের ভিতরে ঢুকে পড়বে আর কোন্ ফল, কোন্ ফুল বা লতা উপড়ে নিয়ে পালিয়ে যাবে? হয়তো সাহেবের হাজার

টাকার ক্ষতি হয়ে যাবে। রাগে দুঃখে পাগল হয়ে যাবেন সাহেব, আর বোধহয় দলবীরকেও ক্ষমা করতে পারবেন না। দলবীরের চাকরি খতম হয়ে যাবে।

মচ মচ খট খট জুতোর শব্দ বাজিয়ে আর লাঠি ঠুকে ঠুকে ঘুরতে থাকে দলবীর। মাঝে মাঝে পাঁচিলের উপর টর্চের আলো ছুঁড়ে দেখতে থাকে, যদিও আজ আর টর্চের আলো ছোঁড়বার খুব বেশি দরকার হয় না। ছোট একটা চাঁদ ভাসছে আকাশে, কুয়াশা আর চাঁদের আলো এক সঙ্গে গলে গিয়ে বাগানের উপর লুটিয়ে পড়েছে।

মনে হচ্ছে, চোর শাক-বুড়িটা আজ আর আসবে না। তবু সাবধান থাকে দলবীর। শাক-বুড়ি বড় চোর। এক মিনিটের জন্য দলবীর আনমনা হয়ে পড়লে, হয়তো সেই সুযোগে বাগানের ভিতর ঢুকে পড়বে আর লতাপাতা ছিঁড়ে নিয়ে পালিয়ে যাবে শাক-বুড়ি।

ঘুরে ঘুরে পাহারা দেয় দলবীর। আর মাঝে মাঝে মা বুড়ির কথা মনে পড়ে। সত্যিই কি এই শীতে একটা কম্বলের অভাবে ঠক ঠক করে কাঁপছে মা বুড়ি? কারও কাছ থেকে পাঁচটা টাকা দার নিয়ে কম্বলটা কিনে ফেললেই তো হয়! মা বুড়ির এতটুকু বুদ্ধিও নেই, পারে শুধু ছেলের উপর রাগ করতে।

চমকে ওঠে দলবীর। সত্যিই মা বুড়ির কথা ভাবতে গিয়ে আনমনা হয়ে গিয়েছিল দলবীর আর সেই সুযোগে চোর শাক-বুড়ি পাঁচিল টপকে বাগানের ভিতরে ঢুকে পড়েছে! ঐ তো একটু চতুর ছায়ার মতো বাগানের আরও ভিতরের দিকে এগিয়ে চলেছে বুড়ি।

এতদিনে সুযোগ পেয়েছে দলবীর। চোর শাক-বুড়ির গালি-গালাজের সেই ভয়ানক মুখরতার শোধ তুলবে দলবীর। বুড়ির গলা টিপে ধরে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে টেনে নিয়ে এসে হাঁক দিয়ে সাহেবকে ডাকতে হবে আর পুলিস আসবার পর বুড়িকে পুলিসের হাতের কাছে একটা ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিতে হবে।

আস্তে আস্তে পা টিপে-টিপে শিকারী বেড়ালের মতো যেন একটা চতুর ইঁদুরকে ধরবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে দলবীর। ছোট ছোট কুতকুতে চোখে রাগের জ্বালা ধক-ধক করে।

থমকে দাঁড়ায় দলবীর। চোখ কাঁপে দলবীরের, সেই সঙ্গে বুকটাও কাঁপে। এ কি করছে চোর শাক-বুড়ি!

ফুল ছিঁড়লো না. পাতা ছিঁড়লো না, একটা লতা ধরে টান দিলো না। কি চমৎকার সীম ধরেছে, সেই সীমের মাচার দিকে একবারও তাকাল না। মিস্টার নাগের স্বপ্নময় স্নেহে ও আদরে লালিত সেই ক্যাকটাসের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে শাক-বুড়ি।

বুড়ির শাড়ির আঁচলটা এই ফিকে চাঁদের আলোতেও বেশ ভাল করে দেখা যায়। বুড়ির গায়ে জড়ানো আঁচলের একটা ছেঁড়া হাঁ করে যেন ঠক ঠক করে কাঁপছে। রাতের কনকনে শীতে বুড়ির কাঁধটা খুঁকড়ে গিয়েছে।

ক্যাকটাসের গায়ের গরম ব্লেজার ফ্ল্যানেলের ঘেরাটোপের গায়ে হাত দেয় বুড়ি। একটা টান দিতেই ঝুলে পড়লো পাঁচ গজ ফ্ল্যানেলের টুকরোটা। কোন ব্যস্ততা নেই, আস্তে আস্তে বেশ আয়েস করে সেই ফ্ল্যানেলটা নিজের গায়ে জড়িয়ে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পাঁচিলের দিকে তাকায় বুড়ি।

গাছের আড়ালে চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে দলবীর। যেন কোন শব্দ না হয়, বুড়ি যেন একটুও টের না পায়, দলবীর দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ভয় করে দলবীরের, দলবীরের ছায়া দেখতে পেলে বুড়ি নিশ্চয় গরম কাপড়ের এতবড় টুকরোটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে পালিয়ে যাবে। নড়ে না দলবীর। দলবীরের লুকানো ছায়ার প্রায় গা ঘেঁষে চলে গেল শাক-বুড়ি।

কখন যে পাঁচিলটা টপকে চলে গিয়েছে বুড়ি, জানে না, লক্ষ্যও করেনি দলবীর। নগ্নদেহ

ক্যাকটাসের কাছে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে চুপ করে মহাভয়ে ভীরু অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

আর একবার চমকে ওঠে দলবীর। বাড়ির বারান্দায় আলো জ্বলে উঠেছে। ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছেন মিস্টার নাগ। সাহেবের সেই কঠোর আলোকিত মূর্তির দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে আর হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দলবীর।

এগিয়ে যান মিস্টার নাগ। বাগানের ভিতরে এসে নগ্নদেহ ক্যাকটাসের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপরেই দলবীরের সেই হতভম্ব ভীরু চেহারাটার দিকে তাকিয়ে গর্জন করেন।—তুম চোর হ্যায়।

—নেহি হুজুর। দলবীরের কুতকুতে চোখ ছলছল করে।

—চুপ! হাম সব দেখা হ্যায়। উপরতলার জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আমি সব দেখেছি।

নীরব হয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে দলবীর।

—ও বুড়ি তুমারা কোন্ হ্যায়? আবার গর্জন করেন মিস্টার নাগ।

—কোন্ বুড়ি হুজুর?

—যে বুড়িকে তুম ফ্ল্যানেল নিয়ে চলে যেতে দিলে।

—ও বুড়ি হামারা কোই নেহি হুজুর।

—ঝুট মত্ বোলো। আমার চোখ পঁচিশ বছরের পাকা জজের চোখ হ্যায়। আমি সব বুঝতে পেরেছি।

—আপ কেয়া সম্‌ঝা হুজুর?

—ও বুড়ি নিশ্চয় তুমারা মা হ্যায়।

—হ্যাঁ হুজুর। চেঁচিয়ে ওঠে দলবীর। ছোট ছোট কুতকুতে চোখে যেন একটা জ্বালা ধক ধক করতে থাকে।

—কিন্তু আজ রাতের শীতে আমার ক্যাকটাস যে মরে যাবে রে চোর।

—নেহি মরেগা হুজুর।

—চুপ। যাও, এখনি দৌড়ে গিয়ে আমার ক্যাকটাসের ফ্লানেল ফিরিয়ে নিয়ে এস।

—নেহি হুজুর।

—কেঁও নেহি? আমার ক্যাকটাসকে তুমি খুন করতে চাও?

—নেহি হুজুর। বলতে বলতে চট করে একটা টান দিয়ে নিজের গায়ের তুলোর জামাটা খুলে ফেলে দলবীর। আস্তে আস্তে, খুব সাবধানে, আদরে আর যত্নে বিচলিত অদ্ভুত আগ্রহ নিয়ে তুলোর জামা দিয়ে কচি ক্যাকটাসের গা ঢাকা দেয় দলবীর। তারপরই চেঁচিয়ে ওঠে দলবীর।—হাম আউর নোকরি নেহি করেগা, হুজুর।

—কিন্তু তুম তো চোর হ্যায়! তোমার সাজা দরকার। চেঁচিয়ে ওঠেন প্রাক্তন জজ ও বর্তমান উদ্ভিদ-প্রেমিক মিস্টার নাগ।

দলবীরও চেঁচিয়ে ওঠে—বহুৎ ঠিক হ্যায়, পুলিস বোলাইয়ে হুজুর।

কুটিলপন্থ

এই শহরের অনেকের চিন্তায় একটা বিস্ময়ের প্রশ্ন প্রায়ই দেখা দিয়ে থাকে। দশজন ভদ্রলোক কোন উপলক্ষে একঠাঁই হলেই তাঁদের কথার মধ্যে কথায় কথায় সেই বিস্ময়ের প্রসঙ্গটা হঠাৎ মুখর হয়ে ওঠে।—সত্যি, কিছু বুঝতে পারা যায় না মশাই, মানুষের এত মহৎ একটা চেষ্টা এত ব্যর্থ হয় কেন? ভালো কাজের পরিণাম এত খারাপ হয় কেন?

প্রশ্নটাকে বিস্ময়ের প্রশ্ন না বলে একটা ধাঁধার প্রশ্ন বলা যায়। ক্লাবের বৈঠকে, যেকোন উৎসবের জনসমাবেশে, কোন ক্রিয়া-বাড়ির ভিড়ের মধ্যে, কেউ না কেউ এই ধাঁধার প্রশ্নটাকে কথাবার্তার মাঝখানে টেনে আনবেই, আর তাই নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা চলবেই। সত্যিই তো, প্রসন্নবাবুর মতো মানুষের এত বড় আত্মোৎসর্গের ফল শেষপর্যন্ত যা দাঁড়াল, তাতে তো এই বিশ্বাসই করতে হয় যে মহত্ত্বের কোন সার্থকতা নেই। মহৎ কাজও পাপের সহায় হতে পারে। মহৎ কাজের পরিণামে মানুষের ক্ষতিও হতে পারে।

সন্ধ্যাবেলা লাইব্রেরী ঘরের বারান্দায় বসে ভদ্রলোক যখন দেখতে পান যে, এক মাতাল যুবকের মূর্তি টলতে টলতে চলে যাচ্ছে, তখন ভদ্রলোকদের আলোচনা ক্রুদ্ধ ধিক্কারের মতো তপ্ত হয়ে ওঠে—ছি, প্রসন্নবাবুর প্রাণদানের ফল শেষে এই দাঁড়াল? নিজের প্রাণ দিয়ে একটা পাপীর প্রাণটিকে বাঁচিয়ে রেখে গিয়েছেন প্রসন্নবাবু।

অনেকেরই মনে পড়ে, উনিশ বছর আগে, এই লাইব্রেরীর সামনের ওই মাঠের উপর শহরের পাঁচহাজার মানুষ এসে ভিড় করেছিল। সেই জনসভায় প্রসন্নবাবুর মহান্ আত্মদানের জন্য শ্রদ্ধার প্রস্তাব গ্রহণ করে অনেকের চোখ জলে ভরে গিয়েছিল। দশ বছর বয়সের একটা ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে সেদিন সকালে নিজের প্রাণ হারিয়েছিলেন প্রসন্নবাবু।

খাজাঞ্চীপুকুর নামে ওই পুকুরের জল থেকে গোপাল দত্তের ছেলেটা পদ্মডাঁটা টানতে গিয়ে জলে ডুবে গিয়েছিল। দেখতে পেয়ে আশেপাশের লোকজন চেঁচিয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই পুকুরের জলে নামতে, তার মানে জলের মধ্যে তলিয়ে যাওয়া ছেলেটাকে তুলবার জন্য কেউ সাহস করতে পারেনি। পুকুরটা যেমন গভীর, তেমনি পাঁকাল, আর জল তেমনি ঠাণ্ডা। তা ছাড়া জংলা জলজে ভরা।

কিন্তু কী আশ্চর্য, হার্টের কষ্টে গত বছরেও যিনি তিন মাস শয্যাশায়ী ছিলেন, সেই প্রসন্নবাবু পুকুরের জলে ঝাঁপ দিলেন। দশ মিনিট ধরে জল তোলপাড় করে আর ডুব দিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে খুঁজলেন। তারপর সত্যিই খুঁজে পেলেন। পাঁকমাখা ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে আর সাঁতার দিয়ে পুকুরের কিনারায় এসে উঠলেন। কিনারায় লোকজনের হাতে ছেলেটাকে সঁপে দিয়ে, জোরে একটা হাঁপ ছাড়লেন প্রসন্নবাবু। যারা সেদিন সেখানে দাঁড়িয়েছিল, তারা আজও স্মরণ করতে পারে, প্রসন্নবাবুর মুখে কী অদ্ভুত একটা আনন্দের হাসি তখন ঝিকমিক করছিল।

ছেলেটাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, আর একঘণ্টা পরেই অজ্ঞান হয়ে যাওয়া সেই ছেলেটা চোখ মেলে তাকিয়ে কথা বলেছিল। ডাক্তার খুশি হয়ে হেসেছিলেন। কিন্তু সেই ডাক্তারকে তখনই আবার ছুটে যেতে হয়েছিল। তখনই খবর পেয়েছিলেন ডাক্তার, নিদারুণ খবর—প্রসন্নবাবু মারা গিয়েছেন।

প্রসন্নবাবুর মুখের সেই অদ্ভুত হাসির ঝিকিমিকি হঠাৎ থরথর করে কেঁপে উঠেছিল। পুকুরের কিনারাতে মাটির উপর হঠাৎ বসে পড়েছিলেন প্রসন্নবাবু। তারপর শুয়ে পড়েছিলেন, তারপর জোরে একটা হাঁপ ছেড়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। পুকুরের কিনারায় সেই ভিড় আর্তনাদ করে উঠেছিল।

শহরের ঘরে ঘরে সারাদিন ধরে এই আক্ষেপ করুণ হয়ে বেজেছিল—ইস্, কী মানুষের

প্রাণটা কিভাবে চলে গেল!

—একটা আজানা অচেনা শিশুর প্রাণের জন্য নিজের প্রাণ কত সহজে বলি দিলেন ভদ্রলোক!

—কত বড় হৃদয়ের মানুষ। কত উদার!

—প্রসন্নবাবুর মতো মানুষ পৃথিবীতে এখনও দেখা যায়, এটা তো পৃথিবীরই সৌভাগ্য।

এই শহরের মধ্যে বিদ্যায়, চরিত্রে, আচরণে আর পরোপকারে যিনি সবার সেরা, সবারই শ্রদ্ধার আস্পদ, সেই প্রসন্নবাবু একটা অচেনা ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। ঘটনাটা সেদিন সারা শহরের শোকের মধ্যেও যেন একটা বিস্ময়-বিহ্বল আনন্দাশ্রুর সজলতা ফুটিয়ে তুলেছিল। এমন মহত্ত্বের ঘটনা ইতিহাসের কাহিনীতে শোনা যায়, প্রসন্নবাবুও যেন মানুষের ইতিহাসের গৌরব। তিনি প্রমাণ করে দিয়ে গেলেন, মানুষ সত্যিই এত মহৎ হতে পারে।

প্রসন্নবাবুর নিজেরও সংসার আছে। স্ত্রী আছে, ছেলে আছে, পাঁচ বছর বয়সের একটি মেয়ে আছে। শহরের ঘরে ঘরে মেয়েরা চোখের জল ফেলে এমন কথাও সেদিন বলেছিল, হায় রে, প্রসন্নবাবুর নিজের মেয়েটা চিরকালের মতো বাপের কোল ছাড়া হয়ে গেল।

সত্যিই সেদিন প্রতিবেশীরাও শুনতে পেয়েছিল, প্রসন্নবাবুর ছোট্ট মেয়েটা, পাঁচ বছর বয়সের অরুণা চেঁচিয়ে কাঁদছে, তুমি কোথায় চলে গেলে বাবা—ফিরে এসো বাবা, আমি যে তোমার কোলে বসব বাবা।

এই লাইব্রেরী ঘরের দেওয়ালে প্রসন্নবাবুর একটা ফটো আজও ঝুলছে। লাইব্রেরীটা প্রসন্নবাবুর চেষ্টার সৃষ্টি। লাইব্রেরীর ঘরের ভিতরে দুটো আলমারিতে গ্রীক-সাহিত্যের যে-সব বই সাজানো রয়েছে, সেগুলিও প্রসন্নবাবুর দান। তিনি নিজে গ্রীক-সাহিত্য ভালোবাসতেন। এই শহরের কলেজের লজিকের অধ্যাপক ছিলেন প্রসন্নবাবু। যেমন চমৎকার সুশ্রী চেহারা, তেমনই সুন্দর গলার স্বর। ভদ্রলোকেরা আজও মনে করতে পারেন, এই লাইব্রেরী ঘরেতে এক-এক দিন এসে প্রসন্নবাবু হোমর আবৃত্তি করে সকলকে কেমন মুগ্ধ করে চলে যেতেন।

সেই মানুষটারই প্রাণ, এত মূল্যবান আর মহৎ প্রাণ যেদিন গোপাল দত্তের ছেলেটাকে বাঁচিয়ে দিয়ে নিজে শেষ হয়ে গেল, সেদিন কেউ কোন কল্পনাতেও এই সন্দেহ করতে পারেনি যে, এত মহৎ আত্মদান এমন ব্যর্থ হয়ে যাবে। ওই যে, যার প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়ে নিজের প্রাণ নষ্ট করেছিলেন প্রসন্নবাবু, সেই প্রাণীটাই আজ টলতে টলতে চলে যাচ্ছে। বোধহয় জুয়ার আড্ডা থেকে ফিরছে, কিংবা কোথায় কোন্ গুণ্ডামি করে এতক্ষণে ঘরে ফিরছে, কে জানে! ঘরে ফিরছে, না অন্য কোথাও দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাবার জন্য যাচ্ছে, তাই বা কে বলতে পারে!

লাইব্রেরী ঘরের বারান্দায় বসে ভদ্রলোকেরা ক্ষুব্ধভাবে আক্ষেপ করেন, একটা হতভাগা পাপীর জন্য প্রসন্নবাবু নিজের প্রাণটা দিয়েছিলেন। ছি, ছি, মানুষের এত মহৎ আত্মদানও এত ব্যর্থ হয়।

গোপাল দত্ত আজ আর বেঁচে নেই। সংসারের আর এই অভিশাপের মূর্তিকে নিজের চোখে দেখবার দুর্ভাগ্য গোপাল দত্তের হয়নি। বেঁচে থাকলে গোপাল দত্তকে আজ শুনতে হতো, শহরের মানুষ বলাবলি করছে—নরেশ গুণ্ডার বাপ গোপাল—গোপাল দত্ত।

প্রসন্নবাবুর মহান আত্মদানের পরিণাম হলো, ওই নরেশ গুণ্ডা। লোকে বলে, সেদিন খাজাঞ্চী পুকুরের পাঁকের মধ্যে ডুবে যাওয়া ওই ছেলের মরে যাওয়াই ভালো ছিল। তাহলে নরেশ গুণ্ডার এই চেহারা আর মাতলামি দেখবার দুর্ভাগ্য কাউকেই সহ্য করতে হতো না। নরেশ গুণ্ডা এই শহরের ভদ্র-জীবনের একটা কলঙ্ক। নরেশ একটা পশুপ্রায় অস্তিত্ব। না জানে লেখাপড়া, না জানে কাজ। শুধু জুয়া খেলা, আর—আরও কি যে করে সেটা পুলিসই ভালো

জানে। একবার পুলিস থেকে অর্ডার হয়েছিল, নরেশকে পাঁচ বছরের জন্য এই শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু কী আশ্চর্য, হতভাগা নরেশ পুলিসেরই বিরুদ্ধে মামলা করে জিতে গেল। হাকিম রায় দিলেন, পুলিস এমন কোন প্রমাণ দিতে পারেনি, যার জন্যে নরেশ দত্তকে শহরের পক্ষে অবাঞ্ছিত বলে মনে করা যেতে পারে।

এটাও একটা কথা। ভদ্রলোকেরা অবশ্য স্পষ্ট করে বলতে পারেন না, হতভাগা নরেশ কার কোন্ ক্ষতি করেছে ও করছে। চোখের সামনে যা দেখা যায়, তাতে শুধু বোঝা যায় যে, নরেশ শুধু নিজের জীবনটাকেই ক্ষতাক্ত ছিন্নভিন্ন ও ক্লেদাক্ত করে তুলেছে। নরেশ শুধু নিজেরই অভিশাপ। ওর সঙ্গে কোন ভদ্র যুবক কথা বলে না। কোন ভদ্রলোকের বাড়িতে ওর নিমন্ত্রণ নেই। শহরের ছেলেরা যেদিন স্বাধীনতার উৎসব করে, সেদিনও দেখা যায়, নরেশ টলতে টলতে চলে যাচ্ছে। নরেশের পকেটের ভিতর একটা বোতলের মুখ উঁকি দিয়ে রয়েছে।

অরুণাও প্রায়ই দেখতে পায়, টলতে টলতে চলে যাচ্ছে মাতাল নরেশ, মাথায় একটা ব্যাণ্ডেজ, ধুতিটা কাদামাখা। কে জানে কোথায় মারামারি করে কিংবা কোন্ নর্দমার কিনারায় গড়াগড়ি করে, আহত জানোয়ারের মতো মূর্তি ধরেছে নরেশ। অরুণার চোখ দুটো যেন দুঃসহ একটা ঘৃণার জ্বালায় কেঁপে ওঠে। মনে পড়ে যায়, এই অমানুষটাই বাবার মৃত্যুর কারণ। এ হেন একটা কদর্য প্রাণীকে বাঁচাবার জন্যে প্রসন্নবাবু প্রাণ দিয়েছেন। শুধু আজ নয়, সেই পাঁচ বছর বয়েসের জীবন থেকে অরুণার মনের ভিতরে একটা ক্ষমাহীন আক্রোশ ঘনিয়ে আছে। মানুষের অনেক মঙ্গল হতো, পৃথিবীর কারো কোন ক্ষতি হতো না, যদি সেদিন এই প্রাণীটা পুকুরের পাঁকের ভিতরে তলিয়ে গিয়ে মরে পচে আর গলে যেত। এই শহরের মানুষ আজও বলাবলি করে, প্রসন্নবাবু আজ বেঁচে থাকলে এই শহরের কত উপকারই না করতেন।

অরুণাদের এই বাড়ির অদৃষ্টটাকেও কত না কাঁদতে হয়েছে, আর ক্ষতি সহ্য করতে হয়েছে। প্রসন্নবাবু ওভাবে মরণ বরণ করবার পর সংসারের দায়-দাবি মেটাতে গিয়ে অরুণার মা'র সব গহনা একে একে বেচে দিতে হয়েছে। নদীর ধারে এগারো বিঘা জমি ছিল, তাও বিক্রি করে দিতে হয়েছে। মামাদের কাছে সাহায্য চাইতে হয়েছে। মামারা অনেক কথা শুনিয়েছেন আর মাঝে মাঝে সামান্য সাহয্য করেছেন তবে বড়দার লেখাপড়ার খরচ মেটাতে পারা গিয়েছে। বাবা বেঁচে থাকলে বড়দাকে আজ ষাট টাকা মাইনেতে আদালতের কেরানীর কাজ করতে হতো না। এম. এ. পাশ করতে পারতেন বড়দা, আর এতদিনে একটা ভালো চাকরি নিয়ে সুখী হতে পারতেন।

বড়দা যখন শীতের দিনে একটা ছেঁড়া আলোয়ান গায়ে দিয়ে আদালতের কেরানীগিরি করতে বেরিয়ে যান, তখন অরুণার ব্যথিত মনটা যেন বাবার উপরেই একটা অভিমানের ঘোরে বিড়বিড় করতে থাকে, চোখ দুটো ছলছল করে ঃ তুমি ভয়ানক ভুল করেছিলে বাবা, গোপাল দত্তের ছেলেকে বাঁচাবার জন্য তোমার প্রাণ দেওয়া একটুও বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। তোমার মহত্বের ভুলে সবারই ক্ষতি হয়েছে। কারো কোন ভালো হয়নি। এমন কি, ওই নরেশেরও কোন উপকার হয়নি। সেটা আজ গুণ্ডা হয়ে এই শহরের অভিশাপ হয়েছে।

বাড়ির বারান্দায় কিংবা জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পথের দিকে তাকালে দু সারি শিরীষের চেহারা চোখে পড়ে। ফুল ফোটে যখন, তখন বাড়ির সামনের ওই পথের সব আলো-ছায়া আর ধুলোও যেন রঙিন হয়ে যায়। শিরীষের ফুলের গুচ্ছগুলি যেন গুচ্ছ গুচ্ছ আনন্দের রক্তিমা। সে রক্তিমা মাঝে মাঝে যেন আভাময় হয়ে অরুণার মুখের উপর এসে লুটিয়ে পড়ে।

শুধু ফোটা শিরীষের আনন্দরক্তিমার জন্য নয়, অরুণা জানে, কলকাতা থেকে ধীরাজ ফিরেছে। আজই বোধহয় এসে দেখা করবে। তারপর পুরো একটা মাস ধরে রোজই আসবে ধীরাজ, তারপর একদিন কলকাতায় চলে যাবে। ধীরাজের কথা মনে পড়লেই অরুণার সুন্দর মুখটা লালচে হয়ে আরও সুন্দর হয়ে যায়।

পথের দিকে তাকালে শুধু যে মূর্তিমান অভিশাপ ওই নরেশকে দেখতে হয়, তা নয়. বছরের মধ্যে অন্তত এমন পাঁচটা মাস আসে যখন রোজই ধীরাজকে দেখতে পাওয়া যায়। শিরীষের ছায়া পার হয়ে অরুণাদের বাড়ির ফটকের কাছে এসে ধীরাজ যখন তার সুস্মিত চোখের দৃষ্টি তুলে বারান্দার দিকে কিংবা জানালার দিকে তাকায়, তখন ধীরাজের সোনার ফ্রেমের চশমাটাও ঝিকঝিক করে সোনালী হাসি হাসতে থাকে।

এগিয়ে আসে অরুণা—এত দেরি হলো কেন?

ধীরাজ—দেরি? চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে, এই সকাল আটটাতে হাজির হয়েছি, তবু বলছ দেরি হয়েছে?

অরুণা—এখনও চক্ষুলজ্জায় ভুগছ?

ধীরাজ হাসে—হ্যাঁ, কিন্তু আর নয়। এইবার বড়দাকে বলে দেওয়াই উচিত...

বড়দাকে যে-সত্যটা আজও দু-জনের কেউ কোনদিন বলতে পারেনি, সে সত্যটা বড়দার অজানা নয়। শুধু বড়দা কেন, প্রতিবেশীদেরও অজানা নয়। সকলেই জানে, ধীরাজের সঙ্গে অরুণার বিয়ে হয়ে যাবে। হওয়াই উচিত। ধীরাজের মতো ভালো ছেলেকে অরুণার মতো ভালো মেয়ের সঙ্গে সবচেয়ে ভালো মানায়।

অরুণাও মনেপ্রাণে অনুভব করেছে, অরুণার জীবনে ধীরাজের ভালোবাসার উপহার যেন একটা সৌভাগ্যের উপহার। অরুণার প্রাণ কল্পনায় যা আশা করেছিল, ধীরাজ যেন সেই আশারই দান। তিন বছর ধরে ধীরাজের ভালোবাসার আশ্বাসে আর অঙ্গীকারে অরুণার দিন-রাতের ভাবনার মুহূর্তগুলি মুগ্ধ হয়ে অরুণাকে মুগ্ধ করে রেখেছে।

তিন বছর আগের দিনগুলিকে স্মরণ করতে পারে অরুণা। কী ভয়ানক উদাস আর অর্থহীন এক-একটা দিন! কিছুই ভালো লাগত না। কতবার ওই শিরীষের মাথা ফুলে ভরে গিয়ে লাল হয়ে গিয়েছে, কিন্তু দেখে একটুও ভালো লাগেনি। জীবনটাকে অর্থহীন বলে মনে হতো। মিছিমিছি বেঁচে থেকে লাভ কি, এমন ভয়ানক প্রশ্নও বারবার মনের ভিতর কত না উৎপাত ঘটিয়েছে। সারাদিন ধরে বই পড়ে আর কাজ করেও একটা শূন্যতার মধ্যে মনটা ছটফট করেছে।

আজ কিন্তু মনে হয়, যে-পৃথিবীতে ধীরাজ আছে, সে-পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার দরকার আছে ধীরাজের ভালোবাস এসে শুধু অরুণার জীবনের শূন্যতাকে নয়, এই পৃথিবীটাকেই যেন শত তৃপ্তিতে ভরে দিয়েছে।

তিন বছর ধরে অপেক্ষা সহ্য করেছে দুজনের জীবন ; আর অপেক্ষার দরকার কি? ধীরাজ একটা চাকরিও পেয়ে গিয়েছে, রেলওয়ের চাকরি, মাইনে ভালো। শিলিগুড়িতে যে কোয়ার্টার পেয়েছে ধীরাজ, সেই কোয়ার্টারও সুন্দর ছবির মতো দেখতে একটা রঙিন কটেজ ; ফটকের দু-দিকে ঝাউ, পিছনে দেবদারুর কুঞ্জ ; আর দেয়ালের গায়ে লতানো গোলাপ।

বড়দার কাছে মুখ খুলে বেশি কিছু বলতে হয়নি। ধীরাজের লজ্জাবিব্রত মুখের দিকে তাকিয়ে বড়দা খুশি হয়ে হেসে ফেললেন—খুব ভালো কথা। আমার মনে হয়, এই মাসের শেষ দিকে কোন একটা দিনে বিয়ে হয়ে গেলে ভালো হয়, কারণ চাটুজ্যেমশাই এসে কাজে জয়েন না করা পর্যন্ত আমি ছুটি পাব না।

ধীরাজ বলে—তাই ভালো। আমারও ফাল্গুনের শেষ দিকে শিলিগুড়িতে গিয়ে কাজে

জয়েন করবার কথা।

শান্ত শহরটা আতঙ্কিত হয়েছে, পুলিসও উদ্বিগ্ন। গোয়েন্দা পুলিস শহরের যত বাজার, বস্তি, সরাইখানা আর ধর্মশালার উপর দিনরাত নজর রাখছে।

তিন তিনটে অদ্ভুত রকমের খুন এই এক মাসের মধ্যে হয়েছে। কোন সন্দেহ নেই, এই সব খুন কোন পাকা খুনীর, কোন ভয়ানক নিষ্ঠুর হিংস্রের কীর্তি। প্রথম খুন ঃ বস্তির একটা ঘরে ; মুড়ি বেচত যে চারু বৈরাগিনী, তাকে কে যেন খুন করে তার রুপোর গোপালকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। লোকে বলছে, রুপোর গোপালের মাথায় দু'ভরি সোনার একটা মুকুট ছিল।

দ্বিতীয় ঘটনা, সরাইখানাতে। এক মাস হলো এক বাইজী এসে ঐ সরাইখানাতে ছিল। এক সকালেবলায় দেখা গেল, বাইজীর ঘরের দরজা খোলা। ঘরের মেঝের উপর মরে পড়ে আছে বাইজী, গায়ের সব গয়নাও অদৃশ্য।

তৃতীয় ঘটনা, নদীঘাটার এক দোকানবাড়িতে। দোকানদারের বউকে ঘরের ভিতরে মরে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। ঘরের জানালাটা ভাঙা। আর লোহার সিন্দুকের ভিতর থেকে সব টাকা উধাও। দোকানদার সে-রাত্রিতে ঘরে ছিল না, গুড় কিনতে রাজপুরে গিয়েছিল।

তিনটে ঘটনাই হলো ঘুমন্ত মানুষকে খুন করবার ঘটনা। একই রকমের খুন, গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে শ্বাস রুদ্ধ করে খুন করা।

পুলিস হয়রান হয়েছে, হতাশও হয়েছে। এই ভয়ানক খুনীর কোন হদিস খুঁজে পাচ্ছে না পুলিস।

ধীরাজের কাকা আর মেজদি এসে যেদিন অরুণাকে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন, সেদিন ঠিক সন্ধ্যার পরে থানার পুলিস অরুণাদের বাড়ির দিকে ছুটে এলো। শহরের লোক ছুটে এসে অরুণাদের বাড়ির ফটকের কাছে পথের উপর ভেঙে পড়ল। ধরা পড়েছে সেই ভয়ানক খুনী।

সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে কেউ ছিল না, ছিল শুধু অরুণা। আশীর্বাদের সেই সোনার হারটা গলায় পরে বাইরের ঘরে একটা কোচের উপরে বসেছিল অরুণা। ঘরে আলো জ্বলছিল ; অরুণার হাতে একটা বই ছিল। কিন্তু চোখ বন্ধ করে যেন একটা স্বপ্নময় আবেশের মধ্যে নিথর হয়ে বসেছিল অরুণা। অরুণার প্রাণটা যেন সেই আবেশের মধ্যে সুস্থির হয়ে সানাইয়ের সুর শুনছে। কালই যে অরুণার বিয়ে!

এসেছিল ধীরাজ। বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে অরুণার ঘুমন্ত মুখের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েছিল।

কিন্তু চমকে উঠল ধীরাজ। ঘরের এক কোণে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা সাধু। কপালে তিলক, মাথায় জটা, আর হাতে একটা দড়ি ; দড়িতে মোটা মোটা কয়েকটা রুদ্রাক্ষ বাঁধা।

ঘরের ভিতরে ঢুকে সাধুটার চোখের সামনে শক্ত হয়ে দাঁড়ায় ধীরাজ। সাধুটা সেই মুহূর্তে কোমর থেকে একটা চক্চকে ভোজালি বের করে ধীরাজের দিকে হিংস্রভাবে তাকায়।

কিন্তু ধীরাজ সেই মুহূর্তে সাধুর সেই হিংস্র চোখের দৃষ্টিকে প্রচণ্ড এক ঘুষির আঘাতে অন্ধ করে দিয়ে, সাধুর হাতের ভোজালি চেপে ধরে। জেগে উঠে, চেঁচিয়ে ওঠে অরুণা। আর, অরুণার সেই আর্ত-চিৎকারের শব্দ শুনে পাশের বাড়ির নন্দবাবু, হেমেন, নিকুঞ্জ আর শিবপদ ছুটে আসে। সাধুটাকে মেঝের উপর আছড়ে দিয়ে আর দড়ি দিয়ে বাঁধাছাদা করে হাঁপ ছাড়ে হেমেন আর নিকুঞ্জ, শিবপদ পুলিসকে খবর দিতে চলে যায়। হেমেনের ডাক শুনে পথের মানুষ ছুটে আসতে থাকে।

খুনী ধরা পড়েছে। ভিড়ের মানুষ বলাবলি করে, হ্যাঁ, এই সাধুটা মাস দুই হল কোথা থেকে যেন এই শহরে এসেছে।

খুনী সাধুটাকে নিয়ে পুলিস যখন চলে যায়, আর পথের ভিড় শূন্য হয়ে যায়, তখন বাড়ির বারান্দার উপরে শুধু অরুণা আর ধীরাজ। ঘরের ভিতরে বড়দা। ফটকের কাছে শিরীষের মাথা মৃদু ঝড়ের ছোঁয়া লেগে দুলছে ; ঝিরিঝিরি শব্দ করছে শিরীষ। হঠাৎ যেন একটা দৈব মায়া কোথা থেকে ছুটে এসে অরুণার প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়েছে ; যেন সেই খুশির উল্লাসের ছোঁয়া লেগেছে শিরীষগুলির মাথায়।

ধীরাজের মুখের দিকে তাকিয়ে অরুণাও যেন একটা বিস্ময়ের আবেশ সহ্য করতে থাকে।

ধীরাজ বলে—কি দেখছ?

—দেখছি তোমাকে।

—কেন?

—তুমি যে সত্যিই আমার প্রাণটাকেও কিনে নিলে।

—কেন?

—তুমিই যে আমার প্রাণ বাঁচালে, তুমি আজ এসে না পড়লে...

সত্যিই, থরথর করে কেঁপে ওঠে অরুণার চোখের দৃষ্টি—আমাকে যে খুনীটা শেষ করে দিয়ে যেত।

ধীরাজ বলে—আমিও ভাবছি, কী আশ্চর্য! ভাগ্যিস হঠাৎ এখানে এসে পড়েছিলাম।

অরুণা—আমিও ভাবছি, কী আশ্চর্য, কেন যে তুমি এলে! তোমার আজ এ-সময়ে আসবার কোন কথা ছিল কী?

ধীরাজ—না।

অরুণা—তাই মনে হচ্ছে, কোন দেবতার কৃপা যেন তোমাকে আজ এখানে পাঠিয়েছিল।

ধীরাজ—তাই হবে। অবিশ্বাস করতে পারছি না। আমার বরং এখন স্টেশনের দিকে যাবার কথা ছিল। ছোটকাকার আজ সন্ধ্যার আসবার কথা।

অরুণা—তবে স্টেশনে গেলে না কেন?

ধীরাজ—গিয়েছিলাম কিছুদূর পর্যন্ত, কিন্তু শেষে ফিরে আসতে হলো।

অরুণা—কেন?

ধীরাজ—চকের কাছে গিয়ে বাধা পেলাম।

অরুণা—কিসের বাধা?

ধীরাজ—একটা মারামারি কাণ্ড আর হুল্লোড়। জুয়াড়ী মাতালের দল ইটপাটকেল ছুঁড়ছে। বিশ্রী জঘন্য কাণ্ড। অগত্যা...

অরুণা—মারামারি করছে কেন?

ধীরাজ—জুয়াড়ী মাতালেরা যেজন্যে মারামারি করে। জুয়ার জিত আর বখরা নিয়ে মারামারি বাধিয়েছে। দেখলাম, সবচেয়ে বেশি মার খাচ্ছে নরেশ গুণ্ডা।

অরুণা—অ্যাঁ?

ধীরাজ—সেই হতভাগা নরেশ। লোকটা বেপরোয়া হয়ে ছুরি হাতে নিয়ে দশটা গুণ্ডার সঙ্গে লড়ছে, ইস্।

অরুণা—কি?

ধীরাজ—কী ভয়ানক বেপরোয়া গুণ্ডা এই নরেশ! ইঁটের ঘায়ে মাথা ফেটে রক্ত ঝরছে, একটা পা ভেঙ্গে গিয়েছে, তবু ছুরি হাতে নিয়ে আর রুখে রুখে এতগুলো গুণ্ডাকে তাড়া করছে। যাই হোক, যখন দেখলাম যে, এই জঘন্য মারামারি সহজে থামবার নয়, চকের

ভিড়ও শিগগির সরবার নয়, তখন অগত্যা ফিরে আসতে হলো।

ওকি? রাস্তার উপর দিয়ে আবার ওটা কিসের ভিড় এত হৈ-হৈ করে চলে যাচ্ছে? একদল পুলিসও ভিড়ের আগে আগে চলছে।

ভিড়ের চিৎকার শোনা যায়, নরেশ গুণ্ডা খতম হয়েছে! খুন হয়েছে নরেশ। মরেছে নরেশ।

হ্যাঁ, পুলিসের পিছু পিছু একটা ঠেলা গাড়িও চলছে। ঠেলাগাড়ির উপর পড়ে আছে নরেশ গুণ্ডার লাশ।

নরেশের রক্তমাখা মুখটা বেশ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ধীরাজ আর অরুণা একসঙ্গে চমকে ওঠে, আর প্রায় একসঙ্গেই চেঁচিয়ে ওঠে—তাই তো, সত্যিই নরেশ গুণ্ডা মরেছে!

আবার শিরীষের ঝিরিঝিরি নিঃশ্বাসের বাজনার শব্দ শোনা যায়। কারণ আবার নীরব হয়ে গিয়েছে রাস্তাটা। অনেক দূরে চলে গিয়েছে সেই ভিড়, সেই লাশের গাড়ি আর সেই পুলিস।

অরুণার মুখের দিকে তাকিয়ে ধীরাজ হেসে ফেলে—এখন তাহলে বলতে হয়, নরেশ গুণ্ডাই আমাকে স্টেশনে যেতে না দিয়ে এখানে পাঠিয়েছিল।

চমকে ওঠে অরুণা—কি বললে?

ধীরাজ—নরেশটা যদি আজ গুণ্ডাদের সঙ্গে এই ভয়ানক মারামারিটা না বাধাত, তবে...

অরুণার মুখটা হঠাৎ যেন শিউরে ওঠে, আর সেই মুখের ওপর ফুটে ওঠা সুন্দর রক্তাভ আনন্দটা যেন একেবারে সাদা হয়ে যায়—কি হতো তবে?

ধীরাজ—তবে আমি তো সোজা স্টেশনে চলে যেতাম আর এদিকে তোমার প্রাণটা একটা খুনীর হাতে শেষ হয়ে যেত।

ছটফট করে অরুণা—কি বলছ তুমি, ঠিক বুঝতে পারছি না।

ধীরাজ এইবার চেঁচিয়ে ওঠে—মনে হচ্ছে, নরেশ গুণ্ডাটা যেন তোমার প্রাণ বাঁচাবার জন্যে আজ মারামারি করেছে আর মরেছে।

অরুণা আনমনার মতো বিড়বিড় করে—একথার কোন মানে হয় না।

ধীরাজ আরও উৎসাহিত হয়ে বলে—মানে একটা হয় বৈ কি। নরেশ গুণ্ডা এই ভয়ানক মারামারিটা না বাধালে আমি কি মাঝপথ থেকে ফিরে আসতাম?

অরুণা--না।

ধীরাজ—আমি না এলে ওই খুনী সাধুটা কি তোমাকে...

অরুণার চোখ দুটো এইবার থরথর করে কাঁপতে থাকে—সে কথা ঠিক, তুমি না এসে পড়লে আমার প্রাণ যেত।

ধীরাজ—নরেশটা নিজে মরে গিয়ে আজ তোমাকে বাঁচিয়েছে। এটা হলো দৈবের কৃপা।

অরুণার সারা মুখে যেন একটা যন্ত্রণার ছায়া ছটফট করে—হ্যাঁ, ঠিক কথা। অদ্ভুত, আশ্চর্যের কথা।

ধীরাজ—শুনেছিলাম, এই নরেশকে বাঁচাতে গিয়ে তোমার বাবার প্রাণ গিয়েছিল।

অরুণা—হ্যাঁ।

ধীরাজও যেন এইবার একটা বিস্ময়ের চমক খেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—তাহলে তো বলতে হয়, তোমার বাবা তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন।

অরুণার দুই চোখ জলে ভরে যায়—হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে।

পরভৃতা

আগেই খবর দিয়ে রাখা হয়েছিল, এবং ট্যাক্সিটাও ঠিক সময়ে এসে বাড়ির ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে হর্ন বাজিয়ে ডাক দিল।

আর দেরি করবার কোন কারণ নেই। চলে যাবার জন্যই তৈরি হয়ে এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল হেমেন। এখন শুধু গরম আলোয়ানটা তুলে নিয়ে কাঁধের উপর ফেলতে হবে, আর ঐ ছোট ব্যাগটা হাতে তুলে নিতে হবে। তারপর ঘরের এই দরজা এইভাবে খোলা রেখে এবং পিছনের দিকে আর এক মুহূর্তের জন্যও না তাকিয়ে সোজা হেঁটে গিয়ে ট্যাক্সির ভিতর ঢুকে পড়তে হবে। উধাও হয়ে যাবে ট্যাক্সি, সঙ্গে সঙ্গে হেমেনের জীবনটাও সাত বছরের একটা অভিশাপের বন্ধন থেকে ছিন্ন হয়ে একটা মুক্তির পথে উধাও হয়ে যাবে।

কাঁটায় কাঁটায় রাত দশটা। আসতে একটুও দেরি করেনি ট্যাক্সি এবং সারা বাড়িও একেবারে স্তব্ধ হয়ে হেমেনের মুক্তির এক সুন্দর লগ্ন ঘনিয়ে রেখেছে।

সুরীতি এখনো বাড়িতে ফেরেনি। হেমেনের সঙ্গে প্রিয় সম্পর্কের বাঁধনে বাঁধা হয়ে থাকা উচিত ছিল যার, সেই মানুষ এই বাড়িতেই থাকে, ঐ সুরীতি, হেমেনের স্ত্রী, কিন্তু সে এখন লালবাগের কোন এক বাড়ির একটি মানুষের দু'চোখ ছাপিয়ে উথলে-পড়া একটা খুশির কাছে বাঁধা পড়ে বসে আছে।

আর কে আছে এই বাড়িতে। রান্নাবান্না করে যে পাঁড়েজী, আর জল তোলে ও বাসন মাজে যে জানকীরাম, তারাও এখন ভাঙ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে আছে এই বাড়ির কোন একটি ঘরের দুই কোণে। কাজেই হেমেনের এই মুক্তিযাত্রার শুভ মুহূর্তে পিছন থেকে হাঁচিকাশি দিয়েও বাধা দেবার মতো মানুষ কেউ আর নেই।

হ্যাঁ, আর একটা মানুষ আছে। কিন্তু তার সঙ্গে হেমেনের জীবনের কোন প্রিয় সম্পর্কের বন্ধন নেই। সে হলো সুরীতির মেয়ে ইমা, প্রায় অপোগণ্ড একটা সাত বছর বয়সের মানুষ। সে তো এখন তার মায়ের দেওয়া নতুন উপহার সেই রঙিন সিল্কের ফ্রক পরে আর জুতো-মোজা পরানো পা নিয়ে বিছানার উপর পড়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

তা ছাড়া, ও মেয়েটা জেগে থাকলেই বা কি? এইটুকু বয়সের ঐ মেয়ে যদি এখন জেগেও থাকে, তবে দূর থেকে আড়ালে দাঁড়িয়ে শুধু দু'চোখের চোরা দৃষ্টি ভাসিয়ে দেখতে থাকবে। কাছে ছুটে আসবে না, কিংবা দূর থেকে একটা ডাকও দেবে না। ঐ মেয়েই তো সেই দুঃসহ রহস্য, যার জন্য সাত বছর ধরে অশান্ত হয়ে রয়েছে হেমেনের মন। লোকে সে রহস্যের কোন খোঁজখবর রাখে না বলেই ভুল করে বলে যে, হেমেনবাবুর মেয়ে ইমা সত্যিই বড় ভালো মেয়ে।

লোকে জানে, ইমা হলো হেমেনবাবুর মেয়ে। লোকে জানে, সুরীতি হলো হেমেনবাবুর স্ত্রী। লোকের এই দুই ধারণাই আইনত সত্য, কিন্তু জীবনের সত্য নয়। তা না হলে আজ এই রাত দশটার নীরবতার মধ্যে একটা ট্যাক্সি এসে হেমেনের জীবনটাকে তুলে নিয়ে পালিয়ে যাবার জন্য হর্ন বাজাতো না।

ব্যাগ হাতে তুলে নেয় হেমেন, গরম আলোয়ানটাকেও কাঁধের উপর ফেলে। এবং দরজার দিকে দু'পা এগিয়ে গিয়েই হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। কী আশ্চর্য, এ যে সুরীতির সেই মেয়েটা। দরজার মাঝখানে পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে রঙিন সিল্কের ফ্রকপরা ইমা।

কোনদিন ভুলেও মেয়েটা হেমেনের ছায়ার কাছেও এসে দাঁড়ায়নি। চিরকাল দূরে দাঁড়িয়েই শুধু চোরা চাউনি তুলে হেমেনের মুখের দিকে তাকিয়ে এসেছে যে মেয়ে, সেই মেয়ে হঠাৎ এত বড় সাহস পেয়ে গেল কেমন করে? কি বলতে চায়, কেন এসেছে ইমা? এতক্ষণ না ঘুমিয়ে জেগেই বা আছে কেন? কি-ই বা কতটুকুই বা বুঝতে পেরেছে ইমা?

হেমেন বলে—তুমি হঠাৎ এখানে ছুটে এলে কেন, ইমা?

ইমা ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে আর অদ্ভুত রকমের ভীতু গলার স্বর কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে প্রশ্ন করে—তুমি কোথায় চলে যাচ্ছ, বাবা?

মুখ ফিরিয়ে ঘরের দেয়ালের দিকে তাকায় হেমেন। বাবা! ইমার মুখের এই ডাকের মধ্যে যে ভয়ংকর এক বিদ্রূপ লুকিয়ে রয়েছে! বাইরের কতকগুলি আইনের জোরে ইমা ঐ ডাক ডাকতে পারে বটে, কিন্তু জীবনের কোন দাবির জোরে নয়। সুরীতি তার মেয়েকে কতরকম রীতি-নীতি শেখাল, কিন্তু ইমার মুখের এই বিদ্রূপের ধ্বনিটাকে নিষিদ্ধ করে দিল না কেন? সাত বছর বয়স হয়েছে মেয়ের, এখন তো তাকে বেশ শেখাতে পারা যায়। সুরীতি কি জানে না যে, এই সাত বছরের মধ্যে ইমাকে একবার স্পর্শও করেনি হেমেন?

হেমেন বলে—তুমি কি করে বুঝলে যে আমি চলে যাচ্ছি?

ইমা—ট্যাক্সি এসেছে, তুমি ব্যাগ হাতে নিয়েছ।

হেমেন—তুমি এখন ঘরে যাও।

ইমা—তুমি ঘরে থাকবে তো?

হেমেনের চোখ জ্বলে ওঠে—কেন ঘরে থাকব আমি?

ইমা—তুমি আর রাগ করো না, বাবা।

হেমেন আবার দেয়ালের দিকে তাকায়—কেন?

ইমা বলে—আমি তোমাকে খাবার জল এনে দেব। আমি তোমার বিছানা করে দেব।

হেমেনের হাতের ব্যাগ হঠাৎ কেঁপে ওঠে। মনের কঠোর জ্বালাটাও যেন হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়। একটু আশ্চর্য না হয়েও পারে না, এবং ভাবতে গিয়ে হেসেই ফেলে হেমেন। এই মেয়ের চোরা-চাউনি কি সত্যই এত সজাগ? হেমেনের জীবনের খুঁটিনাটি দুঃখ আর দীর্ঘশ্বাসগুলিকে কেমন করে দেখতে পায় এবং কখন দেখতে পায় এই মেয়েটা?

অফিস থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে নিজের হাতে জল গড়িয়ে খায় হেমেন। রাত দশটার সময় আধ-ঘুমে আচ্ছন্ন চক্ষু নিয়ে টলতে টলতে নিজের হাতে নিজের বিছানা করে হেমেন। এই ছোট ছোট দুঃখগুলি যে হেমেনের জীবনের সেই আসল অশান্তির দান এবং সেই অশান্তির রহস্য থেকে জন্মলাভ করেছে রঙিন সিল্কের ফ্রকপরানো এই মেয়ে, এই ইমা। এই ইমা পৃথিবীতে দেখা না দিলে আজ নিজের হাতে জল গড়িয়ে খাওয়ার দুঃখকে জীবনের একটা অস্বস্তি মনে করে হয়তো শুধু রাগ করত হেমেন, কিন্তু এত অভিশপ্ত আর অশান্ত হয়ে উঠত না হেমেনের জীবন।

কার মেয়ে ইমা? হেমেনের মনের এই প্রশ্নের সন্ধান এই সাত বছরের মধ্যেও কোন উত্তরের নাগাল পায়নি। কিন্তু আজ পেয়েছে। যেন ইমার পিতৃপরিচয় জানবার লোভে সাত বছর ধরে অপেক্ষায় ছিল হেমেন। আজ জানতে পেরেছে হেমেন। এবং তাই তো এইবার সাত বছরের অশান্ত জীবনটাকে নিয়ে শূন্যে উধাও হয়ে যাবার জন্য ট্যাক্সি ডেকেছে হেমেন।

সাত বছর বয়সের ইমার মনের ভুল এখনি ভেঙে দিতে পারা যায়। ইচ্ছা করলে অনায়াসে বলে দিতে পারে হেমেন, আর ক'দিন পরেই তো লালবাগের সেই ভদ্রলোকের আদরভরা কোলের উপর বসতে হবে, কাজেই আমার দুঃখের কথা নিয়ে তোমার ভাবনা করার দরকার হয় না। জীবনের এই সত্যটি বুঝতে পারলে আমাকে আর বাড়িতে ধরে রাখবার জন্য আধ-আধ ভাষায় এই অনুরোধ জানাতে না।

কিন্তু এসব কথা এই সাত বছর বয়সের একটা মেয়েকে বলবারই বা দরকার কি? এইটুকু মেয়ে ওর জীবনের সেই জটিল রহস্যের তত্ত্ব বুঝবেই বা কি? ইমা যেমন তার খেলনা ঘরের পুতুলগুলির দুঃখ দেখে দুঃখিত হয়, তেমনই হেমেনের মতো প্রকাণ্ড একটা অপমানিত জীবনের পুতুলকেও সেইরকম দুঃখিত মনের সান্ত্বনা জানাচ্ছে।

আজকাল এই পাড়ার, রাঁচির এই ডোরাণ্ডার লোকেরা আড়ালে আড়ালে ফিসফাস করে, হেমেনবাবুর জীবনটা বড়ই অশান্তির জীবন, এবং তাই তো হেমেনবাবুর আর কোন ছেলেপিলে হলো না।

হেমেনের জীবনের অশান্তিকে দেখতে ভুল হয়নি কারও। চোখে দেখতে পাওয়া গেলে বুঝতেই বা ভুল হবে কেন? হেমেন আর সুরীতিকে এই সাত বছরের মধ্যে কোনদিন একসঙ্গে বেড়াতে যেতে দেখা যায়নি। অথচ হেমেন আর সুরীতি দু'জনেরই সারাদিনের মধ্যে অন্তত একটিবার বাইরে বেড়িয়ে আসা অভ্যাস। ঠিক যে-সন্ধ্যায় হেমেনকে দেখা যায় মোরাবাদী পাহাড়ের কাছে, ঠিক সেই সন্ধ্যায় দেখা যায় রিক্সায় চড়ে সুরীতি লেকের পাশের রাস্তা দিয়ে বেড়িয়ে ফিরছে। অফিস থেকে বাড়ি ফিরে এসে সুরীতিকে বাড়ির মধ্যে ক'দিনই বা দেখতে পেয়েছে হেমেন? জানকীরাম শুধু খবর জানিয়ে দিয়েছে, মাইজী হিনু বেড়াতে গিয়েছেন।

অথচ এই ডোরাণ্ডার লোকেরাই সাত বছর আগে হেমেন আর সুরীতির বিয়ের সংবাদ শুনে আশ্চর্য হয়ে বলেছিল, অ্যাঁ, এ যে একেবারে বিশ্বজয়ী প্রেমের ঘটনা!

বড় অকস্মাৎ, শুধু দু'তিনটি দিনের দেখা-শোনার পরেই ডোরাণ্ডার হেমেন আর হিনুর সুরীতির বিয়ে হয়ে গেল। সুরীতির মতো বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে হেমেনের মতো সাধারণ লোকের বিয়ে হবার কথা নয়। শাস্ত্রবিশ্বাসী সন্তোষবাবুর পক্ষেও কার্তিক মাসে এবং তার উপর আবার আইন অনুসারে রেজিস্টারী করিয়ে মেয়ের বিয়ে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু সময়-সংস্কার-শাস্ত্র ও লগ্নের কোন বাধাই বাধা হয়ে উঠতে পারল না। বিয়ে হয়ে গেল।

পাত্রের চলতি বাজার দর অনুসারে হেমেনের মতো পাত্র যত টাকা বরপণ পেতে পারে, সুরীতিকে বিয়ে করে তাঁর পাঁচগুণেরও বেশি বরপণ পেল হেমেন। এবং সন্তোষবাবু বিশেষ খুশি হয়ে তাঁর মেয়ে-জামাইকে দেড় বছরের জন্য আলমোড়াতে গিয়ে মনের আনন্দে থাকবার জন্য আরও কয়েক হাজার টাকা খরচ করলেন।

বিশ্বজয়ী প্রেমের ঘটনা বলে মনে করে যারা সেদিন আশ্চর্য হয়েছিল, আজ তারাই আড়ালে আড়ালে, এমনকি প্রকাশ্যেও বলে ফেলতে একটুও দ্বিধা করে না—আর বেশি দিন নয়, বাঁধন কাটল বলে! হয় সেপারেশন নয় ডিভোর্স। এইভাবে দাম্পত্যজীবন চলে না, চলতে পারে না।

চাকর জানকীরামের কাছ থেকে পাড়ার লোক অনেক খবর জেনে আরও নিঃসন্দেহ হয়। বাবু আর মাইজীর মধ্যে মাসের মধ্যে একটা দিনও কথাবার্তা হয় কিনা সন্দেহ। যদিও বা হয়, সেগুলি কথাবার্তা নয়। দু'জনের মধ্যে তীক্ষ্ণ ও তীব্র ও উন্মত্ত কতগুলি কথার বিনিময়। অনেক দিনের নীরবতার পর হঠাৎ এক-একদিন শুধু চার-পাঁচ মিনিটের জন্য দু'জনে দু'জনের মনের উপর যত ঘৃণা আর বিদ্বেষ ঢেলে নিজের কাজের অথবা ইচ্ছার দিকে চলে যায়।

বিয়ের পর পনেরটা দিন যেতে না যেতে, আলমোড়াতে আনন্দ নিয়ে থাকবার সেই সময়ে হেমেনের আত্মরাত্মা যেন নিষ্ঠুর এক বঞ্চনার বিভীষিকাময় ছায়া দেখে চমকে উঠেছিল। হঠাৎ অসুস্থ হয়েছিল সুরীতি, এবং ডাক্তার ভদ্রলোক নিজেই হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে বলে উঠলেন, আমাকে ডেকে ভুল করেছেন, লেডি ডাক্তার ডাকুন। এবং লেডি ডাক্তার এসে খুশি হয়ে বললেন, চিন্তা করবার কিছু নেই, পেসেন্টের স্বাস্থ্য ও শরীর ঠিক আছে, আর চার মাস পরে আপনি আপনার প্রথম সন্তানের প্রাউড ফাদার হবেন হেমেনবাবু। খিলখিল করে হেসে উঠলেন লেডি ডাক্তার।

ঐ তো সেই মেয়ে, ঐ ইমা, যার দিকে তাকালে হেমেন আজও আলমোড়ার লেডি ডাক্তারের সেই ভয়ংকর খিলখিল হাসির শব্দ শুনতে পায় আর শিউরে ওঠে। কিন্তু সুরীতি সেদিনও হেমেনের মুখের দিকে যেমন শান্ত অথচ শাণিত দুটি চক্ষুর দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছিল, আজও তেমনিভাবে তাকায়। সেদিন যে কথা বলেছিল সুরীতি, আজও সে কথা বলে।—আমার

মান বাঁচাবার জন্য তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই মাত্র। এবং সেজন্যে টাকাও তোমাকে দেওয়া হয়েছে। তবে আর কেন? ওরকম আশ্চর্য হবার কোন দরকার নেই।

হুংকার দিয়েছিল হেমেন—কার কাছ থেকে, কোন্ হতভাগার বুকের কাছে গিয়ে খেলা করে তুমি এই অবস্থা করেছ?

সুরীতি বলে—চুপ। চুপ করে থাকবে বলেই তোমাকে এত টাকা দেওয়া হয়েছে। সাহস থাকে তো আমাকে মেরে ফেলতে পার, কিন্তু ওসব কথা কখ্‌খনো বলবে না।

হেমেন—যার কাছ থেকে এই মেয়েকে পেয়েছ, তাকে বিয়ে করলেই তো পারতে।

সুরীতি—সেটা কি তুমি শিখিয়ে দেবে? তার জন্য তৈরি হয়েই আছি। তারই সঙ্গে একদিন বিয়ে হবে।

হেমেন—কবে?

সুরীতি—যেদিন সুযোগ হবে।

হেমেন—তা'হলে আমি কালই সেপারেশনের জন্য দরখাস্ত করে দিই।

সুরীতি—দাও!

কিন্তু সাত বছরের মধ্যে সেপারেশনের জন্য দরখাস্ত করেনি হেমেন, এবং নিজেই তার এই ভীরুতা দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে। সুরীতির মেয়ে ইমা হেমেনের চোখের সামনে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠেছে। এখন ইমার বয়স সাত বছর এবং ওর মুখের দিকে তাকাতেও ইচ্ছা করে না হেমেনের। এই মেয়ের প্রাণটা যে ওই সুরীতির ভয়ংকর নিঃশ্বাস দিয়ে তৈরি। মুখটায় হুবহু একেবারে বসানো সুরীতির মুখ। কিন্তু শুধু আজই নয়, সেই এক বছর বয়সের ইমার মুখের দিকে তাকাতে ইচ্ছা করেনি হেমেনের। এমন ঘটনাও কতবার হয়েছে, হেমেনের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে ঢলে পড়েছে ইমা, কিন্তু হঠাৎ সাপের কামড় খাওয়া মানুষের মতো ভয় পেয়ে আর যন্ত্রণাক্ত হয়ে ছুটে সরে গিয়েছে হেমেন। এই মেয়ে শুধু আইনত হেমেনের মেয়ে। পৃথিবী জানে ইমাও জানে যে, সে হলো হেমেনের মেয়ে। কিন্তু সুরীতি জানে, একদিন সুযোগ হলেই এই মেয়েকে তার সত্যিকারের বাপের কোলের কাছে নিয়ে গিয়ে ফেলবে সুরীতি। প্রতীক্ষায় আছে সুরীতি, সময় হলেই তার প্রেমের জীবনের সেই মানুষের কাছে চলে যেতে হবে।

কিন্তু কোথায় সেই মানুষ? কে সে? শতবার শত হুংকার দিয়েও সুরীতির সেই প্রিয়জনের পরিচয় জানতে পারেনি হেমেন। লণ্ডন থেকে প্রতি সপ্তাহে সুরীতির কাছে যে চিঠি আসে সেই চিঠির ভিতরেও কোন নাম থাকে না। সুরীতি কিছু না বলুক, হেমেনের বুঝতে আর কিছু বাকি নেই যে সুরীতির জীবনের আগ্রহ শুধু লণ্ডন থেকে একজনের ফিরে আসার পথ চেয়ে বসে আছে।

বোধহয় নিজেরই মান বাঁচাবার এক দুর্মর মোহ, নইলে এতদিনে সেপারেশনের জন্য দরখাস্ত করে দিতে পারত হেমেন, এবং লোকের কানের কাছে চেঁচিয়ে বলে দিতে পারত, আমি ইমার বাবা নই, ইমার বাবা আছেন লণ্ডনে।

কিন্তু কিসের জন্য মান বাঁচাবার এই মোহ? মান কি সত্যিই আর কিছু বেঁচে আছে? কে না জেনে ফেলেছে, স্ত্রী সুরীতি হেমেনকে শ্রদ্ধা করে না? হেমেন শুধু নামেই স্বামী, তাই সুরীতির আর কোন ছেলেপিলে হয় না।

হর্ন বাজায় ট্যাক্সি। শুনে চমকে ওঠে হেমেন। হ্যাঁ, হঠাৎ ভুলেই গিয়েছিল হেমেন, চোখের সামনে রঙিন ফ্রকপরানো একটা সাত বছর বয়সের মূর্তিকে দেখতে পেয়ে মনটা যেন এলোমেলো হয়ে অন্য চিন্তার মধ্যে গিয়ে এতক্ষণ ছটফট করছিল। কী আশ্চর্য, ইমা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ইমার বাবা যে এখন লালবাগের এক হাস্যোজ্জ্বল নিভৃতের মধ্যে বসে ইমার মার কাছে বিলাতের গল্প বলছে। আজই বিলাত থেকে বাড়িতে ফিরেছে ইমার বাবা। আর ক'দিন পরেই তো, এই ইমা তার মার হাত ধরে তার বাবার কাছে চলে যাবে।

ইমার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে গিয়ে হেসে ফেলে হেমেন—আমার এখানে থাকতে আর একটুও ভালো লাগছে না ইমা, তাই চলে যাচ্ছি।

ইমা বলে—ভালো লাগবে, তুমি যেও না।

হেমেন হাসে—কেন ভালো লাগবে?

ইমা—আমি তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাব।

হেমেনের চোখ শিউরে ওঠে—কি বললে?

ইমা—আমি তোমাকে একটুও রাগাব না, ঝগড়া করব না, আমি কখ্‌খনো লালবাগে বেড়াতে যাব না।

যেন একটা তীব্র উত্তাপের আবেগ ছুটে এসে হঠাৎ নিংড়ে দিয়েছে হেমেনের সন্ত্রস্ত দুটি চক্ষু। মাথা নেড়ে, কাঁধের আলোয়ানে চোখ ঘষে ঘষে, তারপর চোখ বন্ধ করে যেন ঘুমন্ত পাগলের মতো বিড় বিড় করে হেমেন—তা কেমন করে হবে? অসম্ভব। তুমি তো তোমার মায়েরই মেয়ে।

ইমা বলে—না বাবা। আমি তোমার মেয়ে।

চেয়ারের উপর বসে পড়ে হেমেন। তারপরেই উঠে এসে ইমার ছোট্ট হাতটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে—ট্যাক্সিকে ফিরে যেতে বলি ইমা? কেমন?

ইমা—হ্যাঁ বাবা।

চলে যায় ট্যাক্সি। বারান্দার উপর ইমার হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকে হেমেন, বোধহয় রাতের অন্ধকার দেখবার জন্য। কিংবা বোধহয় প্রার্থনা করছিল হেমেন, কালই ডিভোর্স দাবী করে দরখাস্ত করুক সুরীতি। মঞ্জুর হয়ে যাক সুরীতির দরখাস্ত। বিলেত ফেরত প্রেমিককে বিয়ে করুক সুরীতি, কিন্তু হে ভগবান, সুরীতি যেন ইমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার অধিকার না পায়। যেন এইটুকু করুণা করে আদালত।

সামনের বাড়ির কেশববাবু জানালা খুলেই হঠাৎ বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন—কি ব্যাপার হেমেনবাবু? মিসেসকে একা নেমন্তন্নে পাঠিয়ে বাড়ি পাহারা দিচ্ছেন বুঝি?

হেমেন—হ্যাঁ।

কেশববাবু—শুনেছেন তো খবর?

হেমেন—কি?

কেশববাবু—লালবাগের সুধাকান্ত বিলেত থেকে মেম বিয়ে করে নিয়ে এসেছে।

—তাই নাকি? বলতে গিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে হেমেন। হেমেনের কানের কাছে সারা পৃথিবীটা যেন হো হো করে হেসে উঠেছে। ইমার হাতটা আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরে হেমেন। এরই মধ্যে, সামনের এই অন্ধকারের মধ্যে লুকানো এক আদালত যেন হেমেনের জীবনের এই আবেদন এরই মধ্যে মঞ্জুর করে দিয়েছে।

রাত এগারটা। কিন্তু সুরীতি এখনও ফিরে আসে না কেন?

একটা সাইকেল ছুটে এসে থামে।

হিনুর বিখ্যাত বড়লোক সেই সন্তোষবাবুর চাকর, অর্থাৎ সুরীতির বাপের বাড়ির চাকর সনাতন সাইকেল থেকে নেমেই খবর দেয়—দিদিমণি আজ আর ফিরবেন না। শরীর খুব অসুস্থ।

পৃথিবীটা আর একবার হো হো করে হেসে ওঠে হেমেনের কানের কাছে। লালবাগ থেকে তাহলে সোজা বাপের বাড়িতে গিয়ে পড়েছে সুরীতি। চাকাভাঙ্গা রথের মতো আছড়ে পড়েছে সুরীতির এতবড় প্রতীক্ষার হতাশ অদৃষ্ট! আজ আসবে না সুরীতি, কাল না এলে এবং অনন্তকাল না এলেও ক্ষতি কি? চিরস্থায়ী হোক সেপারেশন।

ইমাকে কোলে তুলে নিয়ে ঘরের ভিতরে চলে যায় হেমেন।

বড় তাড়াহুড়ো করে বিয়েটা হয়ে গেল। কিন্তু একথা ভেবে সেদিন কারও মনে কোন আক্ষেপ দেখা দেয়নি। বরং সকলেই খুশি হয়েছিল। বীথিকার তো মুখ দেখই বুঝতে পারা গিয়েছিল, বীথিকা যেন ওর আশার বেশি কিছু পেয়ে গিয়েছে। খুশি হয়েছিলেন বীথিকার কাকা আর কাকিমা। খুশি হয়েছিলেন বীথিকার বাবা আর মা। যার সঙ্গে বীথিকার বিয়ে হলো, সেই অভিজিৎ-এর মা আর বাবাও কম খুশি হননি।

আর অভিজিৎ? সে-ও খুশি হয়েছিল বৈ কি। বিয়ের আসরে বসে, ঘরভরা লোকের চোখের সামনেই দুচোখ একেবারে অপলক করে বীথিকার মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিল অভিজিৎ। রেজিস্ট্রার দয়ালুবাবু যখন অভিজিৎ-এর হাতের কাছে খাতাটা এগিয়ে দিলেন, তখনও অভিজিৎ-এর চোখ দুটো যে অনিমেষলোচন ধ্যানীর চোখের মতো একটা বিস্ময়ের আবেশে সুস্থির হয়ে গিয়েছিল। একবার একটা লাজুক হাসিও অভিজিৎ-এর মুখে ফুটে উঠেছিল। সেটাও খুব স্পষ্ট করে দেখতে পেয়েছিলেন অভিজিৎ-এর বাবা আর মা। সেই মুহূর্তে তাঁদের দু'জনের চোখ খুশির হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

তার আগে যেদিন অভিজিৎ-এর কাছে এসে বীথিকার নামটা প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন অভিজিৎ-এর মা, সেদিনও দেখা গিয়েছিল, যেন হঠাৎ চমকে উঠল অভিজিৎ। হাতের বইটা বন্ধ করে দিয়ে কিছুক্ষণ যেন একেবারে আশ্চর্য হয়ে সামনের লনের পাশে অশোকটার দিকে তাকিয়ে রইল। ফুলে ফুলে ভরে আছে সেই অশোক। কে না জানে, এই কিছুক্ষণ আগে ঐ অশোকের কাছে দাঁড়িয়েছিল বীথিকা। এ বাড়িতে প্রায় রোজই আসে বীথিকা। যেদিন যখনই আসুক না কেন, ঐ অশোকটার ফুলভরা রঙিন গৌরবের দিকে কিছুক্ষণ না তাকিয়ে থেকে বীথিকা চলে যায় না।

বীথিকা দেখেছিল, সেই ছোট ঘরটার ভিতরে এক গাদা বই-এর মধ্যে যেন ডুবে বসে আছে অভিজিৎ। কোন সন্দেহ নেই, অভিজিৎ-এরও বই পড়ার মন এক একবার চমকে উঠেছে। দেখতে পেয়েছে অভিজিৎ, সুন্দর ছবির মতো হঠাৎ আবির্ভাব যেন অশোকের ছায়া পার হয়ে লনের ওদিকে চলে গেল।

ঘটনাটা যেন অনেকগুলি শুভ আকস্মিকের রাশিফল। এক মাস আগে বীথিকা কখনও কল্পনা করেনি যে, পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই কলকাতা ছেড়ে কয়েকটা দিনের জন্য কাকা আর কাকিমার কাছে গিয়ে থাকবার ইচ্ছা হবে। কাকা আর কাকিমাও আশা করেননি যে, বীথিকা হঠাৎ কলকাতা ছেড়ে পাহাড় আর জঙ্গলে ঘেরা এই নিরালা জনপদের আলোবাতাসের মধ্যে এসে একটা মাস কাটিয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠবে।

পরীক্ষার শেষ দিনটা শেষ হয়ে যেতেই একটা ভয়ের গ্রাসে পড়েছিল বীথিকার মন। বোটানিটাই ডোবাবে ; খুব কঠিন প্রশ্ন এসেছিল, আর খুবই খারাপ উত্তর দিয়েছিল বীথিকা। পাস করতে পারবে বলে মনে করবার জোরটুকুও আর মনের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছিল না। আক্ষেপও করেছিল বীথিকা, এ ছাই বোটানি নেওয়াই ভুল হয়েছে। খুব ভালো হতো, যদি ফিলসফি নেওয়া হতো।

যদি ফেল করি তবে লেখাপড়ার সব চেষ্টার এখানেই ইতি ; তা ছাড়া, ফিরে গিয়ে আর কলকাতাতে থাকবার দরকার কি? কাকা আর কাকিমার কাছেই থাকা যাবে, যতদিন না...।

মনে মনে তৈরি হয়েই চলে এসেছিল বীথিকা। যত দিন না পরের বাড়ি যাবার ডাক আসে, ততদিন এখানেই মনের সুখে থাকা যাবে।

অভিজিৎ-এর বাবা আর মা দুজনের কেউ ভাবতে পারেননি যে, পাটনার নতুন কলেজের অধ্যাপনার কাজটা হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে আসবে অভিজিৎ। ভালোই হয়েছে, চাকরি

না করলেও অভিজিৎ-এর দিন ভালোই চলে যাবে! বাপ-মায়ের একমাত্র ছেলে অভিজিৎ। তিনটে গালাকুঠীর মালিক যিনি, আর বহু চা-বাগানের বিস্তর শেয়ারের অধিকারী যিনি, সেই রাখালবাবুর এক মাত্র ছেলে অভিজিৎ একটা মাস্টারী চাকরি নিয়ে পাটনাতে পড়ে থাকবে কেন, কথাটা একদিন অনুকূলবাবু বলেছিলেন।

পাহাড়ে আর জঙ্গলে ঘেরা ছোট্ট কদমডিহি, রাঁচি এখানে থেকে উনত্রিশ মাইল। রাখালবাবুর বাড়িটা কিন্তু আকারে-প্রকারে যে-কোন শহুরে ম্যানসনকেও হার মানায়। রাখালবাবুর বাড়ির বাগানেও রাত্রিবেলা বিজলী বাতি জ্বলে। বাগানে পোষা ময়ূর আর হরিণ চরে বেড়ায়। প্রতি সপ্তাহে রেল-পার্শেল হয়ে অভিজিৎ-এর বই আসে। সেই সব বইয়ের বোঝা বয়ে আনবার জন্য একটা চাকর প্রতি সপ্তাহে তিন মাইল দূরের রেল স্টেশনে যায়। অভিজিৎ-এর জীবনের সবচেয়ে বড় আগ্রহের সম্পদ হলো যত ফিলসফির বই। যত স্পিনোজা কাণ্ট আর ডেকার্ট। যত জেমস্ ডিউই আর রাধাকৃষ্ণণ। জৈমিনী পতঞ্জল আর গৌতমের যত ভাষ্যের ভিড় তো আছেই, শেলফে আর ঠাঁই নেই। অভিজিৎ-এর বিছানার উপরেও দেখতে পাওয়া যায়, হয়তো ছড়িয়ে পড়ে আছে ম্যাথেমেটিক্যাল ফিলসফির তিনটে ভল্যুম ; কিংবা ত্রিপিটকের কলম্বো এডিশন।

বীথিকার কাকা অনুকূলবাবুর বাড়িটাও সৌখীনতায় কম যায় না। বাড়ির চেহারাতে ইটের চেয়ে কাঠের কাজই বেশি বলে মনে হয়। অনুকূলবাবু এই অঞ্চলের সবচেয়ে পুরনো ফরেস্ট কন্ট্রাক্টর। তাঁর টিমবার ইয়ার্ড লম্বায় প্রায় এক মাইল। করাত কলটাও দশ বছর ধরে চলছে। সম্প্রতি কাঠ সীজন করবার যন্ত্রপাতি বসিয়েছেন।

অনুকূলবাবুর বাড়ির বাগানটা কিন্তু তেমন সৌখীন নয়। বাগানটাকে সূর্যমুখীর একটা জঙ্গল বলে মনে হয়। বীথিকাও বলেছিল—আপনি শুধু গাছ কাটতে জানেন কাকা। গাছকে বাঁচাতে জানেন না।

—তার মানে? একটু আশ্চর্য হয়ে আর হেসে প্রশ্ন করেছিলেন অনুকূলবাবু।

বীথিকা বলেছিল—রাখালবাবুর বাড়ির অশোকের মতো দু'চারটে অশোক আপনিও ইচ্ছে করলে এই বাগানে রাখতে পারতেন।

—অশোক ফুল তোর ভালো লাগে? কিরকম যেন স্নেহাভিভূত মৃদুস্বরে আর উৎসুক চোখে প্রশ্ন করেছিলেন অনুকূলবাবু।

বীথিকাও বেশ উৎফুল্ল স্বরে উত্তর দিয়েছিল—নিশ্চয়, খুব ভালো লাগে।

অনুকূলবাবু বলেছিলেন—আচ্ছা।

সেদিনের পর আর একটি দিনও দেরি করেননি অনুকূলবাবু। রাখালবাবুর বাড়িতে গিয়ে একেবারে খোলামেলা ভাষায় প্রস্তাব করেছিলেন—ইচ্ছে করেন তো আপনার ছেলের জন্যে একটি ভালো মেয়ে পেতে পারেন রাখালদা।

কথাটা শুনে অভিজিৎ-এর মা প্রায় ছুটে এসেছিলেন।—কে? কার কথা বলছেন? বীথিকা?

অনুকূলবাবু—হ্যাঁ।

রাখালবাবু—কী অদ্ভুত যোগাযোগ! আমি আর উনি এই ক'দিন ধরে ঠিক এই কথাই বলাবলি করছিলাম, অনুকূল!

ঠিক কথা, অভিজিৎ-এর বইপড়া জীবনের রকম-সকম দেখে বেশ চিন্তায় পড়েছিলেন রাখালবাবু। অভিজিৎ-এর মা তো ভয় পেয়ে নানারকম মানত করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। অনুকূলবাবুর কথাগুলিকে তাই ভয়ভাঙ্গা আশীর্বাদের ভাষা বলে মনে হয়েছিল।

তারপর আর দেরি হয়নি। বীথিকার নাম শুনে অভিজিৎ-এর চোঠ দুটো যেন বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েছে ; সেদিন সে দৃশ্য দেখে বীথিকাকেও একটা আশীর্বাদ বলে মনে

করেছিলেন অভিজিৎ-এর মা।

কে জানে কেন, রাখালবাবুর শুধু একটা দাবি ছিল।--কলকাতাতে নয়, এখান থেকে মাত্র ঊনত্রিশ মাইল দূরে রাঁচিতেই বিয়ের অনুষ্ঠান হয়ে যাক।

আপত্তি করেননি অনুকূলবাবু। বীথিকার বাবা আর মা-ও আপত্তি করেননি। অভিজিৎ-এর মতো ছেলের হাতে মেয়েকে সঁপে দেবার সুযোগ পেয়েছেন, সুযোগটাকে দৈব অনুগ্রহের একটা দান, একটা সৌভাগ্য বলেই মনে করেছিলেন তাঁরা। দেরি করা উচিত নয়। কলকাতা থেকে বীথিকার বাবা আর মা আশ্চর্য হয়ে কদমডিহিতে এসেছিলেন।

কাকিমার প্রশ্নের উত্তরে বীথিকাও মুখ খুলে বলে দিতে পেরেছিল--আমার আপত্তি করবার কি আছে? ফিলসফির মানুষ যদি রাজি হয়ে থাকেন, তবে আমিও রাজি।

কাকিমাও দেখে খুশি হয়েছিলেন, এত স্বচ্ছন্দে কথা বলতে গিয়েও বীথিকার মুখের উপর যেন এক ঝলক রক্তাভ খুশির লজ্জা উথলে উঠেছে।

বিয়েটা রাঁচিতে হয়েছিল, কিন্তু বাসরের আয়োজন হয়েছিল কদমডিহির এই বাড়িতে, যেখানে বাগানের ঘাসের উপর খুশি হয়ে ময়ূর পেখম কাঁপিয়ে নাচে আর অশোকের গায়ে গলা ঘষে নধর চিতল হরিণ।

ঘরে কেউ ছিল না, তবু অনেকক্ষণ কথা বলেনি অভিজিৎ।

বীথিকা তাই একটু আশ্চর্য হয়ে আর হেঁটমাথা তুলে অভিজিৎ-এর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। তখনই কথা বলেছিল অভিজিৎ। আর সেই কথা শুনে বীথিকার চোখের তারা দুটো থরথর করে কেঁপে উঠেছিল।

—অনন্ততা বলতে তুমি কি বোঝ? তোমার কি ধারণা? দু'চোখে কী অদ্ভুত এক মুগ্ধতা উথলে দিয়ে প্রশ্ন করছে অভিজিৎ। বীথিকার মনে হয়েছিল, অভিজিৎ যেন এই ঘরের মধ্যে কোন অদৃশ্য মায়াসুন্দর ছায়ার সঙ্গে কথা বলছে।

বীথিকা—কি বললে?

অভিজিৎ--আরম্ভ নেই, শেষও নেই, এরকম একটা অস্তিত্ব কি করে সম্ভব?

বীথিকা—আমাকে জিজ্ঞাসা করছ?

অভিজিৎ--নিশ্চয়। তুমি যে আমার স্ত্রী।

বীথিকা—স্ত্রীকে একথা জিজ্ঞাসা করবার কোন মানে হয় না।

বীথিকার গলার স্বরে মৃদুতা থাকলেও কথাগুলির মধ্যে যেন একটা ভয়ানক সন্দেহের জ্বালা ছটফট করে উঠছিল। আর সেই মুহূর্তে অভিজিৎ-এর দু' চোখের প্রশ্নাকুল মুগ্ধতাও যেন করুণ হয়ে গিয়েছিল।

সে-রাতের পর আর বোধহয় সাতটা দিন ও রাত পার হয়নি, কদমডিহির দুই বাড়ির মন দুঃসহ এক আক্ষেপে করুণ হয়ে গিয়েছিল। না, বিয়েটা এত তাড়াহুড়ো করে না হলেই ভালো হতো। আরও কিছুদিন অপেক্ষা করা উচিত ছিল।

অভিজিৎ-এর বাবা আর মা এত ভয় পেয়েছিলেন যে, লজ্জিত হতেও ভুলে গিয়েছিলেন। অনুকূলবাবুর হাতে ধরে ক্ষমা চেয়েছিলেন রাখালবাবু—আমাকে মাপ কর অনুকূল। বড় অন্যায় করে ফেলেছি। খুবই ভাল হয়েছে। একটু দেরি করা উচিত ছিল।

অনুকূলবাবুর গলার স্বরও বেদনা চাপতে গিয়ে করুণ হয়ে গিয়েছিল—ভুল আমাদেরও হয়েছে। অভিজিৎ-এর ফিলসফিকে আগেই সন্দেহ করা উচিত ছিল।

এখন কিন্তু আর সন্দেহ করবারও কোন প্রশ্ন নেই। অভিজিৎ নিজেই নিজেকে ধরা পড়িয়ে দিয়েছে। সারাদিন ও রাতের মধ্যে একটা কথাও বলে না অভিজিৎ। বই পড়ে, বিড়বিড় করে, আর যেন প্রশ্নহীন অর্থহীন একজোড়া স্তব্ধ চোখের উদাস দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে কে জানে, কোন্ দিকে তাকিয়ে থাকে।

আর বীথিকা সারাটা দিন এতবড় বাড়ির সবচেয়ে ছোট ঘরটার মধ্যে একেবারে একলা হয়ে বিছানার উপর লুটিয়ে থাকে। বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে দিয়ে মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে উঠতেও হয়। অভিজিৎ-এর মা ছুটে এসে বীথিকার হাত ধরেন, মাথায় হাত বুলিয়ে দেন—তুমি আর একটিবার আমার কথাটা শোন, লক্ষ্মী মেয়েটি। অভিজিৎ-এর কাছে গিয়ে একটু বসো। চা হয়েছে, তুমি নিজের হাতে ওকে চা দিয়ে এস।

—কি দরকার? কথা বলতে গিয়ে বীথিকার বেদনার্ত গলার স্বর যেন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। অভিজিৎ-এর মা বলেন—আমার বিশ্বাস, তুমি কাছে গেলেই কথা বলবে অভিজিৎ।

এই অনুরোধ অবশ্য তুচ্ছ করেনি বীথিকা। একবার দু'বার নয়, অনেকবার এই অনুরোধের সঙ্গে যেন একটা চরম বোঝাপড়া করবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে অভিজিৎ-এর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে বীথিকা, হাতে চায়ের কাপ। কিন্তু মুখ তুলে বীথিকার মুখের দিকে তাকিয়েও যেন কিছুই দেখতে পায়নি অভিজিৎ। বীথিকা যেন কোন অস্তিত্বই নয়। শুধু বাগানের অশোকের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করেছে, আর স্পিনোজার একটা বিরাট ভল্যুমের পাতা উলটিয়ে কি যেন খুঁজেছে আর পড়েছে অভিজিৎ। চুপচাপ ফিরে গিয়েছে বীথিকা।

দুটো মাস এভাবেই পার হয়ে যাবার পর একদিন কাকিমা এসে বীথিকাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। কাকিমাও বড় করুণ স্বরে অনুরোধ করলেন—আমার একটা কথা শুনবে, বীথি?

—বলুন।

—অভিজিৎকে তুমি একটা চিঠি দাও।

—দরকার কি?

—আমার মনে হয়, তোমার চিঠি নিশ্চয় পড়বে অভিজিৎ, উত্তরও দেবে।

চিঠি দিয়েছিল বীথিকা। একটা দুটো নয়, বোধহয় কুড়ি-পঁচিশটা। কিন্তু কোন চিঠির উত্তর আসেনি। আর, তিনমাস পরে কাকিমারই সঙ্গে অভিজিৎ-এর বাড়িতে এসে দেখতে পেয়েছিল বীথিকা, খামে বন্ধ সেই সব চিঠি অভিজিৎ-এর পড়ার ঘরের বইয়ের যত এলোমেলো স্তূপের এদিকে ওদিকে আর ফাঁকে ফাঁকে ছড়িয়ে ও গড়িয়ে পড়ে আছে। একটা চিঠিও খোলেনি বা পড়েনি অভিজিৎ। বীথিকা বলেছিল—আর কেন কাকিমা? সবই তো দেখা গেল।

কাকিমা বললেন—হ্যাঁ।

অভিজিৎ-এর মা বললেন—না, আমার আর কিছু বলবার নেই।

সত্যিই তো, আর কি-ই বা বলবেন অভিজিৎ-এর মা? অভিজিৎ পাগল হয়েছে, এই সত্যে আর সন্দেহ কোথায়?

দুই

বি.এ. পরীক্ষার ফল বের হয়েছিল যেদিন, তারও পরে আরও দুটো বছর পার হয়েছে। বীথিকা বেশ বুঝে নিয়েছে বি.এ. পরীক্ষা পাস করলেও ভাগ্যের পরীক্ষায় জীবনটা ফেল করেছে। কাজেই কলকাতায় ফিরে গিয়ে মুখ দেখাবার কোন দরকার নেই। পাহাড়ে আর জঙ্গলে ঘেরা এই নিরালা কদমডিহির কাকার বাড়িই ভালো। ভালোই, কাকার বাড়ির বাগানে কোন বড় গাছের শোভা নেই। সূর্যমুখীর জঙ্গলে হিংসুটে বহুরূপী লিকলিকে জিভের চাবুক চালিয়ে রঙিন প্রজাপতি শিকার করে, তাও ভালো। অন্তত বীথিকার ভাগ্যটার চেয়ে ভালো ভাগ্য পেয়েছিল রঙিন প্রজাপতি। একটা নিষ্ঠুর ঠাট্টার সঙ্গে বিয়ে হওয়া এই জীবনটাকে এখানেই চুপচাপ কাটিয়ে দিতে পারলে আরও ভালো।

আরও একটা ভালো ব্যাপার ঘটে গিয়েছে, যে জন্যে বীথিকার কদমডিহির এই জীবন একটা স্বস্তি লাভ করেছে। অভিজিৎ এখানে নেই। রাখালবাবুর গালাকুঠির ম্যানেজার হৃদয়বাবু আর দুটো চাকরের খবরদারির অধীন হয়ে পাগল অভিজিৎ এখন আছে দেরাদুনে। তার আগে ছিল সিমলাতে। রাঁচির মানসিক হাসপাতালের লেফটেন্যান্ট কর্নেল হিল যা বলে দিয়েছেন তাই করা হয়েছে। খাওয়া-দাওয়া, কাজ, ঘুম, বিশ্রাম, খেলা, আর বেড়াবার যে সব নিয়ম করে দিয়েছেন, ঠিক সেই সব নিয়মের শাসনে ও আদরে অভিজিৎ-এর জীবনের দিনগুলি পার হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু...খবর পেয়েছে বীথিকা, যা ছিল অভিজিৎ আজও তাই আছে। একটুও বদলায়নি। সেই স্তব্ধ দৃষ্টি, সেই গম্ভীর মুখ, সেই মৃদু বিড়বিড়, আর সেই নির্বাক অস্তিত্ব। মাসে হাজার টাকার বেশিই খরচ করছেন রাখালবাবু, কিন্তু অভিজিৎ-এর মুখে একটি কথাও ফোটাতে পারেননি।

কাকা আর কাকিমার মন কিন্তু তাদের পুরনো বিষাদের মধ্যে আবার একটা দুশ্চিন্তার আঘাত পেয়ে চমকে উঠেছে। বীথিকা এখন আর সে রকম গম্ভীর হয়ে আর ঘরের নিভৃতে একলাটি হয়ে পড়ে থাকতে চায় না। বীথিকার চোখের তারা যেন মাঝে মাঝে ঝড়ের রাতের তারার মতো অদ্ভুতভাবে ঝিকমিকিয়ে হেসে ওঠে। অনুকূলবাবুও মাঝে মাঝে উদ্বিগ্ন হয়ে আর বীথিকার কাকিমাকে আড়ালে পেয়ে প্রশ্ন করেন—সৌম্যেন কি আজও এসেছিল?

কাকিমা—হ্যাঁ।

কদমডিহি থেকে পঁচিশ মাইল দূরে সিলিঘাটের নতুন কোলিয়ারির ম্যানেজার হয়ে এখন কাজ করছে যে, সেই সৌম্যেন হলো কাকিমারই বড়দির মেজ ছেলে সৌম্যেন। সৌম্যেন দেখতে বেশ সুন্দর। সৌম্যেন এক হাতে গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে আর-এক হাতে বন্দুক ফায়ার করতে পারে। সেই বন্দুকের এক গুলিতে জংলীপথের সন্ধ্যাবেলার ভালুক হুমড়ি খেয়ে গড়িয়ে পড়ে আর মরে যায়। সৌম্যেনের কাছে এই গল্প শুনে কাকিমার কাছেই গল্প করেছে বীথিকা।

ষোলআনা কাজের মানুষ সৌম্যেন। সৌম্যেন নিজেই বলেছে, বই-টই পড়ার কোন শখ-বালাই আমার নেই। ওসব আমার ধাতেই সহ্য হয় না। তার চেয়ে ঢের ভালো আমার এই হল্যাণ্ড এণ্ড হল্যাণ্ড। কাজের ফাঁকে কিংবা ছুটিছাটার দিনে অন্তত দু'চারটা হরিয়াল মেরে সময়টা সার্থক করি। আমি এক মিনিট চুপ করে বসে থাকতে পারি না, মাসিমা।

বোধহয় আস্তে কথা বলতে পারে না সৌম্যেন, চেঁচিয়ে কথা বলাই অভ্যেস। একদিন অনুকূলবাবুর চোখের সামনে মাত্র দুহাত দূরে দাঁড়িয়ে থেকেও চিৎকার করে একটা সুখবর জানায় সৌম্যেন—আমার জন্য একটা নতুন বাংলো তৈরির খরচ মঞ্জুর করিয়ে ছেড়েছি, মেসোমশাই। তিনমাস ধরে অবিরাম তাগিদ দিয়ে দিয়ে হেড-অফিসকে অস্থির করে

বীথিকার সঙ্গে যে-সব কথা বলে সৌম্যেন, সে-সব কথা ওদিকের বারান্দায় দাঁড়িয়েও শুনতে পান কাকিমা।

—তুমি সারাদিন কি করো বীথিকা?

—কি আর করব? চুপ করে বসে থাকি।

—কাজ করো না কেন?

—ভালো লাগে না।

—কেন?

—কোনো কাজে মন লাগে না।

—আমি বলতে পারি, একটা কাজ তোমার খুব ভালো লাগবে।

—কি?

—তুমি গাড়ি ড্রাইভিং শিখে ফেল।

—কে শেখাবে? আপনি?

—হ্যাঁ।

—আপনার সময় কোথায়?

—তুমি বললে সময় পাব না কেন?

বীথিকা কি উত্তর দিল, সেটা আর শুনতে পাননি কাকিমা। মনে হয়েছিল কাকিমার, বীথিকা বোধহয় হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে সৌম্যেনের কাছ থেকে সরে গিয়ে অন্য দিকে চলে গেল।

এর পর আর কোনদিন বীথিকাকে সন্দেহ করবার কোন দরকার হলো না। বীথিকা নিজেই নিজেকে ধরা পড়িয়ে দিয়েছে। কবে কোন্ সময়ে সৌম্যেন আসবে, ঘটনার নিয়মটাকে যেন মনেপ্রাণে আর স্বপ্নেও সব সময় স্মরণ করছে বীথিকা। একটুও ভুল হয় না। মঙ্গলবার বিকেলবেলা আর রবিবারে সকাল বেলা গেটের কাছে এসে বীথিকা যেন ব্যাকুল এক আশায় অভিসারিকার মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

দেখে মনে হয়, বীথিকার প্রাণটাও যেন আশ্বস্ত হয়েছে। না, ভয় করবার কিছু নেই। সৌম্যেন ভুলেও কোন বই ছোঁয় না। সৌম্যেন একটুও গম্ভীর হয় না। সৌম্যেন অবিরাম কথা বলে। ভালোই তো। এক মিনিটও স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না সৌম্যেন। কাজ কথা খেলা আর খুশির এই চমৎকার অশান্ত মানুষটি ইচ্ছে করলে রোজই এখানে আসতে পারে, আসতে চায়ও বোধহয়। ভাবতে ভালো লাগে বীথিকার। বিশ্বাস করতে ইচ্ছাও করে বৈ কি।

কাকিমা সেদিন একেবারে স্পষ্ট করে শুনতে পেলেন, গেটের কাছে যেন দুর্বার একটা অভিমান ক্ষুব্ধ হয়ে সৌম্যেনের সঙ্গে কথা বলছে।—তুমি তো ইচ্ছে করলে রোজই একবার আসতে পার, তবু আস না কেন?

সৌম্যেন বলে—তার চেয়ে ভালো হয় না কি, যদি...।

বীথিকা—কি?

সৌম্যেন—তুমি আমার ওখানে চলে যাও।

বীথিকা—তার মানে?

সৌম্যেন হাসে—তার মানে, মাসিমাকে এবার স্পষ্ট করে বলেই দাও।

কাকিমা ব্যস্তভাবে জানালার কাছে এসে গেটের দিকে তাকালেন। হ্যাঁ, বেশ স্পষ্ট দেখতেও পাওয়া যাচ্ছে, মাথা হেঁট করে আর একেবারে নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বীথিকা। কাকিমার চোখের দৃষ্টিটা হঠাৎ যেন অদ্ভুত এক মমতার আবেশে ঝাপসা হয়ে যায়। মেয়েটা যেন একটা সৌভাগ্যের দাবির কাছে মাথা পেতে দাঁড়িয়ে আছে, আপত্তি করতে পারছে না বীথিকা। আপত্তি করবার কোন ইচ্ছেও নেই।

একটু আশ্চর্যও হয়েছিলেন কাকিমা। সৌম্যেনের কাছে কিছুই তো অজানা নয়। বীথিকার দুর্ভাগ্যময় বিয়েটার সব ইতিহাস সৌম্যেন শুনেছে। অনুকূলবাবু তো এই সেদিনও অভিজিৎ-এর মনের রোগের শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে দুঃখ করে নানা কথা সৌম্যেনের কাছে বলছিলেন। মস্তিষ্কের প্যারালিসিস নয়, স্মৃতিবিলোপ কি না তাও স্পেশ্যালিস্টরা জোর করে বলতে পারছেন না। লস্ অব নার্ভ বলেও মনে হচ্ছে না। খুবই জটিল রকমের ইনস্যানিটি। কোনদিন সারবে বলে মনে হয় না।

সৌম্যেন শুধু বলেছিল—এটাও এক ধরনের মৃত্যু। প্রাণ নিয়েও মরে থাকা।

অনুকূলবাবু সায় দিয়ে বলেছিলেন—তাই।

তবে আর আপত্তি করবার কি আছে? যেমন সৌম্যেনের ধারণার কাছে তেমনই বীথিকার জীবনের কাছে পাগলা অভিজিৎ আজ আর কোন সজীব অস্তিত্বই নয়। তবে বীথিকার সঙ্গে

সৌম্যেনের বিয়ে হতে বাধাই বা কোথায়?

কাকা আর কাকিমার আপত্তি দূরে থাকুক, তাঁরা বরং একটু বেশি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কলকাতাতে বীথিকার বাবা আর মাকে চিঠি লিখে সব কথা জানালেন। বাবা আর মারও কোন আপত্তি নেই, কারণ সৌম্যেনকে তাঁরাও ভালো করে চেনেন।

অনুকূলবাবু একদিন রাখালবাবুর বাড়ি থেকে ফিরে এসে খুশির স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন--না, রাখালদারও কোন আপত্তি নেই। অভিজিৎ-এর মায়েরও আপত্তি নেই।

রাখালবাবু বলেছেন, আর অভিজিৎ-এর মা আঁচল দিয়ে চোখ মুছে ফেলে হেসেছেন--আমরাও মনেপ্রাণে এই আশীর্বাদ করছিলাম, বীথিকার যেন আবার বিয়ে হয়। ভগবান করুন, বীথিকা যেন সুখী হয়।

অনুকূলবাবু--কিন্তু...

রাখালবাবু--কিসের কিন্তু?

অনুকূলবাবু--সবার আগে আদালতে দরখাস্ত করে বীথিকার জন্যে ডাইভোর্স মঞ্জুর করিয়ে নিতে হয়।

রাখালবাবু ফুঁপিয়ে ওঠেন--নাও। শিগগির নিয়ে ফেল। আমি বার্কলেহিল সাহেবের সার্টিফিকেট আনিয়ে দিচ্ছি, পাগল অভিজিৎ-এর সুস্থ হবার কোন আশা নেই।

বীথিকার জীবন আর মাত্র ছ'টা মাস অপেক্ষার দুঃখ সহ্য করেছিল, তারপর আর নয়। সূর্যমুখীর জঙ্গলে নতুন প্রজাপতির ভিড় দেখা দিতেই পাটনা থেকে খবর পেয়ে গেলেন অনুকূলবাবু, ডাইভোর্স মঞ্জুর হয়েছে, আর সৌম্যেন তার নতুন বাংলাতে উঠে গিয়ে ঘর সাজিয়েছে।

বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য বীথিকাকে সঙ্গে নিয়ে যেদিন পাটনাতে রওনা হলেন কাকা আর কাকিমা, সেদিন রাখালবাবু আর অভিজিৎ-এর মা বীথিকার জন্যে দুটি আশীর্বাদি ঢাকাই শাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

তিন

সিলিঘাট কোলিয়ারির ম্যানেজারের বাংলো, অর্থাৎ সৌম্যেনের ভালোবাসার আনন্দ দিয়ে সাজানো ঘর, অর্থাৎ শান্ত ও সুখী বীথিকার স্বামীর ঘর। বিয়ের পর তিন বছরের মধ্যে তিনবার কলকাতায় মার কাছে, আর বোধহয় ত্রিশ বার কদমডিহিতে কাকিমার কাছে এসেছে বীথিকা। কিন্তু প্রত্যেকবার সৌম্যেনও সঙ্গে এসেছে। তিন বছরের মধ্যে একটা দিনও সৌম্যেনকে না-দেখে থাকবার দুঃখ সহ্য করতে হয়নি বীথিকার। বীথিকার ভাগ্যের ফলক থেকে পুরনো ক্ষতের দাগ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গিয়েছে।

তিন বছরের মধ্যে ত্রিশবার কমদডিহিতে এসে কাকিমার কাছে গেলেও কোনদিন চোখে পড়েনি বীথিকার, রাখালবাবুর বাড়ির সৌখীন লনের পাশে অশোকের মাথা নতুন ফলের গৌরবে রঙিন হয়েছে কি না। সকালে আর বিকেলে অবশ্য সৌম্যেনের সঙ্গে রোজই বেড়াতে বের হয়েছে। চঞ্চল সৌম্যেনের সঙ্গে প্রায় ছুটে ছুটে হাঁটতে হয়েছে, শালবনের ধারে এসে সূর্যাস্ত দেখতে হয়েছে। ছুটোছুটি করে হাঁপিয়ে পড়তে আর ক্লান্ত হতেও ভালো লেগেছে বীথিকার।

সৌম্যেনের ব্যস্ততাও বড় মুখর। কাকিমার সামনেই জোরে চিৎকার করে ডাক দেয় সৌম্যেন--বীথি, বীথি।

অর্থাৎ চা চাই। দু'ঘণ্টা পর পর চা খাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে সৌম্যেন। আর বেশ বুঝতে পারা যায়, সৌম্যেন চায়, ঠাকুর রামজীবন নয়, বীথিকাই চা নিয়ে আসুক।

লজ্জা পেলেও নিজের মনের কাছে অস্বীকার করতে পারে না বীথিকা, বীথিকার হাতের ছোঁয়া চা খাওয়ার জন্য সৌম্যেনের এই পিপাসার হাঁকডাক শুনতে ভালোই লাগে বীথিকার। আরও লজ্জার কথা, সেদিন গেটের কাছে দাঁড়িয়ে সৌম্যেনের সঙ্গে গল্প করবার সময় সৌম্যেনের শক্ত মুঠোর বাঁধন থেকে হাতটাকে ছাড়িয়ে নিতে পারেনি বীথিকা, যদিও কাকা সামনে এসে পড়েছিলেন। এই লজ্জাটাকেও সহ্য করতে ভালো লেগেছিল। অদ্ভুত এক তৃপ্তির মধুরতায় ভরে উঠেছিল বীথিকার মন।

কিন্তু এবার, চৈত্রমাসের রোদের ঝাঁজে সূর্যমুখীর জঙ্গলটা যে-সময় বেশ শুকিয়ে যেতে শুরু করেছে, সে-সময় কলকাতা থেকে বীথিকার মা'র একটা চিঠি পেয়ে বেশ সাবধান হয়ে গেলেন কাকিমা। না, এবার কিছুদিন বীথিকা একাই এখানে থেকে যাক। সৌম্যেনের সাতদিনের ছুটি ফুরিয়ে যাবার পর এবার একাই সিলিঘাটে ফিরে যাক সৌম্যেন। বীথিকার মা লিখেছেন, বীথির ছেলেপুলে হবে বোধহয়, খবর পেলাম বীথির শরীরটা ভালো যাচ্ছে না।

কাকিমার দাবির কথাটা শুনতে একটুও ভালো লাগেনি বীথিকার। কাকিমা যে সত্যিই একটা শাসনের নিয়ম টেনে নিয়ে এসে সৌম্যেনকে দূরে সরিয়ে দিতে চাইছেন এটা দুঃসহ। জীবনে এই প্রথম দুজনকে ছাড়াছাড়ি হয়ে থাকতে হবে, ভাবতে গিয়ে বীথিকার প্রাণটা যেন বিরক্ত হয়ে উঠেছিল।

শেষে কাকার অনুরোধের চাপে পড়ে রাজি হয় বীথিকা। কাকা বললেন—সপ্তাহে অন্তত দুটো দিন তো আসতে পারবে সৌম্যেন, তবে আর এত আপত্তি করবার কি আছে?

সাতদিনের ছুটির মাত্র একটা দিন পার হতেই বীথিকার কাছে এসে হেসে ফেলে সৌম্যেন।—ভালো ব্যবস্থা হয়েছে।

—কি?

—কাকা বললেন, আর ছ'দিন পরেই আমাকে তাড়িয়ে দেবেন।

বীথিকাও হাসে—ভালোই হলো।

সৌম্যেন—যাক্, যা হবার তা হবে। এখন এই ছ'টি দিন অন্তত মনের সুখে একসঙ্গে বেড়িয়ে নেওয়া যাক্, কি বলো?

বীথিকা—নিশ্চয়।

অন্য ঘরের ভিতর থেকে কাকিমা হঠাৎ ডাক দিলেন—একটা কথা শুনে যাও বীথি।

বীথিকা এসে প্রশ্ন করে—কি কথা?

এমন কিছু দুশ্চিন্তার কথা নয়। সামান্য একটা চক্ষুলজ্জার কথা। কাকিমা বলেন—এ ক'দিন তোমাদের বাইরে বেড়ানো বন্ধ রাখাই ভালো।

বীথিকা—কেন?

রাখালবাবুর বাড়ির কাছ ঘেঁষে যাওয়া-আসা না করাই ভালো।

—কেন কাকিমা?

—যদিও নিরেট পাগল, তবু তো চক্ষুলজ্জার একটা ব্যাপার আছে।

—তার মানে?

—অভিজিৎ এখন এখানেই আছে। এক মাস হলো দেরাদুন থেকে ফিরে এসেছে।

—বয়ে গেছে। রূঢ় রুক্ষ ধিক্কারের মতো একটা উদ্ধত অপ্রসন্নতার স্বর বীথিকার সুখী মনের আক্রোশ হয়ে বেজে ওঠে। বোধহয় বলতে চায় বীথিকা, কিসের চক্ষুলজ্জা? পাগল অভিজিৎ আজ বীথিকার জীবনে একটা মৃত দুঃস্বপ্ন মাত্র।

কাকিমা অপ্রস্তুতের মতো বলেন—তবু...তার মানে...।

ঠিকই বলেছেন কাকিমা। বীথিকার মনটা যেন হঠাৎ শান্ত হয়ে গিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে। জেদ করবার কোন মানে হয় না। রাখালবাবুর বাড়ির অশোকের মাথা রঙিন ফুলে ভরে গেল

কিনা, এটা আজ আর বীথিকার জীবনে দেখবার মতো বা খোঁজ করবার মতো কোন তত্ত্ব নয়। কোন দরকার নেই। যে জায়গাটা বীথিকার কাছে আজ নিছক একটা প্রয়োজনহীন শ্মশান মাত্র সে জায়গার ধুলো মাড়িয়ে আর হাঁটাহাঁটি না করাই ভালো।

শরীরটা ভালো নেই, সৌম্যেনকেও বুঝিয়ে শান্ত করে বীথিকা, ক'দিন বাড়ির বাইরে ছুটোছুটি না করে..তার চেয়ে...সূর্যমুখীর জঙ্গলের আশেপাশে ঘুরে বেড়াতে ভালোই লাগবে মনে হয়।

দুটো দিন পার হয়ে গেলেও, সৌম্যেনের সঙ্গে বাড়ির বাইরে কোথাও বেড়াতে যায়নি বীথিকা। সারাটা দিন ওরা দুজনে বাড়ির ভিতরে কিংবা বারান্দায়, কিংবা কুঁয়োতলার সবজিক্ষেতের ধারে ধারে ঘুরে বেড়িয়ে গল্প করেছে। কিন্তু কী আশ্চর্য, কাকিমার চোখের ভয়-ভয় সতর্কতার ভাবটা তবু মুছে যায় না। গেট খোলার শব্দ শুনলেই কাকিমার যেন উদ্বিগ্ন হয়ে ঘরের জানালার কাছে এসে উঁকি দিয়ে তাকান। যেন সন্দেহ করছেন, বীথিকা আর সৌম্যেন বুঝি সত্যিই বাইরে বেড়াতে চলে গেল।

কাকিমার কাছে এসে বীথিকা বলে—কাকিমা কি-যেন ভাবছ বলে মনে হচ্ছে?

কাকিমা—না, ভাবনার কোন কথা নয়। তবে...।

—কি?

—বাড়ির বাইরে যেতে বারণ করেছি বলে রাগ করনি তো?

—রাগ করিনি, কিন্তু তুমিই বা এত ভয়ে ভয়ে কথা বলছ কেন?

—ভয় এই যে, তোমাকে দেখতে পেলে অভিজিৎ বোধহয় চিনে ফেলতে পারবে।

চমকে ওঠে বীথিকা—কেন? পাগল কি ভালো হয়ে গেছে?

—একটুও ভালো হয়নি, তবে পাগলামির রকম বদলেছে।

--তার মানে?

—আজকাল আর ফিলসফির বই-টই ছোঁয় না। সারাক্ষণ শুধু একগাদা চিঠি নিয়ে...।

—কি বললে?

—অভিজিৎ-এর মা বললেন, তোমারই লেখা সেই চিঠিগুলি খুলে টেবিলের উপর সাজিয়ে রেখেছে অভিজিৎ আর যখন-তখন, প্রায় সব সময়, চিঠিগুলি পড়ছে।

বীথিকার চোখের তারা দুটো হঠাৎ একেবারে অচঞ্চল হয়ে যেন একটা ভয়াল কৌতুকের কালো ছায়ার দিকে তাকিয়ে থাকে।

কাকিমা বলেন--পাগলামি বরং বেড়েছে বলে মনে হচ্ছে। যখন-তখন হাত তুলে কি-যেন ধরতে চায়, বিড়বিড় করে আর চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে।

জোরে একটা হাঁপ ছাড়ে বীথিকা—বদ্ধ পাগল।

কাকিমা—হ্যাঁ, অভিজিৎ-এর মা বলেন, বোধহয় চা খাওয়ার জন্য এরকম কাণ্ড করে অভিজিৎ। হাত তুলে চায়ের কাপ পেতে চায়। অভিজিৎ-এর মা এককাপ চা নিয়ে এসে হাতের কাছে যখন তুলে ধরেন, তখনও অবুঝের মতো ফ্যালফ্যাল করে মা'র মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে।

বীথিকার যেন একটা ছটফটে নিঃশ্বাসের জ্বালা চেপে প্রশ্ন করে—চা খায় না?

—খায়।

—কথা বলে না?

—না।

—কারও খোঁজ করেনি?

—কি বললে? হ্যাঁ...না...তবে একটা কাণ্ড করেছে।

—কি?

—তোমারই একটা ফটো, একটা রুমাল, একটা চিরুণি আর কাশির ওষুধের একটা শিশিকে ঠিক চিনতে পেরেছে। সেগুলিকে একসঙ্গে জড়ো করে টেবিলের দেরাজের ভিতরে রেখেছে।

—ওসব ছাইপাঁশ ও-বাড়িতে পড়ে ছিল নাকি?

—নিশ্চয় ছিল, তা না হলে পাবে কেমন করে?

—তোমাদেরও মাথা খারাপ।

—কি বললে?

—ও ছাইপাঁশ ও-বাড়ি থেকে সরিয়ে নিয়ে আসনি কেন?

—অত কি মনে থাকে ছাই! যাক্ গে, ওতে কি আসে যায়? সৌম্যেন চা খেয়েছে?

—হ্যাঁ।

—যাও তাহলে।

—যাচ্ছি।

যাবার জন্যে কিন্তু ব্যস্ত হয়ে ওঠে না বীথিকা। বীথিকার প্রাণটা যেন ভয়ানক এক আলস্যের ভারে নিথর হয়ে গিয়েছে। পাগল অভিজিৎ-এর মন অনন্ততার জিজ্ঞাসা ছেড়ে দিয়ে এ কোন্ ভয়ানক ফিলসফির মধ্যে ডুবেছে!

কাকিমা চলে যান। সৌম্যেনের চেঁচিয়ে-ডাকা আহ্বানের স্বর তখনো বেড়ে চলেছে—বীথি, তুমি কোথায়, একবার এখানে এস। বীথিকা কিন্তু চুপ করে বসেই থাকে।

উঃ, হঠাৎ দুহাত দিয়ে চোখ চেপে ধরে যখন ছটফট করে উঠেছে বীথিকা, ঠিক তখন কাকিমা এসে ভিতরে ঢুকলেন, আর ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—একি? কি হলো বীথি?

ছলছল করছে বীথিকার চোখ।—এ কী সাংঘাতিক পাগলামি, পাগলামি নয় বলেই যে মনে হয়।

কাকিমা হাসতে চেষ্টা করেন—ছিঃ, পাগলা মেয়ে, তুমি আবার ওসব কথা এত বাড়িয়ে ভাবছ কেন? ডাক্তার বলেছে, অভিজিৎ-এর পাগলাভাব একটুও সারেনি।

আবার হাঁপ ছাড়ে বীথিকা।—ভালো কথা।

কাকিমা—সৌম্যেন চা চাইছে, শুনতে পাওনি?

বীথিকা—শুনেছি। যাচ্ছি।

কিন্তু কাকিমা চলে গেলেও বীথিকা চলে যায় না। ব্যস্ত হয়ে ওঠবার প্রাণটা সত্যিই অলস হয়ে গিয়েছে। বোধহয় ভালো লাগে না এত ব্যস্ততাময় ভালোবাসার হাঁক-ডাক, এত ছুটোছুটি আর এত মেশামেশি। সবাই পাগল। কেউ শুধু স্তব্ধতা আর নীরতার মধ্যে পাগল হয়ে আছে, কেউ শুধু মুখরতা আর ব্যস্ততার মধ্যে পাগল হয়ে আছে। এই তো পার্থক্য। কে পাগল নয়?

টেবিলের উপরে মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল বীথিকা। ঘুম ঠিক নয়, ছেঁড়া-ছেঁড়া কাটা কাটা কতকগুলি তন্দ্রালু ভাবনার ভারে চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অনন্ততার রহস্য বুঝে নেবার জন্যে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসার উত্তর আশা করছে পাগল। স্ত্রী বলছে, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অনন্ততার কথা ভুলে যাও। আমিই যে তোমার...। বীথিকার তন্দ্রাটা যেন বিড়বিড় করে কথা বলতে থাকে।

এ কি? বীথিকার কাঁধের উপর একটা তোয়ালে আছড়ে পড়েছে। মুখ তুলে তাকায় বীথিকা। ঘরে কেউ নেই। কিন্তু বুঝতে অসুবিধে নেই, কাকিমা আবার ঘরে ঢুকেছিলেন। স্নান করবার জন্য তাগিদ জানিয়ে দিয়ে গেলেন কাকিমা।

বিকাল যখন হয়, তখন বুঝতে পারে বীথিকা, ছিঃ কী বিশ্রী ভুল! সৌম্যেনের ডাকে সাড়া দিতে আজ ভুলেই গিয়েছে বীথিকা। আর চা নিয়ে সৌম্যেনের কাছেও যেতে পারেনি।

যাক্‌গে, হয় কাকিমা, নয় ঠাকুর রামজীবন নিশ্চয় সৌম্যেনের চা পৌঁছে দিয়েছে।

কিন্তু তখনই আবার ডাক শোনা যায়—বীথি, বীথি। ডাকছে সৌম্যেন। কোন সন্দেহ নেই, এখন আর বাড়ির ভিতরে কিছুতেই থাকবে না সৌম্যেন। হয় সূর্যমুখীর জঙ্গলের আশেপাশে, নয় কুয়োতলার সবজিক্ষেতের কাছে সৌম্যেনের সঙ্গে বেড়িয়ে বেড়িয়ে গল্প করতে হবে। শুধু আজ নয়, আরও চারটে দিন ভালোবাসার ব্যস্ততা আর মুখরতার একঘেয়ে পাগলামির সঙ্গে মিলেমিশে চলতে হবে। সৌম্যেনের ছুটি ফুরোতে আরও চারটে দিন বাকি।

মিররের সামনে দাঁড়িয়ে সাজতে দেরি করে না বীথিকা। ফিকে নীল শিফনের শাড়ি, জানে, বীথিকা, এই শাড়িতে বীথিকাকে সবচেয়ে সুন্দর দেখায়। অনেকদিন হলো খোঁপার ছাঁদ নিয়ে মাথা ঘামায়নি বীথিকা। আজ কিন্তু মনে হয়, দড়িদড়া দিয়ে বাঁধাছাদা না করে খোঁপাটাকে ঢিলে করে আর দুটো পিন দিয়ে কাঁধের উপর এলিয়ে দিলেই ভালো দেখাবে।

কিন্তু সাজতে গিয়ে যে সন্ধ্যা প্রায় হয়ে গেল! এত পরিপাটি করে সাজবার তো কোন কারণ ছিল না বীথিকার। সৌম্যেনের হাঁকডাকও আর শোনা যায় না। ভদ্রলোক একাই বেরিয়ে গেল নাকি?

কদমডিহির পাহাড়ের মাথা থেকে সন্ধ্যারাগের শেষ আভাটুকুও সরে গেল। গেটের মাথার বাতিটা জ্বেলে দিয়েছে চাকর পরশুরাম। সূর্যমুখীর জঙ্গলটা উসখুস করছে, অদ্ভুত রকমের ছেঁড়াছেঁড়া চৈতী বাতাস বইতে শুরু করেছে।

গেটের দিকে দুই চোখ প্রায় অপলক করে আর অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকে বীথিকা। সঙ্গে সঙ্গে বীথিকার সুন্দর মুখের উপর সুন্দর করে মাখানো পাউডারের পরমাণুগুলি যেন অদ্ভুত একটা ইচ্ছার জ্বালায় লালচে হয়ে যায়। ছি ছি, কী সাংঘাতিক ভুল! একটু দূরে দাঁড়িয়ে, অন্তত অশোক গাছটার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে মানুষটাকে শুধু একবার চোখে দেখে আসতে ভুলে গিয়েছে বীথিকা। কিন্তু...দূরে দাঁড়িয়ে কেন? একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে মানুষটাকে একবার বলে দিয়ে এলেই তো হয়, তুমি আর এসব চিঠি পড়ো না, এই সব যত ছাইপাঁশ ভঙ্গুরতা আর নশ্বরতা। যতসব চমৎকার মিথ্যা। তোমার স্পিনোজা কান্ট আর অনন্ততার জিজ্ঞাসা নিয়েই তুমি পড়ে থাকো। তুমি তো পাগল নও, তবে এটুকু বুঝতে পার না কেন যে, আমি মরে গিয়েছি।

এগিয়ে যায় বীথিকা।

গেট খোলবার জন্য হাত তুলতেই যেন একটা ছায়া ব্যস্তভাবে ছুটে এসে বীথিকার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। চমকে উঠে হাত নামিয়ে নেয় বীথিকা। গলার স্বরও চমকে ওঠে।—কে?

—আমি। উত্তর দেয় সৌম্যেন।

—কি হলো? আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করে বীথিকা।

সৌম্যেন হাসে—আমিও তো জানতে চাই, কি হলো? একা একা কোথায় চললে তুমি?

সৌম্যেনের একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে বীথিকা।—কোথাও যাচ্ছি না কিন্তু...।

—কি?

—আমি এখানে একা একা থাকতে পারব না।

—তার মানে?

—আমিও তোমার সঙ্গে সিলিঘাটে যাব।

—বেশ তো, এখনও তো ছুটির আরও চারটে দিন...।

—না, আজই চল।

—কিন্তু, কাকিমা বড় দুঃখ পাবেন।

—না, কাকিমাকে আমি বুঝিয়ে দেব।

—কাকিমা কি সত্যিই বুঝবেন?

—খুব বুঝবেন। মনে হচ্ছে, বুঝেই ফেলেছেন।

অচিরন্তন

ব্যস্, এই বিটপুর পর্যন্ত। ট্রেন আর এক গজও এগিয়ে যাবে না।

কেন? এই ট্রেনেরই তো সোজা পার্বতীপুর পর্যন্ত যাবার কথা ছিল?

আর পার্বতীপুর! কাটিহার পর্যন্ত যাবাবও সাধ্যি নেই। বিশ জায়গায় লাইন উপড়ে ফেলে দিয়েছে। একেবারে যেন লাঙল দিয়ে চষে ধানখেতের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে।

ব্যাপার কি? কারা এ-সব কাণ্ড করছে?

করছে ওই আগস্টওয়ালারা, যারা করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে শুরু করে দিয়েছে।

তাহলে উপায়? ট্রেন থেকে নেমে বিটপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে এই কথাই ভাবতে থাকে সুলেখা সরকার। ছোড়দা কেন যে এই পথে কলকাতা যেতে পরামর্শ দিলেন কে জানে! তার চেয়ে বরউনিতে গঙ্গা পার হয়ে, তারপর পাটনা হয়ে কলকাতা চলে গেলেই ভালো ছিল। পাটনার হাঙ্গামার কথা শুনে ছোড়দা ভয় পেয়ে গেলেন, আর কাটিহার পার্বতীপুর হয়ে কলকাতা যাবার পরামর্শ দিলেন। ছোড়দা ধারণা করতে পারেন নি যে, সব দিকেই যখন আগুন জ্বলছে তখন এই দিকটাই বা বাদ যাবে কেন?

বিজন বসুও এই ভুল করেছে। এখন উপায়? স্টিমার চলছে না। নইলে, এখান থেকে ভাগলপুরে গিয়ে পড়লেই হতো। তারপর সাহেবগঞ্জ রামপুরহাট হয়ে...। কিন্তু ভাগলপুরের খবরও সুবিধের নয়। ওই তো ওরা বলাবলি করছে, খুব গুলি চলেছে ভাগলপুরে। সেন্ট্রাল জেল পুড়েছে।

বিটপুর স্টেশনটাও আধপোড়া হয়ে পড়ে রয়েছে। স্টাফ পালিয়েছে, শুধু একা একটি টুলের উপর বসে স্টেশন-মাস্টার ধুঁকছেন। কিছু দূরে একটা পোড়া ট্রেনের কঙ্কাল পড়ে রয়েছে, ঝলসে কালো হয়ে গিয়েছে ইঞ্জিনটা!

ট্রেন থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মের উপর এই জায়গাটিতে পৌঁছতেই সুলেখা সরকারের চেহারাটা নাজেহাল হয়ে দশ মিনিট ধরে হাঁপিয়েছে। চামড়ার ছোট একটা বাক্স আর ছোট বেডিং, নিজের হাতে টেনে আর বয়ে নিয়ে আসতে হয়েছে। কুলি-টুলির চিহ্ন নেই স্টেশনে, ওরাও বোধহয় করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে করতে চলে গিয়েছে। তার উপর, এই তো স্টেশনের অবস্থা, একটা টিনের শেড পর্যন্ত নেই। এক পেয়ালা জলও পাওয়া যাবে না। এ কোন্ সাংঘাতিক জায়গায় এসে পড়তে হলো! থাকাও যাবে না, যাওয়ায় যাবে না?

কলকাতাতে একটা টেলিগ্রাম করা যাবে কি? দু' চোখ ভরা আতঙ্ক নিয়ে দেখতে থাকে সুলেখা সরকার, টেলিগ্রাফ লাইনের খুঁটিগুলোকেও উপড়ে তুলে নিয়ে এদিক-ওদিক ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। তারের চিহ্নও নেই, আরও মনে পড়ে, সে-বেচারা শিয়ালদহ স্টেশনে এসে হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে যাবে আর দুশ্চিন্তায় পড়বে। বরউনি থেকে টেলিগ্রাম করে নির্মলেন্দুকে জানিয়ে দিয়েছে সুলেখা, কোন্ ট্রেনে কোন্ সময়ে সে শিয়ালদহ পৌঁছে যাবে। বেচারা নির্মলেন্দু এখন কল্পনাও করতে পারছে না যে, তারই স্ত্রী এই ভয়ানক এক পোড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে। বাক্সটা টানতে গিয়ে কাঁধটা টনটন করে উঠেছে, আর বেডিংটা টেনে আনতে আনতে শাড়ির আঁচলটা ফেঁসে গিয়েছে।

একই উদ্বেগ আর একই প্রশ্নে ছটফট করে বিজন বসুর মন। চিঠি পেয়েছে অনিমা।

রবিবার রাত্রি দশটার মধ্যে বিজনের বাড়ি পৌঁছে যাবার কথা। অনিমা বেচারী না খেয়ে অপেক্ষা করবে, তারপর রাগ করে খাবেই না, তারপর দুশ্চিন্তা শুরু করবে, আর সারা রাত জেগে ভোর করে দেবে। মানুষের সমস্যা ও অসুবিধা আর ঝঞ্ঝাটের কিছুই বুঝবে না, অথচ রাগ করবে, তাকেই বলে স্ত্রী।

আচমকা একটা চাঞ্চল্য, যেন পোড়া স্টেশনের চেহারাটা হঠাৎ ছটফট করে উঠেছে। এখানে-ওখানে জটলা বেঁধে যেসব যাত্রী বসে ছিল, তারা প্রায় একসঙ্গে উঠে পড়ে পর-মুহূর্তে নানা দিকে ছুটে চলে গেল। খেতের আলোর উপর দিয়ে, মাঠের উপর দিয়ে, আর কেউ বা আকাটা ভুট্টার শুকনো-মরা ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে পালিয়ে গেল।

স্টেশন-মাস্টার আস্তে আস্তে উঠে এসে বিজনের মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর দু'চোখের চাহনিকে একেবারে উত্তপ্ত করে দিয়ে ধমক দেন ঃ "কি জনাব, এখানে কি মরবার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন?"

একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেও সুলেখা সরকার স্টেশন-মাস্টারের এই বিচিত্র ধমক শুনতে পায়। শঙ্কিতভাবে এগিয়ে আসে সুলেখা। স্টেশন-মাস্টার বলেন, "আপনাকেও বলছি, শিগগির এখান থেকে সরে পড়ুন!"

"কেন? কিসের বিপদ?"

"আসছে পিউনিটিভ পুলিস, তাদের পিছনে আসছে টমি আর টমিগান। দানাপুর ক্যান্টনমেন্টের সেই খুনে চেশায়ারকে এই দিকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

বিজন বলে, "কিন্তু আমি তো কোন পোলিটিক্যাল নই।"

সুলেখা ব্যস্তভাবে বলে, "আমিও নই।"

"কে ওসব শুনবে আর বুঝবে বলুন? আপনি গ্রেপ্তার হবেন, আর আপনিও গ্রেপ্তার হবেন, হাঙ্গামার লীডার বলে আপনাদের দুজনকেই ওরা সন্দেহ করবে।"

ভয়ে সুলেখার মুখ ফেকাসে হয়ে যায়, আর বিজন বসুও তার গম্ভীর চোখ ধোঁয়াটে করে ভাবতে থাকে।

চেঁচিয়ে ওঠে সুলেখা, "কিন্তু যাব কোথায়? ট্রেন নেই, ঘর নেই, এক গেলাস জলও নেই...একটা কুলি পর্যন্ত নেই।"

বিজন বলে, "তার চেয়ে গ্রেপ্তার হওয়াই ভালো।"

সুলেখা ভ্রূকুটি করে, "বাঃ, বেশ কথা বললেন। আপনি পুরুষমানুষ, আপনার পক্ষে যতটা সহজে গ্রেপ্তার সহ্য করা সম্ভব, আমার পক্ষে কি...।"

"না, আপনাকে গ্রেপ্তার হতে আমি বলছি না।"

স্টেশন-মাস্টার বললেন, "দেখুন, আপনারা যদি রাজি থাকেন, তবে আমিই পুলিসকে একটা মিথ্যা কথা বলে দিতে পারি, যার ফলে আপনারা দুজনেই রেহাই পাবেন, আর এখান থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে ইনস্পেকশন বাংলোতে অন্তত আজকের দিন আর রাতটা থাকবার পারমিট পেয়ে যাবেন।"

সুলেখা বলে, "কাইণ্ডলি তাই করুন মাস্টারমশাই।"

গঙ্গার কিনারায় অনেকক্ষণ আগে কয়েকটা স্টিমলঞ্চের ধোঁয়া দেখা গিয়েছিল। তারপর দেখা গিয়েছিল—বালিয়াড়ির উপর দিয়ে যেন একটা ধুলোর আঁধি স্টেশনের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। এখন দেখা যাচ্ছে, বন্দুকধারী দেশী পুলিসের একটা দল, এবং তাদের পিছনে টমিগান আর রাইফেল নিয়ে লালমুখো গোরা পল্টনের তিনটে ঝাঁক মার্চ করে আসছে।

স্টেশন-মাস্টার বলেন, "ওরা আজকের সারাদিন আর রাত এখানেই ক্যাম্প করবে। কী যে কাণ্ড হবে ভগবান জানেন!"

"খুব বেশি ভয়ের ব্যাপার হবে বোধ হয়?"

"তা আর বলতে! তবে এ তল্লাটের সব গাঁয়ের মেয়েরা দূর গাঁয়ে পালিয়ে গিয়েছে, এই যা রক্ষা।"

শিউরে ওঠে সুলেখা সরকারের গলার স্বর, "আপনি আমার অবস্থাটা ভেবে দেখুন মাস্টারমশাই।"

"আমি ভেবেছি বলেই তো মনে মনে একটা মিথ্যে কথা ঠিক করে রেখেছি, ঘাবড়াবেন না।"

বিজন বলে, "আর আমার কথাটাও একটু...।"

"ভেবেছি, আপনাদের দুজনের কথাই ভেবেছি। ঘাবড়াবেন না। এই আজকের দিন আব রাতটা কোনমতে যদি ইনস্পেকশন বাংলোতে একটা ঠাঁই পেয়ে যান, তা হলে কালকেব জন্য আর চিন্তা নেই।"

"কাল ট্রেন পাওয়া যাবে তো?"

"পাবেন, কাল সকাল দশটাতেই পাবেন। ম্যাজিস্ট্রেট নিজে সামনে দাঁড়িয়ে লাইন মেরামতের তদারক করছেন।"

পুলিসের দলটা স্টেশনের কাছে এসে পড়েছে। স্টেশন-মাস্টার ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করেন, "আপনারা বোধহয় কেউ কারও আত্মীয় নন?"

সুলেখা আর বিজন একসঙ্গে উত্তর দেয়, "না।"

'আপনাদের মধ্যে কোন চেনাচেনিও বোধহয় আগে ছিল না?"

সুলেখা ও বিজন একসঙ্গে উত্তর দেয়, "না।"

পুলিসের দল প্ল্যাটফর্মের উপর উঠে ঝুপঝাপ করে বন্দুক রাখে। শত শত ধুলোমাখা শক্ত বুট মচমচ খটখট করে। প্ল্যাটফর্মটাই থরথর করতে থাকে। গ্যাঁটগ্যাঁট করে একজন পুলিস অফিসার বিজন বসু আর সুলেখা সরকারের কাছে এগিয়ে এসে চ্যালেঞ্জ করেন, "কাঁহাসে আতা, কাঁহা যানা ; কৌন্ হ্যায় আপলোগ?"

স্টেশন-মাস্টার বলেন, "এঁরা স্ট্র্যাণ্ডেড প্যাসেঞ্জার, হাসব্যাণ্ড অ্যাণ্ড ওয়াইফ।"

চমকে ওঠে সুলেখা। চমকে ওঠে বিজন। এবং চমকে উঠলেও দুইজনেই চুপ করে দাঁড়িয়ে আর তাকিয়ে থাকে। স্টেশন-মাস্টারের ডাহা মিথ্যা কথাটা যেন আচমকা একটা বিশ্রী বিস্ময়ের আঘাত দিয়ে দুজনকেই ক্ষণিকের মতো বোবা করে দিয়েছে।

স্টেশন-মাস্টার বলেন, "এদের জন্য একটা পারমিট লিখে দিন মিস্টার অফিসার, যাতে অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা এঁরা এ- 'লপুর বাংলোতে থাকতে পারেন।"

পুলিস অফিসার ভ্রূকুটি করেন, "সো নেহি হো সকতা। ইনস্পেকশন বাংলোতে এখন জোর সিকিউরিটি চলছে। কাল সকালে ম্যাজিস্ট্রেট এসে ওখানে থাকবেন। একেবারে অজানা অচেনা লোককে ওখানে...।"

স্টেশন-মাস্টার অনায়াসে আবার একটা ডাহা মিথ্যাকে এক গাল হেসে এলিয়ে দিলেন : "এরা আমার জানা লোক, ভেরি ইনোসেন্ট, পিওর ননপেট্রিয়ট।"

সামান্য একটু ভেবে বুক-পকেটের বই থেকে পারমিটের ফর্ম বের করেন অফিসার · "নাম বলুন।"

"বিজনকুমার বসু।"

"ফর মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস বসু।" পারমিট সই করলেন অফিসার এবং স্টেশন-মাস্টার সেই পারমিট হাতে লুফে নিয়ে ধন্যবাদ জানালেন, "মেনি মেনি থ্যাংকস্ স্যার।"

চেশোয়ারের ঝাঁক তখন লাল-মুখ আর মদো চোখ নিয়ে তীব্র শিসের উল্লাস ছড়াতে ছড়াতে প্ল্যাটফর্মের কাছে এসে পড়েছে। স্টেশন-মাস্টার বিজনের হাতে পারমিটটা গুঁজে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন, "এইবার শিগগির সরে পড়ুন।"

সুলেখা বলে, "আমার এই জিনিসপত্র!"

স্টেশন-মাস্টার উত্তর দেন, "সরি ম্যাডাম, কুলি পাওয়া যাবে না।"

বিজন বলে, "আর দরকার নেই কুলির। আপনি শুধু একটা বাক্স হাতে নিন, আর বাকিগুলো...।"

স্টেশন-মাস্টার বলেন, "ওই দেখুন, ওই যে সোজা একবালপুর যাবার রাস্তা।"

সুলেখার হাতে ছোট একটি বাক্স। বিজনের কাঁধে দুটো বেডিং আর হাতে একটা বাক্স।

প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে পথের উপর এসে পড়তেই হাঁপাতে হাঁপাতে হেসে ফেলে বিজন। হেসে ফেলে সুলেখা।

বিজন বলে, "দেখলেন তো, বিপদে পড়লে মানুষের কী দশা হয়!"

"খুব দেখছি। জীবনে কখনও এমন বিপদে পড়িনি।"

"বাংলোতে একবার পৌঁছতে পারলে বাঁচি।"

"হ্যাঁ, কম নয় তো, পুরো আধ মাইল পথ! তবু, হেঁটে গড়িয়ে কোনমতে পার হতে পারলেই বিপদটা কেটে যায়।"

সুলেখা আবার হেসে ফেলে, বিজনও দম টেনে হাসে। যাবার ট্রেন নেই, থাকবার আশ্রয় নেই, গ্রেপ্তারের ভয় আছে, পুলিস আর মিলিটারির হাতে ভয়ংকর অপমানের ভয় আছে, নানাদিকে হাঙ্গামার আগুন আছে, তেষ্টা পেলে জলও পাওয়া যায় না। এই পৃথিবীটা যেন হঠাৎ দুটি জীবনের উপর নির্মম হয়ে উঠেছে। একই বিপদের গ্রাস থেকে দূরে সরে গিয়ে বাঁচবার জন্য দুজন পথিক একই সঙ্গে চলেছে! চেনাজানা নেই, আত্মীয়তাও নেই, এই দুটি মানুষের মনে আর মুখে তবু হাসি ফুটে উঠেছে।

বিপদটাই যেন ভয় হারিয়েছে। পথের পাশে বড় বড় বট, ছায়াও যথেষ্ট আছে। ছায়ার কাছে এসে বোঝা নামিয়ে একটু জিরোবার জন্য যখন দাঁড়ায় দুজনে, তখনও কথায় কথায় ও আলাপে আলাপে অবাধ হাসির রোল ঝরে পড়ে।

সুলেখা বলে, "ট্রেনের কামরা থেকে ওই বাক্সটা নামাতে গিয়ে আমার কোমরের কাছে হাড়টা যেন কট করে বেজে উঠল, আর ঘাড়টাও টনটন করে উঠল।"

বিজন সিগারেট ধরায় : "আপনার শিক্ষা যা হোক হয়েই গিয়েছে। আমার শিক্ষাটা এইবার শুরু হয়েছে এবং বেশ বোঝাচ্ছে।"

"কি হয়েছে?"

"বাঁ হাতটা মচকে গিয়ে এখন টনটন করছে।"

বিপদের ব্যথাকে দুজন সমান ভাগ করে নিয়েছে। তাই সমবেদনার কোন প্রশ্ন এখানে নেই। সুলেখার কোমরের হাড় খট করে বেজে উঠলেও দুজনে হাসে। আর, বিজনের বাঁ হাতটা মচকে গিয়ে টনটন করতে আরম্ভ করলেও দুজনে হাসে।

একবালপুরের ইনস্পেকশন বাংলো। ফটকের দুপাশে দুটি রোগা ঝাউ আর মাঝখানে দাঁড়িয়ে বন্দুক-কাঁধে এক সান্ত্রী। কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে বাংলোর চারটে দিক এঁটে দেওয়া হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটের দুই কেরানী টাইপরাইটার আর ফাইল নিয়ে বারান্দার উপর অফিস বসিয়েছে। দুজন গোয়েন্দা অফিসার দুটি কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। পারমিট দেখে মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস বসুকে তাঁরা ভিতরের দিকে ওই দক্ষিণের ছোট ঘরটিতে জায়গা নেবার অনুমতি দিয়ে দিলেন। ঘরে ঢুকেই সুলেখা সরকার এক গেলাস জল খেয়ে হাঁপ ছাড়ে, আর চায়ের সন্ধানে বিজন বসু কিচেনে গিয়ে খানসামার সঙ্গে কথা বলে ঘরে ফিরে আসে।

দুঃসহ এক অস্বস্তির জ্বালায় চিড়বিড় করে ওঠে সুলেখা সরকারের গলার স্বর আর কথাগুলিও : "আপনি বাইরে যান।"

"কেন?"

"কেন আবার কী? কাণ্ডজ্ঞান নেই আপনার?"

বিজন বসুও ভ্রূকুটি করে তিক্ত স্বরে বলে, "আমার যথেষ্ট কাণ্ডজ্ঞান আছে, আপনার এক বিন্দুও নেই।"

"আপনাকে ভদ্রলোক বলে মনে করেছিলাম, এখন সন্দেহ হচ্ছে...।"

"আমারও ভুল ভেঙে গিয়েছে, আমার মনে হয় আপনি একজন...সেই রকম ভয়ানক কিছু হবেন।"

"আপনি বাইরে যাবেন কি না বলুন। না, এইরকম অসভ্যের মতো উপদ্রব করবেন?"

"আপনি বাইরে যাবেন কি না বলুন, না, বেহারার মতো আমাকে ট্রাবল দেবেন?"

"আমি তো এই ঘরেই থাকব।"

"আমিও তো থাকব।"

"তা হলে পুলিস ডাকতে হয়।"

"আমিই ডেকে আনছি।"

খানসামা এসে একটা বড় খাতা হাতে নিয়ে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সেলাম জানায় : "নাম ও ঠিকানা লিখে দিন সাহেব।"

খাতাটা হাতের কাছে টেনে এনে বিজন বসু কলম তুলতেই খানসামা বলে, "পারমিটের নম্বরটাও নামের পাশে লিখে দেবেন সাহেব।"

পারমিট? হ্যাঁ, একটা ফর্মে পুলিস অফিসারের সই-করা পারমিট নামে একটা কাগজের টুকরো বিজন বসুর পকেটের মধ্যে এখনও রয়েছে। পারমিটটা যেন গোপন আড়ালে বসে এতক্ষণ ধরে সুলেখা আর বিজনের এই তিক্ত তপ্ত ও রূঢ় ঝগড়া, এবং ঘৃণা ও সন্দেহের তেজ আর মেজাজগুলিকে চুপ করে দেখছিল। এবং ঠিক বিটপুরের সেই স্টেশন-মাস্টারের মতো মুখ করে মাঝে মাঝে এক গাল হাসি হাসছিল। ওই পারমিট এই সংসারের একটা ডাহা মিথ্যার হুকুমনামা! তবু বিজন বসু আর সুলেখা সরকার নামে দুটি বিপন্ন জীবনকে বাঁচিয়ে দিয়েছে আর আশ্রয় জুটিয়ে দিয়েছে এই পারমিট।

ঢালাও অর্ডার দিয়েছেন ম্যাজিস্ট্রেট—স্টেশনে, ধর্মশালায়, রেল লাইনের পাশে, হোটেলে এবং সরাইয়ে, যাকে দেখবে তাকে গ্রেপ্তার করা চাই। কোন ওজর গ্রাহ্য করা হবে না। রেহাই পেতে পারে শুধু তারা, যাদের সঙ্গে মেয়েছেলে থাকবে। তা-ও আবার যে-কোন মেয়েছেলে হলে চলবে না। শুধু আপন মা আর আপন স্ত্রী। তা-ও আবার পুলিসের জানা কোন বিশেষ ব্যক্তির কনফারমেশন থাকা চাই যে, সত্যিই আপন মা আর আপন স্ত্রী। নইলে পুরুষ আর স্ত্রীলোক, দুজনকেই গ্রেপ্তার করতে হবে।

নীরবে ম্যাজিকের কলের মানুষের মতো কলম চালিয়ে বাংলোর রেজিস্টারে পরিচয় লিখে সই করে বিজন বসু। বিজন বসু আর মিসেস বসু। এক বিচিত্র জালিয়াতির দলিল হয়ে গেল এই রেজিস্টার খাতাটা ; কিন্তু উপায় নেই, এই মিথ্যা পরিচয়ের পাশে পারমিটের নম্বরটিও বসিয়ে দিতে হয়।

সুলেখা সরকারও বিবর্ণ মুখে খড়ের পুতুলের মতো স্তব্ধ হয়ে বসে দেখতে থাকে।

আর, খানসামা চলে যেতেই দুজনেরই মূর্তিদুটো যেন ভয়ে ও লজ্জায় হাঁসফাঁস করতে থাকে। বুঝতে পারে সুলেখা, অন্তত আজকের মতো এই ঘর থেকে লোকটাকে তাড়িয়ে দেবার অধিকার নেই। বিপদ কেটে যায়নি। শুরু হল বিপদ ; আর এই তো সবচেয়ে কঠোর আর ভয়ানক বিপদ। একটা গোখরো সাপ ঘরে থাকলে এর চেয়ে কম ভয় নিয়ে থাকা যায়। হাত তুলে কপাল টিপে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকে সুলেখা। সুলেখার বুকের ভিতরটা নীরবে আর্তনাদ করে ওঠে, রক্ষা কর।

বিজন বসুর দু'চোখের দৃষ্টিটাও শঙ্কিত হয়ে থরথর করে। এই ঘরেই আজ থাকতে হবে ;

কিন্তু থাকা যে কোনমতেই উচিত নয়। ওই রকম একটা হিংস্র স্বভাবের মেয়েমানুষের এত কাছে চব্বিশ ঘণ্টা বসে থাকাই যে একটা বিশ্রী বিপদ। যে-কোন একটি মিথ্যা কথা চেঁচিয়ে বলে দিয়ে যে-কোন মুহূর্তে বিজনের জীবনটাকে ভয়ানক অপমানের মামলায় জড়িয়ে দিতে পারে এই রকমেরই মেয়েমানুষ, যে আজ একটা সামান্য স্বার্থের লোভে অনায়াসে নিজেকে মিসেস বিজন বসু করে দিয়ে এখন যে জানে কোন্ নতুন মতলবের স্বপ্ন দেখছে। এই বিপদের চেয়ে গ্রেপ্তারের বিপদ আর মিলিটারির হাতে মার খাওয়ার বিপদ ভালো ছিল।

সুলেখা বলে, "আপনি একটু বাইরে যান।"

"কেন?"

"আমি একবার বাক্স খুলব।"

ব্যস্তভাবে এবং একটা সন্দেহে চমকে উঠে নিজেরই গায়ের পাঞ্জাবির পকেটে হাত দেয় বিজন। নিশ্চিন্ত হয়, না, চাবিটা ঠিকই আছে, চুরি হয়নি।

দুটি চামড়ার বাক্স আর দুটি বেডিং তখন মেঝের উপর জড়াজড়ি করে পড়ে ছিল। বিজন উঠে গিয়ে নিজের বাক্সটাকে টেনে একপাশে সরিয়ে দেয়, বাক্সের তালা বন্ধ আছে কি না দেখে নিয়ে তারপর ঘরের বাইরে চলে যায়।

সুলেখা উঠে এসে দরজা বন্ধ করে, এবং পনর মিনিট পরে ঘরের দরজা খোলা দেখতে পেয়ে ব্যস্তভাবে উদ্বিগ্ন চোখ নিয়ে ঘরের ভিতরে এসে ঢোকে বিজন এবং নিজের বাক্সটার দিকে তাকিয়ে বলে, "আপনি একটু বাইরে যান।"

সুলেখার চেহারাটা বদলে গিয়েছে। এবং ঘরের ভিতরের চেহারাটাও। ক্যাম্পখাটের উপর একটা নিংড়ানো ভিজে শাড়ি স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। পাশের স্নানের ঘরের ভিতর থেকে সাবানের গন্ধ এসে এই ঘরের ভিতরেও ছড়িয়েছে। যে নতুন একটা নীল রঙের তাঁতের শাড়ি পরেছে সুলেখা, তারও একটা গন্ধ আর খসখস শব্দ ঘরের মধ্যে ফিসফিস করছে। সুলেখার হাতে মাঝারি সাইজের একটা ভেলভেটের বাক্স। দেখেই মনে পড়ে বিজনের, অণিমারও এইরকমের একটা ভেলভেটের বাক্স আছে, যে বাক্সে অণিমার তোলা গয়নাগুলি থাকে।

ভেলভেটের বাক্সটাকে হাতে নিয়ে আঁচলের আড়াল করে ঘরের বাইরে বারান্দার উপর গিয়ে দাঁড়ায় সুলেখা। ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে সাজ বদল করে বিজন। বাক্সের ভিতর থেকে করকরে নোটের তাড়া বের করে গুনতে থাকে। সাতশো নব্বই টাকা, ঠিকই আছে। চাবি দিয়ে বাক্স বন্ধ করে নিয়ে ঘরের দরজা খুলে দেয় বিজন।

সুলেখা এসে ঘরে ঢুকেই নিজের বাক্সের দিকে তাকায়, তারপর বিজনের দিকে একবার তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নেয়। সুলেখার চোখের দৃষ্টিটা যেন একটা বিরক্তি সহ্য করছে। আঃ, যেন বরযাত্রী যাচ্ছে, লোকটা সিল্কের পাঞ্জাবি আর ফরাসডাঙ্গা ধুতি পরেছে!

চব্বিশ ঘণ্টার জন্য পারমিট, তার মধ্যে ছটি ঘণ্টা এরই মধ্যে পার হয়ে গিয়েছে। রাতটা ভোর হতে আরো বারো ঘণ্টা। তা হলে দাঁড়াল গিয়ে আঠারো ঘণ্টা। তারপর আর ছ'ঘন্টার বেশি নয়, পারমিটের মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে এবং এই কুৎসিত বিপদের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে দুজনেরই প্রাণ। স্টেশন-মাস্টার বলেছেন, সকাল দশটাতেই নতুন ট্রেন চলতে শুরু করবে।

খানসামা মাঝে মাঝে দরজার কাছে আসে, ভিতরে ঢুকে খাবার দিয়ে চলে যায়। দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শুধু এই চাঞ্চল্য ছাড়া ঘরের মধ্যে আর কোন চাঞ্চল্য একটি শব্দও করেনি। মুখ ঘুরিয়ে যে যার চা আর লাঞ্চ ঘরের দুই দিকে দুই ভিন্ন টেবিলের কাছে বসে খেয়েছে। ভয় ঘৃণা সন্দেহ আর অস্বস্তির দুটি মূর্তি একেবারে বোবা হয়ে এই ছ'ঘন্টার নির্বাসন সহ্য করছে।

আরও ভয়ানক তীব্র ভয় ঘৃণা সন্দেহ আর অস্বস্তি নিয়ে ঘনিয়ে উঠল রাতটা। পারমিটের

ডাহা মিথ্যার শাসনে দুজনের কেউ ঘর থেকে বাইরে ছুটে যেতে পারে না। দরজাটা ভেজিয়ে রাখতেও হয়। ঘরের ভিতর একটি মাত্র ক্যাম্পখাট, কী কদর্য একটা ঠাট্টা!

ঘরে সারারাত আলো জ্বলে ; চেয়ারের উপর বসে সারারাত ধরে লেস বোনে সুলেখা। আর, নিজের বাক্সের উপর বসে সারারাত বই পড়ে বিজন।

কাক ডাকে। ভোর হয়। বাংলোর চারদিকে নানারকম গম্ভীর আর তীব্র শব্দের ব্যস্ততা হৈ-হৈ করে ওঠে। ম্যাজিস্ট্রেট এসেছেন। ঘরের দরজার বাইরে বারান্দার উপর এসে হাঁপ ছাড়ে বিজন আর সুলেখা। সারা রাতের নিস্তব্ধতা যেন শ্মশানের ইঁদুরের মতো ওদের দুজনের প্রাণের হাড়মাংস কুরে কুরে খেয়েছে।

রোগা ঝাউয়ের মাথায় ভোরের আলো পড়েছে। হেসে ওঠে সুলেখার ভয়ার্ত মুখটা। বিজনের মুখটাও হঠাৎ হাসি-হাসি হয়। সিগারেট ধরায় বিজন।

কথা বলতে গিয়ে হেসে ফেলে সুলেখা : "আর চার ঘন্টা পরেই নতুন ট্রেন চলবে।"

বিজন হাসে : "হ্যাঁ, চা খেয়েই আমাদের তৈরি হয়ে যাওয়া উচিত—কি বলেন?"

"নিশ্চয়।"

গোয়েন্দা অফিসার এসে সামনে দাঁড়ান : "আপনারা কি আজকের প্রথম ট্রেনে যাবার জন্য আশা করে আছেন?"

বিজন বলে, "হ্যাঁ।"

গোয়েন্দা অফিসার বলেন, "সে আশা ছেড়ে দিন।"

"কেন?"

"প্রথম ট্রেনে শুধু করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গেরা যাবে।"

"তার মানে?"

"ডোন্ট ইউ নো, কাল সারা দিন আর রাত ধরে চারটে গ্রামকে কর্ডন করে দেড় হাজার লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে? ওদেরই আজ প্রথম ট্রেনে চালান করতে হবে।"

'আমাদের কী উপায় হবে?"

"পরের ট্রেনের অপেক্ষায় থাকুন।"

"সে ট্রেন কখন ছাড়বে?"

"আবার কাল সকাল দশটায়।"

সুলেখা আতঙ্কিতের মতো বলে, "কিন্তু আমাদের পারমিটে যে আর ছ' ঘণ্টার বেশি থাকবার অর্ডার নেই।"

গোয়েন্দা অফিসার কিছুক্ষণ কি যেন ভাবেন। তারপর আশ্বাস দিয়ে বলেন, "আরও চব্বিশ ঘন্টার জন্য পারমিট আমি দিতে পারি ; কিন্তু তার আগে আপনাদের জিনিসপত্র সার্চ করব।"

"করুন।" কথাটা বলেই মনে মনে শিউরে ওঠে বিজন। বাক্সের ভিতরে যে অণিমার লেখা এক গাদা চিঠি আছে। সুলেখার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। বাক্সের ভিতরে শুধু নির্মলেন্দুর চিঠিগুলি নয়, বিয়ের দিনের ফটোটাও আছে—নির্মলেন্দু সরকার আর সুলেখা সরকার। সার্চ করলে যে এই মুহূর্তে ধরা পড়ে যাবে পারমিটের ডাহা মিথ্যা, আর বাংলোর রেজিস্টারে বিজন বসু নামে এই ভদ্রলোকের নিজের হাতে লেখা একটা ভয়ংকর পরিচয়ের জালিয়াতি।

গোয়েন্দা অফিসার পারমিট সই করতে করতে হাসেন : "বুঝতে পেরেছি, থাক্, আর বাক্স খুলতে হবে না। আপনাদের জিনিসপত্র সার্চ করে আমার কোন লাভ হবে না। গলার একটি আওয়াজ শুনেই আমরা বুঝতে পারি, কারও বাক্সের ভিতরে সিডিশন রেবেলিয়ন আর কনস্পিরেসির মাল আছে কি না আছে।"

ডাহা মিথ্যেটাই বেঁচে গেল। হাঁপ ছেড়ে আবার হেসে ওঠে সুলেখা। নির্বাসনের আরও চব্বিশ ঘন্টা মেয়াদ বেড়ে গেল, তবু বিজনের গম্ভীর মুখে নতুন করে হাসি ফুটে ওঠে।

সুলেখা বলে, "ভয় হচ্ছে একটা অসুখে না পড়ে যাই। যা খাওয়া-দাওয়ার ছিরি। আমি ওই সব আধসেদ্ধ হাবি-জাবি সহ্য করতে পারি না।"

"ও, তা হলে তো আপনার খুব একটা কষ্ট গেছে।"

"আর আপনার বুঝি খুব একটা আরাম গেছে?"

"মোটেই না, ঘুমোতে না পারলে আমার যে কী দশা হয় জানেন না। আমারও ভয়, ঘুমোতে না পেরেই অসুখে পড়ে যাব।"

"আপনি ঘুমিয়ে নিলেই তো পারতেন।"

"যাক গে, বিপদে পড়লে তো এমনিতেই চোখের ঘুম ছুটে যায়, তার ওপর যদি আবার...।"

বারান্দার উপরে এক টেবিলের দু'দিকে দুই চেয়ারে বসে চা খায় বিজন বসু আর সুলেখা সরকার।

বিজন বলে, "যাই এবার, মাঠে মাঠে একটু বেড়িয়ে আসি।"

"বাঃ" চেঁচিয়ে ওঠে সুলেখা, "আমি বুঝি একা এই ঘরে পড়ে থাকব?"

"থাকুন না, এই কিছুক্ষণ। আধ ঘন্টারও বেশি হবে না, তার মধ্যেই আমি ফিরে আসছি।"

"আমিও যাব।"

"আপনার না যাওয়াই ভালো। বুঝেছেন তো, কি বিশ্রী হাঙ্গামা চলছে, তার ওপর পুলিস ও মিলিটারি হন্যে হয়ে ছুটোছুটি করছে।"

চলে গেল বিজন। গম্ভীর হয়ে একা ঘরে কিছুক্ষণ বসে থেকে সুলেখার হাত-পাগুলি যেন রাগ করে ওঠে। কী বিশ্রী হয়ে রয়েছে ঘরের চেহারাটা! সাবান, চিরুণী, তেল, তোয়ালে, ছাড়া-কাপড়-জামা, লেস আর বই—এলোমেলো হয়ে আবর্জনার মতো পড়ে আছে। ঘরের মিররে ধুলো। ফুলদানিতে ফুল নেই। টুকটাক করে হাত চালিয়ে ঘরটাকে সুশ্রী করে তুলতে থাকে সুলেখা।

এ কি? ভদ্রলোকের সত্যিই কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। বাক্সটার তালা খোলা হয়ে পড়ে আছে। সার্চ করবার কথা শুনে সেই যে বাক্সটা খুলেছিলেন ভদ্রলোক, তারপর বন্ধ করতে ভুলেই গেছেন।

আঃ, কত দেরি করছেন ভদ্রলোক! একঘন্টা তো পার হয়ে গিয়েছে। পুলিস আর মিলিটারি হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু ভদ্রলোক বোধহয় মনে করেছেন, ওঁকে বুঝি মুখ দেখেই ওরা ছেড়ে দেবে।

পুরো দুটি ঘন্টা কোথায় কোন্ মাঠের কোন্ বটের ছায়ায় ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে যখন বাংলোর ঘরের কাছে এসে দাঁড়ায় বিজন, তখন সুলেখার রাগ চরমে উঠে বসে আছে : "আপনার সত্যিই কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই।"

"কি হলো?"

"আমি তো ভেবে কোন কূলকিনারা পাচ্ছিলাম না। মানুষটা গ্রেপ্তার হলো, না, অন্য কোন বিপদে পড়ল!"

"যাক, আপনি খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়েছেন তো?"

"তার মানে?"

"এটা আপনি কিন্তু খুবই অন্যায় করলেন ; আমার অপেক্ষায় না থেকে খেয়ে নিলে ভালো করতেন।"

খানসামা খাবার নিয়ে আসে। কিন্তু খাবার খেতে বোধহয় আরও দেরি করতে চায়

সুলেখা। সুলেখা বলে, "আপনি আগে খেয়ে নিন।"

খেতে খেতে বিজন বলে, "আপনি এত কাশছেন কেন? খুব ঠাণ্ডা লাগিয়েছেন বোধহয়।"

"হ্যাঁ, ঠাণ্ডা একটু লেগেছে।"

"আপনার সঙ্গে কোনও কাশির ওষুধ আছে?

"না।"

"আমার সঙ্গে আছে।"

খাবার পালা শেষ হবার পর আবার লেস ধরে সুলেখা, আর বইয়ের পাতা খোলে বিজন ; কিন্তু সুলেখার লেস-বোনা একটা ঘরও এগোয়ে না, আর বিজনের বই-পড়া একটা পাতাও এগোয় না। বাংলোর এই ছোট ঘরটা যেন ছোট নদীর বুকের মতো কলস্বরে বাজতে থাকে। গল্প করে সুলেখা আর বিজন, সেই সঙ্গে কথাগুলিও নানা বিস্ময়ের ছোঁয়ায় মাঝে মাঝে হেসে ওঠে আর হাসিয়ে দেয়।

সুলেখা বলে, "ডাক্তার আমাকে ঘুমের ওষুধ খেতে বলেছে, কিন্তু আমি গ্রাহ্যই করি না। এই রকমই দিনরাত বকবক করে বাড়ির মানুষকে জ্বালাই।"

বিজন বলে, "আমি ঘুম ছুটিয়ে দেবার ওষুধ খুঁজছি। কিন্তু ওষুধ পাই না। এদিকে অফিসের কাগজপত্রের ফাইল টেবিলের উপর জমে পাহাড় হয়ে উঠেছে। কাজ শেষ করবার সময়ই পাই না।"

সন্ধ্যার আঁধার দেখা দিতে থাকে। আর পাঁচ ঘন্টা এবং আরও পাঁচ ঘন্টার পর চারিদিকের নিরেট অন্ধকারের ভারে স্তব্ধ হয়ে গেল রাতটা।

কিন্তু সুলেখার চোখে কোন আতঙ্ক আর ভয় নেই। বিজনের চোখেও কোন সন্দেহ আর ঘৃণা নেই। সেই দুঃসহ অস্বস্তিও যেন সব জ্বালা হারিয়ে এবং একটু লজ্জা পেয়ে কোমল হয়ে গিয়েছে। ওই ভদ্রলোককে ভয় করবার কিছু নেই। ওই মহিলাকেও ভয় করবার কিছু নেই। আজ ওরা কেউ কারও বিপদ নয়। রাতটা এত স্তব্ধ হয়ে গেলেও একেবারে বিপদহীন হয়ে গিয়েছে।

বিজন বলে, "আমার একটা অনুরোধ শুনুন। আপনি বড্ড কাশছেন। আমার এই আলোয়ানটা কাছে রাখুন।"

সুলেখা চেঁচিয়ে ওঠে : "আপনি কি আজও সারারাত বই পড়ে কাটাবেন? অসুখের ভয়টা কি ভুলেই গেলেন?"

"না, আমি মেঝের উপরে বেডিং খুলে গড়িয়ে পড়ব। আমার জন্য ভাববেন না। কিন্তু...আপনি..ও কি, খাটের উপর শুধু বসে থেকে আর লেস বুনে রাত কাটাবেন?"

সুলেখা হাসে, "বলেছি তো আমার ঘুম সহজে আসে না। আপনি ভাববেন না। না ঘুমোলে আমার একটুও কষ্ট হয় না।...ও কি, আপনার হাতে কি হয়েছে?"

বিজন হাসে, "এই তো, সেই বাঁ হাতটা স্টেশন থেকে তিনটে বোঝা টেনে আনতে গিয়ে মচকে গিয়েছিল, মনে নেই?"

"খুব ব্যথা করছে?"

"খুব নয়, তবে নাড়তে পারছি না।"

ক্যাম্প খাটের উপর সুলেখার বাঁধা বেডিংটা এক দিকে পড়ে রয়েছে, তার উপর ওই ভদ্রলোকেরই গরম আলোয়ানটা পড়ে আছে। চুপ করে একমনে লেস বোনে সুলেখা, আর মাঝে মাঝে ঘরের আলোর দিকে একজোড়া নিশ্চিন্ত চোখের আলো ছড়িয়ে দিয়ে ভাবে, এই রকম অদ্ভুত দশাতেও মানুষ পড়ে!

ঘরের জানালা দিয়ে হু হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছে। আলোয়ানটার দিকে না তাকিয়ে

শাড়ির আঁচল দিয়ে গলা জড়ায় সুলেখা।

কে জানে কত রাত হলো? ভোর হতে আর কতক্ষণ? মেঝের উপর টান হয়ে শুয়ে রয়েছেন ভদ্রলোক। মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা হাওয়ায় শিউরে কুঁকড়ে যাচ্ছে ভদ্রলোকের ঘুমন্ত শরীরটা।

কী বিশ্রী অস্বস্তি! সুলেখার বুকের ভিতর থেকে যেন সব নিশ্চিন্ত নিঃশ্বাসের বাতাস ঠেলে উপরে উঠতে চাইছে একটা বিপদ। থরথর করে কেঁপে ওঠে সুলেখার হাতটা। ঘুমিয়ে আছেন ভদ্রলোক। কিছুই বুঝতে পারবেন না। আলোয়ানটা তুলে নিয়ে ভদ্রলোকের গায়ে ঢাকা দিলে কেমন হয়?

আলোয়ানটা হাতে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় সুলেখা। কিন্তু এক পা এগিয়ে গিয়েই থমকে দাঁড়ায়।

পর-মুহূর্তে পিছিয়ে আসে। ছটফট করে ক্যাম্প খাটের উপর বসে সুলেখা। আলোয়ানটাকে তেমনি ব্যস্তভাবে খাটেরই এক দিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। চুপ করে লেস বোনে আর কাকের ডাক শোনবার জন্য কান পেতে বসে থাকে সুলেখা।

কাকের ডাক ডেকেছে অনেকক্ষণ। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে বিজন। এবং এই ঘরের ভিতরই একটা ঘুমন্ত মূর্তির দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে। ঘুমিয়ে পড়েছেন মহিলা, যিনি বলেছিলেন যে তাঁর চোখে ঘুম সহজে আসে না। সহজে কি এসেছে? ভয়ে লজ্জায় ও উদ্বেগে আধমরা হয়ে, আধপেটা খেয়ে আর লেস বুনে বুনে ক্লান্ত হয়েছে মানুষটা, তবেই না ঘুমে ঢুলে পড়েছে। ভাবতে লজ্জা পায় বিজন, ওই মহিলাকেই কাল রাতে কত না ভয় করতে হয়েছিল।

লেসের বোনা বুকের উপর তুলে আর দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বাঁধা বেডিং-এ মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছেন মহিলা। কানের একটা দুল খুলে গিয়েছে। মনে হয় ঘুমের ঘোরে চাপাপড়া খোঁপাটাকে এলোমেলো করে দিয়েছেন মহিলা, নইলে একগাদা চুল মহিলার মুখের উপর এভাবে লুটিয়ে পড়বে কেন?

একটা অস্বস্তি। অস্বস্তিটা যেন অদ্ভুত একটা মায়ার জ্বালায় ছটফট করছে। মহিলার সুন্দর মুখটার উপর যেন কালো সাপের মতো একটা উপদ্রব কিলবিল করছে, ওই এলোমেলো হযে লুটিয়েপড়া কতকগুলি চুলের গুচ্ছ। জানবে না, বুঝতেও পারবে না মানুষটা, ওর মুখের উপর থেকে ওই লুটিয়েপড়া এলোমেলো উপদ্রবগুলিকে সরিয়ে দিলে কেমন হয়?

পা টিপে টিপে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে বিজন। ছিঃ, সেই মুহূর্তে নিজের হাতটার এই বেহায়া দুঃসাহসের লজ্জায় শিউরে উঠে সরে যায়। মনটা উত্তপ্ত হয়ে যেন ধিক্কার দিতে থাকে। ভুল করে আজ নিজেই নিজের বিপদ হয়ে উঠেছে বিজন। সেই মুহূর্তে দরজা খুলে ঘরের বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ায়।

ট্রেন ছাড়বার সময় হয়ে এলো। এই ট্রেনই কাটিহার হয়ে পার্বতীপুর চলে যাবে। বিটপুর স্টেশনে লোকের ভিড় দৌড়োদৌড়ি করে। তার উপর বেশ জোরে বৃষ্টি আরম্ভ হয়।

মেয়েদের কামরায় উঠে বসেছে সুলেখা সরকার। এই কামরার জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে বিজন। বিজন জায়গা পেয়েছে অন্য একটা কামরায়।

জানালা দিয়ে মুখ বের করে সুলেখা আস্তে আস্তে বলে, "আপনি এবার যান, আপনার কামরায় গিয়ে বসুন, বৃষ্টি পড়ছে যে।"

বিজন বলে, "যাচ্ছি।"

সব বিপদ কেটে গিয়েছে। কোন বিপদের সামান্য আঁচড়ও পড়েনি দুজনের জীবনে। এই মুহূর্তে একেবারে নিরাপদ পথে ছুটে চলে যাবে দুজনেই। কিন্তু, কী আশ্চর্য, এই শেষ দেখা আর শেষ কথা ঠিক হেসে উঠতে পারছে না।

বৃষ্টিটা আরও জোর করে এসেছে। দেখাদেখির মাঝখানে একটা ঝাপসা পর্দা নেমে এসেছে।

এইবার দৌড়ে গিয়ে নিজের কামরায় ঢুকে পড়বে বিজন। ট্রেন চলতেও শুরু করেছে। স্টেশনের ভিড়ের চিৎকারও জোরে বেজে ওঠে। তারই মধ্যে বেজে ওঠে দুজনের দুটি শেষ কথা।

বিজন বলে, "জানলা থেকে সরে বস, আর মাফলারটা ভালো করে গলায় জড়িয়ে নাও।"

সুলেখা বলে, "হাতের ব্যথাটাকে তুচ্ছ করো না। বাড়িতে পৌঁছেই গরম জলের সেঁক দিয়ে...।"

অযান্ত্রিক

বিমলের একগুঁয়েমি যেমন অব্যয়, তেমনি অক্ষয় তার ঐ ট্যাক্সিটার পরমায়ু। সাবেক আমলের একটা ফোর্ড, প্রাগৈতিহাসিক গঠন, সর্বাঙ্গে একটা কদর্য দীনতার ছাপ। যে নেহাৎ দায়ে পড়েছে বা জীবনে মোটর দেখেনি, সে ছাড়া আর কেউ ভুলেও বিমলের ট্যাক্সির ছায়া মাড়ায় না।

দেখতে যদি জবুথবু, কিন্তু কাজের বেলায় বড়ই অদ্ভুতকর্মা বিমলের এই ট্যাক্সি। বড় বড় চাঁইগাড়ির পক্ষে যা অসাধ্য, তা ওর কাছে অবলীলা। এই দুর্গম অভ্রখানি অঞ্চলের ভাঙ্গাচোরা ভয়াবহ জংলীপথে, ঘোর বর্ষার রাত্রে, যখন ভাড়া নিয়ে ছুটতে সব গাড়িই নারাজ, তখন সেখানে অকুতোভয়ে এগিয়ে যেতে পারে শুধু বিমলের এই পরম প্রবীণ ট্যাক্সিটি। তাই সবাই যখন জবাব দিয়ে সরে পড়ে, একমাত্র তখনি শুধু গরজের খাতিরে আসে তার ডাক, তার আগে নয়।

ট্যাক্সিস্ট্যাণ্ডে সারি সারি জমকালো তরুণ নিউ মডেলের মধ্যে বিমলের বুড়ো ফোর্ড দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমোয়, জটায়ুর মতো তার জরাভার নিয়ে। বাস্তবিক বড় দৃষ্টিকটু। তালিমারা হুড, সামনের আর্শিটা ভাঙা, তোবড়ানো বনেট, কালিঝুলি মাখা পরদা আর চারটে চাকার টায়ার পটি লাগানো ; সে এক অপূর্ব শ্রী। পাদানিতে পা দিলে মাড়ানো কুকুরের মতো ক্যাঁচ করে আর্তনাদ করে ওঠে। মোটা তেলের ছাপ লেগে সীটগুলি এত কলঙ্কিত যে, সুবেশ কোন ভদ্রলোককে পায়ে ধরে সাধলেও তাতে বসতে রাজি হবে না। দরজাগুলো বন্ধ করতে বেশ বেগ পেতে হয়, আর যদিও বন্ধ হল তো তাকে খোলা হয়ে ওঠে দুঃসাধ্য। সীটের উপর বসলেই উপবেশকের মাথায় আর মুখে এসে লাগবে ওপরের দড়িতে ঝোলানো বিমলের গামছা, নোংরা গোটা দুই গেঞ্জি আর তেলচিটে আলোয়ান।

বিমলের গাড়ির দুরায়ত ভৈরবহর্ষ শোনা মাত্র প্রত্যেকটি রিক্সা সভয়ে রাস্তার শেষ কিনারায় সরে যায়। অতি দুঃসাহসী সাইকেলওয়ালারাও বিমলের ধাবমান গাড়ির পাশ কাটিয়ে যেতে বুক কাঁপে। রাত্রির অন্ধকারে এক-একবার দেখা যায়, দূর থেকে যেন একটা একচক্ষু দানব অট্টশব্দে হা হা করে তেড়ে আসছে ; বুঝতে হবে ঐটি বিমলের গাড়ি। একটি হেডলাইটের আলো নির্বাণপ্রাপ্ত। আলগা আলগা শরীরের গাঁটগুলো যে কোন সময়ে বিস্ফোরণের মতো শতধা হয়ে ছিটকে পড়তে পারে।

সবচেয়ে বেশি ধুলো ওড়াবে, পথের মোষ ক্ষ্যাপাবে আর কানফাটা আওয়াজ করবে বিমলের গাড়ি। তবু কিছু বলবার জো নেই বিমলকে। চটাং চটাং মুখের ওপর দু'কথা উল্টো শুনিয়ে দেবে—মশাই বুঝি কোন নোংরা কম্ম করেন না, চেঁচান না, দৌড়ন না? যত দোষ করেছে বুঝি আমার গাড়িটা!

কত রকমই না বিদ্রূপ আর বিশেষণ পেয়েছে এই গাড়িটা—বুড়ঢা ঘোড়া, খোঁড়া হাঁস, কানা ভঁইস! কিন্তু বিমলের কাছ থেকে একটা আদুরে নাম পেয়েছে এই গাড়ি—জগদ্দল। এই

নামেই বিমল তাকে ডাকে, তার ব্যস্ত-ত্রস্ত কর্মজীবনে সুদীর্ঘ পনেরটি বছরের সাথী এই যন্ত্রপশুটা, বিমলের সেবক, বন্ধু আর অন্নদাতা।

সন্দেহ হতে পারে, বিমল তো ডাকে, কিন্তু সাড়া পায় কি? এটা অন্যের পক্ষে বোঝা কঠিন। কিন্তু বিমল জগদ্দলের প্রতিটি সাধ-আহ্লাদ, আবদার অভিমান এক পলকে বুঝে নিতে পারে।

'ভারী তেষ্টা পেয়েছে, না রে জগদ্দল? তাই হাঁসফাঁস কচ্ছিস? দাঁড়া বাবা দাঁড়া।' জগদ্দলকে রাস্তার পাশে একটা বড় বটগাছের ছায়ায় থামিয়ে, কুঁয়ো থেকে বালতি ভরে ঠাণ্ডা জল আনে, রেডিয়েটরের মুখে ঢেলে দেয় বিমল। বগ বগ করে চার-পাঁচ বালতি জল খেয়ে জগদ্দল শান্ত হয়, আবার চলতে থাকে।

এ ট্যাক্সির মালিক ও চালক বিমল স্বয়ং। আজ নয়, একটানা পনের বছর ধরে।

স্ট্যাণ্ডের এক কোণে তার সব দৈন্য আর জরাভার নিয়ে যাত্রীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে বুড়ো জগদ্দল। পাশে হালমডেল গাড়িটার সুমসৃণ ছাইরঙা বনেটের ওপর গা এলিয়ে বসে পিয়ারা সিং বিমলকে টিটকারি দিয়ে কথা বলে--'আর কেন, এ বিমলবাবু? এবার তোমার বুড়িকে পেনসন দাও।'

'--হুঁ, তারপর তোমার মতো একটা চটকদার হাল-মডেল বেশ্যে রাখি।' বিমল সটান উত্তর দেয়। পিয়ারা সিং আর কিছু বলা বাহুল্য মনে করে ; কারণ বললেই বিমল রেগে যাবে, আর তার রাগ বড় বুনো ধরনের।

কার্তিক পূর্ণিমায় একটা মেলা বসবে এখান থেকে মাইল বারো দূরে, সেখানে আছে নরসিংহ দেবের বিগ্রহ নিয়ে এক মন্দির। ট্যাক্সিস্ট্যাণ্ডে যাত্রীর ভিড়। চটপট ট্যাক্সিগুলো যাত্রী ভরে নিয়ে হুস হুস করে বেরিয়ে গেল। শূন্য স্ট্যাণ্ডে একা পড়ে থেকে শুধু ধুঁকতে লাগল বুড়ো জগদ্দল। কে আসবে তার কাছে, যার ঐ প্রাগৈতিহাসিক গঠন আর পৌরাণিক সাজসজ্জা?

গোবিন্দ এসে সমবেদনা জানিয়ে বললো—কি গো বিমলবাবু, একটাও ভাড়া পেলে না?

—না।

—তবে?

—তবে আর কি? এর শোধ তুলব সন্ধ্যেয়। ডবল ওভারলোড নেব, যা থাকে কপালে।

"আমিও যন্ত্র। বেঙ্গলী ক্লাব বলেছে ভালো।' বিমল খুশি হয়ে মনে মনে হাসে।

কিন্তু জগদ্দলও যে মানুষেরই মতো, এ তত্ত্ব বেঙ্গলী ক্লাব বোঝে না, এইটেই দুঃখ। এই কম্পিটিশনের বাজারে, এইসব শিকরে-বাজের ভিড়ে, এই বুড়ো জগদ্দলই তো দিন গেলে নিদেন দুটি টাকা তার হাতে তুলে দিচ্ছে! আর তেল খায় কত কম। গ্যালনে সোজা বাইশটি মাইল দৌড়ে যায়। বিমল গরীব, জগদ্দল যেন এই সত্যটুকু বোঝে!

আরবী ঘোড়ার মতো প্রমত্ত বেগে জগদ্দল ছুটে চলেছে রাঁচীর পথে। সাবাস্ তার দম, দৌড় আর লোড টানার শক্তি। কম্পমান স্টিয়ারিং হুইলটাকে দুহাতে আঁকড়ে ও বুক ঠেকিয়ে বিমল ধরে রয়েছে। অনুভব করছে দুঃশীল জগদ্দলের প্রাণস্ফূর্তির শিহর। কনকনে মাঘী হাওয়া ইস্পাতের ফলার মতো চামড়া চেঁছে চলে যাচ্ছে। মাথায় জড়ানো কম্ফোটারটা দু'কানের ওপর টেনে নামিয়ে দিল বিমল ; বিমলের বয়স হয়েছে, আজকাল ঠাণ্ডাফাণ্ডা সহজে কাবু করে দেয়।

সম্মুখে পড়ল একটা পাহাড়ী ঘাট। এই সুবিসর্পিত চড়াইটা জগদ্দল রুষ্ট চিতাবাঘের মতো একদমে গোঁ গোঁ করে কতবার পার হয়ে গেছে। সেদিনও অভ্যস্ত বিশ্বাসে ঘাটের কাছে এসে বিমল চাপল এক্সিলেটার—পুরো চাপ! জগদ্দল পঞ্চাশ গজ এগিয়ে খং খং করে

কঁকিয়ে উঠল। যেন তার বুকের ভেতর ক'টা হাড় সরে গিয়েছে। উৎকর্ণ হয়ে বিমল শুনল সে আওয়াজ! না ভুল নয়, সেরেছে জগদ্দল! পিস্টন ভেঙে গেছে!

ক'দিন পরে মাঝপথে এমনি আকস্মিকভাবে বেয়ারিং গলে গিয়ে একটা বড় রিজার্ভ নষ্ট হয়ে গেল। তারপর একটা না একটা উপসর্গ লেগেই রইল। এটা দূর হয় তো ওটা আসে। আজ ফ্যানবেল্ট ছেঁড়ে, কাল কারবুরেটারে তেল পার হয় না, পরশু প্লাগগুলো অচল হয়ে পড়ে--শর্ট সারকিট হয়।

এত বড় বিশ্বাসের পাহাড়টা শেষে বুঝি টলে উঠল। বিমল ক'দিন থেকে অস্বাভাবিক রকমের বিমর্ষ। এদিক সেদিক ছুটোছুটি করে বেড়ায়। জগদ্দলেরও নিয়মভঙ্গ হয়েছে, স্ট্যাণ্ডে আসা বাদ পড়ছে মাঝে মাঝে। উৎকণ্ঠায় বিমলের বুক দুর দুর করে। তবে কি শেষে সত্যই জগদ্দল ছুটি নেবে?

--'না, আমি আছি জগদ্দল ; তোকে সারিয়ে টেনে তুলবই, ভয় নেই।' মোটরবিশারদ পাকা মিস্ত্রী বিমল প্রতিজ্ঞা করে।

কলকাতায় অর্ডার দিয়ে প্রত্যেকটি জেনুইন কলকব্জা আনিয়ে ফেলে বিমল। নতুন ব্যাটারি, ডিস্ট্রিবিউটর, অ্যাক্সেল, পিস্টন সব আনিয়ে ফেললো। অকৃপণ হাতে শুরু হলো খরচ ; প্রয়োজন বুঝলে রাতারাতি তার করে জিনিস আনায়। রাত জেগে খুটখাট মেরামত, পার্টস বদল আর তেলজল চলেছে। জগদ্দলকে রোগে ধরেছে, বিমল যেন ক্ষেপে উঠেছে। অর্থাভাব--বেচে ফেললো ঘড়ি, বাসনপত্র, তক্তপোশটা পর্যন্ত।

সর্বস্ব তো গেল, যাক। পনের বছরের বন্ধু জগদ্দল এবার খুশি হবে, সেরে উঠবে। খুব করা গেছে যা হোক ; এবার নতুন হুড, রং আর বার্নিস পড়লে একখানি বাহার খুলবে বটে! বিমলের কল্পনা যেন নিজেরই খুশিতে বিমলের মনের ভিতর হাসতে থাকে।

রাত দুপুরে জগদ্দলকে গ্যারেজে বন্ধ করার সময় বিমল একবার আলো তুলে দেখে নিল। খুশি উপচে পড়ল তার দু'চোখে! এই তো বলিহারি মানিয়েছে জগদ্দলকে! ক'দিনের অক্লান্ত সেবায় জগদ্দলের চেহারা ফিরে গেছে ; দেখাচ্ছে যেন একটি তেজি পেশীওয়ালা পালোয়ান। এক ইশারায় দঙ্গলে ভিড়ে যেতে প্রস্তুত। হাত মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়ল বিমল। বড় পরিশ্রমের চোট গেছে ক'দিন। কিন্তু কী আরামই না লাগছে ভাবতে--জগদ্দল সেরে উঠেছে ; কাল সকালে সগর্জনে নতুন হর্নের শব্দে সচকিত করে জগদ্দলকে নিয়ে যখন স্ট্যাণ্ডে গিয়ে দাঁড়াবে বিমল, বিস্ময়ে হতবাক্ হবে সবাই, আবার জ্বলবে হিংসেতে।

হঠাৎ বিমলের ঘুম ভেঙে গেল। শেষ রাত্রি তবু নিরেট অন্ধকার। ঝুপ্ ঝুপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। ধড়ফড় করে উঠে বসল বিমল--জগদ্দল ভিজছে না তো! গ্যারেজের টিনের ছাদটা যা পুরনো, কত ফুটো ফাঁটাল আছে কে জানে! কোন ফাঁকে ইঞ্জিনে জল ঢুকলে হয়েছে আর কি! বডির নতুন পালিশটাকেও স্রেফ ঘা করে দেবে।

কেরোসিনের বাতি জ্বালিয়ে নিয়ে গ্যারেজে ঢুকে বিমল প্রায় চেঁচিয়ে উঠল--আরে হায়! হায়! ছাদের ফুটো দিয়ে ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টির জল ঝরে পড়ছে ঠিক ইঞ্জিনের ওপর। দৌড়ে শোবার ঘর থেকে বিমল নিয়ে এল তার বর্ষাতিটা ; টেনে আনল বিছানার কম্বল সতরঞ্চি চাদর।

ইঞ্জিনের ভেজা বনেটটা মুছে ফেলে কম্বলটা চাপিয়ে দিল, তার ওপর বর্ষাতিটা! সতরঞ্চি আর চাদর দিয়ে গাড়িটার সর্বাঙ্গ ঢেকে দিয়ে নিজেও ঢুকে পড়ল ভেতরে ; নতুন নরম গদিটার ওপর গুটিসুটি হয়ে বিমল শুয়ে পড়ল ; আরামে তার দুচোখে যেন ঘুমের ঢল নেমে এলো।

পরদিনের ইতিহাস। স্ট্যাণ্ডের উদ্‌গ্রীব জনতা জগদ্দলকে ঘিরে দাঁড়াল, যেন একটা অঘটন ঘটে গেছে। স্তুতিমুখর দর্শকেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল বিমলের অপূর্ব মিস্তিরী-

প্রতিভার নিদর্শন। বিমলও টেনে টেনে কয়েকবার হাসল। কিন্তু কেমন যেন একটু অস্বচ্ছ সে হাসি, একটা শঙ্কার ধূসর স্পর্শে আবিল।

কেন? বিমলের মনের ভিতরে বেদনা ছড়ায় একটা সন্দেহ। জগদ্দল চলছে ঠিকই, কিন্তু কই সেই স্টার্টমাত্র শক্তির উচ্চকিত ফুৎকার, সেই দর্পিত হ্রেষাধ্বনি আর দুরন্ত বনহরিণের গতি?

শহর থেকে দূরে একটা মাঠের ধারে গিয়ে বিমল বেশ করে জগদ্দলকে পরীক্ষা করে দেখল।

'--চল বাবা জগদ্দল! একবার পক্ষিরাজের মতো ছাড় তো পাখা!' বিমল চাপল এক্সিলেটার! নাঃ, বৃথা, জগদ্দল অসমর্থ।

ফার্স্ট, সেকেণ্ড, থার্ড--প্রত্যেকটি গিয়ার পর পর পাল্টে টান দিল বিমল। শেষে রাগ চড়ে গেল মাথায়--'চল, নইলে মারব লাথি।'

অক্ষম বৃদ্ধের মতো জগদ্দল হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে চলতে থাকে।

--'আদর বোঝে না, কথা বোঝে না, শালা লোহার বাচ্চা, নির্জীব ভূত'--বিমল সত্যি সত্যি ক্লাচের ওপর সজোরে দুটো লাথি মেরে বসল।

বিমলের রাগ ক্রমশ বাড়ছে, সেই বুনো রাগ। আজ শেষ জবাব জেনে নেবে সে! জগদ্দল থাকতে চায় না যেতে চায়? অনেক তোয়াজ করেছে সে, আর নয়।

রাগে মাথাটা খারাপই হয়ে গেল বোধহয়। বিমল ঠেলে ঠেলে প্রকাণ্ড সাত-আটটা পাথর নিয়ে এল। ঘামে ভিজে ঢোল হয়ে গেল পরিশ্রান্ত বিমলের খাকি কামিজ। এক এক করে সব পাথরগুলো গাড়িতে তুলে দিল। একেই বলে লোড! এই লোড জগদ্দলকে আজ টানতে হবে ; দেখা যাক, জগদ্দলের সেই শক্তি আছে, না চিরকালের মতো ফুরিয়ে গিয়েছে।

'চল।' জগদ্দল চলল ; গাঁটে গাঁটে আর্তনাদ বেজে উঠল ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে। অসমর্থ--আর পারবে না জগদ্দল এ ভার বইতে!

এইবার বিমল নিশ্চিন্ত। জগদ্দলকে যমে ধরেছে। এ সত্যে আর সন্দেহ নেই। এত কড়া কলিজা জগদ্দলের, তাতেও ঘুণ ধরল আজ। কৃতান্তের ডাক, আর রক্ষে নেই, এইবার দিন ফুরিয়ে সন্ধ্যা নামবে। শেষ কড়ি খরচ করেও রইল না জগদ্দল।

আমি শুধু রৈনু বাকি...পরিশ্রান্ত বিমল মনে মনে যেন বলে উঠল।--কিন্তু আমারও তো হয়ে এসেছে। চুলে পাক ধরেছে, রগগুলো জোঁকের মতো গা ছেয়ে ফেলেছে সব! সেদিনের আর বেশি দেরি নেই, যেদিন জগদ্দলের মতো এমনি করে হাঁপিয়ে আর খুঁড়িয়ে আমাকেও বাতিল হয়ে যেতে হবে।

বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে চুপ করে জগদ্দলের দিকে তাকিয়ে থাকে বিমল। মনের ভিতরে যেন একটা শূন্যতার আক্ষেপ ছটফট করতে থাকে। 'জগদ্দল আগেই যাবে বলে মনে হচ্ছে। তারপর আমার পালা! যা জগদ্দল, ভালো মনেই বিদেয় দিলাম। অনেক খাইয়েছিস, পরিয়েছিস, আর কত পারবি? আমার যা হবার হবে।' যা কোনদিন হয়নি, তাই হলো। ইস্পাতের গুলির মতো শুকনো ঠাণ্ডা বিমলের চোখে দেখা দিল দু'ফোঁটা টলমলে উষ্ণ জল।

ফিরে এসে বিমল জগদ্দলকে গ্যারেজের বাইরে বেলতলায় দাঁড় করিয়ে নেমে পড়ল। পেছন ফিরে আর তাকাল না। সোজা গিয়ে উঠোনে বসে পড়ল, সামনে রাখল দু'বোতল তেজালো মহুয়া।

একটি চুমুক সবে দিয়েছে, শোনা গেল কে ডাকছে--বিমলবাবু আছ! গোবিন্দের গলা।

গোবিন্দ এলো, সঙ্গে একজন মারোয়াড়ী ভদ্রলোক।

--আদাব বাবুজী।

--আদাব, কোন্ গাড়ির এজেন্ট আপনি? বিমল প্রশ্ন করল। গোবিন্দ পরিচয় করিয়ে দিয়ে

বলল--গাড়ির এজেন্ট নন উনি ; পুরনো লোহা কিনতে এসেছেন কলকাতা থেকে। তোমার তো গাদাখানেক ভাঙা অ্যাক্সেল আর রীমটিম জমে আছে। দর বুঝে ছেড়ে দাও এবার।

বিমল খানিকক্ষণ নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল দু'জনের দিকে। ভবিতব্যের ছায়ামূর্তি তার পরম ক্ষুধার দাবী নিয়ে, ভিক্ষাভাণ্ডটি প্রসারিত করে আজ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এমনিতে ফিরবে না সে, শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা চাই। ব্যাপারটা বুঝল বিমল।

--হ্যাঁ আছে পুরানো লোহা, অনেক আছে, কত দর দিচ্ছেন?

--চোদ্দ আনা মণ বাবুজী, মারোয়াড়ীর ব্যগ্র জবাব এলো।--লড়াই লেগেছে, এই তো মওকা, ঝেড়েপুঁছে সব দিয়ে ফেলুন বাবুজী।

--হ্যাঁ সব দেব। আমার ঐ গাড়িটাও দেব। ওটা একেবারে অকেজো হয়ে গেছে।

হতভম্ব গোবিন্দ শুধু বলল--সে কি গো বিমলবাবু?

নেশা ভাঙল এক ঘুমের পর। তখনো রাত, বিমল আর এক বোতল পার করে শুয়ে পড়ল।

ভোর হয়ে এসেছে। থেকে থেকে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে বিমলের। বাইরের জাগ্রত পৃথিবীর সমস্ত কোলাহল থেকে উপচে পড়ছে শুধু একটি শব্দ, বিমলের কানের কাছে আছড়ে পড়ছে --ঠং ঠং ঠকাং ঠকাং। মারোয়াড়ীর লোকজন ভোরে এসেই বিমলের গাড়ি টুকরো টুকরো করে খুলে ফেলেছে।

শোক আর নেশা। জগদ্দলের পাঁজর খুলে পড়ছে একে একে। বিমলের চৈতন্যও থেকে থেকে কোন অন্তহীন নৈঃশব্দের আবর্তে যেন পাক দিয়ে নেমে যাচ্ছে অতলে। তারপরই লঘুভার হয়ে ভেসে উঠছে ওপরে। এরই মাঝে শুনতে পাচ্ছে বিমল, ঠং ঠং ঠকাং ঠকাং, ছিন্নভিন্ন ও মৃত জগদ্দলের জন্য কারা যেন খবর খুঁড়ছে। ঠং ঠং ঠকাং ঠকাং, যেন অনেক কোদাল আর অনেক শাবলের শব্দ।

জরৎকারু ও অস্তিকা

যাযাবর বংশের সকলেই অতিবৃদ্ধ হয়েছেন। দ্বিতীয় পুরুষ বা সন্তান বলতে বংশের মধ্যে মাত্র একজন, জরৎকারু। কিন্তু জরৎকারুও বৃদ্ধ হ'তে চলেছেন। আজ পর্যন্ত বিবাহ ক'রে গৃহী হলেন না। অতিবৃদ্ধ পিতৃসমাজের এই এক দুঃখ।

যাযাবর বংশের গৌরব জরৎকারু, কঠোর ব্রতপরায়ণ তপস্বী। পরম প্রতাপ রাজা জনমেজয় তাঁকে ভক্তিনম্র শিরে অভিবাদন করেন। তপস্যা ও ব্রত ছাড়া সংসারে ও সমাজে আর কোন কর্তব্য গ্রহণ করতে চান না জরৎকারু। রাজা জনমেজয় সংকল্প ঘোষণা ক'রে রেখেছেন, যদি ঋষি জরৎকারু কোনদিন গৃহিজীবন গ্রহণ ক'রে পুত্রলাভ করেন, তবে জরৎকারুর সেই পুত্রকেই তিনি তাঁর মন্ত্রগুরুরূপে সম্মানিত করবেন।

কিন্তু এই গৌরব ও সম্মান সত্ত্বেও যাযাবর পিতৃসমাজের মন বিষণ্ণ হয়ে আছে। জরা বা বার্ধক্যের জন্য নয় ; বংশলোপের আশঙ্কায়। একমাত্র বংশধর জরৎকারু ব্রহ্মচর্যে ব্রতী হয়ে আছে, এই হলো তাঁদের দুঃখের কারণ। জরৎকারুর তপোবল ও বিদ্যার জন্য তাঁরা গৌরব অনুভব করেন ঠিকই, কিন্তু যখন চিন্তা করেন যে, জরৎকারুর পরে যাযাবর কুলের প্রতিনিধিরূপে পৃথিবীতে কেউ থাকবে না, তখনই তাঁদের মনের শান্তি নষ্ট হয়। পিতৃসমাজের মনে এমন আক্ষেপও মাঝে মাঝে জাগে, এই প্রভূত তপোবলের গৌরব ক্ষুণ্ণ ক'রেও যদি জরৎকারু এক সংসারসঙ্গিনী নিয়ে গৃহী হতো, সন্তানের পিতা হতো, তা'ও শ্রেয় ছিল। জরৎকারুর উগ্র তপস্যা শুদ্ধতা সংযম ও তীর্থ-পরিক্রমার পুণ্য, এসবের জন্য হয়তো পৃথিবীতে যাযাবর বংশের নাম থাকবে, কিন্তু যাযাবর বংশ আর থাকবে না। পিতৃপুরুষের বিদেহী সত্তাকে তৃষ্ণার জল দিয়ে তর্পণ করতে কেউ থাকবে না। দুঃখ না হয়ে পারে না।

পিতৃসমাজের দুঃখের কারণ একদিন শুনতে পেলেন জরৎকারু। তাঁরা জরৎকারুকে বললেন--আমাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে, তোমার গৌরব নিয়ে আমরা সুখে মরব, কিন্তু শান্তি নিয়ে মরতে পারব না। তোমার ব্রহ্মব্রতের জন্য আমাদের বংশ লুপ্ত হতে চলেছে।

জরৎকারুর মত তপস্বীর কঠিন মনে তবু বিন্দুপরিমাণ সমবেদনাও জাগে না। পিতৃসমাজ বলেন—তোমার কাছে অনুগ্রহ বা সমবেদনার প্রার্থী আমরা নই। তোমার কর্তব্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। বংশরক্ষার জন্য যখন আমাদের সমাজে দ্বিতীয় আর কেউ নেই, শুধু তুমি আছ, তখন এই কর্তব্য পালনের দায় একান্তভাবে তোমারই। সমাজের প্রতি, পিতৃপুরুষের প্রতি কর্তব্য অবহেলা ক'রে তপস্বী হওয়ার অধিকার তোমার নেই। তুমি নিজে কর্তব্যবাদী বিবেকবান ও বিদ্বান ; তুমি জান আমরা যা বলছি, তা তোমারই ধর্মসঙ্গত নীতি।

জরৎকারু কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে বলেন--আপনারা ঠিকই বলেছেন। আপনাদের দ্বিতীয় পুরুষে যখন আমি ছাড়া আর কেউ নেই, তখন বংশধারা রক্ষার কর্তব্য একান্তভাবে আমারই ধর্ম। কিন্তু আমি যেভাবে আমার জীবন গঠন করেছি, তাতে আমার পক্ষে গৃহিজীবন যাপন করা সম্ভব নয়। পতি হওয়া বা পিতা হওয়ার আগ্রহ বোধ হয় আমার শেষ হয়ে গিয়েছে। সংসার অন্বেষণ ক'রে কোন নারীকে জীবনে আহ্বান করবার রীতিনীতিও আমি ভুলে গিয়েছি। আমি বিষয় উপার্জনের পদ্ধতিও জানি না।

পিতৃসমাজ বলেন--কিন্তু উপায় কি? যে ভাবেই হোক, তোমাকে বংশরক্ষার কর্তব্য গ্রহণ করতেই হবে।

জরৎকারু বলেন--আমি একটি প্রতিশ্রুতি আপনাদের দিতে পারি। আমারই সমনাম্নী

কোন নারী যদি স্বেচ্ছায় আমার জীবনে এসে শুধু পুত্রবতী হতে চায়, তবে আমি তার ইচ্ছা পূর্ণ করব, নিজের ইচ্ছা নয় ; কারণ ইচ্ছাহীন হয়েছে আমার জীবন। আমার মনের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই, সে-মনে সম্ভোগের তিলমাত্র বাসনা নেই।

অতিবৃদ্ধ পিতৃসমাজ হৃষ্টচিত্তে বলেন—তোমার কাছ থেকে এই আশ্বাসও যথেষ্ট। তুমি ভার্যা গ্রহণে সম্মত আছ, এই সত্য জেনেই আমরা শান্তিতে মরতে পারব। মরবার আগে আমরা প্রার্থনা ক'রে যাব, এমন নারী তোমার জীবনে সুলভ্যা হোক, যে নারী স্বেচ্ছায় এসে তোমার সাহচর্যে পুত্রবতী হবে।

ব্রহ্মচারী জরৎকারু, যিনি শুধু আকাশের বায়ুকে ভোজ্যরূপে গ্রহণ ক'রে শরীর ক্ষীণ ক'রে ফেলেছেন, তিনিও প্রবীণ জীবনে দারগ্রহণ করতে সম্মত হয়েছেন, জনসমাজে এবং দেশ ও দেশান্তরে এই সংবাদ রটিত হয়ে গেল। রাজা জনমেজয় শুনে সুখী হলেন।

শ্রদ্ধেয়রূপে সর্বজনবরেণ্যরূপে যিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, তাঁর পক্ষে কিন্তু বরমাল্য লাভ করবার কোন লক্ষণ বা ঘটনা দেখা দিল না। নিঃসম্পদ এক তপস্যাপরায়ণের সংসারভাগিনী হওয়ার মত আগ্রহ হবে, এমন কন্যা দুর্লভ বৈকি।

কিন্তু আশ্চর্য, দেশান্তরে এক রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে এই সংবাদ একজনের বিষণ্ণ মনের চিন্তায় প্রবল এক আগ্রহের চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। নাগরাজ বাসুকির মনে।

নাগরাজ বাসুকিও কুলক্ষয়ের আশঙ্কায় বিষণ্ণ হয়ে আছেন। শুধু তাঁর পুরুষপরম্পরা বংশধারার ক্ষয় নয়, তার চেয়েও ভয়ানক এক ক্ষয়ের আশঙ্কা। সমগ্র নাগ জাতিকেই ধ্বংস করবার জন্য রাজা জনমেজয় তাঁর নিষ্ঠুর পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ক'রে ফেলেছেন। পরাক্রান্ত জনমেজয়ের বৈরিতা ও আক্রমণের সম্মুখে দুর্বল নাগসমাজ আত্মরক্ষা করতে পারে, এমন উপায় আজও আবিষ্কার ক'রে উঠতে পারেননি বাসুকি। নাগপ্রধানেরা একে একে এসে সকল রকম প্রয়াস ও পন্থার পরামর্শ দিয়ে গিয়েছেন, সূক্ষ্ম কূট ও প্রচ্ছন্ন, কিন্তু কোনটিকেই জাতিরক্ষার উপযোগী পন্থা বলে বিশ্বাস করতে পারছেন না বাসুকি। বিশ্বাস হয় না, পরাক্রান্ত জনমেজয়ের শক্তিকে এই সব সূক্ষ্ম কূট বা প্রচ্ছন্ন কোন আঘাত দিয়ে পরাভূত করা সম্ভব হবে।

জাতিরক্ষার জন্য এই চিন্তার মধ্যে বাসুকি আজ কেন যেন বার বার জরৎকারুর কথা স্মরণ করছিলেন। জনমেজয়ের শ্রদ্ধাস্পদ জরৎকারু, যে জরৎকারুর পুত্রকে ভবিষ্যতের মন্ত্রগুরুরূপে নির্বাচিত ক'রে রেখেছেন জনমেজয়, সেই জরৎকারু পরিণত বয়সে ব্রহ্মব্রতের রীতি ক্ষুণ্ণ ক'রে বিবাহের সংকল্প করেছেন। স্বজাতিকে ধ্বংস থেকে রক্ষা, আর জরৎকারুর বিবাহের সংকল্প, দুই ভিন্ন বিষয় ও ভিন্ন প্রশ্ন, দুই ভিন্ন ঘটনা ও ভিন্ন সমস্যা। তবু এই দুই প্রশ্নকে এক ক'রে নিয়ে চিন্তা করছিলেন বাসুকি। মনে হয় বাসুকির, জনমেজয়ের নিষ্ঠুর পরিকল্পনার আঘাত থেকে জাতিকে রক্ষা করবার উপায় আছে।

বার বার মনে পড়ে বাসুকির, তাঁর ভগিনী অস্তিকার কৌলেয় নামও যে জরৎকারু। যা খুঁজছিলেন তারই ইঙ্গিত চিন্তার মধ্যে একটু স্পষ্ট হয়ে উঠতেই আবার বিষণ্ণ হয়ে ওঠেন বাসুকি। বড় কঠিন এই পথ. বড় কঠোর তাঁরও অন্তরের এই পরিকল্পনা। কিন্তু না, শতধিক্, কী নিষ্ঠুর এই কল্পনা! এক তরুণীর জীবনকে উৎকোচরূপে বিলিয়ে দিয়ে জাতিকে বাঁচাতে হবে, এমন চিন্তা মুখ খুলে প্রকাশ করতেও মনের মধ্যে শক্তি খুঁজে পাচ্ছিলেন না বাসুকি। কিন্তু উপায় নেই, বলতেই হবে।

হঠাৎ কক্ষান্তর থেকে বাসুকির সম্মুখে এসে দাঁড়ায় অস্তিকা, বাসুকির ভগিনী। চমকে উঠলেন বাসুকি। যে নির্মম পরিকল্পনার সঙ্গে মনের গোপনে আলাপ করছিলেন বাসুকি, অস্তিকা কি তাই শুনতে পেয়েছে?

বাসুকির ভগিনী অস্তিকা আজও অনূঢ়া, কিন্তু এই কারণে বাসুকির বা অস্তিকার মনে কোন দুশ্চিন্তা নেই। সে কেমন সুপুরুষ, এমন রূপান্বিতা ও সুযৌবনা তরুণীর বরমাল্য কণ্ঠে ধারণ করতে যার আগ্রহ হবে না? কত কান্তিমান যশস্বী ও গুণাধার কুমার এই অস্তিকার পাণিপ্রার্থনার জন্য উৎসুক হয়ে রয়েছে, কিন্তু কুমারী অস্তিকার মনে তার জন্য কোন উৎসাহ নেই ; আনন্দও নেই। দেশান্তরে গিয়ে রাজমহিষী হয়ে জীবন যাপন করবার পথ মুক্ত হয়েই রয়েছে, ইচ্ছা করলে স্বয়ংবরা হয়ে আজই সেই পথে চলে যেতে পারে অস্তিকা। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় অস্তিকার, জনমেজয়ের আক্রমণে তারই ভ্রাতৃসমাজ অচিরে ধ্বংস হয়ে যাবে। শান্তি হারায় সুন্দরী অস্তিকার মন। আসন্ন বিনাশের আশঙ্কায় বেদনাপন্ন জাতি ও সমাজের কথা ভাবতে গিয়ে নিজের জীবনের জন্য কোন আনন্দের উৎসব কল্পনা করতেও ভাল লাগে না। নাগজাতির সঙ্কট, তার পিতৃকুলের সঙ্কট, এর মধ্যে তার কি কোন কর্তব্য নেই?

আজ এতদিন পরে যেন এক কর্তব্যের সন্ধান পেয়েছে অস্তিকা। সেই কথা জানবার জন্য ভ্রাতা বাসুকির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

অস্তিকা বলে—মহাতপা জরৎকারু পিতৃসমাজের অনুরোধে কুলরক্ষার জন্য পত্নী গ্রহণের সংকল্প করেছেন, একথা আপনি নিশ্চয় শুনেছেন ভ্রাতা?

বাসুকি—হ্যাঁ শুনেছি।

অস্তিকা—জরৎকারুর পুত্রকে রাজা জনমেজয় ভবিষ্যতে মন্ত্রগুরুরূপে গ্রহণ করবেন, একথা আপনি নিশ্চয় শুনেছেন।

—হ্যাঁ।

—জরৎকারুকে যদি আমি স্বামিরূপে বরণ করি, তবে?

বাসুকি বিস্ময়ে চিৎকার ক'রে ওঠেন—তবে কি?

—আপনি কূটনাতিক ও বিজ্ঞ, আপনি চিন্তা ক'রে দেখুন, জনমেজয়ের আক্রমণ থেকে নাগজাতিকে রক্ষা করবার উপায় হতে পারে, যদি আমি মহাতপা জরৎকারুকে স্বামিরূপে গ্রহণ করি।

হ্যাঁ, নিশ্চয় উপায় হতে পারে। বাসুকির মন যে এই বিশ্বাসের জন্যই আশা দুরাশা ও হতাশার দ্বন্দ্ব সহ্য করছে। ভবিষ্যতের যে জরৎকারুপুত্রকে জনমেজয় মন্ত্রগুরুরূপে নির্বাচিত ক'রে রেখেছেন, সেই জরৎকারুপুত্র যদি বাসুকির ভাগিনেয় হয়, তবে উপায় হতে পারে। অস্তিকার ক্রোড়ে লালিত সেই জরৎকারুপুত্র তার নিজের মাতৃকুল ধ্বংসের পরিকল্পনায় কখনই জনমেজয়কে সমর্থন করবে না ; বরং, এবং অবশ্য, একমাত্র সে-ই জনমেজয়কে নিবৃত্ত করতে পারে। হ্যাঁ, উপায় হতে পারে।

তবু বাসুকির কণ্ঠস্বর বেদনায় উদাস হয়ে যায়—আমার চিন্তা অপচিন্তা বা দুশ্চিন্তার কথা ছেড়ে দাও ভগিনী অস্তিকা, তুমি নিজের উপর এতটা নির্মম হয়ো না।

অস্তিকা—কিসের নির্মমতা?

বাসুকি—জরৎকারু নিতান্ত দরিদ্র প্রায়বৃদ্ধ ও সংসারবিমুখ এক তপস্বী। তোমার মত সুযৌবনা রূপান্বিতা ও সুখলালিতা নারীর পক্ষে এহেন ব্যক্তি কখনই বরণীয় হতে পারে না।

অস্তিকা বাধা দিয়ে বলে—জাতিকে সমূহ বিনাশ হতে রক্ষা করবার কোন উপায় যখন আর নেই, তখন আমার মত নারীর পক্ষে যা সাধ্য, আমি তাই করতে চাই। আপনার সম্মতি আছে কিনা বলুন?

বাসুকি—আছে। এই একটিমাত্র উপায় আছে। এবং এতক্ষণ ধ'রে অনেক কুণ্ঠা সত্ত্বেও এই উপায়ের কথা চিন্তা করছিলাম ভগিনী অস্তিকা। আশীর্বাদ করি তুমি যেন...।

অস্তিকা—প্রার্থনা করুন, নাগজাতি যেন রক্ষা পায়।

বনপথে একা যেতে যেতে হঠাৎ নাগরাজ বাসুকিকে দেখতে পেয়ে আদৌ বিস্মিত হননি জরৎকারু, কিন্তু নাগরাজের উচ্চারিত অভ্যর্থনার বাণী শুনে একটু বিস্মিত হলেন, এবং নাগরাজের অনুরোধ শুনে আরও বেশি বিস্মিত হলেন।

জরৎকারু বলেন--শুনে সুখী হলাম, আপনার ভগিনী আমারই সমনাম্নী। কিন্তু আমার মত বিষয়সম্পদহীন বয়োবৃদ্ধ পুরুষের জীবনে অযাচিত উপহারের মত এক কুমারী তরুণীর জীবন আত্মসমর্পণ করতে চাইছে, শুনে বিস্ময় হয় নাগরাজ।

বাসুকি--বিস্ময় হলেও বিশ্বাস করুন ঋষি, আমার ভগিনী অস্তিকা স্বেচ্ছায় আপনার মত তপস্বীকে পতিরূপে বরণ করবার জন্য প্রতীক্ষায় রয়েছে।

জরৎকারু--আমার কিন্তু ভার্যা পোষণের উপযোগী বিষয়সম্পদ অর্জনের কোন সামর্থ্য নেই।

বাসুকি--জানি, সে দায় আমি নিলাম।

জরৎকারু--আমি কিন্তু সম্ভোগসুখের জন্য আদৌ স্পৃহাশীল নই।

বাসুকি--জানি, সে তো আপনার জীবনেরই আদর্শ।

জরৎকারু--মাত্র পিতৃসমাজের কাছে প্রতিশ্রুত সত্য রক্ষার জন্য আমি কুলরক্ষার সংকল্প গ্রহণ করেছি।

বাসুকি--জানি, সে তো আপনারই কর্তব্য।

জরৎকারু--তবু আশঙ্কা হয় নাগরাজ। এভাবে পত্নী গ্রহণ করলে একটা দীনতা স্বীকার করতে হবে। আমার কুলরক্ষার ব্রতে সহায়িকা হয়ে যে-নারী আমার কাছে আসতে চাইছে, সে-নারী আমার প্রতি তার আচরণে প্রিয়তা ও সম্মান রক্ষা করতে পারবে কি?

বাসুকি--আমি আশ্বাস দিতে পারি ঋষি, আমার ভগিনীর আচরণে আপনি কোন অপ্রিয়তার প্রমাণ পাবেন না।

জরৎকারু--আমি নিজেকে জানি বলেই একটি কথা জানিয়ে রাখি। আপনার ভগিনীর আচরণ যেদিন আমার কাছে অপ্রিয় বোধ হবে, সেদিনই আমি চলে যাব, এবং আর ফিরে আসব না।

বাসুকি--আপনার এই অধিকারও স্বীকার করি ঋষি।

বিবাহ হয়ে গেল। তপস্বী জরৎকারু ও রাজকুমারী অস্তিকার বিবাহ। এই বিবাহে বরমাল্য বিনিময়ের সঙ্গে হৃদয় বিনিময়ের কোন প্রশ্ন ছিল না। লগ্ন যতই মধুর হোক, কোন আনন্দ শঙ্খে শঙ্খে ধ্বনিত হবার কথা ছিল না। মাঙ্গলিক বেদিকা আলিম্পনে রঙীন হলেও অন্তরনিলয় অনুরাগে রঞ্জিত ছিল না। একজনের উদ্দেশ্য পিতৃকুল রক্ষা, আর একজনের উদ্দেশ্য ভ্রাতৃকুল রক্ষা, তারই জন্য এই বিবাহ। সমাজনীতির মর্যাদা রক্ষা করবার জন্য এক তপস্বী তাঁর ব্রহ্মব্রত ক্ষুণ্ণ ক'রে এক সুযৌবনা নারীকে গ্রহণ করলেন। রাজনীতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য এক তরুণী রাজকুমারী এক বয়োবৃদ্ধ তপস্বীকে গ্রহণ করলেন।

নাগপ্রাসাদের অভ্যন্তরে রমণীয় এক পুষ্পাকুল উদ্যান, সৌরভবিধুর বায়ু আর বিহগের কলকূজন। তারই মধ্যে এক সুশোভন নিকেতনে জরৎকারু ও অস্তিকার অভিনব দাম্পত্যের জীবন আশ্রয় লাভ করে।

করতল কঠোর ক'রে অক্ষিসলিলের ধারা আগেই মুছে ফেলে এই ঘটনাকে বরণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল অস্তিকা। জানে অস্তিকা, এই দাম্পত্যে হৃদয়ের স্থান নেই। এক বয়ঃপ্রবীণ তপস্বীর সাহচর্য বরণ ক'রে তাকে শুধু পুত্রবতী হতে হবে। এ ছাড়া এই দাম্পত্যের আর কোন তাৎপর্য নেই।

জরৎকারুও জানেন, তাঁর কর্তব্য কি, সংকল্প কি? যাযাবর পিতৃসমাজের কাছে প্রদত্ত তাঁর

প্রতিশ্রুতি শুধু রক্ষা করতে হবে। অস্তিকা নামে এই নাগরাজভগিনী শুধু পুত্রবতী হবে : এক তরুণীর জীবনে মাত্র এইটুকু পরিণতি সফল করবার প্রয়াস ছাড়া আর কোন অভীপ্সা তাঁর নেই। সংকল্প অনুসারে এই বিবাহিত জীবনকে যেভাবে গ্রহণ করা উচিত, জরৎকারু ঠিক সেইভাবেই গ্রহণ করলেন। কুলরক্ষার আগ্রহ ছাড়া তাঁর মনে আর কোন আগ্রহ নেই।

মমতা এখানে নিষিদ্ধ, অনুরাগ অপ্রার্থিত, হৃদয়ের বিনিময় অবৈধ। স্পৃহাহীন সম্ভোগ, কামনাহীন মিলন। জরৎকারুর প্রয়োজন শুধু অস্তিকার এই নারীশরীর, নারীত্ব নয়। বিবাহের পর জরৎকারু নিরন্তর এবং প্রতি মুহূর্ত অস্তিকাকে বক্ষোলগ্ন করতে চান, বক্ষোলগ্ন ক'রে রাখেন।

অস্তিকার মনে হয়, এক বিরাট পাষাণের বিগ্রহ যেন তাকে বক্ষে ধারণ ক'রে রয়েছে, যে বক্ষে আগ্রহের কোন স্পন্দন নেই। জরৎকারুর এই কঠোর আলিঙ্গনে অস্তিকার অধর শীতাহত কমলপত্রের মত শিহরিত হয়। কিন্তু কোন আবেগের স্পর্শে নয় ; দুঃসহ এক দুঃখের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ যেন স্ফুরিত হতে চেষ্টা ক'রেও স্তব্ধ হয়ে যায়।

কি অদ্ভুত মিলন নিরন্তর অন্বেষণ করছেন স্বামী! ঋষির স্পৃহাহীন ও উদাসীন নিঃশ্বাসে যেন শুধু শোণিতের আগ্রহ!

দুঃসহ বোধ হলেও একটি আশা অন্তরে ধ'রে রেখেছে অস্তিকা, একদিন না একদিন জরৎকারুর এই কামনাহীন পৌরুষের অবসান হবে। মাঝে মাঝে আরও সুন্দর সুস্বপ্ন দেখে নিজেকে যেন সান্ত্বনা দান করে অস্তিকা। কামনা নেই ঋষির আচরণে, কিন্তু একদিন কামনা দেখা দেবে এই ঋষির নিঃশ্বাসে ; এবং সেই কামনা ও মমতায় সুরভিত হয়ে প্রেমে পরিণত হবে। জরৎকারুর জীবনে পতিধর্মের আবির্ভাব হবে। অস্তিকার দেহের স্পর্শকে সহধর্মিণীর স্পর্শ বলে অনুভব করবার মত হৃদয় লাভ করবেন জরৎকারু।

জরৎকারুকে পতির সম্মান দিয়ে আপন ক'রে নেবার আশা রাখে অস্তিকা। সুযোগ পায় না, তবু সুযোগের অন্বেষণ করে। নিতান্ত শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার আহ্বান ছাড়া জরৎকারুর কাছ থেকে আর কোন সহব্রতের আহ্বান আসে না, তবু অস্তিকার অন্তরাত্মা প্রতীক্ষায় থাকে। জরৎকারু যদিও কোনদিন বলেন না, তবু তাঁর পাদ্য-অর্ঘ্যের আয়োজন ক'রে রাখে অস্তিকা।

এই দাম্পত্যে প্রেম নেই, না থাকুক, তার জন্য দুঃখ করতে চায় না অস্তিকা! এই ঋষির নিঃশ্বাসে শুধু যদি একটুকু কামনাময় আগ্রহের উত্তাপ থাকত!

মধ্যনিশীথের তন্দ্রার মধ্যে নীরবে কেঁদে ওঠে অস্তিকার হৃদয়ের প্রার্থনা।—চাই না প্রেম, শুধু চাই এক বিন্দু কামনার স্পর্শ। বল ঋষি, একবার ঐ রক্তহীন হাস্যহীন ও বিহ্বলতাশূন্য শিলাবৎ অধর স্পন্দিত ক'রে তোমারই বিবাহিতা নারীর কানের কাছে শুধু বলে দাও, ভাল লাগে এই নারীর দেহের স্পর্শ।

নিজের ইচ্ছায় আহূত শোভাহীন ভাগ্যকে নতুন ক'রে সাজিয়ে তুলতে চেষ্টা করে অস্তিকা। মাত্র কুলরক্ষার জন্য সংস্কারচারিণী নারীর মন বুঝতে পারে, এই জীবন পত্নীর জীবন নয়। তবু ভবিষ্যতের জন্য আশা ধ'রে রাখে অস্তিকা। জরৎকারুর এই উত্তাপহীন তৃষ্ণা, আগ্রহহীন লালসা ও আকুলতাহীন সম্ভোগের প্রতিজ্ঞা মেঘাবৃত দিনের অন্ধকারের মত একদিন মিথ্যা হয়ে যাবে, কামনায় কমনীয় হবে জরৎকারুর কঠোর পতিত্ব।

সেদিন তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছিল, পশ্চিম আকাশে রক্তিম আলোকের অবশেষটুকুও আর ছিল না। অস্তিকার মনে পড়ে, স্বামী এখন সন্ধ্যা-বন্দনায় বসবেন। কোথায় আসন ক'রে দিতে হবে, কি উপকরণ সংগ্রহ ক'রে রাখতে হবে, সেই কথাই ভাবছিল অস্তিকা।

জরৎকারু হঠাৎ উপস্থিত হয়ে অস্তিকার হাত ধরলেন। অস্তিকার অন্তর এক অস্পষ্ট শঙ্কায় দুরু দুরু ক'রে ওঠে। পরমুহূর্তে আর কোন অস্পষ্টতা রইল না। মূক উন্মাদের মত

অকস্মাৎ অস্তিকাকে বাহুবন্ধে আবদ্ধ করলেন জরৎকারু। অক্ষণে অবিন্যস্ত কুসুমমাল্য আরও বিস্রস্ত ক'রে অরচিত শয্যায় উপবেশন করলেন।

কোনদিন যা করেনি অস্তিকা, আজ বাধ্য হয়ে তাই করতে হলো। মৃদু প্রত্যাখ্যানে জরৎকারুর বাহুবন্ধন ছিন্ন ক'রে উঠে দাঁড়ায় অস্তিকা। নম্র স্বরে প্রতিবাদ করে অস্তিকা—আপনি ভুল করছেন ঋষি, এখন আপনার সন্ধ্যা-বন্দনার সময়।

জরৎকারু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকেন। ধীরে ধীরে তাঁর মুখে যেন এক অপমানের জ্বালা দীপ্ত হয়ে ফুটে ওঠে।

জরৎকারু বলেন—একথা স্মরণ করিয়ে দিতে তোমার এত আগ্রহ কেন?

অস্তিকা—আমি আপনার স্ত্রী, আপনাকে কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেবার আগ্রহ আমারই তো থাকবে ঋষি।

—তোমাকে সে অধিকার আমি দিইনি।

—তবে আমার অধিকার কি?

—শুধু আমার আচরণের সাহায্য করা, বাধা দিয়ে আমাকে অপমান করা নয়।

—ক্ষমা করবেন ঋষি, অস্তিকার দেহ-মন আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যই প্রস্তুত হয়ে আছে। আপনার নিত্যদিনের ধর্মাচরণে সাহায্য করবার জন্যই আপনাকে সন্ধ্যা-বন্দনার কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছি। আপনাকে অপ্রিয় মনে করি না ঋষি, আপনি প্রিয় বলেই এইটুকু বাধা দিয়ে ফেলেছি। বলুন, কি অন্যায় করেছে আপনার পত্নী অস্তিকা।

—কোন ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন নয় অস্তিকা। মহাতপা জরৎকারুকে আজ তোমার কাছ থেকে কর্তব্যের যে উপদেশ শুনতে হলো, সে উপদেশ তার জীবনে তিরস্কারের আঘাত ছাড়া আর কিছু নয়। আমারই ভুলে আমাকে এই তিরস্কার করবার সুযোগ তুমি পেয়েছ। তপস্বী জরৎকারুর জীবনে এই প্রথম তিরস্কারের আঘাত। কিন্তু এই ভুলকে আর প্রশ্রয় দিতে পারি না, আমি যাই।

আর্তনাদ ক'রে ওঠে অস্তিকা—ঋষি!

জরৎকারু—বৃথা আমাকে ডাকছ অস্তিকা।

অস্তিকার দৃষ্টি বেদনায় সজল হয়ে ওঠে—আপনার পত্নী, আপনার সহচরী জীবনসঙ্গিনী, আপনার ধর্মভাগিনী অস্তিকা আপনাকে ডাকছে, আপনি যাবেন না ঋষি।

জরৎকারু—এত বড় সম্পর্কের প্রতিশ্রুতি আমি তোমাকে দিইনি অস্তিকা, আমার জীবনে এসবের কোন প্রয়োজন নেই। তবু ধন্যবাদ দান করি তোমাকে, তুমি আমাকে আমার এক ভুলের গ্লানি স্মরণ করিয়ে দিয়েছ।

চলে যাচ্ছিলেন জরৎকারু। অস্তিকা কিছুক্ষণ পলকহীন দৃষ্টি তুলে সেই নির্মম অন্তর্ধানের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার নারীত্ব কোন মূল্য পেল না, তার পত্নীত্ব কোন মর্যাদা পেল না। যাক, জেনে শুনে ও স্বেচ্ছায় এই অদ্ভুত এক নিয়তির কাছেই তো আত্মসমর্পণ করেছিল অস্তিকা।

হঠাৎ মনে পড়ে অস্তিকার, তারই জীবনের এক প্রতিজ্ঞা ও পরীক্ষাকে ব্যর্থ ক'রে দিয়ে যেন সদর্পে চলে যাচ্ছে এক মমতাহীন পৌরুষ। ইচ্ছাহীন পৌরুষের ঐ ঋষিকে এভাবে চলে যেতে দিলে রক্ষা পাবে না নাগজাতির জীবন, রক্ষা পাবে না অস্তিকার পিতৃকুলের কল্যাণ।

লুণ্ঠিত লতিকার মত অস্তিকার কোমল মূর্তি হঠাৎ অদ্ভুত এক আবেগে আহতা নাগিনীর মত চঞ্চল হয়ে ওঠে। মোহ নয়, মমতা নয়, শুধু এক কর্তব্যের অঙ্গীকার যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। অস্তিকাও তার কর্তব্যের কথা স্মরণ করে, তার প্রতিশ্রুতি ও সংকল্পের কথা। ত্বরিতপদে ছুটে এসে অস্তিকা জরৎকারুর পথরোধ ক'রে দাঁড়ায়। জরৎকারুর মুখের দিকে তাকিয়ে ডাকে—ঋষি।

লজ্জানম্রা নারীর দৃষ্টি নিয়ে নয়, পতিপ্রেমিকা সহজীবনপ্রার্থিনী ভার্যার সেবাকুল দৃষ্টি নিয়ে নয়, যৌবনস্পৃহাও বিবৃত ক'রে নয়, শুধু এক অসংবৃত নারীদেহ যেন শুধু এক পুরুষদেহের সংসর্গ বরণ করবার জন্য জরৎকারুর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

অস্তিকা বলে—আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়েছেন ঋষি।

জরৎকারু—প্রতিশ্রুতি! কার কাছে?

অস্তিকা—আমার কাছে নয়, আপনার পিতৃসমাজের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সে প্রতিশ্রুতি সফল না হওয়া পর্যন্ত অস্তিকার আলিঙ্গনের মধ্যে আপনাকে থাকতে হবে ঋষি।

সন্ধ্যাদীপের আলোকে সেই মূর্তির দিকে তাকিয়ে জরৎকারু তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ ক'রে অস্তিকার হাত ধরলেন।

জরৎকারু কবে চলে গিয়েছেন, কখন চলে গিয়েছেন, কেন চলে গেলেন, নাগরাজ বাসুকি কিছুই জানতে পারেননি। একদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে জাগ্রত নাগপ্রাসাদের এক কক্ষে বসে দূতমুখে যখন সংবাদ শুনলেন, অস্তিকার আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে জরৎকারু চলে গিয়েছেন, তখন কিছুক্ষণের মত স্তব্ধ হয়ে রইলেন বাসুকি। মনে হলো, জনমেজয়ের আঘাত আসবার আগেই এই নাগপ্রাসাদ যেন নিজের লজ্জায় অপমানে ও ব্যর্থতায় চূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

অস্তিকা কই? বাসুকি উঠলেন। প্রাসাদের অলিন্দ ও চত্বর পার হয়ে, উপবন-বীথিকার ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে এক নিকেতনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন বাসুকি। দগ্ধ ও নির্বাপিত সন্ধ্যাদীপের আধার তখন মসিময় হয়ে পড়েছিল, আর সেই নির্বাপিত ও মসিময় প্রদীপের পাশে নিঃশব্দে বসেছিল অস্তিকা।

বাসুকি ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করেন—জরৎকারু কেন চলে গেলেন অস্তিকা?

অস্তিকা—আমার ভুলে।

হতাশায় আক্ষেপ ক'রে ওঠেন বাসুকি—সব ব্যর্থ ক'রে দিলে ভগিনী অস্তিকা!

অস্তিকা—না ভ্রাতা, সবই সার্থক হয়েছে।

বাসুকির চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—সার্থক? একথার অর্থ?

অস্তিকা—তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন, আমিও আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছি। জরৎকারুর সন্তানের মাতা হওয়ার দায় আমার জীবনে এসে গিয়েছে, আশীর্বাদ কর।

হর্ষে ও আনন্দে বাসুকির চিত্ত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। অস্তিকাকে আশীর্বাদ ক'রে বাসুকি বলেন—নাগজাতিকে ধ্বংস থেকে তুমিই রক্ষা করলে ভগিনী অস্তিকা, তোমার এই গৌরব অক্ষয় হবে।

আনন্দিতচিত্ত বাসুকি চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে অস্তিকাও তার অবসন্ন দেহভার তুলে উঠে দাঁড়ায়। যেন এই সার্থকতা ও গৌরবকে ভাল ক'রে দেখবার জন্যই চারিদিকে তাকায়।

বোধ হয়, তার নিজেরই জীবনের চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখল অস্তিকা। কিন্তু দেখতে পায়, স্বামিহীন এক সংসারের নিকেতনে আজীবন শূন্যতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে তার জীবন। আর, নির্বাপিত সন্ধ্যাদীপের আধারে ঐ যে মসিময় অবলেপ, ঐ তো তার অপমানিত নারীত্বের শ্মশানধূমলেখা। শুধু অপমান, শুধু ব্যর্থতা ও অগৌরব।

চ্যবন ও সুকন্যা

বল্মীক নয়, বল্মীকবৎ স্থানুক এক তপস্বীর শরীর। দীর্ঘ তপস্যার ক্লেশে অভিভূত দেহ, যেন জরাপ্রাপ্ত ত্বগস্থির একটি ধূলিক্লিন্ন স্তূপ। অপহৃত হয়েছে যৌবন ; নিরুদক সরোবরের মত শুষ্ক সেই অবয়ব হতে অপসৃত হয়েছে তারুণ্যতরলিত কান্তির শেষ কল্লোল। আপন বক্ষের অগ্নিতে আপনি দগ্ধীভূত শমীবৃক্ষের দুটি শাখার মত দুটি অঙ্গারবর্ণ বাহু, ভৃগুতনয় চ্যবন সেই কাননের নিভৃতে শিলাসনে বসে ভাবছিলেন, এতদিনে তাঁর মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে। ভাবছিলেন, বিপুল তপঃক্লেশের পুণ্যে এতদিনে ক্ষয় হয়ে গেল তাঁর ত্বগস্থিশোণিতের সকল কামনার অবলেশ। এই বক্ষে তৃষ্ণা নেই, এই চক্ষে কৌতূহল নেই, সংসারের কোন রূপ ও মায়াকে আলিঙ্গন দান করবার জন্য এই দুই বাহুতে কোন স্পৃহা নেই।

সহসা কাননিভৃতের সমীরে যেন কার দুটি চলোচ্ছল চরণের মঞ্জীর ধ্বনিত হয়। আর, সেই ধ্বনির স্পর্শে হঠাৎ আহত হয়ে শুষ্ক বল্মীকের পঞ্জর কেঁপে ওঠে। উৎকর্ণ হয়ে তরুচ্ছায়ামেদুর বনপথের তৃণাঞ্চিত রেখার দিকে তাকিয়ে থাকেন চ্যবন।

কিছুক্ষণ আগেই সহস্র মত্তকণ্ঠের উল্লাস এই শান্ত বনভূমির নীরবতা মথিত ক'রে চলে গিয়েছে। জানেন চ্যবন, নৃপতি শর্যাতি আজ বসন্তমৃগয়ার আমোদ উপভোগের জন্য কাননে প্রবেশ করেছেন। সঙ্গে আছে লক্ষ্যভেদনিপুণ শত শত ধনুর্ধর সৈনিক। আছে চামরগ্রাহিণী কিংকরী ও করঙ্কবাহক কিংকর। আছে সঙ্গীতপরায়ণ সুত মাগধ ও চারণ। সৈনিকের হর্ষ কলরব ও জয়নাদ, আর সুত-মাগধ-চারণের সুমধুর গীতস্বর ও স্নিগ্ধ বেনুপ্রণাদ শুনেছেন চ্যবন। কিন্তু সেই ধ্বনি শুনে বল্মীকবৎ স্থানুক তপস্বীর বক্ষঃপঞ্জরের শান্তি শিহরিত হয়নি। তাঁর এই কৌতূহলহীন স্পৃহাহীন ও কামনাহীন নিভৃতজীবনের নেপথ্যকে শুধু ক্ষণকালের মত ক্ষুব্ধ ক'রে চলে গিয়েছে সেই ধ্বনি। চঞ্চলিত হয়নি চ্যবনের চিন্তার বিরাগ।

কিন্তু একি অদ্ভুত ধ্বনি! স্ফুটকুসুমের বর্ণে ও সৌরভে পরিকীর্ণ এই বনস্থলীর বসন্ত যেন শিঞ্জিত হয়ে উঠেছে। যেন পিকনাদপীযূষে মগিরায়িত এক যৌবনাবেগ মঞ্জীরিত হয়ে ছুটে আসছে। মনে হয়, খঞ্জনের চঞ্চলতা নিয়ে দুটি কজ্জলিত নয়ন এই মধুমাসমদ কাননের অন্তর অন্বেষণ করবার জন্য এগিয়ে আসছে। কিংবা, শ্যামশোভাবিহ্বলা এক মায়ামৃগবধূর চরণে কেউ নূপুর পরিয়ে দিয়েছে। চঞ্চল উদ্দাম ও মধুর সেই শব্দ।

যে চক্ষুতে কৌতূহল ছিল না, সেই চক্ষুই কৌতূহলে দীপ্ত হয়ে ওঠে। দেখলেন চ্যবন, বিপুল লাস্যে লীলায়িততনু ও রূপমঞ্জুলা এক নারী লতাকুঞ্জ হতে চয়িত পুষ্প দুই হস্তের হেলাবলীলায় বিক্ষেপ ক'রে নর্তিত পুষ্পোৎসবের মত এগিয়ে আসছে। যৌবনান্বিতা বনভূমির শোভাকে যেন রূঢ় ব্রীড়াকটাক্ষে তুচ্ছ ক'রে এগিয়ে আসছে এক নারীর মত্ত যৌবনের অহংকার। বিলোলা ব্যালাঙ্গনার মত একটি বেণী সাগ্রহে জড়িয়ে ধরেছে সে নারীর কণ্ঠদেশ, যেন বিলোল হয়ে রয়েছে পুরুষহৃদয় দংশনের জন্য উৎসুক এক বাসনা। যেন দরদলিত কোকনদের রক্তাভ কোমলতা দিয়ে নির্মিত পদতল। সেই লাবণ্যগরীয়সী নারীর নীলাংশুক বসনের অঞ্চল সমীরশিহরিত কেতনের মত উড়ছে।

নিকটে এসে দাঁড়িয়েছে নারী। কিন্তু দেখেও বুঝতে পারে না নারী, যে বল্মীকের কাছে এসে সে এখন দাঁড়িয়েছে, সে বল্মীক সত্যই বল্মীক নয়। কল্পনাও করতে পারে না নারী, সে এখন দুটি জীবন্ত চক্ষুর নিকটে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বসনবন্ধন স্খলিত ক'রে অঙ্গে পুষ্পরজঃ লেপন করে পুষ্পাধিক কমনীয়দেহা নারী।

—কে তুমি কুমারী?

যেন নিভৃতের এক তরুচ্ছায়া হঠাৎ প্রশ্ন করেছে। চকিত হস্তে বিবৃত বরাঙ্গের শোভা নীলাংশুকে আবৃত ক'রে এবং বিস্ময়াভিভূত নেত্রে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করে নারী।

—কে তুমি অনুপমা?

আবার প্রশ্ন। মনে হয়, এই নিভৃতের এক বৃক্ষের কন্দর হতে ধ্বনিত হয়েছে এই প্রণয়সম্বোধন। আতঙ্কিতের মত আর্তনাদ ক'রে ওঠে নারী—কে তুমি অবয়বহীন?

—আমি তপস্বী চ্যবন।

এতক্ষণে বল্মীকের দিকে দৃষ্টিপাত করে নারী এবং বুঝতে পারে. এই বল্মীক সত্যই বল্মীক নয়। জীর্ণ বল্মীকবৎ জরাধূলিসমাচ্ছন্ন ও বিগতযৌবন এক তপস্বীর দেহ। তারই দিকে তাকিয়ে আছে সেই তপস্বীর চক্ষু। তপস্বী চ্যবনের দুই চক্ষুতে তীক্ষ্ণ এবং উজ্জ্বল দুটি দৃষ্টি জ্বলছে।

নারী বলে—আমি নৃপতি শর্যাতির দুহিতা সুকন্যা।

চ্যবন বলে—তুমি ধন্যা, তপস্বী চ্যবনের মনোহারিণী অয়ি বিপুলযৌবনা! তোমার নীলাংশুক বসনের অঞ্চল তোমারই অঙ্গসৌগন্ধ্যের স্পর্শ দান ক'রে আমার এই নিভৃতজীবনের নিঃশ্বাসসমীর সুরভিত করেছে।

ভ্রূভঙ্গী কঠোর ক'রে সুকন্যা বলে—আপনার ভাষণে বিস্ময় বোধ করছি ঋষি।

চ্যবন—কিসের বিস্ময়?

সুকন্যা—আপনি তপস্বী, আপনি বয়ঃপ্রবীণ, আপনি জরাগ্রস্ত। আপনার দেহ আছে, কিন্তু দেহে প্রাণ আছে বলে মনে হয় না। আপনার নিঃশ্বাস আছে, কিন্তু সে নিঃশ্বাসে সমীর আছে বলে বিশ্বাস করতে পারি না। দাবদগ্ধ বৃক্ষের মত অঙ্গার হয়ে গিয়েছে আপনার যৌবন। তবে কেন আর কিসের আশায় এক বিপুলযৌবনার প্রতি প্রণয় নিবেদন করছেন ঋষি?

চ্যবন—তোমার বিস্ময় মিথ্যা নয় সুকন্যা। দীর্ঘ তপঃক্লেশে ক্ষয় হয়েছে আমার দেহ, কিন্তু আজ বুঝতে পেরেছি, ক্ষয় হয়নি আমার কামনা। আমার দেহে জরা, কিন্তু আমার অন্তরে জরা নেই সুকন্যা। আমার দেহে কামনা নেই, কিন্তু আমার মনে কামনা আছে কামিনী শর্যাতিতনয়া।

সুকন্যা—কিন্তু সে কামনা যে নিতান্তই নিরর্থক। আপনি পক্ষহীন বিহগের মত, পত্রহীন বিটপীর মত ও তৈলহীন প্রদীপের মত অক্ষম কামনার আধার মাত্র। আমাকে প্রণয় নিবেদন ক'রে কি লাভ হবে আপনার? আমি আপনার উৎসঙ্গ শোভিত করলে কোন্ পরিতৃপ্তি লাভ করবেন আপনি?

চ্যবন—তোমার সান্নিধ্য আর তোমার স্পর্শই আমার পরিতৃপ্তি। আমি আমার নিমেষহীন চক্ষুর দৃষ্টি দিয়ে তোমার সুহাসিত বিম্বাধরপ্রভা আর কুন্দাভ দন্তরুচিজ্যোৎস্না চিরক্ষণ পান ক'রে পরিতৃপ্ত হব শর্যাতিতনয়া।

সুকন্যা—কেমন ক'রে পরিতৃপ্ত হবেন হে জরায়িতদেহ তপস্বী? আপনার দেহ যে তৃষ্ণা ধারণেও অক্ষম।

চ্যবন—পরিতৃপ্ত হবে আমার মন। তৃষ্ণা আছে আমার মনে।

সুকন্যা—কুৎসিত এই তৃষ্ণা।

ভ্রূকুটি করেন চ্যবন—তপস্বী চ্যবনের প্রতি নিন্দাবাদ প্রকাশের দুঃসাহস সংবরণ কর শর্যাতিতনয়া সুকন্যা!

ভ্রূকুটি করে সুকন্যা—আপনি আমার প্রতি আপনার জরাগ্রস্ত প্রণয় নিবেদনের উৎসাহ সংবরণ করুন তপস্বী।

চ্যবন—ভার্গব চ্যবনের পত্নী হবে তুমি, তোমার এই সৌভাগ্য বিনষ্ট করো না শর্যাতিতনয়া।

হেসে ওঠে সুকন্যা—আপনার পতিত্ব স্বীকার ক'রে যৌবনিত জীবনের অপমান সহ্য করবার দুর্ভাগ্য বরণ করতে চায় না শর্যাতিতনয়া।

চ্যবন—ভুলে যেও না শর্যাতিতনয়া, তোমার এই অহংকার চূর্ণ করবার শক্তি তপস্বী চ্যবনের আছে।

সুকন্যা—থাকতে পারে, কিন্তু শর্যাতিতনয়ার অননুরাগ চূর্ণ করবার শক্তি নেই আপনার। ঘৃণ্য আপনার প্রস্তাব।

—ঘৃণ্য? ক্রোধোদ্দীপ্ত স্বরে চিৎকার ক'রে প্রশ্ন করেন চ্যবন।

সুকন্যা বলে—হ্যাঁ তপস্বী, জরাকে ঘৃণ্য বলে মনে না ক'রে পারে না যৌবন।

চলে যাচ্ছিল সুকন্যা। চ্যবন আহ্বান করেন—শুনে যাও সুকন্যা?

—বলুন।

—একবার তাকিয়ে দেখ আমার দিকে?

—দেখেছি।

—কি দেখলে?

—ক্রোধোদ্দীপ্ত দুটি চক্ষু।

—দেখতে ভয় করে না?

—দেখতে ঘৃণা বোধ করি।

সহসা দুই চক্ষু মুদ্রিত করেন চ্যবন। যেন এই যৌবনগর্বিতা নারী ঘৃণাভরে তাঁর দুই চক্ষু তীক্ষ্ণ কণ্টকে বিদ্ধ ক'রে দিয়েছে।

চ্যবন বলেন—যাও।

কাঁদছিল সুকন্যা। কিন্তু নৃপতি শর্যাতি বলেন—না, আর কোন উপায় নেই রাজকন্যা। ভার্গব চ্যবনের রোষ আর অভিশাপ হতে রক্ষা লাভ করবার আর কোন উপায় নেই।

সুকন্যা—আপনারই তনয়ার প্রতি কেন এত কঠোর হলেন পিতা?

শর্যাতি—তোমারই আচরণে রুষ্ট হয়েছেন চ্যবন।

সুকন্যা—আমার আচরণে কি অপরাধ আর কিসের অন্যায় দেখলেন পিতা?

অকস্মাৎ অশ্রুধারায় প্লাবিত হয় শর্যাতির নয়ন। বেদনাভিভূত স্বরে বলেন—তোমার অপরাধ হয়নি সুকন্যা। কিন্তু, ক্রুদ্ধ চ্যবনের অভিশাপে আমার রাজ্যের সকল সৈনিক অকস্মাৎ ব্যাধি ও জরায় আক্রান্ত হয়েছে। তোমার দর্প পরাভূত করবার জন্য নৃপতি শর্যাতির ক্ষত্রবলদর্প চূর্ণ ক'রে দিয়েছেন চ্যবন। আমার রাজ্য লুপ্ত হবে, আমার এই গৌরবের কিরীট ভূমিসাৎ হবে, আমার প্রজার সংসার হতে সকল হর্ষ ও আনন্দ চলে যাবে, এই ভয়ানক অভিশাপ তুমিই অপসারিত করতে পার কন্যা।

সুকন্যা—যদি চ্যবনের কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করি, তবে কি তিনি আমাকে ক্ষমা ক'রে তুষ্ট হবেন না?

শর্যাতি—না তনয়া, তিনি তোমাকে শাস্তি না দিয়ে তুষ্ট হবেন না।

সুকন্যা—শাস্তি?

শর্যাতি—হ্যাঁ, তুমি তাঁর পত্নী না হলে তিনি তুষ্ট হবেন না।

সুকন্যা—আমাকে শাস্তি দেবার জন্যই কি তিনি আমাকে তাঁর কাছে পত্নীত্ব গ্রহণে বাধ্য করতে চান?

শর্যাতি—হ্যাঁ।

কিছুক্ষণ চিন্তিত মনে অথচ শান্ত নেত্রে দাঁড়িয়ে থাকে সুকন্যা। তারপরেই বলে—আপনি কি ইচ্ছা করেন পিতা?

শর্যাতি—সদসৎ বিবেচনা করবারও আর আমার কোন সাহস নেই কন্যা। আমার রাজ্যের আনন্দ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। চ্যবনের অভিশাপ হতে রক্ষা লাভের জন্য তোমাকে যদি...।

সুকন্যা—তাই হোক পিতা। আমার জীবনই অভিশপ্ত হোক, আর চ্যবনের অভিশাপ হতে মুক্ত হয়ে সুখী হোক আপনার রাজ্য ও আপনার ইচ্ছা।

জরাগ্রস্ত তপস্বীর জীবনের সঙ্গিনী হয়েছে বিপুলযৌবনা সুকন্যা। হ্যাঁ, শাস্তিই দান করেছেন চ্যবন। তাঁর ক্রোধোদ্দীপ্ত দুই দক্ষুর দৃষ্টি যেন কিরাতের জাল, এবং এই জালের বন্ধন শান্তচিত্তে জীবনে গ্রহণ করেছে এক সুন্দরদেহিনী মায়ামৃগী। প্রণয়সম্ভাষণ নয়, করুণাবচন নয়, সান্ত্বনা নয়, শুধু তপস্বী চ্যবনের রুষ্ট দুই চক্ষুর নির্দেশ। সেই নির্দেশ মান্য ক'রে আশ্রমদাসীর মত নিকেতকর্তব্য পালন করে সুকন্যা। দিন যায়, মাস অতীত হয়, বর্ষের পর বর্ষ অতিক্রান্ত হয়, কাননভূমির নিভৃতে বসন্তামোদ জাগে ; কিন্তু চ্যবনপত্নী সুকন্যার জীবন যেন চিরনিদাঘে তাপিত জীবন।

এই শাস্তিভীরু জীবনের ভারে অবসন্ন সুকন্যার মন মাঝে মাঝে যেন মুক্তির স্বপ্ন দেখে। মনে হয়, তপস্বী চ্যবনের ঐ দুই চক্ষু হতে ক্রোধজ্বালা অন্তর্হিত হয়েছে। শান্ত দৃষ্টি তুলে সুকন্যার দিকে তাকিয়ে আছেন চ্যবন।—এইবার আমাকে মুক্তি দান করুন তপস্বী। সাশ্রুনয়নে আবেদন করতে গিয়েই সুকন্যার স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। দেখতে পায়, তেমনি ক্ষুব্ধ ও কঠোর দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে আছেন চ্যবন। না, ঋষি চ্যবনের মনে ক্ষমা নেই, সুকন্যার জীবনে এই শাস্তির শেষ নেই।

আবার এক একদিন সুকন্যার মনের ভাবনাগুলি যেন হৈমন্তী কুহেলিকার মত মায়াময় হয়ে ওঠে। তন্দ্রাচ্ছন্ন নয়নে দেখতে পায় সুকন্যা, সত্যই স্বামী চ্যবনের নয়নে সেই ক্রোধজ্বালা আর নেই। ব্যথিত দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে আছেন চ্যবন। প্রশ্ন করে সুকন্যা—এ কি? আপনি ব্যথিত হয়েছেন কেন তপস্বী?

কিন্তু প্রশ্ন করতে গিয়েই সুকন্যার তন্দ্রা ভেঙ্গে যায়। দেখতে পায় সুকন্যা, তরুতলে দাঁড়িয়ে তারই দিকে শুষ্ক কঠোর ও বেদনাহীন দৃষ্টি তুলে দাঁড়িয়ে আছেন চ্যবন। না, বৃথা স্বপ্ন, বৃথা তন্দ্রা, বৃথা এই আশামুগ্ধ লোভ। ঐ ক্ষমাহীন তপস্বীর চক্ষু কোনদিন ব্যথিত হবে না।

দিবস-রজনীর প্রতি মুহূর্ত যেন এক বল্মীকের সেবা ক'রে চলেছে শর্যাতিতনয়া সুকন্যা। এই বল্মীকই যেন এক দেববিগ্রহ, এবং তার উপাসিকা হয়েছে বনবাসিনী নৃপতিতনয়া সুকন্যা। মাঝে মাঝে উৎসুক নেত্রে তাকিয়ে থাকে সুকন্যা, আর নীরবে আক্ষেপ করে। এই তপস্বীকে শিলাময় দেববিগ্রহের মত শ্রদ্ধেয় মনে হতো, যদি তাঁর দুই চক্ষুতে এই নির্মম ক্রোধের জ্বালাটুকু শুধু না থাকত। কিন্তু কঠিন শিলার বিগ্রহকেও পূজা ক'রে যেটুকু আনন্দ লাভ করা যায়, চ্যবনের এই মূর্তিকে পূজা ক'রে সেটুকু আনন্দও পায় না সুকন্যা। নিতান্তই এক শাস্তার মূর্তি। দুর্ভাগ্য, প্রেমহীন জীবনের ক্রন্দন শান্ত করবার মত একটা ছলনাও খুঁজে পায় না সুকন্যা। কোন মুহূর্তে এক বিন্দু মিথ্যা হর্ষেরও স্পর্শে ঋষি চ্যবনের চক্ষু স্নিগ্ধ হয় না।

নববসন্তাগমের ইঙ্গিত ঘোষণা ক'রে একদিন কাননের তরু ও লতার বক্ষে জেগে ওঠে নব কিশলয়। জেগে ওঠে পিককলরব। কাননসরোবরের নিকটে এসে দাঁড়িয়ে থাকে সুকন্যা। মনে হয় সুকন্যার, সরোবরের ঐ সলিল যেন তৃষ্ণার্ত হয়ে তারই মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হয়, পরাগভারে বিহ্বল কুসুমের স্তবক তারই যৌবনমদয়িত তনুচ্ছবির স্পর্শ পেতে চাইছে।

বল্কলবসনের ভার ভূতলে নিক্ষেপ করে সুকন্যা। বিকচ শতদলের মত রাগবিহসিত বিহ্বল দেহভার সরোবরসলিলে লুটিয়ে দিয়ে স্নানামোদে তৃপ্ত হয় সুকন্যা। তারপর তীরতরুর ছায়ায় এসে দাঁড়ায়। অতনুবিমোহন সেই বরতনুর অনাবরণ কোমলতাকে পুষ্পপরাগের লেপনে

আরও কমনীয় ক'রে তোলে সুকন্যা। যেন এক স্বপ্নলোকের বক্ষে দাঁড়িয়ে জীবনের নির্বাসিত কামনার বেদনাগুলিতে স্নিগ্ধ সলিলের ও পুষ্পপরাগের প্রলেপ দিয়ে শান্ত করছে সুকন্যা।

অকস্মাৎ নিকটাগত এক পদশব্দ শুনে চমকে উঠেই দেখতে পায় সুকন্যা, সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে সুন্দর এক পথিকপুরুষ।

আগন্তুক বলেন--আমি অশ্বিনীকুমার রেবন্ত।

অসম্বৃত বসন সম্বৃত ক'রে বিব্রতভাবে প্রশ্ন করে সুকন্যা—কিন্তু আমার সম্মুখে আপনার আগমনের হেতু কি অশ্বিনীকুমার?

রেবন্ত—হেতু তুমি।

সুকন্যা—আমার পরিচয় আপনি জানেন কি?

রেবন্ত—জানি, তুমি শর্যাতিতনয়া সুকন্যা, তুমি চ্যবনভার্যা সুকন্যা।

সুকন্যা--তবে?

রেবন্ত--তোমারই বিপুল যৌবনভার বক্ষে ধারণ করবার তৃষ্ণা নিয়ে আমি এসেছি সুকন্যা।

সুকন্যার অন্তর যেন পিকসঙ্গীতের চেয়ে মধুরতর এক সুস্বরের স্পর্শে শিহরিত হয়।

মুগ্ধ রেবন্তের কণ্ঠে যেন বন্দনার সঙ্গীত ধ্বনিত হয়—এস লোকললামা বরারোহা, এস সুমধ্যমা বামোরু, এস নিতম্বগুর্বী কুচভারভীরুকটি সুভ্রূ, এস সুমধুরাধরা সুদতী, আজিকার পুষ্পময় বসন্তের মত যৌবনমান এই রেবন্তের পরিরম্ভনে এসে ধরা দাও সুকন্যা। তৃপ্ত রমিত ও প্রীত হোক তোমার সকল বাসনার অভিমান।

মুগ্ধভাবে রেবন্তের মুখের দিকে তাকিয়ে বিচলিতস্বরে সুকন্যা বলে—আপনি সুন্দর, আপনার আহ্বানও সুন্দর, কিন্তু আমাকে ক্ষমা করবেন অশ্বিনীকুমার রেবন্ত।

রেবন্ত—কেন সুকন্যা?

সুকন্যা—আমি ঋষি চ্যবনের ভার্যা, আপনার আহ্বানে যতই মধুরতা থাকুক, সে আহ্বান আমি গ্রহণ করতে পারি না রেবন্ত।

রেবন্ত—জরাভিভূত ক্ষীণদেহ ও প্রণয়বিরহিত স্বামীর জীবনসঙ্গিনী নারী...।

অকস্মাৎ বক্ষের গভীরে যেন তীক্ষ্ণ এক কণ্টকের আঘাত অনুভব করে সুকন্যা। সত্য বাক্য উচ্চারণ করেছেন রেবন্ত, এক জরাগ্রস্তের উদ্দেশে ঘৃণা নিবেদন করছে এক যৌবনের গর্ব। কিন্তু বিস্মিত হয় সুকন্যা, আর বেদনার্তভাবে অন্যমনার মত তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে, কেন ব্যথা বাজে অন্তরে?

—সুকন্যা।

রেবন্তের আহ্বানে সাড়া দেয় না সুকন্যা। যেন তার দুই বিষণ্ণ ও ভীত চক্ষুর দৃষ্টি অনেক দূরে ছুটে চলে গিয়েছে। রেবন্তের ধিক্কার সেই জীর্ণ বল্মীকের কঠোর অহংকারের সব প্রসন্নতা চূর্ণ করতে চায়। সুকন্যার বুক কেঁপে ওঠে।

রেবন্তের ধিক্কার যেন সুকন্যার এক নিরর্থক গর্বকে অপমানে আহত করেছে। সুকন্যা বলে—আমার স্বামী জরাভিভূত এক যৌবনহীন বলেই কি আপনি আমাকে সহজলভ্যা বলে মনে করেছেন রেবন্ত?

রেবন্তের প্রগল্ভ হর্ষও যেন হঠাৎ আহত হয়। চিন্তান্বিতের মত সুকন্যার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন রেবন্ত।

সুকন্যা বলে—ঋষি চ্যবন যদি যৌবনবান হতেন, তবে কি আপনি তাঁর ভার্যাকে এইভাবে প্রণয়াসঙ্গে আহ্বান করতে পারতেন রেবন্ত?

রেবন্ত বলেন--বুঝেছি সুকন্যা।

সুকন্যা--কি বুঝেছেন?

রেবন্ত—বুঝেছি, কোথায় তোমার দুঃখ, কিসের জন্য তোমার অভিমান, আর আমার

প্রণয়ে কেনই বা তোমার সংশয়। কিন্তু আমি হীনপ্রেমিক নই শর্যাতিতনয়া। আমার প্রণয় কোন সুযোগের অনুগ্রহ গ্রহণ করে না। আমি ক্ষীণ খদ্যোৎ নই নারী, দীপহীন অন্ধকারের সুযোগ চাই না। আমি ক্ষুদ্র ভৃঙ্গ নই নারী, আমি নিদ্রিতা কমলকলিকার অসহায় অধর অন্বেষণ করি না। আমার অন্তরে কোন তস্করতা নেই সুকন্যা। চ্যবনের জরাতুর দুর্বল হস্তের মুষ্টিবন্ধন হতে ঐ রূপরত্ন অনায়াসে ছিন্ন ক'রে সুখী হতে পারে না স্পর্ধিতযৌবন রেবন্তের স্পৃহা।

রেবন্তের ভাষণ যেন বিশালহৃদয় এক প্রেমিকের অন্তরের গভীর মন্ত্র, মুগ্ধ হয়ে শুনতে থাকে সুকন্যা। তপোবলে মন্ত্রবলে অথবা অস্ত্রবলে নারীর হৃদয় নিপীড়ত ও আতঙ্কিত ক'রে নারীর অনুৎসুক হস্তের বরমাল্য কণ্ঠে ধারণ করতে গৌরব বোধ করে না যে প্রেমিক, স্বয়ংবরার বরমাল্য ছাড়া তৃপ্ত হয় না যে প্রেমিকের অন্তর, তেমনই এক প্রেমিক সুকন্যার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

রেবন্ত—আমি তোমার মনের সংশয় অপসারিত করতে চাই সুকন্যা। আমি ভিষগীশ্বর রেবন্ত, আমি জরা অপহরণের বিজ্ঞান জানি, আমি রুগ্ন দেহে রূপ স্বাস্থ্য কান্তি ও পুষ্টি প্রদানের রহস্য জানি।

চকিত হর্ষে দীপ্ত হয়ে ওঠে সুকন্যার দুই চক্ষু--তবে ঋষি চ্যবনেব জরা অপহরণ ক'রে তাকে যৌবন ও কান্তি প্রদান করুন রেবন্ত।

হেসে ওঠেন রেবন্ত--তাই হবে সুকন্যা। এই কাননে যে সরোবরের জলে ওষধীশ চন্দ্রমা নিত্য স্নান করেন, সেই সরোবরের সন্ধান আমি জানি। যদি আমার সঙ্গে গিয়ে সেই সরোবরের জলে স্নান করেন ঋষি চ্যবন, তবে তিনি সুযৌবন ও দিব্যকান্তি লাভ করবেন।

সুকন্যা--আমার অনুরোধ...।

রেবন্ত—আমার অনুরোধ শোন সুকন্যা। ঋষি চাবনের কাছে গিয়ে আমার এই প্রস্তাব নিবেদন কর।

চলে যাচ্ছিল সুকন্যা। রেবন্ত বলে—আমার আর একটি প্রস্তাব শুনে যাও সুকন্যা।

--বলুন।

—আমি ও প্রাপ্তযৌবন চ্যবন, উভয়েই তোমার বরমাল্যের প্রার্থী হয়ে তোমার সম্মুখে এসে দাঁড়াব। অঙ্গীকার কর, যার মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হবে তোমার প্রাণ, তারই কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করবে। হয় আমি, নয় ঋষি চ্যবন, উভয়ের একজনের জীবনসঙ্গিনী হবে তুমি।

সুকন্যা বলে--অঙ্গীকার করলাম রেবন্ত।

রেবন্ত—অঙ্গীকার কর, এই প্রস্তাবও ঋষি চ্যবনের কাছে নিবেদন করবে তুমি।

সুকন্যা—নিবেদন করব।

রেবন্ত—অঙ্গীকার কর, ঋষি চ্যবনকে এই প্রস্তাবে তুমি অবশ্যই সম্মত করাবে।

পুলকাঞ্চিতা বনকুরঙ্গীব মত চকিতহর্ষে নিবিড় নয়নের দৃষ্টি ক্ষণপ্রগল্ভতায় তরলিত ক'রে সুকন্যা বলে—অঙ্গীকার করলাম রেবন্ত।

চলে গেল সুকন্যা, এবং আশ্রমকুটীরে এসে উল্লসিত স্বরে চ্যবনের কাছে শুভবার্তা জ্ঞাপন করে—আপনার জরা অপহরণ ক'রে যৌবন প্রদান করবেন অশ্বিনীকুমার রেবন্ত। হৃষ্টচিত্ত চ্যবন রেবন্তের উদ্দেশে আশীর্বাণী বর্ষণ ক'রে সেই মুহূর্তে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

আবার স্বাধীন হবে শর্যাতিতনয়া সুকন্যার প্রণয়বাসনা : সুকন্যার হাতের বরমাল্য তারই পরিণয় বরণ ক'রে নেবে জীবনে, যার মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হবে সুকন্যার প্রাণ। এই পরীক্ষার প্রস্তাবেও সানন্দে সম্মত হয়ে চলে গেলেন চ্যবন।

আশ্রমকুটীরের নিভৃতে নীরব হয়ে বসে থাকে সুকন্যা। কি অদ্ভুত পরীক্ষা! এই পরীক্ষার পরিণামে সুকন্যা যে এক শাসনকঠোর ও হৃদয়হীন স্বামীর সান্নিধ্য ছেড়ে এক বিশালহৃদয় প্রবলপ্রেমিকের ব্যাকুল আহ্বানের কাছে চিরকালের মত চলে যেতে পারে। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও ব্যথিত হলেন না, শঙ্কিত হলেন না, বিষণ্ণ হলেন না কেন ঋষি চ্যবন?

ঝটিকাঘাতে একটি পল্লব শাখা হতে ছিন্ন হয়ে গেলে যতটুকু ব্যথা অনুভব করে বিশালদেহ দেবদারু, ততটুকু ব্যথাও বোধ হয় ঋষি চ্যবনের বক্ষে বাজবে না, যদি সুকন্যা আজ প্রণয়াভিলাষী রেবন্তের কণ্ঠে বরমাল্য দান করে। শাস্তির দাসীকে চিরকাল কঠোর নেত্রে ঘৃণা ক'রেই দিনাতিপাত করলেন যে জরাভিভূত ঋষি, সে ঋষি যৌবনাঢ্য হয়ে সেই নারীর মুখের দিকে কি প্রেমদৃষ্টি দান করবেন? বিশ্বাস হয় না, তাই ভয় হয় সুকন্যার। কিন্তু কেন এই অদ্ভুত ভয়? অকারণে বিচলিত নিজেরই এই হৃদয়ের উপর রুষ্ট হয় সুকন্যা।

—ওঠ সুকন্যা, তাকাও দুই পাণিপ্রার্থীর মুখের দিকে, স্বয়ংবরার গর্ব নিয়ে বেছে নাও তোমার জীবনের সঙ্গী। কানের কাছে যেন এক মায়াস্বর গুঞ্জরিত হয়ে অবসন্নহৃদয়া সুকন্যাকে উৎসাহিত করে। কিন্তু তবু দুই হাতে অশ্রুপ্লুত চক্ষু আবৃত ক'রে বসে থাকে সুকন্যা। কেন, কিসের জন্য এই বেদনা, এবং কি চায় সুকন্যা, নিজের মনকেই প্রশ্ন ক'রে বুঝতে পারে না সুকন্যা।

বুঝতে পারে না সুকন্যা, আজ এতদিন পরে তার মুক্তির মুহূর্ত যখন আসন্ন হয়ে উঠেছে, তখন কেন আবার বক্ষের স্পন্দনে ও নিঃশ্বাসে এই নূতন ও অদ্ভুত এক বেদনার সঞ্চার জাগে?

আশ্রমকুটীরের আঙ্গিনায় দুই আগন্তুকের পদধ্বনি শোনা যায়। চমকে ওঠে সুকন্যা। আসছেন সুন্দরতনু রেবন্ত, আসছেন সুন্দরতনু চ্যবন।

—শর্যাতিতনয়া সুকন্যা! হর্ষাকুল রেবন্তের কণ্ঠস্বর আশ্রমের প্রাঙ্গণের বক্ষে ধ্বনিত হয়। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর কই? নীরব কেন সুকন্যার যৌবনগর্বের শাস্তিদাতা সেই ঋষি, যিনি স্বয়ং আজ রেবন্তের অনুগ্রহে যৌবনান্বিত হয়ে ফিরে এসেছেন?

পুষ্পমাল্য হাতে নিয়ে কুটীরের বাইরে এসে দাঁড়ায় সুকন্যা। দেখতে পায়, যৌবনাঢ্য দুই পুরুষের দুই মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে প্রাঙ্গণের বক্ষের উপর। উভয়েই সমানসুন্দর, একই তরুর দুই পুষ্পের মধ্যে যতটুকু রূপের ভিন্নতা থাকে, তা'ও নেই। কান্তিমান দ্যুতিমান ও বিশাল বক্ষঃপট, নবীন শাল্মলী সদৃশ যৌবনান্বিত দুই দেহী।

রেবন্তের মুখের দিকে তাকায় সুকন্যা। দেখতে থাকে সুকন্যা, হর্ষে উজ্জ্বল ও আনন্দে সুস্মিত হয়ে উঠেছে রেবন্তের চক্ষু। রেবন্তের দুই সুন্দর নয়নে জ্যোৎস্নালিপ্ত সমুদ্রতরঙ্গের মত কী বিপুল প্রণয়োচ্ছল আহ্বান হিল্লোলিত হয়! মুগ্ধ হয় সুকন্যার দুই নয়ন।

চ্যবনের মুখের দিকে তাকায় সুকন্যা। চমকে ওঠে সুকন্যার হৃৎপিণ্ড।

ক্রোধজ্বালা নয়, অবহেলা নয়, অহংকার নয়, দুঃসহ ব্যথায় বিষণ্ণ হয়ে রয়েছে সুন্দরতনু ঋষিযুবা চ্যবনের চক্ষু। যেন এক হতাশ ও অসহায়ের দৃষ্টি। এতদিন পরে তাঁরই শাস্তিনিঃসারী দুই শুষ্ক চক্ষুর কঠোর শাসনে নিগৃহীতা নারীর উপর তাঁর সকল অধিকার একটি পুষ্পমাল্যের প্রতিহিংসার জ্বালায় ভস্মসাৎ হয়ে যাবে, যেন সেই শাস্তি নীরবে সহ্য করবার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন চ্যবন। কিন্তু সুকন্যা যেন এক অকল্প্য দৃশ্য দেখছে ; বিস্ময়াভিভূত অন্তরের উল্লাস সংযত ক'রে ব্যথিত নয়নে চ্যবনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

একই তরুর দুই পুষ্পের মত দুই সমানসুন্দর রূপ, কিন্তু একজনের নয়নে হর্ষ, আর একজনের নয়নে বেদনা। রেবন্তের সুস্মিত নয়নের দিকে তাকিয়ে নয়ন মুগ্ধ হয় সুকন্যার, কিন্তু চ্যবনের ব্যথিত চক্ষুর দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে যায় সুকন্যার হৃদয়।

ফুল্লরুচি ফুলদলের মত সুস্মিত হয়ে ওঠে শর্যাতিতনয়া সুকন্যার অধর। যেন আজ

এতদিন পরে নিজেকেই দেখতে পেয়েছে সুকন্যা। যেন ঋষি চ্যবনের চক্ষুতে ঐ বেদনার আবির্ভাব দেখবার আশায় এতদিন ধ'রে দুর্বহ এক প্রতীক্ষার ব্রত পালন ক'রে এসেছে সুকন্যা।

ধীরে ধীরে ঋষি চ্যবনের সম্মুখে এসে আহ্বান করে সুকন্যা।--ঋষি!

চ্যবন--বল শর্যাতিতনয়া।

সুকন্যা--কি ভাবছেন ঋষি?

চ্যবন--প্রতিশোধ গ্রহণ কর সুকন্যা।

হেসে ওঠে সুকন্যা--সুযোগ পেয়েছি ঋষি, প্রতিশোধ গ্রহণ করাই উচিত।

চ্যবন--হ্যাঁ সুকন্যা।

--এই লও প্রতিশোধ! চ্যবনের কণ্ঠে বরমাল্য দান ক'রে মুগ্ধ চক্ষু তুলে চ্যবনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সুকন্যা।

চমকে ওঠেন রেবন্ত, এবং নিজেরই মনের বিস্ময় সহ্য করতে না পেরে ধিক্কার ধ্বনিত করেন--ধন্য ছলনানিপুণা সুকন্যা!

ধার্মিক দাক্রুজ

ভাগীরথীকূলের সেই পর্তুগীজ উপনিবেশে বাস করতেন অনেক ধর্মযাজক। গির্জার প্রাঙ্গণে তাঁদের ভিড় দেখা যেতো। আবার দেখা যেতো, তাঁরাই এসে ভিড় করছেন দুর্গের দুয়ারে ; তাঁদের নির্দেশ আর অনুরোধ উৎকর্ণ হয়ে শুনছে পর্তুগীজের সৈনিক আর সেনাপতি। কুঠির অভ্যন্তরে বণিকের টাকার হিসাবের দপ্তরেও তাঁদের দেখা যেতো ; আরও বিস্ময়ের বিষয়, এক একদিন তাঁরাই ব্যস্তভাবে দাঁড়াতেন দাসের বাজারের কাছে।

দাস বিক্রয়ের বাজার—গ্রীষ্মের রোদে আর বর্ষার জলে খোলা মাঠের উপর শত শত জীবন্ত মানুষকে এক একটি দড়ির বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে রাখা হতো। নৌকা বোঝাই ক'রে দাস নিয়ে এসেছে পর্তুগীজ দস্যুবণিক। এসেছে সন্দ্বীপ হতে, এসেছে বাকলা হতে, এসেছে সুন্দরবন ও বালেশ্বর হতে। দক্ষিণবঙ্গের কত গ্রামের মাঝরাতের ঘুম আগুনে পুড়িয়ে দিয়ে, ভীত দুর্বল ও অসহায় নর ও নারীকে ধ'রে-বেঁধে ব্যবসায়ের পণ্যবস্তুর মত বহন ক'রে নিয়ে এসেছে পর্তুগীজের নৌকা, শিকারী ব্যাধ যেমন ফাঁদ-পেতে-ধরা জীবন্ত খরগোশের মালা নিয়ে আসে, আর মাংসলোলুপের হাটে বেচে দিয়ে চলে যায়।

এ দৃশ্যও দেখতেন আর সহ্য করতেন ধর্মযাজকেরা। দাস বাজারের মাঠের উপর সারি সারি বট আর অশথের ছায়ায় তাঁরা বসতেন এবং খোলা মাঠের উপর রোদে পুড়তো আর জলে ভিজতো দাস নরনারীর দেহ, যতক্ষণ না ক্রেতা এসে তাদের কিনে নিয়ে যেতো।

দাস নরনারীর কাছে এসে দাঁড়াতেন পর্তুগীজের ধর্মযাজক। বলতেন—মুক্তি পেতে পারো, যদি আমার ধর্মে এসে ঠাঁই নাও।

ভীত ও বিষণ্ণ পশুর মত বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে থাকতো দাস নরনারীর দল। ধর্মযাজকেরা বলতেন—খৃস্টান হও। খৃস্টান হয়ে, পর্তুগীজ প্রভুর কাছ থেকে ভূমি আর চাকুরি নিয়ে সুখে জীবনযাপন কর।

কেউ রাজী হতো, কেউ রাজী হতো না। যারা রাজী হতো তারা ঠাঁই পেতো পর্তুগীজের সেই উপনিবেশে। যারা রাজী হতো না, তারা ক্রেতার দাস হয়ে চলে যেতো। সূর্য যখন ডুবতো, আর শান্ত হয়ে যেতো দাসবাজারের চিৎকার, তখন ভাগীরথীর জলে এক একটি নৌকায় ক্রীতদাস আর ক্রীতদাসীর কান্নার রোলে করুণ হয়ে উঠতো সন্ধ্যার বাতাস। ক্রেতা বণিকের নৌকায় জীবন্ত দাস ও দাসীর রজ্জুবদ্ধ দেহ চালানি পশুর মত চালান হয়ে যেতো দেশ আর বিদেশের দূরান্তরে।

পর্তুগীজের সেই উপনিবেশের নাম হুগলি। পর্তুগীজের কুঠি আজ আর নেই, দুর্গও নেই, দাসবাজারের অশথও মরে গিয়েছে। শুধু বেঁচে আছে পর্তুগীজের গির্জা, ব্যাণ্ডেলের গির্জা। এই গির্জাই আজও স্মরণ করিয়ে দেয়, পর্তুগীজের লোভ ও নিষ্ঠুরতার উপনিবেশ সেই ১৬৩০ সালের হুগলিতেই এমন একজন ধর্মযাজক ছিলেন, যিনি ধর্মের পথ চিনতে ও বুঝতে ভুল করেননি। তাঁর নাম ফাদার দাক্রুজ। ভাগীরথীর পল্লীর হিন্দু আর মুসলমানেরাও তাঁর নাম দিয়েছিলেন, ধার্মিক দাক্রুজ।

অন্যান্য ধর্মযাজকেরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে মানুষকে আহ্বান ক'রে বলতেন—এসো খৃস্টান হও। আমরা এই হিদেনের দেশ হিন্দুস্থানে ধর্মের বীজ বপন করতে এসেছি।

আর ধার্মিক দাক্রুজ পল্লীর প্রান্তরে একাকী ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর হাতে থাকতো ছোট একটি থলি, তার মধ্যে পর্তুগাল দেশের এক রঙীন ফুলের বীজ। গ্রামের মানুষ বিস্মিত হয়ে

দেখতো, গাঁয়ের মাঠে মাঠে ফুলের বীজ ছড়িয়ে চলে যাচ্ছেন ধার্মিক দাক্রুজ।

লোকে প্রশ্ন করতো—এ কি করছেন আপনি?

ধার্মিক দাক্রুজ হাসতেন।—আমি এদেশের মাটিতে ফুলের বীজ বপন করতে এসেছি।

ব্যাণ্ডেলের গির্জার প্রাঙ্গণের এক কোণে তিনি থাকতেন। পর্তুগীজ বণিকের কুঠিতে কোনদিন তাঁকে কেউ দেখেনি। পর্তুগীজ দুর্গের সৈনিকের সঙ্গে পরামর্শদাতা অভিভাবকের মত মেলামেশা করতে কখনো তাঁকে দেখা যেতো না। তিনি থাকতেন তাঁর নিরালা জীবনের উপাসনা আর প্রার্থনার মধ্যে। দাসবাজারের অশথের ছায়ায় দাঁড়িয়ে অন্যান্য ধর্মযাজকেরা যখন দাস নরনারীর ধর্ম নিয়ে টানাটানি করতেন, ধার্মিক দাক্রুজ তখন গির্জার অভ্যন্তরে বেদিকার উপর স্থাপিত মাতা মেরির মূর্তির দিকে ভক্তিবিহ্বল দুই চোখের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকতেন। সন্ধ্যায় ভাগীরথীর জলে যখন নৌকায় ক্রীতদাস আর ক্রীতদাসীর কান্না বেজে উঠতো, তখন বিচলিতচিত্তে প্রার্থনা করতেন দাক্রুজ। হৃদয়হীন সেই উপনিবেশের এক নিভৃতে যেন মানুষের হৃদয়ের ধর্ম সেই প্রার্থনার স্বরে গুঞ্জন ক'রে উঠতো।

মোগল বাদশাহ শা'জাহান অনেকবার অনেক সাবধান-বাণী জানিয়ে পত্র দিয়েছেন হুগলির পর্তুগীজকে।—আপনাদের শুধু চিনি মশলা ও কাপড়ের ব্যবসায় করবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। দাস ব্যবসায় বন্ধ করুন। সাবধান!

দিল্লীর মোগল দরবারের সেই সাবধান-বাণীকে শুধু অমান্য আর অবহেলা করেছে হুগলির পর্তুগীজ।

হুগলির খৃস্টান ধর্মযাজকদের কাছেও কঠোর এক প্রতিবাদের পত্র প্রেরণ করেছেন বাদশাহ শা'জাহান।—দেশের মানুষকে ধর্মান্তরিত করবেন না। এই অধিকার আপনাদের নেই। আপনাদের শুধু নিজেদের ধর্মজীবন যাপনের এবং উপাসনাগৃহ নির্মাণের অধিকার দেওয়া হয়েছে।

উত্তর দিলেন হুগলির পর্তুগীজ উপনিবেশের ধর্মযাজকেরা—বাদশাহ আকবর ও জাহাঙ্গীরের ফারমান অনুযায়ী আমরা কাজ করছি। এ দেশের মানুষকে খৃস্টান করার অধিকার আমাদের আছে।

অনুরোধ জানালেন শা'জাহান—জোর করে ধর্মান্তরিত করবেন না। মানুষের ধর্মের উপর জোর করার অধিকার কোন ফারমানে আপনাদের দেওয়া হয়নি।

হাসলেন হুগলির পর্তুগীজ ধর্মযাজকেরা। উত্তর দিলেন—আমরা জোর করি না। আমরা দাস নরনারীকে মুক্তি দিয়ে ধর্ম দান করি।

ধর্মযাজকদের এই প্রগলভতা সমর্থন করতে পারলেন না ধার্মিক দাক্রুজ। বললেন—এ-যুক্তি যুক্তি নয়। মোগল দরবারের অনুরোধ রক্ষা করাই কর্তব্য। ধর্মপ্রচারের পথে লোভ-দেখাবার আর জোর করবার কোন স্থান নেই।

—আপনি পর্তুগীজের সম্মানের শত্রু! হুংকার দিয়ে প্রতিবাদ করলেন ধর্মযাজকেরা। পর্তুগীজ সৈনিক ও সেনাপতি ক্রুদ্ধ হলেন। পর্তুগীজ বণিক রুষ্ট হলেন। সকলের সমবেত প্রতিবাদ আর নিন্দার আঘাতে নীরব হয়ে গেলেন ধার্মিক দাক্রুজ।

মনের শান্তি হারালেন ধার্মিক দাক্রুজ। এক প্রভাতে গির্জার প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে দেখলেন, পশ্চিমের আকাশে এক খণ্ড ভয়ংকর কালো মেঘ ভাসছে। কে জানে, ঐ মেঘের মধ্যে কোন্ শংকার ইঙ্গিত দেখতে পেয়েছিলেন ধার্মিক দাক্রুজ। ছুটে গিয়ে প্রবেশ করলেন গির্জার অভ্যন্তরে। মেরি মাতার দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করলেন—তুমি আমাকে বর্জন করো না মাতা। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যেন তোমার ঐ পুণ্যস্নিগ্ধ মুখচ্ছবি চোখের সম্মুখে দেখতে পাই।

প্রার্থনা সমাপনের পর হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলেন ধার্মিক দাক্রুজ। অনুভব করেন, আর চুপ ক'রে থাকলে চলবে না। পর্তুগীজ উপনিবেশের এই ভয়ংকর ভুল আর সহ্য করা উচিত

হবে না।

গির্জার প্রাঙ্গণ পার হয়ে ব্যস্তভাবে হেঁটে চললেন ধার্মিক দাক্রুজ। তারপর ছুটে এসে দাঁড়ালেন চিৎকারমুখর দাসবাজারের নিকটে। তখন ভাগীরথীর দুই তট মধ্যাহ্নের রোদে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

দেখলেন ধার্মিক দাক্রুজ, জীবন্ত পণ্যের মত দাস নর-নারীর দল বসে রয়েছে উত্তপ্ত মাঠের উপরে। ক্রেতার প্রশ্ন, বিক্রেতার উত্তর, নিলামের হাঁক—বীভৎস এক লোভের উৎসব কি ভয়ানক মুখর হয়ে উঠেছে!

লক্ষ্য করলেন ধার্মিক দাক্রুজ, কৌপীন পরিহিত এবং মাথায় জটা এক বৃদ্ধকে ক্রয় করবার জন্য তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে এক ক্রেতা। লোকটি বৃদ্ধ কিন্তু দেহ তার অশক্ত নয়।

বৃদ্ধের দেহের মাংসপেশীর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ক্রেতা উৎসাহ হারিয়ে বলেন--এ যে বৃদ্ধ, কতদিনই বা বাঁচবে, কিনে কোন লাভ নেই।

বিক্রেতা পর্তুগীজ বণিক বলে—বৃদ্ধ বটে, কিন্তু দেহ এখনো মজবুত আছে। দাম বেশি নয়। মাত্র বাইশ টাকা। কিনলে আপনার লাভই হবে।

রাজী হয় ক্রেতা। সেই মুহূর্তে এগিয়ে আসেন এক ধর্মযাজক। বৃদ্ধ দাসের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন—মুক্তি চাও তুমি?

বৃদ্ধ শান্ত ও নির্বিকার দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে পর্তুগীজ ধর্মযাজকের মুখের দিকে। তারপর বলে—না।

বিস্মিত হন ধর্মযাজক। বলেন—খৃস্টান হও, তাহলেই তোমাকে আর দাস হতে হবে না।

বৃদ্ধ বলে—আপনার অনুগ্রহে আমার কোন প্রয়োজন নেই।

পর্তুগীজ বণিকের হাতের চাবুক সেই মুহূর্তে সশব্দে আছাড় খেয়ে পড়ে বৃদ্ধ দাসের পিঠের উপর—তবে তাই হোক।

ক্রেতার দিকে তাকিয়ে হাত পাতে পর্তুগীজ বণিক—দিন টাকা, আর এই শক্ত পশুটিকে নিয়ে যান।

থলি হতে টাকা বের করে ক্রেতা। কিন্তু সেই মুহূর্তে চমকে উঠলো ক্রেতা, চমকে উঠলো পর্তুগীজ বণিক আর ধর্মযাজক। সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন ধার্মিক দাক্রুজ। দাক্রুজের হাতে টাকার তোড়া।

পর্তুগীজ বণিক প্রশ্ন করে—এর অর্থ?

দাক্রুজ বলেন—আমি পঞ্চাশ টাকা আপনাকে দিচ্ছি। এই দাসকে মুক্তিদান করুন।

বণিক ভ্রূকুটি করে—কেন?

দাক্রুজ—আমার দরকার আছে।

বিস্মিত হয়ে ভ্রূকুটি ক'রেই ধার্মিক দাক্রুজের হাত থেকে পঞ্চাশ টাকা তুলে নেয় বণিক। বৃদ্ধ দাসের হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে গর্জন করে—চলে যাও।

বৃদ্ধ দাসও উঠে এসে বিস্মিতভাবে তাকিয়ে থাকে দাক্রুজের মুখের দিকে।

দাক্রুজ বলেন—আসুন আমার সঙ্গে।

সেদিন যখন সন্ধ্যা নামলো ভাগীরথীর তটে, আর স্তব্ধ হলো দাস বাজারের চিৎকার, তখনও গির্জার অভ্যন্তরে মেরি মাতার সম্মুখে বসেছিলেন দুই জন ধার্মিক, দাক্রুজ ও সেই বৃদ্ধ।

দাক্রুজ প্রশ্ন করেন—আপনার পরিচয় জানতে পারি?

বৃদ্ধ বলেন—আমি সংসার-ছাড়া সন্ন্যাসী।

—কোথায় থাকেন?

এই ভাগীরথীরই কূলে যে-কোন একটি গাছের তলায়।

দাক্রুজ বলেন--আপনি মুক্ত, আপনি আপনার স্থানে চলে যান।

বৃদ্ধ প্রশ্ন করেন--এখানে কেন আমাকে নিয়ে এলেন?

দাক্রুজ--আমার উপাস্য ঐ মেরি মাতার মূর্তিটি শুধু একবার আপনাকে দেখাবার জন্য।

বৃদ্ধ বলেন--সুন্দর মূর্তি।

বিদায় নিয়ে চলে গেলেন কৌপীনধারী বৃদ্ধ। যাবার সময় বলে গেলেন--আমি আর একদিন আসবো।

এবং রাত্রির মাঝপ্রহরে মোগল ফৌজের তোপের ধ্বনিতে কেঁপে উঠলো পর্তুগীজের হুগলি। সেনাপতি কাসেম খাঁ'র পরিচালনায় মোগলের নওয়ারা, সওয়ার, পদাতিক, আর তোপ হুগলিকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে।

মোগলের তোপে বিধ্বস্ত হলো ব্যাণ্ডেলের গির্জা। মাতা মেরির মূর্তি বুকে আঁকড়ে পথে বের হলেন ধার্মিক দাক্রুজ। পর্তুগীজের দুর্গদ্বারে আগুন জ্বলে ওঠে। কুঠির অভ্যন্তরে আশ্রিত পর্তুগীজ নরনারীর ভীতিবিহ্বল কণ্ঠস্বরও মোগল তোপের গর্জনে চাপা পড়ে যায়। দুটি পুরো মাসের অবরোধ এবং যুদ্ধের পর হতাশ হয়ে পড়ে পর্তুগীজ সেনাপতি। পালিয়ে যাবার পথ খোঁজে পর্তুগীজ। রাত্রির অন্ধকারে পালিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হয় পর্তুগীজের ধ্বংসাবশিষ্ট নৌবহর। দুর্গের কুঠির ভিতর থেকে সন্তর্পণে বের হয়ে মধ্যনিশীথে সারি সারি বজরা ও ডিঙির ভিতর এসে আশ্রয় গ্রহণ করে পর্তুগীজ নরনারী, সৈনিক আর ধর্মযাজক। মেরি মাতার মূর্তি সঙ্গে নিয়ে ধার্মিক দাক্রুজও এসে আশ্রয় নিলেন।

কিন্তু রেহাই দিলো না কাসেম খাঁ'র নওয়ারা আর তোপ। গোলার আঘাতে আহত হলো পর্তুগীজের পলায়নপর নৌবহর, জ্বলে উঠলো বজরা, ডুবলো ডিঙি, কিন্তু পর্তুগীজ নৌবহরের এক অংশ তবুও অবরোধ ভেদ ক'রে ভাগীরথীর জলে দ্রুত দাঁড় টেনে পালিয়ে গেল দূর সাগরমোহানার দিকে। বাকি নৌবহরকে ঘিরে বন্দী ক'রে ফেললো মোগলের কামানবাহী বজরা।

নৌকার উপর দাঁড়িয়ে শান্তভাবেই এই বিপর্যয়ের দৃশ্য দেখছিলেন ধার্মিক দাক্রুজ। আর মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছিলেন মাতা মেরির মুখ। সেই পুণ্যস্নিগ্ধ মুখচ্ছবি—এই মূর্তির মুখে তো কোন উদ্বেগ নেই।

বন্দী করার জন্য শৃঙ্খল হাতে নিয়ে একদল মোগল সৈনিক লাফ দিয়ে এসে উঠলো দাক্রুজের নৌকার উপর। যুদ্ধক্ষুব্ধ ভাগীরথীর তরঙ্গে মশালের আলো ছটফট করছে। দূরে অন্ধকার। অকস্মাৎ চিৎকার ক'রে উঠলেন ধার্মিক দাক্রুজ। মাতা মেরির মূর্তি দু'হাতে আঁকড়ে ধরে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে তাঁরই সহচর এক ভক্ত ভৃত্য।

আর চিৎকার করবারও সুযোগ পাননি ধার্মিক দাক্রুজ। যখন আর একবার তাঁর বিচলিত চোখের দৃষ্টি তুলে ভাগীরথীর জল আর অন্ধকারের দিকে তাকালেন, তখন মোগল সৈনিকের শৃঙ্খলে তাঁর দুই হাত বদ্ধ হয়ে গিয়েছে। বন্দী হয়ে শতাধিক পর্তুগীজের সঙ্গে আগ্রায় নীত হলেন ধার্মিক দাক্রুজ।

শোনা যায়, একমাত্র ধার্মিক দাক্রুজকেই ক্ষমা করেছিলেন বাদশাহ শা'জাহান। শোনা যায়, বাদশাহের প্রদত্ত শাস্তি শান্তভাবেই গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন ধার্মিক দাক্রুজ। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ক'রে মুক্তিলাভের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন দাক্রুজ এবং মত্ত হাতির পায়ের তলায় পড়ে প্রাণ বিসর্জনের শাস্তিই হাসিমুখে গ্রহণের জন্য তৈরি হয়েছিলেন। কিন্তু মত্ত হস্তীই ধার্মিক দাক্রুজের দেহ স্পর্শ না ক'রে শুধু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আগ্রা থেকে ফিরে এসে ব্যাণ্ডেলের বিধ্বস্ত গির্জার কাছে একদিন দাঁড়ালেন ধার্মিক দাক্রুজ। বাদশাহ শা'জাহানও তাঁকে নতুন করে গির্জা নির্মাণের অনুমতি দিয়েছিলেন।

পর্তুগীজের সেই হুগলিতে সেদিন আর পর্তুগীজের ঔদ্ধত্যের কোন চিহ্ন ছিল না। ছিল না দুর্গ, ছিল না কুঠি, আর নীরব হয়ে গিয়েছিল পর্তুগীজের দাসের বাজার। শুধু ছিলেন দাক্রুজ।

তিনিই আবার নতুন ক'রে নির্মাণ করলেন ব্যাণ্ডেলের গির্জা। দিন, সপ্তাহ, মাস, বৎসর— শুধু এক শান্ত ও অবিচলিত বিশ্বাসের প্রেরণায় গির্জা নির্মাণের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে থাকেন দাক্রুজ। টাকা আসে সুদূর সিংহলের পর্তুগীজ বণিকের কুঠি হতে।

গির্জা নির্মিত হলো, কিন্তু মূর্তি কই? মূর্তিহীন শূন্য বেদিকার সম্মুখে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করেন দাক্রুজ—ফিরে এসো মাতা।

লোকে বলে, সত্যই ফিরে এসেছিল মাতা মেরির সেই মূর্তি। আজও সেই মূর্তিই ব্যাণ্ডেল গির্জার অভ্যন্তরে প্রতিদিন ভক্ত উপাসকের প্রার্থনা শুনছেন।

কেমন ক'রে ফিরে এল মেরি মাতার মূর্তি? কেউ বলে, সে রাত্রে এক স্বপ্ন দেখে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়েছিল ধার্মিক দাক্রুজের। ঘর থেকে বের হয়ে গির্জার প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। দেখেছিলেন, ভাগীরথীর বুক থেকে যেন আলোকের ছটা উৎসারিত হয়ে উঠছে। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ভাগীরথীর তট এবং একটি মানুষের ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে সেই আলোকিত পথ ধ'রে। আর, বহু বিস্মিত মানুষের একটি ভিড় সেই দিকে তাকিয়ে বলছে—তিনি এসেছেন, তিনি এসেছেন।

পরদিন সকালে দেখা গেল গির্জার শূন্য বেদিকার উপর স্থাপিত রয়েছে মেরি মাতার সেই মূর্তি, সেই পুণ্যস্নিগ্ধ মুখচ্ছবি।

কিন্তু কে সেই ছায়ামূর্তি, কে এসেছিল ধার্মিক দাক্রুজের সেই স্বপ্নে-দেখা আলোকিত পথ ধ'রে? লোকে বলে, এসেছিলেন সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী, সেই দাস, যাঁকে পর্তুগীজ বণিক আর ক্রেতার হাত থেকে মুক্ত করেছিলেন ধার্মিক দাক্রুজ। ভাগীরথীর কূলেই মেরি মাতার সেই মূর্তিকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন সেই সন্ন্যাসী।

ধার্মিক দাক্রুজকে স্মরণ ক'রে ব্যাণ্ডেলের গির্জায় আজও প্রতি বৎসর উৎসব হয়, সে উৎসবের নাম—দোমিঙো দাক্রুজ। কিন্তু শুধু ব্যাণ্ডেলের গির্জা নয়, ধার্মিক দাক্রুজের স্মৃতি আজও নীরবে বহন করছে আর একটি বস্তু। ঠিক বস্তু নয়, ফুল। যে নতুন ফুলের বীজ তিনি বপন করেছিলেন এই দেশের মাটিতে, সেই ফুল আজও এই বাংলার মাঠ ছেয়ে ফুটে ওঠে। সেই ফুলেরই নাম কৃষ্ণকলি। অত্যাচারের পর্তুগীজ লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, শুধু এক শুভবুদ্ধি ধার্মিক পর্তুগীজের হৃদয়টিই যেন ফুল হয়ে ফুটে রয়েছে।

লীলা ও চারণক

অনেকদিন আগে, দূর সাগরের এক দ্বীপদেশের ছেলে এক নতুন মহাদেশের নদীর উপকূলে এসে এক মেয়ের কালো চোখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়েছিল। দেখে মুগ্ধ হয়েছিল সেই দ্বীপদেশের ছেলে। বাঁকা ভুরুর ছায়ার নিচে আর টানা কাজলরেখার উপর ফুটে রয়েছে সে-মেয়ের দুই চোখের দুই মায়াবিনী তারকা। তাম্বুলের রসে রঞ্জিত দুটি অধর, যেন এই নতুন দেশেরই ভোরের আকাশের রক্তরাগ সিক্ত হয়ে রয়েছে এই দেশেরই ভোরের শিশিরে। চন্দনের পঙ্ক দিয়ে আঁকা একটি তিলক রয়েছে দুই ভুরুর মাঝখানে, যেন ফুলবনের এক লুব্ধ প্রজাপতি সে-মেয়ের কপালে চুমো দিতে এসে ঘুমিয়ে পড়েছে কপালের উপর। মেয়ের কোমর জড়িয়ে অলস এক চন্দ্রহার মৃদু মৃদু কাঁপে। বাজুবন্ধে দোলে সোনায় গড়া কদম্ব।

রুপোয় গড়া দুটি পায়জোড়ের উল্লাস রুমঝুম ক'রে বেজে উঠতে চায় সে-মেয়ের আলতা-রাঙানো দুটি পায়ের দিকে তাকিয়ে। দ্বীপদেশের ছেলে কোনদিন কল্পনাও করেনি যে, এরকমের রূপের মেয়েও আছে পৃথিবীতে, আর এত মায়া আছে কালো চোখে।

মহাদেশের নদী-উপকূলের সেই মেয়েও কখনো কল্পনা করতে পারেনি যে, দূর সাগরের এক দ্বীপের কোল থেকে এমন এক রূপের ছেলে এসে একদিন দাঁড়াবে তারই চোখের এত কাছে। কালাপানির এত ঢেউ আর এত তুফান কেমন ক'রে পার হয়ে এল এই সুন্দর নির্ভীক? সেই মেয়েও মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখেছিল আগন্তুক পরদেশী যুবকের রূপ। মনে হয়, যেন এক প্রবালদ্বীপের রাজকুমারই সমুদ্র পার হয়ে এই নদী-উপকূলে এসে দাঁড়িয়েছে। কালো কাজল নয়, আকাশের নীল লেগে রয়েছে সেই ছেলের চোখে। স্তবকিত কেশে যেন গলানো সোনার প্রলেপ। যেন এক হিমানীর দেশ হতে নতুন অরুণোদয়ের আভা অঙ্গে মেখে এই নতুন দেশের মাটিতে এসে দাঁড়িয়েছে এই সুগৌরদেহ আগন্তুক।

কিন্তু কি চায় সে? কেন অমন ক'রে তাকিয়ে থাকে? নিজের মনের এই প্রশ্নেই বিচলিত হয়ে মুখ লুকোবার জন্য মাথা হেঁট করেছিল সেই মেয়ে। আর দ্বীপবাসী সেই আগন্তুকও নতুন দেশের মেয়ের লজ্জারাগে আরক্ত সেই মুখের শোভাও দেখে ফেলেছিল।

উপকথা নয়, রূপকথাও নয় এবং এমন খুব বেশি দিনের কথাও নয়। এই কাহিনী হলো এই কলকাতারই ইতিহাসের এবং আজ থেকে মাত্র দু' শত আশি বছর আগেকার একটি কাহিনী। 'আরংজেব ভারত যবে করিতেছিলেন খান্ খান্.' দিল্লীর মোগল-মসনদের গর্বে যখন ভাঙনের আভাস লেগেছে আর গঙ্গার মোহানায় ফিরিঙ্গীর মানোয়ারী জাহাজের ভিড় একটু বেশি ক'রে দেখা দিতে আরম্ভ করেছে, সেই সময়।

সুতানুটিতে ইংরাজের প্রথম কুঠি স্থাপন করেছিলেন যিনি, তাঁর নাম জোব চারণক। আরংজেবের এক ফারমানের অনুগ্রহে ভাগীরথীতটের এক গণ্ডগ্রামে স্থাপিত সেই কুঠিই একদিন দিল্লীর মসনদ অধিকার ক'রে ফেলবে, এমন শঙ্কা সেদিন দেখা দেয়নি বাদশাহ আলমগীরের মনে এবং সেই আগন্তুক তরুণ ইংরাজ জোব চারণকও নিশ্চয় কল্পনা করতে পারেননি।

ইতিহাসের সেই অদৃষ্টের কথা থাক। জোব চারণক কি তাঁর নিজেরই জীবনের পরিণাম কল্পনা করতে পেরেছিলেন? ভাগীরথীতটের এই মাটিতে নামবার আগে এমন স্বপ্ন ছিল না তাঁর চোখে, ভাবতেও পারেননি যে, জীবনের প্রথম প্রেমে তাঁকে এই দেশের মাটিকেই চিরকালের মত আপন ক'রে নিতে হবে।

সুতানুটি হতে অনেক দূরে ও অনেক উত্তরে গঙ্গারই তটভূমির উপর একস্থানে দ্বিতীয় এক সদাগরী কুঠি স্থাপন ক'রে তখন মসলিন আর মশলার বিকিকিনির ব্যস্ততার মধ্যে দিন যাপন করছিলেন জোব চারণক।

সেদিন ছিল এক উৎসবের দিন, মেলা বসলো নদীর কিনারার এক প্রান্তরে। নানা খেলা, নানা পণ্য ও নানা আমোদের এক বিচিত্র মেলা। জোব চারণক এলেন মেলা দেখতে এবং মেলা দেখতে এসেই প্রথম দেখলেন সেই মেয়েকে, যার নাম লীলা, এক ব্রাহ্মণ ভূস্বামীর কন্যা।

দেখতে ভুল করেননি চারণক, সেই মেয়ের সীমন্তে যে সিঁদুরের রেখা আঁকা রয়েছে। জানতেন চারণক, এমন মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার অর্থ দিগ্বলয়ের তারকার দিকে তাকিয়ে থাকা। কাছে যাওয়া যায় না, কাছে আহ্বান করা যায় না। ভিন দেশের এই বিবাহিতা নারীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা বড় ভুল, তার চেয়ে বেশি ভুল মুগ্ধ হওয়া।

ভূস্বামীর মেয়ে লীলাও অবশ্যই বুঝেছিল, সাগরপারের মানুষের মুখের দিকে অমন ক'রে তাকাবার অধিকার তার নেই। যেন এক অজানা সমুদ্রের ঢেউ হঠাৎ এসে এদেশের মাটি

ছুঁয়েছে, আবার ফিরে যাবে আর মিলিয়ে যাবে সেই ঢেউ, চোখে দেখার সুযোগ আর নাগাল থেকে অনেক দূরে।

হঠাৎ নিজের মনের দিকে তাকিয়েই ভয় পায় আর লজ্জা পায় লীলা। সমুদ্রের ঐ ঢেউ যদি সরে না যায়, যদি চিরকাল চোখের কাছেই থাকে, তাতেই বা কি লাভ? সে যে বিবাহিতা নারী। পরপুরুষের রূপ দেখে মুগ্ধ হওয়াও যে অপরাধ। কিন্তু বুঝতে পারে লীলা, সে অপরাধ আজ ঘটে গেল তার জীবনে। তার আনত মুখের এই লজ্জারাগে তারই বিচলিত মনের যে ভাষা নীরবে ফুটে উঠেছে, সে ভাষা বুঝে ফেলেছে বিদেশের এই মানুষ।

পরপুরুষের প্রতি অনুরাগী হওয়া উচিত নয় ; কিন্তু লীলা যে তার নিজ পুরুষের মূর্তিটা আজ কল্পনাও করতে পারে না। কে সে, কেমন সে এবং কোথায় আছে সে? তিন বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল লীলার, সে আজ বিশ বছর আগের ঘটনা। বারাণসী যাবার পথে এক ব্রাহ্মণ ক'দিনের জন্য অতিথি হয়েছিলেন ব্রাহ্মণ ভূস্বামীর বাটিতে এবং ভূস্বামীর সেই অতিথির বংশমহিমায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর তিন বৎসরের শিশুকন্যা লীলাকে যথাবিধি শাস্ত্রীয় রীতি অনুসারে এবং সোৎসবে ও সাড়ম্বরে সেই অতিথিরই কাছে সম্প্রদান করেছিলেন। শিশু বধূর সীমন্তে সিন্দূর দান ক'রে স্বামী চলে গেলেন বারাণসী ধামে। যৌবনসম্পন্না লীলা আজ আর তার স্বপ্নের ভিতর সন্ধান ক'রে খুঁজেও পায় না স্বামী নামে কোন পুরুষের স্মৃতি।

মেলা থেকে ঘরে ফিরে যাবার পর নিজেকে ধিক্কার দিতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছিল লীলা। মনে হয়, কোন্ এক নিষ্ঠুর বিদ্রূপ তাকে বৃথা এই সধবার সাজ পরিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে চিরকালের মত এবং আর এক বিদ্রূপ প্রেমিকের চক্ষু নিয়ে তার এই মুখের দিকে তাকিয়ে কলঙ্কিনী ক'রে দিয়েছে তার মনের ভাবনাকে। দর্পণের সম্মুখে দাঁড়িয়ে নিজের রূপ ও যৌবনের প্রতিবিম্বের দিকেই ভ্রূকুটি হানে ধনী ভূস্বামীর কন্যা লীলা, যেন এক সর্বনাশের মোহ হতে নিজেকেই সাবধান আর শাসন করার চেষ্টা করে। কিন্তু ভুলতে পারে না যে, এক পুরুষের মুখের দিকে তাকিয়ে আজ সে মুগ্ধ হয়েছে। জীবনে এই প্রথম।

জোব চারণক তাঁর সদাগরী জীবনের সকল ব্যস্ততার মধ্যেও ভুলতে পারেন না সেই দুই কালো চোখের দৃষ্টি আর লজ্জারাগে আরক্ত মুখের ছবি। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এবং বৎসর ঘুরে নতুন বৎসর আসে ; গঙ্গাতটের এক স্নানঘাটের দিকে প্রতি প্রত্যূষে যে পালকি আসে আর চলে যায়, সেই পালকিই এক নতুন মোহ হয়ে উঠলো কুঠিয়াল জোব চারণকের জীবনে। পালকির অভ্যন্তরবর্তিনী সেই নারীর মুখ নিত্যই দেখতে পান চারণক। প্রতি প্রভাতে সূর্যোদয় দেখবার নেশার মত দুর্বার এক কৌতূহলের আবেগে প্রতি প্রভাতে পথের পাশে এসে একবার না দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না চারণক।

এইভাবেই একদিন, সেদিন কোন পালকি দেখা দিলো না নদীতটে। জোব চারণক দেখলেন, দূরে উপকূলের এক স্থানে রচিত হয়েছে একটি চিতা। অনেক লোক, অনেক বাদ্যকর এবং অনেক উপচার এসেছে। শুনলেন, ঐ চিতায় মৃত স্বামীর সঙ্গে সহমরণ বরণ ক'রে আজ সতী হবেন এক নারী।

মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় কেমন ক'রে পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যায় জীবন্ত নারী? একটি আর্তনাদও কি করে না? নারীর পিতা পুত্র ও ভ্রাতা কি সত্যই এক ফোঁটা চোখের জল না ফেলে সহ্য করে সেই দৃশ্য? দূরের সেই সজ্জিত চিতামঞ্চের দিকে তাকিয়ে এই কৌতূহলেই অস্থির হয়ে উঠেছিলেন জোব চারণক।

তবু যেতে পারেন না চারণক। চুপ ক'রেই দাঁড়িয়ে থাকেন আর অপেক্ষা করেন। একটু বিষণ্ণ হয়েই ভাবছিলেন চারণক, প্রতিদিনের মত আজও কি সেই পালকি একবারও এই পথে না এসে থাকতে পারবে? প্রতি প্রত্যূষে যে নারীর সুন্দর মুখ সুস্মিত হয়ে নীরবে অভ্যর্থনা জানিয়ে যায় জোব চারণকের অন্তরের এই কৌতূহল আর প্রতীক্ষাকে, কোথায় আছে আর

কি করছে সেই নারী? মনে কি পড়ে না তার, এই পথে একটি মানুষের মন তারই প্রতীক্ষা সহ্য করতে না পেরে এতক্ষণে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

সত্যই জানেন না চারণক, সেই নারী এখন দাঁড়িয়ে রয়েছে ঐ চিতারই কাছে আর তাকিয়ে দেখছে, ঘৃতসিক্ত চন্দনের কাঠের যে-শয্যা তারই জন্য রচিত হয়ে রয়েছে তার সম্মুখে। আর কতক্ষণ? অগ্নিশিখার ভোজ্য হয়ে যে দেহ আর কিছুক্ষণ পরে শুধু কতগুলি তপ্ত কালো ধূমের কুণ্ডলী হয়ে চিরকালের মত মিলিয়ে যাবে বাতাসে, সেই দেহেরই রূপ আর কামনাকে ধিক্কার দিয়ে মনে মনে হাসছিল লীলা।

বারাণসী ধাম হতে বার্তা বহন ক'রে নিয়ে এসেছে এক আত্মীয়, লীলার স্বামীর দেহান্ত হয়েছে। আর নিয়ে এসেছে, লীলার স্বামীর একজোড়া কাষ্ঠ-পাদুকা। সজ্জিত হয়েছে চিতা, যে চিতায় ঐ কাষ্ঠ-পাদুকারই যথারীতি সৎকার করা হবে। আর, কাষ্ঠ-পাদুকার পাশেই শয্যা গ্রহণ ক'রে সহমরণ বরণ করবে লীলা। সতী হবে লীলা।

অন্যমনস্কের মতই নদীতীরের সেই চিতার দিকে তাকিয়েছিলেন চারণক। হঠাৎ কি-যেন দেখতে পেয়ে আর কি ভেবে চমকে ওঠেন চারণক। মনে হয়, ঐ তো সেই সুস্মিত মুখের মতই একটি মুখ সজ্জিত চিতার দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। বাদ্য বাজছে প্রমত্ত হয়ে, শত শত কৌতূহলী মানুষের যেন একটা মেলা বসে গিয়েছে চিতাস্থলীর নিকটে। শ্মশানচারী সাধু ও ভিখারীর ভিড়। পাগল কুষ্ঠী আর কুকুরের ভিড়। সতীর সিঁদুর নেবার জন্য ভিড় করেছে নারীর দল। আছেন পুরোহিত ও আত্মীয় স্বজন।

জোর চারণক ছুটে এসে সেই ভিড়ের কাছে পৌঁছিয়েই একেবারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। মিথ্যা হয়নি তাঁর আশংকা। লীলা, সেই লীলা, চারণকের এই প্রবাসজীবনের শত দিবসের প্রত্যূষ যার সুস্মিত চক্ষুর প্রণয়-দৃষ্টিতে মধুর হয়ে উঠেছে, সেই নারীই দাঁড়িয়ে আছে মৃত্যুর প্রতীক্ষায়।

চারণকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল লীলা। দেখলেন চারণক, দুই চোখের সেই সুস্মিত দৃষ্টি আজও তাকে প্রতিদিনের মত নীরবে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। এই শেষ অভ্যর্থনা, কিন্তু তার জন্য যেন কোন দুঃখ নেই লীলার মনে।

প্রমত্ত হয়ে বাদ্য বাজে। সিক্ত হয়ে ওঠে চারণকের চক্ষু। শুষ্ক শূন্য এক স্বপ্নের শ্মশানে যেন আগুনের করাল উৎসবে চারণকের অন্তর ভস্ম হয়ে ঝরে পড়ছে। অকস্মাৎ শুনতে পান চারণক, চিৎকার ক'রে উঠেছেন পুরোহিত। সতী হতে অস্বীকার করেছে লীলা।

পুরোহিত প্রশ্ন করেন--কেন?

লীলা বলে--মনের মধ্যে মিথ্যা রেখে মৃত্যু বরণ করতে চাই না।

পিতা প্রশ্ন করেন--এই কথার অর্থ?

লীলা--স্বামীকে চিনি না আমি, কোনদিন দেখেছি বলেও মনে পড়ে না। স্বামীর অনুরাগিণী আমি নই।

--কিন্তু তাতে সতী হতে আপত্তি কি? সহমৃতা হও, তাই হবে তোমার অনুরাগের প্রমাণ।

লীলা বলে--আমি পরানুরাগিণী, সতী হবার অধিকার আমার নেই।

অসতী! অসতী চিৎকার করে জনতা। এই নারী আজ নিজ মুখে তার মনের কলঙ্ক প্রকাশ ক'রে দিয়েছে। জনতা অভিশাপ দেয়, চিৎকার করে ঘোষণা করে--দূর হও অসতী নারী।

দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল আর এক শ্রেণীর নর ও নারী, শবমাংসলুব্ধ শ্মশান-পিশাচের চেয়েও ঘৃণ্য সেই সব পাপ-ব্যবসায়িক, যারা অ-সতী নারী সংগ্রহের আশায় সতীদাহের চিতার কিছুদূরে দাঁড়িয়ে থাকে।

জনতার অভিশাপের ও ধিক্কারের সান্নিধ্য থেকে সরে গিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছিল

লীলা। বুঝতে পারে, সত্যই মৃত্যু হয়ে গিয়েছে তার। ক্ষুব্ধ জনতার চিৎকার তাকে বীভৎস এক প্রেতলোকের পথে চলে যাবার ইঙ্গিত ঘোষণা করছে। পাপ-ব্যবসায়িকের দল ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে আসছে লীলার দিকে। এক সুন্দরী অ-সতী তরুণীর জীবন্ত দেহকে আশ্রয় দেবার জন্য আগ্রহের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়।

অকস্মাৎ যেন এক রুষ্ট সিংহের গর্জন ধ্বনিত হয়। কোমরবন্ধ হতে তরবারি খুলে নিয়ে মত্ত সিংহের মত সবেগে এগিয়ে আসেন চারণক। সন্ত্রস্ত হয়ে সরে যায় পাপ-ব্যবসায়িকের দল।

যন্ত্রণাদগ্ধ চোখের দৃষ্টি তুলে লীলা তাকায় চারণকের দিকে। বিস্মিত হয়ে বলে—তুমি?

চারণক—হ্যাঁ, আমি।

লীলা—কেন?

চারণক—আমার আশ্রয়ে এসো।

লীলা—তুমি অশ্রয় দেবে অ-সতীকে?

চারণক বলেন—হ্যাঁ, আমি আশ্রয় দেবো আমার জীবনের প্রথম অনুরাগের নারীকে।

গঙ্গাতটের সেই অ-সতী নারীকেই এক সুন্দর উপহারের মত ক্রোড়ে ধারণ করে কুঠিয়াল ইংরাজের এক নৌকা তখনি পাল তুলে রওনা হয়ে গেল দূর সুতানটির দিকে। আর নৌকার কক্ষের ভিতরে বসে লীলা তার নিজেরই কোলের উপর লিলিপুষ্পের একটি গুচ্ছের দিকে বিমুগ্ধের মত তাকিয়ে থাকে। প্রেমিকের উপহার স্পর্শ ক'রে রয়েছে লীলার শরীর। মনে হয় লীলার, সত্যই রূপকথার জগতের এক সায়রের ঢেউ-এ ভেসে চলেছে তার জীবন, কিন্তু ডুববার ভয় নেই, হাতে ধরে ভাসিয়ে রাখবার মানুষ কাছেই রয়েছে।

আর, কক্ষের বাইরে নৌকার পাটাতনের উপর বসে গঙ্গার জলের উপর সূর্যাস্তের রঙীন ছায়ার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকেন চারণক। প্রশ্ন জাগে চারণকের মনে, তাঁর জীবনের নৌকা বহু নীল সাগরের ঢেউ পার হয়ে সত্যই কি এইবার এই গঙ্গার এক মায়াবালুচরের কাছে এসে ঠেকে গেল? প্রেমের চক্ষু নিয়ে যে নারীর মুখের দিকে জীবনে প্রথম তাকিয়েছিলেন চারণক, সেই নারী তাঁরই সদাগরী কুঠির এক আশ্রয়ে জীবন সঁপে দেবার জন্য তাঁর সঙ্গে চলেছে।

সন্ধ্যা হয়, নদীতীরের কুটীরের দীপ জ্বলে ওঠে। চারণকের নৌকা গঙ্গার লক্ষ ঢেউ পার হয়ে এক সন্ধ্যায় সুতানুটির ঘাটে এসে থামে। আর, সুতানুটির ইংরাজ কুঠির এক কক্ষের দ্বারের কাছে এসে দাঁড়ায় লীলা ও চারণক।

চারণক বলেন—এই তোমার আশ্রয় লীলা।

চলে গেলেন চারণক।

কয়েকটি সন্ধ্যার পর এক সন্ধ্যায় এই আশ্রিত জীবনের নির্ভয় আনন্দের মধ্যেই বুঝতে পারে লীলা, চারণকের কুঠির আশ্রিতা নারী মাত্র সে, চারণকের জীবনের আশ্রিতা নারী সে নয়। প্রেমিকা মাত্র, বিবাহিতা পত্নী নয়। চারণকের অনুরাগের উপহার হয়ে প্রতিদিন লিলিপুষ্পের গুচ্ছ শুধু আসে, কিন্তু চারণক আসেন না। কিন্তু তার জন্য কোন ক্ষোভ জাগে না লীলার মনে। এই ভালো, এই ঢের, এই লিলিপুষ্পের মৃদু গন্ধে মুগ্ধ হয়ে থাকুক এই আশ্রয়, এর চেয়ে বেশি কোন সম্পর্ক আশা করে না লীলা।

কিন্তু এই সুতানুটিরই এক সুন্দর সন্ধ্যায় যেন হঠাৎ এক দুঃস্বপ্ন দেখে চমকে উঠলো চারণকের কুঠির কক্ষে আশ্রিতা সেই নারীর মন। এই আশ্রয়েরই আয়ু আর কতদিন? গঙ্গা-তটের এক নারীকে আশ্রয় দিতে পারে, কিন্তু হাত ধ'রে সেই নারীকে জীবনে আপন ক'রে নিতে পারবে না এই পরদেশী প্রেমিক। দ্বীপদেশের ছেলে একদিন আবার তার তরণী নিয়ে সাগরের ঢেউ-এর মতই ফিরে চলে যাবে। সেই শূন্যতা সহ্য করার শক্তি থাকবে না লীলার।

মরতেই হবে আর একবার, তবে আজই প্রেমিকের অনুরাগের সম্মান মাথায় নিয়ে মরে যাওয়াই ভালো।

অগ্নিশিখার দিকে নয়, সুতানুটির কুঠির উদ্যানের এক সরোবরের শীতল জলের দিকেই মৃত্যুর সন্ধানে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছিল লীলা। সেই মুহূর্তে কে যেন পিছন হতে হাত ধ'রে ফেললো লীলার।

লীলা চমকে ওঠে—তুমি?

চারণক হাসেন--হ্যাঁ, আমি।

লীলা--কিন্তু কতদিন?

চারণক বলেন—চিরদিন।

চুপ করে লীলা।

চারণক বলেন--শুধু জীবনে নয়, মৃত্যুতেও আমি তোমার কাছেই থাকবো লীলা।

মিথ্যা হয়নি এই প্রতিশ্রুতি। লীলাকে ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করেছিলেন জোব চারণক। সে অনুরাগের জীবনে ছেদ পড়েনি কোনদিন ; জীবনে নয় এবং মৃত্যুতেও যে নয়, তার প্রমাণ আজও রয়েছে এই কলকাতা শহরে।

ঐ যে সেণ্ট জন গির্জার প্রাঙ্গণে এক স্মৃতিসৌধের শান্তশীতল অভ্যন্তরে বিচিত্র প্রস্তরে রচিত দুটি পাশাপাশি সমাধি—জোব চারণক আর লীলা চারণকের সমাধি। দূর সাগরের দ্বীপদেশের এক ছেলে আর এই গঙ্গাতটের এক মেয়ের বিচিত্র অনুবাগের স্মৃতি চিরন্তন ক'রে রেখেছে এই দুই সমাধি।

সমাহিত আর্তনাদ

বিচিত্র এই বীরভূমির মাটি। পথে পথে পাথর ছড়ানো। বেলে-পাথর, হাঁসা-পাথর, চুনা-পাথর আর লোহা-পাথর।

বক্রেশ্বরের উষ্ণ-প্রস্রবণের জলে গন্ধকের গন্ধ আর ময়ূরাক্ষীর জলে সুবর্ণরেণু। কঠিন ও অতিকায় গ্র্যানিটে চিহ্নিত দুবরাজপুর, আর অভ্রচূর্ণে আকীর্ণ সিঙুর। খড়ি মাটির খয়রাসোল আর লালকাঁকরের সাঁইথিয়া।

বীরভূমির ইতিহাসের পথে পথে রহস্যের পাথর ছড়ানো। প্রাচীন রাঢ় সূক্ষ্ম আর কর্ণ-সুবর্ণের ইতিহাস এই বীরভূমির গ্রাম এবং জনপদের নামরহস্যের মধ্যে আত্মগোপন ক'রে রয়েছে। দুরন্ত বর্গীর আর ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরের আঘাতচিহ্ন আজও ধারণ ক'রে রয়েছে বীরভূমির মাটি। পরিত্যক্ত গ্রামের ধ্বংসীভূত অবশেষের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে অতীতের যন্ত্রণাক্ত স্মৃতি। কুঠিয়াল ইওরোপীয় বণিকের বাণিজ্যিক লালসার ভগ্নাবশেষ কোথাও শেষ ইষ্টক খণ্ড হারিয়ে ধানের ক্ষেতের সঙ্গে মিশে গিয়েছে এবং কোথাও বা প'ড়ে আছে বন্য গুল্মের অন্তরালে মুখ ঢেকে।

কে জানে কবে বীরভূমির কোন্ কাল্পনিক তাঁর দেশের মাটি পাথর আর জলকে পৌরাণিক রহস্যে রসিত ক'রে দিযেছিলেন? পাতালের হটকাক্ষ শিব সুমেরু পর্বতকে মাথায় বহন ক'রে নিয়ে এলেন, আর তাঁর তেজ ধারণ করতে গিয়ে উষ্ণ হয়ে গেল বক্রেশ্বরের উৎস। বৃকোদর ভীমের হাতে নির্যাতিত হয়ে জয়দ্রথ প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি লাভের জন্য সিদ্ধিনাথ শিবের উপাসনা কবলেন শিবপাহাড়ীতে এসে। রাক্ষস হিড়িম্বের বাসস্থান ছিল ঐ একচাকা নামে অভিহিত গ্রামটিতেই, মল্লারপুর হতে তিন ক্রোশ পুর্বে। সাঁইথিয়ার দু' ক্রোশ

উত্তরে কোটাসুর, এখানেই থাকতেন মহাভারতের বক রাক্ষস। সেতু বন্ধনের জন্য রাজা রামচন্দ্র হিমালয় হতে শিলাখণ্ড সংগ্রহ ক'রে বিমান রথে আরোহণ ক'রে চলে যাবার সময় এক স্থানে এসে একটু অসুবিধায় পড়েছিলেন। রথের অশ্ব হঠাৎ ভয় পেয়ে চমকে উঠেছিল। একদিকে কাত হয়ে পড়লো রথ এবং কিছু শিলাখণ্ড রথচ্যুত হয়ে নিচের মাটিতে প'ড়ে গেল। সেই সব পাথরই তো হলো দুবরাজপুরের ঐ গ্র্যানিট। মহাভারত আর রামায়ণের পৌরাণিক ঘটনার চমক-পুলক আত্মসাৎ ক'রে রহস্যময় হয়ে উঠেছে যে বীরভূমির শিলা আর উৎস, সেই বীরভূমির একটি গ্রামের নাম সুপুর।

সুরথ নামে এক রাজার রাজধানী সুপুর। আজও আছেন সুরথেশ্বর শিব, সুপুরের মাটি এক ভূস্বামীর ঐতিহাসিক স্মৃতি ধারণ করে রেখেছে। মাটির নিচে সেই ঐতিহাসিক সুরথের প্রাসাদভবনের বিগলিত দেহের চিহ্ন আজও দেখা যায়। কিন্তু তাঁর ঐতিহাসিক পরিচয় আর খুঁজে পাওয়া যায় না। বিচিত্র এক কাহিনীর রাজ্যেই অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছেন রাজা সুরথ। মহাকালীর তুষ্টি বিধানের জন্য প্রত্যহ এক লক্ষ পশু বলি দিতেন রাজা সুরথ। বলি দিতেন যে স্থানে, সেই স্থানেরই নাম বোলপুর।

এই সুপুরেরই মাটিতে ফরাসী বণিকের কুঠিতে ফ্রান্সের জাতীয় পতাকা উড্ডীন হতে দেখতে পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছিল সেদিনের ফরাসীশত্রু ইংরাজ। ফ্রান্সের পতাকাকে নমিত ক'রে কুঠি অধিকার করেছিলেন ইংরাজ কলেক্টর। সে কুঠির ইষ্টক আজও প'ড়ে আছে সুপুরের মাটিতে এবং ঐ মাটিতে সুপুরেরই এক দেশপ্রেমিক বীর সন্তানের স্মৃতি মিশে রয়েছে।

ফরাসীকে কুঠি স্থাপনের জন্য ভূমি দিয়েছিলেন গোস্বামী আনন্দচাঁদ। বর্গীর আক্রমণে উৎপীড়িত বীরভূমির গ্রামের বেদনা দেখে একদিন অশান্ত হয়ে উঠেছিলেন ঐ শান্ত বৈষ্ণব আনন্দচাঁদ গোস্বামী। বিপন্ন সুপুরকে রক্ষা করার জন্য জপমালা রেখে দিয়ে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন আনন্দচাঁদ। বর্শা ও কুঠারে সজ্জিত গ্রামবাসীদের নিয়ে বাধা দিয়েছিলেন বর্গীকে। আক্রমণকারী বর্গী বিস্মিত হয়ে দেখেছিল, শ্বেতাশ্বে আরূঢ় এক বিপক্ষ যোদ্ধার চারটি মূর্তি যেন গ্রামের চারদিকের রণাঙ্গনে প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করছে। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে অস্ত্র সম্বরণ করেছিল বর্গী এবং রক্ষা পেয়েছিল সুপুর।

বর্গীর অশ্বখুরের আঘাতে পীড়িত সুপুরের মাটির সেদিনের বেদনা কালের বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছে। গোস্বামী আনন্দচাঁদ আজ অতীতের এক স্মৃতি মাত্র। সুপুরের সমাহিত অতীত একেবারে শব্দহীন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু জেগে আছে শুধু একটি শব্দ। অতি করুণ একটি সমাহিত আর্তনাদ।

তাঁর নাম ছিল সুধন্য রায়। সারা জীবন ধ'রে অর্থ উপার্জন আর অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন তিনি। রাত্রি যখন গভীর হতো, অন্ধকারে অন্ধ হয়ে যেতো চারদিকের চক্ষু, তখন তিনি আলো জ্বালতেন তাঁর গৃহের এক গোপন কক্ষের অভ্যন্তরে। স্বর্ণ মুদ্রায় পরিপূর্ণ সারি সারি কলসীর দিকে মুগ্ধ নেত্রে তাকিয়ে থাকতেন। কক্ষের কপাটও বন্ধ করে দিতেন, যেন এই কক্ষের কোন শব্দ বহন ক'রে বাইরে পালিয়ে না যায় ঘরের বাতাস। কলসী উপুড় ক'রে ধরতেন, আর গড়িয়ে পড়তো স্বর্ণমুদ্রার ধারা। অতি শ্রুতিসুখকর এক ঝনৎকারের ধারা। শুনতেন এবং শুনে ধন্য হতেন অর্থোপাসক সুধন্য রায়।

বিবাহ করেননি সুধন্য রায়, কারণ বিবাহিত জীবন হলো দায়বহ জীবন। আশংকা হয়, সে দায় পালন করতে গেলে পুঞ্জীভূত এই স্বর্ণমুদ্রার স্তূপও কর্পূরখণ্ডের মত দিন দিন ক্ষীণ হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সত্যিই তো, মহাজনেরা ঠিকই বলেছেন, দারা-সুত-কন্যা হলো কতগুলি মায়ার ছলনা। সঞ্চিত সম্পদ ক্ষয় ক'রে দেবার জন্যই ওরা আসে। তাই বিবাহ করেননি সুধন্য রায়।

শ্রদ্ধার সঙ্গে জ্ঞানগ্রন্থ পাঠ করেন সুধন্য রায়। এবং পাঠ ক'রে তৃপ্তি লাভ করেন। ঠিকই

বলেছেন জ্ঞানীরা--ভোগে সুখ নেই।

সুখ হলো সঞ্চয়ে, ভোগে নয়। সঞ্চিত অর্থ মনের কোন আকাঙ্ক্ষার ভুলে তিলমাত্রও যেন ক্ষয় হয়ে না যায়, সর্বদাই সতর্ক হয়ে থাকেন সুধন্য রায়। ভোগহীন যোগীর মতই বন অন্বেষণ ক'রে ফল সংগ্রহ করেন, কখনো বা নদীতটের অযত্নজাত শস্যের কণিকা সংগ্রহ ক'রে ঘরে নিয়ে আসেন। দেহ ধারণের জন্য, ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য, এই যথেষ্ট।

ব্যবসায়িক ভিষক ছিলেন সুধন্য রায় এবং তাঁর চিকিৎসার খ্যাতিও ছিল। অর্থ সঞ্চয়ই ছিল তাঁর ব্যবসায়িক ব্রতের লক্ষ্য। কোনদিন মনের কোন ভুলে বিনা অর্থে কোন রুগ্নের পরিচর্যা ক'রে ফেলেননি তিনি। ক্ষুধার্ত অতিথিকে অনায়াসে গৃহদ্বার হতে ফিরিয়ে দিতে কোন কুণ্ঠা ছিল না তাঁর মনে। ভিখারির ছায়া দেখতে পেলে তিনি দ্বার বন্ধ ক'রে দিতেন।

শুনেছিলেন, মাত্র একটি বিল্বপত্রের উপহারে তুষ্ট হন শিব সুরথেশ্বর। তাই শিবভক্ত হয়েছিলেন সুধন্য রায়। বিশ্বাস করতেন, এই শিবই দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পূজারীকে অর্থব্যয়ের দুশ্চিন্তায় ও বিপাকে বিড়ম্বিত করেন না শিব, মাত্র একটি বিল্বপত্রেই তুষ্ট হন। প্রতিদিন সুরথেশ্বরের সম্মুখে গিয়ে ভক্ত পূজারীর মত উপবেশন করতেন সুধন্য রায়। বিল্বপত্র নিবেদন করতেন এবং সেই সঙ্গে নিবেদন করতেন তাঁর জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার কথা--চাই অর্থ, আর কিছু চাই না। এই দীনের প্রার্থনা পূর্ণ কর হে সর্ববিভূতির ঈশ্বর!

বিফল হয়নি সুধন্য রায়ের মনের কামনা। দিন দিন তাঁর অর্থের সঞ্চয় পরিস্ফীত হয়ে উঠেছিল। অতিক্রান্ত হলো যৌবনের জীবন, সন্ধ্যাশেষের মত ধীরে ধীরে এগিয়ে এল প্রৌঢ়ত্বের ছায়া। বুঝতে পারেন, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে বার্ধক্যের লুলিত ত্বক, পলিত কেশ আর জীর্ণ মেরুদণ্ড। সুধন্য রায়ের দুই চক্ষুর দৃষ্টিতে তবু অর্থের উপাসনা যেন জ্বলতে থাকে। দুই কর্ণ মুগ্ধ হয়ে স্বর্ণমুদ্রার ঝনৎকার শোনে।

কিন্তু তারপর? প্রশ্ন জাগে মনে।

একদিন গভীর রাত্রিতে দূরের শ্মশানক্ষেত্রের বক্ষ হতে বায়ুবাহিত হরিধ্বনি সুধন্য রায়ের দুই কানে এসে আঘাত করলো। চমকে উঠলো বক্ষের পঞ্জর। ও যে মৃত্যুর ধ্বনি! ঐ ধ্বনি যে মানুষের সব সোনা-রূপাকে ভস্ম ক'রে দেয়। রাজার রাজ্য কেড়ে নেয় ; সন্ন্যাসীর পিত্তলের কমণ্ডলুও কেড়ে নেয় ঐ ধ্বনি। কাউকে কিছুই চিরকাল ধ'রে রাখতে দেয় না ঐ মৃত্যু, জগতে এ কি কঠোর নিয়ম ক'রে রেখেছেন সুরথেশ্বর শিব?

কক্ষের নিভৃতে ক্ষীণ দীপের আলোকে স্বর্ণমুদ্রার কলসীর দিকে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলেন সুধন্য রায়। সারা জীবনের সঞ্চয় এই স্তূপীকৃত অর্থ একদিন কি পরের উপভোগের জন্য ফেলে রেখে চলে যেতে হবে? সেই যাবার দিনটিও কি আসন্ন হয়ে এসেছে?

জ্ঞানগ্রন্থ পাঠ করলেন সুধন্য রায়। পাঠ ক'রে আবার হরষিত হয়ে ওঠে সুধন্য রায়ের মন। বলেছেন জ্ঞানী--পুনর্জন্ম হয়, মৃত্যুর পর পুনরায় ভূমিষ্ঠ হয় মানুষ। যে তৃষ্ণা নিয়ে মৃত্যু হয় মানুষের, সেই তৃষ্ণাই একটা সংস্কার হয়ে মানুষকে পুনরায় জন্মগ্রহণে বাধ্য করে।

আশ্বস্ত হলেন একনিষ্ঠ অর্থোপাসক সুধন্য রায়। সংস্কারের বশে পুনরায় জন্ম লাভ করতে হয়, ভালোই নিয়ম করেছেন ভগবান সুরথেশ্বর। চিন্তা করেন এবং চিন্তা করতে করতে স্বপ্ন দেখেন ঘুমন্ত সুধন্য রায়, মৃত্যুর রাজ্য হতে ফিরে এসেছেন তিনি। ফিরে এসে দাঁড়িয়েছেন, এই কক্ষেরই দুয়ারের কাছে। এবং দেখতে পেয়েছেন, সব ঠিক আছে, সঞ্চিত স্বর্ণমুদ্রার একটিও কলসী স্থানচ্যুত হয়নি।

প্রভাত হতেই গ্রামান্তর হতে এক দৈবজ্ঞকে ডেকে নিয়ে এলেন সুধন্য রায়। বললেন-- আমি স্বপ্ন দেখেছি আচার্য, আমার মৃত্যুর পরেও আমার সঞ্চিত অর্থ অটুট আছে। পুনর্জন্ম লাভ ক'রে আমি আমার সঞ্চিত অর্থের অধিকার পুনরায় পেয়েছি। এ কি সত্যই সম্ভব?

দৈবজ্ঞ বলেন—হ্যাঁ। সঞ্চিত অর্থকে চিরস্থায়ী ক'রে রাখবার একটি দুরূহ ব্রত আছে।

—আজ্ঞা করুন, সেই ব্রত আমি পালন করবো।

—যখ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একজন জীবন্ত মানুষকে আপনার সঞ্চিত অর্থের সঙ্গে একস্থানে সমাহিত ক'রে দিতে হবে। ঐ সমাহিত ব্যক্তিই যখে পরিণত হবে এবং নিদ্রাহীন প্রহরীর মত চিরকাল আগলে রাখবে আপনার অর্থ।

যখ প্রতিষ্ঠার সংকল্প করলেন অর্থোপাসক সুধন্য রায়। সন্ধান করেন মানুষ। হিংস্র ব্যাধের মত লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে গ্রাম ও গ্রামান্তরের যত দীন-দরিদ্রের কুটীরের আঙিনার দিকে তাকিয়ে থাকেন। কিন্তু উপায় খুঁজে পান না, কেমন ক'রে আর কি ভাবে কা'কে তাঁর এই ব্রতের উপচার করতে পারা যায়।

গোচারণের মাঠে বসেছিল এক বালক। সুধন্য রায় প্রশ্ন করলেন—কে তুমি?

বালক বলে—আমি গরু চড়াই।

—কে তোমার পিতা?

—পিতা নেই, মাতা আছেন।

—গরু চড়াও কেন?

—মা অশক্ত রুগ্ন। মাকে সেবা করার জন্যই আমাকে এই কাজ ক'রে পয়সা যোগাড় করতে হয়। কিন্তু শত খেটেও যে পয়সা হয়, তাতে মায়ের ওষুধ ও পথ্য হয় না।

—আমি তোমার রুগ্না মাতাকে চিকিৎসা ক'রে সুস্থ করার দায় নিতে পারি, কিন্তু তার পরিবর্তে...।

—আজ্ঞা করুন।

—তার পরিবের্ত তোমাকে আমার সঞ্চিত অর্থ আগলে রাখার দায় নিতে হবে, যতদিন না আমি ফিরে আসি।

—কবে ফিরে আসবেন?

—মৃত্যুর পর। ততদিন তুমি আমার সম্পদের যখ হয়ে থাকবে।

—বলে দিন, কি করতে হবে?

—মন্ত্র প'ড়ে দেবো তোমার কানে। তুমি সেই মন্ত্র শুনে নিয়ে মাটির নিচে এক গুপ্তগৃহের মধ্যে আমার ধনরত্নের কাছে গিয়ে দাঁড়াবে। দ্বার বন্ধ ক'রে দেবো আমি। তুমি থাকবে, যতদিন না আমি ফিরে এসে আবার সেই দ্বার মুক্ত করি।

উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বালকের চক্ষু।—আমি প্রস্তুত। কিন্তু আমার মাতাকে বলবেন না, কোথায় আমি আছি।

মাতৃবৎসল সেই বালক সুধন্য রায়ের ব্রতের উপচার হয়ে সেদিন এসে দাঁড়ালো সুধন্য রায়ের গৃহদ্বারে। স্নান করলো বালক। বালকের কানে মন্ত্র প'ড়ে দিলেন সুধন্য রায়। গুপ্তকক্ষের ভিতরে প্রবেশ করলো বালক।

স্বর্ণমুদ্রায় পরিপূর্ণ সারি সারি কলসী। জ্বলছে প্রদীপ। বালকের উজ্জ্বল চক্ষু হঠাৎ যেন সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। পরমুহূর্তে চোখ ফিরিয়ে দ্বারের দিকে তাকায়। সুধন্য রায় প্রশ্ন করেন—কি?

—আমাকে একটিবার বাইরে যেতে দিন।

—কেন?

—মা'র সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।

সুধন্য রায় বলেন—না। কথার অন্যথা করো না, পাপ হবে। কথা দিলে কথার মান রাখতে হয়।

বালক কাতর স্বরে বলে—আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে কর্তা।

সুধন্যা রায়—বল, কি খেতে চাও?

বালক—কথা দিন, যা খেতে চাইবো তা-ই দিতে পারবেন।

সুধন্য রায়—এই গ্রামের শস্যক্ষেত্র হতে সংগ্রহ করা যায়, এমন কোন বস্তু চাইলে আমি অবশ্যই এনে দেবো।

বালক বলে—দেখেছি, আপনার এই বাড়ির বাইরে দুয়ারের সামনেই কলাইয়ের ক্ষেতের উপর একটি বাছুর দাঁড়িয়ে আছে। ঐ বাছুরের মাংস খেতে চাই।

ভ্রূকুটি করেন সুধন্য রায়—চতুরতা করো না বালক। গোবৎস সংহার করতে আমি পারি না, সেকথা তুমি জানো। অন্য বস্তু প্রার্থনা করো।

—আপনি আপনার কথা রাখতে পারলেন না, আমায় ছেড়ে দিন।

—কি বললে?

—আমি আপনার কথা বিশ্বাস করতে পারছি না। আমার রুগ্না মাকে সুস্থ করবেন বলে যে কথা দিয়েছেন আপনি, সে কথা আপনি রাখতে পারবেন না। আপনি কথার মান রাখতে জানেন না, পারেনও না।

—চুপ কর বাচাল বালক!

বালকের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ ক'রে দিয়ে যেন প্রচণ্ড একটি শব্দ হঠাৎ আছাড় খেয়ে পড়ে। দ্বার বন্ধ ক'রে দিলেন সুধন্য রায়। কপাটের উপর কান রেখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। শুনতে পান সুধন্য রায়, ভিতর থেকে ছোট ছোট দুটি দুর্বল হাতের আঘাত ছটফট ক'রে বাজছে কপাটের বুকে। মনে হয় সুধন্য রায়ের, তাঁর সঞ্চিত অর্থের জীবন্ত হৃৎপিণ্ড শব্দ করে বাজছে। বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে তাঁর এই সঞ্চিত অর্থের স্তূপ।

তারপর ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে কক্ষান্তরে গিয়ে উপবেশন করলেন সুধন্য রায়। অস্তমিত হয় আকাশের সূর্য, সন্ধ্যাকাশের ললাটও অন্ধকারে ঢাকা পড়ে। ঘনিয়ে আসে রাত্রি।

নিঃশব্দে বসে থাকেন সুধন্য রায়। অকস্মাৎ অনুভব করেন, আজ আর স্বর্ণমুদ্রার ঝংকার শুনতে হবে না। কাজ ফুরিয়েছে জীবনের। সারা জীবনের সঞ্চিত সব আনন্দের স্তূপ নিরাপদ অক্ষয় ও চিরস্থায়ী হয়ে গিয়েছে। এখন শুধু প্রতীক্ষা আর প্রতীক্ষা।

কি দুঃসহ এই প্রতীক্ষা! মৃত্যুর পদশব্দ শোনবার জন্য প্রতি মুহূর্ত উৎকর্ণ হয়ে থাকতে হবে। কে জানে কেমন সেই শব্দ, ভয়াল কিংবা করাল! মৃত্যুর ছায়া দেখবার জন্য দুই চক্ষু অপলক ক'রে বসে থাকতে হবে। কে জানে কেমন সেই ছায়া, বিকট কিংবা বীভৎস? উৎকট এক সন্ত্রাসের দংশনে মৃতপ্রায় হয়ে ধুকপুক করে সুধন্য রায়ের প্রাণ।

কিন্তু আর প্রতীক্ষা ক'রে থাকতে হয়নি। হঠাৎ এক শব্দের বজ্র যেন ফেটে পড়লো সুধন্য রায়ের বুকের পাঁজরের উপর। দূর শ্মশানের বক্ষ হতে বায়ুবাহিত হরিধ্বনি নয়, বেজে ওঠে রাত্রিচর ফেরুপালের চিৎকার এবং সেই শব্দের আঘাতেই হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল সুধন্য রায়ের অর্থগৃধ্নু হৃৎপিণ্ড।

যেখানে ছিল সুধন্য রায়ের সেই স্তূপীকৃত অর্থরাশির গুপ্তভাণ্ডার, সেখানে আজ ছলছল করে এক দীঘির জল। কে জানে কবে, কালের কোন্ বিদ্রূপে ক্ষুধার্ত মাটির আরও গভীরে তলিয়ে গেল সুধন্য রায়ের ধনরত্নের ভাণ্ডার। দিনের আলোকে যখন পানকৌড়ির দল ডুব-সাঁতার দিয়ে দীঘির জলে খেলা করে, তখন এই দীঘির দিকে তাকালে কখনো এ সন্দেহ হয় না যে, এক নিরীহ দরিদ্র বালকের আর্তনাদ সমাহিত হয়ে রয়েছে এই দীঘিরই জলের গভীরে।

মাঝে মাঝে, শব্দহীন গভীর রাতের অন্ধকারে যখন দীঘির কিনারায় ঘুমন্ত গাছের পাতায় পাতায় জোনাকির দল ঝিকঝিক করে, তখন একটি ছায়া ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ায় দীঘির কিনারায়। লোকে বলে, সুধন্য রায়েরই ছায়াময় প্রেতশরীর এসে লুব্ধ দৃষ্টি তুলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর, সেই গুপ্ত ধনরত্নের স্তূপের কাছে যাবার জন্য ক্ষুধার্ত বন্য প্রাণীর

মতই ক্রুব সাহসে অতি কঠিন মূর্তি ধ'রে ধীরে ধীরে জলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু দীঘির জলের গভীর বক্ষ হতে হঠাৎ ধ্বনিত হয় অতিকরুণ এক আর্তনাদ—নিদ্রাহীন এক যখের আর্তনাদ। সেই শব্দে হতাশ হয়ে আর ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় সুধন্য রায়ের প্রেতচ্ছায়া।

কবি রূপ ঠাকুর

মধুর কীর্তন সঙ্গীতের গায়নী রীতির মধ্যে নতুন মধুরতা এনেছিলেন যিনি, তাঁর নাম রূপচাঁদ অধিকারী। ঢপ কীর্তনের প্রবর্তক কবি রূপচাঁদ। আজ থেকে প্রায় দেড় শত বছর আগে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে কবি রূপচাঁদের কণ্ঠ। কিন্তু সেই কণ্ঠের দান, ঢপ নামে সেই গায়নী ভঙ্গী আজও সুস্বরমুখর ক'রে রেখেছে বঙ্গভূমির গীতিকুঞ্জ। কবি রূপচাঁদের সাঙ্গীতিক রীতিকে আশ্রয় ক'রে একদিন অনেক গায়ক অনেক সুরমধু সিঞ্চন করেছিলেন, আর মিষ্টি হয়ে উঠেছিল বাংলার পিপাসিত মনের মাটি। অঘোর দাস, শ্যাম বাউল, আর মধু কানের জীবন বিদায় নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে কবে, কিন্তু তাঁদের গানের রেশ আজও বাজে পল্লীর কণ্ঠে-কণ্ঠে আর অন্তরে। বিস্ময়ের বিস্ময়, ঢপ কীর্তনের যিনি প্রবর্তক, সেই কবি ও গায়ক রূপচাঁদের রচিত কোন একটি কীর্তনপদের ভণিতাও আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রথম যিনি গাইলেন ঢপ, তাঁরই গানের ভাষা লুপ্ত হয়ে গেল, এই রহস্য সত্যই এক রহস্য।

সুকণ্ঠস্বর ভক্তি আর সুরকুশলতা, এই তিনটি গুণেরই অধিকারী হয়েছিলেন রূপচাঁদ অধিকারী। হাটবাজারের শোরগোল আর বেচাকেনার ব্যস্ততাও থেমে যেতো যখন রূপচাঁদ এসে হাটের পাশে বটের ছায়ায় বসতেন, আর হাতের একতারাটি কানের কাছে তুলে নিজের মনে গাইতেন গান। যাত্রীর নৌকা ঘাট ছেড়ে চলে যেতে গিয়েও থেমে যেতো, আর উৎকর্ণ হয়ে শুনতো যে, গান গাইছেন কবি রূপচাঁদ ঠাকুর। সান্ত্বনা লাভের জন্য শোকার্ত এসে দাঁড়াতো কবি রূপের ঘরের দুয়ারে। শুনতো গান এবং তারপরেই চোখ মুছে ফিরে যেতো ঘরে। গঙ্গার এপার আর ওপার হতে, দূরের আর বহুদূরের জনপদ থেকে ছুটে আসতো কৃষ্ণনামপিপাসী মানুষ। শুনেছে সকলেই, সুধা আছে কবি রূপচাঁদ ঠাকুরের কণ্ঠস্বরে এবং ঐ কণ্ঠের নামগান একবার না শুনলে তৃপ্ত হবে না পিপাসা।

পলাশীর মাঠে ক্লাইভের তোপ যেদিন গর্জন ক'রে উঠেছিল, তারও প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে পলাশীর ছয় ক্রোশ উত্তরে আজকের বেলডাঙা নামে পরিচিত পল্লীর ক্রোড়ে জন্ম লাভ করেছিলেন কবি রূপচাঁদ অধিকারী। এবং পলাশীর মাঠে ক্লাইভের তোপ শান্ত হয়ে যাবার পরে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত গানের জীবন যাপন ক'রে আশি বছর বয়সে কালগ্রাসে তিরোহিত হয়েছিলেন তিনি। বেলডাঙার নিকটেই আজও সে-কালের চিহ্ন ধারণ ক'রে রয়েছে ফরিদতলা। পীর ফরিদ সাহেবের দরগার নিভৃতে এক সমাধির তলে নীরব হয়ে রয়েছেন সিরাজের সেনাপতি মীরমদন। পলাশীর সেই আম্রকানন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। আজ আর বেলডাঙার মাটিতে খুঁজে পাওয়া যায় না ফতেচাঁদ জগৎশেঠের প্রাসাদের কোন চিহ্ন। কিন্তু কবি রূপ ঠাকুরের ভিটাটি আছে।

এই ভিটা যেন দেড় শত বছর আগের এক সঙ্গীতের সমাধি। এই ভিটা আজ নিজে নীরব হয়ে শুধু শুনছে বৈশাখী ঝড়ের আর শ্রাবণী ধারার সঙ্গীত। আজ এই ভিটার দিকে তাকিয়ে কল্পনাও করা যায় না যে, একদিন এখানে গীতমুখর হয়ে উঠতো সমাগত গুণী ও কবির সভা। আজ এখানে সেঁয়াকুল আর কাঁটাকরঞ্জের ঝোপঝাপের মধ্যে অপরাজিতা লতার

গায়ে কখনো বা ফুটে ওঠে ফুল, যেন এক অবহেলার বেদনা হঠাৎ নীল হয়ে ফুটে ওঠে। কিন্তু এমন একদিন ছিল, যেদিন এই স্থানেরই এক সুন্দর গৃহবাটিকার দ্বারের লতাবিতানে ফুটে থাকতো শুভ্র গন্ধপুষ্পের স্তবক, আর সেই পুষ্পেরই মাল্য কণ্ঠে ধারণ ক'রে, হরিনাম উচ্চারণ ক'রে এবং গুরুদত্ত একতারাটি হাতে নিয়ে কবি রূপচাঁদ দূর গ্রামের আমন্ত্রণ রক্ষার জন্য যাত্রা করতেন।

দূর গ্রামের এক ভক্তসভায় গান গাইবার জন্যই সেদিন চলেছিলেন কবি রূপচাঁদ। চৈত্র মাসের ভোরের শিশির শুকিয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ আগে, খরতর হয়ে উঠেছে খোলা মাঠের রোদ। যেতে যেতে পথপ্রান্তের এক দীঘীর কিনারায় এক ছায়াময় বৃক্ষ দেখতে পেয়ে বিশ্রামের জন্য থামলেন কবি রূপচাঁদ। অদূরে একটি কুটীর দেখা যায়। দেখে মনে হয়, কোন সুখী গৃহীরই কুটীর।

দীঘীর কিনারায় বৃক্ষের শীতল ছায়ায় উপবেশন ক'রে দেহ স্নিগ্ধ হলেও কবি রূপচাঁদের মন যেন হঠাৎ বেদনায় বিচলিত হয়ে উঠলো। বুঝলেন কবি রূপচাঁদ, ভুল ধারণা করেছেন তিনি। ঐ কুটীর সুখী গৃহীর কুটীর নয়, কারণ অতি বিষণ্ণ ও করুণ নারীকণ্ঠের কান্নার ক্ষীণস্বর ঐ কুটীরের ভিতর থেকেই বাতাসে ভেসে আসছে।

শুনতে পেয়ে বিষণ্ণ এবং ব্যথিত হয়ে উঠলো কবি রূপচাঁদের মন। কে কাঁদে? কিসের দুঃখ?

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসেছিলেন কবি রূপচাঁদ, তার পরেই হাতের একতারাটি কানের কাছে তুলে নিলেন। গাইলেন গান—ধৈরয ধর শ্যামপিয়ারী।

দীঘির পদ্মপত্রে জলের ফোঁটা চিকচিক করে। সেইদিকে তাকিয়ে যেন কুটীরবাসিনী এক অপরিচিতার অশ্রুসজল মুখের ছবিটিকেই দেখছিলেন কবি রূপচাঁদ। কে জানে, কিসের দুঃখে কাঁদছে এই নারী। শোক, অপমান, ব্যাধি, আঘাত অথবা আশাভঙ্গ? যা-ই হোক, সেই অদূরবর্তিনী অপরিচিতার উদ্দেশেই যেন স্নিগ্ধ সান্ত্বনার উপহারের মত এই গানের ভাষা আর সুর পাঠিয়ে দিলেন কবি রূপচাঁদ। ধৈরয ধর শ্যামপিয়ারী, কবি রূপচাঁদের গলার এই গান শুনতে পেলে কি পৃথিবীর কোন কান্না এক মুহূর্তের জন্যও শান্ত না হয়ে থাকতে পারে?

শান্ত হলো কুটীরের কান্না। এবং কবি রূপচাঁদও জানেন না, কখন থেমে গিয়েছে কান্না। তখনো একমনেই দুই চক্ষু দীঘির পদ্মপত্রের জলবিন্দুলেখার দিকে নিবদ্ধ ক'রে গান গাইছিলেন রূপচাঁদ। হঠাৎ চমকে উঠলেন পদশব্দ শুনে।

প্রিয়দর্শিনী এক তরুণী ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে কবি রূপচাঁদের সম্মুখে উপবেশন করে, আর চোখের জল মুছে, অপার বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় আকুল দুই চোখের দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে গীতাবিষ্ট কবি রূপচাঁদের মুখের দিকে।

বিব্রতভাবে প্রশ্ন করেন কবি রূপচাঁদ—কে আপনি?

নারী বলে—আমি ঐ কুটীরেরই মেয়ে।

কবি রূপচাঁদ—আপনিই কি কাঁদছিলেন?

নারী—হ্যাঁ।

কবি রূপচাঁদ—কেন কাঁদছিলেন?

নারী বলে—আপনি প্রতিশ্রুতি দিন, আমাকে আপনার শিষ্যা ব'লে গ্রহণ করবেন?

রূপচাঁদ বলেন—আমার শিষ্যা হবার চিন্তা কেন দেখা দিলো তোমার মনে?

নারী—জীবনে শান্তি পেতে চাই ঠাকুর।

রূপচাঁদ—আমার শিষ্যা হলে জীবনে শান্তি পাবে, এই কথাই বা তোমার মনে হলো কেন?

নারী—আপনার গানে দূর হয়ে গিয়েছে আমার মনের বেদনা আর আক্ষেপ! আপনার

কণ্ঠের সব গান আর সব সুর সম্বল ক'রে এই জীবন শান্তিতে পার ক'রে দিতে চাই গুরু।

হেসে ফেললেন কবি রূপচাঁদ।—কিন্তু বলো দেখি মেয়ে, কিসের দুঃখে শান্তি হারিয়েছে তোমার জীবন?

চুপ ক'রে থাকে অপরিচিতা তরুণী।

কবি রূপচাঁদ ঠাকুর বলেন—তুমি আমাকে গুরু ব'লে সম্বোধন করেছো, তুমি আমার কন্যাসমা। আমার কাছে তোমার জীবনের দুঃখের কথা প্রকাশ করাই উচিত।

কবি রূপচাঁদকে প্রণাম ক'রে তরুণী বলে—আমার নাম মুক্তালতা। এক ডাকাত আমাকে ভালোবাসে। আর, আমিও সেই ডাকাতকে ভালোবাসি।

রূপচাঁদ—তবে আর সমস্যা কিসের?

মুক্তালতা—কিন্তু দস্যুর ঘরনী হতে মন চায় না।

রূপচাঁদ—এর অর্থ?

মুক্তালতা—আমার মন চায়, সে-মানুষ দস্যুবৃত্তি ছেড়ে দিক। তারপর তার বধূ হতে আমার কোন আপত্তি থাকবে না।

কেঁদে ফেলে মুক্তালতা। এই আমার জীবনের সমস্যা। দস্যুকে ভালোবেসেছি, কিন্তু তার ঘরনী হতে পারছি না। এই বেদনার জীবন থেকে আমি এইবার আলগা হয়ে যেতে চাই। আপনি কৃষ্ণ-নামগানের দীক্ষা দিন আমাকে।

মুক্তালতার মুখের দিকে তাকিয়ে কবি রূপচাঁদ প্রশ্ন করেন—সে দস্যু যদি দস্যুবৃত্তি ছেড়ে দেয়, তবে?

প্রশ্ন শুনে অপ্রস্তুত হয়ে নীরবে তাকিয়ে থাকে মুক্তালতা।

হাসতে থাকেন কবি রূপচাঁদ। তার পরেই মুক্তালতার মাথায় হাত রেখে বলেন—যাও, এখন ঘরে যাও মুক্তালতা। আশীর্বাদ করি, মনের মত পতি লাভ করো।

উঠে দাঁড়ায় মুক্তালতা।

কবি রূপচাঁদ জিজ্ঞাসা করেন—দস্যুর নামটি শুধু আমাকে বলে দিয়ে যাও।

মুক্তালতা বলে—তার নাম নয়ানদাস।

ঘরে ফিরে গেল মুক্তালতা। কবি রূপচাঁদও গ্রামান্তরের উদ্দেশে আবার যাত্রা শুরু করলেন। কিন্তু দেখতে পাননি এবং কল্পনাও করতে পারেননি কবি রূপচাঁদ, এক দস্যুর ক্রুদ্ধ চক্ষুর দৃষ্টি তখন অন্তরাল হ'তে তাঁকে অনুসরণ করছে।

সে দস্যুর নাম নয়ানদাস। মুক্তালতার প্রণয়ী নয়ানদাস। মুক্তালতার পিতাকে বহু অর্থ দিয়ে বশীভূত করেছে নয়ানদাস এবং মুক্তালতার পিতাও তাঁর কন্যাকে দস্যু নয়ানদাসের সঙ্গে বিবাহ দিতে অনেক দিন থেকেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। আপত্তি শুধু মুক্তালতার। নয়ানদাসের প্রতি প্রস্তাবেই মুক্তালতা শুধু বলেছে—দস্যুবৃত্তি ছাড়ো। তা না হলে আমাদের বিয়ে হতে পারে না।

সন্দেহ করেছে নয়ানদাস—বুঝতে পারছি মুক্তা, তোমার ভালোবাসা নিতান্তই মিথ্যা।

মুক্তালতা বলেছে—একটুও মিথ্যা নয়।

মুক্তালতার এই কথাতেও কিছু সন্দেহ থেকে যেতো নয়ানদাসের মনে। সেই সন্দেহই ভয়ংকর হয়ে জ্বলে উঠলো এইবার। আজ অন্তরালে দাঁড়িয়ে স্বচক্ষেই দেখতে পেয়েছে নয়ানদাস, দীঘির কিনারায় সুন্দর এক যুবাপুরুষের মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে সঙ্গীত শুনছে মুক্তালতা। গোপনে এক গানের মানুষকে হৃদয় দান করেছে, তাই তো দস্যুর ভালোবাসাকে এত সহজে তুচ্ছ করতে পেরেছে মুক্তালতা।

বস্ত্রের আড়ালে শাণিত অস্ত্র লুকিয়ে মূঢ় দস্যু নয়ানদাস এগিয়ে চলে। মুক্তালতার প্রণয়ী ঐ সঙ্গীতের প্রাণীটিকে একটি আঘাতে শেষ ক'রে দিয়ে জীবনের প্রণয়পথের বাধা আজ

নিশ্চিহ্ন করবে নয়ানদাস। কবি রূপচাঁদের দিকে লক্ষ্য রেখে হিংস্র আগ্রহের এক ভয়ংকর প্রতিমূর্তির মত চলতে থাকে নয়ানদাস। এবং প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার সুযোগও পেয়ে গেল।

তখন অপরাহ্নের আলো ম্লান হয়ে এসেছে। বৃক্ষবহুল এক ঘন অরণ্যের কিনারা ধ'রে ধীরে ধীরে যাচ্ছিলেন কবি রূপচাঁদ। শাণিত অস্ত্র উদ্যত ক'রে এক লাফে এগিয়ে এসে কবির পথরোধ করে ডাকাত নয়ানদাস। হিংস্র বাঘের মতই যেন থাবা তুলে দাঁড়ায়, কবিকে টেনে নিয়ে অরণ্যের ভিতরে চলে যায়।

কবি রূপচাঁদের দুই হাত বন্যলতা দিয়ে শক্ত ক'রে বেঁধে দিয়ে প্রস্তুত হয় নয়ানদাস। হত্যা করার জন্য অস্ত্র তুলতেই কবি রূপচাঁদ বলেন—একটা জিজ্ঞাস্য আছে।

—বল।

—আমার সঙ্গে যে সামান্য অর্থ আছে, তা সবই তো পেলেন, তবে আর আমাকে হত্যা করবার প্রয়োজন কি?

নয়ানদাস বলে—আমার দস্যুতার রীতিই এই।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকেন রূপচাঁদ। তারপর বলেন—একটি অনুরোধ আছে।

—বল।

—আপনার নামটি জানতে চাই।

নয়ানদাসের কঠোর দৃষ্টিতে শাণিত ছুরিকার মত হিংসুক বিদ্রূপ চিকচিক করে। দাঁতে দাঁত ঘষে নয়ানদাস বলে—আমার নাম তো তোর জানাই আছে রে শয়তান, কিন্তু আমাকে জানতে পারিসনি।

—কে আপনি?

—আমি তোর যম নয়ানদাস।

কবি রূপচাঁদের শান্ত দুটি চক্ষু হঠাৎ চমকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। রূপচাঁদ বলেন—আর একটি অনুরোধ আছে।

—বল।

—একটু অপেক্ষা করুন। আমাকে একটু সময় দিন।

—কেন?

—আমি গানের মানুষ, মৃত্যুর পূর্বে জীবনের শেষবারের গান গেয়ে যাই।

নয়ানদাস ভ্রূকুটি ক'রে বলে—তাই হোক, অপেক্ষা করছি।

গান গাইলেন কবি রূপচাঁদ। দস্যু নয়ানদাসের শাণিত অস্ত্রের দিকে তাকিয়ে সেদিন অবিচলিতচিত্তে ও শান্তভাবেই গান গেয়েছিলেন ঢপ কীর্তনের প্রবর্তক কবি রূপচাঁদ অধিকারী।—আওয়ে বিপিন পথে বনমালী!

কবি রূপ ঠাকুরের গান শুনতে থাকে ডাকাত নয়ানদাস। বিপিন পথে চলেছেন মুরালীধারী শ্যাম। প্রেমজরজরহিয়া অভিমানিনী রাধা এখন যমুনার নীল জলে গাগরি ভাসিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উৎকর্ণ হয়ে রয়েছে বৃষভানুনন্দিনী, আর কতক্ষণ, এখনো কেন বেজে উঠছে না বাঁশি?

গান শুনতে শুনতে কখন দু'চোখ জলে ভ'রে উঠেছে, তা'ও বুঝতে পারেনি দস্যু নয়ানদাস। এ কেমন গান? এ কি অদ্ভুত গান!

হঠাৎ হাতের অস্ত্র দূরে ছুঁড়ে ফেলে নয়ানদাস, কবি রূপচাঁদের হাতের বাঁধন খুলে দেয়, অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়, তার পরেই ছটফট ক'রে ব'লে ওঠে—পালিয়ে যাও, আর এক মুহূর্তও আমার চোখের সামনে থেকো না।

রূপচাঁদ—আমাকে পালিয়ে যেতে বলছেন কেন?

নয়ানদাস—চলে যান, আর কোন বাধা দেবো না। আমি হার মেনে নিলাম।

মৃদু হাসির আভা ফুটে ওঠে রূপচাঁদের মুখে।—কিসের হার মেনে নিলেন, কেন হার মেনে নিলেন নয়ানদাস?

নয়ানদাস—আপনার গলার গান আমার হাতের অস্ত্রের চেয়ে অনেক বেশি নিষ্ঠুর।

চোখের জল মুছে নিয়ে অসহায়ের মত করুণভাবে রূপচাঁদের মুখের দিকে তাকায় নয়ানদাস।—আপনি জয়ী হয়েছেন, আপনার জয় হওয়াই উচিত। মিষ্টি গানের মানুষকে ছেড়ে দিয়ে এই হিংস্র অস্ত্রের মানুষকে কেউ ভালোবাসতে পারে না। সে কোন দোষ করেনি, সে কোন ভুল করেনি। আমারই ভুল হয়েছে।

প্রীতিবিহ্বল স্বরে রূপচাঁদ ডাকেন—নয়ানদাস!

বনের গাছের ছায়ার দিকে আনমনার মত তাকিয়ে কি-যেন চিন্তা করে নয়ানদাস, তারপরেই কবি রূপচাঁদের নিকটে এগিয়ে এসে প্রার্থীর মতই দুই হাত জোড় ক'রে আবেদন জানায়—আপনার জয় একেবারে সম্পূর্ণ ক'রে দিতে চাই। আপনি অঙ্গীকার করুন, আমার এই ইচ্ছা পূরণ করবেন!

বিস্মিত হয়ে রূপচাঁদ বলেন—আপনার কথার অর্থ বুঝতে পারছি না নয়ানদাস।

নয়ানদাস বলে—দস্যুর জীবন এখানেই আজ শেষ ক'রে দিতে চাই।

চমকে উঠে রূপচাঁদ বলেন—ছিঃ, কখনই না।

নয়ানদাস হাসে—দস্যুতার জীবন শেষ ক'রে দিতে চাই কবি। আপনার ঐ গানের দীক্ষা দিন আমাকে, আপনি আমার গুরু। নামগান সম্বল ক'রে এইবার সংসার থেকে দূরে সরে যেতে চাই।

রূপচাঁদ প্রসন্নহাস্যে বলেন—হ্যাঁ, শিষ্য করতে পারি তোমাকে, কিন্তু একটি সর্তে।

—আজ্ঞা করুন।

—যদি সংসারে থাকো, তবেই আমি আমার গানের দীক্ষা তোমাকে দেবো। যদি আমার শিষ্যা মুক্তালতাকে...।

চমকে ওঠে দস্যু নয়ানদাস—কি বললেন ঠাকুর?

হেসে ওঠে রূপচাঁদ—যদি আমার শিষ্যা মুক্তালতাকে তোমার জীবনসঙ্গিনী ক'রে নাও, তবে আমি আমার গানের দীক্ষা দেবো তোমাকে।

কবি রূপচাঁদের মুখের দিকে বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে থাকে নয়ানদাস। তার পরেই বিস্ময়ের আর শ্রদ্ধার আবেগে চিৎকার ক'রে ওঠে ডাকাত নয়ানদাস—ক্ষমা করুন ঠাকুর।

রূপচাঁদ—কেন?

কবি রূপচাঁদকে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়ায় এবং অশ্রুসজল চোখে নয়ানদাস বলে—আমার পাপমনে অনেক ভুল ছিল ঠাকুর।

যেন ক্ষমার স্পর্শ লাভ করার জন্যই কবি রূপচাঁদের সম্মুখে মাথা পেতে দাঁড়িয়ে থাকে নয়ানদাস।

কবি রূপচাঁদ বলেন—আগে হাত পাতো নয়ানদাস।

হাত পাতে নয়ানদাস এবং কবি রূপচাঁদ তাঁর গানের পুঁথি ঝুলি থেকে বের ক'রে নয়ানদাসের হাতে তুলে দিয়ে বলেন—এই নাও, আমার শিষ্যা মুক্তালতার বরকে যৌতুক দিলাম।

ধৈরয ধর শ্যামপিয়ারী, ঐ গান আজও শোনা যায় পল্লীর কণ্ঠে। লোকে জানে, এই গান হলো নয়ানদাস নামে অতীতের কোন এক ভক্তের রচনা। গঙ্গার ওপারে তালিবপুরের নিকটে সেদিন পর্যন্ত দাসোপাধিক কয়েক ঘর পরিবারের বাস ছিল। লোকে জানতো, এঁরাই হলেন সেই নয়ানদাসের বংশধর, যে নয়ানদাস একদিন কবি রূপচাঁদের গান শুনে দস্যুবৃত্তি বর্জন

করেছিলেন।

নয়ানদাসের বংশধরেরাও আজ আর নেই। যতদিন তাঁরা ছিলেন, ততদিন বেলডাঙার কবি রূপচাঁদের ভিটাও তাঁদের কাছ থেকে এক বিচিত্র প্রথায় শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছে। এই পরিবারের ছেলে বা মেয়ের বিয়েতে বরণডালা সাজাবার জন্য নানা উপকরণের সঙ্গে সংগ্রহ ক'রে আনতে হতো বিশেষ একটি উপকরণ, মাটির একটি ঢেলা, কবি রূপ ঠাকুরের ভিটার মাটি। যে কবির গানের পুণ্যে সফল হয়েছিল মুক্তালতা আর নয়ানদাসের প্রেম, সেই কবির স্মৃতিকেই দু'শো বছর ধ'রে শ্রদ্ধা জানিয়েছে এই প্রথা।

সেই কবির ভিটা আজও পড়ে আছে বেলডাঙার এক নিভৃতে। ভিটার মাটিতে শুধু নীল অপরাজিতা নীরবে ফোটে আর নীরবে ঝরে যায়। শুভ বিবাহের বরণডালা সাজাবার জন্য সেই ভিটার মাটি নিতে আজ আর কেউ আসে না।

রম্যরচনা

সাতপাঁচ

মধুমালার দেশ

"স্বপ্নে দেখেছি আমি মধুমালার দেশ।"

এ যুগের শ্রেষ্ঠ ছন্দোবদ্ধগ্রন্থগীত সম্মুখে রয়েছে সারি সারি। পাতা উল্টিয়ে পড়ি, আবৃত্তি করি। বিচিত্র কল্পনা, ভাব, ভাষা ও ছন্দের বৈভবে মন আত্মহারা হয়। বাস্তবতার শাসন দীর্ণ করে মন যেন অরূপলোকে উত্তীর্ণ হয়। কল্প কল্পান্তরের আবেগ শরীরী হয়ে সম্মুখে আসে। যা অনির্বচনীয়, যা অধ্যেয়, তাই যেন প্রত্যক্ষের আনাচে কানাচে মুখর হয়ে ওঠে, বর্ণভূষা সৃষ্টি করে।

যে কবিতাই পড়া যাক্ না কেন, যদি সেটা সত্যিই কবিতা হয়, তবে তার মধ্যে এমন কোন গুণ থাকবে যার আবেদন শুধু যুক্তি ও বুদ্ধির ওপর পড়ে না। সঙ্গে সঙ্গে কল্পনার সাযুজ্য তাকে লাভ করতেই হবে। যার প্রসাদে একটা রূপের আশ্রয় পাওয়া যায়। বস্তু ও ভাব পরিবেশন করেই শুধু কাব্য ও শিল্পের কর্তব্য শেষ হয় না। সমস্ত ছাড়িয়ে পৌঁছতে হবে রূপে। ভাব ভাষা ছন্দ ও বিষয়, সব কিছুই লুব্ধ চঞ্চল ভ্রমরের মত এই বাঞ্ছিত রূপের মুদ্রিত পদ্মটির চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শিল্প, কাব্য সাহিত্য, কথাসাহিত্য—সবারই লক্ষ্য এই রূপ। রসিক পাঠককে যে শিল্প ও সাহিত্য এই রূপলোকে হাত ধরে নিয়ে যেতে সক্ষম নয়, সে সাহিত্য সাহিত্যই নয়, সে কাব্য কাব্য নয়, সে কথা কথা নয়।

* * * *

তাই নতুন যুগের কাব্য সাহিত্য পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে ক্লান্ত মস্তিষ্কে স্বপ্নে দেখি মধুমালার দেশ। জ্যোৎস্নারাতের বনান্ত দেশের মত সেই আমাদের রূপকথার জগৎ। যে জগতের রূপ ছেলেবেলা থেকে প্রত্যেক শিশু শ্রুতিধরের মত শুনে শুনে নিজের কল্পনার সিন্দুক পূর্ণ করেছে, বড় হয়ে সঁপে দিয়েছে শিশু পরপুরুষের কাছে। বিনা অক্ষরে বিনা পুঁজিতে এই রূপকথা কত পুরুষ ধরে আমাদের মানসলোকে প্রবাহিত হয়ে আসছে জানি না। রূপকথার এই প্রাণশক্তির, এর অফুরান ঐশ্বর্যের কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। মানুষ সভ্য হচ্ছে, জ্ঞানী হচ্ছে, অনুশীলন ও বিশ্লেষণে নিপুণ হচ্ছে, ঐতিহ্য ও সংস্কারকে ঝাড়া দিয়ে পুরাতন নির্মোকের মত ফেলে দিচ্ছে। আজকের সাহিত্য কাল অচল হয়ে যায়। কত পুরাণ, মহাকাব্য ও গীতিকা সাগর লহরী সমান জনমি পুনঃ মিলিয়ে যাচ্ছে। কত শাস্ত্র, নীতিকথা, দোঁহা, স্তোত্র ও মন্ত্র সাধক ও কবির মুখে রচিত হলো, দেশ বা জাতির সমাজ ও সম্প্রদায় বিশেষে তার স্থান হলো। কিন্তু কত দিন? কটা যুগ শেষ না হতেই তা মিলিয়ে গেল জলের তিলকের মত। কত ছান্দসিক ও বৈয়াকরণিক এ কাব্যকে অলঙ্কৃত করেছে, সুসংস্কৃত করেছে, কিন্তু মহাকালের পরীক্ষায় তা লোকময় হয়ে টিকে থাকতে পারে নি। যদি কেউ বলেন, কবি কালিদাস অমর, সে কথা সত্য বলে স্বীকার করতে পারবো না। কালিদাসকে ক'বছরের মধ্যেই মেরে ফেলা যায় যদি অক্ষর ও লিপি অর্থাৎ লিখন কলাকে নিঃশেষ করে ফেলা হয়। কালিদাসের অমরতার মন্দির দাঁড়িয়ে আছে কাগজে কলমে লেখা কাব্যগ্রন্থের ভূমির ওপর। সে ভিত্তি যদি ভাঙে তবে কালিদাসের কাব্যের অমরতাও ভাঙবে। অন্যপক্ষে দেখি আমাদের রূপকথা সাহিত্যের এই অস্থূল প্রাণাশ্রয়ী ও লোকোত্তর শক্তি। সে কথার রূপ প্রখর জ্যোতিষ্কের মত কালের আকাশে বিনা নির্ভরে ভেসে আসছে যুগ যুগ ধরে।

* * * *

প্রথম নিঃশ্বাসের মত প্রত্যেক শিশু এই রূপকথার প্রসাদ গ্রহণ করে তার সমস্ত সত্তা

দিয়ে। সমস্ত জীবনে তাকে সে আর ঠেলতে পারে না। তাই মধুমালার দেশ স্বপ্নে আজও দেখা দেবে, তাতে আশ্চর্যের কি আছে?

কারা ছিল সেই কথাকার? কথাকে এত রূপ দিয়েছিল, কোন্ কবি? কে তাদের নাম জানে? কোথায় তারা কুড়িয়ে পেয়েছিল এই স্বপ্নচ্ছবি? এই অপূর্ব অদ্ভুত পুরাতন মেঘদূতের মহিমা আজও অম্লান।

সাত ভাই চম্পা জাগো রে! পারুল দিদির ডাকে সাড়া দাও। রাজার মালী ফুল তুলতে এসেছে। দিও না দিও না ফুল। রাজা এসেছে, চলে যাক্, সুয়োরাণী এসেছে চলে যাক্। এবার আসছে দুয়োরাণী দুঃখিনী ; সাত ভাই আর বোনের মা। সাতটি চাঁপা ও পারুল ঝাঁপিয়ে পড়লো মায়ের বুকে।

রূপকথার এও আলেখ্য যে রচেছিল সেই অজ্ঞাত শিল্পীর প্রতিভাকে আজ প্রণতি জানাই। জানি অতিদূর বিস্মৃত দিবসের এই কবিগুরু আজ কোন স্মৃতিপটে নেই, কোন নির্মাল্য অর্ঘ্য সেখানে পড়ে না। তবে জানি কবিতা কল্পনা ও কথার সাহিত্যে এত বড় সৃষ্টির তুলনা পৃথিবীর সাহিত্যে বিরল।

* * * *

মধুমালার দেশে যে কল্পনার ফসল একদিন ফলেছিল তারই প্রসাদ আজও আমরা অকাতরে গ্রহণ করে কথাকে রূপদান করি। 'সোনার কাঠি' ও 'রূপার কাঠি'র রূপ যাদের কবিত্বের ইন্দ্রজালে সত্য হয়ে উঠেছিল, তাঁরা কি 'গেঁয়ো' কবি ছিলেন। সে সোনার কাঠি যুগের শত রুচিবিপ্লব উত্তীর্ণ হয়ে আজও ক্লাসিক গরিমায় প্রতিষ্ঠ রয়েছে।

পাতালপুরীর ঘুমন্ত রাজকন্যা, মালঞ্চমালা, কাঞ্চনমালা, পক্ষীরাজ আর সাপের মণি—এ রূপকথার জগৎ কাদের সৃষ্টি। মনে হয়, কোন প্রলয়ে সে জগৎ বুঝি নষ্ট হবে না কোন দিন। উপনিষদের জীবাত্মা আর পরমাত্মারূপী দুই পাখীর কথা পণ্ডিতেরাই বোঝে, সহস্র বৎসর পরে পণ্ডিতেরা হয় তো তাও ভুলে যাবে, কিন্তু রূপকথার দেশে বেঙ্গমা বেঙ্গমী গাছের ডালে বসে যে আলাপ করে গেল তার গুঞ্জরণ অনাহত ছন্দে এখনও বেজে চলেছে—রূপগ্রাহী মানুষের স্মরণের মধ্যে।

* * * *

তাই মনে হয়, শিল্প ও সাহিত্যে আমরা একান্ত মনে খুঁজছি শুধু এই একটি জিনিস—রূপ। সাহিত্যকে রিপোর্ট না হয়ে রূপকথা হতে হবে। আমরা দেখতে চাই আমাদের যুগের বেদনা আনন্দ সংসার সংগ্রাম শুধু ভাষা ও ছন্দের জোরে মুখর হবে না, শুধু ভাবের ভারে ঋদ্ধ হবে না, শুধু জ্ঞানঘন হবে না। তাকে রূপময় হতে হবে।

মহেঞ্জো-তরুণীর মৃত্যু

ধনধান্যে সমৃদ্ধ, হাসি আনন্দ কলরবে মুখরিত একটি নগর। শান-বাঁধানো বড় বড় রাস্তা, সমস্ত দিন পথ দিয়ে কর্মব্যস্ত নরনারীর আনাগোনা। হাতি ঘোড়া ও মানুষ-টানা বড় বড় রথের আকারে গাড়ি বোঝাই পণ্য সামগ্রী আসে আর যায়। বড় বড় অট্টালিকার বাতায়নপথে সঙ্গীতের সুশব্দ ও নৃত্যপরা ললনার নূপুর নিক্কণ শোনা যায়। বিচিত্র কারুকার্যে খচিত প্রত্যেকটি ভবনদ্বার। দূর সিরিয়া বাবিলন ও মিশর থেকে পণ্যসম্ভার নিয়ে শহরের সদাগর ছেলেরা বছর শেষে ঘুরে আসে। নরনারী প্রত্যেকের পরিপাটি বেশভূষা, গায়ে দামী পাথর ও ধাতুর তৈরি নানা অলঙ্কার ও আভরণ। এই নগরে অস্ত্রের ঝন্ঝনা শোনা যায় না। মানুষের

মনে রাজ্যজয়ের কোন তাড়না নেই,—তারা চায় সুখে ও শান্তিতে ভরা নিরুপদ্রব জীবন। কোন প্রাচীর বা পরিখা দিয়ে নগরকে ঘিরে রাখা হয়নি।

সেদিন ভোরে, সিন্ধুনদের পূর্বপ্রান্তে দেওদার বনে ঘুম-ভাঙা পাখির ডাকের সঙ্গে সূর্য উঠছে। অকস্মাৎ সারা নগরের বুক ভেদ করে এক আর্তনাদ বেজে উঠলো। দস্যুরা হানা দিয়েছে। পশ্চিম গিরিমালার সহস্র গুহাকন্দর ও বালুকাপ্রান্তর থেকে নানা ভয়ানক হিংস্র আয়ুধে সজ্জিত দস্যুর দল লুব্ধ জন্তুর মত এই সুসভ্য নগরের পথে ঘাটে অতর্কিতে এসে ছড়িয়ে পড়েছে। হত্যার উৎসবে লাল হয়ে উঠলো নগরের কঠিন পাথরের পথ। দস্যুরা আগুন লাগিয়ে দিল—নগরের সেই দারুময় শিল্পশোভা ভস্মে অঙ্গারে ঝরে পড়তে লাগলো।

* * * *

নগরের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী, এ তরুণী নটী। উৎসবরজনীর শেষে তার ক্লান্ত ঘুমন্ত দেহভার পড়েছিল নৃত্যকক্ষের মেজের ওপর। গায়ের আভরণগুলি খুলে রাখারও সময় হয়নি। হঠাৎ ঘরের সিঁড়িতে শোনা গেল উন্মত্ত দস্যুদের চীৎকার। একজন দস্যু একহাতে এসে ধরলো নটীর গলার মণিময় মালা, আর একজনের হাতের উদ্যত খড়গ নির্মমভাবে এসে আঘাত করলো তরুণীর অঙ্গে।

তরুণী দস্যুদলের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে রক্তাক্তদেহে ছুটে পালাচ্ছে। তার গলার হার ছিঁড়ে মণিশিলাগুলি খসে ঝরে পড়ছে পথের ওপর। পেছনে ধাবমান দস্যুরা উল্লাসে চীৎকার করে কুড়িয়ে নিচ্ছে তার দেহচ্যুত যত রত্ন আভরণ। তরুণী নটী তবু ছুটে পালাচ্ছে আশ্রয়ের জন্য, প্রাণরক্ষার জন্য।

বড় রাজপথের পাশে নেমে গেছে সরু একটা গলি। সেখান দিয়ে কিছুদূর গিয়ে একটা অন্ধকারময় মণ্ডপ। সেখান থেকে একটা পাথরের সিঁড়ি ধাপে ধাপে নেমে গেছে নীচে। সিঁড়ির শেষে একটা গোপন কুঠুরি, তার পাশেই একটি জলভরা কূপ।

এক আঁজলা ঠাণ্ডা জল খেয়ে তরুণী সেখানে বসে পড়লো। পেছনে উন্মত্ত দস্যুদের রব আর শোনা যায় না। ওপর দিকে তাকালে দেখা যায় পুঞ্জ পুঞ্জ ধূমকুণ্ডলী আকাশ ছেয়ে ফেলছে। সমস্ত নগর পুড়ছে।

এখনো দেহে প্রাণ আছে। তরুণী একবার চেষ্টা করলো, সে ওপরে উঠবে আবার। দেখবে সেই নিহত নগরের চিতাবহ্নি শান্ত হলো কি না। কিন্তু বৃথা! এক-পা দু'পা করে কয়েক সিঁড়ি ওপরে উঠেই তার শেষ নিশ্বাস বাতাসে মিশে গেল। নগরের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী সেই তরুণী নটী পড়ে রইল সেই সিঁড়িতে মাথা রেখে।

* * * *

তারপর, এক দুই তিন করে সাতটি হাজার বছর কেটে গেছে। কিন্তু তরুণী নটী তেমনি পড়ে রয়েছে সিঁড়িতে মাথা রেখে। আজও তাকে দেখতে পাওয়া যায়।

যে কাহিনী বলা হলো, তা আদৌ রূপকথা নয়। এটা ইতিহাসের কথা, আমাদেরই ভারতের ইতিহাস। অতীত ভারতের এক গৌরবময় যুগে, হঠাৎ একদিন এমনই এক ট্রাজেডি নেমে এসেছিল। এই কাহিনী কোন শিলালেখ বা তাম্রলেখে পাওয়া যাবে না। মাটি খুঁড়ে এই কাহিনীকে হাড়গোড় সুদ্ধ পাওয়া গেছে। প্রাগার্য ভারতের সভ্যতা অর্থাৎ সিন্ধুসভ্যতার লীলানিকেতন মহেঞ্জো-দাড়োর স্তূপ খনন করে এই তরুণী অস্থি আবিষ্কৃত হয়েছে। সাত হাজার বছর আগে সেই দুর্ভাগিণী ঠিক যেভাবে সিঁড়ির ওপর মাথা রেখে মরেছিল, আজও তাকে সেইভাবেই পাওয়া গেছে। হাঁটুটি এখনো যেভাবে রয়েছে, তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মরবার আগে সে হামা দিয়ে ওপরে ওঠবার চেষ্টা করেছিল। তার নাম ধাম গোত্র সঠিক জানা যাবে এমন কোন প্রমাণ সেখানে নেই। কোন্ দুঃসহব্যথা বা ঘটনা তার জীবনের এমন করুণ পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিল তা জানা যায় না। কিন্তু তার গায়ে অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন থেকে

এবং আরও নানা প্রমাণ থেকে বোঝা যায় যে, তার জীবনের ঐ ট্রাজেডির কাহিনী কল্পিত হলেও একান্ত অসম্ভব নাও হতে পারে।

* * * *

বড় বিস্ময়কর এই সিন্ধু সভ্যতা। দুঃখের বিষয় এত বড় একটি কীর্তির সম্বন্ধে কোন লিখিত পরিচয় কোথাও কিছু পাওয়া যায় নি। সিন্ধুনদের সারা উপত্যকা জুড়ে যে সভ্যতার বিস্তার ছিল, যে মানুষেরা দূর বাবিলন মিশরের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ রাখতো, যাদের শিল্পরুচি এত উন্নত ছিল, যারা এত উন্নত নগর পত্তন করার মত পূর্ততত্ত্ব আয়ত্ত করেছিল তাদের জীবনের ছবি শুধু আমরা কল্পনা করে নিই। তাদের নামধাম আচার ব্যবহার ভাষা পরিচ্ছদ—কোন কিছুরই বিশদ পরিচয় পাওয়া যায় না।

নাচের ছবি

ঝড়ের ফটো কেউ দেখেছেন কি? অনেকে নিশ্চয় দেখে থাকবেন। তবে ঝড়ের ফটো সচরাচর চোখে খুব বেশী পড়ে না।

কল্পনা করা যাক উনপঞ্চাশ বায়ু বল্গা ছেঁড়া ঘোড়ার মত প্রমত্ত হয়ে আকাশ জুড়ে দাপাদাপি করছে। ঈশানের পুঞ্জ মেঘ অন্ধ বেগে ধেয়ে আসছে দিগন্তের কাজল সমুদ্র থেকে। আর্ত চীৎকার ছেড়ে গ্রামান্তরে বেণু বন আভূমি হেলে পড়েছে। শাবকসুদ্ধ পাখীর বাসাগুলি লুটের বাতাসার মত ছিটকে পড়ছে ক্ষেতে, মাঠে, মাটিতে। অন্তরীক্ষ থেকে কোন ক্ষ্যাপা দেবতা বনবাদাড়ের ঝুঁটি ধরে টানছে সমস্ত নির্মম শক্তি দিয়ে। নোঙর ছেঁড়া নৌকাগুলি রসাতলের টানে ঢেউয়ের বাড়ি খেয়ে উন্মত্ত হয়ে ছুটছে। লিক্‌লিকে বিদ্যুতের ঝলকে মেঘের স্তবক চিড় খেয়ে ফেটে যাচ্ছে।

এই ঝড়ের ছবি তোলা হলো ক্যামেরায়। তারপর তুলনা করা হোক্ এই ঝড়ের ফটো আর সেই চোখে দেখা ঝড়ের স্মৃতিচিত্র।

সূক্ষ্ম বিচার করতে হবে না। সাদা চোখেই ফটোটি দেখুন। দেখা যাবে তার মধ্যে কালো মেঘ আছে, ছিটকে পড়া পাখীর বাসা আছে, হেলে পড়া বাঁশবন আছে আর বিক্ষুব্ধশীর্ষ বনবাদাড় আছে। কিন্তু ঝড়ের ছবি কোথাও পাওয়া যাবে না। অমন উদ্দাম বিদ্যুল্লেখা যেন খড়ি দিয়ে আঁকা একটা স্তব্ধ রেখা ; প্রকৃতিশরীর যেন কোন রোগে বেঁকে চুরে বসে আছে ; একটি বিকৃত নিসর্গের প্রতিচ্ছবি।

ফটোতে সব বস্তুর এত ভাল রূপ ফুটে ওঠে, ঝড়ের বেলায় এ ব্যতিক্রম কেন?

* * * *

ফটোতে সব জিনিসেরই চিত্র ফুটে উঠবে ঠিক, শুধু একটি জিনিস ছাড়া, সেটা হলো গতির ছবি। মানুষ, পশুপাখী স্থান স্থাণু—সব কিছুরই নিখুঁত প্রতিরূপ (বর্ণ বাদ দিয়ে) ফটোতে পাওয়া সম্ভব, কিন্তু গতিকে ফটোতে ধরা সম্ভব নয়। ফটোতে Static রূপই শুধু প্রকাশ পেতে পারে। যেটা নিছক গতি (movement), তার ছন্দ রূপ বিভঙ্গ বিক্ষোভ ফটো প্লেটের বা সেলুলয়েডের নির্জীব চক্ষে ফুটে উঠতে পারে না। এক সেকেণ্ডের একশ ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যেও যে ত্রস্তা পলায়নরতা হরিণীর ছবি ফটোপ্লেটে ধরা পড়বে সেটাও স্থাণুর ছবি, গতির ছবি নয়। সোজা কথায় বলা যায়, দাঁড় করিয়ে গতির ছবি দেখান যায় না ; যেমন চোখে দেখে বলা সম্ভব নয় ডালে নুন হয়েছে কিনা।

যে কোন সচিত্র পত্রিকার পাতা উল্টালে চোখে পড়বে নাচের ছবি। নাচের ছবি—কাঁটালের আমসত্ত্বর মতই শোনায়। যে বস্তুর প্রাণ গতি (movement) তাকে এইভাবে স্তব্ধ

করে, দাঁড় করিয়ে বোঝান কি সম্ভব? যে লাস্য, অঙ্গহার রেচক ও মুদ্রার ছন্দোময় গতিহিল্লোলে নৃত্যের রূপ সৃষ্টি হয়, সে জিনিস এই সব ফটোর ঘাড় বাঁকানো পা-তোলা সব জড়পুত্তলির মূর্তির মধ্যে পাওয়া কি সম্ভব? নৃত্যরত কতগুলি মানুষের ছবি ফটোতে দেখলে মনে হয় যেন কতগুলি বিকলাঙ্গ লোক দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত ভঙ্গীগুলি ভেংচি বলেই মনে হয়।

কোন সৌখীন ভদ্রলোক নিজের ফটো তোলাবার সময় জামাকাপড়ে ভাল করে সুগন্ধ মেখে নিতেন। তিনি সুগন্ধভরা একটি ফটো আশা করতেন কিনা জানি না। কিন্তু যাঁরা নাচের ফটো তুলবার আশা করেন তাঁদের কি করে থামানো বা বোঝান যায়? বোঝা উচিত যে ছবিতে গতির রূপ দিতে হলে চাই তুলির সাহায্য। ওটা চিত্রকলার অথবা ভাস্কর্যের এলাকা। নটরাজের প্রলয় নাচন শিল্পীর হাতেই রূপ পেতে পারে ; কেন না শিল্পীর এই ছবি বা মূর্তি রেখার 'বন্ধনে' স্থির নয়, রেখার স্ফূর্তিতে ও অবাস্তব স্বাধীনতায় তার উদ্দামতা ও গতিপ্রাণতা রূপময় হয়ে উঠেছে।

মিউজিয়মের বাঙালী

বাঙালী কোন্ জাতি? কূলপঞ্জিকায় যে সব তত্ত্ব আছে তার কথা ছেড়েই দেওয়া যাক্, নৃতত্ত্বে (Anthropology) কি বলে?

রিজলী সাহেব বলে গেছেন, আমরা বাঙালীরা নাকি মঙ্গোল-দ্রাবিড় (Monglo-Dravidian) মিশ্র রক্তের সন্তান। এর পর এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়েছে। সে সব পড়ে দুটি সিদ্ধান্ত করা যায়, হয় জাতি হিসাবে বাঙালী কিছুই নয়, অথবা সব কিছু। খুলি, চোয়াল ও চুল দেখেই নাকি মূল গোত্রগুলি বলে দেওয়া যায়। এই ধরণের বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেই যে যা বলেছেন, তাতে বুঝলাম সত্যই হেথায় একদিন আর্য, অনার্য, দ্রাবিড়, চীন সকলে এক দেহে লীন হয়েছিল। বাঙালীর করোটীতে খুব বড় রকমের একটা বর্ণসাঙ্কর্যের ইতিহাস লেখা রয়েছে। নেগ্রিটো, আলপাইন, প্রোটো-অস্ট্রেলয়েড কিছুই বাদ পড়ে নি।

পণ্ডিতদের লেখা পড়েই এরকম একটা ধারণা মনে গেঁথে গিয়েছিল। কিন্তু একবার যাদুঘর ঘুরে এলে কোন বাঙালীর এই inferiority complex (?) নিঃশেষে দূর হয়ে যাবে।

—একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখুন, নানা জাতির মৃৎ ও প্রস্তর মূর্তি অধ্যুষিত যাদুঘরের একটি সুপ্রশস্ত কক্ষে, দেয়ালের গায়ে বসানো রয়েছে একটি আস্কন্ধ মূর্তি। বোধ হয় তরুণ বয়সের 'আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট'। লম্বা সুউচ্চ নাক, টানা টানা ভ্রূ আর চোখ, সুদৃশ্য চোয়াল, ঢেউ খেলানো চুলের স্তবক মাথা ছেয়ে রয়েছে।

ঐ বস্তুটি কি? এ্যাপোলোর মুণ্ডও হতে পারে। একটু এগিয়ে গেলেই কিন্তু এ ভ্রান্তি ঘুচে যাবে কারণ মূর্তিটির নীচে স্পষ্ট লেখা রয়েছে—বাঁকুড়ার জনৈক রাঢ়ী কায়স্থ।

এই চাক্ষুষ প্রমাণের পরেও কি বলবো আমরা বাঙালীরা অনার্য?

কথারূপ

ভাষায় চলতি এমন এক একটি শব্দ পাওয়া যায়, যার মধ্যে অদ্ভুত হিউমার, কবিত্ব, ইতিহাস ও উপকথার সংক্ষিপ্ত রূপ লুকিয়ে থাকে। ইংরাজীতে ফুল, ফল, পাখী প্রভৃতির নামের মধ্যে এই ধরনের অজস্র অর্থগূঢ় শব্দ পাওয়া যায়। কণ্ঠাস্থিকে 'বাবা আদমের আপেল' (Adam's apple) বা ঢেঁড়সকে 'ভদ্রমহিলার আঙুল' (Lady's finger) বলার মধ্যে সত্যিকারের কবিত্ব রয়েছে।

বাংলা ভাষাও এদিক দিয়ে গরীব নয়। যে ভাষায় পাখীর নাম 'বউ কথা কও' বা 'চোখ গেল' সে ভাষার সঙ্গে কাব্যময় শব্দের প্রতিযোগিতায় পৃথিবীর খুব কম ভাষাই টেক্কা দিতে পারবে। এ ভাষার প্রকোপে পড়ে নীলকর সাহেবের লগুড়ও 'শ্যামচাঁদ' হতে বাধ্য হয়েছে। 'লেডিকেনির' কথা তো সকলেই জানেন—এক লাটগিন্নীর নামের রসে আজও ভারি হয়ে আছে। এই বাংলা দেশেই আকাশ থেকে 'ইলসেগুঁড়ি' ঝরে পড়ে। এইটুকু 'বেনে-বৌ' ঘাসের ডগার ওপর বসে থাকে। 'তাঁতী-বৌ' গাছের পাতা থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে মুখের লালা দিয়ে জাল বোনে আর মাছি বেঁধে রস শুষে খায়। এক ধানেরই বোধ হয় অষ্টোত্তর শতনাম আছে—কনকচূর, খেজুর ছড়ি, দুধরাজ, মৌকলস, জামাই লাড়ু, সীতাশালি, লক্ষ্মীকাজল। 'বিশ্বনাথ মুখো' অমৃত ফল হয়ে গাছে গাছে ঝুলছে। ফুল বাগানে 'শ্যাম সোহাগিনী' ফুটে উঠছে প্রতি সন্ধ্যায়।

সংস্কৃত শব্দেও এ ধরনের নামরসের অভাব নেই। একটি শব্দ দেখলাম—'তুরস্কা'। প্রথমে মনে হলো এ বুঝি 'তুরস্ক নারীর' কোন প্রতিশব্দ হবে। কিন্তু আসলে তা নয় ; 'তুরস্কা' একটি অতি সাধারণ মসলা, যাকে আমরা যোয়ান বলি।

সব চেয়ে আশ্চর্য লাগে 'ব্রাহ্মণা' শব্দটি। শব্দটির মধ্যে বর্ণাশ্রমসুলভ বেশ একটু নিষ্ঠার ঘটাও রয়েছে। কিন্তু এর অর্থ বুঝবার পর একটু দুঃখই বোধ হলো। 'ব্রাহ্মণা' অর্থ কোচিন মুর্গী।

অবলা থিওরী

কোন কোন ধর্মশাস্ত্রে বলা হয়েছে নারীর আত্মা নেই। ফিলসফিতেও কতখানি 'সাম্প্রদায়িকতা' থাকতে পারে, এটা তারই একটা বড় নমুনা। যে সংস্কৃতি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সৃষ্টি তাতে এ রকম নারীবিরুদ্ধ মতবাদের প্রশ্রয় ও উৎসাহ দেওয়া হবেই ; এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। আবার অনেক ধর্মশাস্ত্র ও সংহিতা আছে যাদের দৃষ্টি একটু উদার। তারা নারীর আত্মা নিয়ে এতটা সঙ্কীর্ণ মনোভাবের পরিচয় দেয়নি। তাদের মতে পুরুষ ও নারী, দুইই বিধাতার সৃষ্টি ; উভয়ের মধ্যেই জীবাত্মার অধিষ্ঠান। পৃথিবীর সকল দেশের ফিলসফির মধ্যে এ বিষয়ে সব চেয়ে উদার মতবাদ প্রচার করেছে ভারতের সাংখ্য। নারী সম্বন্ধে এতটা উদার উক্তির তুলনা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। সাংখ্যের 'পুরুষ' হ'ল নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতিই প্রধানা শক্তি ও সৃষ্টির অধিনায়িকা।

এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, প্রাচীন মানবসমাজে নারীই ছিল সমাজের কর্ত্রী। পরবর্তী যুগে ধীরে ধীরে কি করে ও কিভাবে তারা গৌরবের আসন থেকে নেমে এল তার বিশদ কাহিনী এখন শুধু অনুমানসাপেক্ষ। তবে নারীর অদৃষ্টে এ ট্রাজেডি ঘটেছে, এটা অস্বীকার করা যায় না।

পুরুষের রচিত ফিলসফির স্তাবক স্বরূপ আবির্ভূত হলেন মধ্যযুগের কবির দল। তাঁদের একটি মাত্র ধূর্ত প্যাঁচের জোরে নারীজাতির সকল মর‍্যালে বিপ্লব ঘটে গেল। প্রচারিত হল—নারী অবলা, লজ্জাই তার ভূষণ। ব্রীড়াশীলা অবনতমুখী নারী, গৃহ তার একমাত্র কর্মস্থলী, সেবা ও সন্তানধারণ তার একমাত্র ধর্ম। দেখা গেছে ঠিক যেদিন থেকে এই অবলা থিওরী নারী সমাজে বিশ্বাসের সঙ্গে গৃহীত হয়েছে, ঠিক সেই দিন থেকে সুরু হয়েছে তার বুদ্ধির অপকর্ষ। এইখানে নারীর ঐতিহাসিক অধঃপতনের আরম্ভ। ধীরে কোথায় মিলিয়ে গেল মাতৃতান্ত্রিক সমাজের সবলা মানবীর প্রতিভা, কর্মশক্তি আর বুদ্ধিচর্চা।

* * * *

পুরুষতন্ত্র একবার যখন প্রতিষ্ঠিত হ'ল তারপর নারীর বন্ধনদশা দৃঢ়তর করার জন্য নানাদিকে প্রচেষ্টার আর অন্ত রইল না। বৈজ্ঞানিকেরাও কতখানি সঙ্কীর্ণ হতে পারে তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। একদল বৈজ্ঞানিক প্রচার করলেন—নারীর মস্তিষ্ক নাকি আয়তনে ও ওজনে পুরুষের মস্তিষ্কের চেয়ে অনেক ছোট। কাজেই বুদ্ধিচর্চায় নারী পুরুষের চেয়ে অনগ্রসর থাকবে এটা প্রকৃতির বিধান।

তবু সুখের কথা, আধুনিক বিজ্ঞানীরা এটা অস্বীকার করেছেন। নারীর মস্তিষ্কের আয়তন পুরুষের মস্তিষ্কের অনুপাতে ক্ষুদ্রতর নয়। বরং দেখা গেছে, দেহের আয়তনের অনুপাতে পুরুষের চেয়ে মেয়েদের মস্তিষ্ক বড়।

* * * *

নারীর বিরুদ্ধে অখ্যাতি সৃষ্টি করতে মাঝে আর একটি থিওরি খুব জোর গলায় প্রচার করা হ'ল—নারীর চেয়ে পুরুষ নাকি দৈহিক সৌন্দর্যে বড়। হেলেনিক (Helenic) আর্ট তার সব চেয়ে বড় নিদর্শন। গ্রীক শিল্পীরা নারীর চেয়ে পুরুষের দেহের মধ্যেই সৌন্দর্যের পরিচয় পেল বেশী করে। গ্রীক ভাস্কর্যে নারীকে আর্টের উপেক্ষিতা হয়েই থাকতে হয়েছে।

স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—"স্ত্রীজাতি অপেক্ষা যে পুরুষজাতির সৌন্দর্য অধিক, প্রকৃতির সৃষ্টি-পদ্ধতি সমালোচনা করিয়া দেখিলে আরও স্পষ্ট প্রতীতি হইবে। যে বিস্তীর্ণ চন্দ্রকলাপ ময়ূরের আছে, ময়ূরীর তাহা নাই। যে কেশরে সিংহের এত শোভা, তাহা সিংহীর নাই। যে ঝুঁটিতে বৃষভের কান্তি বৃদ্ধি করে, গাভীর তাহা নাই। কুক্কুটের যেমন সুন্দর তাম্রচূড়া ও পক্ষসকল আছে, কুক্কুটীর তেমন নাই।"

পুরুষরচিত রূপতত্ত্বের (Aesthetics) এই সাম্প্রদায়িকতা মনোবিজ্ঞানীরা এক যুক্তিতে উল্টে দিয়েছেন। প্রাচীন মানবসমাজের কোন নারী দার্শনিক ঠিক এইভাবেই বলতে পারতেন—পুরুষ কি কুৎসিত! ময়ূরের গায়ে এত নোংরা পেখমের বোঝা ; মোরগের মাথায় এই তাম্রচূড়া, সিংহের ঘাড়ের রোঁয়া আর ষাঁড়ের ককুদ—কি কুৎসিত আবর্জনায় ভারাক্রান্ত পুরুষের দেহ!

জীবজগতের পুরুষদেহের এই স্বাভাবিক অলঙ্কারের যে যুক্তি দেওয়া হয়েছে সেটাও আবার সব ক্ষেত্রে সত্য নয়। রূপতত্ত্বের এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করলেও দেখা যায় যে, কীট ও পতঙ্গ জগতে এর ব্যতিক্রম আছে। অধিকাংশ পতঙ্গ ও কীটের মধ্যে অবয়বের অলঙ্কারে স্ত্রী-জীবই সমৃদ্ধ। দৈহিক শক্তিতেও স্ত্রী-কীট ও স্ত্রী-পতঙ্গ পুরুষের চেয়ে উন্নত।

* * * *

'যাবো না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী,
আমারে প্রেমের বীর্যে কর অশঙ্কিনী।
বীর হস্তে বরমাল্য লবো একদিন...'

রবীন্দ্রকাব্যে সবলা নারীর মুখে এই উক্তির সঙ্গে আমরা পরিচিত। আজ আবার প্রত্যেক দেশে নারী-অভ্যুত্থানের মধ্যে এই সুর প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে। নারী অবলা নয়, দৈহিক

শক্তিতেও সে পুরুষের সমান।

আর একটা কথা বিশেষ করে অবিশ্বাস করার সময় হয়েছে। ইতিহাসের সবলা নারী আজও পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়নি ; যদিও এর জন্য গোঁড়া পুরুষতান্ত্রিক সমাজের উদ্যোগে যথেষ্ট চেষ্টা যত্ন করা হয়েছে।

আধুনিক নারীও দৈহিক শক্তিতে পুরুষের চেয়ে কত উন্নত তার প্রমাণ স্কটল্যাণ্ডের নারী শ্রমিক। ভারতেও এর নিদর্শনের অভাব নেই। মহারাষ্ট্রে সব চেয়ে বেশী শ্রমসাধ্য ও দৈহিক শক্তিসাপেক্ষ কাজ নারীরাই করে। মহারাষ্ট্রের এক কারখানায় আশ্চর্য হয়ে দেখেছি, সেখানে মেয়ে শ্রমিকেরা বড় বড় ঘান হাতুড়ী চালাচ্ছে আর পুরুষ শ্রমিকেরা শুধু চিমটে দিয়ে লোহার পাত নাড়াচাড়া আর ঠুকঠাক করছে।

বাংলা দেশেও নারীর দৈহিক শক্তির উৎকর্ষের প্রমাণ পেতে হলে বাঁকুড়া, বীরভূম আর মানভূমের মেয়ে শ্রমিকদের দিকে লক্ষ্য করলেই বুঝা যায়। দু'মণ ওজনের বোঝা শুধু নারী শ্রমিকেরাই বহন করতে পারে। পুরুষ শ্রমিক এদিকে ঘেঁসে না। কিন্তু অত্যন্ত বিচিত্র ও দুর্ভাগ্যের বিষয়, মেয়ে শ্রমিকদেরই মজুরী কম।

* * * *

তবুও অস্বীকার করার উপায় নেই যে আধুনিক সমাজে নারী ঠিক স্বাধীন নয়। তাকে পুরুষের আশ্রিত হয়ে থাকতে বাধ্য করা হয়েছে। নারী সব দিক দিয়ে পুরুষের সঙ্গে সমান কুশলী ও যোগ্য হয়ে ঠিক এঁটে উঠতে পারছে না। সুতরাং এক বিষয়ে নারী এখনও পুরুষের চেয়ে অনগ্রসর নিশ্চয়। পুরাতন মাতৃতান্ত্রিক সমাজের সবলা নারী নিশ্চয় এমন কোন গুণ সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলেছে যার অভাবে তার অভ্যুত্থান সুসিদ্ধ হতে পারছে না।

আধুনিক নারী সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলেছে তার প্রাচীন যুদ্ধবিদ্যার নিপুণতা, সংহার কর্মে সে আজ আর শ্রেষ্ঠ নয়, এখনও নয়। অথচ বর্তমান সমাজে যুদ্ধই জগতের ভাগ্যের কর্ণধার। কলহকলায় নারী অবশ্য পুরুষের চেয়ে পশ্চাৎপদ নয়। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে (Collection) মারণ সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া, যুদ্ধবিগ্রহ পরিচালনা করা ও ধ্বংসের জন্য আক্রমণমূলক (aggressive) উদ্যোগ করার উৎসাহ আধুনিক নারীর মনস্তত্ত্বে আর স্থান পায় না। এই দিকে তার প্রেরণা আজ একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে। বাহুবল থাকা সত্ত্বেও দ্বন্দ্বে ও সংগ্রামে বাহুবলের প্রয়োগ করার প্রবৃত্তি (instinct) তার লুপ্ত হয়ে গেছে।

গ্রীক ইতিকথার অশঙ্কিণী আমাজন (Amazon) নারী সম্প্রদায়ের রাজ্যপ্রতিষ্ঠা ও রণনৈপুণ্য এবং বীরনারী চিত্রাঙ্গদার কাছে অর্জুনের পরাজয় আজ কল্পকথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ইতিহাসে এই কথাটাই একদিন সত্য ছিল, নারী কোন কালেই অবলা ছিল না।